শারদীয়া
শুকতারা
১৪০৭

এল পুজো
চাই সাজ
সঙ্গে চুলের বাহার

তাই চুল নিয়ে কিছু কথা...

জীবনে হাজারো সমস্যার মধ্যে আপনার চুল নিয়ে সমস্যা একটি অন্যতম। চুল পড়ে যাওয়া, অকালে পেকে যাওয়া, খুস্কি। আসুন, আমরা আলোচনা করে দেখি কেন এই সমস্যা আর কি এর প্রতিকার।

-অতিরিক্ত চুল পড়া, অকাল পক্কতা বা খুস্কি এগুলো চুলের কোন রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র।

চুল কেন পড়ে ?

-প্রতিটি চুলের নিজস্ব যে আয়ু তা শেষ হলে চুল স্বাভবিকভাবে পড়ে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত চুল পড়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন রক্তাল্পতা, পেটের গোলমাল অথবা শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি।

চুল কেন পাকে ?

- শরীরের আভ্যন্তরীন গোলযোগের প্রভাবে চুলের মেলানিন ঠিকমত তৈরী না হলে চুল সাদা হয়ে যায়।

খুস্কি কেন হয় ?

-মাথার তালুর মৃত কোষকে খুস্কি বলে। অনেক কারণের মধ্যে অপরিমিত রক্ত সঞ্চালন, নার্ভ স্টিমুলেশনের ঘাটতি, ইনফেকশন, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং সঠিক পরিচর্যার অভাব।

সমাধানের উপায় —

-চুল নিয়ে উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে আপনার প্রয়োজন সঠিক খাওয়ার ওষুধ ট্রায়োফার ট্যাবলেট যা চুলের সমস্যার মূল কারণগুলি ভিতর থেকে দূর করে কারণ এতে আছে প্রয়োজনীয় টিস্যু সল্ট এবং পরীক্ষিত হোমিও ওষুধ ট্রায়ো - লাইকো, কার্বো, চায়না।

এর সঙ্গে তেলবিহীন আর্নিকাপ্লাস হোমিও হেয়ার ভাইটালাইজার যা চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় উপাদান যোগান দিয়ে গোড়াকে স্টিমুলেট করে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে চুলের গোড়াকে করে মজবুত ও প্রানবন্ত।

Allen Estate, Krishnapur Road, Calcutta - 59, Ph.:+91 33 571 7273, Fax: +91 33 571 2121, E-mail : allenlab@vsnl.com

পুজোর ক'দিন
পথে ঘোরা বাইরে খাওয়া
আর
লিভোসিন
আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক
কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে, ক্ষুধা ও হজম শক্তি বাড়াতে, অম্লরোগ,
গ্যাস ও ক্লান্তি তাড়াতে, পেট পরিষ্কার রাখতে ও লিভারের যত্ন নিতে
নিয়মিত লিভোসিন সেবন করুন
250ml.
LIVOSIN
AYURVEDIC LIVER TONIC
CARMINATIVE APPETISER
Livosin
Ayurvedic Liver Tonic
Allen Estate, Krishnapur Road, Calcutta - 59, Ph.:+91 33 571 7273, Fax: +91 33 571 2121, E-mail : allenlab@vsnl.com

শারদীয়া শুকতারা

আশ্বিন ১৪০৭ □ সেপ্টেম্বর ২০০০

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সরোজ সরকার

দাম : ৪৮ টাকা মাত্র

ভারতে সর্বাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

প্রতি মাসে পড়ুন
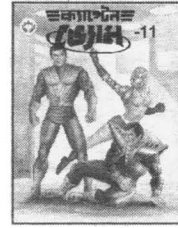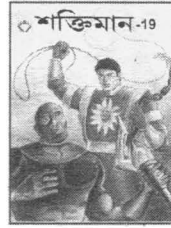
ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাবের সদস্য হোন এবং বছরে ২০০ টাকা বাঁচান!

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম-এবং ঠিকানা ইংরাজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী! ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি **'ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব'**-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি.পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : ____________________

ঠিকানা : ____________________

____

পোস্ট : ____________ জেলা : ____________

পিন কোড : ____________________

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : ____________________

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. A-11, সেক্টর-58, নয়ডা-201301 (উ.প্র.)

বাঁটুল দি গ্রেট

আসুন, আসুন! কি চাই বলুন?
কি চাই সেটা ঝটপট হাতে ধরিয়ে দে না ছাই!

এইযে, এই নিন, দাদাভাই!
এটা কি?
আমরা কি চাই ওটা তারই ফর্দ!

একি! চাঁদা- দশ হাজার!
ওটাই আমাদের সবচেয়ে কম চাঁদার অ্যামাউন্ট!

মগের মুলুক নাকি? এই নাও তোমাদের চিরকুট!
আমাদের দেওয়া চাঁদার নির্দেশের প্রতিবাদ করলে কি করা হয় রে, প্যান্তা?
অ্যামাউন্ট ডবল হয়ে যায়!
ধরিয়ে দে।

এই নিন দাদা পেনাল্টি রসিদ। বেয়াদবি না করে দিয়ে দিন। না হলে টাকা বাড়বে আর বিপদে পড়বেন!
কি! জুলুমবাজি করে আবার হুমকি দিচ্ছো! এক পয়সাও দেবো না!

পুজো এসে গেলো। চল তোদের জন্যে কিছু কেনা কাটা করা যায় কিনা দেখি।
খুব ভালো কথা। তাই চলো, বাঁটুলদা!

পোশাকের দোকান
এই দোকানেই ঢোকা যাক। ভালো জিনিসই পাওয়া যাবে মনে হয়।
হ্যাঁ, বেশ বড়ো দোকান।

এ সময় কারা আবার মরতে ঢুকলো?
ঢুকেছে ভালোই হয়েছে। এদের কাছ থেকেও তোলা মানে চাঁদা তুলবো রে প্যান্তা!

দিনটা কি পয়া রে, স্যাঙাৎ! ক্রেতা বিক্রেতা দুয়ের কাছ থেকেই তোলা তুলবো।
কি তুলবেন দাদা?
কিছু চাঁদা।

দেরী না করে চিরকুটটা চটপট এর হাতে ধরিয়ে দে।
রেডি করাই আছে, ধরো।

চিরকুটে দশহাজার লেখা এর মানে?
চাঁদা। ওটাই আমাদের লোয়েস্ট রেট।
১০০০০

এই দেখো, ওরা আমাকেও দিয়েছে। প্রতিবাদ করায় দশহাজারকে কুড়িহাজার করেছে। না দিলে অঙ্ক আরো বাড়বে বলেছে!

কই মাল ছাড়ুন! তাড়াতাড়ি! খামোকা টাইম কিল করবেন না!
জলদি করো! তোমাদের নিয়ে থাকলে চলবে না। বহুত পার্টির কাছে যেতে হবে। কুইক!

এইযে, দাদারা! তোমাদের দাবীর টাকা দিতে না পারার জন্যে আমরা খুবই আন্তরিক দুঃখিত!
তাই বুঝি!

তাহলে আমরাও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমরাও আমাদের আঙুল বেঁকাতে বাধ্য হচ্ছি। প্যান্তা তুই বিক্রেতার ভুঁড়ি আমি ক্রেতার মুড়ি ছরকুটে দেবার ব্যবস্থা করছি।
ওরে বাবারে! এদের ঘাঁটিয়ে তুমি ভালো করলে না, বাছা!

আর বেশী কথা নয়। এক থেকে তিন গোনার মধ্যে হয় ক্যাশ দেবে, নয় এই স্পেশাল পিস্তলের স্পেশাল গুলি তোমাদের ভুঁড়ি আর খুলি ছত্রখান করে দেবে!
এক-দুই-

ইরক!
-ই-ন্!
আরে অতো তাড়া কিসের?
দুড়ুম!
দুড়ুম!

এটা কি হলো রে, স্যাঙাৎ? এরকম তো হওয়ার কথা নয়!
আমরা রং নাম্বারে ঢুকে পড়েছি রে, প্যান্তা! চল কেটে পড়ি।

সাবধানে! এ জায়গাটা খুব সুবিধের নয়।
ওরক
টরক!
পোশাক দোকান

হাঃ হাঃ! কোথায় যাচ্ছেন দেখে শুনে যাবেন তো!
পোশাকের দোকান

এবার তোমাদের যাতে এই তল্লাটে আর দেখতে পাওয়া না যায় তার ব্যবস্থা করছি।
পোশাকের দোকান

যাও, এবারে এমনিই রেহাই দিয়ে দিলুম।
অবিশ্বাস্য!
সেই মহাপাজি তোলাবাজ দুটো না।
হ্যাঁ! গত সপ্তাহে ওদের আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়েছিলো।

কি করতে কি হয়ে গেলো বলতো ভাই, প্যান্তা?
ভেবেছিলাম ফুর্তিতে উড়বো! কিন্তু এভাবে উড়বো ভাবিনি রে, প্যান্তা!

এইভাবে দুষ্কৃতি হঠানো আগে দেখিনি। তাই ওদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এই পাঁচ হাজার টাকার চেক!
আর তোমাদের জামা।

৫৩ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪০৭ ● সেপ্টেম্বর ২০০০

আবার কাঁদুনি

অন্নদাশঙ্কর রায়

মশাই,
বাসান্তরী করলে আমায়
ঘুঘুডাঙার মশায়।
সন্ধ্যাবেলা পড়ল ধরা
ম্যালেরিয়া জ্বর
নার্সিং হোম-এ যেতে হলো
তখনই সত্বর।
শুয়ে শুয়ে কেটে গেল
চার রাত চার দিন
সমস্তক্ষণ ছিলুম আমি
চিকিৎসা অধীন।
দুইবেলা দু'জন ছিল
শুশ্রূষাকারিণী
এ হেন সংকটে আমার
তারাই তারিণী।
হোম্ থেকে হোম্-এ এসে
নাই কো নিস্তার
পালা করে সঙ্গী হয়
দু'জন সিস্টার।
মাস ছয়েক কেটে গেছে
তবুও দুর্বল
বেঁচে আছি এখনও
এটাই সুফল।
মশাই,
কোমর-ভাঙা করে গেছে
ঘুঘুডাঙার মশায়॥

ছবি : সুফি

জংশন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।
ওকে তুমি যাই বলো, বলবে 'জী, আজ্ঞা'॥

যদি হয় সজ্জন, এক ঘরে দশজন।
ঠেলাঠেলি লেগে যায় আসতেই জংশন॥
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে।
যেন দুনিয়ার ভার একা ওর স্কন্ধে॥

নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি।
গরমে খাও কুঁজোর জল, মেঝেয় পাতো শীতলপাটি॥

দু-নৌকোয় পা রেখো না, পড়ে যাবে অগাধ জলে।
মাঠে আজ জবর খেলা, দেখতে যাব সদলবলে॥

রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোমার বড়ো খোসা।
বলেছিলাম সরে বসতে, তাতেই বাবুর গোঁসা॥
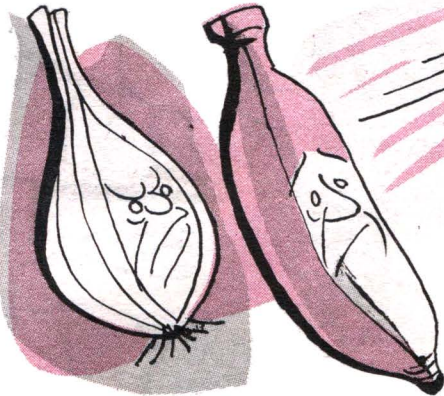
ভাবা যায় না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

খেলায় নাকি ইচ্ছে করে
কেউ হারে, কেউ জেতে,
আমরা তো কই অমন ব্যাপার
ভাবতে পারি না।
কেউ ক্রিকেটে, ফুটবলে কেউ
আমরা থাকি মেতে,
কিন্তু অমন জিতি না কেউ,
কিংবা হারি না।
ওইভাবে হারজিতের কথা
ভাবতে পারি না।

সব সময়ে জেতা কি যায়,
অনেক সময় হারি,
কিন্তু অমন কাণ্ড তো কেউ
ভাবতে পারি না।
ওইভাবে হারজিতের মধ্যে
লজ্জা আছে ভারী,
তাই ও-রকম কাণ্ডের ধার
আমরা ধারি না।
খেলার মধ্যে ব্যবসাদারি?
ভাবতে পারি না।

চলাচল

কৃষ্ণ ধর

চলাচল নিয়ে খুড়ো ভেবে হিমশিম
ভাইপোকে ডেকে কন, শোনো তো অসীম।
গাড়ি চলে, টাকা চলে, আর চলে কী?
মুখ চলে হরদম, নয় চালাকি।

হাত চলে যদি বলি মানে যায় বোঝা
পা চলে যদি বলো তারও মানে সোজা।
বাটিচলা জানো তো, তুকতাক করা
দিন চলে গেলে তাকে যায় না তো ধরা।

গরমে আরাম হয় যদি চলে পাখা
পোশাকে-আশাকে চলে ফ্যাশনের চাকা।
স্রোত চলে নদীজলে সাগরসঙ্গমে
মিছিলের চলা ঘিরে যানজট জমে।

আচার-বিচারে চলে যত সংস্কার
গুলি যদি চলে তবে সব ছারখার।
চায়েতে চলে না চিনি যদি কেউ বলে
শুধুই লিকার কাপে দিতে হয় ঢেলে।

কলম না চলে যদি হয় না তো ছড়া
চলা নিয়ে এত কথা নয় মনগড়া।
আগে চলো, আগে চলো বলছে সবাই
চলার কথাটা নিয়ে তোমাকে ভাবাই।

কোন কথা কোথা চলে জানা থাকে যদি
ভাষার সাগরে গিয়ে মেলে বাগ্‌বিধি॥

ছবিঃ সুফি

নিনি, কল্যাণীয়াসু

বুদ্ধদেব গুহ

নিনি, কল্যাণীয়াসু,

তুইই একদিন বলেছিলি যে, তোর মা তোকে বলেছিল যে, আমি কীসব বিটকেল বিটকেল লেখা লিখি। মায়ের সব কথাই কি শুনতে আছে! তুই এও আবদার করেছিলি যে কোথাওই বেড়াতে গেলে সেখান থেকে যেন তোকে চিঠি লিখি।

আমি তো দার্জিলিং, শিলং, কুলু-মানালী, কেদার-বদ্রী, সিকিম-হিমালয় এসব জায়গা নিয়ে লিখব না। ওসব জায়গাতে যে বেড়াতে যাইনি এমন নয়। শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই ছেলেবেলা থেকে আমার পা পড়েছে। কিন্তু সকলেই যেখানে যায়, যা নিয়ে লেখে, সেখানে যেতে বা সেইসব জায়গা নিয়ে লিখতে আমার ভাল লাগে না কোনোদিনই। অ্যামেরিকান কবি Robert Frost-এর একটা বিখ্যাত কবিতা আছেঃ "The Road not taken".

সেই কবিতার শেষে আছে, "I had taken the other road and that had made all the difference."

মানে বুঝলি রে নিনি-বোকাই? এখন না বুঝলেও বড় যখন হবি তখন নিশ্চয়ই বুঝবি।

ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার গভীর জঙ্গল পাহাড়ঘেরা একটি জায়গার নাম মহুলসুখা, ম্যাঙ্গানীজ মাইনের জন্যে বিখ্যাত। ওড়িশার এই সুন্দরগড় জেলা ও বিহারের সিংভূম জেলাতে বেশ কয়েকটি জঙ্গলে জায়গা আছে যেখানে লাল-নীল নদী বয়ে যায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। ম্যাঙ্গানীজ-এর খনি বা খাদান যেখানে আছে, বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে নেমে-আসা মাটি-ধোওয়া জল যখন পাহাড়ী নদীতে এসে পড়ে তখন সেই জলের রঙ লাল দেখায়, আবার যেখানে লোহার খনি বা খাদান থাকে সেখানের পাহাড় থেকে মাটি ধুয়ে নিয়ে আসা জলের রঙ নীল। তাই নদীর রঙ লাল বা নীল।

এই মহুলসুখাতে এসেছি, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কয়েকদিন হলো। এসেছি নিছকই জঙ্গলের মধ্যে থাকব বলেই। বড় ভাল লাগছে। জঙ্গলের মধ্যে সময় কাটালে তোদেরও ভাল লাগবে কারণ প্রকৃতিই যে আমাদের দ্বিতীয় মা।

মহুলসুখা মাইনস-এর আরেকটা নাম ভুতরা মাইনস। কালো জলরাশি বুকে নিয়ে ম্যাঙ্গানীজ আকর-এর গুঁড়ো বয়ে নিয়ে ছিপছিপে নদী চলেছে বনবিতানের মধ্যে দিয়ে। নদীর নাম কুড়াড়ি। তবে জল এখানে লাল নয়, কালোই।

মহুলসুখা ম্যাঙ্গানীজ মাইনস-এর গেস্ট হাউসটি একটি পাহাড়ের উপরে। খুবই সাদামাঠা বন্দোবস্ত। সঙ্গে বাবুর্চিখানা নেই বলে আরোই অসুবিধের। নিচের স্টাফ ক্যান্টিন থেকে চা থেকে শুরু করে অন্যান্য খাবারদাবারও সব বয়ে নিয়ে আসে চৌকিদার, ফলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তবে জঙ্গলে যেতে পারলে ও থাকতে পারলে এইসব ছোটখাটো অসুবিধা গায়ে মাখলে চলে না। খাওয়া না হয় একটু কমই হলো, আরাম-বিলাসও না হয় নাই হলো কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তো থাকা হলো। সেটাই তো মস্ত লাভ।

আমি মহুলসুখাতে গেছিলাম বড়বিল থেকে, বড়জামদা হয়ে জীপে করে। রাউরকেল্লা থেকেও আসা যায়।

বাংলোর বারান্দাতে বসে তোকে চিঠি লিখছি। হাওয়াটা ঝড়ের মতো বইছে। বিহার ওড়িশার পাহাড়ে জঙ্গলে এপ্রিল মাসে যেমন বয় আর কী! হাওয়াটা ক্রমশই জোর হচ্ছে। লোহা আর ম্যাঙ্গানীজের আকরের গুঁড়ো-মাখা লাল মাটির মিহি আস্তরণ উড়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে মাইক স্যাটোর ফরমূলা রেসিংকারের মতো। আর উপরের স্তরে উড়ে চলেছে পাতারা, ছোটকি ধনেশ কী টিয়ার ঝাঁকের চেয়েও অনেক বেশি গতিতে। নানারঙা পাতা, শাল গাছের পাতা, আমের পাতা, শিমুলের পাতা, পলাশের ঝরা পাপড়ি,বয়েরের পাতা, জংলী কাঁটালের পাতা, কুসুম গাছের পাতা ঝাঁক ঝাঁক তীরের মতো উড়ে চলেছে। আর তারও উপরে উড়ছে ডিগবাজি খেতে খেতে, গিলিরী আর মুতুরী আর না-নউরিয়া ফুলেদের ফিনফিনে পাপড়ি। আঃ কী ভাল যে লাগে!

এই মহুলসুখা ছাড়িয়ে, কুড়াড়ি নদী পেরিয়ে অনেক পাহাড়ে উঠে এবং নেমে জীপে করে প্রথমদিনই খাণ্ডাধারে গেছিলাম। তখনও কোথায় যে শেষ পর্যন্ত থাকব সে সম্বন্ধে মনস্থির করিনি। মহুলসুখার ম্যাঙ্গানীজ মাইন বেসরকারী কিন্তু খাণ্ডাধারের

শারদীয়া—শু-১(ক)

লৌহ আকরের খাদান সরকারী। ম্যানেজারের নাম বিশ্বল সাহেব। ক্রিমসন-রঙা হাওয়াইন শার্ট পরে অফিসে কাজ করছিলেন। তিনি নাকি বড়বিলের বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নিয়মিত পড়েন।

শিক্ষিত ওড়িয়াদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলা পড়তে পারেন যে শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যর খুবই ভক্ত। এই কথা জানলে তাঁদের উপরে বাঙালি হিসেবে আমার ভক্তি বাড়ে এবং আমাদের নিজেদের উপরে কমে। আমরা কি কেউই ওড়িয়া বা অহমিয়া সাহিত্য পড়ি? হিন্দী বা উর্দুতেও অনেকই ভাল সাহিত্য রচিত হয়, যদি বিহারী সাহিত্য বলে তেমন কিছু নাও থাকে। তবে ওড়িয়া আর অহমিয়া ভাষার সাহিত্যর মান বেশ ভাল। আমরা জাত হিসেবে কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই এতটাই উচ্চমন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে কোনোদিনই তেমন উৎসাহ পোষণ করিনি, তাঁদের জানবার চেষ্টা করিনি, ভালবাসার তো নাইই। উল্টে অকারণেই আমাদের ঘোর অজ্ঞতাতে তাঁদের নানাভাবে অপমান করেছি। অবশ্য আজকে সেই অপরাধের পাপ কড়ায় গণ্ডায় স্খালন করছি আমরা এবং হয়তো আমাদের পরের প্রজন্মেরও তা করতে হবে। আমরা জাত হিসেবে কূপমণ্ডূকও বটে। কুণ্ডু স্পেশাল বা বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের নানা ট্যুওরে সেই সব রাজ্য বুড়ি ছোঁওয়ার মতো করে ছুঁয়ে এসে আমরা মনে করি আমরা দারুণ ভ্রমণমনস্ক। কিন্তু ভ্রমণ কাকে যে বলে, সেটাই আমাদের মধ্যে কম মানুষ জানি। শারীরিকভাবে কোথাও না গিয়েও বাড়ি বসেও মানসভ্রমণ করা যায় কিন্তু ভ্রমণ কী করে করতে হয় তা শিখতে হয়। কোনো স্কুল-কলেজে এই বিদ্যা শেখানো হয় না, হয়তো হবে কোনোদিন। কিন্তু ভ্রমণের এই ওরিজিনাল কায়দাতে আমি রপ্ত হয়েছি আমার ছেলেবেলা থেকে। এ কথা জেনে আহ্লাদবোধ করি, গর্ব বোধ না করলেও।

এই খাণ্ডাধারে খুব সুন্দর একটি জলপ্রপাত আছে। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ চড়ুভাতি করতে আসেন এখানে।

যেদিন আসি এখানে, সেদিনই মালপত্র জীপ থেকে না নামিয়ে সোজা খাণ্ডাধারেই চলে গেছিলাম। যেখানে মন করবে সেখানেই থাকব বলে। খাণ্ডাধার-এই থাকতে পারতাম আমি। কারণ এখানের সরকারী অতিথি-ভবনটি ছোট হলেও অনেক আরামদায়ক। কিন্তু ভেবে দেখলাম যে মহুলসুখাতেই থাকা ভাল অসুবিধে সত্ত্বেও। কারণ মহুলসুখা অনেকই জংলী মালভূমির খাণ্ডাধারের চেয়ে। সেই কারণেই বড়বিলের মিত্র এস. কে. লিমিটেডের ব্যানার্জি সাহেব আমাকে মহুলসুখা মাইনস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিশ্র সাহেবের জিম্মাতে এই পাহাড়চুড়োর বাংলোতে সন্ধ্যের মুখে মুখে গরমে কাতর, তৃষ্ণায় চিঁক-চিঁক-চিঁক করে শিস তুলে ডাকা ঝুড়িভর্তি মুরগীদের এবং আমাকেও মহুলসুখাতেই নামালেন।

তখন আমাদের অবস্থাও কাঁচা লাল পথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর লাল ধুলোর আস্তরণে বিজয়া দশমীর বিকেলে সিঁদুর খেলা সধবাদের মতো। ব্যানার্জি সাহেব আমাকে এক মুঠো ম্যালেরিয়া-নিবারণী বড়ি দান করে চলে গেলেন। জীপের লাল টেইল লাইট দুটো অন্ধকারের মধ্যে চড়াই-উৎরাই করতে করতে হারিয়ে গেল।

এখান থেকে বড়জামদা বা রাউরকেল্লা যেতে হলে, যাদের জীপ নেই, তাদের যেতে হবে কইরা অথবা বারসূঁয়া। বারসূঁয়া মহুলসুখা থেকে প্রায় সতেরো-আঠারো মাইল ঘন জঙ্গলের মধ্যের পথে। এই বারসূঁয়াতে হিন্দুস্থান স্টিল-এর লোহার খাদান আছে। মালগাড়ির বড় বড় ওয়াগনের রেক ভর্তি হয়ে লৌহ-আকর চলে যায় এখান থেকে রাউরকেল্লাতে। টাটানগর-গুয়ার এই রেলপথটির দৃশ্য ভারী সুন্দর, বারকাকানা-ডালটনগঞ্জের রেলপথেরই মতো সুন্দর। এই পথেই পড়ে বাদামপাহাড়। সুন্দর নাম নয়? একটি ছোট গল্প পড়েছিলাম অনেকদিন আগে, নাম "বাদামপাহাড়ের যাত্রী"।

মহুলসুখাতে আসতে হলে, জীপে করে বড়বিল বা রাউরকেল্লা বা বড়জামদা থেকে, পথে একটি ভারী সুন্দর উপত্যকা পড়ে, সুন্দর পাহাড়ী নদী কুড়াড়ি বয়ে গেছে তার বুকের উপর দিয়ে। জায়গাটির নাম সারকুণ্ডা। বন্ধ হয়ে-যাওয়া একটি খাদান আছে এখানে। ম্যাঙ্গানীজের।

এখানের অধিকাংশ আদিবাসী, যারা এইসব খাদানে কুলি-কামিনের কাজ করে, জাতে মুণ্ডা এবং হো। বেশ উঁচু একটি পাহাড়ের উপরে তাদের মুখ্য বাসস্থান ভুতরা বস্তি। যে বস্তির নামেই মহুলসুখার আরেক নাম ভুতরা মাইনস।

চৈত্র শেষে বা বৈশাখে এলে দেখতে পাবি পাহাড়ে পাহাড়ে দাবানলের মালা। লাল ফুলে গাঁথা। এই সময়ে কোন পাহাড়ের সঙ্গে যে কোন পাহাড়ের মালা বদল হয় তা এই বন-পাহাড়ের দেবতারাই জানেন।

যখনই সময় বা সুযোগ হবে তখনই এই মহুলসুখা বা খাণ্ডাধার বা বারসূঁয়া বা সারকুণ্ডার বা কইরার মতো জায়গাতে চলে আসবি বেড়াতে। যে সব জায়গাতে সকলেই যায়, ভ্রমণ-সংক্রান্ত পত্রপত্রিকাতে যে সব জায়গা বহু বিজ্ঞাপিত এবং বহু আলোচিত, সেই সব পথ, জায়গা এমনকি বন বাংলোও এড়িয়ে যাবি। বনে আসতে হয় একা। একেবারেই একা। এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তবেই না বন তোর কাছে মন খুলবে!

'মহুলসুখার চিঠি' নামের একটি বইও আছে। প্রাপ্তবয়স্কদের বই। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্ক হয়ে সেই বইটি অবশ্যই পড়বি।

ইতি—তোর বিটকেল কাকু

কলকাতা ২৮/৭/২০০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটি মেয়ে, অনেক পাখি

বিদেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। খুব ভালো খবর।

সাদা লম্বা খাম, তার ওপর ডাকটিকিটটা কী সুন্দর, একটা ডানা মেলা পাখির ছবি, লাল আর নীল রং মেশানো, লম্বা ঠোঁট। অচেনা পাখি।

মিনু বললো, বাবা, আমি এই স্ট্যাম্পটা নেবো!

বাবা বললেন, আচ্ছা পরে নিস।

তারপর বাবা ইংরিজিতে মাকে কী যেন বললেন।

মিনুর বয়েস সাড়ে চার বছর। সে মোটে দু'চারটি ইংরিজি শব্দ জানে, সব বোঝে না। সে এটাও বোঝে, মা-বাবা তার সামনে যখনই কোনো গোপন কথা বলতে চান, তখনই ইংরিজিতে কথা বলতে শুরু করেন, বাংলার বদলে।

সারাদিন ধরে মা-বাবা আড়ালে আড়ালে কী যেন আলোচনা করতে লাগলেন। বিদেশের চিঠিতে খুব ভালো খবর এসেছে, প্রথমবার চিঠিটা পড়ে তাঁর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছিল। এখন ওঁরা দু'জনেই চিন্তিত।

আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয় বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বাবা সেখানে পড়াবেন ছ'মাসের জন্য। ওরা যাওয়া-আসার ভাড়া দেবে, থাকার জায়গা দেবে, অনেক টাকা দেবে। এটা ভালো খবর নয়?

কিছুদিন আগে বাবার খুব অসুখ করেছিল। এখন সেরে উঠেছেন। তবে নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। ভুলে গেলেই মুস্কিল। কিন্তু বাবার দারুণ ভুলো মন। মা প্রত্যেক দিন দু'বেলা বাবাকে ওষুধের কথা মনে করিয়ে দেন।

বাবা বিদেশে গেলে মাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু মিনুর কী হবে?

চিঠিতে স্পষ্ট লেখা আছে, বিদেশে বাবাকে যেখানে থাকতে দেওয়া হবে, সেখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের থাকা নিষেধ! অর্থাৎ মিনুকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

তা হলে মিনু কোথায় থাকবে? মিনুকে ফেলে মা যাবেন কী করে?

মিনুর আর ভাইবোন নেই, কলকাতাতে ওদের আর কোনো আত্মীয়স্বজনও থাকে না।

রাত্তিরবেলা খেতে বসে মা জিজ্ঞেস করলেন, মিনু, আমরা যদি কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাই, তুই মাসির কাছে গিয়ে থাকতে পারবি?

মিনু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

বয়েসে এত ছোট হলে কী হবে, মিনু ঠিকই বুঝেছে যে তাকে নিয়ে তার মা-বাবার কিসের জন্য যেন মাথাব্যথা হয়েছে।

মা বললেন, তোর বাবাকে বিদেশ

থেকে ডেকেছে। সেখানে তাঁর কত সুনাম হবে। অনেক টাকাও দেবে বলেছে। সেখানে তো তোকে নিয়ে যাবার উপায় নেই। তোকে যদি বুলার কাছে রেখে যাই—

মিনু টলটলে দুটো চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ, থাকতে পারবো!

বাবা বললেন, তোর মন কেমন করবে না? অবশ্য দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যাবে।

মা বললেন, তোর জন্য আমাদের মন কেমন করবে। তোকে চিঠি লিখবো, ফোন করবো। তোর জন্য সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে আসবো।

বাবা বললেন, বুলা মাসিদের ওখানে অনেক খোলামেলা জায়গা। খেলা করতে পারবি। বুলা মাসির মেয়েরা তোকে পড়া দেখিয়ে দেবে। ঠিক করে বল, থাকতে পারবি তো?

মা বললেন, তুই রাজী না হলে আমরা যাবোই না!

মিনু আবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন বললো, থাকবো! তোমরা কিন্তু তার বেশি দেরি করবে না!

মা আর বাবা দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বুলা মাসিরা থাকে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের কাছে একটা ছোট্ট জায়গায়। শান্তনু মেসো একটি চা-বাগানের ম্যানেজার। আগের বছর মিনুরা এখানে বেড়াতে এসেছিল, তখন খুব ভালো লেগেছিল।

মা আর বাবা বিদেশযাত্রার আগে মিনুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ারে, কয়েকটা দিন সেখানে কাটালেন। মিনুকে বেশ হাসিখুশি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন ওঁরা। মিনুকে অনেক আদর করে বিদায় নিলেন একদিন।

বুলা মাসি মায়ের চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট। কিন্তু তাঁর দুটি মেয়ে আছে, এগারো বছর আর ন'বছরের। মিনু জন্মেছে অনেক পরে। মিনুর সেই দুই দিদি পমপম আর ঝুমঝুম কিন্তু এবারে এখানে নেই, তারা ভর্তি হয়েছে দার্জিলিং-এর বোর্ডিং স্কুলে। মিনু স্কুলে ভর্তি হবে সামনের বছর।

বুলা মাসি যেন মায়ের চেয়েও বেশি যত্ন করে মিনুকে খাওয়ান, জামা পরিয়ে দেন, গল্প বলেন, ঘুম পাড়ান। মাঝে মাঝেই বলেন, এই মেয়ে, কাঁদছিস না তো? দেখি, দেখি, চোখ দেখি!

মিনু একটু একটু কাঁদে ঠিকই, হঠাৎ হঠাৎ এমনি এমনি কান্না পেয়ে যায়, কিন্তু বুলা মাসিকে দেখেই চোখ মুছে ফেলে। এখানে যে তার ভালো লাগছে, সে কথাও ঠিক।

টিলার ওপরে মস্ত বড় বাড়ি। চারপাশে বাগান, কত রকম ফুল। দূরে দেখা যায় গম্ভীর, উঁচু পাহাড়। মিনুর যদিও খেলার সঙ্গী কেউ নেই, তবু সে বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ায়। আপনমনে কথা বলে।

মিনুকে সব সময় চোখে চোখে রাখার জন্য ফুলসরিয়া নামে একটি কাজের মেয়ের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে। সে বারান্দায় বসে থাকে, খাওয়ার সময় মিনুকে ডেকে নিয়ে যায়।

ফুল ছাড়া পাখিও দেখা যায় অনেক রকম। শান্তনু মেসোর খুব পাখি পোষার শখ, কতরকম পাখি যোগাড় করে এনেছেন। সে পাখিগুলোকে আলাদা আলাদা খাঁচায় রাখা হয়নি। শুধু জাল দিয়ে ঘিরে অনেক বড় একটা বাড়ির মতন বানানো হয়েছে, তার মধ্যেই সব রকম পাখি থাকে। সেই জালের বাড়িতে কয়েকটা গাছও রয়েছে, পাখিরা উড়ে উড়ে সেই গাছেও বসে। এই বাড়িটার নাম বার্ড হাউজ, মিনু সেটা বানান করে পড়তে শিখেছে।

আশ্চর্য, এত রকমের পাখি একসঙ্গে থাকে, কিন্তু তারা ঝগড়া করে না একটুও। কিংবা কখনো ঝগড়া করে হয়তো, কিচিরমিচির শুনে তো কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু মারামারি করে না একেবারেই।

শান্তনু মেসো নিজে সব পাখির খাবার দেন। এক একটা পাখিকে আদর করেন গায়ে হাত বুলিয়ে। বুলা মাসির অত পাখির শখ নেই, তিনি ভালোবাসেন বই পড়তে। তা ছাড়া তিনি দুপুরে কুলিবস্তির ছেলেমেয়েদের পড়াতে যান।

শান্তনু মেসো খাবার দিতে যখন বার্ড হাউজে ঢোকেন, তখনই মিনু ওঁর সঙ্গে ভেতরে যায়। অন্যসময় তালাবন্ধ থাকে। শান্তনু মেসো মিনুর হাতে অনেকগুলো টাটকা ছোলা দিয়ে বলেন, এই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে থাকো, দেখবে ঐ সাদা পাখিগুলো তোমার হাত থেকে খাবার তুলে নেবে। সত্যিই সেই পাখিগুলো তার হাত থেকে খাবার খায়, দু'একটা তার কাঁধে এসে বসে। কী মজাই যে লাগে!

একদিন সকালবেলা শান্তনু মেসোকে কাঁধে বন্দুক নিয়ে বেরুতে দেখে মিনু জিজ্ঞেস করলো, তুমি পাখি মারতে যাচ্ছো বুঝি?

শান্তনু মেসো মিনুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, না মিনু সোনা, আমি জীবনে কখনো পাখি মারিনি। আমি যে পাখিদের ভালোবাসি।

মিনু জিজ্ঞেস করলো, তবে বন্দুক নিয়েছো কেন?

শান্তনু মেসো বললেন, একটা লেপার্ড বেরিয়েছে যে। বড্ড উৎপাত করছে।

বুঝতে না পেরে মিনু আবার জিজ্ঞেস করলো, লেপার্ড কী?

শান্তনু মেসো বললেন, লেপার্ড হচ্ছে এক রকমের ছোট বাঘ। এখানে লোকে বলে চিতাবাঘ, কিন্তু চিতা ঠিক নয়। ছোট হলে কী হবে, এক একটা লেপার্ড খুব হিংস্র হয়, মানুষকেও আক্রমণ করে।

মিনু বললো, তুমি বুঝি সেই বাঘটাকে মারবে?

শান্তনু মেসো বললেন, প্রথমে চেষ্টা করবো ভয় দেখিয়ে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিতে। চা-বাগানে লুকিয়ে আছে, যদি কুলিদের আক্রমণ করে, তা হলে মারতেই হবে। তুমি কিন্তু সাবধানে থাকবে। বাগানের বাইরে এক পাও যাবে না।

বিকেলবেলা বুলা মাসি বললেন, এই দ্যাখ মিনু, তোর মা'র চিঠি এসেছে!

মিনু দেখলো, এই সাদা খামের ওপরেও একটা পাখির ছবিওয়ালা স্ট্যাম্প। মনে হচ্ছে যেন, এই পাখিটার মতনই দুটো পাখি আছে বার্ড হাউজে।

বুলা মাসি চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। মা আর বাবা মিনুর কথা লিখেছেন বারবার।

বুলা মাসি তারপর বললেন, তোর মা-বাবা কোথায় আছেন বুঝতে পারিস? পৃথিবীটা গোল জানিস তো? আমরা পৃথিবীর যেখানে আছি, ওঁরা আছেন প্রায় উল্টো দিকে। এখানে তো এখন বিকেল পাঁচটা, ওখানে এখনও ভোরই হয়নি। দু'জনেই এখন ঘুমোচ্ছেন!

বাবা-মা এখনো ঘুমোচ্ছেন শুনে ফিক করে হেসে ফেললো মিনু।

বুলা মাসি বললেন, দিদি লিখেছে, আমাদের মিনুর চেয়ে সুন্দর মেয়ে এখানে একটিও দেখিনি!

মিনু বললো, আহা, নিজের মেয়েকে সবাই বেশি সুন্দর দেখে!

বুলা মাসি চোখ বড় বড় করে বললেন, বাবাঃ! এর মধ্যেই পাকা বুড়ির মতন কথা বলতে শিখেছিস তো!

॥ ২ ॥

চার মাস কেটে গেছে। এখন মিনু বেশির ভাগ সময় পাখির বাড়িতে কাটায়।

এর মধ্যে শান্তনু মেসোকে তিন-চারদিনের জন্য কলকাতায় যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। তিনি না থাকলে ফুলসরিয়ার ওপর ভার থাকে পাখিদের খাবার দেওয়ার। এবার শান্তনু মেসো সেই ভার দিয়েছিলেন মিনুকে। সে সব শিখে গেছে। অবশ্য ফুলসরিয়াও সঙ্গে থাকে।

শান্তনু মেসো বলে দিয়েছেন, মিনু ইচ্ছে করলে যখন খুশি বার্ড হাউজে যেতে পারবে, ফুলসরিয়া তালা খুলে দেবে। ফুলসরিয়া আবার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে যায় নিজের কাজে।

সেবারে সেই চিতাবাঘটাকে আর শেষ পর্যন্ত মারতে হয়নি। শান্তনু মেসো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে সেটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যান জঙ্গল পর্যন্ত।

সেই জঙ্গল থেকে তিনি নিয়ে আসেন একটি পাখির ছানা।

ঝড়ে একটা গাছ ভেঙে পড়েছিল, সেই গাছের ডালে ছিল একটা পাখির বাসা। তাতে তিনটে বাচ্চা পাখি ছিল, দুটো মরে গেছে; একটা বেঁচে আছে কোনোক্রমে। খুব সাবধানে, খুব যত্ন করে সেই পাখির ছানাটা নিয়ে এসে শান্তনু মেসো বলেছিলেন, দেখ তো মিনু, এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারো কি না!

পাখিরা ছোলা খায়, ছাতুমাখা খায়, গম খায়। ফুলসরিয়া কোথা থেকে কেঁচো আর পোকামাকড়ও নিয়ে আসে। টিয়া পাখিদের জন্য কাঁচালঙ্কাও দিতে হয়। কিন্তু এতটুকু বাচ্চা পাখি তো ওসব কিছুই খেতে পারবে না। মিনু ছেঁড়া কাপড়ের পলতে পাকিয়ে, সেটা দুধে ভিজিয়ে ওর মুখে দিয়েছিল। সেই ভাবেই খাইয়েছিল মধু। তাই খেয়েই ওর গায়ে জোর হয়েছে, এখন দিব্যি উড়ে বেড়ায়। ছোলা খেতেও শিখেছে। ডানায় সবুজ রং, গলার কাছে একটু লাল, এটা চন্দনা পাখি। মিনু ওর নাম দিয়েছে চন্নু! আরও অন্য অনেক পাখিরও নাম দিয়েছে সে, কোনোটা ভুলু, কোনোটা মিতু, কোনোটা বুকবুকি।

একদিন বুকবুকি পাখিটা হঠাৎ বলে উঠলো, এই মেয়ে, তুমি রোজ আমাদের খাবার দাও, তুমি নিজে কী খাও?

মিনু চমকে উঠে চোখ গোল গোল করে পাখিটার দিকে তাকালো।

পাখিটা কিন্তু মানুষের ভাষায় কথা বলেনি। সে বলেছে, বুক কুক কুক, কুলিং, কুলো কলো। মিনু তার মানে বুঝে গেল কী করে?

মিনু একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, কুলু মুণ্ড মুণ্ড পিকালো পিকালো। তার মানে, আমি ভাত খাই, ডাল খাই!

পাখিটা বললো, আমি একদিন তোমার খাবার খাবো!

এবার বাচ্চা চন্দনা পাখিটা বললো, ট্যা-টু-টু-টুটুকু টুকুকু!

মিনু এর মানেও বুঝে গেল। এ পাখিটা বলছে, তুমি রোজ আমায় খাবার দাও। তুমি কি আমার মা?

মিনু বললো, না, আমি তোমার মা নই।

চন্দনা বললো, তাহলে আমার মা কে?

মিনু বললো, তোমার মা কোথায় আমি জানি না।

চন্দনা পাখিটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললো, না, জানি, তুমিই আমার মা!

মিনু হেসে ফেললো। সে পাখির মা হবে কী করে?

সে চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে এক বাটি ভাত নিয়ে এসে রাখলো এই পাখির বাড়ির মাঝখানে। অমনি অনেক পাখি উড়ে এসে বসলো সেই বাটির কাছে। এক মিনিটে শেষ হয়ে গেল সব ভাত।

মিনু বেশ অবাক হলো। পাখিরা ভাত খেতে ভালোবাসে?

শুধু দুটো বড় বড় কাকাতুয়া ভাত খেতে এলো না। একটা কাকাতুয়া ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, ককেটু কাকাটু, কটু কটা, ক্কা ক্কা!

মিনু বুঝতে পারলো, সে বলছে, আমরা ভাত খাই না! আমাদের খেজুর দাও!

মিনু খেজুর পাবে কোথায়? বাড়ির মধ্যে গিয়ে ফুলসরিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, সে বললো, খেজুর তো নেই!

বুলা মাসি বললেন, তোর খেজুর খেতে ইচ্ছে হয়েছে মিনু? ঠিক আছে, শিলিগুড়ি থেকে এনে দেব। কাল আমি গাড়ি নিয়ে যাবো শিলিগুড়ি। তুই-ও যাবি আমার সঙ্গে।

মিনু কিন্তু শিলিগুড়ি যেতে রাজী হলো না। এর আগে একবার সে ওঁদের সঙ্গে শিলিগুড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। অনেক দূর। সকালবেলা গিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরতে হয়। অতক্ষণ সে পাখিদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

সে পাখিদের ভাষা শিখে গেছে বলে খুব মজা লাগছে। শুধু সে-ই ওদের কথা বুঝতে পারে। বুলা মাসি, ফুলসরিয়া, এমনকি শান্তনু মেসো পর্যন্ত বোঝেন না।

সে নতুন নতুন খাবার যোগাড় করে পাখিদের দেয়। ওদের কোনোটা পছন্দ হয়, কোনোটা হয় না। শুধু কাকাতুয়া দুটোকে নিয়েই মুস্কিল। তাদের প্রায় কিছুই পছন্দ হয় না। একদিন তারা বললো, ও মানুষের মেয়ে, আমাদের জন্য প্রজাপতি ধরে দাও। আমরা প্রজাপতি খেতে ভালোবাসি।

মিনু রাগ করে বললো, না, আমি প্রজাপতি ধরে দিতে পারবো না। ঐ যা গম খাচ্ছো, তাই খাও!

বাগানে কত চমৎকার চমৎকার প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। ফুল যেমন সুন্দর, প্রজাপতিও তেমন সুন্দর। পাখিরা প্রজাপতিদের খাবে কেন? এ খুব

অন্যায়। কাকাতুয়া দুটো আবার প্রজাপতি খেতে চাইলেই মিনু ওদের বকে দেবে খুব!

একদিন একটা কাণ্ড হলো।

তারের জাল দিয়ে ঘেরা এতখানি জায়গার মধ্যে অনেক পাখি বন্দী রয়েছে বলে বাইরের পাখিরা এদিকে আসেই না। হঠাৎ একদিন দুপুরে একটা বড় সবুজ পাখি বাইরের জালে এসে বসলো।

মিনু তখন সব পাখিদের জন্য খাবার এনেছে। তার হাতে, বুকে, ঘাড়ের ওপর এসে বসেছে অনেক পাখি। দুটো বদরি পাখি বসেছে তার মাথায়। একটা ছোট্ট মউটুসি পাখি সুড়সুড়ি দিচ্ছে তার কানে। মিনু হাসতে হাসতে বলছে, এই, এই, দুষ্টুমি করিস না!

বাইরের বড় সবুজ পাখিটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখলো। তারপর আপন মনে বললো, এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষের সঙ্গে পাখির এত ভাব! আর সব জায়গায় তো দেখি, মানুষরা পাখিদের ধরে মারে, ডানা ছিঁড়ে দেয়, রাক্ষসের মতন খেয়েও ফেলে! এ মেয়ে দেখছি পাখিদের কত খাবার দিচ্ছে! আমার যে কী খিদে পেয়েছে!

মিনু ওর কথা বুঝতে পেরে বললো, তোমার খিদে পেয়েছে? খাবার খাবে তো এসো!

সবুজ পাখিটা বললো, আহা ভারি চালাক। ঐ জালের মধ্যে ঢুকবো, অমনি আমায় বন্দী করে রাখবে, তাই না?

মিনু বললো, ঠিক আছে, জালের বাইরে তোমার জন্য খাবার রেখে দিচ্ছি।

পাখিটা বললো, তার দরকার নেই। আমি মানুষের দেওয়া খাবার খাই না। মানুষেরা আমার তিনটে ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলেছে।

মিনু বললো, ইস, তাই নাকি? যারা তোমার ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলেছে, তারা খুব পাজি!

পাখিটা বললো, পাজিই তো! আমি আমার ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। তারপর ঝড় উঠলো। আমি আর ফিরতে পারি না, ফিরতে পারি না। ঝড় আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল অনেক দূর দেশে। ঝড় থামবার পর আমি আর রাস্তা চিনতে পারি না। অনেক খুঁজে খুঁজে যখন পৌঁছোলাম, তখন দেখি, কারা যেন সেই গাছটা কেটে নিয়ে গেছে, আমার বাসাটাও নেই, ছেলেমেয়েরাও নেই। তারপর থেকে আমি ওদের খুঁজছি। এখনো খুঁজছি। আমার দুধের বাচ্চারা কোথায় যে গেল!

মিনু জিজ্ঞেস করলো, গাছটা কেউ কেটে নিয়েছে, না ঝড়ে ভেঙে পড়েছে?

চন্নু নামে বাচ্চা পাখিটা মিনুকে বললো, মা, তুমি ওর সঙ্গে এত কথা বলছো কেন? আমাকে ভালো করে খেতে দিচ্ছো না!

বাইরের বড় পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ওমা, ঐ তো আমার একটা ছেলে!

চন্নু বললো, আমি মোটেই তোমার ছেলে নই। এই মেয়েই আমার মা।

বাইরের পাখিটা বললো, ওমা, দেখেছো কী কাণ্ড! এই মেয়েটা আমার ছেলেকে চুরি করে এনেছে! তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে পর করে দিয়েছে!

মিনু বললো, মোটেই আমি চুরি করে আনিনি। গাছতলায় পড়ে ছিল। এখানে না আনলে মরেই যেত।

বাইরের পাখিটা এবার নরম গলায় বললো, ওগো মেয়ে, তুমি আমার একটা ছানাকে বাঁচিয়েছো, তোমার পায়ে শত কোটি প্রণাম। তোমার খুব ভালো হবে। এবার তুমি আমার বাছাকে ফেরৎ দাও না গো!

মিনু তখন চন্নুকে বললো, কী রে, তোর মায়ের কাছে যাবি?

চন্নু বললো, ও আমার মা নয়। ওকে আমি চিনি না।

মিনু বললো, হ্যাঁ, ও-ই তোর মা। তোকে ছেড়ে তোর মায়ের কত কষ্ট হচ্ছে। তুই মায়ের কাছে ফিরে যা।

চন্নু বললো, আমার ভয় করছে। কোনোদিন তো বাইরে যাইনি!

মিনু বললো, ভয় কী! মায়ের সঙ্গেই তো থাকবি। একবার গিয়ে দ্যাখ, যদি ভালো না লাগে, আবার ফিরে আসবি এখানে।

চন্নুকে হাতে নিয়ে মিনু সাবধানে দরজা খুলে, আবার বন্ধ করে বেরিয়ে এলো বাইরে। চন্নুকে এক জায়গায় বসিয়ে সে সরে গেল একটু দূরে।

বাইরের বড় পাখিটা কাছে এসে ঠোঁট দিয়ে কত আদর করলো চন্নুকে। তারপর দু'জনে হঠাৎ ফুরুৎ করে উড়ে গেল।

মিনু আবার ভেতরে আসতেই একটা কাকাতুয়া গম্ভীর ভাবে বললো, তুমি ওকে ছেড়ে দিলে? তাহলে আমাদেরও ছেড়ে দাও।

মিনু বললো, তোমাদের আমি ছাড়বো কী করে? শান্তনু মেসো তোমাদের এনেছেন।

কাকাতুয়া বললো, ঐ বাচ্চাটাকেও তো তিনিই এনেছিলেন। আমাদের বুঝি বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না?

মিনু বললো, তোমাদের তো মা নিতে আসেননি। সেটা আলাদা কথা।

তখন সব পাখি একসঙ্গে কলকাকলি শুরু করে দিল। কয়েকজন বললো, চন্নু মুক্তি পেলে তাদেরও মুক্তি পাওয়া উচিত। আর কয়েকজন বললো, মুক্তির কী দরকার। এখানেই তো বেশ আছি। খাবার খুঁজতে হয় না, এমনি এমনি খাবার পাই।

শুধু বুকবুকি নামের পাখিটা গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, আমাকে ছেড়ে দিলেও যাবো না। আমি মিনুর কাছে থাকবো!

মিনু আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলো বাইরে।

দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

আকাশের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে।

বাগানের একদিকে তাকালে পাহাড় দেখা যায়। সেখানে ঘন বন রয়েছে, খুব বড় বড় গাছ। বড় পাখিটা চন্নুকে নিয়ে ঐ দিকে উড়ে গেছে।

মিনু যেন কল্পনায় দেখতে পেল, চন্নু তার মায়ের সঙ্গে উড়ছে, উড়ছে তো উড়ছেই, মহা আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে। চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

হঠাৎ মিনুর চোখে জল এসে গেল।

সে শব্দ করে কাঁদছে না, কিন্তু চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে তার বুকের জামা।

॥ ৩ ॥

ঠিক ছ'মাস দশ দিন পর ফিরে এলেন মিনুর বাবা আর মা। বাবাকে বিদেশে আরও কিছুদিন থেকে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু মা বলেছিলেন, আর একদিনও বেশি থাকতে চান না। মিনুকে তিনি কথা দিয়ে এসেছিলেন।

দমদম এয়ারপোর্টে নেমে মা আর বাড়িই ফিরলেন না।

বাবাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সল্টলেকের বাড়ি ঠিকঠাক করে রাখার জন্য। মা ওখান থেকেই আর একটা প্লেনে চেপে চলে গেলেন শিলিগুড়ি।

আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল, শান্তনু মেসো শিলিগুড়ি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিলেন মায়ের জন্য।

জিপ গাড়িতে উঠে বসার পর মা জিজ্ঞেস করলেন, আগে মিনু কেমন আছে বলো!

শান্তনু মেসো বললেন, মিনু চমৎকার আছে। একদিনও তো তাকে কাঁদতে দেখিনি। সে তো সর্বক্ষণ আমার বার্ড হাউজের পাখিদের নিয়েই মেতে থাকতো! ঐটুকু মেয়ের কী দায়িত্বজ্ঞান! অতগুলো পাখির খাবার দেওয়া, ঠিক সময়ে জল দেওয়া, এসব তো মিনুই করে।

মা তখন বিদেশের গল্প শুরু করলেন।

চা-বাগানের বাংলোয় পৌঁছেই মা ডাকলেন, মিনু, মিনু, মিনু কোথায়?

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একটা সবুজ রঙের ফ্রক পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মিনু। বুলা মাসি তার চুল আঁচড়ে একটা লাল রিবন বেঁধে দিয়েছেন।

মা ঝপাস করে মিনুকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমো দিতে দিতে বলতে লাগলেন, আমার মিনু সোনা, কতদিন তোকে দেখিনি, তোর কথা সব সময় মনে পড়তো, কত খেলনা এনেছি তোর জন্য। কেমন আছিস রে মিনু সোনা?

মিনু বললো, টি টি, টর টর, চুকুটুম, চুকুটুম!

মা চমকে উঠে বললেন, এ আবার কী?

বুলা মাসি হাসতে হাসতে বললেন, পাখির ভাষায় কথা বলছে। ক'দিন ধরেই শুনছি, ও এই সব বলে!

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুই কী বলছিস রে মিনু?

মিনু বললো, টু রু রু রাং, টুপিউ টুপিউ!

বুলা মাসি বললেন, দিদি ও মজা করছে তোমার সঙ্গে।

মজা ভেবে মাও হাসতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মা আর বুলা মাসির মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। মিনু একটাও বাংলা কথা বলে না, শুধু পাখিদের মতন কিচিরমিচির করে।

মা তাকে আরও আদর করলেন, শেষ পর্যন্ত ধরে ঝাঁকুনিও দিলেন, তারপর কেঁদে ফেললেন। মিনু কিছুতেই কথা বলে না, যেন সে কথা বলতে ভুলেই গেছে।

রাত্তিরে সে ভাতও খেল না। শুধু মুঠো মুঠো ছোলা নিয়ে চিবুতে লাগলো।

সকালবেলাতেই ডেকে আনা হলো চা বাগানের ডাক্তারকে। তিনি এসে বললেন, এই ছ'মাসের মধ্যে মেয়েটার একবারও কোনো অসুখ হয়নি। হঠাৎ কী হলো?

তিনি মিনুকে কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিছুই লাভ হলো না। তিনি মিনুকে কাতুকুতু দিলেন, একবার গালে চড়ও মারলেন, মিনু তাঁকে বললো, কিপিটু কুপুটু, পিকো পিকো পিকো!

পরিশ্রান্ত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, এ তো মনে হচ্ছে মনের অসুখ। এর চিকিৎসা আমার সাধ্য নয়। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অন্য ডাক্তার দেখান।

পরদিনই মা মিনুকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। সারা রাস্তা মিনু মায়ের সঙ্গে একটা কথাও বললো না।

বাবার সঙ্গেও মিনু কথা বললো পাখির ভাষায়।

বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি পণ্ডিত লোক, অনেক রকম মনের অসুখের কথা তিনি জানেন। কিন্তু পাখি-রোগের কথা তিনি কখনো শোনেননি।

ডেকে আনা হলো বড় বড় ডাক্তার। কিছুতেই কিছু হয় না।

মিনুকে চোখের আড়াল করারও উপায় নেই। কেননা, মা একবার মিনুকে ঘরের মধ্যে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে ছাদে এসে দেখলেন, মিনু কতকগুলো শালিক পাখির সঙ্গে কথা বলছে। মাকে দেখে শালিকের ঝাঁক উড়ে গেল, আর মিনুও দুটো হাত ডানার মতন দু'পাশে ছড়িয়ে দিল, যেন সে-ও পাখিদের সঙ্গে উড়ে যাবে।

মা ছুটে এসে তাকে ধরে না ফেললে কী যে হতো কে জানে!

মা তারপর আর মিনুকে একলা ছাড়েন না।

কোনো ডাক্তারই কিছু সুবিধে করতে পারছেন না। একজন ডাক্তার বললেন, একটা ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আলিপুরদুয়ারে ও যেখানে পাখিদের সঙ্গে ছিল, ফিরিয়ে নিয়ে যান সেখানে। আপনারাও থাকুন সঙ্গে। ও পাখিদের সঙ্গে কথা বলুক, আপনারা ওকে একেবারে প্রথম থেকে বাংলা কথা শেখান।

তারপর তিনি মুচকি হেসে বললেন, কিংবা ওখানে থেকে থেকে আপনারাও পাখির ভাষা শিখে নিন। তাহলে আপনারা মেয়ের কথাও বুঝতে পারবেন।

অনেক কাজ ফেলে এবার বাবাও মেয়ের সঙ্গে চলে এলেন আলিপুরদুয়ারে। মা কাঁদতে কাঁদতে বুলা মাসিকে বললেন, এ আমার কী হলো, আমি আর কক্ষণো মিনুকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

বার্ড হাউজে ঢুকেই মিনুর কী আনন্দ! সব পাখিরাও এই ক'দিন পর তাকে দেখে একসঙ্গে ডাকাডাকি করতে লাগলো। মিনুর কত কথা তাদের সঙ্গে। অনেক পাখি তার গায়ে মাথায় এসে বসে, মিনু একটা দোয়েলের সঙ্গে সঙ্গে শিস দেয়।

মা, বাবা, বুলা মাসিরা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন।

তিন-চার দিন কেটে গেল, মিনুর অবস্থা একটুও বদলালো না। সে খাঁচার মধ্যে নাচে, পাখিদের সঙ্গে খেলে, আর বাইরে এলেই চুপ। কেউ বারবার এক কথা জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয় পাখির ভাষায়।

কত খেলনা আনা হয়েছে তার জন্য, সে সেসব নিয়ে খেলে না। কত ভালো ভালো খাবার দেওয়া হয়, সে সেসব কিছু খাবে না। খায় শুধু ছোলা আর ছাতু।

একদিন মিনু বার্ড হাউজের মধ্যে

খেলছে, মা-বাবা বসে আছেন জালের বাইরে। শান্তনু মেসো একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে।

এবারে তিনি জালের কাছে এসে বললেন, এসো একটা কাজ করা যাক মিনু। আমি বদলি হয়ে যাচ্ছি, অন্য চা-বাগানে যেতে হবে। সেখানে তো এত পাখি নিয়ে যাওয়াও ঝামেলা। তাই ঠিক করলাম, ওদের সবাইকে ছেড়ে দেব। তুমি নিজের হাতে এক এক করে ওদের উড়িয়ে দাও!

মিনু বললো, টুকা কুকু, পি-র-র-র টুঁ-ই-ই!

শান্তনু মেসো বললেন, আমি তো বুঝবো না। তুমি পাখিদের বুঝিয়ে দাও।

তিনি দরজাটা খুলে দিলেন হাট করে।

বড় কাকাতুয়াটা জিজ্ঞেস করলো, এটা কী হচ্ছে? এবার তুমি আমাদের মারবে?

মিনু বললো, কেউ মারবে না। ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি তো ছাড়া পেতেই চেয়েছিলে!

কাকাতুয়াটা বললো, সত্যি? দেখি তো!

কাকাতুয়া দুটোই উড়ে গেল আগে। তারপর টিয়া, বুলবুলি, বদরি পাখির ঝাঁক। কোনো কোনো পাখি এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। মিনু তাদের হাতে নিয়ে বলছে, যাও!

ঘুঘু পাখিরা বললো, তুমি কি মিষ্টি মেয়ে মিনু!

একটা ময়না পাখি বললো, থ্যাঙ্ক ইউ মিনু, থ্যাঙ্ক ইউ!

একটা হরিয়াল বললো, আমরা এখানে ভালোই ছিলাম, তবে বাইরে আরও ভালো লাগবে।

শুধু বুকবুকি পাখিটা বারবার বলতে লাগলো, আমি কিছুতেই যাবো না। আমি মিনুর কাছে থাকবো।

খাঁচা একেবারে খালি হয়ে গেল, বুকবুকি পাখিটা বসে রইলো মিনুর কাঁধে।

তাকে আদর করতে করতে মিনু চলে এলো মায়ের কাছে। এই প্রথম সে বাংলায় বললো, মা, আমি এই পাখিটা কলকাতায় নিয়ে যাবো!

ছবিঃ সমীর সরকার

ভিনগ্রহী ভাবনা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে
উঠল গভীর রাত্রি,
যান থেকে ধীরে নেমে এলো নিচে
দুই ভিনগ্রহী যাত্রী!

শহরের ঠিক মাঝখানে যেথা
নামকরা ডাকঘর,
সামনে 'লেটার বক্স' গোটা-চার
আছে খাড়া পরপর!

দুই ভিনগ্রহী দেখে সেগুলোকে
তাড়াতাড়ি কাছে এসে,
গায়েতে ওদের হাত বুলিয়েই
উঠল খুশিতে হেসে!

এক ভিনগ্রহী বলে, তোমাদের
নেতা হেথা কারা আছে?
পারবে তোমরা আমাদের নিয়ে
যেতে কি তাদের কাছে?

আর একজন বললে, ওদের
সাথে বকিসনি বোকা,
ওরা কি বলবে? ওরা তো নেহাতই
নাবালক কচি-খোকা!

সঙ্গীটি তার বলে ভেঙে দিয়ে
রাত্রির নীরবতা,
ঠিকই বলেছিস, এখনও ওদের
ফোটেনি মুখেতে কথা!

বৃষ্টি অঝোর ঝরে

ইন্দ্রজিৎ গুহ

ক'দিন ধরেই একনাগাড়ে
বৃষ্টি অঝোর ঝরে,
বাইরে যাওয়া যায় না শুধু
আটকে থাকা ঘরে।

ভিজে ভিজেই ইস্টিশানে
আসতে হলো শেষে
বেড়ানোটা করলো মাটি,
বৃষ্টি সর্বনেশে!

এ.সি. কোচে বোতাম টিপে,
চেয়ারটা 'পুশ' করা—
জানলা দিয়ে দেখেন বাবু
পেরোচ্ছে গুসকরা।

করুণ ছবি ভাসছে জলে
গরু ছাগল মোষ,
ভেসে গেল কোলের শিশু
কী ছিল তার দোষ!

ভাসিয়ে দু'পার ফুঁসছে 'অজয়'
এমন ভয়ংকর,
গাছের মাথা জাগছে শুধু
কোথায় বসতঘর।

এ.সি, কোচের বাবু ভাবেন
চুমুক দিয়ে কফিতে
দৃশ্য এমন দেখি বটে
বইয়ের পাতায় ছবিতে!

ছবি : সুফি

লিমেরিক

সৈয়দ হাসমত জালাল

সেদিন রাতে গড়ের মাঠে
সে কি ভীষণ ঝড়-বাদল,
ঘুরছে দেখি ভূতের ছায়া—
ঘোড়ার মতো ঠিক আদল।
নাচছে তারা শূন্যে তুলে দু' হাত-পা
চিঁহি-হিঁ-হিঁ ছাড়ছে আওয়াজ, তফাৎ যা!
সঙ্গে তাদের পেত্নী ছ'জন
বাজায় ডিডিম্-ডিম্ মাদল॥

ঘুড়ির পিছনে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রিটায়ার করার পর গণপতিবাবুর আর সময় কাটে না। সকালটা বাজার করেন, তারপর বাগানে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করে খানিক সময় কাটে। কিন্তু দুপুরবেলাটায় ঘুমের অভ্যাস নেই বলে ভারী বিরক্তিকর লাগে তাঁর।

শরৎকাল, দুপুরে বারান্দায় বসে বসে তিনি নানা দৃশ্য দেখতে থাকেন। সামনের মাঠে কিছু ছেলে ঘুড়ি ওড়ায় আর কয়েকটা ছেলে লম্বা বাঁশের আগায় শুকনো ডালপালা বেঁধে তৈরি করা লগি নিয়ে প্রস্তুত থাকে। ঘুড়ি ভো-কাট্টা হলেই তারা ঘুড়ির পিছনে ছুটতে থাকে।

এই কাটা-ঘুড়ি ধরার ব্যাপারটা গণপতিবাবুর বেশ পছন্দ হলো। রোজই তাঁর চোখের সামনে দশ-বিশটা ঘুড়ি কাটা যায়। ছেলেবেলায় তাঁর ঘুড়ি ধরার নেশা ছিল।

গণপতিবাবু সুতরাং একটা বাঁশের আগায় শুকনো কাঁটাঝোপ বেঁধে নিজস্ব একটা লগি তৈরি করে নিলেন। কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করে তো আর ঘুড়ি ধরতে পারেন না। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা কথা আছে। তিনি তাই ছাদে উঠে ঘাপটি মেরে থাকতে লাগলেন। কাছেপিঠে ঘুড়ি পেলেই লগি দিয়ে খপ করে ধরে ফেলেন। তিন-চার দিনে তিনি প্রায় সাত-আটটা ঘুড়ি ধরলেন। ধরে খুবই আনন্দ আর উত্তেজনা হতে লাগল তাঁর। জীবনে খেলাধুলো বা লেখাপড়ায় কোনও প্রাইজ পাননি। বুড়ো বয়সে ঘুড়িগুলোকেই তাঁর প্রাইজ বলে মনে হতে লাগল। ঘুড়ি ধরার প্রবল নেশাও পেয়ে বসছিল তাঁকে।

সেদিন পাড়াসুদ্ধু সবাই ঝেঁটিয়ে কোথায় যেন বনভোজনে গেছে। দুপুরবেলা সামনের মাঠটা একদম ফাঁকা। ঘুড়ি ওড়ানোও নেই, ঘুড়ি ধরাও নেই। গণপতিবাবু ছাদ থেকে দেখতে পেলেন পুবদিকের আকাশে একটা লাল টুকটুকে ঘুড়ি উড়ছে, তার আবার বেশ লম্বা সাদা লেজ। উত্তরদিক থেকে একটা কালো বিটকেল চেহারার ঘুড়ি ধীরে ধীরে বেড়ে আসছে লাল ঘুড়িটার দিকে। কাটাকাটি হবে।

গণপতিবাবু হিসেব করে দেখলেন এই লড়াইয়ে যে ঘুড়িটা কাটা যাবে সেটা তাঁর ছাদের কাছে আসবে না। মাঠে আজ ছেলেপুলে কেউ নেই দেখে লগি হাতে গণপতিবাবু নেমে এলেন নিচে। মাঠে দাঁড়িয়ে ঘুড়ির লড়াই দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই প্যাঁচ লাগল। একটু টানাহ্যাঁচড়ার পরই হঠাৎ লাল ঘুড়িটা কাটা পড়ে উত্তুরে মিহিন বাতাসে দক্ষিণের দিকে ভেসে যেতে লাগল। গণপতিবাবু পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। দেখলেন এখনও এই বয়সেও তিনি বেশ ভালই ছুটতে পারেন।

ঘুড়িটা ধীরে সুস্থে হেলতে দুলতে মাঠ পেরিয়ে রেললাইনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। পিছনে গণপতিবাবু। রেললাইন পেরিয়ে ফলসা গাছের জঙ্গল। তারপর একটা পতিত জমি পেরিয়ে মঙ্গলপুরের জলা। বিশাল জলা। মাঝখানে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপের নাম কাঠুরেডাঙ্গা। ঘন জঙ্গল আর সাপখোপের বাসা। কেউ সেখানে যায় না। আর জলারও খুব বদনাম আছে।

চোরা পাঁকের জন্য মঙ্গলপুরের জলা কুখ্যাত। কত মানুষ যে জলার পাঁকে তলিয়ে মারা গেছে তার আর হিসেব নেই। সুতরাং ওই জলা সবাই সভয়ে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু মুশকিল হলো, ঘুড়িটা ওই জলার দিকেই চলেছে। ছুটতে ছুটতে গণপতিবাবুও জলার ধারে চলে এলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দেখলেন ঘুড়িটা যেন হাসতে হাসতে তাঁকে একটু বিদ্রূপ করেই জলার ওপর দিয়ে দ্বীপটার দিকে ভেসে

যেতে লাগল।

গণপতিবাবু খুব দুঃসাহসী লোক নন ঠিকই, জলার চোরা পাঁকের কথাও তিনি জানেন, কিন্তু ঘুড়ি ধরার নেশা তাঁকে যন্ত্র ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।

জলায় পাঁক আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা সর্বত্র নয়। আর জল কোথাও কোমর-সমানের বেশি উঁচু নয়, আর ঘুড়িটা এখনও নাগালের বাইরে যায়নি। মাত্র চার-পাঁচ হাতের মধ্যেই সুতোর আগাটা ভেসে যাচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই ধরা যায়।

চটিজোড়া ছেড়ে গণপতি হাঁটুজলে নেমে পড়ে লগি বাড়িয়ে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন ঘুড়িটাকে। এক চুলের জন্য পারলেন না। সুতরাং তিনি সাহস করে আরও দু'কদম এগোলেন। এবারেও ফসকাল। গণপতিবাবু জল ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল ঘুড়িটা না ধরলে তাঁর আজ রাতে ঘুমই হবে না।

ঘুড়ি এগোচ্ছে, গণপতিও এগোচ্ছেন। জল ক্রমশ হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর সমান হলো। চোরা পাঁকে পড়েননি বটে, কিন্তু পায়ে যথেষ্ট থকথকে পাঁক লাগছে। পা পিছলেও যাচ্ছে। জলে বড় বড় ঘাস আর হোগলার মধ্যে ঢুকে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধে হচ্ছে। নানারকম পোকামাকড় গায়ে বসছে। পায়ে জোঁকও লেগেছে কয়েকটা। কিন্তু তাঁর এমন জেদ চেপেছে যে ঘুড়িটার আজ একটা এসপার-ওসপার না করেই ছাড়বেন না।

ঘুড়ি এগোয়, গণপতিবাবুও এগোন। ঘুড়ি ক্রমে ক্রমে জনহীন শ্বাপদসংকুল দ্বীপটার ঘন গাছ-গাছালির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনে গণপতিবাবু।

কিছুক্ষণ পর ডাঙ্গা জমিতে পা রেখে চারদিকে চেয়ে বুঝলেন তিনি দ্বীপটায় পৌঁছে গেছেন। স্মরণকালের মধ্যে আর কেউ এরকম কাজ করেছে বলে তাঁর জানা নেই। সামনে গহীন জঙ্গলে যেন অমাবস্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। দিনের বেলাতেই ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গাছগুলো পেল্লায় লম্বা, আর নিচে বড় বড় ঘাস, ফণীমনসা এবং হাজার রকমের আগাছার দুর্ভেদ্য জঙ্গল। লাল ঘুড়িটা যে এই জঙ্গলের কোথায় কোন গাছের মগডালে গিয়ে পড়েছে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। গণপতি খুব হতাশভাবে জঙ্গলটার দিকে চেয়ে রইলেন। ঘুড়ির আশা ত্যাগ করে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু গণপতি এতটা জলকাদা ভেঙে এসে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন। এখন একটু না জিরোলেই নয়। দ্বীপটার অনেক রকম বদনাম শুনেছেন, তবু শরীর আর দিচ্ছে না বলে সাহস করে তিনি ডাঙ্গায় উঠলেন।

জলার জলে কাদা-মাখা পা ধুয়ে নিয়ে ভেলভেটের মতো নরম আর মোলায়েম ঘাসের ওপর বসলেন গণপতিবাবু। গা একটু ছমছম করছে ঠিকই। কিন্তু একটু দম না ফেলে উপায়ও নেই। চারদিকে বিস্তর পাখি ডাকছে। ঘুঘু, শালিখ, চড়াই, দোয়েল ছাড়াও বিস্তর পাখির অচেনা ডাক কানে আসছে। ফুলের গন্ধও পাচ্ছেন। ভয়-ভয় করা সত্ত্বেও বেশ ভালই লাগছে তাঁর।

বসে একটু আলিস্যি ভর করল শরীরে। তিনি আধশোয়া হলেন। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে খুব। কিন্তু এই অচেনা বিপজ্জনক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়াটা মোটেই কাজের কথা নয়। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। গায়ে চিমটি কাটলেন, হেঁড়ে গলায় গানও ধরলেন। কিন্তু কাজ হলো না। রাজ্যের ঘুম যেন চোখে চেপে বসল। একটু বাদে নিজের অজান্তেই মখমলের মতো ঘাসের ওপর তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভারী অবাক হলেন গণপতিবাবু। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। কিন্তু চারদিকে একেবারে আলকাতরার মতো অন্ধকার। কোথায় আছেন তা কিছুক্ষণ বুঝতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই তাঁর শরীর শিউরে উঠল। ওরে বাবা! তিনি যে এখনও জলার ভিতরকার অলক্ষুণে দ্বীপটার মধ্যে বসে আছেন! ফিরবেন কি করে? দু'চোখে যে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না।

হঠাৎ কাছেই কে যেন খুক করে একটু হেসে উঠল।

গণপতি প্রবল আতঙ্কে বাজখাঁই গলায় বললেন, কে রে? ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি।

আর কোনও শব্দ নেই। গণপতিবাবুর গায়ের লোম ভয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা লাল ঘুড়ির পাল্লায় পড়ে এবার প্রাণটা না যায়। তিনি তাড়াতাড়ি জলায় নেমে পড়ার জন্য বসা অবস্থাতেই পিছলে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পিছন থেকে কে যেন মোলায়েম গলায় বলে উঠল, মঙ্গলপুরের জলা যে এখান থেকে দূর হে বাপু!

কে? কে কথা বলছে রে?

বন্ধুও ভাবতে পারো, শত্রুও ভাবতে পারো, সে তোমার ইচ্ছে।

আ-আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ভূ-ভূত নাকি?

ভূত! তাই বা খারাপ কি?

আমি কোথায় আছি?

এ ভাল জায়গা।

কিন্তু আমি যে বাড়ি যাবো।

তাড়া কিসের? এটাই বাড়ি ভেবে নাও না।

বাড়ি! এটা বাড়ি হতে যাবে কেন? এ তো জঙ্গল। মঙ্গলপুরের—

না হে বাপু, বললুম না মঙ্গলপুরের জলা থেকে তুমি দূরে এসে পড়েছো!

কত দূর?

বেশি নয়। মাত্র দু'হাজার দুশো কুড়ি কোটি আলোকবছর।

যাঃ, কী যে বলেন! এখন এই খিদের মুখে ইয়ার্কি ভাল লাগে না। বরং একটা আলো-টালো জ্বালুন।

জ্বালছি বাপু। তবে যা বললুম তা নির্যস সত্যি কথা। তুমি একটু দূরেই এসে পড়েছো কিন্তু।

ফস করে একটা অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠল। একেবারে দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল চারদিক। গণপতি দেখতে পেলেন, তিনি একটা কাচের ঘরে বসে আছেন। ঘরটা ঝকঝকে তকতকে। মেঝেতে পুরু গালিচা। চারদিকে নানারকম বিচিত্র সব আসবাব। কাচের ওপাশে দেখা যাচ্ছে, বহু নিচে অনেক বড় বড় বাড়িঘর, উঁচু দিয়ে ফ্লাইওভারের মতো রাস্তা কোথা থেকে যে কোথায় চলে গেছে। আকাশে নানা আকৃতির সব জিনিস ভাসছে। কোনওটা নৌকার মতো,

কোনওটা বাটির মতো, কোনওটা চুরুটের মতো। সেগুলো এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে।

আর সামনে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী একটা লোক ফিকফিক করে হাসছে।

গণপতি বললেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

না হে বাপু, স্বপ্ন নয়। আমাদের এই গ্রহের নাম আঁধারমানিক।

আপনি বাংলায় কথা বলছেন যে!

তা আর কোন ভাষা বলব? আমাদের ভাষাই যে বাংলা।

বটে! আমি স্বপ্ন দেখছি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বলুন এখানে আমাকে আনলেন কি করে?

সে বিজ্ঞানের অনেক কলকাঠি আছে। তুমি বুঝবে না।

কিন্তু আনলেন কেন?

আমার কাজই হলো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে গিয়ে এক-আধটা বাঙালীকে ধরে নিয়ে আসা।

সে কী! কেন?

তার কারণ, পৃথিবীর বাঙালীরা ভারী অলস, কুচুটে, মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বাজে কাজে সময় নষ্ট করে, রাজনীতি আর তর্ক-ঝগড়া করে আয়ুক্ষয় করে। পৃথিবীর বাঙালীদের এনে কিছু তালিম দিয়ে তাদের আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা।

কিন্তু আমি যে একজন রিটায়ার্ড বুড়ো। আমার কি আর তালিম নেওয়ার বয়স আছে?

ওই তো তোমাদের দোষ। নিজেকে বুড়ো বা অকর্মণ্য ভাবার জন্যই তোমরা অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছো। তোমার যা বয়স তাতে আমাদের হিসেবে তুমি আরও বিশ বছর বাঁচবে। আর এই বিশ বছরে তোমার কর্মক্ষমতা অনুযায়ী পৃথিবীর একশ মানুষের একশ বছর ধরে করা কাজ তুমি একাই করতে পারবে।

ওরে বাবা! অসম্ভব।

তুমি ঘুড়ির পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করছিলে দেখেই তোমাকে আমি নিয়ে এসেছি। আজই তোমাকে তালিম দেওয়া শুরু হবে। তৈরি থাকো।

গণপতিবাবু ভয়ে শুকিয়ে গেলেন। দিব্যি আলসেমি করে সময় কাটছিল, হঠাৎ এসব কী?

লোকটা তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দিব্যি বাঙালী রান্না ডাল ভাত তরকারি পায়েস রসগোল্লা দিয়ে ভূরিভোজ করিয়ে একটা ডিঙি নৌকোর মতো যানে উঠিয়ে লোকটা তাঁকে নিয়ে বেরোলো। যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান গণপতি। বিশাল গ্রহ জুড়ে আশ্চর্য সব যানবাহন, আশ্চর্য ঘরবাড়ি, বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি। গাছ-পালা নদী-নালা পাহাড়-উপত্যকা মিলিয়ে সৌন্দর্যও অসামান্য।

আপনার নামটি কী?

ভোলানাথ বসু।

বাঃ, এ তো বাঙালী নাম!

বললুম না, আমরা এ গ্রহের লোক সবাই বাঙালী। তবে তোমাদের মতো অপদার্থ নই। আমরা কাজের মানুষ। এখানে আমরা এক দণ্ড সময় নষ্ট করি না। ঘড়ি ধরে চলি, ঘুড়ি ধরে সময় নষ্ট করি না।

গণপতি একটু লজ্জা পেলেন।

একটা ভাসমান বাড়ির গায়ে নৌকোটা ঠেকিয়ে ভোলানাথ বলল, এবার এসো। তোমাকে বিজ্ঞানের তালিম দেওয়া হবে।

গণপতিবাবু এই আশ্চর্য ভাসমান বাড়িতে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিচিত্র সব যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ল্যাবরেটরি। একটা ঘরে ক্লাশ হচ্ছে। সেই ক্লাশে অনেক ছাত্র বসে আছে। তার মধ্যে দুজনকে দেখে গণপতি অবাক। একজন তাঁদের গ্রামেরই নাকুসার ঘোষ, যে বছরটাক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অন্যজন গোকুল বিশ্বাস, যে কিনা মঙ্গলপুরের জলায় মাছ ধরতে গিয়ে পাঁকে তলিয়ে গিয়েছিল বলে লোকে জানে।

গোকুল বিশ্বাসের পাশেই তাঁকে বসানো হলো। একজন ছোকরামতো অধ্যাপক ব্ল্যাকবোর্ডে কী সব আঁকিবুকি করে কী যেন বোঝাচ্ছে।

গোকুল চাপা গলায় বলল, বাঁচতে চাও তো পালাও। এরা দিনরাত খাটাতে খাটাতে জান কয়লা করে দিচ্ছে। খটোমটো সব জিনিস বোঝাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারি না।

পালাবো কি করে?

তা জানি না। কিন্তু না পালালে মারা পড়ব। এত কাজ জীবনে করিনি। ক্লাশের পর চাষের ক্ষেতে নিয়ে যাবে, তারপর কারখানায় নিয়ে যাবে, তারপর হাসপাতালে যেতে হবে, তারপর কবিতার ক্লাশ, ছবি আঁকার ক্লাশ, গানের ক্লাশ, জিমন্যাসিয়াম, সাঁতার, বক্সিং, ক্রিকেট, দাবা...

বলো কী?

আরও আছে।

গণপতিবাবু সভয়ে উঠে পড়লেন। তারপর এক দৌড়ে করিডোর পেরিয়ে সোজা ডিঙি নৌকোটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ডিঙি নৌকোটা পট করে সরে যাওয়ায় শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

চমকে যখন উঠে বসলেন তখন চেয়ে দেখেন, বেলা পড়ে এসেছে। তিনি কাঠুরেডাঙার জঙ্গলের ধারেই রয়েছেন।

বাপ রে! জোর বেঁচে গেছি! বলে লাফ দিয়ে জলে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে লাগলেন গণপতি। না, আর জীবনেও ঘুড়ি ধরতে যাবেন না তিনি।

ছবি : বিজন কর্মকার

জেলি আর তুলি

নবনীতা দেব সেন

তনয়া নিজে অত ছোট্ট হলে কি হবে তার আরও ছোট ছোট দুটো ছানা আছে। একজনের নাম জেলি। সে হচ্ছে সরু লম্বা নাকওয়ালা, ছোট্ট মতন, বাঁটকুল মতন, চ্যাপ্টা মতন, নিচু মতন, খুদে গুড়গুড়ি, কানঝুলুয়া, ন্যাজতুলুয়া হাসিখুশি একজন কুকুরছানা। জেলি তার খুশিমতন খেলে বেড়ায় দিনভর সারা বাড়িতে, সারা বাগানে।

দিনরাত্তির ধর্‌-ধর্‌-গেল-গেল করতে হচ্ছে ওকে নিয়ে। তনয়ার সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলতে ভীষণ ভালোবাসে, আর ভালোবাসে দৌড়ে গিয়ে তনয়ার মার কোলে বসে আদর খেতে, আর বাবার সঙ্গে বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলতে। তনয়ার বাবা অফিস থেকে ফিরে বেল বাজালেই জেলি ভুক্‌ ভুক্‌ করে ডেকে বাড়ি মাথায় করবে, আর বাবা ঘরে ঢুকলেই সবুজ বলটা নিয়ে গিয়ে বাবার সামনে রাখবে। তার মানে, 'এসো আমরা খেলা করি।' মা বকেন, 'দাঁড়াও ওঁকে আগে বসতে দাও, চা-টা একটু খেতে দাও, তারপর খেলা হবে!'

জেলি সবচেয়ে পাগলামো করে তনয়া যখন ইশকুল থেকে ফেরে। ঘরময় গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে তার সে কী নাচ! ঠাম্মা বলেন, 'তাণ্ডব নৃত্য!' মা তো ডাক্তার, যখন তখন বেরোন, যখন তখন ফেরেন, বাঁধাধরা টাইম নেই, তাই মা ফিরলেই ও দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাকে অভ্যর্থনা করে, মার হাত চেটে, ঘৌ ঘৌ করে, 'এসো, এসো' বলে। জেলি সব কথা বোঝে, সব কথা বলতেও পারে। এই ধরো সেদিন ওর বলটা মা তাকের উপর তুলে লুকিয়ে রেখেছেন, বাবাকে ভীষণ বিরক্ত করছিল বলে। জেলি করল কি, বাবাকে নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে ডেকে ডেকে তাকের কাছে টেনে এনে, সরু লম্বা নাকটা উঁচু করে আমরা যেমন আঙুল দিয়ে দেখাই, তেমনি করে নাক দিয়ে লক্ষ্য করিয়ে বাবাকে দেখিয়ে দিল তাকের ওপর বলটা কোথায় আছে। বাবা আর কী করেন, বল নিয়ে একটুখানি খেলতেই হলো তাঁকে। জেলি এইরকম।

আর তুলি ?

তুলি একেবারে আলাদা।

তুলি থাকে একটা খাঁচার মধ্যে। সেই খাঁচাটা কাঠের খুচরো পাতলা পাতলা কুচিতে ভর্তি। সেটাই ওর বিছানা। তুলি সেই কাঠের কুচোগুলো জড়ো করে উঁচুমতন গোল মতন বাসা বানায়, বানিয়ে তার মধ্যে গোল একটা তুলোর ছোট্ট বলের মতো হয়ে ঘুমোয় সারাদিন। একটা ছোট্ট বাটিতে ওর খাবার থাকে, আরেকটা ছোট্ট বাটিতে জল। আসলে ওগুলো কিন্তু বাটি নয়। শিশির ঢাকনা। অত ছোট্ট বাটি তো হয় না। তাই ঢাকনাতে করে ওকে জল দিতে হয়, খাবার দিতে হয়। তুলি সবচেয়ে ভালোবাসে চীজ খেতে। ঠাম্মা বলেন, 'এ তো বাপু বাড়াবাড়ি! ইঁদুর বলে কথা। সে সাহেব-ইঁদুরই হোক আর দিশি-ইঁদুরই হোক, তারা সর্বভুক্। উই আর ইঁদুরের দ্যাখো ব্যবহার, যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার। আর তোর এই নাকউঁচু শাদা-ইঁদুর এটা খাবে না সেটা খাবে না। চীজ খাবেন! ইশ! এটা কি বিলেত? তুলি অবশ্য একটু-আধটু ফলটলও খায়, কলা খেতেও ভালোবাসে। তনয়া একদিন আলু দিয়েছিল, খায়নি। সব্জী খেতে তুলি তেমন পছন্দ করে না। ঠিক তনয়ার মতোই।

এই যে শাদা ইঁদুর তুলি (ঠাম্মা ওকে বলেন, 'নেংটি ইঁদুর'; তনয়ার এই ডাকটা মোটেই ভালো লাগে না, 'নেংটি' কথাটা কিরকম বিশ্রীমতন, লজ্জা-লজ্জা, অসভ্য অসভ্য শুনতে না?') তুলি দেখতে কিন্তু পরমাসুন্দরী। তার রং ধবধবে ফর্সা, নরম তুলতুলে পশমের বলের মতন গা, টুকটুকে লাল পুঁতির মতন দুটো জ্বলজ্বলে কুট্টি কুট্টি চোখ, গাঢ় গোলাপী রঙের, গোল গোল ফুলের পাপড়ির মতন দুটো কান, নরম গোলাপী সিল্কের মতো পেট। সরু টিং টিং লম্বা লালচে ল্যাজ। সরু সরু গোলাপী আঙুল, তাতে সূক্ষ্ম শাদা শাদা পরিষ্কার নোখ। তুলি খুব জানে সে কত সুন্দর। তাই সে সাজতে-গুজতে খুবই ভালোবাসে। দিন নেই রাত্তির নেই কেবল লোম পরিষ্কার করছে, হাত-পা পরিষ্কার করছে, ঠিকঠাক সেজেগুজে যেন বেড়াতে বেরুবার জন্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে রেডি হচ্ছে। তুলি জেলির মতন নয়। সে একা একাই খেলতে ভালোবাসে। তাকে বের করে তনয়া আদর করে যখন হাতের মুঠোয় নেয়, তুলি প্রথম প্রথম ভয়ে কুঁকড়ে মুকড়ে গুটিশুটি মেরে এত্তোটুকুনি পুঁটলি হয়ে বসে থাকতো। আজকাল তেমন করে না। হাতে বসে পুটুর পুটুর এদিক-ওদিক তাকায় ঘাড় ঘুরিয়ে। কিছু খেতে দিলে দুই হাতে ধরে কুটুরকুটুর করে খায়ও। কিন্তু অন্য লোকদের পছন্দ করে না। তুলির বন্ধুরা প্রথম প্রথম ওর খাঁচার কাছে এসে হৈচৈ করলেই তুলি করত কি, নিমেষের মধ্যে পেছন ফিরে বসতো উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে। ঠাম্মা বলতেন, 'কনে বউটি সেজেছে দ্যাখো।' আজকাল অত লজ্জা পায় না অবশ্য।

তুলি তার খেলা নিজেই বানিয়ে নেয়। খাঁচার গা বেয়ে বেয়ে উঠতে পারে। এমনকি উল্টো হয়েও ছাদের থেকে চারপায়ে ঝুলতে পারে। তুলির সবচেয়ে আশ্চর্য গুণ, সে সাইকেল চালাতে পারে।

বাবা-মা তনয়াকে সাবধান করে দিয়েছেন, 'তুলি যা পারে, জেলি তা পারে না কিন্তু! জেলিকে যেন খবর্দার তুমি সাইকেল চড়া শেখাতে যাবে না! ও পড়ে যাবে, খুব ব্যথা পাবে। যেমন, যদি তুলির সঙ্গে তুমি বল ছুঁড়ে খেলতে যাও, গায়ে বল লাগলেই ও কিন্তু তক্ষুণি মরেই যাবে।' এতই কচি, আর খুদে, আর পলকা শরীর তুলির। তুলির শরীরের চেয়ে বাবার আঙুলগুলো লম্বা অনেক বেশি। তুলি যখন গোল হয়ে ঘুমোয়, ওকে একটা তুলোর গুলি বলে মনে হয়।

কিন্তু যখন সাইকেল চালায়? তখন ওকে দ্যাখে কে? ক্যাঁচ-কোচ-ক্যাঁচকোচ-ক্যাঁচকোচ শব্দ করতে করতে সাঁই সাঁই গতিতে গোল হয়ে হয়ে চাকা ঘোরায় সে চার পায়ে। তুলির সাইকেলটা ঠিক মানুষের সাইকেলের মতন নয় অবশ্য। এটা একটা তারের গোল চাকা, তাতে অনেক তারের-তাক বানানো। খেলনাটা ঠিক ছোট্ট নাগরদোলার মতন দেখতে। তুলি সেই তাকগুলোতে ওর ছোট্ট ছোট্ট পা দিয়ে দিয়ে ঠেলা মেরে নাগরদোলাটা ঘোরাতে পারে। বন্‌বন্ করে ঘোরায় এতই স্পীডে, যে মাঝে মাঝে তুলিকেই ঝাপসা দেখায়। তনয়ার কাকু এই চাকাটা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছেন। ওখানে এটা পোষা ইঁদুরদের জন্যে খেলনা।

তনয়ার বন্ধুরা সবাই তুলির সাইকেল চালানো দেখতে খুব ভালোবাসে। তারা যেন ঠিক সার্কাস দেখছে, এমন আনন্দ পায় তুলির কীর্তি দেখে। কিন্তু বন্ধুদের সন্ধ্যেবেলায় আসতে হয়, তুলিটা যে দিনের বেলায় কিছুতেই ব্যায়াম-ট্যায়াম প্র্যাকটিস করবে না! সারাদিন কুঁড়েমি। কেবল গোল বল হয়ে বাসায় শুয়ে ওম হয়ে ঘুমুবে। আর সারারাত্তির 'ক্যাঁচকোচ...ক্যাঁচকোচ...!' সেবার হয়েছে কি, পিসিমণি এসে মাঝরাত্তিরে উঠে আলো জ্বেলে খুঁজছেন, চোর এলো নাকি? এত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে কোথায়? পিসিমণির এই প্রথম তুলির সঙ্গে দেখা কিনা? ও যে রাতভোর জোরসে অমন 'ক্যাঁচর-কোচর-ক্যাঁচর-কোচর' শব্দ করে বীরের মতন ব্যায়াম করে, সাইকেল নাগরদোলা চালায়, তা তো পিসিমণি জানেন না?

তুলি যখন দু'হাতে ফলের কুচি, কি চীজ-এর কুচি ধরে খায়, তখনও ভারী মিষ্টি দেখায় ওকে। মাঝে-মাঝে ঘাড় কাত করে করে তুলি খাওয়া থামিয়ে ওদের টেরিয়ে একটু দেখে নেয় আবার। আছে তো তনয়া?

তুলি কেবল রাত্তির বেলাই সার্কাস দেখায়, সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঠাম্মা বলেন, 'নিশাচর প্রাণী'। বলেন, 'ইঁদুর কেউ পোষে বলে তো জন্মে শুনিনি! দিনে দিনে কতই হলো, এবার শুনবো বাচ্চারা উইপোকা পুষছে।' কিন্তু ঠাম্মা জেলিকে খুব ভালোবাসেন। 'জেলিসোনা, জেলিসোনা' বলে ডেকে পেঁপে, আম, সব খেতে দেন। ঠাম্মার কাছে জেলি তো দারুণ আমের আঁটি খেতে শিখেছে। প্রথম প্রথম না বুঝে ভেঙে চিবিয়ে ফেলেছিল। তেতো! এখন ভুলেও ভাঙে না, চুষে চুষে আমটা খেয়ে নিয়ে, আঁটিটাকে শুকনো, শাদা করে পাপোশের ওপর এনে রেখে দেয়। অর্থাৎ: 'আমার আম খাওয়া হয়ে গেছে। এবার এটা তোমরা নিয়ে নাও।'

জেলি খাঁচার বাইরে থেকে তাকিয়ে

তাকিয়ে তুলিকে দ্যাখে, কিন্তু ওকে কিছু বলে না। তুলিও মাঝে মাঝে সাইকেল চালাতে চালাতে থমকে গিয়ে টুক করে জেলিকে দেখে নেয়। ওদের ঠিক ভাব হয়েছে কিনা, তনয়া বুঝতে পারে না। কেননা মা বলেছেন, 'খবর্দার, যেন দু'জনকে নিয়ে একসঙ্গে খেলবে না, খেলতে গিয়ে জেলি তুলিকে মেরেই ফেলতে পারে। ও অত বোঝে না। এটা ভালো-মন্দের ব্যাপার নয়, এটা প্রকৃতির নিয়ম। জেলি তো কুকুরছানা, আর তুলি ইঁদুরছানা, ওবাড়ির বিল্লি যেমন বেড়ালছানা। এদের তিনজনকে নিয়ে কোনোদিন একসঙ্গে খেলা করা যাবে না। এরা পরস্পরের বন্ধু নয়, পরস্পরের শত্রু। তোমাকেই সাবধান হতে হবে।' তাই তনয়া খুব সাবধানে দু'জনকে নাড়াচাড়া করে।

মাঝেমাঝেই তুলির খাঁচায় কাঠের গুঁড়ো পালটে দিতে হয়। পাড়াতে ছুতোর মিস্ত্রি মদনদার দোকান থেকে বিন্দুদি কাঠের ফুলকো চেয়ে আনে। সেদিন হয়েছে কি, তুলির ঘরের ভেতরে কাঠের গুঁড়ো বদলে দেবার সময়ে তুলি হঠাৎ একছুটে বেরিয়ে চকিতের মধ্যে 'ভ্যানিশ'! অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়ে তনয়া চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মা! ও মা! তুলি যে পালিয়ে গেল!' 'কি সর্বনাশ!' মা ছুটে এলেন, বিন্দুদি আর ঠাম্মাও। কোথায় গেল? কোথায় গেল? ঠাম্মা তো প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। যাতে জেলি না ঢুকে পড়ে। জেলি বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই ভীষণ চেঁচিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। খোঁজাখুঁজি শুরু হলো, খাটের নিচে, আলমারির তলায়, টেবিলের নিচে, আলনা সরিয়ে, তনয়ার গাদা গাদা খেলনা পুতুল, ছবির বই, গল্পের বই, পড়ার বই, সবই নাড়ানাড়ি করা হলো। কত কিছু হারানো জিনিস বেরিয়ে পড়ল—জেলির হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বলটা, বাগানের গেটের হারানো চাবিটা, মার রুমাল, পিসিমণির এনে দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট বিলিতি গাড়ি দুটো, ঠাম্মার তৈরি পুঁতির ব্যাগ, কত কি! কিন্তু তুলি নেই। ঠাম্মা বললেন, 'দ্যাখ, আলমারির মাথায় দ্যাখ একবার।' নিচেগুলো দেখা হয়েছে। এবার মাথাগুলো দ্যাখা শুরু হলো। আর উঃ ঘরটা থেকে কী ঝুল বেরোল, কী ধুলো বেরুল! মা এইজন্যে বিন্দুদিকে বকুনি দিলেন, বিন্দুদিও লজ্জায় চুপ করে রইল। কিন্তু তুলি বেরুল না। তুলি উধাও।

মা খাঁচার মধ্যে খাবার দিয়ে রাখলেন। সে খাবার পড়েই রইল। কেউ খেল না। সেদিন তনয়ার ঘরটা বন্ধ করা থাকল যাতে ও বেরুতে না পারে। আর জেলি যাতে ওঘরে না ঢোকে। সক্কলের ভয় জেলি পাছে তুলিকে অন্য ইঁদুর ভেবে হঠাৎ শিকার করে ফেলে! পরদিন বাবা বাজার থেকে একটা ভালো ইঁদুর-ধরা-কল কিনে আনলেন। যাতে ইঁদুরেরা ধরা পড়ে, কিন্তু ব্যথা পায় না মারাও পড়ে না। সেটা রাখা হলো তনয়ার ঘরে, তাতে চীজের টুকরো দিয়ে। চীজ কেউ খেল না। এবারে তনয়া কেঁদে ভাসাল। কক্ষণো তুলি বেঁচে নেই। ঠিক বাগানে গেছে আর বিল্লি নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে। ঠাম্মা আদর করে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও দিদু, সবগুলো ঘরে একবার করে ফাঁদটা পেতে আগে দেখি? নেংটি ইঁদুররা কিন্তু দরজার নিচ দিয়েও সরু হয়ে গলে পালাতে পারে! এক কাজ করো না, ওর খাঁচাটাতেই চীজ দিয়ে রান্নাঘরে রেখে দাও না? রান্নাঘরে তো জেলি ঢোকে না, আর বিন্দু বলছিল সেদিন রান্নাঘরে মনে হচ্ছে যেন একটা ইঁদুর ঢুকেছে। সেই ইঁদুরটা তুলিও তো হতে পারে?'

রান্নাঘরে আর ভাঁড়ার ঘরে তো অনবরতই ইঁদুর ঢোকে, আর বিন্দুদি অনবরত তাদের তাড়ায়, মেরে-ধরে। সেটা তুলি কেন হবে? তবু রান্নাঘরে সেদিন রাত্তিরে তুলির খাঁচাটা রেখে, তাতে চীজের টুকরো দেওয়া হলো।

সেদিন মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘৌ ঘৌ ঘৌ ঘৌ করে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল জেলি। বাবা ধমক দিলেন, 'চুপ করো জেলি। রাত্তিরবেলা শুধু শুধু চেঁচায় না। মিছিমিছি গোলমাল কোরো না। পাড়ার লোকে বিরক্ত হবে।'

ভয় পেয়ে জেলি চুপটি করে গেল। তার পরেই শোনা গেল সেই শব্দ। 'ক্যাঁচকোচ, ক্যাঁচকোচ, ক্যাঁচকোচ...' তুলি তার সাইকেল চালাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে আসছে শব্দটা।

'মা! তুলি!' আহ্লাদে আটখানা তনয়া চেঁচিয়ে উঠল। হাসিমুখে মা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, 'চুপ! এবার চুপি চুপি গিয়ে খাঁচাটা বন্ধ করতে হবে। রান্নাঘরে একবার লুকোলে ধরা মুশকিল!' কিন্তু বিন্দুদি আগেই শব্দটা শুনতে পেয়েছে, বন্ধও করে ফেলেছে খাঁচার দরজা। সব্বাই এবার নিশ্চিন্ত! আঃ! কি আরাম! মাঝরাত্তিরে সারা বাড়িতে যেন তুলির হ্যাপি বার্থ-ডের আনন্দ উৎসব পড়ে গেল। চীজ-টীজ খেয়ে মহানন্দে তিনি আপনমনে ব্যায়াম করছেন। যেন কিছুই হয়নি। দুটো দিন যে বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকে কী ভাবনা ভাবিয়েছেন! এবং কেউ মুখে কিছু না বললেও, টেরিয়ে টেরিয়ে সকলেই দেখেছে, জেলির মুখে রক্তটক্ত কিছু লেগে আছে কিনা!

বেচারা জেলি! কিছুই করেনি, তবু লোকে ওকে মনে মনে খুনী বলে সন্দেহ তো করেছিল? এক তনয়া ছাড়া। তনয়া একবারও জেলির দোষ ভাবেনি, ও ভেবেছিল বিল্লি বুঝি ধরে ফেলেছে। কিন্তু বিল্লিরও তো দোষ নেই, ওর তো ওটাই কাজ! বেড়ালের তো দায়িত্ব ইঁদুর ধরা। কিন্তু কাউকেই কিছু করতে হলো না। তুলি দু'দিন বেড়িয়ে-টেড়িয়ে দিব্যি নিজেই চীজ-এর লোভে বাড়ি ফিরে এল। আর সবার আগেই সেটা জানতে পেরে চেঁচিয়ে বাড়ির সবাইকে খবর দিচ্ছিল তো জেলিই! বেচারী শুধু শুধুই বকুনি খেল।

কেবল অবাক হয়ে তনয়া মনে মনে ভাবল, তবে যে ঠাম্মা এত 'নেংটি ইঁদুর' 'নেংটি ইঁদুর' বলে অপমান করেন তুলিকে, মনে মনে তার মানে ওকে ভালোওবাসেন?

তুলি আর পালায়নি। জেলিও দিব্যি আছে। বিল্লির চারটে মিষ্টি মিষ্টি ছানা হয়েছে। তনয়া একটু ভেবেছিল, একটাকে আনবে কিনা? কিন্তু মা বলে দিয়েছেন, 'খবর্দার না! তুলি রয়েছে না?'

ছবি : বিজন কর্মকার

ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কোথায়

আমি কোথায় আছি?

আমি আছি আমার এই শহরে। কেউ বা বলবে সে ঠিক শহরটিতে নেই, তার বাস শহরের উপকণ্ঠে। কেউ আবার এমন কথাও বলতে পারে, সে আছে শহর ছাড়িয়ে উপকণ্ঠ পার হয়ে অনেক দূরে—এমন হওয়া সম্ভব তিন রাজ্যের শেষে আর এক নতুন রাজ্যে।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জবাব একসঙ্গে জুড়ে এমন উত্তরও দেওয়া যায়, আমরা যে যেখানেই ঘর করি না কেন, আমরা সবাই আছি আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, আরো এগোনোর সুযোগ আছে।

'নটে গাছটি মুড়োল' থেকে কেন নটে গাছ মুড়োল ধরে, 'কেন' পর্যায়ে যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া যায় অনেক দূর, তেমনি আমাদের দেশটাই বা কোথায় আছে থেকে আমরাও এগিয়ে যেতে পারি ইচ্ছেমতো। দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে আমাদের ছায়াপথ, ছায়াপথ থেকে লোক্যাল গ্রুপ, তারপর শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে পৌঁছোব আমরা। জ্ঞাতি-গোত্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সবাই আছি এই ব্রহ্মাণ্ডে।

এই যে ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলছি আমরা, এই ব্রহ্মাণ্ডটা চেহারায় কি রকম? সে কি নির্দিষ্ট একটা অবয়বের, নাকি তার চেহারাও বদলে বদলে চলেছে? আমরা রোগা-মোটা হই, ব্রহ্মাণ্ডের চেহারারও কি হেরফের ঘটে?

হ্যাঁ, ব্রহ্মাণ্ডের আকারও স্থির নেই। বয়সকালে সে মানুষের মতো ছোট হয়ে যায় না। বরং বয়স যত বাড়ে ততই সে আকারে বেড়ে চলে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটা বেলুনের দৃষ্টান্ত নেওয়া সবচেয়ে ভাল। বড় বেলুন, ফোলানোর আগের অবস্থায় তার গায়ে কালি দিয়ে অনেক ছোট ছোট গোলাকার ক্ষেত্র এঁকে নিলাম। কালির গোলাকার দাগগুলি রইলো বেলুনের চারপাশে ছড়িয়ে।

এবার বেলুনে ফুঁ দিতে শুরু করি। চ্যাপটানো বেলুন ফুলতে আরম্ভ করলো। যেটা ছিল এলোমেলো, ছড়ানো, অবয়বহীন তা একটা নির্দিষ্ট চেহারা নিল। কিন্তু বেলুন ফোলানোর আরো অনেক বাকি। এখনও হাওয়া আছে তার ভিতরে অল্পই। তবু গোলাকার দাগগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এবার এই ঘেরা দাগগুলির ভেতরে অনেকগুলি কালির বিন্দু এঁকে দেওয়া হলো।

বেলুনের গা জুড়ে এই ঘেরা দাগগুলি আর তার ভিতরে বিন্দুগুলি কিসের প্রতীক? এক একটা বিন্দু এক একটা নক্ষত্রলোক আর যে কোনো ঘেরা দাগের ভিতরে আছে নক্ষত্রলোকের এক একটা দল বা এক একটা নক্ষত্রলোকপুঞ্জ।

তাহলে নক্ষত্রলোকেরা মহাকাশে একাকী ঘুরে বেড়ায় না, তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও নেই। মহাকাশে যত নক্ষত্রলোকের খবর

পাওয়া গেছে সংখ্যায় তারা কম নয়। এরা যেন আছে এক একটা দলে ভাগ হয়ে, কোনো পাড়ায় বা কোনো পল্লীর ভিতরে।

যদিও একটা নক্ষত্রলোক থেকে আর একটা নক্ষত্রলোকের দূরত্ব সীমাহীন তবুও সাধারণভাবে এরা দলছুট হয়ে থাকে না। নক্ষত্রলোকপুঞ্জ সংখ্যায় গণনার অতীত। তার কোনোটার সদস্যসংখ্যা মাত্র দুই-তিন, কোনোটার আবার দু'হাজার, আড়াই হাজার।

আমাদের ছায়াপথও মহাকাশে একটি নক্ষত্রলোক—অসংখ্য তারকায় মিলে যেন একটি দ্বীপজগৎ। কিন্তু সেও একাকী নয়। সে আছে একটা দলের মধ্যে, এটিকে বলা হয় লোক্যাল গ্রুপ। এই দলটিকে বড় বলা যায় না। অন্যান্য নক্ষত্রলোকপুঞ্জে সদস্যের সংখ্যা যেখানে কয়েক হাজার হতে পারে, সেখানে এটিতে পরিচিত সদস্যসংখ্যা মাত্র ২৫। তা ছাড়া আরো কিছু সদস্য থাকলেও থাকতে পারে।

বেলুনের গায়ে আঁকা এক একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে নক্ষত্রলোকের এক একটা দল নিয়ে আধফোলা বেলুনটিকে আরো ফোলানো যাক এবারে। বেলুন যত ফোলানো হবে ততই একটা ঘেরা অঞ্চল আর একটা ঘেরা অঞ্চল থেকে দূরে সরে যাবে। ভিতরের বিন্দুগুলির পরস্পরের দূরত্বও এক থাকবে না। একটা থেকে আর একটার দূরত্বও ক্রমাগত বেড়ে চলবে।

মহাবিশ্বে মহালোকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্রলোকগুলিও ওইরকমই। তারাও একে অন্যের থেকে দূরে সরে চলেছে। তবে তারা শুধু বেলুনের পিঠের উপরে নেই, তারা আছে বেলুনের ভেতরে হাওয়া ভরা জায়গাতেও। আর তাই তো স্বাভাবিক।

যদি আশ্চর্য কোনো শক্তিবলে আমরা আমাদের ছায়াপথ থেকে অন্য সব কটা নক্ষত্রলোককে দেখতে পেতাম, তাহলে নজরে আসতো অন্যান্য নক্ষত্রলোক আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে দূরে আর যে নক্ষত্রলোক যত দূরে, তার গতিবেগ তত দ্রুত। এ শুধু আমাদের ছায়াপথের কথা নয়, যে কোনো নক্ষত্রলোক থেকেই ছুটে চলা অন্য নক্ষত্রলোক সম্পর্কেও এমনটিই মনে হবে।

নক্ষত্রলোকেরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলে মহাবিশ্বও আর একই অবস্থায় থাকছে না। তারও ক্রমাগত প্রসারণ ঘটছে। কিন্তু মহাবিশ্বকে যদি গুটিয়ে নিয়ে আসা যায় পৃথিবীতে? কল্পনা করা যাক পৃথিবীও এক অবস্থায় থাকছে না, তারও প্রসারণ ঘটছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশও বেলুনের মতো। তাহলে পৃথিবীর প্রসারণে কলকাতার মানুষের নজরে আসবে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই কলকাতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শহরের কাছের এক টাউনের কথা ধরা যাক। কলকাতা থেকে বর্ধমানের দূরত্ব যদি ১০০ মাইল হয়, তাহলে কলকাতায় বসে দেখতে পাবো বর্ধমান শহর ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো শহরের দূরত্ব যদি ১০০০ মাইল হয় তাহলে ঘণ্টায় ১০০০ মাইল বেগে সরে যেতে দেখবো সেই শহরকে। আসল কথ সরণের গতিবেগ দূরত্বের সমানুপাতী।

এখন পৃথিবী ছাড়িয়ে দুটো নক্ষত্রলোকের কথা ধরা যাক। একটা নক্ষত্রলোক থেকে আর একটা নক্ষত্রলোকের দূরত্ব ধরে নিই ১০ কোটি আলোকবর্ষ। আমাদের চিন্তা-ভাবনায় আলোকবর্ষ দূরত্বটার খেই পাওয়া কঠিন। আলো ১ সেকেন্ডে চলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। আলোকের সঙ্গে বর্ষ যোগ করায় ১ বছরে আলোর পথ চলাটাই ১ আলোকবর্ষ। এই হিসেবে দুটো নক্ষত্রলোকের দূরত্ব ১০ আলোকবর্ষ হলে কাছের নক্ষত্রলোক থেকে দূরের নক্ষত্রলোকটিকে দেখা যাবে, সেকেন্ডে ১৯০০ মাইল বেগে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সেকেন্ডে ১৯০০ মাইল গতিবেগে ১০ কোটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করতে সময় লাগবে প্রায় ১০০০ কোটি বছর।

১০ কোটির বদলে দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করা হয়! এখন যে নক্ষত্রলোক আছে ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে তার সময় অবশ্য একই থাকবে। কারণ দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেই প্রায় ১০০০ কোটি বছরের কাছাকাছি। কিন্তু দূরত্ব শেষ পর্যন্ত কত করলে নক্ষত্রলোকের অপসরণের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এসে পৌঁছোবে? দূরত্ব যদি হয় ৭০ কোটি আলোকবর্ষ তাহলে নক্ষত্রলোকের গতিবেগ হবে সেকেন্ডে ১৩৪০০ মাইলের সমান। আর যে নক্ষত্রলোক আছে ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে তার অপসরণ গতিবেগ হবে প্রতি সেকেন্ডে ৩৮০০০ মাইলের সমান। গতিবেগ বাড়ানোর জন্যে দূরত্ব আরো বাড়িয়ে চলি। এ পর্যন্ত দূরবীক্ষণের নজরের মধ্যে যত নক্ষত্রলোক ধরা পড়েছে তাদের নিয়ে হিসেব করলে অপসরণের সর্বোচ্চ গতিবেগ পাওয়া যায় প্রতি সেকেন্ডে ৮৫০০০ মাইল। এটা আলোর গতিবেগের অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা কম। আর আলোর গতিবেগে পৌঁছনোর জন্যে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব হওয়া উচিত প্রায় ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ। নক্ষত্রলোকের যে বিশাল ব্যাপ্তি তাতে এ রকম নক্ষত্রলোক থাকতেই পারে। তাহলে আমাদের কাছ থেকে বা পৃথিবী থেকে ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে সব নক্ষত্রলোক আছে তারা ছুটে চলেছে আলোর গতিবেগে।

যে সব নক্ষত্রলোক আলোর গতিবেগে ছুটে চলে তারা কি কোনোদিন আমাদের নাগালে আসবে? নক্ষত্রলোকের আলো আসছে আমাদের দিকে ধেয়ে, কিন্তু দৃষ্টির নাগালে আসার আগেই আলোর গতিবেগে সে সরে যাচ্ছে। কিংবা ঘুরিয়ে বলি, চোর-পুলিশের খেলায় চোর যে গতিবেগে পালায়, পুলিশ যদি সেই গতিবেগে ধাওয়া করে তাহলে পুলিশ কি কখনও চোরের নাগাল পাবে?

তাই ১০০০ কোটি আলোকবর্ষের বাইরের সব কিছুই আমাদের দৃষ্টির বাইরে রয়ে যাবে। দূরবীন যতই জোরালো হোক, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আমাদের দৃষ্টির পরিসীমা ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ। তারপর আর নয়।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

নেকলেস রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

উ, মিউ কোথায় গেলি... সাতসকালে শঙ্করকাকুর গলা শুনে মিউ তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে, শঙ্করকাকুই তো। মামের সঙ্গে কথা বলছেন। পুলিশের ধড়াচুড়া পরে নেই। প্লেন ড্রেসে। শঙ্করকাকু কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। তাই বেশির ভাগ সময় সাধারণ পোশাকে থাকেন।

ব্রেকফাস্ট তো করিসনি? এখানেই সেরে নে। তুই মিউ-এর সঙ্গে গল্প কর। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাম রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

তোরা এবার কোথায় যাচ্ছিস? শঙ্করকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

এবার বোধহয় কোথাও যাওয়া হবে না।

কেন, কেন? শঙ্করকাকুকে যেন একটু উৎসাহী দেখালো।

যাবার জায়গা ঠিক হয়নি বলে বাবুদাদা, রাজাদাদা বলছিল, এবার আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

মিউ খুব রেগে গেছে। কিকি যে কখন এসে আলমারির ওপর বসেছিল কেউ খেয়াল করেনি। কিকি বলে উঠলো, সব সময় বেরুনো। পড়াশোনার নাম নেই!

এই তুই চুপ করে থাক। সব সময় ফোড়ন কাটা চাই। মিউ কিকিকে তাড়া দেয়।

মামকে বলে দেব কিন্তু, তুমি এখনো পড়তে বসোনি।

উঃ জ্বালালে দেখছি! বুয়া কিকিকে নিয়ে যা তো। মিউ চেঁচিয়ে বুয়াকে ডাকে।

কিকি উড়ে গিয়ে পেলমেটের ওপর বসে। সে জানে বুয়ার হাত ওখানে পৌঁছুবে না। কিকিকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে দেখে শঙ্করকাকু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তোদের যখন কোথাও যাওয়া ঠিক হয়নি তখন আমার সঙ্গে চল।

কোথায়? মিউ-এর মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে।

তোদের অতি পরিচিত জায়গায়।

মানে?

টাকীর কাছে একটা জায়গায়।

ধুস! মিউ-এর চোখেমুখে হতাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলে, কতবার গেছি। পাতালঘর রহস্যর সমাধান তো আমাদের পুরোনো বাড়িতে হয়েছিল, মনে নেই।

নেই আবার।

তাহলে আবার সেখানেই যেতে বলছো কেন?

কারণ আছে নিশ্চয়।

শঙ্করকাকুর কথা শুনে মিউ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বলে, খুলে বলো তো ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন। একটা ব্যাপার নিয়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস টাকী থেকেই গোটা ব্যাপার কনট্রোল করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো হদিস পাচ্ছি না।

ব্যাপারটা কী তাই এখনো বলোনি কিন্তু।

শোন বিরাট একটা ড্রাগ পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পুরো ব্যাপারটা পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক চোরাচালানি আর মাফিয়াদের মদতে। আমি জানি, পুরো ড্রাগ স্টোর করা হচ্ছে টাকীর কাছে একটা জায়গায়। আমরা সব জায়গায় হানা দিয়েছি। আমাদের লোক আর ইনফরমাররা চিলের মতো নজর রেখেছে। কোনো লাভ হয়নি।

থানার স্টাফ বদলেছো?

নিশ্চয়ই! ওসি থেকে আরম্ভ করে কনস্টেবল পর্যন্ত। এমনকি সি আই (সার্কেল ইনসপেক্টার)-কে পর্যন্ত ট্রানসফার করা হয়েছে। নতুন যাঁরা গেছেন তাঁরা প্রত্যেকে সৎ এবং কর্মক্ষম। তবু কোনো লাভ হয়নি। আমি কাল আবার যাচ্ছি। ভাবলাম, তোরা যদি কোথাও যাবার প্ল্যান না করে থাকিস তাহলে তোদেরও নিয়ে যাই। বলা যায় না তোরাই হয় তো রহস্যের সমাধান করে ফেলবি।

বিপদের দিকটা ভাবলে না তো।

মিউ-এর কথা শুনে শঙ্করকাকু চমকে উঠে বললেন, বিপদ, কিসের বিপদ?

বিপদ নয়। আমাদের সকলেই যে চেনে। আমাদের সম্বন্ধে কতো কাহিনী ওখানে প্রচলিত তা ভুলে গেলে?

না, ভুলিনি। এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। তা এখন বল কাল আমার সঙ্গে তোরা যাবি কিনা।

যাবো তো নিশ্চয়। কোথা থেকে আমাদের পিক আপ করবে বলো। আমরা তৈরি থাকবো।

কেন এখান থেকে। সকলকে পাতিপুকুরে আসতে বলবি। আমরা সকালে সাতটা নাগাদ বেরুবো। ভি আই পি রোড দিয়ে বাগুইআটি ক্রস করেই হাতিয়াড়ার মধ্যে দিয়ে রাজারহাটের রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে উঠবো বেলেঘাটায়। তুই সকলকে ফোন করে দে। সকলে যেন রাত্তিরেই এসে যায়।

কে আসবে রাত্তিরে? মা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে দুটো প্লেটে ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা আর পায়েস।

রাজাদাদা, বাবুদাদা, মোমা...

মিউ-এর কথা শেষ হলো না মা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী শঙ্কর— ছেলে-মেয়েগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি?

দূরে কোথাও নয়, কাল আমি টাকী যাবো, ওরা এবার কোথাও যাচ্ছে না শুনে বললাম, ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারে।

তার মানে কোনো ব্যাপার আছে? তোকে কতবার বলেছি, ছেলে-মেয়েগুলোকে গোলমালের মধ্যে জড়াস না। ওদের এখন লেখাপড়া করার সময়।

না না, ওসব কিছু নয়। টাকীতে আবার গোলমাল কোথায়! বর্ডার হলেও জায়গাটা খুব শান্ত। ওখানে ক'দিন থেকে ওরা চলে আসবে। নিজেদের দেশের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাওয়া তো ভালো!

হুঃ! তোর কথা শুনেই বুঝতে পারছি, কিছু একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা এই ছোট ছেলে-মেয়েগুলোকে কেন তোদের কাজের সঙ্গে জড়াস বল তো! ওদের জন্যে এমনিতেই আমরা সব সময় দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি। যেখানে যাবে সেখানেই একটা না একটা কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। সেবার টাকীতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই না হলো।*

না না, এবার ওসব কিছু নয়।

আমি আর কী বলবো। নে খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শঙ্করী চা আনছে।

মাম ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মিউ ফোন তুলে নিয়ে চটপট বাবু আর রাজাকে আসতে বললো। সেই সঙ্গে মোমাকে খবর দিতে বললো। আজ রাত্তিরে পাতিপুকুরে থেকে কাল ভোরে বেরিয়ে পড়া হবে। সেই বুঝে তোমরা সকলে তৈরি হয়ে এসো। কিছুদিন

* 'পাতালঘর রহস্য' ও 'জঙ্গল রহস্য' দ্রষ্টব্য।

টাকীতে থাকতে হবে কিন্তু।

শঙ্করকাকু ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়লেন। বলে গেলেন, পরদিন ভোর ভোর গাড়ি নিয়ে আসবেন।

কিকি এতোক্ষণ চুপ করে বসেছিল। শঙ্করকাকু উঠতেই বলে উঠলো, আমিও যাবো কিন্তু।

সে তো যাবিই। তোকে বাদ দিয়ে আমরা কোথাও গেছি নাকি?

মিউ একটু রেগে কিকিকে বললো। কিকি ততোক্ষণে আবার আলমারির ওপরে গিয়ে বসেছে। মিউ রেগে গেলেই কিকি তার নাগালের বাইরে গিয়ে বসে থাকে।

মিউ গজগজ করে উঠলো, দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। এবার তোকে আর বুয়াকে বাড়ি রেখে যাবো।

আমরাও যাবো। কিকি উড়ে গেল ঘর থেকে। গিয়ে বসলো, বাড়ির পেছন দিককার ঝাউ গাছে।

মিউ রাগতে গিয়েও হেসে ফেললো।

॥ দুই ॥

পরদিন সক্কালবেলায় শঙ্করকাকু একটা টাটা সুমো নিয়ে এলেন।

মিউরা আগেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। শঙ্করকাকু ঢুকতেই মাম বললেন, এক কাপ চা খেয়ে যাও।

দেরি হয়ে যাবে বৌদি। অনেকটা পথ যেতে হবে।

কিচ্ছু দেরি হবে না, চা রেডি আছে। মামের কথা বলা শেষ হতে না হতেই শঙ্করীদিদি চা আর বিস্কুট এনে টেবিলের ওপর রাখলো। শঙ্করকাকুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

এরা কোথাও গেলে ভয়ে আমার বুক কাঁপে। কোথায় যে কী করে বসবে কে জানে। এবার কিন্তু তোমার দায়িত্ব। আমায় যেন শুনতে না হয়, এই বিপদ হয়েছে, ঐ বিপদ হয়েছে।

ঠিক আছে বৌদি, আমার খেয়াল রইলো। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। ওদের দায়িত্ব আমার।

ঠিক তো?

হ্যাঁ!

শঙ্করকাকুর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। একটা বিস্কুট মুখে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। ফেলুদার মতো পেটানো চেহারা। লম্বা ছ' ফুটের কাছাকাছি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ওঁর গায় যেমন জোর, তেমনি জোর মনেরও। বিস্কুট চিবোতে চিবোতে শঙ্করকাকু বললেন, বৌদি আমরা তাহলে যাচ্ছি।

যাচ্ছি নয়, বলো, আসছি।

হেসে ফেললেন শঙ্করকাকু। মার দিকে তাকিয়ে বললেন, যার নাম চাল ভাজা তার নামই মুড়ি।

শঙ্করকাকু আর দাঁড়ালেন না। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। ছেলে-মেয়েদের জামা-প্যান্ট, সোয়েটার সব আলাদা আলাদা সুটকেসে ছিল, সেগুলো আগেই তোলা হয়েছে। শঙ্করকাকুর পেছনে পেছনে ওরা পাঁচজনও বেরিয়ে এলো। গিয়ে বসলো গাড়িতে। রাস্তা ভালো থাকলে ওরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই টাকী পৌঁছে যাবে। শঙ্করকাকু ইশারা করতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো। মাম এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালেন।

শঙ্করকাকু বললেন, তোরা কেন টাকী যাচ্ছিস জানিস তো? মিউ নিশ্চয়ই তোদের বলেছে।

হ্যাঁ, আমরা সবই জানি।

দেখ্ তোরা কেসটা সলভ করতে পারিস কিনা। আমি বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

অতো চিন্তা কোর না, একটা কিছু হয়েই যাবে।

বলছিস?

হ্যাঁ, একটা কথা বলো তো—পুরো ব্যাপারটা যে ওখান থেকে কনট্রোল করা হচ্ছে তা জানলে কি করে? বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্করকাকুর দিকে তাকালো।

ওদের একজন এজেন্ট টাকীর ট্রেনে ধরা পড়েছে। সে বলেছে, টাকী স্টেশনে একটা বাচ্চা ছেলে এসে ওকে প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিল। তার বেশি সে আর কিছু জানে না। ছেলেটাকে এখন দেখলেও চিনতে পারবে না। কারণ ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে সে প্যাকেটটা এনে লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল। এমনটা তো হতেই পারে। অবিশ্বাসের কিছু নেই।

একটু থেমে শঙ্করকাকু বললেন, লোকটা একইভাবে কয়েকবার কলকাতায় মাল এনেছে। স্টেশনে চেকারের পোশাক পরা একটা লোক এসে মালটা নিয়ে প্রত্যেকবার একটা করে খাম দিয়ে গেছে। খামের মধ্যে নগদ দু'হাজার করে টাকা ছিল। শেষবার চেকারের আসতে একটু দেরি হচ্ছিল। ও উসখুস করছিল। সেই সুযোগে পুলিশ এসে তাকে ধরে। লোকটাকে আমরা পুলিশ কাস্টডিতে রেখেছি। ওর জামিনের জন্যে কেউ আসেনি। তা থেকেই বোঝা যায় গ্যাঙটা বেশ সতর্ক, শক্তিশালীও। হবে নাই বা কেন। কোটি কোটি টাকার কারবার যে। ঝুঁকি যেমন আছে, টাকাও তেমনি। থাকতেই হবে—তবে না খেলা জমবে!

শঙ্করকাকু, আমরা বাড়িতেই উঠব তো?

হ্যাঁ। সতীশদাকে খবর পাঠিয়ে দেব ভেবেছিলাম। সময় পাইনি। তা তোদের কোনো অসুবিধে হবে না।

তুমি কি আজই কলকাতায় ফিরে যাবে? মিউ জানতে চাইলো।

হ্যাঁ। আমার মোবাইল নম্বর তোদের কাছে আছে তো? ঐ নম্বরে ফোন করে দিবি খুব দরকার হলে।

গাড়িটা জোরে ছুটছে। এদিকের রাস্তা-ঘাট মোটামুটি ভালো। সামনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। দূরে দূরে ভেড়ি। রাস্তার ধারে ঝাউগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ দেখতে লাগে চারপাশটা। অনেক দূরে আকাশ যেখানে মাটি স্পর্শ করতে চাইছে সেখানে, এই ভর দুপুরে, মেঘের ভেলা যেন পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। তবু আবার...

রাজা বললো, এ থেকে তো প্রমাণ হয় না যে ওদের মাস্টার ব্রেন টাকীতে থাকে আর স্টোরও হয় ওখানেই।

তোর কথায় যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের মানে পুলিশের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা বস্তু আছে। তার খবর, বামাল আর বুদ্ধি দুইই একজনের আর সে থাকে টাকীতে। সেখান থেকেই সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে। যদিও ব্যাপারটার পেছনে আছে কোনো আন্তর্জাতিক চক্র।

এরপর আর বলার কিছু থাকতে পারে না।

হু হু করে গাড়ি ছুটছে। সূর্যদেব পুব আকাশ আলো করে রেখে বেশ খানিকটা ওপর দিকে উঠে পড়েছেন। তাঁর সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দু'পাশে জলা। মাছ চাষ হয় এখানে। গাছে গাছে পাখি। রাস্তা দিব্যি ফাঁকা। বহু আগে এক সময় এই পথ দিয়ে মার্টিন কোম্পানির ছোট ট্রেন যেত। এখন দেখে বোঝার উপায় নেই।

শঙ্করকাকু হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আর ক' বছরের মধ্যে সব বদলে যাবে। এখানে মেগাসিটি হবে।

তাহলে এই জলা, মাছ চাষ, ধানের ক্ষেত, এত গাছ, পাখি এদের কি হবে?

সল্টলেকে যা হয়েছে তাই হবে। হারিয়ে যাবে প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ রূপ। মানুষ বাড়ছে, শহর বড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ সভ্যতা। কাজ বাড়বে আমাদের।

শঙ্করকাকু চুপ করলেন। গাড়িও পৌঁছে গেল টাকী রোডে। রাস্তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়, তেমনি বাস, লরি, গাড়ির ভিড়। বেলেঘাটার ব্রিজ পার হয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো বেড়াচাঁপার দিকে। ওখানে সিঙাড়া আর চা খাওয়া হবে। চন্দ্রকেতুর গড় ওখানেই। মিউরা আগেই দেখেছে। বেড়াচাঁপা থেকে টাকী পৌঁছুতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না। এক ঘণ্টা, বড় জোর সওয়া ঘণ্টা।

বেড়াচাঁপায় চা-টা খেয়ে গাড়িতে ওঠার সময় মিউ বললো, মাম থাকলে এখন মা কালীকে স্যালুট করতে যেত।

স্যালুট? মোমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

বাবু হেসে বললো, বুঝলি না, প্রণাম—প্রণাম। মামী প্রণামকে স্যালুট বলে।

তাই বলে তোমরা বলো না। কিকি গম্ভীর হয়ে বললো।

ফের পাকামি করছিস? মিউ চোখ পাকায়।

কিকি বুয়ার কাঁধ থেকে নেমে কোলে বসে। ওর ধারণা ও যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, ওকেও কেউ দেখতে পাবে না। এখন অবশ্য সত্যি তাই। বুয়া যে ড্রাইভারের পাশে বসেছে।

॥ তিন ॥

ওদের দেখে সতীশদা আকাশ থেকে পড়লো, তোমরা? একটা খবর দিয়ে আসতে হয়।

কেন, অসুবিধেটা কি? শঙ্করকাকু সতীশদার দিকে তাকালেন।

না, তেমন কিছু নয়। মাছ-টাছ নেই তো। তোমরা কী খাবে তাই ভাবছি।

ভাবার কী আছে, পুকুরে জাল ফেলো। আর কিছু না হোক, মাছের ঝোল-ভাত তো হবে।

সতীশদা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, না, না, সে কথা বলছি না। তাছাড়া বেলা তো বেশি হয়নি, একবার বাজারেও ঘুরে আসতে পারি। শুধু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে অসুবিধে হবে না? আমি বরং একবার বাজারটা ঘুরে আসি।

কোনো দরকার নেই। আগে একটু চা খাওয়াও দেখি। চা খেয়ে আমরাও বেরুবো।

কোথায় যাবো শঙ্করকাকু? মিউ-এর জিজ্ঞাসা।

হাসনাবাদে। থানায় গিয়ে ওসির সঙ্গে কথা বলবো। তোদেরও চিনিয়ে দেবো।

উনি তো আমাদের চেনেন।*

না, চেনেন না। তোরা যাঁর কথা ভাবছিস, তিনি বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন ওসি এসেছে। থানার পুরো স্টাফ বদলে ফেলা হয়েছে। কাল বললাম না।

কেন, কেন?

সে কথা বলবো না। ইচ্ছে করেই বলবো না।

আমি বুঝতে পেরেছি। মিউ বললো।

কি বুঝেছিস বল! কিকি আদুরে গলায় বললো।

মিউ কটমট করে কিকির দিকে তাকালো। শঙ্করকাকু হেসে উঠলেন। বললেন, আমরা ব্যাপারটার পেছনে অনেকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছি। সন্দেহ হওয়ায় বাধ্য হয়েই আমাদের হাসনাবাদ থানার পুরো স্টাফ বদলে দেওয়া হয়েছে। তোদের চেনা কাউকেই ওখানে পাবি না। তোদের নিয়ে আমি থানায় যাবো। তোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। দরকার হলে ওদের হেল্প নিতে পারবি। থানায় এসে টেলিফোনও করতে পারবি।

সত্যি? কত দূর...

কত দূর মানে? তোরা অনেকবারই থানায় গেছিস।

হ্যাঁ, তা তো গেছি।

তাহলে?

ওরা কিছু বললো না। শঙ্করকাকুর হিসেব একটু অন্যরকম। সব সময় ওদের মতের সঙ্গে মেলে না। এতক্ষণ গাড়িতে এসে ওরা এখন খুব ক্লান্ত। ভেবেছিল, একটু বিশ্রাম করবে। তা আর হবে না। শঙ্করকাকুর সঙ্গে এখন হাসনাবাদ থানায় যেতে হবে। আসলে শঙ্করকাকু চলে যাবেন তো, যাবার আগে ওদের সঙ্গে ওসির আলাপ করিয়ে দিতে চান। যাতে হঠাৎ দরকার হলে ওসি ওদের হেল্প করতে পারেন। ড্রাগের ব্যাপার, বড় সাঙ্ঘাতিক। বিপদ যে কখন কোথা দিয়ে আসবে কেউ জানে না। অবশ্য বিপদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওদের আছে। তবু পুলিশ পেছনে থাকাটা নিঃসন্দেহে বাড়তি সুবিধে।

হাসনাবাদ থানা থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এলো ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটার ঘর ছুঁয়েছে। হঠাৎ একটা রিকশা মাইকে গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়ালো। গানটা থামিয়ে দিয়ে শুরু হলো ঘোষণা। টাকীর জোড়ামন্দিরের মাঠে বিরাট মেলা বসেছে। সবাই আসুন। যা চান তাই পাবেন সেই মেলায়। ছোটদের জন্যে আছে নানা ধরনের মনোরঞ্জনের উপাদান। এবারের মেলার সব থেকে বড় আকর্ষণ কৃষ্ণনগরের পুতুলের প্রদর্শনী।

পুতুল প্রদর্শনী! তাহলে তো একবার যেতেই হচ্ছে। মিউ লাফিয়ে উঠলো। বললো, বাবুদাদা চলো, আজ বিকেলেই দেখে আসি। পাশেই ছোটমামাদের বাড়ি। খিদে পেলে সেখানে গিয়ে হাজির হলেই হবে।

বাবু বললো, সেই ভালো, আজ বিকেলেই আমরা মেলায় যাবো। পুতুল প্রদর্শনীটা দেখে আসবো। কৃষ্ণনগরে এখন তো যাওয়াই হয় না। বাড়িটাও রামকৃষ্ণ আশ্রম হয়ে গেছে।

মিউ বললো, তাই যাবো।

গাড়ি এসে টাকীতে ওদের বাড়ির সামনে থামলো। ওদের দেখে সতীশদা হেসে বললো, নাও চান-টান করে নাও। আমার রান্না হয়ে গেছে।

কি রাঁধলে? শঙ্করকাকু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, ভিণ্ডির তরকারি, আলু দিয়ে মাছের ঝোল।

বেগুন কোথায় পেলে? কী মাছ ধরলে?

বাগানে অনেক বেগুন, ভিণ্ডি হয়েছে। আর কেজি দুই-আড়াই-এর একটা রুই মাছ ধরেছি।

গুড।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওপরের ঘরে গিয়ে শঙ্করকাকু শুলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন।

একটু পরে ওরা ঘরে এলো। শঙ্করকাকু একটা মোবাইল ফোন মিউ-এর হাতে দিয়ে বললেন, ভাগ্যিস এদের রেঞ্জটা বেড়েছে। তুই তো আমার নম্বরগুলো জানিস। যে কোনো দরকারে

---

*'পাতালঘর রহস্য' দ্রষ্টব্য।

ফোন করতে দেরি করবি না। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজে আসবো, ব্যবস্থাও নেবো।

বাবু বললো, তুমি দু-একটা দিন থেকে গেলে পারতে। আর কিছু না হোক বিশ্রাম তো হতো।

উপায় নেই রে। ইচ্ছে হলো অমনি ছুটি নিলাম কিংবা কামাই করলাম— আমাদের কাজে তা হবে না। তবে এবার আর আমার চিন্তা নেই। তোদের রেখে যাচ্ছি। যা করার এবার তোরাই কর। অ্যাডভেঞ্চার তো তোদের ভালো লাগে। ধরে নে এটা একটা নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার।

নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার?

নিশ্চয়ই। দ্যাখ, তোদের আমি কতটা গুরুত্ব দিই। যে কাজ পুলিশের করার কথা, কিন্তু পারছে না, সেই কাজ করার দায়িত্ব আমি তোদের দিচ্ছি। কেন দিচ্ছি জানিস? তোদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে।

থ্যাঙ্ক ইউ। মিউ আস্তে আস্তে বললো।

আমি আর একটু পরেই চলে যাবো। তোরা কিন্তু একদম সময় নষ্ট করবি না। আজ থেকেই কাজ শুরু করে দে।

মিউ বললো, আমরা তাড়াহুড়ো করে কিচ্ছু করি না। আমাদের কাজ দেখে-শুনে, বাজিয়ে নিয়ে তবেই।

কেন?

তা না করলে আমরা ধড়ে প্রাণ পাই না যে! আমরা যা করি ভেবেচিন্তে করি। রাজার উত্তর।

তোদের কী মনে হয়, পুলিশ যা করে হুট-হাট করে করে? মোটেই না। পুলিশকে বরং আরও বেশি সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়।

শঙ্করকাকুর কথা ওরা একসঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, পুলিশ তো ইচ্ছে হলে যেখানে খুশি যেতে পারে। আমরা পারি না। এটা কম বড় অসুবিধে! উপায় নেই। আমরাও মেনে নিয়েছি।

এই কেসটার কথা ভেবেছিস?

না!

তাহলে কাজ করবি কী করে? শঙ্করকাকু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঠিক সময়ে তুমি খবর পেয়ে যাবে।

আরে, আরে, আমি কী সে কথা বলেছি! আসলে আমার চিন্তা তোদের নিয়ে। তোরা যা ঝুঁকি নিস!

ঝুঁকি না নিলে কিছু হয়—তুমিই বলো।

পুলিশের ওপর নির্ভর কর দেখি। দেখবি সব কেমন সহজ হয়ে যায়।

গোলমালও হয়ে যেতে পারে।

শঙ্করকাকু হেসে ফেললেন, তোদের সঙ্গে সত্যি কথায় পেরে ওঠা যায় না। যাক গে, আমি এবার বেরুবো। তোরা সাবধানে থাকিস। দিনে অন্তত একবার বৌদিকে ফোন করিস।

পড়তে বসবে না? কিকি গলা মোটা করে বলে উঠলো।

আবার পাকামি করছিস?

মামকে বলে দেবো কিন্তু। কিকি উড়ে একটু দূরে গিয়ে বসলো। সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো। শঙ্করকাকু বললেন, তোরা বই-টই এনেছিস নাকি?

পড়ার বই নিয়ে কেউ বেড়াতে আসে। দু' চারটে গল্পের বই আছে।

মিউ-এর কথা শেষ হলো না বাবু বলে উঠলো, এবার আমরা মোটেই বেড়াতে আসিনি। শঙ্করকাকুর কাজ করতে এসেছি।

দোহাই তোদের বেশি কাজ যেন করিস না।

না, না, অল্প অল্প করব...

রাজার বলার ধরনে আবার সবাই হেসে উঠলো।

শঙ্করকাকু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন, আর দেরি করলে কলকাতায় পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে।

হ্যাঁ! পৌঁছে মামকে ফোন করে দিও। মিউ বললো।

সে কথা কী তোকে বলে দিতে হবে? শঙ্করকাকু ঘর থেকে বেরুলেন। ওরাও পেছনে পেছনে চললো। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। শঙ্করকাকু তাতে উঠতে উঠতে বললেন, কোনো ঝুঁকি নিবি না। দরকার হলেই আমায় ফোন করবি। মনে রাখিস ওসি কিন্তু আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। ওর সাহায্য সব সময় পাবি।

ঠিক আছে! মিউ জবাব দিলো।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই ওরা হাত তুললো।

শঙ্করকাকুকে নিয়ে গাড়িটা ছুটে গেল বড় রাস্তার দিকে।

তখন বিকেল। মেঘলা আকাশের ফাঁক গলে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে রাস্তা পেরিয়ে ওদের সদর দরজার ওপর। দরজাটা একটু আগেও বন্ধ ছিল। এখন খোলা। বাতাসে একটা ভিজে ভিজে গন্ধ। গাছ-গাছালির গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে ওদের গায় ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দেয় জলো হাওয়া। একটু পরে সূর্য আরও পশ্চিমে হেলে পড়ে কনে-দেখা আলো ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। রাস্তাটা তখনো ফাঁকা।

মিউ বললো, আজ আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করছে না। চলো ওপরে গিয়ে গল্প করি। বুয়া, তুই সতীশদাকে বলে দে মুড়ির সঙ্গে আমাদের জন্যে যেন বেগুনি, পেঁয়াজি—এইসব ভেজে দেয়।

মোমা বললো, মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা কতদিন খাইনি রে?

একটু পরেই খাবি।

তেলেভাজা—বাড়িতে হবে?

নিশ্চয়! সতীশদা সব জানে।

কী পদের হবে কে জানে।

মোমার কথা শেষ হবার আগেই রাজা বলে উঠলো, খেয়ে দেখে তারপর কথা বলিস।

সতীশদার হাতে তেলেভাজা খাসনি তো, খেলে বুঝতিস! মিউ-এর ছোট্ট জবাব।

রাজা বললো, আজই তো খাবি, তারপর বলিস।

মোমা বুঝতে পারেনি। বললো, ঠিক আছে খেয়ে দেখি।

ওরা দোতলার ঘরে এসে বসলো। বুয়া গেল সতীশদাকে বলতে। মুড়ির সঙ্গে আজ আমরা তেলেভাজা খাবো।

বুয়া চলে গেল। মিউ বললো, তোরা চাইনিজ চেকার খেল না। আমি ততক্ষণে একটু গড়িয়ে নিই।

মিউ বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। বললো, বাবুদাদা কাল সকালে কী করা হবে ভেবে দেখো।

মোমা বলে উঠলো, চল না কাল সকালে সাপদাদুর বাড়ি যাই। সাপগুলো এতদিনে কত বড় হয়ে গেছে কে জানে।

বাবু বললো, ময়ালটা আরও বড় হয়েছে বোধহয়।

ওকে আমি দেখবো না। মোমা বলে।

কেন রে?

আমার ভয় করে।

মোমার কথা শুনে ওরা হো হো করে হেসে উঠলো। মিউ বললো, সত্যি তুই একটা ভিতুর ডিম। সাপটা তো খাঁচার মধ্যে। ওখান থেকে বেরুতেই পারবে না।

মোমা কিছু বললো না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবু বললো, তোর ভয়ের

সাপটা ফণা তুলে দুলতে লাগলো।

কিছু নেই। আমরা তো পাশে থাকবো। অত বড় সাপ দেখলে সত্যিই ভয় লাগে।

এতক্ষণে মোমার মুখে হাসি ফুটলো। সেই মুহূর্তে সতীশদাও চা, মুড়ি আর তেলেভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

॥ চার ॥

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ওরা বেরিয়ে পড়লো। বাজার ছাড়িয়ে দাদুর ডাক্তারখানার সামনে দিয়ে ওরা গিয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ বাড়ির শেষ প্রান্তে। ইছামতী বয়ে চলেছে বাড়িটার গা ছুঁয়ে। মস্ত চওড়া নদী। ওপারে শ্রীপুর। আগে নাম ছিল টাকী শ্রীপুর। বাংলাদেশ। ওদিকে এখন আর যাবার উপায় নেই। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়দের বাড়িটা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে খান সেনারা ভেঙে দিয়েছে। টাকীর দিকে নদী এখনো ভাঙছে। দক্ষিণ বাড়ির পরে দু' দুটো বিশাল বাড়ি ছিল। প্রথমটা আটচালা বাড়ি, দ্বিতীয়টার নাম পুবের বাড়ি। কোনোটাই নেই। জলের তলায় হারিয়ে গেছে। পুবের বাড়ির কাছারিবাড়িটা এখন পুবের বাড়ির নামটা বাঁচিয়ে রেখেছে। দুর্গা পুজো-টুজো সব ওখানেই হয়। নবমীর দিন এখনো মহিষ বলি হয়। কথাটা মনে হতেই মিউ-এর গা শিরশির করে ওঠে। বলে, চলো আমরা স্নেক হাউসে যাই।

বাঁদিকে ঘুরে নদীর ধার ধরে ওরা এগিয়ে যায়। গেস্ট হাউসের সামনে দিয়ে পুরনো বাজার পেছনে ফেলে ওরা সোদপুরের দিকে এগিয়ে যায়। জোড়া-মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা চমকে ওঠে। মন্দিরের পাশের বিশাল মাঠে তাঁবু পড়েছে। একটা নয়, অনেকগুলো। টয় ট্রেন, কাঠের ঘোড়া, চরকি কী নেই। রাজা বললো, মেলা বসবে মনে হচ্ছে।

সে তো দেখাই যাচ্ছে। বাবু গম্ভীরভাবে বললো।

আমরা মেলায় আসবো তো? মোমা জিজ্ঞেস করে।

নিশ্চয় আসবো। মিউ হেসে উত্তর দেয়।

সাপ দেখতে হলে আর দেরি করিস না। তাড়াতাড়ি চল।

তাই চলো। সাপগুলো কত বড় হয়েছে দেখার জন্যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

বাবুর কথা শেষ হলো কি হলো না মিউ বলে উঠলো, তোমার কী সাপ দেখতে খুব ভালো লাগে?

মোটেই না।

তাহলে?

তাহলে আবার কী। তোরা যাচ্ছিস তাই আমিও যাচ্ছি।

ওরা হেসে উঠলো। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ি অবধি যেতে হলো না। তার আগেই বাঁ দিকে ঘুরে ওরা সাপ-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

এইটুকু জায়গা থেকে মানে একই গ্রাম থেকে একসঙ্গে দু' দুজন জেনারেল ছিলেন। কে কে বলো তো? মোমা বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করে।

তুই আর বোকার মতো প্রশ্ন করিস না। এ তো সবাই জানে। মেজমামা জেনারেল দেবপ্রিয় ব্যানার্জি আর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী। ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রাম এক সঙ্গে দুজন জেনারেলকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে উপহার দেবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

আর একটু এগিয়ে একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়ির বাইরে লেখা আছে, স্নেক হাউস। পুরো বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটের দু' দিকে দুজন দারোয়ান। দারোয়ান ভানুপ্রকাশ ওদের চেনে। এর আগে অন্তত বার দশেক ওরা এখানে এসেছে। ওদের দেখে ভানুপ্রকাশ হেসে বললো, ভালো আছো তোমরা, কবে এলে?

গতকাল।

কাল এসেছো আর আজ সকালেই চলে এলে?

ময়াল সাপটা কতো বড় হয়েছে? মোমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

অনেক বড় হয়েছে। যাও না, গিয়ে দেখো। ভানুপ্রকাশ কথা বলতে বলতে গেটটা খুলে দিলো।

ওরা মধ্যে ঢুকে সাপের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পুরো বাড়িটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মধ্যে সবুজ লন। নানারকম ফুলের গাছ। সাপের ঘরের দরজা খোলা। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বিশাল ঘরের চারপাশে ছোট-বড় খাঁচার মতো। সামনেটা

কাচ। অনেকটা আলিপুর চিড়িয়াখানার স্নেক রুমের মতো। সেখানে সাপগুলোর নাম-টাম লেখা আছে। এখানে নেই।

মোমা পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছিলো। রাজা ওকে হিড়হিড় করে টেনে আনলো। মিউ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ময়াল সাপটার কাছে। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় মস্ত বড়। মোমার দিকে ফিরে মিউ বললো, এই সাপটাকে আমরা কত ছোট দেখেছি জানিস?

মোমা উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। মিউ বলে, এইটুকু।

দু' হাত তুলে সাপটার আকার বোঝাবার চেষ্টা করে মিউ।

বাবু গিয়ে পদ্মগোখরোর খাঁচার কাচে টক টক শব্দ করতেই সাপটা ফণা তুলে দুলতে লাগলো।

মিউ চেঁচিয়ে উঠলো, দেখো... দেখো...কী সুন্দর!

সত্যি সুন্দর। ভয়ঙ্করও বটে। সরু লকলকে জিভটা মাঝে মাঝে বের করে ক্রুদ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। তাই দেখে মোমার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বললো, আমার ভয় করছে। তোরা ফিরে যাবি তো চল।

তাই চল। ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো।

ওদের তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ভানুপ্রকাশ বললো, কী হলো, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

এই যে এর জন্যে। ভয় পাচ্ছে। যত বলি, কোনো ভয় নেই। কে শোনে, কার কথা। তাই...

তাহলে আবার এসো।

আসতেই হবে। জানেন তো আমরা সাপ দেখতে কত ভালোবাসি!

তা তো জানি। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবে। যে কোনো সময়।

রাজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, সাপরা খায় কখন? দেখা যায়?

কেন দেখা যাবে না। সাড়ে এগারোটা-বারোটায় এলেই দেখতে পাবে।

সত্যি! বুয়া লাফিয়ে উঠলো।

ভানুপ্রকাশ অবাক হয়ে বুয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন বুয়াকে দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে একদিন ও বেদেদের সঙ্গে ঘুরতো।*

ভানুপ্রকাশ বললো, সাপদের খাওয়া দেখতে কিন্তু মোটেই ভালো লাগবে না।

মিউ বললো, একটা অভিজ্ঞতা তো হবে। সেইটাই বা ছাড়বো কেন।

ঠিক আছে তাহলে কাল পৌনে বারোটার মধ্যে এসে যেও। ঐ সময় আগে ময়ালটাকে খেতে দেওয়া হয়।

কি খায় ওরা?

যা পায় তাই খায়।

তা তো খায়। এখন এখানে কী কী খেতে দেওয়া হয়? মিউ-এর জিজ্ঞাসা।

অনেক রকম। জ্যান্ত খায় ওরা!

বলেন কী! মিউ-এর বিস্ময়।

হ্যাঁ, তাই বলছি তোমাদের একদম ভালো লাগবে না। জ্যান্ত হাঁস, মুরগী— এই সব...

তা হোক আমরা আসবো। একটা এক্সপেরিয়েন্স তো হোক। ভানুপ্রকাশের কথা শেষ হলো না রাজা বলে উঠলো।

স্নেক হাউস থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করলো। মোমার মুখে ক্ষীণ হাসি। বললো, নদীর দিকে যেতে হবে কিন্তু।

সে তো যাবোই।

অত জোর দিয়ে বলিস না। কখন কী হয় বলা তো যায় না।

থাম, ও সব আবার কী কথা! আমরা এখানে এসেছি ছুটির ক'দিন কাটাতে। আমাদের আবার কী হবে।

হঠাৎ বাবু বললো, মিউ একটা লোককে দেখেছিস, আমাদের পেছনে ঘুরঘুর করছে।

হ্যাঁ, আমিও খেয়াল করেছি। নির্ঘাৎ হাসনাবাদ থানার ওসির কাজ। শঙ্করকাকু বলেছিলেন না আমাদের দিকে একটু নজর রাখতে। ব্যস একজনকে পেছনে লাগিয়ে দিয়েছেন।

তার মানে পুলিশের লোক?

তাই তো মনে হয়। পুলিশ যদি হয় তাহলে বলতেই হবে ভীষণ বোকা।

কেন, কেন? রাজার জিজ্ঞাসা।

দেখছো না, আমাদেরই চোখ এড়াতে পারলো না। যাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে তারা যদি বুঝতেই পারে তাহলে আর কী লাভ হলো!

তা ঠিক!

ওরা জোড়ামন্দিরের কাছে এসে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ থেকে মাইকের গান শুনতে পাচ্ছিল। এখন বুঝলো, মেলার মাঠে মাইক বাজছে। জোড়ামন্দিরের সামনে দিয়ে ওরা মেলার মাঠের দিকে যত এগোয় ততই কানে আসে হৈচৈ, চিৎকার, চেঁচামিচি। সেই সঙ্গে নানারকম নির্দেশ বাতাসে ভাসতে থাকে। ওরা মেলার গেটের কাছে এসে দাঁড়ায়। মাঠটা ঘেরা হয়েছে, তবে টিকিট-ফিকিটের ব্যবস্থা নেই। ওরা মেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখনো তেমন ভিড় হয়নি। মেলার মাঠের চেহারা ভাঙা হাটের মতো। চরকি-টরকি সব বন্ধ। হঠাৎ বাবু ফিসফিস করে বললো, লোকটা আমাদের ফলো করে এখানেও এসেছে রে!

মিউ বললো, ও সত্যিই পুলিশের লোক কিনা কী করে বোঝা যায় বলো তো?

ওসিকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া উপায় নেই।

যদি জিজ্ঞেস করতেই হয় তাহলে ওসিকেই তা করবো।

গুড! এই তো চাই।

তার মানে আপাতত কিছু জানা যাবে না। তাই তো?

ওদের অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর করলে, আমার মনে হয়, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কাল সকালেই তাহলে যাবে?

হ্যাঁ, যাবো!

মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখিস।

মেলার মধ্যিখানটায় একটা বড় পুতুল। পেছনে একটু ফাঁকা জায়গা। আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখা গেল একটা বড় গাছের তলায় একটা তাঁবু। তাঁবুটা বেশ বড়। তাঁবুর দরজাটা হাট করে খোলা। ওরা মধ্যে উঁকি দেয়। প্রথমটা ওরা চমকে যায়। সার সার ওরা কারা দাঁড়িয়ে আছে?

বাবু চাপা গলায় বললো, পুতুল মনে হচ্ছে!

পুতুল? এত বড় বড়?

হ্যাঁ, লন্ডনে মাদাম তুসোর ওয়াক্স মিউজিয়ামেও এই রকম বড় বড় মোমের প্রতিমূর্তি করা আছে পৃথিবীর বিখ্যাত সব মানুষদের। মিউ-এর কথা শেষ হলো না রাজা বলে উঠলো, এখানেও তো তাই মনে হচ্ছে।

চল ভেতরে যাই। বাবু গট গট করে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেল।

মধ্যে কেউ নেই। শুধু মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

মিউ এক একটা পুতুলের সামনে যায় আর নিজের মনে বলে ওঠে, এটা নেপোলিয়ন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু,

---

*'কেল্লা রহস্য' দ্রষ্টব্য।

জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, সুনীল গাভাসকার, কুইন এলিজাবেথ...

মোমা মিউ-এর পেছনেই ছিল। বলে উঠলো, কুইনের কত গয়না!

কুইনের গয়না কী বলছিস, নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে দেখ। গলায় মণি, মুক্তা, হীরের হার!

সত্যি তো—এগুলো আসল নাকি?

তুই কী পাগল হলি! সত্যি হতে পারে! সত্যি হলে কী আর জায়গাটা এই রকম অরক্ষিত থাকতো?

তা ঠিক। তবে দারুণ বানিয়েছে। কিসের বল তো?

কে জানে। মাটিরও হতে পারে। দাঁড়া, দাঁড়া—ওখানে কী লেখা আছে চল দেখি।

মিউ আর মোমা গিয়ে দাঁড়ায় গেটের পাশে একটা ছোট বোর্ডের সামনে। একটা লম্বাটে কাগজ সেখানে চিপকানো। মিউ চটপট চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির পালরা মূর্তিগুলো বানিয়েছে। এগুলো বিক্রির জন্যে নয়। শুধু দেখার। বিক্রির মূর্তি-টুর্তি বাইরে আছে।

রাজা নেপোলিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছিল। তাই দেখে মিউ বললো, রাজাদাদা তুমি কী নেপোলিয়ন সাজবে? তোমায় মানাবে কিন্তু। শুধু নেপোলিয়নের গলা বলে কিছু নেই। তোমার আছে। তা না হলে মেকআপ করে দাঁড়ালে কেউ ধরতে পারত না।

বাবু হেসে উঠলো। বললো, স্কুলের থিয়েটারে রাজা একবার নেপোলিয়ন হয়েছিল জানিস না?

তাই বুঝি? মোমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মোমাকে অবাক হতে দেখে ওরা একসঙ্গে হেসে ওঠে। মোমা বিরক্ত হয়ে বলে, হাসছো কেন, হাসির কী হলো?

কিচ্ছু হয়নি। চল এবার বাইরে যাই। বাইরে এসে মিউ বললো, সন্ধ্যে না হলে কী আর মেলা জমে! আলো জ্বলবে। নাগরদোলা দুলবে, টয় ট্রেন পুরো মেলাটা পাক খাবে, পাঁপড়ভাজা, তেলেভাজার গন্ধ বেরুবে। সেইসঙ্গে মানুষের ভিড়ে, কথাবার্তায় মেলাটা গমগম করবে।

তাহলে চল এখন বাড়ি যাই, সন্ধ্যেবেলায় আসবো।

সেই ভালো। আরে আরে লোকটাকে দেখ! বাবু চাপা গলায় বললো।

মিউ বললো, আমাদের পাহারা দিচ্ছে নাকি! এ তো দেখছি আচ্ছা ঝামেলা।

কাল ওসিকে বলবো নাকি কথাটা? বাবু জিজ্ঞেস করে।

মিউ বলে, না না তার দরকার নেই। ও তো আমাদের ডিসটার্ব করছে না। উল্টে ওকে নিয়ে মজা করা যাবে।

ওরা হেসে উঠলো। ওদের হাসতে দেখে একটু দূরে দাঁড়ানো লোকটার মুখেও হাসি খেলে যায়। মোমা চাপা গলায় বলে, লোকটা হাসছে। নির্ঘাৎ আমাদের ওপর নজর রাখছে।

তা তো রাখছেই। মিউ বললো।

কী সর্বনাশ! ও কাদের লোক? গোলমাল হবে না তো? মোমা আঁতকে ওঠে।

হতেও পারে। বাবু গম্ভীর হয়ে বলে।

তাহলে চলো আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। মিছিমিছি এ সব ঝামেলার মধ্যে থাকার কী দরকার!

সত্যি তোর মতো ভিতু আর দ্বিতীয়টা দেখিনি। এতদিন আমাদের সঙ্গে ঘুরছিস, তবু তোর ভয় যাবে না। কোনো মানে হয়! তোর যদি কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে তাহলে চলে যা।

মোমা চুপ করে থাকে। মিউ ভালোভাবেই জানে, মোমা কিছুতেই ফিরে যাবে না! সব সময় শুধু ঘ্যান ঘ্যান করবে। রাজা বললো, চল আর দেরি করে লাভ নেই। পরে আবার আসবো।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন গোটা শহর তোলপাড়। সকলের মুখে এক কথা, জমিদারগিন্নির হীরের নেকলেস চুরি হয়ে গেছে।

সতীশদাই ওদের প্রথম খবরটা দিয়ে বললো, একটা বিয়েতে উনি কলকাতা থেকে এসেছিলেন। জ্ঞাতির বাড়িতে বিয়ে তাই ওঁকে পারিবারিক হীরের নেকলেসটা পরতে হয়েছিল। এটা রায়চৌধুরী বাড়ির নিয়ম। বংশানুক্রমে এই নিয়ম চলছে। বাড়ির বড় বৌ নেকলেসটা পরবেন। তিনি সেটা দিয়ে যাবেন তাঁর বড় ছেলের বৌকে।

ভারী অদ্ভুত তো!

হ্যাঁ! নেকলেসটা ওঁদের কাছে অত্যন্ত শুভ প্রতীক। দাম তো অনেক। তা নিয়ে অবশ্য ওঁরা কোনোদিনই মাথা ঘামাননি।

সতীশদাকে থামিয়ে দিয়ে মিউ বললো, তা চুরি হলো কী ভাবে?

সেইটাই তো রহস্য। বিয়েবাড়িতে অবশ্য একটুখানির জন্যে লোডশেডিং হয়েছিল। ওদের বাড়িতে জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। তাই চট করে আলো এসে গিয়েছিল। তখন কেউ খেয়াল করেনি। খেতে বসার সময় একজনের নজর পড়ে, বড়মার গলায় নেকলেসটা নেই।

তারপর কী হলো?

কী আবার হবে! চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এলো।

কিন্তু কিছু হলো না তাই তো? রাজা হেসে বললো।

হ্যাঁ!

ওসব বড় বড় ব্যাপার। আমাদের মাথা ঘামিয়ে কী হবে। তার চেয়ে চল ঘুরে আসি। বাবু বললো।

সেই ভালো। মিউ-এর কথা শেষ হলো না কিকি এসে ওর কাঁধে বসলো। গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, চলো চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

আবার ওস্তাদি করছিস! মিউ-এর কড়া গলা শুনে কিকি উড়ে গিয়ে বুয়ার কাঁধে বসলো।

ওরা বাইরের দরজা খুলে বেরুতেই পাড়ার কুকুরগুলো লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এসে মিউ-এর সামনে দাঁড়ালো। মিউ রেডি ছিল। হাতের প্যাকেট থেকে বিস্কুট বের করে ওদের দিতে লাগলো। প্রত্যেকের বরাদ্দ দুটো করে বিস্কুট। বিস্কুট দিয়ে মিউ বললো, তোরা এখানেই থাক। পেছন পেছন আসিস না।

ওরা এগিয়ে গেল গ্রিন পার্কের দিকে। ভারী সুন্দর জায়গাটা। সবুজ প্রাঙ্গণ। চারদিকে নানারকম বাহারী ফুলের গাছ। ফুল ফুটে চারপাশটা যেন আলো করে রেখেছে। পার্কের পাশ দিয়ে মাটির রাস্তা। রাস্তার দু' পাশ গাছ-গাছালিতে ভরা। ওখান থেকে নদীর জল দেখা যায় না। উঁচু ভেড়ি আড়াল করে রেখেছে। চারপাশটা যেমন নির্জন তেমনি শান্ত। পাখিরা গান গায়। বুলবুলি নাচে। কাঠঠোকরা ঠকঠক করে তাল দেয়। কাঠবিড়ালী গাছে চড়া-নামার অনুশীলন করে। ওখানে এলে মনে হয়, পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা এখানে, তা এখানেই।

দূর থেকে গ্রিন পার্ক দেখা যাচ্ছে। মিউ চাপা গলায় বললো, বাবুদাদা লোকটা আজও বসে আছে।

মনে হচ্ছে, রোজই এই সময় লোকটা এখানে এসে বসে থাকে।

তাই তো মনে হচ্ছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো, লোকটা সব সময় লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ দেয়, আঁক কাটে।

তোর কী মনে হয়, কিছু লেখে?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। আমার কিন্তু লোকটাকে সুবিধের ঠেকছে না।

কেন, কেন—এ কথা বলছিস কেন? বুড়ো মানুষ। দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখ। প্যান্টটা তালিমারা। শার্টের অবস্থাও তাই। গরিব মানুষ। দেখে মায়া হয়। বাবু মিউ-এর দিকে তাকালো।

মিউ বললো, কেন জানি না আমার ঠিক ভালো লাগে না। শোন বাবুদাদা, আমরা ঐ দিকে যাচ্ছি। তুমি গিয়ে বুড়োর পাশে বসে দেখো ও কী লেখে। নাকি শুধু দাগ কাটে।

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তোরা ওদিক দিয়ে যা। দেখি লোকটার সঙ্গে ভাব করা যায় কিনা।

মিউ, মোমা, বুয়া আর রাজা ওপাশের গেট দিয়ে গ্রিন পার্কে ঢুকলো। বুয়া ছুটে গিয়ে দোলায় উঠে বসতেই কিকি উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসলো। বুয়া দোল খাচ্ছে, মিউ আর মোমা এদিক-ওদিক ঘুরছে। রাজা গিয়ে বসলো বটগাছের চারপাশে বাঁধানো চাতালের ওপর। মিউ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালেও ওর নজর কিন্তু বুড়ো লোকটার পাশে বসা বাবুর ওপর।

বাবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বুড়ো মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে। অপর পক্ষ থেকে কোনো সাড়াই এল না। লোকটা একমনে তার পায়ের পাশের আর সামনের ধুলোর ওপর লাঠি দিয়ে আঁক কাটছে তো কাটছেই। জগৎ-সংসারে আর কেউ আছে বলে লোকটা মনে করে না। শুধু ও আর ওর ঐ দাগ কাটা। বাবু দাগগুলো দেখার চেষ্টা করলো। কিছু বুঝলো না। আরও খানিকক্ষণ বসে থাকার পর বাবুর মনে হলো, এইভাবে বসে থাকাটা অর্থহীন। ও উঠে পড়লো, সোজা চলে এলো মিউ আর মোমা যেখানটায় ঘুরছিল সেখানে। মিউ বললো, কিছু বুঝলে?

না রে। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি যতক্ষণ ছিলাম, ও ধুলোয় লাঠি দিয়ে দাগ কেটেছে আর ধুলো দিয়েই

লোকটা এখানে এসে বসে থাকে।

মুছে দিয়েছে। আমার তো লোকটাকে পাগল পাগল মনে হলো।

হতেও পারে। কেন জানি না, আমার মনে কিন্তু একটা সন্দেহ ঢুকে গেছে।

কি বলতে চাইছিস তুই?

বাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মিউ সত্যজিৎ রায়ের জটায়ুর মতো করে বললো, লোকটাকে দেখছি কাল্‌টিভেট করে দেখতে হবে।

যত খুশি দেখ। কিছু পাবি না।

তা না পাই না পাবো, দেখতে দোষ কোথায়!

কি দেখবি শুনি? লোকটা নিজের মনে শুধু আঁক কাটবে আর তারপর ধুলো দিয়ে বুজিয়ে দেবে। হাজার চেষ্টা করেও লোকটাকে রা কাটাতে পারবি না।

সে আমি জানি। তবু আমার মনে হয়, লোকটার এটা একটা ক্যামোফ্লাজ। যাতে ওর ওপর কারো নজর না পড়ে! কেউ না ওকে সন্দেহ করে।

ঐ বুড়ো মানুষকে কে আর কিসের জন্যেই বা সন্দেহ করতে যাবে শুনি। আমার তো ওকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বাবু হেসে তাকালো মিউ-এর দিকে।

বেলা বাড়ছে। বাড়ছে রোদের তেজ। কিন্তু গাছ-গাছালি, নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাস জায়গাটাকে রীতিমতো ঠাণ্ডা করে রেখেছে। বুয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আজ সাপ দেখতে যাবে?

হ্যাঁ যাবো। দেরি করে যাবো কিন্তু। মিউ বললো।

কেন, দেরি করে যাবে কেন?

সাড়ে এগারোটা-বারোটা নাগাদ গেলে একটা জিনিস দেখতে পাবো।

কী?

সাপদের খাওয়া। ঐ সময় ওদের খেতে দেয়।

তাহলে আমিও যাবো।

তা যাস। এখন বাড়ি গিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে হবে। বাবুদাদা, রাজাদাদা তোমাদের খিদে পায়নি?

পেয়েছে তো।

তাহলে চলো।

ওরা ফেরার পথ ধরে। হঠাৎ বুড়োটার দিকে নজর পড়তেই মিউ চমকে ওঠে। বুড়োর পাশে একটা লোক এসে বসেছে। বুড়োটা হাতের লাঠি দিয়ে ধুলোর ওপর কিছু লিখছে। পাশের লোকটা ঝুঁকে সেটা পড়ছে। হঠাৎ লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে চলতে শুরু করলো। মিউ বলে উঠলো, বাবুদাদা কুইক...

বাবু ছুটে গিয়ে বুড়োর পাশে বসে নিচের দিকে তাকালো। বুড়োটা যা লিখেছিল সেটা লাঠি দিয়ে প্রায় মুছে দিয়েছে। বাবু শুধু একটা অক্ষর পড়তে পারলো 'জু'।

ততোক্ষণে মিউরা এগিয়ে এসেছে। মিউ ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, পড়তে পারলে? বাবু হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে এলো। মিউ জিজ্ঞেস

করলো, কিচ্ছু বুঝতে পারলে না?

না রে, শুধু একটা অক্ষর 'জু' পড়তে পেরেছি। বুড়োটা বাকি সব মুছে দিয়েছে।

দেখলে তো আমার সন্দেহই ঠিক। ঐ বুড়োটা ওদের সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যম। আচ্ছা, বুড়োটা বুঝতে পারেনি তো, তুমি ও যা লিখেছে তা পড়তে গিয়েছিলে?

মনে হয় না। দেখলি না, আমি পায় চোট লাগার ভান করলাম। এখনো দেখ, আমি ইচ্ছে করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। কিন্তু 'জু' কী হতে পারে?

সেইটাই তো ভাবছি।

বাড়ি চলো, 'জু' দিয়ে কী কী শব্দ হয় বের করতে হবে।

বাড়ি ফিরে ওরা অবাক। শঙ্করকাকু সাত সকালে এসে হাজির হয়েছেন। সতীশদা চা করে দিয়েছে, বসে বসে চা খাচ্ছেন। ওদের দেখে বললেন, কোথায় গিয়েছিলি, নদীর ধারে?

না, গ্রিন পার্কে। কিন্তু তুমি এই সাত সকালে কোথা থেকে এলে? এলেই বা কেন?

আর বলিস না! শুনেছিস তো জমিদারগিন্নির হীরের নেকলেস চুরি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সতীশদার কাছে শুনেছি।

ওঁরা আবার পি সির (পুলিশ কমিশনার) আত্মীয়। ব্যস! পি সির নির্দেশ, নেকলেসটা খুঁজে বের করতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দেরি হলেই হীরেগুলো খুলে নিয়ে সোনাটা গলিয়ে ফেলবে। তখন আর কিছুতেই কিছু করা যাবে না। সমস্যাটা বুঝতে পারছিস?

তুমি এখন কী করবে? মিউ জিজ্ঞেস করে।

চা খেয়ে আগে থানায় যাই। দেখি ওরা কতদূর এগিয়েছে। জমিদারগিন্নি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেও যেতে হতে পারে। তারপর অন্য চিন্তা করবো। তোরা বাড়িতে আছিস তো, নাকি কোথাও যাবার প্ল্যান করেছিস?

বেলার দিকে একবার স্নেক হাউসে যাবো।

বেলার দিকে কেন?

ঐ সময় সাপদের খেতে দেয়।

তাই দেখবি, খারাপ লাগবে না?

দেখিই না, কেমন লাগে!

সত্যি তোরা পারিস বটে। শঙ্করকাকু উঠে পড়লেন। শেষ রাত্তিরে কলকাতা থেকে বেরিয়ে এখন এসে পৌঁছেছেন। এক্ষুণি আবার থানায় ছুটতে হচ্ছে। সত্যি পুলিশের চাকরি বড় কষ্টের।

শঙ্করকাকু বেরিয়ে যাবার পর সতীশদা ওদের লুচি আর বেগুনভাজা দিয়ে গেল। মিউ জিজ্ঞেস করলো, শঙ্করকাকু খেলেন না?

না। সময় নেই। থানা থেকে ঘুরে এসে খাবেন বলেছেন। মনে হচ্ছে আজ এখানে থাকবেন।

সত্যি? মিউ খুশি হয়ে ওঠে।

বাবু বলে, মোমা কাগজ-কলম নিয়ে 'জু' দিয়ে কী কী শব্দ হতে পারে লিখে ফেল তো।

তোমরা বলো, আমি লিখছি।

আগে খেয়ে নাও তারপর ঐ সব লেখা-লেখা খেলা খেলো।

লেখা-লেখা খেলা! বাঃ, বেশ বলেছো তো সতীশদা। ওরা হেসে ওঠে।

খাওয়ার পর ওরা দোতলায় উঠে গোল হয়ে বসে। বাবু বলে, 'জু' দিয়ে কী কী শব্দ হয় বল তো রাজা।

কিচ্ছু মাথায় আসছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ জুলু, জুম, জুৎ, জুজুৎসু...আর কী...আর কী...হ্যাঁ, জুবিলি...

না হচ্ছে না। বাবু মাথা নাড়ে। মিউ হাসে।

রাজা বলে, তোরা হাসছিস! শঙ্কর-কাকুকে আমাদের হেল্প করা উচিত নয়?

সেই চেষ্টাই তো করছি।

'জু' দিয়ে কী কী শব্দ হয় তাই দিয়ে নেকলেস চোর ধরবি নাকি?

ধরতেও পারি! মিউ গম্ভীর হয়ে বলে। তুমি বুঝতে পারছো না রাজাদাদা, আমরা ক্লু ধরার চেষ্টা করছি। একটা ব্যাপারে আমি কনফিডেন্ট।

কী?

বুড়োটা ঐ চোরদের চক্রর মধ্যে আছে।

তাহলে তো ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হয়।

এক্ষুণি না। ওর কাছ থেকে আরও খবর বের করতে হবে। বুড়োটা যেন কোনোভাবেই বুঝতে না পারে, আমরা ওকে সন্দেহ করছি।

মিউ-এর কথা শেষ হতে না হতেই বাবু তাড়া দেয়, বল, বল 'জু' দিয়ে আর কী কী শব্দ হয়।

মোমা বলে, একটা বাংলা ডিক্সনারি পেলে ভালো হতো। জু দিয়ে তো জুরাসিক পার্কও হয়।

তা হয়। ওসব না। আচ্ছা এখানে যে সব দোকান দেখেছিস তার নাম বল তো।

নিতাই সুইটস, দিলীপ ড্রাগ স্টোরস, লক্ষ্মী ট্রেডার্স আর...আর...

বুয়া বললো, এখানে একটা গয়নার দোকান আছে—রীতা জুয়েলার্স...

মিউ লাফিয়ে উঠলো, ঠিক বলেছিস —জুয়েলার্সের 'জু'। তার মানে বুঝতে পারছো বাবুদাদা?

প্রথম নেকলেস চুরি তারপর জুয়েলারির দোকানে...

কারেক্ট...

সময় নেই। মনে হচ্ছে আজই... আচ্ছা দোকানটা কত বড়?

রাজা বললো, এই অঞ্চলের সব থেকে বড় দোকান। ওদের খদ্দের বাংলাদেশ থেকেও আসে।

তার মানে হয় নেকলেসটা ওখানে বিক্রি করবে না হলে দোকানে ডাকাতির প্ল্যান করছে ওরা।

ওরা কারা?

সেইটাই তো খুঁজে বের করতে হবে। বুড়োটাকে পুলিশ ধরলে অবশ্য ওদের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

যেতে পারে বলছিস কেন—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

যারা এসব কাজ করে তারা অত বোকা নয়। বুড়োটা বোধহয় ওদের খবর আদান-প্রদানের মাধ্যম। ও কাউকেই তেমনভাবে চেনে না। শুধু লাঠি দিয়ে লিখে লিখে খবরগুলো সাপ্লাই করে। এখন থেকে নজর রাখতে হবে বুড়োটার ওপর। খেয়াল রাখতে হবে ওর পাশে কারা এসে বসে তাদের দিকে।

তা এখন কী করবি? আমাদের কথা তো শুনবে না রীতা জুয়েলার্সের মালিকরা।

অত ভাবার কী আছে, শঙ্করকাকু এসে গেছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করলেই হবে।

তা ঠিক। মিউকে সমর্থন করলো বাবু।

রাজা বললো, ক'টা বেজেছে জানিস, সাপদের খাওয়া দেখতে যাবি না?

তাই তো, চল চল...।

ওরা আর দেরি করলো না। সতীশদাকে বলে বেরিয়ে পড়লো। স্নেক হাউস খুব একটা দূরে নয়। সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল। ওদের ইচ্ছে ময়াল সাপের খাওয়া দেখা।

ওরা ময়াল সাপের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তখনো ওকে খাবার দেওয়া হয়নি। তবে সময় হয়ে গেছে। বুয়া বললো, ঐ দিকটায় চলো, তোমাদের একটা অন্য সাপ দেখাবো।

কি সাপ?

দেখবে চলো।

কোথায়?

ঐ যে পাশের ঘরে।

ওরা পাশের ঘরে এলো। বুয়া গিয়ে দাঁড়ালো একটা ছোট ঘরের সামনে। সামনে মোটা কাচ। যাতে মধ্যেটা ভালোভাবে দেখা যায়। চিড়িয়াখানায় সাপের ঘরে যেমন আছে অনেকটা সেই রকমই। ঘরের মেঝের ওপর একটা কুচকুচে কালো সাপ ঘুরছে। দেখলেই বোঝা যায়, রাগে ফুঁসছে। বুয়া বললো, এটা কী সাপ জানো না তো—কাল-কেউটে।

কালকেউটে!!

হ্যাঁ! কাউকে পরোয়া করে না। তেড়ে গিয়ে কামড়ায়, ভীষণ বিষাক্ত।

হঠাৎ এই সাপটা দেখাতে আনলি কেন রে? বাবু জিজ্ঞেস করে।

বুয়া বললো, এই সাপ নদীর ভেড়িতে অনেক আছে। নদীর ধারে একটু সাবধানে থেকো। সাপটা চিনে গেলে তো?

হ্যাঁ!

চলো, এতক্ষণে নিশ্চয় ময়ালকে খাবার দিয়ে দিয়েছে।

সে কী। তাহলে আসল সময়টাই যে আমরা মিস করে গেলাম। ওরা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে এসে ময়ালের সামনে দাঁড়ায়।

ময়ালটা তখন একটা মুরগি খেতে শুরু করেছে। মুরগিটা একটু আগে তারস্বরে চিৎকার করছিল। এখন আর করছে না। একটু পরেই মুরগিটার আর কিছু দেখা যাবে না। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল। এখন আর তা নেই। নড়ছে না। কিছু খেলে ওরা চুপ করে বসে থাকে। খাঁচার ময়ালটার অবস্থাও অনেকটা সেইরকম।

হঠাৎ মিউ ভীষণভাবে চমকে উঠলো। সাপটার পেটের কাছে কতকগুলো ছোট প্যাকেট। খাওয়ার সময় সাপটা নড়তে পারছে না। মিউ চাপা গলায় বাবুকে ডাকলো, বাবুদাদা দেখো দেখো...ওগুলো কী?

কোনগুলো?

সাপের পেটের তলায়।

হ্যাঁ! ওগুলো কী রে?

মিউ বললো, ভালো করে লক্ষ্য করো?

পলিথিনের ট্রান্সপারেন্ট প্যাকের মধ্যে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু রয়েছে।

মিউ বললো, আর দেরি করো না। এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেন? রাজা জিজ্ঞেস করলো।

আমরা কিছু দেখেছি, ওদের না জানাই ভালো।

ঠিক বলেছিস। চলো, চলো। বাবু তাড়া দিলো।

সাপটা সবে খেতে শুরু করেছে। বুয়া খুঁতখুঁত করে।

মিউ বললো, আর একদিন এসে সাপের খাওয়া দেখা যাবে। এখন চল তো। দেরি করিস না।

ওরা স্নেক হাউস থেকে বেরিয়ে এলো। ওদের দেখে দারোয়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছো?

ক'টা বেজেছে দেখেছো! কারো চান হয়নি। আর দেরি করলে সতীশদা চেঁচামিচি করবে।

ওরা দ্রুত হাঁটছে। রাজা বললো, ল্যাণ্ডবোটটা ঠিক আছে।

কৈ রে?

ঐ যে দ্যাখ না। ও ভাবছে, ওকে আমরা দেখতে পাই না।

একটা মজা করবি?

বাবু বললো, চুপ কর, এখন মজা করার সময় না। শঙ্করকাকুকে সব কথা জানাতে হবে।

মিউ বললো, রাস্তায় কোনো কথা নয়। তাড়াতাড়ি চলো। বাড়ি গিয়ে ঠিক করতে হবে আমরা কী করবো।

এদিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা। দু'চারটে সাইকেল, একটা রিকশা ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। জোড়ামন্দিরের পাশের মাঠে মেলার ওখানটায়ও ভিড় নেই। এই ভরদুপুরে কে আর এখানে আসে। বুয়া জিজ্ঞেস করে, ছোটমাদের বাড়ি কোনটা?

ঐ তো, মন্দিরের পাশ দিয়ে দ্যাখ। পুকুরের ওপাশটায়।

যাবি? ভাই তো মামার বাড়িতে আছে।

মোমাকে থামিয়ে দিয়ে মিউ বললো, এখন আর কোথাও যাবার নাম করিস না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল।

॥ পাঁচ ॥

ওরা চান-টান করে খেতে বসবে বসবে করছে এমন সময় শঙ্করকাকু এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি রে তোদের খাওয়া হয়ে গেছে?

না। এবার খেতে বসবো।

গুড। চল একসঙ্গে বসি।

চলো, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ আছে। মিউ বললো।

খেতে খেতে শুনবো।

মোটেই না। বাবু জোর দিয়ে বললো।

ওখানে সতীশ ছাড়া বাইরের কেউ তো থাকবে না।

জানি। তবু না।

হুম! বুঝতে পারছি। ঠিকই বলেছিস, দেয়ালেরও কান আছে। কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়াই তো বোকামি। চল আগে তো খেয়ে নেওয়া যাক।

ওরা নিচে নেমে এসে খেতে বসে। সতীশদা রেডি ছিল। চটপট খেতে দিয়ে দিলো। ভাত, বেগুনভাজা, ডাল, পোস্তো দিয়ে ঝিঙির তরকারি, বড় বড় ট্যাংরা মাছের ঝোল, আমড়ার চাটনি, বাড়িতে পাতা মিষ্টি দই আর মাখা সন্দেশ।

বাবাঃ, এ যে দেখছি জব্বর খানা। তা দই কোথায় পেলে?

মঙ্গলার দুধ। একটু ঘন করে চিনি দিয়ে কাল পেতে দিয়েছিলাম। সতীশদা লজ্জিত ভাব করে।

তোরা রোজ এইরকম খাচ্ছিস নাকি? শঙ্করকাকু জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ। মিউ হাসে। মাম ফোন করে সতীশদাকে বলে দিয়েছেন।

ওরা কিন্তু একদম পড়ছে না। কিকি যে কখন ঘরে এসে বসেছিল কেউ খেয়াল করেনি। এখানে এসে ওর খুব মজা। গাছে গাছে ঘুরছে।

শঙ্করকাকু হেসে কিকির দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব খারাপ কথা। মামকে বলে দিও!

দেবোই তো। মাম ফোন করলেই বলব।

তুই থামবি! মিউ তাড়া দেয়।

কিকি উড়ে এসে বুয়ার কাঁধে বসে। কিকি এমন পরিষ্কার কথা বলে যে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে ওটা একটা কাকাতুয়ার গলা। আসলে ও যে কথাটা শোনে ঠিক মনে রেখে পরে জায়গা বুঝে বলে দেয়। তাই গোপন আলোচনার সময় ওরা কিকিকে সরিয়ে

দেয়। সেবার ওরা যখন টানেলের* মধ্যে বন্দী ছিল, সেখানকার প্রত্যেকটা ঘটনার কথা ও পরে মামকে বলেছিল। তাই শুনে মামের কী রাগ! ওদের আর বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে দিতে চান না। খুঁতখুঁত করেন, আবার কোথাও গিয়ে না ওরা গোলমাল পাকায়।

খাওয়ার পর ওরা ওপরের ঘরে এসে বসলো। বুয়া নিচে আছে। কিকিও। শঙ্করকাকু জিজ্ঞেস করলেন, কি বলবি বল।

মিউ আস্তে আস্তে বললো, তোমার একটা হেডেক মনে হয় কমতে চলেছে।

কি বলতে চাইছিস খুলে বল না।

হেরোইন কোথায় লুকিয়ে রাখা হয় তা বোধহয় জানা গেছে।

কী বলছিস! সত্যি! কোথায়, কোথায়? শঙ্করকাকু উত্তেজনার চোটে উঠে দাঁড়ালেন।

স্নেক হাউসে! মিউ গম্ভীরভাবে বললো।

মানে?

বড় সাপগুলো—ঐ যে ময়াল, চন্দ্রবোড়া—এরা তো কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে?

তাতে কী?

সাপের কাছে কেউ ঘেঁষবে না। সন্দেহও করবে না। হেরোইনের প্যাকেটগুলো বড় সাপগুলোর পেটের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়। সাপদের যখন খেতে দেওয়া হয় তখন কাউকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। আমরা ক'দিন ধরে বলে বলে আজ দুপুরে সাপদের খাওয়া দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ময়াল সাপের পেটের তলায় অনেকগুলো প্যাকেট দেখতে পেয়েছি।

প্যাকেটগুলো কত বড় আর কী রকম দেখতে খেয়াল করেছিস তো?

প্যাকেটগুলো পোস্টকার্ডের মাপের হবে। মধ্যে সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো কিছু যে আছে তা আমরা স্পষ্ট দেখেছি।

তাহলে তো এক্ষুণি ওখানে রেড করতে হয়। আমি ফোর্স পাঠাতে বলছি। আচ্ছা কতক্ষণ আগে দেখেছিস?

ঘণ্টাখানেক আগে হবে।

তার মানে এখনো সরাতে পারেনি। হাতেনাতে ধরতে পারবো।

তা হয়তো পারবে তাহলে কিন্তু তোমার নেকলেস রহস্যের সমাধান হবে না।

কেন, কেন?

আমাদের মনে হয় গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে একটাই দল জড়িয়ে আছে। ওরা অ্যালার্ট হয়ে যাবে। রীতা জুয়েলার্সে ওরা ডাকাতির প্ল্যান করেছে সেটাও ক্যানসেল করে দেবে।

রীতা জুয়েলার্সে ডাকাতি হবে! তোরা কী করে জানলি?

মিউ সব কথা খুলে বলে বললো, এবার দুয়ে দুয়ে চার করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুয়ে দুয়ে কী চার করবি শুনি। তোদের কথাবার্তা কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। শঙ্করকাকুকে অসহিষ্ণু দেখায়।

বাবু তখন পার্কের পাশে বসে থাকা বুড়োটার কথা সব বললো। বুড়োটা যে লাঠি দিয়ে ধুলোর ওপর আঁক কেটে খবর দেওয়া-নেওয়া করে সে কথাও বললো।

বুড়োটাকে অ্যারেস্ট করলেই তো হয়। তারপর ওর পেট থেকে সবকটা নাম বের করে নেওয়া কঠিন হবে না।

কিন্তু পাখি তো ততক্ষণে বাংলাদেশে পালিয়ে যাবে। তোমার নেকলেসও যাবে। আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন পুলিশ কমিশনারকে কী কৈফিয়ত দেবে শুনি!

শঙ্করকাকু মাথা নাড়লেন, তোদের কথার যুক্তি আছে। তাহলে কী করতে বলিস?

আর দু' চারটে দিন অপেক্ষা করো। ওরা যেন কোনোভাবেই জানতে না পারে যে আমরা হেরোইন লুকিয়ে রাখার জায়গার খোঁজ পেয়েছি।

তোদের কথা শুনে শেষকালে আপসোস করতে হবে না তো!

মনে তো হয় না! একটু ঝুঁকি নেওয়াই যাক না!

ঠিক আছে তোরা যখন বলছিস। আমি ফোর্স রেডি করতে বলি। তোরা বললেই অ্যাকশান শুরু হয়ে যাবে।

শঙ্করকাকু চিন্তিত মুখে বসেছিলেন। মিউদের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। স্নেক হাউসে হানা দিয়ে শুধু বাড়ির মালিককে পাওয়া যাবে, কিছু হেরোইন উদ্ধার হবে। তার বেশি আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আর ঐ বুড়োটাকে ধরা যেতে পারে। এদের তো আর কাউকে ধরা যাবে না। ফলে চক্রটা অটুট রয়ে যাবে। শুধু হয়তো জায়গা বদল হবে। শঙ্করকাকু বললেন, তোরা ঠিকই বলেছিস, আমাদের কাজ মনে হচ্ছে সুদূরপরাহত।

আমার তা মনে হয় না।

কেন?

একসঙ্গে দু' দুটো রহস্যভেদ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। একটু সময় তো লাগবেই।

তাহলে আমায় এখন কী করতে হবে? শঙ্করকাকু মিউ-এর দিকে তাকালেন।

মিউও গম্ভীর হয়ে বললো, আজ রাত্তিরে রীতা জুয়েলার্সে ডাকাতি করতে আসা ডাকাতগুলোকে আগে ধরো তো দেখি।

কারেক্ট! আমি এক্ষুণি হাসনাবাদ থানায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। দেখি রাত্তিরে কী হয়।

'জু' দিয়ে নিশ্চয়ই জুরাসিক পার্ক, জুলু, জুজু—এ সব হবে না। জুয়েলার্স হওয়াই স্বাভাবিক। তাই না?

নিশ্চয়ই। শঙ্করকাকু উঠে দাঁড়ালেন। একটু থেমে বললেন, তোরা আজ আর নদীর ধার ছাড়া কোথাও যাস না।

কেন?

তোদের ওপর যাতে কারো সন্দেহ না হয়।

বুড়োটার হবে না বলছো! মিউ বলে।

মনে হয় না। তোরা রোজ গ্রিন পার্কে যাস। বুড়োর পাশে গিয়ে বসিস।

তা ঠিক। বুড়োর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করেছিলাম। ও অবশ্য কারো সঙ্গে কথা বলে না। সব সময় বসে বসে লাঠি দিয়ে পায়ের কাছে ধুলোর ওপর দাগ কাটে।

তোরা বিশ্রাম কর। আমি থানায় যাচ্ছি। রাত্তিরের ব্যাপারটা তো আছে।

আমরা হেল্প করতে পারি না? বাবু জিজ্ঞেস করলো।

কি হেল্প করবি? আগে থানায় গিয়ে প্ল্যান করি। দরকার হলে জানাবো। যেখানেই যাস মোবাইলটা সঙ্গে রাখিস।

সে তো থাকেই।

শঙ্করকাকু বেরিয়ে গেলেন। মিউ বললো, বাবুদাদা আমরা কি আজ ওদের কোনো কাজে লাগতে পারি?

আগে দ্যাখ সোনার দোকানে সত্যি সত্যি ডাকাতি হয় কিনা। আমরা সেখানে থেকে কী করবো। ওদের হাতে পিস্তল, বোমা থাকবে। আমরা আগেভাগে খবরটা

---

*'বাতিঘর রহস্য' দ্রষ্টব্য।

জানিয়ে দিয়েছি। পুলিশ এবার যা করার করুক।

এখানে একটা অ্যাকশান হবে, আমরা সেখানে থাকবো না—ঠিক মানতে পারছি না। মিউ খুঁতখুঁত করে।

শোন বুড়োটা বা স্নেক হাউসের কেউ যেন আমাদের সন্দেহের চোখে না দেখে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

সে তো বটেই। ওদের যদি একবার সন্দেহ হয় তাহলে সব প্ল্যান আপসেট হয়ে যাবে। শঙ্করকাকু চেয়েছিলেন 'হেরোইন'-এর খোঁজ। আমরা তা দিয়েছি। এরপর আমরা ঐ নেকলেসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। ওসব ডাকাতি-টাকাতির মধ্যে আমাদের না থাকাই ভালো। বাবু চাপা গলায় মিউকে বললো।

তাহলে আজ বিকেলে আমাদের গ্রিন পার্কে যাওয়া উচিত। আমাদের মধ্যে অন্তত একজনকে খানিকক্ষণ বুড়োর পাশে বসতে হবে। কাল রাজাদাদা বসেছিল। আজও তাই বসা উচিত। কালকের মতো আজও রাজাদাদার শরীরটা ভালো থাকবে না। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে বসবে।

ঠিক তাই করতে হবে। রাজাকে বলে দিচ্ছি। আমরা কিন্তু বিকেল হলেই বেরুবো। বাবু বললো।

মিউ বললো, রাজাদাদা বুড়োর পাশে বসে খেয়াল রাখবে বুড়ো কিছু লেখে কিনা। বুড়ো যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে, তুমি ওর লাঠির আঁক কাটার দিকে নজর রাখছো। বুড়োটা যদি কিছু লেখে ভালো। না লিখলেও ক্ষতি নেই। আমাদের অবশ্যই বুড়োটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

বুড়োটা কোথায় থাকে খুঁজে বের করতে পারলে ভালো হতো। বাবু বলে।

ফলো করলে হয় না? রাজার জিজ্ঞাসা।

একদম না। ওকে ফলো করলেই আমরা ঐ দুষ্টচক্রের চোখে পড়ে যাবো। আমাদের সন্দেহ করলেও ওরা সিওর হতে পারবে না।

ঠিক বলেছিস মিউ। বাবু মিউকে সমর্থন করে।

বিকেলবেলায় ওরা নদীর ধারে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ভেড়ির ওপর দিয়ে চলে এলো গ্রিন পার্কে। রোদ পড়ে গেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। শ্মশানঘাটের বাঁশগাছের পাতায় পাতায় ঝির-ঝিরে শব্দ ওঠে। গ্রিন পার্কে ঢুকেই ওরা দেখলো, পার্কের বাইরে বেঞ্চির ওপর বুড়োটা বসে আছে মাথা নিচু করে। হাতের লাঠি দিয়ে পায়ের কাছে ধুলোর ওপর আঁক কাটছে। সত্যি ও নিজের মনে আঁক কাটে না সংবাদ আদান-প্রদান করে তার প্রমাণ আজ রাত্তিরেই। রীতা জুয়েলার্সে ডাকাত পড়লে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না যে দুষ্টচক্রের সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যম ঐ বুড়োটাই। তখন শঙ্করকাকু বুড়োর সম্বন্ধে যা ঠিক করবেন তাই হবে।

ওরা কথা বলতে বলতে ওপাশের গেটের কাছে চলে এলো। প্ল্যান মতো বাবু জোরে জোরে বললো, এই রাজা তোর কষ্ট হলে ঐ বেঞ্চিটায় গিয়ে বসে একটু রেস্ট নিয়ে নে।

হ্যাঁরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে আসছি। তোরা এগিয়ে যা।

তোকে ফেলে আর কোথায় যাবো। আমরা পার্কের মধ্যেই আছি। একটু বিশ্রাম নিয়ে চলে আয়।

ঠিক আছে। রাজা এগিয়ে গিয়ে বুড়োর পাশে বসে পড়লো। বুড়ো ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। রাজা বসে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। কায়দা করে দেখার চেষ্টা করলো বুড়ো কিছু লিখেছে কিনা। না, আজ আর কোনো শব্দ-টব্দ লেখা নেই। শুধু দাগ কাটা। রাজা ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো, কিছু লিখে তারপর হিজিবিজি কেটে সেটা অপাঠ্য করে তোলার চেষ্টা আর কী। না সেরকম কিছু আজ নেই। রাজা ভালো করে বুড়োটাকে লক্ষ্য করে। পরনের স্যুটটা খুব পুরনো। দু' এক জায়গায় একটু ছিঁড়েও গেছে। রিপু করা। মুখে ক'দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় মান্ধাতা আমলের সোলার হ্যাট। লোকটা একবারের জন্যেও মাথা তুললো না।

আধঘণ্টাখানেক বসে রাজা উঠে আবার পার্কে চলে এলো। মিউ, মোমা, বাবুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দিকে মুখ করে। হাসনাবাদের ওপাশে চালকলের চিমনির পাশ দিয়ে সূর্য পাটে বসেছে। লাল হয়ে আছে আকাশ। সাদাটে মেঘের মাথা ছুঁয়েছে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা। দেখার মতো সে দৃশ্য। ওরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজা এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। বাবু জিজ্ঞেস করলো, কিছু দেখতে পেলি? কোনো নাম-টাম?

না। নিজের মনে লাঠি দিয়ে শুধু দাগ কেটেই চলেছে বুড়োটা। লিখছে না কিছুই। শুধু আঁকি-বুকি কাটছে।

কেউ এসে তো ওর পাশে বসেওনি আজ? মিউ জিজ্ঞেস করলো।

আমি যতক্ষণ ছিলাম, কেউ আসেনি। আগে কেউ এসেছে কিনা জানি না। রাজা হাসলো।

না আসেনি। আজ কোনো খবর পাচার করার নেই। যে খবর ছিল কাল সে তো দেওয়া হয়ে গেছে।

তুমি কি করে জানলে, আজ কেউ এসে বুড়োর পাশে বসেনি? মিউ বাবুর দিকে তাকালো।

বুড়োর খবরের ভিত্তিতেই তো আজ রীতা জুয়েলার্সে ডাকাত ধরার ফাঁদ পাতা হয়েছে।

মিউ ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে চুপ করার ইশারা করলো। বললো, এসব কথা উচ্চারণ করতে নেই।

বাবু বললো, শঙ্করকাকুর ফোন যখন এলো না তখন নিশ্চয়ই আজ আর আমাদের কিছু করতে হবে না।

মনে তো হয় তাই। রাজা বললো।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। দূর থেকে ভেসে আসে শাঁখের শব্দ। সন্ধ্যেবেলায় এখানে সব বাড়িতে শাঁখ বাজে। কোনো কোনো বাড়িতে তুলসীতলায় প্রদীপও জ্বালা হয়।

ওরা উঠে দাঁড়ায়। এবার ফিরে যেতে হবে। পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ওরা মান সিং রোডে পড়লো। মোগল সেনাপতি মান সিং এই রাস্তা দিয়ে সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিলেন যশোররাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তাই এই রাস্তার নাম—মান সিং রোড।

বুড়োটা সেইভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে। আর হাতের লাঠিটা দিয়ে ধুলোর ওপর 'আঁক' কাটছে। বুড়োর পাশ দিয়ে ওরা ভন্টেদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মিউ চাপা গলায় বললো, চুপ চুপ—কোনো কথা নয়।

রাজা বললো, ঐ দ্যাখ—ও কিন্তু সব সময় আমাদের পেছনে আছে।

সত্যি বিচ্ছিরি ব্যাপার। কেন যে শঙ্করকাকু এই কাণ্ডটা করলো। ওর জন্যে আমাদের কাজের অসুবিধে হচ্ছে।

ওকে নিয়ে মজা করাও তো হচ্ছে। অস্বীকার করতে পারবে না।

তা অবশ্য ঠিক। তাহলে?

তাহলে আবার কী। যে ক'দিন আছি, ঐ কষ্টটা না হয় সঙ্গে থাকলো।

শেষ বিকেলের কনে-দেখা আলোটা মিষ্টি হলেও বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায়। এই সময়টা কলকাতায় ব্যস্ততার মধ্যে হারিয়ে যায়, চোখেও পড়ে না। এখানে কিন্তু না দেখে উপায় নেই। আলো কমে আসছে ধীরে ধীরে। অন্ধকার এখনই হবে। ওরা দ্রুত হাঁটে। শঙ্করকাকুর ফোনের জন্যে অবশ্য চিন্তা নেই। মোবাইলটা তো সঙ্গেই আছে। কিছু বলার থাকলে বা কোনো নির্দেশ থাকলে শঙ্করকাকুর ফোন এতক্ষণ এসে যেত। ওরা বুঝেছে, ফোন আর আসবে না।

॥ ছয় ॥

শঙ্করকাকু ফিরলেন পরদিন ভোর-বেলায়। বাবু ছাদে ঘুরছিল। অন্যরা তখনো ঘুমোচ্ছে। শঙ্করকাকুকে জিপ থেকে নামতে দেখেই বাবু নিচে নেমে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। বাবুকে দেখে শঙ্করকাকু হেসে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

ধন্যবাদ কেন?

কেন আবার, তোমাদের কথামতো আমরা রীতা জুয়েলার্সে ফাঁদ পেতেছিলাম। সেই ফাঁদে পা দিয়েছে ওরা। পুরো ডাকাত দলটাকেই ধরে ফেলেছি আমরা। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু...

কিন্তু কি?

ওদের কাছ থেকে নেকলেসের কোনো হদিস পেলাম না।

অতো সহজে মেলে নাকি।

তার মানে?

উঁহু, এখন আর কোনো কথা নয়। মুখ-হাত ধুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। তারপরে আলোচনা করা যাবে।

তা যা বলেছিস। যেমন ক্লান্ত লাগছে তেমনি ঘুমও পাচ্ছে।

শঙ্করকাকু মুখটুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বাবু বললো, আর একটু পরেই আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যাবো। ঘণ্টা দু-তিন পরে তোমায় তুলে দেবো কেমন?

সেই ভালো। শঙ্করকাকু চোখ বন্ধ করলেন। বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছাদের পুব দিকটায় তাকালো। সূর্যদেব উঠি উঠি করছেন। রাতের তারারা শেষবারের মতো পৃথিবীকে দেখে নিয়ে একে একে চোখ বুজছে। অন্ধকারও দ্রুত পাততাড়ি গুটিয়ে তারাদের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে। বারো ঘণ্টার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম তাদের।

বাবু আর দেরি করলো না। তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। বললো, চল নদীর ধারে যাই।

মিউ মুখ ধুয়ে আসতেই বাবু বললো, শঙ্করকাকু ফিরে এসেছেন। আমাদের সন্দেহ ঠিক।

মানে?

বুড়োটা সত্যিই ওদের দলের। ওর মাধ্যমে খবর আদান-প্রদান হয়।

তার মানে কাল রাত্তিরে রীতা জুয়েলার্সে ডাকাত পড়েছিল। আর শঙ্করকাকুরা তাদের ধরেছেন?

ঠিক তাই।

আমাদের আরও কেয়ারফুল হতে হবে বুঝেছো! এবার ওরা আমাদের সন্দেহ করবে। শঙ্করকাকু এখানে এসে ওদের সন্দেহটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ক'জন ডাকাত ধরা পড়েছে?

শঙ্করকাকু ডিটেলসে কিছু বলেননি। শুধু বলেছেন, ডাকাত দল ধরা পড়েছে। আর নেকলেসের কোনো খোঁজ ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ওদিকে সেটা উদ্ধার করতেই তো শঙ্করকাকুরা মরিয়া।

নেকলেসটা যদি ঐ দলটা চুরি করে থাকে তাহলে এখনই ওটা এখান থেকে পাচার করে দেবার চেষ্টা করবে।

কেন?

দেখছিস না ওদের বেশির ভাগ সদস্য ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তো পুলিশের জেরার কাছে মুখ খুলে বসতে পারে। তখন? তাছাড়া ঐ নেকলেসের দাম রীতা জুয়েলার্সের মতো এখানকার দোকান দিতে পারবে না। পারলেও ওদের কাছে গিয়ে বিক্রি করাটা ডাকাতদের কাছে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই ওটা ওরা পাচার করবেই।

সবাই তো কাল ধরা পড়ে গেছে। কে তাহলে ওসব কাজ করবে?

মিউ বললো, সবাই কী ধরা পড়তে পারে? দু' চারজন নিশ্চয়ই বাইরে আছে। স্নেক হাউসের ওরা এর মধ্যে আছে কিনা কে জানে। থাকলে কিন্তু আমি অবাক হবো না।

চিন্তিত মুখে বাবু বললো, তোর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। আমাদের এখন কী করা উচিত?

বুড়োটার ওপর নজর রাখতে হবে। চলো দেখি, ও এসেছে কিনা।

এতো ভোরে কি আর আসতে পারে?

দেখাই যাক না।

ওরা তাড়াতাড়ি গ্রিন পার্কের দিকে এগিয়ে গেল। পশ্চিমদিকে গেটের বাইরে বেঞ্চিটা ফাঁকা। বুড়ো তখনও আসেনি। মিউ বললো, রাজাদাদা রেডি থেকো। বুড়ো এলেই তোমার ডিউটি শুরু। তোমার শরীর ভালো নেই। আমাদের মতো হাঁটতে পারছো না। তাই বারবার গিয়ে বেঞ্চিটায় বসে বিশ্রাম করতে হবে। তোমায় একটু পরিশ্রম করতে হবে।

ওরা প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত গ্রিন পার্কে ঘোরাঘুরি করলো। বুড়ো মানুষটাকে দেখতে পেল না। কোনোদিন তো এরকম হয় না। সূর্য ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ো এসে বেঞ্চিতে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়ে। আজ কিন্তু এলো না। মিউ বললো, ওর না আসাটাই স্বাভাবিক।

কেন, কেন?

ওদের দলের কয়েকজন কাল রাত্তিরে ধরা পড়েছে না! পুলিশ খবরটা পেল কোথা থেকে? পুলিশ দলে শঙ্করকাকু ছিলেন। তার মানে...বুঝতে পারছিস তো?

হ্যাঁ, খবরটা লিক হওয়ার পেছনে বুড়োর পাশাপাশি আমরাও ঐ দুষ্টচক্রের নজরে পড়ে গেছি।

গেছি তো গেছি। চলো এখন বাড়ি যাই। সাপদের লাঞ্চের আগে স্নেক হাউসে পৌঁছতে হবে না!

ওরা আর দেরি করলো না। বাড়ি ফিরে এল। শঙ্করকাকু উঠে পড়েছিলেন। বসেছিলেন একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারবেন বলে। সতীশদার ব্রেকফাস্টে সেই লুচি, বেগুনভাজা আর সন্দেশ। আজ আবার অতিরিক্ত হিসেবে আছে বড় বড় পারশে মাছ কড়া করে ভাজা। কালীদির মাছ ভাজা এত সুন্দর যে কাঁটাসুদ্ধু চিবিয়ে খেয়ে নেওয়া যায়।

খেতে খেতে শঙ্করকাকু বললেন, স্নেক হাউসের ওপর নজর রাখা হয়েছে। ওখান থেকে কিছুই পাচার হয়নি। তোদের খবরের ওপর ভিত্তি করে আজ কিন্তু ওখানে হানা দেওয়া হবে।

কখন?

সওয়া বারোটা নাগাদ।

কোনো অসুবিধে নেই। আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ সাপদের লাঞ্চ খাওয়া

দেখতে যাবো।

হ্যাঁ, আজই দেখে নে। আর দেখতে পাবি না।

কেন?

তোদের খবর সত্যি হলে আমরা তো স্নেক হাউস সিল করে দেবো। কলকাতায় খবর দেবো, চিড়িয়াখানা থেকে লোক এসে সাপগুলোকে নিয়ে যাবে।

ষাঃ, এখানকার একটা দর্শনীয় জিনিস নষ্ট হয়ে গেল।

হবেই তো। কথায় বলে না, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

তা তোরা কাল ঠিক দেখেছিলি তো? শঙ্করকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ। হানড্রেড পারসেন্ট সিওর।

তোরা কটার সময় যাবি? সাড়ে এগারোটা তো? বারোটার মধ্যে বেরিয়ে আসবি কিন্তু।

কেন, তোমরা বারোটার সময়...

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। তাই হবে।

বাড়িটার ওপর অবশ্য নজর রাখা হয়েছে। পুলিশের লোক চারপাশে ছড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে কেউ বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লেগে যাবে। আলটিমেটলি তাকে ধরে থানায় নিয়ে আসবে।

ওসব কথা আমাদের না জানাই ভালো।

হ্যাঁ, তোরা কিচ্ছু জানিস না। সাপের খাওয়া কোনোদিন ভালো করে দেখিসনি। তাই দেখতে গেছিস।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওরা স্নেক হাউসে এল। এই সময় গেট বন্ধ হয়ে যায়। ওদের দেখে দারোয়ান হেসে বললো, তোমরা আজও এসেছো। কাল তো দেখে গেলে।

বারে কাল বলে গেলাম না যে ভালো করে দেখা হলো না, আবার আসবো!

ও হ্যাঁ, তাই তো, ভুলে গিয়েছিলাম। আজ কিন্তু বেশিক্ষণ থেকো না।

কেন, কী হয়েছে?

তা জানি না। কর্তাদের মেজাজ খুব খারাপ। তোমাদের দেখে ক্ষেপে না যায়! দেরি কোরো না, দেখা হলেই চলে এসো।

ঠিক আছে, আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বাবুর ঠোঁটের তলায় চাপা হাসি। সাপের

কুইক কালু, ধর ওদের।

ঘরগুলোর দিকে এগোতে এগোতে মিউ আস্তে আস্তে বললো, মেজাজ কেন খারাপ বুঝতে পেরেছো তো?

সে আর বলতে! কাল রাত্তিরে অতগুলো লোক ধরা পড়েছে। পুলিশ ওদের মুখ থেকে ঠিক স্নেক হাউসে স্মাগলিং-এর খবর জেনে যাবে।

শঙ্করকাকুর খবর, ওরা এখনো মাল পাচার করে দেয়নি। তবে যে কোনো মুহূর্তে করতে পারে।

করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। শঙ্করকাকুর লোকজন গোটা বাড়িটা একরকম ঘিরে রেখেছে। ওদের অবশ্য কেউ দেখতে পাবে না।

বাবুর কথা শেষ হলো কী হলো না মিউ চাপা গলায় বললো, এরা ভাবতেও পারছে না, খবু অল্প সময়ের মধ্যে এখানে কী ঘটতে চলেছে।

কিকি আজ জোর করে ওদের সঙ্গে এসেছে। বুয়ার কাঁধে সে ভালো ছেলের মতো বসে আছে। মিউ বললো, ওকে নিয়ে সাপদের ঘরে যাবি?

তাতে কী! ও কিচ্ছু করবে না।

তা জানি, তবু মনটা খুঁতখুঁত করছে।

বুয়া বললো, তুমি ভেবো না। আমি কিকিকে ধরে রাখবো।

ওরা গিয়ে সাপের ঘরে ঢুকলো। তিন নম্বর ঘরটায় ময়াল সাপটা থাকে। কুণ্ডলী পাকানো থাকলেও ওরা চোখ খুলে দেখতে পারে। কিকিকে দেখে সাপটা জুলজুল করে একবার তাকালো। এদিকে সাপ ওদিকে সাপ—দেখে কিকি ছটফট করে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে, ভালো লাগছে না। বাইরে চলো।

মিউ গম্ভীর হয়ে বললো, তোকে বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম। কথাটা তো তখন কানে যায়নি। এবার বোঝ কেন বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম।

কিকি চুপ করে বসে থাকে। ভয়ের চোটে নড়ে না পর্যন্ত।

ময়াল সাপটা আর কুণ্ডলী পাকিয়ে নেই। জালের মাঝে মুখ এনে কিকির দিকে তাকিয়ে আছে। কিকি সাপটার দিকে আর তাকাচ্ছে না। ওকে দেখলেই

এখন বোঝা যাচ্ছে যে ও কতটা ভয় পেয়েছে। বুয়া বললো, আমি ওকে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবো?

ব্যাপারটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না। যা দেখার, দেখে নিয়েছি। ময়াল সাপটার পেটের তলায় অনেকগুলো প্যাকেট, কালকের চেয়েও বেশি রয়েছে।

ওরা আর দেরি করলো না। বেরিয়ে এলো। দ্রুত এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

ওরা বন্ধ গেটের কাছে পৌঁছেছে কী পৌঁছয়নি ওপর থেকে কড়া গলায় কেউ বলে উঠলো, তোমরা ওখানে কী করছো? কে ঢুকতে দিয়েছে তোমাদের?

বস্‌, সেই ছেলেমেয়েগুলো। কালও এসেছিল।

কুইক কালু, ধর ওদের।

কথার মধ্যে বাবু ছুটে গিয়ে গেটে ধাক্কা দিতেই গেট খুলে গেল। ওরা ছুটে বাইরে চলে এলো। গেটও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। খুশি হয়ে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখলো, ওখানে আর কেউ না—শঙ্করকাকু দাঁড়িয়ে। শঙ্করকাকু বললেন, চটপট গাছপালার আড়ালে চলে যা। বি কেয়ারফুল গুলি চলতে পারে। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়েছে। কেউ পালাতে পারবে না।

দারোয়ান কোথায় গেল?

সে হাতে হ্যান্ডকাফ পরে দূরে পুলিশের গাড়িতে বসে আছে। যা তোরা পালা।

ক'জন ছুটে এসে গেটে ধাক্কা দিতে দিতে দারোয়ানের নাম ধরে ডেকে গেট খুলে দিতে বললো।

গেটের দু'পাশে সাত-আটজন পুলিশ ঘাপটি মেরে বসে আছে। শঙ্করকাকু নিজেই গেট খুলে একটা পাল্লার সঙ্গে পেছন দিকে সরে গেলেন।

কোথায় গেল বিচ্ছুগুলো? ওদের ছাড়া চলবে না। চারপাশটা খুঁজে দেখো।

তা আর হলো না। দু-তিন পা যেতে না যেতেই কালু কিসে যেন পা আটকে দুম করে আছাড় খেলো। সেই মুহূর্তে আর একজন পুলিশ তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে কব্জা করে ফেললো। দুজনের হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিলো আর একটি পুলিশ। শঙ্করকাকু চিৎকার করে উঠলেন, গেট ইনসাইড। সার্চ করো সব জায়গায়। ময়াল সাপের ঘরটা ভালো করে দেখতে হবে।

জনা পনেরো পুলিশ দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। বাড়ির মধ্যে আরও চার-পাঁচজন ছিল। তারা প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশের হাতে রাইফেল দেখে নিজেদের সামলে নিলো ওরা।

আত্মসমর্পণ করলো।

শঙ্করকাকুর নির্দেশ শুনে পুলিশ ভ্যানটা গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকগুলোর হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। ময়াল সাপের পেটের তলা থেকে কয়েক কেজি হেরোইন পেল পুলিশ। তারা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করল। পুলিশের গাড়িটা ওদের নিয়ে চলে গেল থানার দিকে। ওরা গাছ-গাছালির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। মিউ জিজ্ঞেস করলো, পেয়েছো কিছু?

সে তো পাবোই। তোদের খবরও ঠিক। ময়ালের পেটের তলা থেকে বেশ কয়েক কেজি হেরোইন পাওয়া গেছে। থ্যাঙ্ক ইউ। কিপ ইট আপ।

শঙ্করকাকুকে দেখে একটা জিপ এসে পাশে দাঁড়ালো। ওদের আগে উঠিয়ে দিয়ে পরে শঙ্করকাকু উঠলেন।

শঙ্করকাকু বললেন, তোদের জন্যে আমাদের একটা বড় কাজ হয়ে গেল। নেকলেস রহস্যের সমাধান হয়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো। তোদের কী মনে হয় নেকলেসটা উদ্ধার করা যাবে?

যাবে বলেই তো মনে হচ্ছে। মিউ উত্তর দিলো।

তোরা যে কী করে এত কনফিডেন্টলি কথা বলিস বুঝতে পারি না।

কনফিডেন্টলি বলবো না কেন! আজ যারা ধরা পড়লো তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো। যাই হোক না কেন, আজকালের মধ্যেই মনে হয় একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

এ কথা বলছিস কেন?

রীতা জুয়েলার্স থেকে একদল ডাকাত ধরা পড়লো। এখান থেকে স্মাগলাররা। নেকলেসটা যার কাছেই থাক, সে সেটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেই। দরকার হলে ঝুঁকিও নেবে। সেই চান্সটাই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তুমি এর মধ্যে কলকাতায় যাচ্ছো না তো?

আজই যাবো ভাবছিলাম।

যেও না। দু-একটা দিন থেকে যাও।

ভালো কথা, তোদের পেছনে সেই ল্যাংবোটটা কি এখনো আছে?

আছেই তো।

বন্ধ করে দেবো?

না থাক। যা করার আমরাই করবো।

জিপটা এসে থামলো বাড়ির সামনে। ওরা জিপ থেকে নামতে নামতে বললো, যা খিদে পেয়েছে না!

খিদের আর দোষ কী। দুটো প্রায় বাজে।

ওদের একসঙ্গে দেখে সতীশদা আকাশ থেকে পড়লো, কোথায় ছিলে সব। খেতেটেতে হবে না?

এক্ষুণি দাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমরা হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। তুমি ভাত দিয়ে দাও।

দাদাবাবু তুমিও তো এদের সঙ্গে বসবে?

নিশ্চয়ই। আমরা কোথায় গিয়েছিলাম জানতে চাইলে না তো?

কোথায় আর যাবে! চোর-ডাকাতের পেছনে ঘুরছিলে।

ঠিক বলেছো। যারা আজ ধরা পড়লো তাদের চেয়ে বড় ডাকাত আর হয় না। ওদের কারা ধরিয়ে দিয়েছে জানো?

কারা? সতীশদা অবাক হয়ে তাকালো।

তোমার দাদাবাবু, দিদিমণিরা।

সে কী! ওরা আবার এ সব আরম্ভ করেছে? মা জানতে পারলে আমায় খেয়ে ফেলবেন।

মিউ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কথাটা শুনেছিল। বললো, মাম তোমায় কীভাবে খাবেন? হালুম করে!

হ্যাঁ, তাই। সব সময়......

ওরা হেসে উঠলো। শঙ্করকাকুও যোগ দিলেন ওদের হাসির সঙ্গে।

॥ সাত ॥

বিকেলবেলায় ওরা নদীর ধারে বেড়াতে গেল। শঙ্করকাকু খেয়েদেয়ে উঠেই থানায় চলে গেছেন। যারা ধরা পড়েছে তাদের কাছ থেকে কোনোভাবে নেকলেসটার হদিস মেলে কিনা দেখার জন্যে শঙ্করকাকু উদগ্রীব হয়ে আছেন। জমিদার খোদ পি. সি. মানে পুলিশ কমিশনারের বন্ধু। নেকলেসটার সঙ্গে এখন পি. সি.-র সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে। যেভাবেই হোক ওটা উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? শঙ্করকাকুর মাথায় ঢোকে না। আজ যারা ধরা পড়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায় তা

জানার জন্যে শঙ্করকাকু থানায় গিয়ে বসে আছেন। পুলিশ কমিশনারও বারবার ফোন করছেন। শেষকালে বলেছেন, তোমার ভাইপো-ভাইজিকে লাগিয়ে দাও। ওরা ঠিক খুঁজে বের করবে।

শঙ্করকাকু চুপ করে থাকেন। পি. সি. বলেন, কথাটা পছন্দ হলো না?

না, না, সে কথা নয়। ওরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওদের খবরের ওপর ভিত্তি করেই রীতা জুয়েলার্স-এ ডাকাতি রোখা গেছে। ধরাও পড়েছে কয়েকজন। হেরোইনের স্টকিস্ট কারা তাও এখন জানা। তাদের ধরাও হয়েছে। এ সবই ওদের জন্য সম্ভব হয়েছে। নেকলেস খোঁজার জন্যে ওরা কাজ শুরু করেছে।

তাহলে আর চিন্তা নেই। আজ না হয় কাল নির্ঘাৎ ওটা পাওয়া যাবে। ওদের সাহায্য কর।

সে তো আমিই আছি স্যার। যা করার আমি করবো।

শঙ্করকাকুর সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের কথার কিছুই জানলো না ওরা। শঙ্করকাকু ইচ্ছে করেই কিছু বলেননি।

ওরা গ্রিন পার্কের কাছে গিয়ে হতাশ হলো। বুড়োটা আজও এসে বসেনি তো! গেল কোথায় লোকটা।

ওরা এদিকে-ওদিকে হাঁটছিল। রাজার চোখ বারবার বুড়ো যে বেঞ্চিটায় এসে বসতো সেদিকে গিয়ে পড়ছে। বেঞ্চিটা ফাঁকা। হঠাৎ রাজা বললো, আমি গিয়ে একটু বসছি। বেঞ্চিটার একা একা লাগছে। বুড়োটা রোজ এসে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকে। কেন? তা তো বোঝাই যাচ্ছে, আজ নেই। কালও ছিল না। এমনটা তো হবার কথা ছিল না?

রাজা গিয়ে বুড়োর জায়গায় বসে পড়লো। কিন্তু পায়ের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলো রাজা।

কেউ যেন কিছু লিখেছিল। বালি টেনে এনে মুছে দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে। সফল হয়নি। একটু একটু রয়ে গেছে। রাজা ইশারায় ওদের সকলকে ডাকলো। তারপর মাটিতে বসে পড়লো। খুব পরিশ্রান্ত লাগলেও কাজ সবার আগে। মিউ এসে পাশে দাঁড়ালো। বললো, আর কিছু না হোক, এক-আধটা শব্দ পাওয়া যাবে কিনা দ্যাখো।

রাজা চেষ্টা করছে। বললো, একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস পেলে কাজে দিতো।

এখানে আর কোথায় পাবে রাজাদাদা। চেষ্টা করো।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রাজার দুটো অক্ষর মনে হচ্ছে চেনা চেনা।

রাজা বললো, দুটো অক্ষর মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছি।

কি কি? মিউ উদগ্রীব হয়ে দেখছে।

প্রথমটা মনে হচ্ছে 'মে' আর দ্বিতীয়টা...না পড়তে পারছি না।

দেখি আমি পারি কিনা। রাজার পাশে মিউ বসে পড়লো। ধুলোর ওপর এ-দাগ ও-দাগের মধ্যে অক্ষর খোঁজা যে এত কষ্টকর মিউ তা জানতো না। ও উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, ইমপসিবল, আমার দ্বারা হবে না।

রাজাও উঠে দাঁড়ালো। বললো, আর একটু আগে এলে হয়তো পড়া যেত। যত সময় যাচ্ছে লেখা ততই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বললো, এই লেখাটাই প্রমাণ করছে যে নেকলেসটা এখনো এই শহরেই আছে।

মিউ বললো, এবার কিন্তু সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হবে। আর তা আজ রাত্তিরেই।

কিন্তু কোথায় আছে ওটা?

ঐ যে 'মে' শব্দটা লিখেছে—ওর মধ্যে লুকোনো আছে কোনো গোপন সংকেত।

কী হতে পারে সেটা?

কিছু বুঝতে পারছি না।

মিউ বললো, আজ রাত্তিরেই যা হবার হবে!

যা হবার মানে?

মানে পাচার! কিন্তু কোথা থেকে?

হঠাৎ মোমা বললো, মে মানে মেলা নয় তো?

মে মানে 'মেলা'। হতেই পারে। থ্যাঙ্ক ইউ মোমা। তোর আর ভয় করছে না তো? বাবু জিজ্ঞেস করে।

ভয় কেন? ও রয়েছে না!

ও-টা কে? ওরা ফিরে দেখে পাহারাদার পুলিশটা ওদের প্রায় ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ খেয়ালই করেনি। পুলিশটাকে দেখে ওরা চটপট উঠে পড়লো। বাবু বললো, চল বাড়ি যাওয়া যাক।

ওরা বাড়ির পথ ধরলো। খেয়ালও করলো না পুলিশটা কান খাড়া করে ওদের পেছনে পেছনে আসছে। মিউ বললো, নেকলেসটা মেলায় কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?

সেই কথাই তো ভাবছি। কোথায়? এমন একটা জায়গায় রেখেছে যেখানে থাকলে কারো সন্দেহ হবে না। জিনিসটাও নিরাপদে থাকবে। সময় মতো নিয়ে নেওয়াও যাবে।

মিউ বললো, কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের ডল একজিবিশন টেন্টে না তো?

কারেক্ট। ওর থেকে সেফ জায়গা আর তো কোথাও পাওয়া যাবে না। আজ রাত্তিরে ওরা নেকলেসটা ওখান থেকে বের করে নেবে।

অতো সোজা! আমরা আছি না! মিউ জোর গলায় বললো।

কি করবি?

তোমাদের মনে আছে, নেপোলিয়নের মূর্তিটা তাঁবুর দরজার দিকে মুখ করে আছে। রাজাদাদা ভালো মেকআপ নিতে পারে। নেপোলিয়ন সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে রাজাদাদা।

মিউকে বাধা দিয়ে রাজা বললো, নেপোলিয়নের মূর্তিটার কী হবে?

কি আবার হবে! পেছন দিকে কোথাও সরিয়ে রাখলেই হবে।

ব্যাপারটা একটু ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে না? রাজা বললো!

ঝুঁকি না নিলে কী করে হবে?

তা আমায় কী করতে হবে শুনি!

তুমি নেপোলিয়ন সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে। নেকলেসটা কোথায় আছে আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে দেখে নেবো। যে ওটা নিতে যাবে সে তো জানে, ওটা কোথায় আছে। সে সেদিকে গেলেই নেপোলিয়ন লোকটার দিকে এগিয়ে যাবে। লোকটা তাই দেখে হয় ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, না হয়...

না হয় কী?

দৌড়ে পালাবে! আমরা তাঁবুর আশেপাশে থাকবো। লোকটা বেরুলেই ধরে ফেলবো।

হ্যাঁ, প্ল্যানটা তো ভালোই মনে হচ্ছে।

মিউ বললো, চল সতীশদাকে বলে একবার মেলায় যাই।

ওরা খেয়াল করলো না পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনে নিল পাহারাদার পুলিশটা। তার মুখে খেলে গেল হাল্কা হাসি।

ওরা যখন জোড়ামন্দিরের পাশ দিয়ে

বাবু ওকে পা বাড়িয়ে ফেলে দিলো।

মেলা প্রাঙ্গণে এলো তখন মেলা জমে গেছে। নাগরদোলা, টয় ট্রেন, চরকির কাছে কচি-কাঁচাদের ভিড় বেশি। পাঁপড়ভাজার গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। চিৎকার, হৈচৈ-এ মেলা গমগম করছে। ওরা কোনো দিকে না গিয়ে সোজা চলে এলো কৃষ্ণনগরের পুতুলের প্রদর্শনী তাঁবুর সামনে। এখন আর মধ্যে তেমন ভিড় নেই। দু' দশজন লোক ঘুরে ঘুরে পুতুলগুলো দেখছে। এক ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে দেখছিলেন। তাঁর পাশে এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভালো করে দেখো। আমার তো মনে হচ্ছে মাদাম তুসোর মিউজিয়ামের চেয়ে অনেক ভালো আর প্রাণবন্ত এই মূর্তিগুলো।

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির সামনে। বললেন, ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি তো ওখানেও আছে। এটা দেখো, কত জীবন্ত। নূরজাহানের গয়নাগুলো দেখেছো, মনে হচ্ছে যেন সত্যিকারের মণিমুক্তা। কী রকম জ্বলজ্বল করছে।

সত্যি কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের তুলনা নেই। ভাবছি একবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখে আসবো।

মিউ আর বাবু নূরজাহানের গলার হার-টারগুলো দেখছিল। অনেকগুলো ছিল। মিউ চাপা গলায় বললো, বাবুদাদা, আছে।

ঠিক দেখেছিস? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

নূরজাহানের গলার হার-টারগুলোর তলায় দেখো। চকচক করছে। আলো রিফ্লেক্ট করছে।

হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। চল। একটু পরেই তো আবার এখানে আসতে হবে।

ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। রাজা বললো, নেপোলিয়নের পোজটা দেখে নিয়েছি। পোশাক পাবো কোথায়?

সত্যি তোর মাথায় কিছু নেই। মিলন সমিতির নাটকের কথা ভুলে গেলি?

ও, হ্যাঁ! ওরা তো কিছুদিন আগেই 'নেপোলিয়ন' নাটক করেছে।

বাবু বললো, ওদের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুই গেলেই ওরা সাজিয়ে দেবে।

তারপর যাবো কী করে?

কেন রিকশা। ছোটুকে বলা আছে। ও মিলন সমিতির সামনে থাকবে। তোকে পৌছে দেবে। বাবু বললো।

মিউ বললো, আর দেরি কোরো না। চটপট খেয়ে নিতে হবে।

ওরা বাড়ি চলে এলো। সতীশদা সন্ধেবেলায় রান্না করে রাখে। ওরা খেতে দিতে বললে অবাক হয়ে বললো, আজ কী হলো? অন্যদিন তো বলে বলে খেতে বসাতে পারি না।

ভুলে গেলে আজ বিকেলে আমরা কিছু খাইনি। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।

সতীশদা আর দেরি করলো না। ওদের খেতে দিয়ে দিলো। খেয়েদেয়ে ওপরে ওঠার সময় মিউ বুয়াকে কাছে ডেকে চাপা গলায় বললো, আমরা বেরুবো। তুই কিকিকে নিয়ে বাড়ি থাকবি।

আমি যাবো না?

তাহলে কিকিও যাবে যে! তুই কিকিকে নিয়ে বাড়ি থাক।

কিকি কিন্তু চেঁচামিচি করবে।

তুই সামলে নিবি।

কখন ফিরবে তোমরা?

তা কী বলা যায়! তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি। দেরিও হতে পারে। তুই কিন্তু জেগে থাকার চেষ্টা করিস।

প্ল্যান মতো রাজা খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেছে। শঙ্করকাকুর খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে সতীশদা খেতে বসেছে। ওরা আর দেরি করলো না। পা টিপে টিপে ওরা বেরিয়ে পড়লো। তারপর সোজা মিলন সমিতি ক্লাবে। রাজার নেপোলিয়ন সাজা হয়ে গেছে। ছোটু রিকশা নিয়ে এসে গেছে। রাজাকে পাঁচ মিনিট পরে বেরুতে বলে ওরা মেলার দিকে এগিয়ে গেল। বললো গেটের কাছেই থাকবে। ওরা আগেই দেখে এসেছে সনৎদাদের বাড়ির পাশে অনেকটা জায়গা ঘেরা নেই পুকুর আর গাছগুলো আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে বলে। পুকুরে আবার একটা ছোট নৌকো। দুর্গাপুজোর আলো দিয়ে সাজানোর মতো করে সেই নৌকোর মাঝির হাল বওয়া দেখানো হচ্ছে। সন্ধ্যের পর এই দিকটায় অনেক লোক ভিড় করে দেখে। এখন একদম

ফাঁকা। নৌকোর আলোও জ্বলছে না, মাঝি হাল বাইছে না। ঐ দিকটায় এখন বেশ অন্ধকার। ওতে ওদের সুবিধেই হয়েছে।

রাজা এসে গেল একটু পরেই। ওরা ঐ দিক দিয়ে রাজাকে নিয়ে মেলায় ঢুকলো। নেপোলিয়ন সেজে রাজার হাঁটতে একটু অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। উপায় নেই। হাঁটতেই হবে। কৃষ্ণনগরের পুতুলের তাঁবুর পর্দা ফেলা। পর্দা সরিয়ে ওরা মধ্যে ঢুকলো। বাবু টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গিয়ে নেপোলিয়নের মূর্তিটা পেছন দিকে টেনে নিয়ে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে দিলো। রাজা গিয়ে দাঁড়ালো নেপোলিয়নের জায়গায়।

বাবু ফিসফিস করে বললো, কেউ ঢুকলে বুঝতে পারবি তো! নূরজাহানের মূর্তি তোর বাঁ পাশে দুটোর পরে। লোকটা ঢুকে নূরজাহানের মূর্তির দিকে গেলেই তুই হাতের তরোয়াল তুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যাবি। তাতেই কাজ হবে। আমরা তাঁবুর বাইরে ঘাপটি মেরে থাকবো।

ঠিক আছে তোরা বাইরে যা।

ওরা বেরিয়ে এসে অন্ধকার জায়গা দেখে বসে পড়লো। মেলার প্রায় সব আলোই নিভে গেছে। মধ্যিখানে একটা জোরালো আলো জ্বলছে। তাতে এদিকটা বিশেষ দেখা যায় না। অন্য একটা তাঁবু আর বিশাল নাগরদোলার ছায়া পড়েছে। এতে ওদের সুবিধেই হয়েছে।

মিউ বাবুর কানে কানে বললো, বোকা বনে যাবো না তো?

দেখাই যাক না। ঝুঁকি না নিলে কী চলে!

হঠাৎ মিউ উঠে দাঁড়ালো। বললো, বাবুদাদা টর্চটা দাও তো।

কেন কী করবি?

নূরজাহানের গলা থেকে নেকলেসটা খুলে আনবো। লোকটা আসুক না আসুক ওটা না নিয়ে আজ যাচ্ছি না।

হঠাৎ ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বাবু ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে আরও খানিকটা পেছন দিকে টেনে আনলো।

হঠাৎ ওরা দেখলো একটা লোক গদাই-লস্করী চালে এসে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা যেভাবে হেঁটে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো তাতে মনেই হয় না সে কোনো দুষ্কৃতী। বাবু ফিসফিস করে উঠলো, এ আবার কে রে? ওর পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে হলো ওর হাতে একটা কিছু আছে।

মিউ বললো, কৃষ্ণনগরের পালদের কেউ হবে মনে হচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে ঘুমোতে গেল। রাজাদাদা না ঝামেলায় পড়ে।

না, তা পড়বে না। ও তো এখন নেপোলিয়ন। চুপ করে বসে থাক। আমার মন বলছে, কেউ আসবে।

রাত বাড়ছে। আশেপাশের বাড়িগুলোতে রেডিও, টিভি চলছিল। সেগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকটা এখন আরও বেশি নিস্তব্ধ। মেলা প্রাঙ্গণে কেউ জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে শুধু পাহারাদারদের হেঁটে যাবার শব্দ শোনা যায়। ওদের খুব মশা কামড়াচ্ছে। এখানে এত মশা আগে জানলে ওডোমস মেখে আসতো। মশাকে মারবে সে উপায় নেই। বারবার হাত উঠছে। সামলিয়েও নিচ্ছে। ম্যালেরিয়া না হয়। হঠাৎ বাবু মিউকে ঠেলা দিলো। মিউ চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাতেই দেখলো কেউ একজন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে ওদের চোখ সয়ে গেছে বলে দেখতে কোনো অসুবিধে হলো না।

বাবু, মিউ আর মোমা রেডি হলো। লোকটা তাঁবুর গেটের কাছে এসে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে মধ্যে ঢুকলো। ওরাও এগিয়ে এলো তাঁবুর গেটের কাছে। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে থেকে হুঙ্কার শোনা গেল, চোট্টা কাঁহাকা—মালা লেনে আয়া...

ভূত...ভূত...বলে চেঁচিয়ে উঠে লোকটা তাঁবুর বাইরে ছুটে আসতেই বাবু ওকে পা বাড়িয়ে ফেলে দিলো। লোকটা পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে বাবুর দিকে একটা ঘুঁষি চালিয়ে ছুটতে যেতেই মিউ তার কোমর জড়িয়ে ধরলো। বাবুর গায়ে ঘুঁষিটা একটুর জন্যে লাগেনি। বাবু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে একটা মোটাসোটা নেপোলিয়ন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে উঠলো, পাকড়ো...পাকড়ো...

নেপোলিয়নবেশী রাজাও এসে দাঁড়িয়েছে তাঁবুর গেটের কাছে। সেও ভীষণ অবাক। মোটা নেপোলিয়ন ততোক্ষণে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে। বাবুর কাছে দড়ি ছিল। চটপট ওকে বেঁধে ফেললো। তারপর মোটা

আরামে আছি

বিদ্যুৎ কুমার সাহা

পেটরোল দামী তাই
চড়ি না মটর,
সাইকেল চড়ি নাকো
লটর পটর।

রেল থেকে দূরে থাকি
ভয় কাটা পড়া,
বাসে-ট্রামে বড় ভিড়
যায় নাকো চড়া।

প্লেনেতে চড়ি না বড়
তাড়াতাড়ি যায়,
যখন আছাড় খাবে
বাঁচিব না হায়!

নৌকোর মাঝি কহে
মুখ হাসি হাসি—
'ডুবুরি তুলিবে গুনে
ওঠো যত খুশি।'

এইসব দেখেশুনে
পায়ে পায়ে হাঁটি,
উদ্‌বেগ নেই কোনো
আরামেই আছি॥

হিজিবিজি

মানস ভাণ্ডারী

পাণ্ডা ছোটে বাজারে
আণ্ডা আনে হাজারে।

কাঁপিয়া ওঠে অন্তরে
চাপিয়া যায় যন্তরে।

কইতে কথা চায় না
বইতে শুধু বায়না।

চাই যে সব জানতে
তাই পারি না মানতে।

ছবি : সুফি

নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে বাবা?

হামে চিনতে পারলে না—বলে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো মোটা নেপোলিয়ন।

মিউ ততক্ষণ নুরজাহানের গলা থেকে নেকলেসটা খুলে নিয়ে এসে বললো, মোটা নেপোলিয়ন কে জানো?

কে, কে?

আমাদের ওপর নজর রাখছিল যে, সেই বোকা পুলিশটা।

হামি বোকা নেহি...

না, না, ভীষণ চালাক। আর একটু হলে আমাদের সব প্ল্যান গুবলেট করে দিয়েছিলে আর কী।

লেকিন উয়ো হার...

মিল যায়গা। আভি উয়ো বদমাশ-কো লেকে চলো জী...

হার মুঝে দো ভাই...মেরা প্রমোশন হো যায়গা...

প্রমোশন জরুর হোগা। আভি চলো। বসমাশকো ঠিকসে পাকড়ো!

লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে আনা হলো। মোটা নেপোলিয়নকে আর লোকটাকে রিকশায় তোলা হলো। রাজা নেপোলিয়ন আর ওরা তিনজন রিকশার পাশে পাশে চললো। যাতে সকলে একসঙ্গে যেতে পারে তার জন্যে ছোটু খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছে।

গভর্নমেন্ট স্কুলের কাছে আসতেই দেখলো প্রচুর পুলিশ, জিপ, শঙ্করকাকু...

শঙ্করকাকু রিকশা আসতে দেখেই ছুটে গেলেন। তাঁর পেছনে রাইফেল নিয়ে দশ- বারোজন পুলিশ ছুটে এলো। শঙ্করকাকুর হাতে পিস্তল। তাই দেখে বাবু আর মিউ এগিয়ে এলো।

এ কী তোরা? ওরা কারা...দু' দুটো নেপোলিয়ন...ঠিক দেখছি তো?

হ্যাঁ, ঠিকই দেখছো! এ হলো রাজা, আর ঐ যে রিকশায় একটা ডাকাতকে ধরে রেখেছে ও হলো সেই যাকে আমাদের পেছনে লাগিয়েছিলে।

আর এই নাও তোমার হীরের নেকলেস! মিউ নেকলেসটা শঙ্করকাকুর চোখের সামনে তুলে ধরলো...

আমি কিছু বুঝতে পারছি না...

বাড়ি চলো বুঝিয়ে বলছি। তা তোমার ঐ পুলিশটি আমাদের সব প্ল্যানের বারোটা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিলে...

বাবু বললো, বেচারার দোষ নেই। প্রমোশন পায় না। কাজ দেখিয়ে প্রমোশন পাবার জন্য নেপোলিয়ন সেজেছে। তা দেখো ডাকু তো ধরেছে। নেকলেস উদ্ধারে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। ওর হাবিলদার হওয়া উচিত!

নিশ্চয়! শঙ্করকাকু ওসির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, আপনি রেকমেন্ড করবেন। তারপর যা করার আমি করবো।

চল চল বাড়ি গিয়ে তোদের অ্যাডভেঞ্চারটা শুনি। আপনিও চলুন। এবার বুঝতে পারছেন তো ওদের কেন এনেছিলাম। আপনারা পারেননি, আমিও পারিনি। ওরা কিন্তু সব রহস্যের সমাধান করে দিলো!

সেকেন্ড অফিসার ডাকুটাকে নিয়ে জিপে উঠলেন, অন্যরা কেউ জিপে, কেউ ভ্যানে উঠলো। শঙ্করকাকু, ওসি আর ওরা চারজন আর একটা জিপে উঠলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো মোটা নেপোলিয়ন। সে বলে উঠলো, হামি কী করবে?

তুমিও ভ্যানে ওঠো। শঙ্করকাকু বললেন।

ইসি কাপড়োমে? তার গলা কাঁদো কাঁদো।

সকলে হেসে উঠলো।

ছবি : বিজন কর্মকার

তরুণ পাঁচন

অমর দাশ

তরুণবাবুর বেজায় লোভ—
নিত্যি নতুন পথ্যি চাই।
মণ্ডা-মিঠাই, চাপ-কাবাব
কিচ্ছুতে তাঁর খামতি নাই॥
মোচ্ছবে তাঁর বেজায় মজা,
খিচুড়ি আর জিভে গজা—
বর্ষাতে চাই আস্ত ইলিশ,
শীত-গ্রীষ্মে মেনু খাসা।
তরুণ-তপন-নীহারবালা,
পাঁচন খেয়ে মেটায় জ্বালা॥

বাদল আসেনি

সেকেন্দার আলি সেখ

বৃষ্টি এলো আকাশ মেঘে
বর্ষা আসেনি
বাংলাদেশের পুকুর-ঘাটে
ব্যাঙ তো ডাকেনি
ব্যস্ত চাতক ফাটায় গলা
একটু থামেনি
কাজল-কালো মেঘের ভারে
বাদল আসেনি
ঝিলিক-ঝিলিক চিলিক মেরে
আকাশ হাসেনি
বৃষ্টি জলে ধানের ক্ষেত
কোথাও ভাসেনি।

কাঁকাল-কাহিনী

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

কাঁকাল মাছের লম্বা মুখ
পাঁকের মধ্যে ঘুমিয়ে সুখ।
খলশে, পুঁটি সারি সারি
যাচ্ছে দ্যাখো লেজটি নাড়ি।
আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
তপসে মাছের ভীষণ দাড়ি।
মৌরলা, চাঁদা, পারসের ঝাঁক
ডুবুরিকে দেখলেই যত বিভ্রাট।
কাঁকাল মাছ করবে সুখ
লম্বা ঠোঁটে কুটুর কুট॥

ছবি : সুফি

জলের দেবতা এবং ভূত

সমরেশ মজুমদার

এক গ্রামের প্রান্তে একটি চাষী পরিবার বাস করত। তারা খুব গরীব। নিজেদের কোনো জমি-জমা নেই। অন্য মানুষের জমি চাষ করে যা পায় তাই দিয়ে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে থাকে। গ্রামের পাশেই বড় নদী। কিন্তু ওই পরিবারের কেউ নদীর কাছে যেত না। কারণ তাদের এক পূর্বপুরুষ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই আদেশ জারি হয়েছিল কেউ যেন ভুলেও নদীর কাছে না যায়।

চাষীর দুই ছেলে। দু'জনেই বাবাকে খুব মান্য করে। বাবার সঙ্গে পরিশ্রম করে। কিন্তু একটা ব্যাপারে দু'জনের খুব অমিল। বড় ছেলে রোজ রাত্রে খুব ভাল ভাল স্বপ্ন দ্যাখে। ভাল খাবার, ভাল দৃশ্য, সুন্দর ফুল এবং দেবদেবীরা তার স্বপ্নে দেখা দেন। আর ছোট ছেলে স্বপ্ন দেখলেই যাবতীয় খারাপ দেখতে পায়। সে ইতিমধ্যে তার স্বপ্নে গেছো ভূত, শাঁকচুন্নি, স্কন্ধকাটা ভূত, ব্রহ্মদৈত্য দেখে ফেলেছে। দেখে দেখে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আর মনে ভয় আসে না।

সকালবেলায় চাষী কাজ খুঁজতে যাওয়ার সময় বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, 'কাল রাত্রে তুই কি স্বপ্ন দেখলি বড় খোকা?'

বড় ছেলে বলল, 'পবনপুত্র বীর হনুমানকে দেখলাম। তিনি বললেন, বাবা তোমার স্বপ্নে সব দেবতা আসেন, শুধু বরুণদেব ছাড়া। কেন জানো? আমি বললাম, না তো। তখন বীর হনুমান বললেন, তুমি নদীর কাছে থেকেও কখনও নদী দ্যাখোনি, তাই।'

চাষী বলল, 'স্বপ্নে ওরকম অনেক কিছু শোনা যায় কিন্তু শুনতে নেই। তা হ্যাঁরে ছোট খোকা, কাল তুই কোন ভূত দেখলি?'

ছোট ছেলে বিষণ্ণ মুখে বলল, 'কাল কোনো ভূতপেত্নীকে দেখতে পাইনি বাবা। তারা নাকি মেছোভূতের বাড়িতে গিয়েছিল।'

'একথা তোকে কে বলল?' চাষী জিজ্ঞাসা করল।

'একটা কানা প্যাঁচা স্বপ্নে উড়ে এল। সে-ই বলল। মেছোভূতের বাড়িতে নাকি সবার নেমন্তন্ন ছিল। নদীতে বড় বড় মাছ ধরেছিল জমিদারমশাই, সব মেছোভূত নিয়ে নিয়েছে ওদের খাওয়াবে বলে। কানা প্যাঁচা আমাকে ঠাট্টা করল নেমন্তন্ন পাইনি বলে।'

চাষী বলল, 'স্বপ্নে অমন কথা অনেকেই বলে কিন্তু কান দিবি না।'

সেদিন কাজ পেল না ওরা। বৃষ্টি না হলে কাজ নেই। কাজ না হলে তো খাবার জুটবে না। খরা শুরু হয়ে গেল। চাষী আর তার ছেলেরা শাকপাতা জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে এসে সেদ্ধ করে খেতে লাগল। একসময় খরার দাপটে গাছের পাতাও শুকিয়ে গেল। চাষীর রাত্রে ঘুম হতো না কিন্তু তার ছেলেরা বেশ ঘুমাতো। সেদিন সকাল হতে চাষী দেখল বড় ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। চাষী তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'কাল রাত্রে স্বপ্নে কোনো দেবতাকে দেখতে পায়নি। কোনো ভাল ফুল বা ভাল দৃশ্য চোখে পড়েনি। শুধু মালো পাড়ার নিবারণকাকা এক ঝুড়ি মাছ

নিয়ে চলে গিয়েছিল বিক্রি করতে।'

কথাটা শুনে ছোট ছেলেও বলল, সে কাল রাত্রে নিবারণকাকাকে দেখেছে। কোনো ভূত-পেত্নী-দানব নয়। শুধু নিবারণকাকা ঝুড়ি থেকে মাছ তুলে কপ্ কপ্ করে কাঁচা খেয়ে নিচ্ছিল।

এসব শোনার পর চাষী ঠিক করল, আর নয়, এখান থেকে ছেলেদের নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। কাজের অভাবে খাবার জুটছে না, তার ওপর ছেলেরা যদি শুধু মাছের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে তাহলে হয়তো একদিন নদীতে মাছ ধরতে যেতে চাইবে।

অতএব পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ওরা রওনা হলো। গ্রাম ছাড়িয়ে প্রান্তর, প্রান্তর ছাড়িয়ে বন, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শেষে খিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা বটগাছের নিচে বসে পড়ল। ঠিক তখনই একজন সাধুপুরুষ সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে চাষী প্রণাম করে বলল, 'বাবা, আমরা কাজ করে পেট ভরাতে চাই। আপনি আমাদের পথ বলে দিন। কোথায় গেলে কাজ পাব?'

সাধুপুরুষ বললেন, 'বলতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। আমি দুটো প্রশ্ন করব, যদি তার ঠিকঠাক জবাব দিতে পার তাহলেই বলব।'

চাষী বলল, 'আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি করে উত্তর দেব?'

সাধুপুরুষ বললেন, 'থাক তাহলে।'

তখন বড় ছেলে বলল, 'বাবা, আমি যদি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি?'

সাধুপুরুষ বললেন, 'বেশ তো। প্রথম প্রশ্ন হলো, কোন ফুল ঝরে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, মৃত্যুকে কে ভয় করে না?'

বড় ছেলে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'উত্তর যদি ভুল হয়?'

'ভুল হলে কিছুই পাবে না। তোমরা দু'জন দূরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ওর দেওয়া উত্তর তোমাদের সামনে শুনব না।'

চাষী আর তার ছোট ছেলে অনেকটা দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালে বড় ছেলে বলল, 'প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। রোজ রাত্রে আমি সুন্দর ফুল দেখি। সেটা কখনও শুকোয় না, ঝরে যায় না। কারণ সে ফুটেছিল স্বর্গের নন্দনকাননে।'

সাধুপুরুষ মাথা নাড়ল, 'ঠিক ঠিক। তাই ওর বুকে মধু নেই, গন্ধ নেই। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও।'

বড় ছেলে বলল, 'তার উত্তর আমার জানা নেই প্রভু।'

সাধুপুরুষ বড় ছেলেকে চাষীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছোট ছেলেকে কাছে ডাকলেন, 'তুমি কি প্রশ্ন দুটোর জবাব দিতে পারবে?'

মাথা চুলকে ছোট ছেলে বলল, 'প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মৃত্যুকে ভয় পায় না দৈত্য-দানব ভূত-পেত্নী। রোজ রাত্রে তাদের আমি দেখি তো! আর মরার ভয় নেই বলে ওরা ভয় পায় না।'

'বাঃ, ঠিক বলেছ।'

এবার চাষীকে ডেকে সাধুপুরুষ বললেন, 'তোমার দুই ছেলে একটা করে উত্তর ঠিক বলেছে। দু'জনের উত্তর জুড়লে দুটো উত্তরই সঠিক। কিন্তু সেটা তো কথা ছিল না। তবু অর্ধেকটা দিয়েছে বলে তোমাকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি। তোমরা এখানে মাটি খোঁড়। খুঁড়তে খুঁড়তে বিরাট দীঘি তৈরি কর। সেই দীঘি তোমাদের খাওয়াবে।'

উপদেশ মতো দীঘি তৈরি হলো। দীঘিতে প্রচুর মাছ হলো। সেই মাছ খেয়ে ওরা দিব্যি ছিল। কিন্তু এক রাত্রে বরুণদেব চলে এলেন বড় ছেলের স্বপ্নে। এসে খুব রাগ করলেন তাঁকে পুজো না করে দীঘি কাটা হয়েছে বলে। আবার ছোট ছেলে স্বপ্নে দেখল মেছোভূত তিড়িং বিড়িং নাচছে। তাকে বাদ দিয়ে ওরা মাছ খাচ্ছে বলে।

সকালে সব শুনে চাষী দুটো বেদী তৈরি করল দীঘির ধারে। একটার ওপর বরুণদেবের মূর্তি এনে বসাল, অন্যটির ওপর মেছোভূতের মূর্তি। একেবারে মুখোমুখি।

মুশকিল হলো, সেই রাত থেকে চাষীর ছেলে দুটোর মন খুব খারাপ, তারা আর স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

ছবি : জুরান নাথ

কেউ কেউ

হান্নান আহসান

সকালে উঠিয়া রামু
সারে আরাধনা
'ভগবান করে দাও
পেলে মারাদোনা।'

তুখোড় ছেলেটি সাজু
শেখেনি সে হারা
মনে মনে হয়ে যায়
শচীন বা লারা।

দিনরাত টেনিসের
পোকা রিনি মিনি
বলে তারা হবে নাকি
স্টেফি সাবাতিনি।
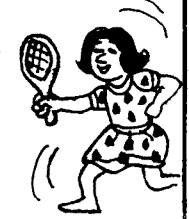
মাঠে ছুটে দরদর
ঝরে খুব ঘাম
কেউ থাকে আবডালে
কেউ পায় দাম।

টা-টা

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

যখন আমি স্কুলে যাই
বাবা যান অফিসে
মামা-মামী-মাসী-মেসো
ন'পিসি আর ন'পিসে

যাওয়ার সময় বলে
হাত নেড়ে টা-টা
কখনো কেউ বলে না তো
বিড়লা বা বাটা।

ডালমিয়ার কী যে দোষ
গোয়েঙ্কার অপরাধ
বোঝা কিছু যায় না তো
ওরা কেন হলো বাদ?

আমি তো আর ছোট নই
পড়ি ক্লাস ফাইভে
হাত নেড়ে টা-টা বলার
মানে খুঁজে পাইনে।

সোনার পালক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামা অনেকক্ষণ ছাতে একা ঘুরছে। সেই বেলা তিনটে নাগাদ উঠেছে, এখন প্রায় সন্ধ্যা হতে চলল। আমি স্কুলের হোমটাস্ক করছিলুম। শীত আসছে বলে মাসিমা কলে সোয়েটার বুনছিল। আমাকে বললে, 'একবার দেখে আয় তো, বড় কত্তা এতক্ষণ ছাতে কি করছে! নিশ্চয় কোনো অপকর্ম!'

'সে করলে করুক না। ছাতেও তো একটা বাথরুম আছে।'

'তোর মাথা। অপকর্ম, দুষ্কর্ম এই সব মিলিয়ে কতরকম কর্ম আছে জানিস?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'এই তো মাস তিনেক আগে ওই ছাতে বসে নিজের চুল নিজে কাটছিল, তারপর কি হলো?'

'ন্যাড়া হতে হলো।'

'তারপর, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কে মারা গেছেন। যেই শোনে কেউ মারা যায়নি, তখন প্রশ্ন, তাহলে কি উকুন! তুই যা, চুপি চুপি একবার দেখে আয়।'

আমার মামার বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায়। কিছু দূরেই একটা সরোবর। ভোরবেলায় দিগ্বিদিক থেকে হরেক রকমের পাখি এসে জলে নামে। চারপাশের গাছ নানারকমের পাখিতে ভরে যায়। আর এই সন্ধেবেলায় সব বাসায় ফেরার পালা। ছাতের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। কত রকমের ডানার শব্দ। হুস্ হুস্, ফটফট, ঝপাস ঝপাস। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে গায়ে ডানার বাতাস লাগে।

বড়মামার যত সব উদ্ভট গল্প। যখন ক্লাস টু-তে পড়তুম, বিশ্বাস করতুম। চোখ বড় বড় হয়ে যেত। একবার এক পূর্ণিমার রাতে ফটফটে চাঁদের আলোয় বড়মামা এই ছাতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাচের মতো আকাশ। হঠাৎ সেই আকাশ থেকে কি একটা পাক খেতে খেতে নিচের দিকে নেমে আসছে। ঠক করে বুকে এসে পড়ল। তুলে দেখল, এই এত বড় একটা সোনার পালক। ভীষণ সুন্দর! তার যে কত টাকা দাম হবে, কারো ধারণা নেই।

'কিসের পালক? কার পালক?'

'হাঁসের পালক। এক ধরনের স্বর্গীয় হাঁস আছে, যারা আকাশের খুব উঁচুতে, মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তারা স্বর্গে থাকে। পৃথিবীর একটা জায়গায় তারা পূর্ণিমার রাতে নামে, সেই জায়গাটার নাম মানস সরোবর। পৃথিবীর মানুষের জন্যে তারা ডানা থেকে একটা করে পালক খসায়। সেই সোনার পালক কে পায় জানিস? যারা সৎ, সুন্দর, জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলে না, লেখাপড়ায় ভাল, ফার্স্ট, সেকেন্ড হয়।'

'তুমি যা বললে, সেই রকম হলে, আমারও বুকে সোনার পালক পড়বে?'

'আলবাৎ পড়বে।'

সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করলুম, একটাও মিথ্যে কথা বলব না। একটাও বাজে কাজ করব না। লেখাপড়া মন দিয়ে করব। সবাই বলতে লাগল, পিন্টুটা হঠাৎ কি রকম বদলে গেছে। পরীক্ষাতেও ফার্স্ট, সেকেন্ড হচ্ছে। বড়মামা বলেছিল, দেখ, এসব কথা কারোকে বলবি না, সিক্রেট। সোনার পালকের কথা কারোকে বলবি না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, তোমার পালকটা কোথায়? বড়মামা বললে, সেই পালকটা দিয়ে, আমি ভগবানের কাছ থেকে বুদ্ধি কিনেছি। বুদ্ধি তো দোকানে পাওয়া যায় না।

তখন সবই বিশ্বাস করেছিলুম। বড়মামা, আমি যখন আর একটু বড় হলুম, তখন একদিন বললে, সোনার পালকের রহস্যটা বুঝলি। সোনার পালক হলো চরিত্র। আমি বললুম, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি বড়মামা। সোনার পালক আমি পেয়েছি। বড়মামা বললে, সেই কলমে নিজের জীবনী লিখে যা।

বড়মামা ছাতের মাঝখানে একটা মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটো খোলাই রয়েছে। মাসিমার নির্দেশ মতো চুপি চুপি এলেও বড়মামা ধরে ফেলেছে, 'কিসের অনুসন্ধান ভাগনে?'

'না, কোনো অনুসন্ধানই নেই। বেড়াতে এসেছি।'

'তা ভাল। তবে আমি জানি, কি

কারণে এসেছিস!'

'কি কারণ!'

'কুসী পাঠিয়েছে। দেখে আয় তো কি করছে!'

'মিথ্যে কথা বলব না, মাসিমা বললে দেখে আয় তো বড়টা অনেকক্ষণ ছাতে একলা রয়েছে, কি আবার অপকর্ম করছে।'

'এ অপবাদ আমার ঘুচল না রে ভাগনে! এতখানি বয়েস হলো আমার। তুই সেই গল্পটা জানিস?'

'কোনটা?'

'গুড়ের ফোঁটা।'

'না।'

'তাহলে শোন। এক মুদিখানার দোকানের বাইরে দুই ভদ্রলোক বাঁশের মাচানে পাশাপাশি বসে আছে। ওদিকে দোকানি বসে আছে টাটে। খুব কেনাবেচা চলছে। সকালের ভিড়। ওই দুই ভদ্রলোকের একজন হলো শয়তানের দূত, আর একজন দেবদূত। শয়তানের দূত খুব দুঃখ করে দেবদূতকে বলছে, 'দ্যাখো ভাই, পৃথিবীর যেখানে যত গণ্ডগোল, লোকে বলে শয়তানের কারসাজি। আমার প্রভুর এমনই বরাত। আচ্ছা, এই যে গুড়ের টিনটা এইখানে রয়েছে, এর থেকে আঙুলে করে একটা ফোঁটা নিয়ে আমি এই বাঁশের খোঁটায় লাগালুম।'

শয়তানের দূত ছোট্ট একটা ফোঁটা লাগিয়ে দেবদূতের পাশে এসে বসল। দেবদূতকে প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে তুমি শয়তানের কোনো কারসাজি দেখতে পাচ্ছ?'

দেবদূত বললে, 'না। অনেকেই অমন করতে পারে। খদ্দেররাও অনেকে আঙুলে কিছু লাগলে বাঁশের গায়ে মুছে দেয়।'

শয়তানের দূত বললে, 'তবে? সব দোষ আমার প্রভুর ঘাড়ে! আচ্ছা, আমি তবে আসি ভাই। তুমি খানিক বসে যাও।'

শয়তানের দূত চলে গেল। দেবদূত বসে রইল উদাস। দেবদূতদের মাঝে মাঝে অমন হয়, কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করে না। ঘন ঘন হাই ওঠে। মানুষ হলে চা খেত। দেবদূতদের তো চা খাওয়া বারণ। চা হলো শয়তানের আরক। দেবদূত দেখছে, গুড়ের ফোঁটাটা লক্ষ্য করে এক সার পিঁপড়ে বাঁশ বেয়ে উঠছে। আর বেশ মোটাসোটা একটা টিকটিকি একেবারে টঙে নিচের দিকে মুখ ঝুলিয়ে স্থির। কোথাও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। খদ্দেররা আসছে যাচ্ছে। দাঁড়িপাল্লা, বাটখারার শব্দ। নানা কথা। কখনো বচসা। দেবদূত দেখছে, টিকটিকিটা পিঁপড়ে ধরার লোভে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তা এগোক। টিকটিকির কাজ টিকটিকি করুক। একটা বেড়াল আধবোজা চোখে থুপ্পি মেরে বসেছিল। বেড়ালটা টিকটিকি দেখে মারলে লাফ। একটা কালো মুশকো কুকুর ঝিমোচ্ছিল এক পাশে। চিরশত্রু বেড়াল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ালটার ঘাড়ে। এইবার বেড়াল আর কুকুর ঝটাপটি করতে করতে দোকানদারের ঘাড়ে। দোকানদার এক লাফ। মাথার কাছে তাকে তাকে যত কৌটো-ফৌটো ছিল সব পড়তে লাগল শিলাবৃষ্টির মতো। খরিদ্দার ভয়ে ছুটোছুটি। নিমেষে দোকান লণ্ডভণ্ড। দেবদূতও দৌড় মেরেছে। একটা গাছের তলায় শয়তানের দূত গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। দেবদূত হাঁপাচ্ছে। শয়তানের দূত বললে, 'এসো ভাই, বোসো, হাঁপাচ্ছ কেন?' দেবদূত পাশে বসে বললে, 'তোমার কেরামতি আছে ভাই।' দেবদূত তাকিয়ে আছে। শয়তানের দূত বললে, 'সবই আমার প্রভুর ইচ্ছা ভাই।'

বড়মামা গল্প শেষ করে বললে, 'জানিস তো, আমার ওই গুড়ের ফোঁটা। কুসীর দোষ নেই। সবই আমার বরাত। সেদিন খাটটাকে জানলার দিকে সরাব বলে যেই টানলুম, একটা পায়া মচকে গেল। খাটটা এখন তোর ইনক্লাইনড প্লেন। এধারে শুলুম তো কিছুক্ষণের মধ্যে গড়িয়ে ওধারে। যেন খাদে পড়ে গেলুম গড়িয়ে। তারপরেই শুরু হলো কসরত। গড়িয়ে ওপরে উঠতে হবে। সারা রাত ধস্তাধস্তি। রাত ভোর। একে বলে একসারসাইজ অন ইনক্লাইনড প্লেন। এই ব্যায়ামের ফলে আমার ভুঁড়িটা কত উন্নত হয়েছে দ্যাখ।'

'তাহলে মাসিমাকে কি বলব?'

'বলবি, এক ভদ্রলোক অতি ভদ্রলোকের মতো ছাতে শুয়ে আছে।'

'কেন শুয়ে আছ? শুয়ে কেন আছ?'

'আমার মন খারাপ। আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। মা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের আর কে আছে! ভাই, বোন, ভাগনে থাকাও যা, না থাকাও তা। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে তোকে পাঠাতেন না, নিজেই চলে আসতেন। আমার মাথার কাছে বসে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাতেন, কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগনে মদন।'

'তা তুমি আরো কতক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকবে!'

'সে তো বলতে পারছি না, মন ভাল হলেই উঠে পড়ব।'

মাসিমাকে গিয়ে রিপোর্ট করলুম। মাসিমা বললে, 'মা থাকলে কি করত?'

'মাথার শিয়রে বসে চুলে হাত বোলাতেন আর কুমোরপাড়া শোনাতেন।'

'তাই না কি! মা যা রাগী ছিলেন! এমন একটা দিন ছিল না, যে বড়দা পেটানি খায়নি। ব্যাপার অন্য, চল তো, আমার সঙ্গে চল।'

মাসিমা ছাতে গিয়েই বললে, 'এই, ওঠো তো। ওঠো, ওঠো।'

বড়মামা বললে, 'অসম্ভব। এখন আমার মায়ের সঙ্গে কমিউনিকেশান চলছে। নানারকম মেসেজ আসছে, ডোন্ট ডিসটার্ব।'

'তুমি উঠবে, না গায়ে আরশোলা ছাড়ব!'

আরশোলার ভয়ে বড়মামা একবার ভুবনেশ্বরে পালিয়েছিল। সেখান থেকে আবার পালিয়ে এসেছিল কাঁকড়াবিছের ভয়ে। আরশোলার নাম শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। মাসিমা বললে, 'আমার এই কৌটোয় বেশ বড়সড় তেলচুকচুকে একটা আছে, পিঠের দিকেই ছাড়ি।'

বড়মামা এক লাফে ছাতের ট্যাংকের কাছে। মাসিমা আমাকে বললে, 'মাদুরটা তোল।' এই মাসখানেক আগে প্রচুর খরচ করে ছাতে পাথর বসানো হয়েছিল। একটা পাথর চৌচির। মাসিমা হুঙ্কার

ছাড়ল, 'বড়দা, এটা কি?'

বড়মামা সরল বালকের মতো এগিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'এ কি! ফেটে চৌচির!'

মাসিমা বললে, 'সে তো আমরা সবাই দেখছি। প্রশ্ন হলো, এই অপকর্মটি কার?'

বড়মামা বললে, 'আশ্চর্য ব্যাপার বটে। যখন মাদুর পাতলুম তখন কিচ্ছু ছিল না। বইয়ে পড়েছিলুম, মানুষের দুঃখে পাথর ফাটে, আজ স্বচক্ষে দেখলুম।'

'কোন মানুষের দুঃখ?'

'আমার দুঃখে পাথর ফ্র্যাকচার।'

'তোমার আবার কিসের দুঃখ!'

'হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ল। শীতকালে মা আমাদের কতরকম করে খাওয়াতেন। মায়ের কোলে চড়ে ঝুলনের মেলায় গিয়ে কাঠের বাঘ কেনা।'

'কোলে চড়ার কাল পর্যন্ত মনে আছে! বাব্বা! কি মেমারি!'

আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললুম, 'বড়মামা, তুমি না সোনার পালক পেয়েছিলে!'

বড়মামা থতমত খেয়ে আমার দিকে তাকাল, 'তাহলে সত্যি কথাই বলি, এটা কাশ্মীর কেস।'

'জঙ্গি হানা! তলার দিক থেকে পাথর ফাটিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা।'

বড়মামা বলল, 'না, আখরোট। হাতুড়ি দিয়ে ঠুকছি। মুখে ফেলছি। এক বেটা এতই নিরেট, ছিটকে বেরিয়ে গেল, ধরে এনে মারলুম এক ঘা। রেগে গেছি তো। রেগে গেলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। আর সেই কারণেই আখরোটটা প্রাণে বেঁচে গেল। হাতুড়ি মিস করল। পড়ল পাথরে। কেয়াবাত, ফ্র্যাকচার। সঙ্গে সঙ্গে মাদুর পেতে শয়ন। তবে হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি, আমি একটা দামী জিনিস পেয়েছি। ফাটা পাথরের উপহার। কাউকে দেখাব না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

বড়মামা পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে।

মাসিমা বললে, 'তুই, বন্দেমাতরম বলে জাপটে ধর।'

ছবি : সমীর সরকার

কাকের মিটিং

সরল দে

কার্নিশে কাক ডাকছিল খুব
নাক ছিল তার সিঁটকে,
বলছিল, ধ্যাৎ রঙবেরঙের
গন্ধ আসে ছিটকে!
হামবড়া ভাব দেখাচ্ছে কি
রামধনিয়ার মোরগা?
তিনমুলুকের ফুলবাগানের
রঙ ছড়ানো ওর গা।
আস্ত পোকা জ্যান্ত গিলে
মোরগা বলে, কঁককো,
রঙের খোঁটা দিস কেন রে
ওরে অকালপক্ক।
তোর গায়ে তো অন্ধকারের
ঘোর কালো আলকাতরা,
এক গালে চুন খুব করে মাখ
চুনের গোলা হাতড়া।
তাই শুনে কাক ডাকল মিটিং
মস্ত ছাতের আলসেয়,
কাক-পালকের পাল্টাবে রঙ
আজকে না-হয় কাল সে।
বলল, মেরে ভাইও, মানুষ
কালোয় করে ফরসা,
কালো টাকাও করছে সাদা
ঐ যে হরিহর সা।
সত্যি নাকি? সমস্বরে
বলে বায়সবৃন্দ,
ফরসা হবার উপায়টা কী
হরি হে গোবিন্দ!

দুষ্টুমতি সমাজপতি

মনীষা মিত্র

কমলাক্ষ সমাজপতি
কড়া মেজাজ ধূর্ত অতি
গামছা কাঁধে সদাই সজাগ,
সইতে নারাজ কোনো ক্ষতি।
কচি-কাঁচা দেখলে চটে
তাকিয়ে থাকে গোলা চোখে
ফল-ফুলুরির সাধের বাগান
ওদের জ্বালায় আর কি থাকে!
জলে, ঝড়ে, রোদ্দুরে তাই
লাঠি হাতে দেয় পাহারা
ফলে-ফুলে হাত দিলে কেউ
পাল্টে দেবেই তার চেহারা।
সবাই তারে ছিঃ ছিঃ করে,
বলে, বুড়ো সমাজপতি
টাকার কুমীর হয়েও তুমি
মন্দ অতি দুষ্টুমতি।

ছবি : সুফি

স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা

প্রণবেশ চক্রবর্তী

১৯০২ সাল। দিনটা ছিল ২ জুলাই, বুধবার। ভগ্নী নিবেদিতা সেদিন বেলুড়মঠে গেলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ স্বামীজি নিবেদিতাকে বললেনঃ আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্বামীজির এই কথার সত্যতা সম্পর্কে নিবেদিতার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ঠিকই, তবু তিনি বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্কুল সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন। এবার স্বামীজি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেনঃ এসব ব্যাপারে আমি আর আলোচনা করতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলেছি।

সেদিন ছিল একাদশী। অসুস্থ স্বামীজি নিজে উপবাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিবেদিতাকে খাওয়াবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিবেদিতা এতে একটু বিব্রত হলেন। কিন্তু শিষ্যাকে নিজের হাতে খাওয়াতে তাঁর গুরু সেদিন যথার্থই ব্যাকুল। তিনি খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিজেই পরিবেশন করতে শুরু করলেন। খাওয়ার জিনিসের মধ্যে ছিল কাঁঠালের বিচি সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, ভাত এবং বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ। নির্বাক ও নিস্পন্দ নিবেদিতা যন্ত্রচালিতের মতো সব কিছু খেলেন।

এবার তাঁর সামনে এল আরও বড় বিস্ময়। স্বামীজি নিজেই জল ঢেলে নিবেদিতার হাত ধোয়ালেন এবং তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় নিবেদিতা সঙ্কুচিত হয়ে প্রতিবাদ করলেন, বললেন, স্বামীজি, এসব তো আমারই করার কথা। আপনাকে আমারই সেবা করার কথা। অথচ আপনিই আমার জন্য করছেন?

একথা শুনে হঠাৎই যেন স্বামীজি

গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর একটু থেমে বললেন, যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠলেন নিবেদিতা। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক কেঁপে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলতে যাচ্ছিলেন, সে তো যিশুর শেষ সময়! কিন্তু এই কঠিন কথাগুলি তিনি আর উচ্চারণ করতে পারলেন না। কে যেন আড়াল থেকে তাঁর গলা চেপে ধরল। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যিশু খ্রিস্ট ঠিক তাঁর অন্তিম সময়ে শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে কি?... আর তিনি ভাবতে পারছিলেন না।

তারপর এল ৪ জুলাই। সেদিনই রাত্রে নিবেদিতা স্বপ্ন দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই রাত্রে দ্বিতীয়বার দেহত্যাগ করছেন। পরদিন খুব সকালেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তাঁর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলেই তিনি দেখলেন, বেলুড়মঠ থেকে একজন লোক এসেছেন। তিনি চিত্রার্পিতের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু হাত বাড়িয়ে নিবেদিতার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিটা পড়েই নিবেদিতা আর্তনাদ করে উঠলেন। 'স্বামীজি নেই।' বিশ্বসংসার তাঁর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল।

কিন্তু শোকে ভেঙে পড়ার অবকাশ কোথায়? বিবেকানন্দ গোটা দেশকে আত্মশক্তিতে জাগাতে চেয়েছিলেন। ভারতের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অস্পৃশ্যতা এবং নারীজাতির দুর্দশা থেকে সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন ছিল স্বামীজির চোখে এবং স্বামীজি চেয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণ। এই যুগান্তকারী কর্তব্যের আহ্বান নিবেদিতার সামনে। গুরুর কাজ সম্পন্ন করার জন্যই তো তিনি নির্দিষ্ট। তাই তো স্বদেশ, স্বজনকে ছেড়ে গুরুকে অনুসরণ করে ভারতে এসেছিলেন। প্রাণ এবং মন দিয়ে ভারতকে ভালবেসেছিলেন এবং ভারতকেই একমাত্র আরাধ্যা দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামে এক ছোট্ট শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের মতোই পিতা স্যামুয়েলও ছিলেন ধর্মযাজক এবং স্বদেশপ্রেমী। ধর্ম ও দেশপ্রীতি ছিল নিবেদিতার রক্তে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে মার্গারেট শিক্ষাপর্ব শেষ করে শিক্ষাব্রতী হন। তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজ করছিল সত্যকে জানবার জন্য দুর্নিবার এক আকাঙ্ক্ষা। যখন আটাশ বছর বয়স তখনই এল তাঁর জীবনের এক মহা ক্রান্তিলগ্ন। নভেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যায় এক বান্ধবীর আহ্বানে তিনি এলেন তাঁর বসার ঘরে, সাক্ষাৎ পেলেন বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের।

সেদিন স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর নিবেদিতা ঘরে ফিরে গেলেন ঠিকই,

কিন্তু কিছুতেই তিনি সেই হিন্দুযোগীকে ভুলতে পারলেন না। ১৮৯৫ সালের ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর স্বামীজি পরপর দুটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার টানে নিবেদিতা এসে হাজির হন। তারপর ২৭ নভেম্বর স্বামীজি আবার আমেরিকা চলে গেলেন এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে তিনি ফিরে এলেন লন্ডনে। এই চার-পাঁচ মাস নিবেদিতা শুধু স্বামীজির প্রাণ-জাগানিয়া কথাগুলি ভেবেছেন, আর ভেবেছেন বহু দূরের অজানা সেই ভারতবর্ষের কথা। স্বামীজির কাছে এবং কাজে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে তিনি তখন প্রস্তুত। সেই সময় স্বামীজি এক পত্রে মার্গারেটকে লিখলেনঃ হে মহাপ্রাণ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?

জেগে উঠল এক মহাপ্রাণ। স্বামীজির সঙ্গে তিনি ভারতে আসতে পারেননি। তাঁর কিছু কাজ বাকি ছিল। তিনি কলকাতায় এলেন ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি।

॥ ৩ ॥

নিবেদিতা ভারতে আসতে চাইলেও কেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে সে প্রস্তাবে রাজী হননি? স্বদেশপ্রেমী বিবেকানন্দ ভারতকে কেউ বাইরে থেকে এসে কৃপা করে যাবে—এটা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন যদি কেউ ভারতের সেবা করতে চায়, তাকে ভারতের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে হবে, তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে ভারতের সাধনা, উপলব্ধি করতে হবে ভারতের মহিমা। বিবেকানন্দ সেদিন তাই তাঁকে লিখেছিলেনঃ 'এমন মানুষ চাই, যার জীবন নিঃস্বার্থ মানবসেবার বেদিতলে একটি অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলবে।' নিবেদিতা মনে-প্রাণে ঠিক সেইরকমই একটি মানুষ ছিলেন—ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিবেদিতা নিঃস্বার্থ মানবসেবার একটি অনির্বাণ শিখা। ভারতে ফিরে আসার পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে সর্বান্তঃকরণে আহ্বান জানিয়ে লিখলেন 'ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। তোমার শিক্ষা, তোমার ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে কেল্‌টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরকম নারী, যাকে প্রয়োজন।'

নিবেদিতা ভারতে এলেন, তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির সামনে ভারত তার সকল মহিমা, সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করল। শুধু ভারতকেই নয়, অনেক কাছের থেকে অনেকদিন ধরে নিবেদিতা দেখলেন গুরু বিবেকানন্দকে। আরও দেখলেন "জগতের মহত্তমা নারীকে" —শ্রীমা সারদা দেবীকে, যিনি সাগরপারের এই মেয়েটিকে সস্নেহে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতের নারী জীবনের চিরন্তন মহিমার শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ দেখলেন তাঁর মধ্যে।

আরও একটি রূপ তিনি দেখেছিলেন তা চর্মচক্ষে নয়, দেখলেন তাঁর মানসচক্ষে, সে রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সকল মহিমা আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করলেন সাগরপারের এই কন্যার প্রজ্ঞাদৃষ্টির সামনে। তাই তিনি দেখেছিলেন, 'কালীগত প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।'

॥ ৪ ॥

ভারতে যদি কোনওদিন সেবাব্রতের ইতিহাস রচিত হয়, তাহলে ১৮৯৯ সালে কলকাতা মহানগরীতে প্লেগ-সেবায় নিবেদিতার জীবন-সমর্পিত সাধনার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে। সেদিনের একটি মর্মস্পর্শী খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন সেকালের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। তিনি বাগবাজার বস্তিতে প্লেগ রোগী দেখতে গিয়ে দেখলেনঃ "সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-দীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।" এই শিশুটির পিতা-মাতা ভয়াবহ প্লেগ রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য শিশুটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন, আর নিবেদিতা এসে সেই মৃতপ্রায় শিশুকে তুলে নিয়েছেন নিজের কোলে। ডাঃ কর লিখলেন, "দুইদিন পরে শিশুটি এই করুণাময়ীর স্নেহতপ্ত অঙ্গে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।" মৃত্যুর ঠিক আগে সেই শিশুটি নিবেদিতাকেই নিজের মা মনে করে বারবার "মা মা" বলে ডেকে উঠেছিল।

যথার্থই তিনি তাঁর জীবন-সমর্পিত সাধনায় হয়ে উঠেছিলেন লোকমাতা। ইউরোপীয় প্রভাবে ভারতীয়রা যখন কালীপূজা নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন, নিবেদিতা তখন মা কালীর তত্ত্ব জনমানসের সামনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছেন। কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে বক্তৃতা করেছেন। বাগবাজার পল্লীর ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের একটা জীর্ণ ঘরে তিনি কী ভয়ঙ্কর কষ্টে দিন কাটাতেন, তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়। আবার নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে দ্বারে দ্বারে সেদিন তিনি কীভাবে ঘুরেছিলেন, সেকথা আজ ইতিহাসের সম্পদ।

১৮৯৯ সালের ২৫ মার্চ, শনিবার, 'নিবেদিতা' নাম দেবার ঠিক এক বছর পরে স্বামীজি তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী-রূপে দীক্ষিত করেন। তিনি হলেন ব্রতধারিণী। কী সে ব্রত? এই ভারতের কল্যাণ সাধনাই তখন তাঁর একমাত্র ব্রত।

তাই দেখি ভারতের বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে নিবেদিতা অনলস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন আচার্য জগদীশ বসুর সঙ্গে, ভারতের শিল্পায়নে স্বামীজির স্বপ্নকে সার্থক করতে তিনি যোগাযোগ করেন জামশেদজি টাটার সঙ্গে এবং ভারতের সাধারণ মানুষকে আত্মবিশ্বাসে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। তিনি যেন তখন সত্যি অগ্নিশিখা।

মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিঙে হিমালয়ের নির্জন কোলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শেষ কথাটি উচ্চারণ করেঃ "দ্য বোট ইজ সিংকিং, বাট আই শ্যাল সি দ্য সানরাইজ।"

বুড়ির ভূত

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এবার শীতে পুপসিদের মধুপুরের বাড়ি সরগরম। কে না এসেছে! বাবা মা ঠাকুরদা ঠাকুমা, মাসতুতো দিদি মুনা, মামাতো বোন কঙ্কা টুকটুকি, এমনকি চরম কাজের মানুষ ভানুমামাও। এত লোকজন দেখে বাড়ির কেয়ারটেকার ত্রিভুবনের মুখে হাসি আর ধরে না।

আসেনি শুধু পুপসির দিদি খুকু। সদ্য খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেয়েছে সে, বেজায় ব্যস্ত থাকে দিনরাত। এই ফিচার, ওই রিপোর্টিং, এখানে যাওয়া, সেখানে ছোটা... । মধুপুর যাওয়ার প্রস্তাব শুনে নাক কুঁচকেছিল খুকু, অফিসের রোমাঞ্চকর কাজকর্ম ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত পুরীতে বেড়াতে আসার তার কোনও বাসনাই নেই।

হ্যাঁ, পাণ্ডববর্জিত পুরীই বটে। পাঁচিলঘেরা পেল্লাই বাড়ি, চতুর্দিকে আম জাম বেল নিম শাল মহুয়ার মিনি জঙ্গল। স্টেশন থেকে বাড়িটা বেশ দূর, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। আশেপাশে আরও খান কয়েক এরকম পুরনো পুরনো বাগানবাড়ি আছে বটে, কোনওটাতেই জনমনিষ্যি নেই। এ বাড়িতেও মানুষ বলতে দু'জন। ত্রিভুবন আর তার বউ বাসন্তী। তারা থাকে সেই পাঁচিলের ধারে, আউট হাউসে। মাঝে মাঝে ঝাড়াঝুড়ি করা ছাড়া পুপসিদের এই দোতলা বাড়িটা প্রায় খোলাই হয় না।

পুপসিদের ট্রেন মধুপুর পৌঁছেছিল বিকেল তিনটেয়। ত্রিভুবনকে আগেই খবর দেওয়া ছিল, সার সার ঘর খুলে রেখেছে সে। স্থানীয় একটা লোককে ধরে গোটা বাড়ি ঝকঝকে তকতকে করে ফেলেছে।

ডিসেম্বরের শেষ। দিন এখন খুব ছোট। পৌঁছে হাত-পা ছড়াতে না ছড়াতেই সন্ধ্যে। উঁহু, হাত-পা ছড়ানোর উপায় কোথায়? জব্বর ঠাণ্ডা এখানে, শাল সোয়েটার টুপি মোজা গ্লাভস যে যা পারছে গায়ে চাপিয়ে ফেলছে। তবু শীতের হাত থেকে নিস্তার নেই, হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে যায়।

এদিকে বিজলীবাতিও নেই। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ত্রিভুবন। তবে কেউ এখন নিজের ঘরে নেই, সব্বাই জড়ো হয়েছে দোতলার হলটায়। জোর হৈহল্লা চলছে। গল্প হাসি গান...

বাসন্তী এসে আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। ছোটদের জন্য গরম গরম খাঁটি গরুর দুধ। গরুও খাঁটি, দুধও খাঁটি, খাওয়ার পর গোঁফে ইয়া পুরু দুধের সর লেগে থাকে।

পুপসির দিদা প্রীতিলতা অনেকক্ষণ ধরেই রান্নাঘরে যাওয়ার জন্য উসখুস করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন বাসন্তীকে,—হ্যাঁ রে, আজ রাতে কী খাবার?

—লুচি বেগুনভাজা আলুচচ্চড়ি আর পেঁড়া।

—ব্যস্? মুরগি-টুরগি কিছু হচ্ছে না?

মেনু ঠিক করার দায়িত্ব ভানুমামার। তাকে এবার টিমের ম্যানেজার করা হয়েছে। এসেই একটা সাইকেল জুটিয়ে সে বাজারে ছুটেছিল, নিয়ে এসেছে গাদাখানেক ময়দা, ঘি, আলু বেগুন লঙ্কা পেঁয়াজ, আর মধুপুরের বিখ্যাত পেঁড়া। দোকানেই সে খান আষ্টেক পেঁড়া সাঁটিয়েছে, বাড়ি আসতে আসতে আরও গোটা পাঁচেক।

ভানু গম্ভীর ভাবে বলল,—না মাতাশ্রী। আজ সারাদিন প্রচুর উল্টোপাল্টা খাওয়া হয়েছে, রাত্তিরবেলা শুধু লুচি চচ্চড়িই ভাল।

প্রীতিলতা ঘোর আমিষাশী। মুখ বিকৃত করে বললেন,—অ্যাহ্, বেড়াতে এসে মুরগি-মাটন ছাড়া মুখে রোচে?

পুপসি মাছমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার সামনে আমিষ খাওয়ার গল্প করলেও সে আহত হয়। দিদাকে জ্ঞান দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল,—দ্যাখো দিদা, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। এই যে তোমরা মুরগি-ভেড়া জবাই করো, জানো তাদের আত্মারা তোমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়? তোমাদের অভিশাপ দেয়?

মুনা খিলখিল হেসে উঠল,—মুরগিভূত? ভেড়াভূত?

—ঠাট্টা কোরো না মুনাদিদি। ভেবো না স্কুলে পড়াচ্ছ বলে সব জেনে গেছ! পুপসি রীতিমতো গোমড়া,—মানুষ মরে ভূত হতে পারে, জীবজন্তুরা পারে না?

কঙ্কা শীতে জড়োসড়ো হয়ে পুপসির মায়ের গা ঘেঁষে বসে। কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলে উঠল,—আবার ভূত-টুতের কথা বলছ কেন?

মুনা বলল,—ওমা, কী বোকা রে তুই! ভূতের ভয় পাচ্ছিস?

পুপসির দাদু ধীশঙ্কর বললেন,— ভূতকে কে না ভয় পায়?

—কেন ভয় পাও? তুমি কি কখনও ভূত দেখেছ?

—দেখেছি বৈকি। ধীশঙ্কর ভাল করে গায়ে শালটা জড়িয়ে নিলেন,—জানিস তো, একসময়ে আমার কীরকম ফুটবলের নেশা ছিল। মোহনবাগান ক্লাবে না গিয়ে একদিনও থাকতে পারতাম

না। একদিন ক্লাব থেকে বেরিয়ে আমি আর আমার বন্ধু দরবারি ধর্মতলার দিকে যাচ্ছি...ময়দানের মধ্যে দিয়ে গেলে অনেকটা শর্টকাট হয়, ময়দান ধরেই চলেছি...ঘুরঘুট্টে অন্ধকার, বেশ তাড়াতাড়িই মাঠটুকু পার হচ্ছিলাম আমরা, তখনই স্পষ্ট পেছনে একজনের গলা,—দাদা, আপনাদের কাছে কালকের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের টিকিট হবে? চমকে তাকিয়েছি দু'জনে। ওমা, দেখি কেউ কোত্থাও নেই। ভাবলাম আমাদের শোনার ভুল। আবার দু' পা এগিয়েছি, আবার এক প্রশ্ন! ঘুরলাম, কেউ নেই। তারপর এক পা করে হাঁটছি, আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। গলার স্বরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কিন্তু ধারে কাছে একটি প্রাণীও নেই। আমরা দুই বন্ধু ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলাম। হাঁটুতে হাঁটু লেগে যাচ্ছে। দরদর ঘামছি...

মুনা কাঁধ ঝাঁকাল,—এতে কী প্রমাণ হয়? তোমরা দেখতে তো কাউকে পাওনি!

—তা পাইনি। কিন্তু...

—কী কিন্তু?

—আজব এক কাণ্ড হলো। আমাদের পকেটে তখন সত্যি সত্যি টিকিট ছিল, আমি আর দরবারি যুক্তি করে একটা টিকিট ঘাসে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে জোর বাতাসের ঝাপটা এল একটা, আর টিকিটটা সোঁ করে উড়ে চলে গেল। ব্যস্, তারপর ওই গলাও থেমে গেছে। আর নো প্রশ্ন, নো রিকোয়েস্ট।...এটাকে কি ভূতের এভিডেন্স বলা যায় না?

টুকটুকি দাদুর হাঁটু চেপে ধরেছে,—ভূতের গল্প থাক না দাদু।

কিন্তু ভূতের গল্প একবার শুরু হলে আর কি থামে? তার ওপর যদি এমন একটা শীতের রাত হয়, যেখানে আলো-আঁধার মিশে একটা আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছে?

দেখা গেল ঘরের অনেকেই কখনও না কখনও দেখা পেয়েছে ভূত-পেত্নীদের। পুপসির বাবা নাকি একবার এক সাইকেল ভূতের পাল্লায় পড়েছিল। পুপসির ঠাকুমা পড়েছিলেন মেছো ভূতের কবলে। প্রীতিলতাকে নাকি একবার মাদ্রাজি পেত্নী তাড়া করেছিল, প্রাণপণে পো পো বলে তিনি তাকে বিদায় করেছিলেন। ভাগ্যিস প্রীতিলতার জানা ছিল তামিলে 'পো' মানে 'যা'! পুপসির মাও বাদ যায়নি, সে নাকি একবার এক ব্রহ্মদত্যির খপ্পরে পড়েছিল। ভারী ছিঁচকে ছিল ভূতটা। আসানসোলে থাকার সময়ে সুমিত্রা একটু অন্যমনস্ক হলেই নাকি কলাটা মুলোটা হাপিশ করে দিত পাশের বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি।

একমাত্র দেখা গেল পুপসির ঠাকুরদা নিখিলনাথেরই কপাল খারাপ। তাঁর চোখের জ্যোতি বরাবরই ক্ষীণ, সে জন্যই নাকি তাঁর এ জীবনে ভূতের দর্শন পাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে মৃদু আফসোসও আছে তাঁর।

ভানুমামা আর মুনা ভূতের গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

ভানু বলল,—আরে ছোঃ। তোমরা কখনও সাহসী লোকদের ভূত দেখতে দেখেছ?

সঙ্গে সঙ্গে মুনা সায় দিল,—ঠিক ঠিক। ভূত শুধু ভীতু মানুষদেরই দেখা দেয়। ভূত মানুষের মনের ভুল। দুর্বলতা।

পুপসি চেঁচিয়ে উঠল,—মোটেই না। ভূত সব্বাইকে দেখা দেয়। আমার কাছে একদিন একটা হরিণের ভূত এসেছিল। জলে ভরা কী করুণ দুটো চোখ! অবিকল মানুষের গলায় বলল, তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন গো? বিনা কারণে কেন আমাদের মেরে ফেলো?

—পেছন পেছন কোনও বাঘের ভূত আসেনি? হরিণের ভূতটাকে খেতে? ভানু অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল,—তোদের মতো লেবদুসকে নিয়ে আর পারা যায় না। ভয় পেয়ে পেয়ে তুই যেন কেমন কেবলি হয়ে গেছিস।

ত্রিভুবন দরজায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে বলে উঠল,—অমন কথা বোলো না ভানুদাদা, তেনারা শুনলে রাগ করবেন।...জানো, এ বাড়ির বাগানেও তেনারা আছেন!

—তাই নাকি? ক'জন আছে?

—একজন তো প্রায়ই দেখা দেন। এক বুড়ি। ওই কুয়োপাড়ের আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়েছিল। কেন এখানে এসে মরল কে জানে, হঠাৎ একদিন সকালে কুয়োর জল তুলতে গিয়ে দেখি...

—তুমি কি সেই দশ বছর আগের ঘটনাটা বলছ? পুপসির ঠাকুমা সান্ত্বনা জিজ্ঞেস করলেন,—সেই বুড়িটা এখানেই কোন গাঁয়ে থাকত না?

—হ্যাঁ মা, ঠিকই ধরেছেন। ছেলেরা দেখত না মাকে, বড় দুঃখী ছিল বুড়িটা।

—সে যে ভূত হয়ে এখানে আছে আগে বলোনি তো?

—আপনারা ভয় পাবেন বলে বলিনি। দেখেননি, আপনারা এখানে এলে আমি আপনাদের সন্ধ্যের পর কুয়োতলায় যেতে বারণ করি? সে তো ওই বুড়ির জন্যই। ছেলে দুটো গিয়ে যদি গয়ায় পিণ্ডি চড়িয়ে আসত, তাহলে হয়তো বুড়ি শান্ত হতো। এখন তো ফি পূর্ণিমা-অমাবস্যাতেই আসছে।

—এসে কী করে? ভানু চোখ ঘোরাল,—হাঁউমাউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ বলে?

—না গো দাদা, খালি কাঁদে। ছেলেপিলেরা অবহেলা করলে মায়ের মরে গিয়েও যে দুঃখ যায় না গো।...মাঝে মাঝে অবশ্য ডাকেও যেন কাকে। মনে হয় ছেলেদেরই।

—বেশ জম্পেশ গপ্পোটা ফেঁদেছ তো? ভানু খ্যাক খ্যাক হাসছে,—তা অমাবস্যাটা কবে? তেনাকে কি দেখা যাবে?

—যেতেই পারে। কালই তো অমাবস্যা। না না, আজই তো পড়ে গেছে।

—বাহ্। তা এলে আজ একবার ডেকো। বুড়ির সঙ্গে একটু গপ্পোসপ্পো করা যাবে। চাই কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি ওকে স্বর্গের রাস্তাটাও দেখিয়ে দিতে পারি।

গল্পে গল্পে রাত বাড়ছে। পথশ্রমে সকলেই আজ অল্পবিস্তর ক্লান্ত, খাওয়ার ডাক পড়তেই সবাই মিলে ছুটেছে একতলায়। আহারপর্ব চুকিয়েই যে যার মতো কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে পড়েছে লেপ-কম্বলে।

দোতলার একটা ঘরে মুনা-পুপসি শুয়েছে। পাশের ঘরে ভানুমামা। কঙ্কা-টুকটুকি ভয়ে বেজায় কাতর, তাদের মা-বাবা

সঙ্গে আসেনি বলে কোথাও তারা ভরসা পাচ্ছে না। দু'জনে গুটিসুটি আশ্রয় নিয়েছে দাদু-ঠাকুমার খাটে।

গভীর রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল পুপসির। কেমন যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে! কান পাতল। শব্দ কোথায়? এ তো গলার আওয়াজ! কে যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে না?

মুনাকে ঠেলল পুপসি,—এই মুনাদি, ওঠ্।...শোন্।...শুনতে পাচ্ছিস?

মুনা অতি কষ্টে লেপ থেকে মুখ বার করল,—কী শুনব?

—কে যেন...!

আর বলতে হলো না, গলার আওয়াজটা মুনার কানেও পৌঁছে গেছে। মিহি স্বরে কে যেন আবার ডাকল,—মুনা...পুপসি...?

মুনা পুপসির হাত খামচে ধরল,—উরি বাবারে! উরি বাবারে!

পুপসি ডুকরে উঠল,—তখনই বলেছিলাম আত্মা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করিস না! এখন কী হবে?

—কী করি বল তো?

—রাম নাম কর। রাম নাম কর।

ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা সব উবে গেছে। রাম নাম জপ করছে দু'বোন। আশ্চর্য, আওয়াজটাও থেমে গেল!

একটু বুঝি ধাতস্থ হয়েছে দু'জনে, হঠাৎই একটা ধুপ করে শব্দ!

মুনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—ওটা কী হলো রে?

—বুড়িটা বোধহয় গাছ থেকে নেমে এল।

আর কোনও কথা নেই, দুই বোন হুড়মুড়িয়ে ছুটেছে পাশের ঘরে,—ভানুমামা...ভানুমামা...?

ভানুর দরজা ভেজানোই ছিল। আলগা ধাক্কা দিতেই খুলে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে লেপের ভেতর থেকে ভানুর আর্ত চিৎকার,—ওরে বাবা রে! এসে গেছে রে! ছেড়ে দাও রে! আর কিছু বলব না রে!

দুই বোন কোরাসে ডেকে উঠল,—ভানুমামা, আমরা। মুনা-পুপসি। তুমিও কি আমাদের মতো ভয় পেয়ে গেছ?

—ও, তোরা! ওমনি তড়াক করে উঠে বসেছে ভানু,—দেখলি তো, কেমন ভয় পাওয়ার অ্যাক্টিংটা করলাম!

ঘরে মৃদু হ্যারিকেনের আলো। মুনা-পুপসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

পুপসি বলল,—তুমি কিছু শোননি?

—কী শুনব?...যত্ত সব ভীতুর ডিম! য্যা য্যা, শুয়ে পড় গিয়ে।

বলেই আবার শোয়ার তোড়জোড় করছে ভানু। কিন্তু লেপে আর মাথা ঢোকাতে হলো না। ফের শুরু হয়েছে মিহি স্বরের আহ্বান। এবার রীতিমতো কাছ থেকে। একেবারে স্পষ্ট গলা,—ওরে, আমি এসেছি, দরজা খোল। ওরে মুনা-পুপসি...ভানুমামা-আ- আ...

শেষ সম্বোধনটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে যেন প্রলয় ঘটে গেল। লেপ-মশারিসুদ্ধ হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেছে ভানু। লেপের ভেতর থেকে অবিকল একটা ম্যান-রোল হয়ে চিঁ চিঁ করছে,—ওরে, ভানুমামা বলে ডাকে কেন রে? আমি কোন সুবাদে ও বুড়ির মামা হলাম রে?

মিহি স্বর আর হাঁকাহাঁকিতে থেমে নেই, দুমদাম ধাক্কা দিচ্ছে নিচতলার দরজায়,—কী হলো, দরজা খোল। আমি আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ভানুর দাঁতকপাটি লেগে গেছে। ঠকঠক কাঁপতে কাঁপতে বলে চলেছে,—দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চলে যা না।

—কী গো, দরজা খুলবে না? আমি কি দরজা ভেঙে ফেলব? এবার রীতিমতো শাসানি,—একবার ভেতরে ঢুকি, তোমাদের সবার আমি মজা দেখাচ্ছি।

—সর্বনাশ করেছে! ওরে মুনা, ওরে পুপসি, আর বুঝি রক্ষা নেই। বুড়ি আমার মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলবে!

বাড়ির সকলেই প্রায় জেগে গেছে। থম মেরে আছে সকলে। যেন কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে চলেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। কঙ্কা-টুকটুকি উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দিল।

ক্রুদ্ধ মিহি গলা এবার ক্রমশ করুণ,—খুলবে না কেউ? আমি যে ঠাণ্ডায় জমে গেলাম। অনেক তো হলো, আর কেন শাস্তি দিচ্ছ?

—আঁইই, এ যে আবার সুর বদলালো! নরম করে ডাকছে! ওরে খুলিসনি, খুলিসনি...

তবু কে যেন খুলে দিল দরজা। মিহি গলা হাঁউমাউ করতে করতে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। তীর বেগে উঠে আসছে।

ভানু অজ্ঞান হয়ে গেল।

সকলে মিলে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাল ভানুর। চোখ খুলেই ভানুর প্রথম বুলি,—বুড়িটা কোথায়? গেছে?

খুকু ঝুঁকল মুখের ওপর,—আমি বুড়ি কেন হব? আমি খুকু। খুকু। বুড়ি তো তোমার দিদির নাম। সে তো এখন কলকাতায়।

ভানু চোখ পিটপিট করল,—খুকু তুই? তুই কোথ্থেকে এলি?

—কলকাতা থেকে। ভাবলাম পেছন পেছন চলে এসে তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিই। মধুপুরে ট্রেন ঢোকার কথা সাড়ে আটটায়, এল সাড়ে বারোটায়। আসানসোলে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে...!

খুকু সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরনে জিনস্, পুলওভার, মাথায় ব্রিটিশ হ্যাট। দেখে কে বলবে এ ছেলে নয়, মেয়ে!

ঘরভর্তি লোকজনকে ঝাঁঝাল গলায় বলল খুকু,—কখন থেকে গেটে এসে চিল্লাচ্ছি...কত কষ্ট করে একটা রিক্সাঅলাকে পটিয়ে-পাটিয়ে স্টেশন থেকে এলাম...কী তোমাদের মরণঘুম, কিছুতেই সাড়া পাওয়া যায় না! শেষে উপায় না দেখে পাঁচিল টপকালাম...জোর জোর দরজা ধাক্কাচ্ছি, তাও তোমরা...

বলতে বলতে খুকু ফের ভানুর দিকে ঝুঁকেছে,—কী ভানুমামা, ভূত ভেবে বসলে? ইশ, তোমাকে আমি এতদিন সাহসী বলে জানতাম,...

ভানু আবার অজ্ঞান। তবে এবার ভয়ে নয়, লজ্জায়।

ছবি : সমীর সরকার

ভজহরি চাকলাদারের গল্প

প্রফুল্ল রায়

পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। ইংরেজি কাগজে বেরুত সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার। এই গল্পটা যারা পড়ছ, তখন তাদের জন্মই হয়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে যে লড়াইটা হয়েছিল তার একদিকে ছিল জাপান, জার্মানি, ইতালি। অন্যদিকে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ। এই বিশ্বযুদ্ধে আমাদের ভারতবর্ষও জড়িয়ে পড়েছিল। কত লোক যে মারা গিয়েছিল তার হিসেব নেই।

মহাযুদ্ধের ইতিহাস নয়, আমি ভজহরি চাকলাদারের গল্প শোনাতে বসেছি।

ভজহরি থাকতেন ভবানীপুরে, আমাদের পাড়াতেই। বেঁটে, মোটা, কালো এবং মাথার আধখানা জুড়ে টাক। বিয়ে করেননি। মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই। বাড়িতে আছেন এক বিধবা পিসিমা আর দু'জন কাজের লোক। বাবা বেশ কিছু টাকা আর বড় বড় দু'খানা তেতলা বাড়ি রেখে গেছেন। রোজগারের চিন্তা নেই। দিব্যি আছেন ভজহরি। কিন্তু মাঝে মাঝে নানারকম বাতিক মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে তাঁর।

হাইট, গায়ের রং এবং টাক নিয়ে ভজহরির মনে বড্ড কষ্ট। টাকে চুল গজাবার জন্য হেকিমি, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কত কিছু করলেন কিন্তু কিছুই হলো না। টাকটা শুধু আরও খানিকটা বেড়ে গেল। এর পর গায়ের রংটা ধবধবে করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কত ওষুধ খেলেন, সর্বাঙ্গে কত রকম মলম ঘষলেন কিন্তু রংটা যেমন ভুষো কালি ছিল তেমনিই থেকে গেল। এবার তিনি ভাবলেন, ধুত্তেরি, রং আর টাক নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না, হাইটটা অন্তত বাড়ানো যাক। রোজ সকাল-বিকেল পাড়ার ক্লাবে গিয়ে প্যারালাল বারে প্রচুর কসরত করলেন, ফুটপাথের একটা গাছের ডাল ধরে মাসখানেক ঝুললেন। সেই সঙ্গে দুই পালোয়ান রাখলেন। তাদের একজন দু'পা ধরে নিচের দিকে টানতে লাগল, আর একজন মুণ্ডু ধরে ওপর দিকে। ফলে টানাটানিতে মালাইচাকি এবং ঘাড়ে এমন চোট লাগল যা সারাতে তিন মাস লেগে গেল। কিন্তু হাইটটা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি এক চুলও বাড়ল না।

তিনটে ব্যাপারে ঘা খেয়ে বেশ কিছুদিন মনমরা হয়ে রইলেন ভজহরি। কিন্তু যাঁর মস্তিষ্কে সবসময় বাতিকের চাষ চলছে তিনি কি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন?

হঠাৎ ভজহরি ঠিক করলেন অল ইন্ডিয়া সুইমিং কম্পিটিশনে নাম দেবেন। ছোটবেলায় বর্ধমানে মামাবাড়িতে গিয়ে পুকুরে একটু-আধটু সাঁতার হয়তো কেটেছিলেন কিন্তু এতকাল বাদে তা কি আর মনে আছে? থাক আর না-ই থাক, প্র্যাকটিসটা তো করতে হবে। সুইম-স্যুট পরে তিনি ঢাকুরিয়া লেকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জলে নেমে টের পেলেন, সাঁতারের 'স' পর্যন্ত ভুলে গেছেন। খাবি খেতে খেতে ডুবে যাচ্ছিলেন। নেহাত পাড়ে যারা ছিল তাদের কেউ দেখতে পেয়ে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় তাঁকে তুলে নিয়ে আসে। ততক্ষণে সের পাঁচেক জল খেয়ে ফেলেছেন। সেই জল বার করে ভজহরিকে সুস্থ করে তুলতে সময় কম লাগেনি।

কিছুদিন চুপচাপ, হাত-পা গুটিয়ে থাকার পর নতুন বাতিক চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি এখন থেকে পরোপকার করে বেড়াবেন।

মাসখানেক ভজহরি চারপাশের রাস্তা-টাস্তা পর্যবেক্ষণ করে বেড়ালেন। পরোপকারটা কীভাবে কাদের দিয়ে শুরু করবেন, সেটাই দেখে নিচ্ছেন আর কি। হঠাৎ একদিন তাঁর চোখে পড়ল, ডাস্টবিনে রাস্তার পঁচিশ-তিরিশটা বেওয়ারিশ কুকুর নিজেদের মধ্যে তুমুল লড়াই আর কামড়া-কামড়ি করে এঁটোকাঁটা খাবার চেষ্টা করছে। কুকুরগুলো বেজায় রোগা, পাঁজরার হাড় বার-করা। দেখেই বোঝা যায়, পেট ভরে খেতে পায় না। আহা, অবোলা প্রাণী। ওদের দুঃখে মনটা গলে গেল ভজহরির।

পরের দিন থেকেই এলাহি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বাড়ির কাজের লোকদের দিয়ে প্রচুর ভাত, রুটি, মাছ, মাংস রাঁধিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভজহরি। আগে আগে 'তু' 'তু' 'আয়' 'আয়' করে কুকুরদের আদর করে ডাকতে লাগলেন তিনি। পেছনে কাজের লোকেদের হাতে ঢাউস ঢাউস বালতি বোঝাই ভাত, মাংস ইত্যাদি। পাড়ার কুকুররা তো বটেই, অন্য পাড়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরও বহু কুকুর ভোজের গন্ধ পেয়ে হাজির হলো। ভজহরি খুব যত্ন করে তাদের খাওয়ালেন।

দিন পাঁচ-সাতেক নির্বিঘ্নে কুকুরভোজন চলল। তারপরই অঘটনটা ঘটে গেল। একটা বদরাগী কুকুরকে খাবার দিতে দেরি হওয়ায় চটেমটে ভজহরির পায়ের গোছে সে বসিয়ে দিল জব্বর এক কামড়। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। হইহই করে লোকজন ছুটে এসে ভজহরিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল।

কুকুরে কামড়ালে তখনকার দিনে পেটে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে

হতো। সেগুলো নিলে যন্ত্রণাও হতো ভীষণ। ভজহরির পেটে ইঞ্জেকশন নিয়ে ডুমো ডুমো চোদ্দটা সুপুরি তৈরি হয়ে গেল।

অনেকদিন পর তিনি যখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন, কুকুরসেবা বন্ধ হয়ে গেল।

পরোপকারের বাইটা কিন্তু মাথা থেকে গেল না ভজহরির। অসভ্য, ইতর প্রাণীদের ওপর থেকে তাঁর নজর সরে গিয়ে এবার এসে পড়ল মানুষের দিকে। তাঁর মনে হলো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। অনেক আগেই তাদের উপকারের কথাটা ভাবা উচিত ছিল। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কি সীমা-পরিসীমা আছে!

যুদ্ধের সময় কলকাতায় আমেরিকান সৈন্যে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের বলা হতো টমি। শহরের যেদিকেই যাওয়া যাক, অগুনতি সেনা-ছাউনি, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যারাক।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে টমিরা নিজেদের দেশে ফিরে গেল। ফেলে রেখে গেল নানা ধরনের গাড়ি। তারই একটা ভীষণ সস্তায় কিনে ফেললেন ভজহরি।

গাড়িটার অদ্ভুত চেহারা। বিরাট বিরাট হেডলাইট, রামশিঙের মতো আড়াই প্যাঁচওলা পেতলের হর্ন, মাথায় ক্যাম্বিসের হুড।

ভজহরি গাড়ি চালাতে জানতেন। ওই গাড়িটা নিয়ে মানুষের উপকারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রথম উপকারের চেষ্টাতেই প্রচণ্ড ঘা পড়ল।

বিকেলবেলা স্কুল ছুটির পর বার-তের বছরের দুটো ছেলে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পিঠে ব্যাগ, পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম। তারা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। চারপাশে আরও কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

ভজহরি ছেলে দুটির কাছে গাড়ি থামিয়ে হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কী নাম?'

একটি ছেলে বলল, 'নাম জানতে চাইছেন কেন?'

'জানলে কথা বলতে সুবিধে হয়।'

'আমার নাম সিদ্ধার্থ আর ওর নাম শৈবাল।'

'কোন স্কুলে পড়?'

একটা নাম-করা মিশনারি স্কুলের নাম করল সিদ্ধার্থ। কথায় কথায় জানাল তারা একই ক্লাসে পড়ে। দু'জনের ভীষণ বন্ধুত্ব।

ভজহরি এবার বললেন, 'তোমরা কোথায় থাক?'

সিদ্ধার্থ একটু ভালমানুষ ধরনের—সরল, সাদাসিধে। কিন্তু শৈবাল বেশ চালাক-চতুর। সে জিজ্ঞেস করে, 'যেখানেই থাকি না, আপনার কী দরকার?"

'তোমাদের দেখে খুব ভাল লাগল। তাই জানতে চাইছি।'

'আমরা শ্যামবাজারে থাকি।'

'রোজই অতদুর থেকে বাসে করে যাতায়াত কর?'

'না। আমাদের বাড়ির গাড়ি এসে দু'জনকে নিয়ে যায়। আজ গাড়িটা খারাপ হয়েছে। তাই বাসে যাব। এত কথা জানতে চাইছেন কেন?'

ভজহরি গলায় স্নেহ ঢেলে বললেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, ভিড়ের বাসে যেতে কষ্ট হবে। তাই বলছিলাম, আমার গাড়িতে ওঠ। বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সেই সময় কলকাতায় ছেলেধরার ভীষণ হিড়িক চলছে। শৈবাল দারুণ চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, 'এই দেখুন, লোকটা আমাদের গাড়িতে উঠতে বলছে। বাড়িতে পৌঁছে দিতে চায়। নিশ্চয়ই লোকটার খুব খারাপ মতলব।' তার সঙ্গে সিদ্ধার্থও গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে থাকে।

বাসস্ট্যান্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল, হইহই করতে করতে তেড়ে আসে, 'ছেলেধরা—নির্ঘাত ছেলেধরা—মার ব্যাটাকে, মেরে ছাল তুলে ফ্যাল।'

প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে হাতজোড় করে ভজহরি কাতর সুরে বোঝাতে থাকেন, তাঁর কোনও মন্দ অভিসন্ধি নেই, তিনি শুধু সিদ্ধার্থ আর শৈবালের উপকারই করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভজহরির ওপর ততক্ষণে মুষলধারায় কিল চড় ঘুঁষি পড়তে শুরু করেছে। একটা দল রাস্তা থেকে ঢিল, খোয়া, ভাঙা ইট তুলে ছুঁড়তে শুরু করেছে। মুহূর্তে উইন্ড স্ক্রিনের কাচ ভেঙে চুরমার। বনেট দরজা সব তুবড়ে দুমড়ে একাকার। অত সুন্দর পেতলের হর্নটা টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলে পড়েছে।

নিরুপায় ভজহরি প্রাণ বাঁচাতে ডান দিকের দরজা খুলে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে চোঁ চাঁ দৌড়। স্পিড দেখলে মনে হবে ওলিম্পিকে গোল্ড মেডেলটা তাঁর বাঁধা। পৃথিবীর সেরা দৌড়বাজও তাঁকে হারাতে পারবে না।

লোকগুলো অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে আসে। কিন্তু কার সাধ্য ভজহরিকে ধরে। চোখের পলকে তিনি সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যান।

ভাঙাচোরা গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকে। সেটা আর তিনি আনতে যাননি।

এমন একটা লোমহর্ষক ঘটনা যে ঘটে গেল তাতেও বিন্দুমাত্র দমেননি ভজহরি। পরোপকার তাঁকে করতেই হবে। তিনি জানেন, মহৎ কাজে প্রচুর বাধা। তাই বলে লোকের ভাল না করলে চলে!

সিদ্ধার্থ আর শৈবালকে নিয়ে সেই ঘটনার পর দিন কয়েক বাড়িতে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর আবার বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করার জন্য নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ভজহরির একটু-আধটু সিনেমা দেখার শখ আছে। সেদিন নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে যখন ফিরছেন, হঠাৎ মারাত্মক হই-চই কানে এল। মনে হলো, কারা যেন গলা ফাটিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করছে।

মধ্যরাতের নিঝুম রাস্তা। কোত্থেকে আওয়াজটা আসছে? এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে ভজহরি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ডানদিকের একটা বাড়ির দোতলার দরজা-জানালা সব হাট করে খোলা। ভেতরে চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা গেল তিন-চারটে লোক তুমুল চেঁচাচ্ছে এবং পরস্পরের দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে মারামারি খুনোখুনি হয়ে যাবে।

ভজহরি বাড়িটার সামনে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'এই যে মশাইরা, বয়েস তো কম হলো না। এই বয়েসে ঝগড়াঝাঁটি করা কি ভাল, না শোভা পায়?'

কিন্তু লোকগুলো নিজেদের নিয়ে এমনই মত্ত যে ভজহরির গলা তাদের কানে ঢোকে না।

অন্য লোক হলে কী করত? 'মরুক গে, আমার কী?' বলে চলে যেত। কিন্তু ভজহরি চাকলাদার অন্য ধাতুতে তৈরি। তাঁর মাথায় পরোপকারের নেশা প্রচণ্ড চাড়া দিয়ে উঠেছে। লোকগুলো মারদাঙ্গা করে মরবে, সেটা জানার পরও চুপচাপ চলে যাবেন তেমন পাত্রই তিনি নন।

আরও বারকয়েক লোকগুলোকে থামাবার চেষ্টা করেও যখন কাজ হলো না তখন প্রায় মরিয়া হয়ে রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে দোতলা পর্যন্ত উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

ঝগড়া চলছে তো চলছেই। লোকগুলোর তর্কাতর্কি শুনে বোঝা গেল, ওরা মায়ের পেটের ভাই। বাবা হঠাৎ মারা গেছেন, পৈতৃক

বাড়ির ভাগ নিয়ে তাদের যুদ্ধ চলছে।

ভজহরি জানালার শিকের ভেতর দিয়ে নাক ঢুকিয়ে বললেন, 'মশাইরা, মায়ের পেটের ভাই হয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছেন। এটা কি উচিত কাজ হচ্ছে? মাথা গরম না করে মেজাজ ঠাণ্ডা করে মিটমাট করে নিন।'

এইবার কথাগুলো লোকগুলোর কানে গেল। ঝগড়া থামিয়ে জানালার বাইরে এই মাঝরাতে টাক-মাথা একটা লোককে দেখে তারা এতই অবাক হয়ে যায় যে প্রথমটা কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। তারপর হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, 'এই কে রে তুই? কে?'

'আমাকে চিনবেন না। আমি আপনাদের উপকারী বন্ধু ভজহরি চাকলাদার—'

ঝগড়ায় বাধা পড়ায় বেজায় ক্ষেপে গিয়েছিল লোকগুলো। তারা একসঙ্গে হুমকে ওঠে, 'কেমন উপকারী বন্ধু, দেখাচ্ছি! পাইপ বেয়ে উঠে বলে কিনা মিটমাট করে নিন। চল তো ব্যাটাকে ধরি।'

ভেতর দিকের সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে লোকগুলোর নেমে আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। এখানে আর একটি মুহূর্তও থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেগতিক বুঝে হাঁচোড়-পাঁচোড় করতে করতে নিচে নেমেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট।

লোকগুলো ততক্ষণে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'চোর, চোর—'

চোর ধরার মতো মজা আর দ্বিতীয়টি নেই। নিস্তব্ধ রাত্তিরে কোত্থেকে গাদা-গাদা লোক মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে ভজহরির পিছু নেয়।

ভজহরি দেখলেন, বড় রাস্তা দিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কেননা সামনের দিক থেকেও মারমার করতে করতে লোক আসছে। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বড় রাস্তা থেকে সরু প্যাঁচালো গলির ভেতর ঢুকে পড়েন, তারপর তস্য গলি তস্য গলি হয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন, হাঁফাতে হাঁফাতে জিভ বেরিয়ে আসার উপক্রম। হবেই বা না কেন, দু'-আড়াই মাইল রাস্তা তাঁকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে হয়েছে।

'এই কে রে তুই? কে?'

এত যে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট আর দুর্ভোগ, তবু পরোপকারের ভূত ঘাড় থেকে নামল না।

হঠাৎ একদিন ভজহরি খবর পেলেন আমাদের পাড়ারই রামনরেশ পুরকায়স্থ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বয়স সত্তর পেরিয়েছে। তাঁর নাকি এখন-তখন অবস্থা। যে কোনও মুহূর্তে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে।

রামনরেশ থাকতেন তাঁর এক ভাইপোর কাছে। ভাইপো যাদব মানুষ ভাল কিন্তু খুব ছোটখাটো চাকরি করত, কোনও রকমে সংসার চলে।

রামনরেশের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল ভজহরির। তিনি মারা গেলে হয়তো পয়সার অভাবে ভালভাবে তাঁর শেষ কাজ করা যাবে না। সুতরাং ভজহরির হাতে-পায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি এক ঘণ্টার ভেতর রামনরেশকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য লোক যোগাড় করে ফেললেন, নতুন খাট আর প্রচুর ফুল কেনা হলো, ভিখিরিদের বিলোবার জন্য থলে ভর্তি করে অজস্র রেজগি নিলেন, রাস্তায় ছড়াবার জন্য বড় বড় ধামাভর্তি খই কিনলেন। এমনকি একটা কেত্তনের পার্টিও জোটালেন।

সবাইকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে হাসপাতালে এসে ভীষণ দমে যেতে হলো ভজহরিকে। রামনরেশ এর মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠে বিছানায় বসে দুধ আর বিস্কুট খাচ্ছেন।
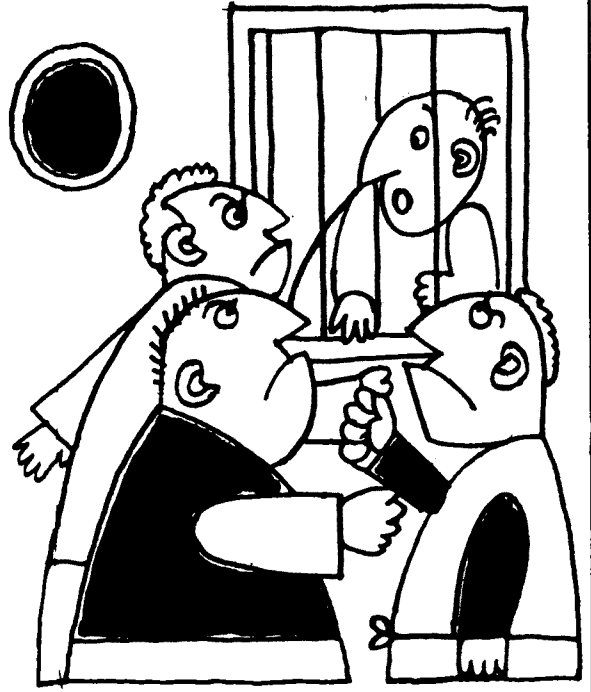
প্রথমটা মুষড়ে পড়লেও, দু-চার মিনিটের ভেতর আবার ঠিক হয়ে গেলেন। এতবড় একটা আয়োজন নষ্ট হয়ে যাবে, তা তো আর হতে দেওয়া যায় না।

ভজহরি অন্য পেশেন্টদের কেবিনে কেবিনে ঘুরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'আপনাদের খাট, ফুল, কেত্তনের দল দরকার? কোনও খরচ লাগবে না। সব রেডি আছে—'

তখন হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার্স। প্রতিটি রোগীকে তাদের বাড়ির লোকজন দেখতে এসেছে। তারা বেজায় চটে গিয়ে দূর দূর করে ভজহরিকে তাড়িয়ে দিল।

ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে শেষ রোগীটির কাছে এসে প্রস্তাবটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। এই পেশেন্টের বাড়ি থেকে যণ্ডামার্কা জনকয়েক আত্মীয়স্বজন এসেছিল। তারা মারাত্মক ক্ষেপে গিয়ে হুমকে উঠল, 'হতচ্ছাড়া বদমাশ, জ্যান্ত লোককে মেরে ফেলতে চাইছ। তোমার বজ্জাতি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।' বলেই বেদম মার শুরু করল।

ওয়ার্ডে অন্য লোকজন যারা ছিল তারা এসে যখন ভজহরিকে ছাড়িয়ে আনল তখন তাঁর মাথায় সিকিভাগ চুল নেই, কপালে দু'-তিনটে আলু গজিয়ে গেছে, দুটো দাঁত ভাঙা, মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। তা ছাড়া ডান পায়ের মালাইচাকি আর বাঁ হাতের হাড় চুরমার হয়ে গেছে।

ওই হাসপাতালেই ভজহরিকে ভর্তি করা হলো। এখন তাঁর সারা গায়েই ব্যান্ডেজ আর প্লাস্টার; নাকে নল। বেডে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবলেন, জীবনে কোনও দিনই আর কারও উপকার করবেন না।

ছবি : বিজন কর্মকার

মহানায়ক ভোলেননি

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স। প্যারিসের কোনো এক স্কুলে পড়ত ফুটফুটে একটি ছেলে। স্কুলের আর পাঁচটা ছেলের মতোই সে ছুটোছুটি, দুরন্তপনা করে বেড়ায়।

স্কুলের পাশেই ছিল ছোট্ট একটি দোকান। এক প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন দোকানটির মালকিন। ছোট ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসতেন তিনি। ফলে, স্কুলের ছেলেদের তিনি ছিলেন খুবই আপনজন। রংবেরং-এর পেন্সিল থেকে শুরু করে নানারকম মুখরোচক খাবার—সব কিছুই মিলত তাঁর দোকানে. অতএব সারাক্ষণ সেখানে ছেলেদের ভিড় লেগেই থাকত। অনেক সময় পকেটে পয়সাকড়ি না থাকলেও ছেলেদের বাকিতেই জিনিস দিয়ে দিতেন তিনি, ধারশোধ হবে কিনা সে চিন্তা না করেই।

এই ছেলেটিও সময় পেলেই হানা দিত প্রৌঢ়ার দোকানটিতে, নানারকম খাবারদাবার, জিনিসপত্তর কিনত। প্রৌঢ়াও ছেলেটিকে খুব স্নেহ করতেন।

একদিন টিফিনের সময় ছেলেটি একটু কাঁচুমাচু মুখে দোকানে এসে দাঁড়াল। কী যেন সে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। মহিলাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী গো ছেলে, কী খাবে আজ?

ছেলেটি বাধো বাধো গলায় জানাল, কী করে খাবার কিনব, আজ বাড়ি থেকে পয়সা আনতে ভুলে গেছি যে!

এই কথা? হেসে ফেললেন প্রৌঢ়া, তাতে কী হয়েছে? তোমার যা লাগবে নাও না। পরে একসময় পয়সা দিয়ে যেও।

ছেলেটি তো প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। এর আগে সে কখনো ধারে জিনিস নেয়নি। মহিলাটি তাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত তার হাতে একটা বড় কেক আর দু'খানা বিস্কুট গুঁজে দিলেন। ছেলেটির মুখ
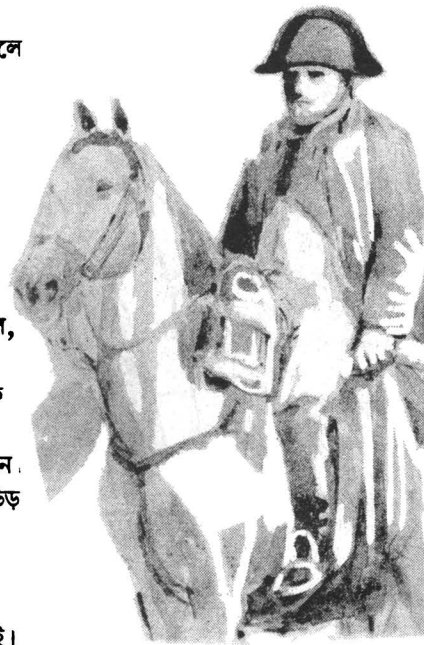
দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বেচারির খুব খিদে পেয়েছে।

এর পরদিন থেকেই স্কুলে দীর্ঘদিনের জন্য ছুটি পড়ে গেল। ছুটির পর স্কুল খুললে দেখা গেল সেই ছেলেটি আর আসছে না। প্রৌঢ়া মহিলাটি ভাবলেন, পয়সা ফাঁকি দেওয়ার মতো ছেলে ও নয়। হয়তো এই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, তাই আর এদিকে আসতে পারছে না। নিশ্চয়ই আসবে কোনো একদিন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেকগুলো বছর।

ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এখন দেশের সর্বাধিনায়ক। গোটা ইউরোপ মহাদেশ তাঁর ভয়ে তটস্থ।

হঠাৎ একদিন প্যারিসের এক পল্লীতে শোরগোল উঠল—নেপোলিয়ন আসছেন! নেপোলিয়ন আসছেন!

খানিকক্ষণ পর নেপোলিয়ন এসে পৌঁছলেন সেখানে। সাদাসিধা পোশাক, সঙ্গে পারিষদবর্গের ভিড় নেই। একটা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে ফেললেন তিনি। এখানেই তিনি ছোটবেলায় পড়েছেন বেশ কিছুদিন। তারপর তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন পাশেই একটি ছোট্ট দোকানের দিকে।

দোকানে বসেছিলেন এক অতিবৃদ্ধা মহিলা। নেপোলিয়ন সোজা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বুড়ি মা, চিনতে পারছেন আমাকে? একদিন আমার পকেটে পয়সা ছিল না, আপনি ধারে কেক আর বিস্কুট দিয়ে আমার খিদে মিটিয়েছিলেন। মনে পড়ে সে কথা?

বুড়ি তো হতবাক! সেদিনের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। নেপোলিয়ন বলাতে এক নিমেষে সেই সুদূর অতীতের ঘটনা মনে পড়ে গেল তাঁর। সেদিনকার সেই ছটফটে, মিষ্টি ছেলেটি যে একদিন মহাপরাক্রান্ত রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন হয়ে উঠবে, আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিনটির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেবে—এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ক্ষীণ, ঝাপসা দৃষ্টি মেলে তিনি নেপোলিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, মুখে কোনো কথা সরল না তাঁর।

নেপোলিয়ন এবার পরম সমাদরে বুড়ির হাতখানি তুলে ধরে তাতে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি গুঁজে দিয়ে বললেন, এতেও কিন্তু সেদিনের খাবারের দাম শোধ হলো না, বুড়ি মা। আমার লোক মাঝে মাঝে এসে আপনার খোঁজ নিয়ে যাবে।

এবার আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন, তাঁর চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য চকচক করে উঠল। নেপোলিয়ন শুধু একজন মহাবীরই ছিলেন না—তিনি ছিলেন দয়া, মায়া এবং মানবিক গুণসম্পন্ন এক মহান মানুষ। বৃদ্ধা একদৃষ্টে তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছবি : বিজন কর্মকার
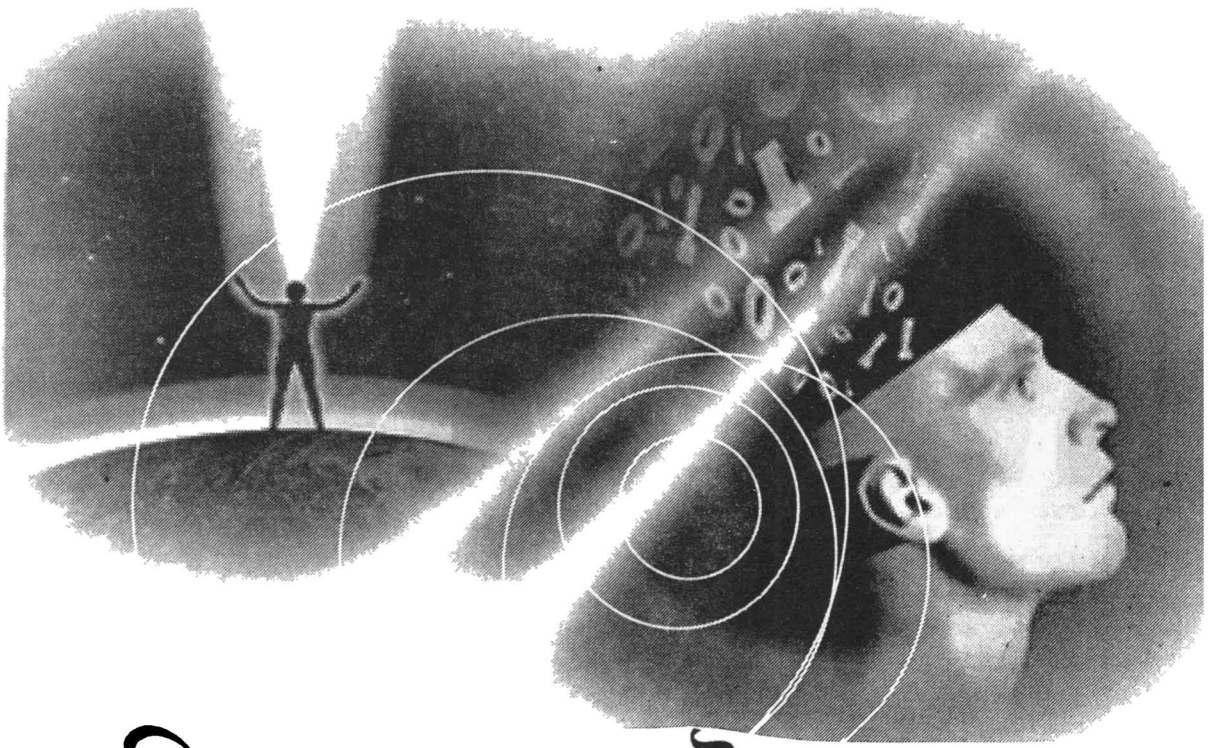
বিজ্ঞান এভাবেই এগোয়

শ্যামল চক্রবর্তী

উইলহেলম রনজেন। জার্মান দেশের বিজ্ঞানী। রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কর্তা। ১৯০১ সালে আলফ্রেড নোবেলের টাকায় যখন পুরস্কার চালু হয়েছিল, সবাই একবাক্যে রনজেনকে পুরস্কৃত করার কথা বলেছিলেন। কেন ? কারণ সবাই বুঝেছিলেন এই আশ্চর্য আবিষ্কার মানুষের অশেষ উপকারে আসবে। পরিচিত বন্ধুরা মিতবাক বিজ্ঞানী রনজেনকে বুঝিয়েছিলেন, 'এমন রশ্মির স্রষ্টা তুমি, পেটেন্ট নিচ্ছো না কেন ?' মুচকি হেসে নিরুত্তর থাকতেন রনজেন। বন্ধুরা বুঝতে পারতেন, তিনি গররাজী।

চোট পেয়ে হাড় ভাঙলে বা বাইরে থেকে দেখা যায় না এমন সব অসুখেই আজকাল 'এক্স-রে' করা হয়। পাড়ায় পাড়ায় এখন এক্স-রে ক্লিনিক।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই এক্স-রশ্মিকে নানা কাজে লাগিয়েছেন। একটা বড়ো কাজ হলো, কেলাসের গঠন বের করা। কেলাস কি আমরা অনেকেই জানি। মৌলের কেলাস হয়। যৌগেরও কেলাস হয়। কেলাসের ভেতর পরমাণু বা আয়নেরা একটা নিয়মে পরপর সাজানো থাকে। কখনোই অগোছালো নয়। অগোছালো হলে তখন তাকে আর কেলাস বলা হয় না। যে কোনো নতুন জিনিসের গঠন জানতে চাওয়াটা বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কেম্ব্রিজের ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারে পিতাপুত্র মিলে এই কাজ অপূর্ব উপায়ে সমাধান করেছিলেন। বাবা তখন উইলিয়াম ব্র্যাস। ছেলে লরেন্স ব্র্যাস। বাবার জন্মকাল ১৮৬২। ছেলের জন্মকাল ১৮৯০। ১৯১৫ সালে বাবা ও ছেলে মিলে যখন নোবেল পুরস্কার ঘরে তুলেছেন, বাবা তখন যথার্থই প্রবীণ। ছেলে মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক। এতো কম বয়েসে কেউ আজ পর্যন্ত নোবেল লাভ করেননি।

যেই উপায়টা জানিয়ে দিলেন দুনিয়ার কাছে, নানা দেশের বিজ্ঞানীরা অমনি তাকে কাজে লাগাতে নেমে পড়লেন। নতুন নতুন কেলাস পেলেই আর কথা নেই। দিনরাত মেতে থাকছেন তাকে নিয়ে। ভেতরকার গঠনটা জানতেই হবে।

বিল অ্যাসটবুরি। লিডস শহরের উল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতেন। সুতোর মতো প্রোটিনের কেলাস নিয়ে আজীবন কাজ করেছেন। উল, শিং, নখ, চুল—আরও কত কি! ব্র্যাস পিতাপুত্রের ফন্দি কাজে লাগিয়ে এদের কেলাসের গঠন বের করেছেন। দু'রকম কেলাস তাঁর চোখে পড়েছিল। নাম দিয়েছিলেন তাই, আলফা-কেলাস আর বিটা-কেলাস। নামটুকুর বাইরে আর কিছুই বলছি না এখন।

একটা দালানবাড়ি একগাদা ইট দিয়ে তৈরি হয়। একটা প্রোটিন তেমনি অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিডে তৈরি। অন্নদাশঙ্কর রায় সে-ই কবে লিখেছিলেন, ছোট ছোট মেয়েগুলি কি দিয়ে তৈরি, ছোট ছোট ছেলেগুলি কি দিয়ে তৈরি, তেমন-ই আর কি।

সুতোর মতো প্রোটিন হলেই আলফা
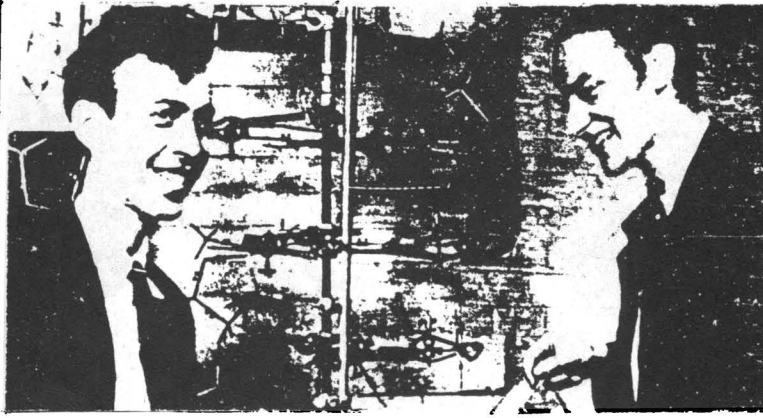
জেমস ওয়াটসন। ফ্রান্সিস ক্রিক।

আর বিটা গড়ন হয়—অ্যাসটবুরির এই মতটা বহুকাল চালু ছিল। এই ভুবনে নতুন হাওয়া নিয়ে এলেন ক্যাভেনডিশের আরও দু'জন বিজ্ঞানী। ব্র্যাস পিতাপুত্রের কাছাকাছি ঘরেই ওঁরা কাজ করতেন। একজন ম্যাকজ পেরুজ। অন্যজন জন কেন্দ্রু। ১৯৫০ সাল নাগাদ বললেন ওঁরা, শুধু সুতোর মতো প্রোটিনে নয়, গোলগাল চেহারার দুই প্রোটিন হিমোগ্লোবিন আর মায়োগ্লোবিনেরও একই চেহারা দেখা গেছে। লরেন্স ব্র্যাস বারবার বলেছেন তাঁর ছাত্রদের, হাতের কাছে যে কোনো প্রোটিনের কেলাস পেলেই তার একটা মডেল বানাতে চেষ্টা কর। হিমোগ্লোবিনের ক্ষমতার তুলনা নেই। রক্তের প্রোটিন। যা ছাড়া জীবন বাঁচে না। দিনরাত ভেবেচিন্তে অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে মডেল বানালেন একটা। ব্র্যাস, পেরুজ আর কেন্দ্রুর নামে রয়েল সোসাইটির প্রসিডিংস-এ সেই কাজ ছাপা হলো।

এক শনিবার সকালবেলা লাইব্রেরিতে জার্নালের পাতা উল্টাচ্ছিলেন পেরুজ। আমেরিকা থেকে বেরোয় ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর পত্রিকা। খুব নামডাক কাগজটার। সেই কাগজে আরও নামডাকওয়ালা একজন মানুষ প্রোটিনের গঠন নিয়ে একটার পর একটা লেখা ছাপিয়েছেন। মানুষটি আর কেউ নন, লাইনাস পাউলিং। বিশ শতকের বিস্ময়। জীবনে দু'বার নোবেল পেয়েছেন। পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলে বারবার আমেরিকা সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁর জীবনকথা পড়লে আমাদের মনের জোর হাজার-লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। পরে সময় হলে কখনো নিশ্চয়ই বলব।

পাউলিং-এর পেপার পড়ে পেরুজের আনন্দ ধরে না। গঠন বলতে গিয়ে পেরুজ ঘোরানো সিঁড়ির পাকের মতো একটা ছবি ভেবেছিলেন। দুটো পাকের মাঝে ফারাক বলেছিলেন ৫.১ সেন্টিমিটার। আশ্চর্য, পাউলিং যা বলেছেন, তার সঙ্গে পেরুজের কথার হুবহু মিল। ঘোরানো সিঁড়ির মতোই পাক রয়েছে। তবে দুই পাকের ফারাক বলেছেন ৫.৪ সেন্টিমিটার। একটা বড় কাজ সমাধা করেছেন পাউলিং। অ্যামিনো অ্যাসিড সাজাতে গিয়ে পেরুজ একটু গায়ের জোরেই এদের বসিয়েছেন। যেভাবে

লরেন্স ব্র্যাস।

সিঁড়ির পাক বানিয়েছেন, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে সব চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারলে এরকম পাক হবার কথা ছিল না। সব চাপ থেকে মুক্তি দেবার মন্ত্র একমাত্র বোধহয় পাউলিং-ই জানেন। পাউলিং-এর ছবিতে দেখা গেল, পাশাপাশি রয়েছে সব অ্যামিনো অ্যাসিড। কেউ কারও ওপর জোর করছে না।

পেরুজ নিজের চুল টানতে লাগলেন আফসোসে। এরকম একটা ছবি কেন তাঁর মনে এল না? কত সহজ, ছিমছাম। পৃথিবীর সব বড়ো জিনিস সহজ আর ছিমছাম হয়। অনেকের চোখে ধরা পড়ে না। অ্যাসটবুরি তাঁর কাজের বেলায় পাকের ফারাক ৫.১ সেন্টিমিটার ধরেছিলেন। পেরুজ আর যাচাই করে দেখেননি। অ্যাসটুবরিকে নির্ভুল মেনেছিলেন। কাল হয়েছে ঐটুকুনই। মাথায় খটকাও লেগেছে। যেভাবে পাক ঘুরিয়েছেন পাউলিং, সেভাবে সচরাচর হবার কথা নয়। ঝড় বইছিল পেরুজের মনে। মাস্টারমশাই বার্নালের কথা মনে পড়ছিল। জীবনের ঠিকানা বুঝতে চাইলে প্রোটিনের গঠন বার করতেই হবে। সব পথ হেঁটে এসেও শেষরক্ষা হলো না। পাউলিং তুড়ি মেরে বেরিয়ে গেলেন। পেরুজ বলছেন, 'পেপারটা দেখে কি যে হচ্ছিল বলতে পারব না। সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে এলাম। ছেলেমেয়েরা ছুটে

লাইনাস পাউলিং।
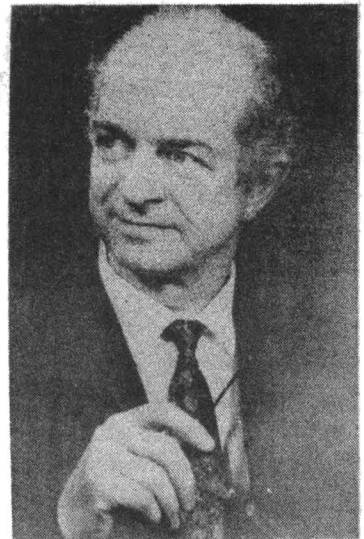
এসে মজা করতে চাইল। যেন চিনতেই পারছি না। স্ত্রী কতো কি জানতে চাইছেন ; আমি নিরুত্তর।'

সারাদিন ভেবে ভেবে কাটল। পাউলিংকে বারবার বুঝতে চাইছেন। একসময় মনে হলো, পাউলিং ঠিক বলছেন না। দৌড়েই প্রায় অ্যাসটবুরির কাছে গেলেন। ঘুরে ঘুরে সব জিনিস দেখতে থাকলেন। ক্যামেরায় এসে চোখ আটকে যায়। এ তো সমতল প্লেট ক্যামেরা। এই ক্যামেরায় কেমন করে পাউলিং-এর দেখা ছবি ধরা পড়বে? অ্যাসটবুরির দোষ নেই কোনো। হাতের কাছে যেমন যন্ত্র, তেমন ছবিই তো দেখবেন।

এবার নিজের ল্যাবে ফিরে এলেন পেরুজ। ঘোড়ার লোম নিয়ে পরীক্ষায় মাতলেন। লোম থেকে প্রোটিন নিয়ে পাউলিং-এর মতোই চোঙাকৃতি ছবি তোলার প্লেট নিলেন। যা ভেবেছেন তাই। ঠিক পাউলিং-এর ছবিটাই ভেসে উঠেছে।

শনিবার কাটল। রবিবারও গেল। কি হলো বাবার? ছেলেমেয়েরা দূর থেকে দেখছে সব। স্ত্রী নিজেও এমনতরো স্বামীকে আগে কখনও দেখেননি। সোমবার ভোরবেলা সব সঙ্গে নিয়ে ব্র্যাসের দরজায় ধাক্কা দিলেন পেরুজ। বললেন যা যা ভেবেছেন, যা যা দেখেছেন। পিঠ চাপড়ে ছাত্রকে তারিফ করলেন ব্র্যাস।

৫.৪ আর ৫.১ সেন্টিমিটারের ঝগড়া মিটবে কেমন করে? দু'বছরে এর কোনো সমাধা হলো না। ফ্রান্সিস ক্রিক আসতেই পেরুজের কাছে আর কোনো কুয়াশা রইল না। রবারের নল আর কয়েকটা কর্ক হাতে নিয়ে দাপটে বুঝিয়ে দিলেন ক্রিক, ছবিটা কখন ৫.৪ সেন্টিমিটার আর কখন ৫.১ সেন্টিমিটার হবে।

কে এই ফ্রান্সিস ক্রিক? ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারেরই বিজ্ঞানী। যিনি পরে ওয়াটসনের সঙ্গে কাজ করেছেন। জেমস ওয়াটসন। দু'জনে মিলে ডি. এন. এ-র গঠন বের করেছেন। এই কাজ বি.বি.সি.-র সমীক্ষায় গত শতকের সবসেরা কাজ বলে অভিনন্দিত হয়েছে।

ছবি: সরোজ সরকার

অশোক সী

পেটুক কী ব্বাস্ খাস হাঁসফাঁস
সামনে যা পাস তা-ই,
সকাল-দুপুর আর রাতভোর
মুখ চলে তোর ভাই!

ভেলপুরী জোর, পনির-মটর
ফ্রাই কি আলুর দম,
বিউলির ডাল, পুঁইশাক ঝাল
লোভ তোর নেই কম!

চাকুম্ চুকুস্ চুকুম্ চাকুস্
দেখে তোর মহাভোজ,
সকলেই ট্যারা হয় বাকহারা
রেখেছে সে যারা খোঁজ!

ঠিক তোর মতো মহাকাশে কত
আজব বস্তু ঘোরে,
ছায়াপথ-গ্রহ-তারাদের সে তো
কাছে পেলে পেটে পোরে!

মনে ভাবি তাই, কিনারা তো নাই
মনেই বেঁধেছে গোল,
খাদ্যের যম করিস হজম—
তুই-ই সেই 'ব্ল্যাকহোল'!

দাদু হেসে ওঠে

কালিদাস ভট্টাচার্য

সকাল থেকে দেখছি দাদুর মুখখানা খুব ভার,
আদর করে আমায় কেন ডাকছে না একবার।
দাদু আমায় দেখছে চেয়ে কিন্তু কাছে এসে
বলছে নাকো কোনো কথা একটুখানি হেসে।
কী করলে হাসবে দাদু ভাবছি অনেকক্ষণ
ভাবতে ভাবতে এক বুদ্ধি পেলো আমার মন।
দাদুর ঘরে গিয়েই আমি শুরু করলুম পড়া
পড়লুম আমি ইংরেজি বই, পড়লুম আমি ছড়া।
দাদু আমায় আদর করে হঠাৎ হেসে ওঠে,
এবং বলে, পড়িসনি তাই হাসিনি আজ মোটে॥

গতাগত পূজা সন্দেশ

চিত্ত পাল

গত পূজায় যা ঘটেছে এই পূজাতে বলছি;
ছাতা মাথায় খালি পায়েই ঠাকুর দেখে চলছি।
ক'দিন আগেই ভোট হয়েছে এবং গেছে বন্যা
তবু কি ছাই শান্ত ছিল বরুণদেবের কন্যা?

বর্ষাবাদল বাজিয়ে মাদল পূজাই দিল মুড়িয়ে
দুগ্গা মাগো এই পূজাতে দিয়োগো প্রাণ জুড়িয়ে।
পূজার ক'দিন আকাশ-বাতাস-মানুষ রেখো সুস্থ
খুশির ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিও অনাথ-আতুর-দুঃস্থ॥

হরির হোটেল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

স্টেশনে ট্রেন থামতে না থামতেই যাত্রীদের মধ্যে হুলুস্থুল বেধে গিয়েছিল। ভিড়ে ঠাসা কামরা। পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ আর গুঁতো টের পাচ্ছিলুম। তারপর দেখলুম, কেউ কেউ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কসরত দেখিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চ্যাঁচামেচি চলেছে। অবশেষে ঠেলা খেতে খেতে যখন প্ল্যাটফর্মে পড়লুম, তখন আমার ওপর দিয়ে অসংখ্য জুতোপরা পা ছুটে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, অন্য সব কামরা থেকেও পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে ছুটে চলেছে।

রাগ করে লাভ নেই। কার ওপরই বা রাগ করব! নিমেষে প্ল্যাটফর্ম নির্জন নিঝুম হয়ে গেল। কাঁধের ব্যাগ আর পোশাক ঝেড়েঝুড়ে রুমালে মুখ মুছলুম। ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে আস্তেসুস্থে চলে গেল। সেই সময় হঠাৎ মাথায় এল, ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছিল সম্ভবত। তাই অত সব যাত্রী প্রাণভয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল!

এতক্ষণে ভয় পেলুম। রাত আটটা বাজে। প্ল্যাটফর্মে আর স্টেশনঘরে আলো জ্বলছে। গেটে মানুষজন নেই। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়ালুম। ডাকাতরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনঘরে ঢুকে হামলা করেছে কিনা দেখবার জন্য উঁকি মারলুম।

নাঃ। স্টেশনঘরে উর্দিপরা এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছেন। তাঁকে বললুম—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

তিনি চোখ না খুলেই বললেন—পারেন। তবে আপনার বরাতে হরির হোটেল আছে।

অবাক হয়ে বললুম—হরির হোটেল মানে?

—হুঁ। এ তল্লাটে নতুন এসেছেন। যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—সেখানে কার বাড়ি যাবেন?

একটু বিরক্ত হয়ে বললুম—সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি।

রেলকোট পরা ভদ্রলোক এবার চোখ খুলে একটু হেসে বললেন—হুঁ। আপনার বন্ধু আপনাকে এখানকার হালহদিস কিছুই জানাননি দেখছি। তা কী আর করবেন? হরির হোটেল এখন আপনার ভবিতব্য।

কথা না বাড়িয়ে বললুম—গেটে টিকিট নেওয়ার লোক নেই। টিকিটটা নেবেন কি?

—টিকিট কেটেছেন? তা এ তল্লাটে নতুন প্যাসেঞ্জার। টিকিট কাটবেন বৈকি। ইচ্ছে হলে দিন। না হলে দেবেন না।

বুঝলুম, এই ভদ্রলোকই স্টেশনমাস্টার। মাথায় হয়তো ছিট আছে। টিকিটটা ওঁর সামনে টেবিলে রেখে বললুম—আচ্ছা, এবার বলুন তো, অতসব যাত্রী ট্রেন থেকে ওভাবে মরিয়া নেমে দৌড়ে পালাল কেন?

—আজ যে শনিবার। তাতে ট্রেন চার ঘণ্টা লেট।

—বুঝলুম না।

—বুঝতে পারবেন। গেট পেরিয়ে নিচের চত্বরে যান।

গেট পেরিয়ে গিয়ে দেখি, কয়েক ধাপ সিঁড়ির নিচে একটা খোলামেলা জায়গা। একপ্রান্তে কিছু দোকানপাট। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করলুম, চত্বর একেবারে জনহীন। আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মল বলেছিল, স্টেশন থেকে নামলেই বাস, সাইকেল রিকশো বা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি একটা কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু কোথায় তারা?

একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে বললুম—পরের বাস কটায় দাদা?

চা-ওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—বাবুমশাইয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

—কলকাতা।

—ঠিক, ঠিক। তা যাওয়া হবে কোথায়?

—কাঞ্চনপুর। পরের বাস কখন আসবে?

—বাবুমশাই! এ রাত্তিরে আর বাস আসবে না। আসবে সেই ভোরবেলা। কেননা রাত্তিরে তো এই স্টেশনে আর কোনও ট্রেন থামে না।

—সাইকেল রিকশো বা এক্কাগাড়ি?

চা-ওয়ালা হাসল।—আজ্ঞে না। খামোকা কেন রাত্তিরবেলা ওরা আসবে? বাবুমশাই! আপনি বড্ড ভুল করেছেন। আসবার সময় দেখেননি সোনাগড় জংশনে হঠাৎ ট্রেনের কামরায় বেজায় ভিড় হয়েছিল?

মনে পড়ে গেল। বললুম—তুমি ঠিক বলেছ। কামরা একেবারে ফাঁকা ছিল। হঠাৎ ওই জংশনে ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলুম।

—ব্যাপারটা হলো, এ তল্লাটের অসংখ্য লোক সোনাগড়ে কলকারখানায় চাকরি করে। তারা প্রতি শনিবারে বাড়ি ফেরে। রোববারটা কাটিয়ে আবার সোমবার সোনাগড় যায়। আপনি যদি ট্রেন থেকে নেমেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে আসতেন, তা হলে হয়তো বাসে বা সাইকেল রিকশো, নয়তো এক্কাগাড়িতে ঢুকে যেতে পারতেন। হ্যাঁ—সহজে পারতেন না। একটু কসরত করতে হতো, এই যা!

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। নির্মলের ওপর রাগ হলো। এই ব্যাপারটা আমাকে তার খুলে বলা উচিত ছিল।

কিন্তু আর রাগ করে লাভ নেই। তাছাড়া নির্মলের মেয়ের অন্নপ্রাশন কাল রবিবার। আমি কবে যাব, নির্দিষ্ট করে তাকে তো বলিনি! শুধু বলেছিলুম—নিশ্চয় যাব। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিস।

বললুম—এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না দাদা?

চা-ওয়ালা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল—না বাবুমশাই! উনুনে আমার রাতের রান্না শেষ করে জল ঢেলে দিয়েছি। আর চা করার কোনও উপায় নেই।

—আচ্ছা, এখানে হরির হোটেলটা কোথায়?

লোকটা যেন চমকে উঠল।—হরির হোটেল? এর আগে কখনও হরির হোটেলে খেয়েছিলেন নাকি?

—না। আমি এই প্রথম এখানে আসছি। হরির হোটেলের কথা স্টেশনমাস্টারের মুখে শুনলুম।

—ও। হরির হোটেলে যখন যাবার ইচ্ছে হয়েছে, চলে যান। তবে একটু দেখেশুনে যাবেন।

বলে চা-ওয়ালা আমার মুখের সামনেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। এখানে দেখছি সবই অদ্ভুত। লোকজনও অদ্ভুত! হরির হোটেলে
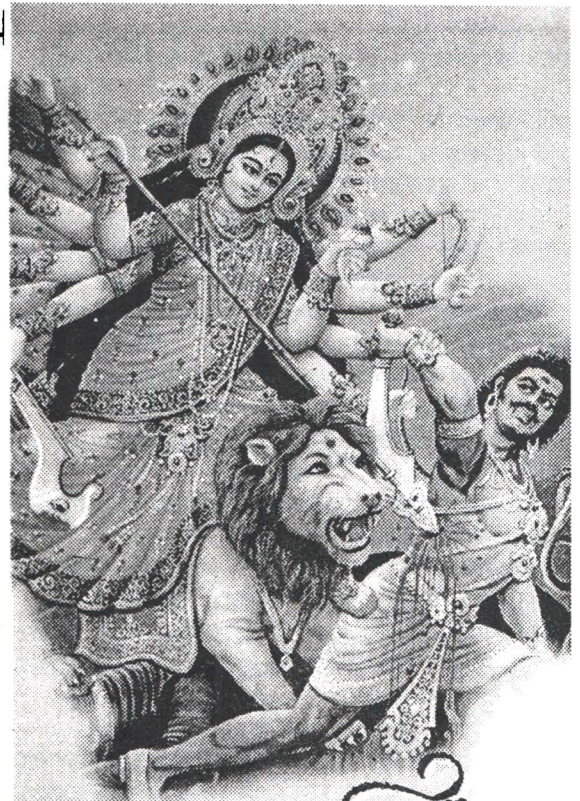
যেতে দেখেশুনে যাব কেন? কিছু বোঝা গেল না।

এতক্ষণে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সব দোকানপাট বন্ধ। শুধু শেষদিকটায় আলো জ্বলছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটা ঘর খোলা আছে। দরজার কাছে টেবিলের সামনে একজন রোগাটে গড়নের কালো রঙের লোক বসে আছে। পরনে ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। ভেতরে দু'সারি লম্বা বেঞ্চের সঙ্গে উঁচু ডেস্ক আঁটা। দেখেই বোঝা যায় এটা একটা হোটেল।

এই তা হলে হরির হোটেল? লোকটি আমাকে দেখেই কেন যেন সবিনয়ে করজোড়ে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করে বললুম—এটাই কি হরিবাবুর হোটেল?

সে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলল—আজ্ঞে স্যার, দয়া করে আমাকে বাবু বলবেন না। আমি একজন সামান্য লোক। বাইরে টাঙানো সাইনবোর্ড দেখুন। লেখা আছে অন্নপূর্ণা হোটেল। কিন্তু এ তল্লাটে সবাই বলে হরির হোটেল।

ঠিক এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, আজ বেলা এগারোটায় খেয়েছি। তারপর ট্রেনে বার তিনেক বিস্বাদ চা। আর একই সময়ে ডাল-ভাত-মাছের ঝোলমিশ্রিত লোভনীয় খাদ্যের তীব্র ঘ্রাণ আমার বাঙালি পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক করল।

সটান হোটেলে ঢুকে কাছের বেঞ্চে বসলুম। ব্যাগটা একপাশে রেখে বললুম—আমার খুব খিদে পেয়েছে। শীগগির ব্যবস্থা করুন হরিবাবু। ডাল-ভাত-যা হোক—

হরি ডাকল—খ্যাঁদা। ও খেঁদু! ঘুমোলি নাকি?

ভেতর থেকে ঢোলা হাফপ্যান্টপরা একটা নাদুসনুদুস গোলগাল গড়নের যুবক এসে একগাল হেসে বলল—তখন তোমাকে বলেছিলুম না হরিদা, দু'মুঠো চাল বেশি করে দিই? আর তরকারি তো অনেক আছে।

হরি বলল—তা হলে স্যারকে একখানা পুরো মিল দে।...

কিছুক্ষণের মধ্যে গোগ্রাসে এক থালা ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ঢেঁকুর উঠল। হাতমুখ ধুয়ে এবং মুছে বললুম—অপূর্ব! খাসা আপনার হোটেলের রান্না। খেয়ে এমন তৃপ্তি জীবনে পাইনি।

হরি বলল—অথচ ব্যাটাচ্ছেলেরা আমার হোটেলের বদনাম রটায়! কী আর বলব স্যার? আমার নামে থানায় পুলিশের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিল। যাকগে সে-সব কথা। আপনি আমার অতিথি। আপনার কাছে দাম নেব না।

কিছুতেই হরি মিলের দাম নিল না। অবশেষে বললুম—ঠিক আছে। তা হলে আমাকে রাত্রে থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া দিন।

হরি জিভ কেটে বলল—ঘর তো নেই স্যার! আমার হোটেল শুধু খাওয়ার হোটেল। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আমি আর খ্যাঁদা ওপরের ঘরে রাত্তির কাটাই। নিচে কি থাকবার জো আছে? নানা উপদ্রবের চোটে অস্থির হতে হবে।

—কী উপদ্রব? হরিবাবু! আমি এই বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটাতে পারব। কোনও উপদ্রব গ্রাহ্য করব না।

হরি হাসল।—আপনার মাথা খারাপ? কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমারও খিদে পেয়েছে। তা আপনি যাবেন কোথায়?

—কাঞ্চনপুর।

—দিব্যি জ্যোছনা রাত্তির! মোটে তো তিন কিলোমিটার রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে চলে যান। কোনও ভয় করবেন না। আমাদের এ তল্লাটে আর যা কিছু থাক, চোর-ছিনতাইবাজ-ডাকাত নেই। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলে যান।

অগত্যা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছি, হরি হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডাকল—স্যার! শুনুন স্যার।

ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমাকে অবাক করে ছ'টা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আমার হাতে গুঁজে দিল। বললুম—অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট কী হবে?

হরি মুচকি হেসে বলল—বাইরের মানুষ। হরির হোটেলে খেয়েছেন। যদি দৈবাৎ অম্বল হয়-টয়। আপনি আমার এ রাত্তিরের একমাত্র খদ্দের স্যার। আপনি আমার সার্টিফিকেটও বটে।

বলে সে হোটেলে ফিরে গেল। আমি এতক্ষণে একটু চিন্তায় পড়লুম। খেতে তো সবই সুস্বাদু মনে হচ্ছিল। তাই খেয়েছিও প্রচুর। প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করতে হয়েছে। কিন্তু অ্যান্টাসিড কেন?

দু'ধারে মাঠ। নির্জন পিচরাস্তায় গুনগুন করে সত্যিই মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে হাঁটছিলুম। জ্যোৎস্নায় চারদিক বেশ স্পষ্ট। কিছুদূর চলার পর মনে হলো পেট বেজায় ওজনদার হয়ে উঠছে। তখন দুটো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকলুম।

আরও কিছুদূর হাঁটার পর পেটের ওজন কমেছে মনে হলো। সেইসময় নেহাতই খেয়ালবশে একবার পিছু ফিরে দেখি, আমার পিছনে কেউ হেঁটে আসছে। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে দাঁড়িয়ে গেলুম। অমনি সেই লোকটাও দাঁড়িয়ে গেল। বললুম—কে?

কোনও সাড়া এল না। একটু ভয় পেলুম। ছিনতাইবাজ বা ডাকাত নয় তো? চলার গতি বাড়ালুম। তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করলুম। যতবার পিছনে তাকাচ্ছি, দেখছি জ্যোৎস্নায় কালো রঙের মূর্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশের মাঠ থেকে একজন-দু'জন করে আরও লোক এসে সেই ছায়ামিছিলকে বাড়িয়ে তুলছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করে বললুম—তোমরা যেই হও, আমার কাছে ডাকাতি করার মতো মালকড়ি নেই। বন্ধুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে উপহার দিতে কিছু পুতুল আর জামা কিনেছি। নগদ টাকাকড়ি যা আছে, তা তোমরা কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করলে প্রত্যেকে একটা আধুলির বেশি পাবে না। কাজেই তোমরা কেটে পড়ো।

আশ্চর্য ব্যাপার, কালো-কালো মানুষের দল স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঘুরে দেখি, তারা সমান দূরত্বে আমাকে অনুসরণ করছে। এরা কারা? অজানা ত্রাসে শিউরে উঠলুম। সাহস দেখিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম—সাবধান! আমার কাছে রিভলভার আছে। আমি কিন্তু পুলিশের লোক। গুলি করে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

কিন্তু এই হুমকিতেও কাজ হলো না। আমি যত দ্রুত হাঁটছি, তারা একই দূরত্বে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালে তারাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত ছায়াকালো মিছিল পিছনে নিয়ে হেঁটে চলা সহজ ছিল না। আমার গলা তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে জলের বোতল নেই। এমনকি একটা টর্চও আনিনি। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি দৌড়ুতে শুরু করলুম। দৌড়ুতে দৌড়ুতে যতবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, সেই বিভীষিকা আমাকে অনুসরণ করছে।

কিছুক্ষণ পরে সামনে ঘন কালো গাছপালার ফাঁকে রাস্তার ধারে একটা মন্দির দেখতে পেলুম। মন্দিরের উঁচু খোলা চত্বরে কারা বসে কথা বলছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই লোকগুলো হইচই করে উঠল।—কে? কে?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম—আমি।

কেউ ধমকে বলল—আমি কে?

—আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। যাব কাঞ্চনপুর। বাস

ফেল করে বড় বিপদে পড়েছি।

একজন বলল—তাই বলুন। তা বিপদটা কী?

—একদল কালো-কালো লোক আমাকে ফলো করে আসছে।

—সর্বনাশ! আপনি কি হরির হোটেলে খেয়েছেন?

—খেয়েছি। বড্ড খিদে পেয়েছিল।

অমনি আবার হইচই পড়ে গেল।—ওরে! এ হরির হোটেলে খেয়েছে রে! কী সর্বনাশ! আবার একা নয়, সঙ্গে হরির হোটেলে খাওয়া পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে এসেছে।

এইসব বলতে বলতে লোকগুলো মন্দিরের পিছনে উধাও হয়ে গেল। তারপর গ্রামের কুকুরগুলো ডাকতে লাগল। আমি এবার কী করব ভাবছি, সেইসময় দেখলুম উঁচু চত্বরের পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললুম—দেখুন তো মশাই, কী অদ্ভুত ব্যাপার? বিপদে পড়ে এখানে ছুটে এলুম। অথচ ওঁরা অমন করে পালিয়ে গেলেন!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল—পালাবারই কথা। আপনি হরির হোটেলে খেয়েছেন কি না!

করুণ স্বরে বললুম—কেন? হরির হোটেলে খেলে কী হয়?

—যে খায়, সে ভেদবমি করে টেঁসে যায়।

—আমি কিন্তু টেঁসে যাইনি। হরিবাবু আমাকে অ্যান্টাসিড দিয়েছিলেন। দুটো খেয়েছি।

—দুটোতে কাজ হয় না মশাই! এখনও আপনার পেটে হরির হোটেলের ভাত আছে তো! তারই গন্ধে যত গণ্ডগোল বেধেছে। কারা আপনাকে ফলো করেছে বলছিলেন যেন?

—হ্যাঁ। একজন-দু'জন করে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। জ্যোৎস্নায় সব কালো-কালো মূর্তি।

—তারা হরির হোটেলে খেয়ে টেঁসে গেছে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। হরির রান্নাটা যে সুস্বাদু! সেই লোভে পড়ে পেট পুরে খেলেই কেলেংকারি। ওরা ভেদবমি করে টেঁসে গিয়েছে বটে, কিন্তু লোভটা যায়নি। আপনার পেট থেকে হরির সুস্বাদু রান্নার গন্ধ টের পেয়েই ওরা আপনার পিছু নিয়েছে। বুঝলেন তো?

—বুঝলুম। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে কাঞ্চনপুরে পৌঁছে দিন।

—কাঞ্চনপুর আরও প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে কাদের বাড়ি যাবেন?

—নির্মল সিংহের বাড়ি।

—ও! সিঙ্গিমশাইদের বাড়ি? চলুন। আমার বাড়িও ওই গ্রামে। তবে সাবধান, আপনি আগে-আগে চলুন। আমি যাব পেছনে।

—কেন? আমাকে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন?

—কিছু বলা যায় না! হরির হোটেলে এ পর্যন্ত যারা খেয়েছে, তারা সবাই টেঁসে গেছে।

—আহা! বলছি তো আমার কিছু হয়নি!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল—টাটকা টেঁসে যাওয়া বডি তো! তাই প্রথম প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই তো দিব্যি আমার বডিখানা আস্ত আছে! কিন্তু আত্মার ভ্রম। আসলে বডি কখন চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

—কী অদ্ভুত!

—মোটেও না। এমন হতে পারে আপনার বডির স্মৃতি আপনাকে এখনও আস্ত রেখেছে। যাক্ গে। চলুন। পিছনে তাকাবেন না। আমিও তাকাব না।

কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর বললুম—দেখুন! আপনার যেমন আমাকে ভয় করছে, তেমনি আমারও আপনাকে ভয় করছে! কখন পিছন থেকে আপনি কী করে বসবেন।

—ঘাড় মটকে দেব বলতে চান?

—যা অবস্থা, তাতে এবার ওটুকুই যা বাকি।

—বাজে কথা বলবেন না! আপনি বড্ড অকৃতজ্ঞ মানুষ তো!

—আমাকে মানুষ বললেন যখন, তখন আর আমাকে ভয় কেন? বরং আপনার ভয় পাওয়া উচিত যারা আমাকে ফলো করে আসছিল, তাদের।

লোকটি থমকে দাঁড়াল।—এই রে! একেবারে ভুলে গেছি। আমার জামার পাশপকেটে টর্চ আছে। বের করা যাক। আগে আপনাকে টর্চের আলোয় দেখে নিই। তারপর এখনও কেউ পিছনে ফলো করছে কিনা দেখা যাক।

বলে সে টর্চ জ্বেলে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে টর্চের আলো ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই আলোয় দেখলুম, একদঙ্গল আস্ত কঙ্কাল ছিটকে দু'ধারে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

আর লোকটাও সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমার সৌভাগ্য, তার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ছিটকে পড়েছিল। সেটা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এবার নির্ভয়ে হেঁটে চললুম।

মাঝে মাঝে পিছু ফিরে টর্চের আলো ফেলছিলুম। কিন্তু আর কেউ আমাকে অনুসরণ করছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তার বাঁকের মুখে মোটর সাইকেলের উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। তারপর মোটর সাইকেলটা আমার কাছে এসে থেমে গেল। নির্মলের সাড়া পেলুম।—যা ভেবেছিলুম! এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ তো শনিবার। পুঁটু কি অত ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে পারবে? হ্যাঁ রে! হেঁটে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আয়! ব্যাকসিটে বস! দোষটা আমারই। বুঝলি?

মোটর সাইকেলের ব্যাকসিটে চুপচাপ উঠে বসলুম। যা ধকল গেছে, এখন আর কোনও কথা নয়।

নাঃ। পরেও আর কোনও কথা নয়। এমনকি হরির হোটেলে খাওয়ার কথাও চেপে যাব। হরির দেওয়া অ্যান্টাসিডের ট্যাবলেট দেখিয়ে বলব—রাতে কিছু খাব না। পেটের অবস্থা ভালো না।

শুধু একটাই ভাবনা, হরির হোটেলের ভাত যতক্ষণ না পুরো হজম হচ্ছে, ততক্ষণ কি নির্মলের বাড়ির আনাচে-কানাচে সেই ছায়াকালো-কালো মিছিলের মূর্তিগুলো গন্ধ শুঁকতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে? দেখা যাক।...

ছবি : বিজন কর্মকার

হাঁদা-ভোঁদার

প্রতিদ্বন্দ্বী

আমি পাজিটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে তোর বানগুলো আমার জন্যে ফেরত নিয়ে আসবো।
সাবধান, হাঁদা!
অ্যাই, ছুঁচো বটকা! তুই ভোঁদার বানগুলো কেড়ে নিয়েছিস, সেগুলো ওকে ফেরত দিয়ে দে!
যদি না দিই?
নীচে গিয়ে আমি তোকে মজা দেখাচ্ছি পেটুক কোথাকার!
আমি পেটুক? মজা দেখাবি? তোকে কষ্ট করে নীচে নামতে হবে না আমিই ওপরে যাচ্ছি!
এখানে আসবে? ঐ হতচ্ছাড়াটা! এলে শয়তানটা দুঃখ নিয়ে ফিরবে!
সেটা তোর পক্ষেও হতে পারে, হাঁদা! ওই ছেলেটা নাকি ভয়ানক মারকুটে টাইপের!
মরেচে! বটকা এরকম! তুই আগে আমাকে এটা জানাসনি কেন—আমি কাটি!
এবার! কোথায় ও?
কো কোথায় কে, বটকা?
এইমাত্র আমার মনে পড়লো আমাকে এখুনি কোথাও যেতে হবে! ওকে বলে দে, ভোঁদা, ওর সঙ্গে আমি পরে মোকাবিলা করবো!

উঁহু, না, তোর যাওয়া হবে না!
আরে, আরে, আউ! ছেড়ে দে বলছি, গিদ্ধর!

আর একটু হলেই হাঁদার গায়ের জামা প্রায় ছিঁড়ে ফেলছিলো!
বাঁচাও, বাঁচাও! অ্যাই, ভোঁদা! এটাকে লেঙ্গি মেরে ফেলে দে না!

এই তো! ঝাড়ুদার তার ঝাড়-পোঁছের ডাণ্ডা ন্যাতা বালতি এখানে রেখে বাইরে গেছে। এই ডাণ্ডা ন্যাতাটাই কাজ দেবে!

এই নে, পাষণ্ড!

দাঁড়া, চিমড়ে! দ্যাখাচ্ছি, তোকে!
ভয় নেই! চলে আয়, ভোঁদা! হড়কে পড়ি।

এই ঘটনায় তোর জন্যে ভয় পাচ্ছি হাঁদা!
আমি নয়, আমরা চুপি চুপি জানলা দিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দেবো!

আমাকে ওপরে ডাকার আগে নিশ্চিত হয়ে নিবি যে ও ওখানে নেই!

হাঁদা! তুমি এখানে এ অবস্থায় দণ্ড ন্যাতা হাতে নিয়ে কি করছো?
ওঃ! স্পোর্টস স্যার!

ঐ নোংরা ন্যাতাটা আমাকে দাও আর এখুনি আমার ঘরে এসে দেখা করো!
হ্যাঁ, স্যার!

হাঃ হাঃ! ঐ যে জানালার তলা দিয়ে হতভাগাটা সরে পড়ছে! এই আমার সুযোগ!

এই যে আগে জল তারপর ন্যাতা দিয়ে ঘষে মুখ সাফ করার কাজ সমাধা করতে আমি মুহূর্তের মধ্যে নীচে যাচ্ছি!
আরঘ্গ্লুব!

মরেছে! এযে স্পোর্টসস্যার!
বটকা! তোর এতো আস্পদ্দা!

সত্যিই আমি দুঃখিত, স্পোর্টসস্যার!
সেটা তুই অবশ্যই হবি, বটকা! এখুনি আমার ঘরে আয়!

আমি আপনাকে ভেজাতে চাইনি, স্পোর্টসস্যার!
হয়তো নয়, কিন্তু আমি এই ধরনের নষ্টামি বরদাস্ত করি না। তাই তোকে—
স্কুলের মাঠটা একশোবার চক্কর দিতে হবে।
প্রতিদ্বন্দ্বী ঘায়েল, এবারে ভোঁদার বানগুলো বাগাতে হবে।

একটু পরে-
একি রে, ভোঁদা! আমি এতো কাণ্ড করে আমার— মানে তোর বানগুলো উদ্ধার করলুম আর তুই কিনা নিজেই সবগুলো সাবড়ে দিলি!
কি করবো বল। তোর জন্যে আর ওয়েট করা গেলো না রে, হাঁদা!

ভূতের বাড়ি

ডঃ গৌরী দে

চিৎপুরের কাছে অনেকদিনের পড়ে থাকা একটা খালি পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ দেখা গেল চারজন মানুষকে। বাড়িটা যে কত পুরনো কে জানে! চারদিকে বটের ঝুরি। পলেস্তারা খসে পড়া ইটগুলো যেন দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় এই বুঝি ভেঙে পড়লো। এ হেন বাড়িতে কেন যে ঐ চারজন লোক ভাড়া নিয়ে এলো—এ নিয়ে পাড়ায় জোর জটলা শুরু হলো। তার ওপর লোকগুলোর চেহারা, চালচলন কেমন যেন সন্দেহজনক। তবে কতদিন আর জটলা চালানো যায়? একসময় সবাই চুপ করে গেল।

দিন পনেরো যেতে না যেতে আবার হৈ হৈ। যারা এসেছিল, ক'দিন ছিল, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না, রাতারাতি পালিয়েছে। বাড়ির মালিক থাকেন দমদমে, এ নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ লোকগুলো এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছিল, আর ঐ পোড়ো বাড়ির ভাড়া যা হওয়া উচিত তার থেকে বেশিই দিয়েছিল। পাড়ায় জটলা আবার বাড়লো। অত টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া করে পুরো এক মাসই বা থাকলো না কেন?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল দিন পাঁচেক পর। একটা পচা দুর্গন্ধ বেরতে লাগলো বাড়িটা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে থানা, পুলিশ, খবরের কাগজ, হৈ হৈ ব্যাপার। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল একটা মুখবাঁধা বস্তা। রান্নাঘরের বড় উনুনটার ভেতর ঢোকানো ছিল। বস্তা খোলা হলো, একটা পচাগলা মৃতদেহ। হাত-পা কেটে ছোট্ট করে মুড়ে রাখা হয়েছে। লোকগুলোকে ধরতে পারা গেল না। ওরা যে ঠিকানা দিয়েছিল—সে ঠিকানায় কোনো রাস্তাও নেই, বাড়িও নেই। বাড়ির মালিক নিশিকান্ত বসু কিন্তু আর হাত-পা ছেড়ে বসে থাকতে পারলেন না। তাঁকে থানায় যেতে হলো। বিল বইতে চারজনের নাম লেখা ছিল—সেগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিতে হলো। সবচেয়ে দুঃখের কথা—ও বাড়ির বদনাম হয়ে গেল। আর কেউ কোনোদিন ওখানে থাকবেও না, কিনবেও না। পাড়ার লোকে নাম দিল ভুতুড়ে বাড়ি। কেউ বলে মাঝরাতে একটা লোক ছাতে হেঁটে চলে বেড়ায়। কেউ বলে মাঝে মাঝে ঘরে দপদপ করে আলো জ্বলে নেভে।

এ হেন বরবাদ বাড়ির জন্যে হঠাৎ দু'জন তরুণ প্রমোটার দেখা করলো নিশিকান্ত বসুর সঙ্গে। ভূত তারা মানে না, তবে এ ধরনের বাড়ি বেশির ভাগ সময় জলের দরে বিক্রি হয়—সেই আশায় ওরা এসেছে। হলোও তাই। নিশিকান্তবাবু হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। নামমাত্র দামে বেচে দিলেন চিৎপুরের মতো জায়গায় অমন বাড়িটা।

সাতদিনের মধ্যেই দুই প্রমোটার, সুজিত আর মৃন্ময় বাড়িটার কাজ শুরু করে দিল। ওরা দু'জন সারাদিন থাকে, রাতে বাড়ি চলে যায়। পরদিন সকাল সকাল এসে শুরু করে মিস্ত্রি খাটানো।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। রাস্তাঘাট জলে ভর্তি। চিৎপুরের সব কটা বাড়িতে একতলা পর্যন্ত জল ঢুকে গেল। সুজিত তার মোটর বাইকটাকে জল থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনোরকমে ঠেলে ঠেলে একটা উঁচু জায়গায় তুলে দিল। অন্য মিস্ত্রিরা একগলা জল ভেঙে বাড়ি ফিরে গেল, শুধু যেতে পারলো না রঘুমিস্ত্রি।

ওর বাড়ি উত্তরপাড়ায়। সেখানে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

সুজিত-মৃন্ময় নিজেদের থাকার জন্যে একটা ঘর বেছে নিয়েছিল দোতলায়। সে ঘরে আলো-পাখাও লাগিয়ে রেখেছিল। বসার জন্যে ছিল একটা বড় শতরঞ্জি। সুতরাং একটা রাত কাটানো কিছু না। সব দোকান বন্ধ। পেটে কিছু পড়েনি। তাই ঘুমও আসছে না ওদের। ওরা বসে গল্প করছে, পাশে বসে রঘুও গল্প শুনছে, এমন সময় টুক করে নিভে গেল আলো-পাখা। রঘু বাবুদের আরও কাছে সরে বসলো। মৃন্ময় একটা মোমবাতি জ্বেলে একটু দূরে সরিয়ে রাখলো। সেই আলো-আঁধারিতে ওদের ছায়াগুলো দেওয়ালে লম্বা হয়ে পড়তে লাগলো।

ঐ দিকে তাকিয়ে সুজিত কি যেন ভাবছিল। মৃন্ময় হঠাৎ বললো, এ একটা অ্যাডভেঞ্চার। ঘন অন্ধকারে একটা ভূতের বাড়িতে রাত কাটানো। লোককে বলার মতো ঘটনা।

তুই ভূতে বিশ্বাস করিস? সুজিত প্রশ্ন করে।

মোটেই না। তুই করিস নাকি?

করি তবে ভূতে নয়, প্ল্যানচেটে। আমার জীবনে বেশ কয়েকবার ঘটেছে এমন ঘটনা।

প্ল্যানচেটে ভূত আনবি নাকি তুই? দূর দূর, ওসব ভাঁওতা। সব হাতের কায়দা।

নাঃ, এ বিষয়ে তোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সরি।

বেশ তো, হয়ে যাক তাহলে। এমন স্থান, এমন পরিবেশ, এ কি সহজে পাওয়া যায়?

কিন্তু একজন মিডিয়াম চাই তো।

মৃন্ময় ইশারায় রঘুকে দেখিয়ে দেয়। লাফিয়ে ওঠে সুজিত। বলে, দ্য আইডিয়া। তবে শোন, শুনেছি পুলিশ এ বাড়ির খুনের কিনারা করতে পারেনি আজও। আয় আমরা তিনজনে সেই অতৃপ্ত আত্মাকে স্মরণ করি—যাকে খুন করা হয়েছিল।

রঘু বাবুদের কথা ঠিক ধরতে পারছিল না। খুন কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠলো। বললো, খুনের কথা কি বলতেছো, বাবুরা?

মৃন্ময়-সুজিত রঘুর হাত ধরে শতরঞ্জির ওপর বসালো। সহজে অবশ্য রঘু বসতে চায়নি। সুজিত রঘুকে বললো, শোন রঘু, এ বাড়িতে একটা লোক খুন হয়েছিল। আজ আমরা তার কথা চিন্তা করে তাকে খুশি করবো।

হে বাবু, রাতবিরেতে ওনাদের কথা কেন?

রঘু, এ বাড়িটা যে ভূতের বাড়ি তা তো তুমি জান। তবু বাধ্য হয়ে আজ রাতটা এখানে কাটাতে হচ্ছে। ভূত এসে আমাদের ঘাড় মটকে দেবার আগে এস আমরা ওকে খুশি করি। সকলে চোখ বন্ধ করে তার কাছে প্রার্থনা কর। তার কথা ভাব।

রঘু কি বুঝলো কে জানে, মাথা নেড়ে চোখ বন্ধ করলো। সুজিত-মৃন্ময়ও চোখ বন্ধ করে সেই অচেনা আত্মাকে ডাকতে লাগলো। সুজিত হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, হে অতৃপ্ত আত্মা, সাড়া দাও। আমরা এসেছি তোমার খুনের কিনারা করতে। তুমি আমাদের সাহায্য কর।

দশ মিনিট...পনেরো...কুড়ি মিনিট...হঠাৎ রঘু গোঁ গোঁ করে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় তাকে বীভৎস দেখাচ্ছে।

সুজিত প্রশ্ন করলো, তুমি কে?

আমার নাম মিহির সামন্ত। তোরা কি চাস?

খুনীকে শাস্তি দিতে চাই।

খুব খুশি হলো অশরীরী। রঘুর মুখের চেহারাটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। রঘুর মুখ দিয়ে আত্মা বললো, আমরা চারজন ব্যাঙ্ক ডাকাত ছিলাম। দলে আরো অনেকে আছে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

চারজনের নাম বল।

আমি মিহির সামন্ত, প্রকাশ আগরওয়ালা, কালু আর মোহন। বেশিদিন এক জায়গায় আমরা থাকতুম না। তাতে ধরা পড়ার ভয় ছিল। ২৫ জুলাই এই শহরে আমরা একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির প্ল্যান করি। সেজন্য কলকাতায় আমরা একটা আস্তানা খুঁজছিলাম। পেয়ে গেলাম। সে অনেক কথা। অত কথা বলার সময় পাব না। তোমরা যে ঘরে বসে আছ তার পুবদিকের দেওয়ালে দেখ একটা ইট আলগা। ওটা টানো।

সুজিত দেখলো দেওয়াল থেকে ইটটা টানলেই বেরিয়ে আসবে। এলও।

অশরীরী বললো, দেখ ওর ভেতরে টাকা আর চিঠি আছে।

সুজিত একটু ইতস্তত করছিল। আত্মা এক ধমক দিল। বললো, তাড়াতাড়ি, সময় খুব কম।

সুজিত হাত ঢুকিয়ে চিঠি আর প্রচুর টাকা বার করে আনলো।

মৃন্ময়, সুজিত দু'জনেই মোমবাতির আলোয় তাড়াতাড়ি পড়তে লাগলো চিঠিটা—

'ওরা এইমাত্র বেরিয়েছে তাই চিঠি লিখছি। কেন জানি না মনে হচ্ছে সামনে আমার বিপদ। আমার সঙ্গীরা আমাকে সন্দেহ করছে। যদি কিছু হয় আমার তাহলে ওরাও রেহাই পাবে না। এ চিঠি আমি তার আগেই পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেব পোস্টে। আমরা এ বাড়িতে এসেছি ৫ জুলাই। এখানে আমাদের সঙ্গে আগের ব্যাঙ্ক ডাকাতির প্রচুর টাকা রয়েছে। ২৫ জুলাই প্ল্যান করা হয়েছে ধর্মতলার ব্যাঙ্ক লুট করার। বাইরে আমাদের লোকেরা আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। আমরা চারজন ডাকাতি করে এখানে এসে উঠব তারপর রাতারাতি চারজন চারদিকে পালাব।

২৩ জুলাই সন্ধ্যেবেলা এক ভদ্রলোক এলেন এই আস্তানায়। সামনেই আমি ছিলাম। আমাকে বললেন, একবার শুনবেন? আমি রাস্তায় নামতেই উনি বললেন, এটা নাকি বিক্রি আছে? বললাম, জানি না। উনি বললেন, দয়া করে মালিকের নাম-ঠিকানাটা যদি দেন।

ঘরের মধ্যে একটা বাড়ি ভাড়ার বিল আছে, তাতে সব লেখা আছে। কিন্তু সেটা তখন আনা সম্ভব ছিল না। তাই বললাম, কাল সন্ধ্যেবেলা আর একবার আসুন, দিয়ে দেব।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে কালু, প্রকাশ আমাকে লক্ষ্য করছে। ভীষণ রাগ হলো। এত অবিশ্বাস!

ঘরে ঢুকতেই প্রকাশ বললো, লোকটা

কি বলছিল রে? বললাম বাড়ির মালিককে খুঁজছে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা ওরা তাস খেলছিল। ভদ্রলোক আসতেই ওরা সজাগ হয়ে উঠলো। আমি চিরকুটে মালিকের নাম-ঠিকানা লিখে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দিয়ে এলুম। দ্বিতীয়বার এই ভদ্রলোক আসায় সবাই আমার দিকে এমন করে দেখতে লাগলো যে বুঝতে পারলাম ওরা আর আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। খুব অপমান লাগলো। আমিও আর কিছু বললাম না। দূর থেকে দেখলাম ওরা ফিসফিস করে কি সব বলছে।

২৫ জুলাই দুপুর দুটোয় অপারেশান। আমি তৈরি হচ্ছি। ওরা বললো, তুই আজ থাক। আমাদের ঘরটা পাহারা দে। আমরা কাজ সেরে আসছি। নীল কাচ দিয়ে ঘেরা একটা কালো মারুতি ভ্যানে আমাদের দলবল চলে গেল। আমি জানি এরপর ওরা আগে নম্বরপ্লেটটা বদল করবে। তারপর যাবে।

মনে হলো এই সুযোগ। কি দেবে না দেবে তার ঠিক নেই। তারচেয়ে এইবেলা কিছু সরিয়ে রাখি, ওরা টের পাবে না। তখনও কিন্তু জানতাম না ওরা পাইপয়সা গুনে হিসেব করে রেখেছে। রান্নাঘরের উনুনটা খুব বড়। সমস্ত মাটি খসে ইট বেরিয়ে আছে। তার ভেতর রয়েছে বস্তা ভর্তি টাকা। আমি তার থেকে একটা মোটা বান্ডিল সরিয়ে রাখলাম দোতলার ঘরের পুবদিকের ইটের ফাঁকে।'

এই পর্যন্ত পড়ার পর সুজিত আর মৃন্ময় বললো, এরপর কি হলো।

আত্মা বললো, সন্ধ্যের সময় ওরা ফিরে এল। ওদের নাকি পুলিশে তাড়া করেছিল। অন্যসময় এরকম ঘটনা কতবার হয়েছে, কিন্তু এবার ওরা রক্তচক্ষুতে তাকালো আমার দিকে। আমি গায়ে মাখলাম না। ওরা দু'জন গেল রান্নাঘর থেকে বস্তা আনতে, অন্যজন গেল বাথরুমে। এই অবসরে সামনে রাখা ডাকাতির টাকা থেকে একটা বান্ডিল নিখুঁত ভাবে হাতসাফাই করে লুকিয়ে রাখলাম। প্রকাশ বাথরুম থেকে বেরলে আমি গেলাম। আমি বাথরুম যাবার নাম করে ইটের গর্তের মধ্যে টাকাটা রেখে এলাম। প্রথমত, মনে হলো ওরা আমাকে কম দেবে। দ্বিতীয়ত, ভাবলাম ভবিষ্যতে পুলিশের কাছে ওদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে তো প্রমাণ চাই। আঁটঘাট বেঁধে কাজ করা ভাল।

আমি ঘরে ঢুকতেই ওরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর সবাই মিলে। বললো, আমাদের হিসেবের টাকা কে সরিয়েছে? বললাম, আমি কি জানি? কালু কোমর থেকে ছোরা বার করে বললো, বেশি চালাকি করলে জানে মেরে দেবো। বল টাকা কোথায়? বললাম, জানি না।

তক্কাতক্কি হাতাহাতি হলো। তারপর ওরা তিনজনে মিলে আমাকে মেরে হাত-পা কেটে বস্তায় ঢুকিয়ে উনুনের মধ্যে পুরে দিল। সবটা ঢুকলো না, বেরিয়ে রইলো খানিকটা, ওরা একটা কয়লার ঝুড়ি এনে বস্তার ওপর উপুড় করে দিল।

অশরীরী বললো, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে এবার ছেড়ে দাও। আমার সময় হয়ে গেছে।

মৃন্ময় বললো, শুধু বলে যাও ওদের বর্তমান ঠিকানা।

অশরীরী বললো, লিখে নাও তাড়াতাড়ি। হয়তো ভুলে যাবে।

আত্মা চলে যেতে রঘু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মাথায়-মুখে জল দিয়েও ও ঠিক সুস্থ হতে পারলো না। পরদিন ওকে সবেতন ছুটি দিল সুজিত-মৃন্ময়। বললো, তোমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

রঘু জানতেও পারলো না কতবড় ব্যাপার একটা ঘটে গেল তার সাহায্যে।

সুজিত-মৃন্ময়ের বিবৃতি, চিঠি, নোটের নম্বর, পাড়ার লোকের সাক্ষ্য আর বাড়ির মালিকের কাছে বিলে লেখা চারজনের নাম—সব পেয়ে যেতে আততায়ীদের ধরতে আর কোনো অসুবিধা হলো না।

সুজিত-মৃন্ময় পেল মোটা অঙ্কের পুরস্কার। রঘুকেও ওরা বঞ্চিত করলো না। কিন্তু রঘু আজও বোঝেনি—হঠাৎ বাবুরা যেচে এসে তাকে এতগুলো টাকা দিয়ে গেল কেন।

ছবি: রঞ্জন দত্ত

ছেলেবেলা

সিদ্ধার্থ সিংহ

বৃষ্টিতে ভারী মজা,
ভিজে হও সারা!
ভাঙা মন্দিরে থাকে
বলো দেখি কারা!

ঘুড়িতে জড়ায় মেঘ
ফুলগাছে হিম,
ঘরময় ছায়া ভূত
মাথা ঝিমঝিম।

লুকিয়ে বেড়াল পোষা
মাঠে ঢিল ছোঁড়া
কত যে ফুর্তি ছিল
বুঝবি না তোরা!

এখনও এ সব আছে
দুঃখটা এই:
স্বপ্নের সেই সব
ছেলেবেলা নেই।

আলিপুর টু গায়না

গোবিন্দ গোস্বামী

শেয়াল গাইছে খেয়াল
হুক্কা হুয়ায় বেহাল
শব্দে ভাঙে খালের ধারে
কাঁচা মাটির দেয়াল।

হাতির মেজো নাতির
জু-তে বড়োই খাতির
সব্বাইকে দু'পা তুলে
বহর দেখায় ছাতির।

জেব্রা এবং জিরাফ
বেঁধে পুজোর মেরাপ
বাহারি ছাপ জামা গায়ে
খাচ্ছে রঙিন সিরাপ।

হায়না কিছুই খায় না
মা'র কাছে তার বায়না
এবার পুজোয় ঘুরতে যাবে
আলিপুর টু গায়না।

ছবি: সুফি

বেড নাম্বার ফর্টি

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

তখন হাউস সার্জেন। আমি জুনিয়র, দেবুদা সিনিয়র। অর্থোপেডিক্স। প্রফেসর রায় ডিপার্টমেন্টের হেড। দেবুদা স্যারের ডান হাত, ডাকেন বড়বাবু। আমি ছোটবাবু।

ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে স্যারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবুদা। রেগে আগুন। বরাবরই ফৌজি মেজাজ। আর্মিতে অলরেডি সিলেকটেড। কিছুদিন পরেই এখানকার টার্ম শেষ, তারপর সোজা দিল্লী।

আমাকে দেখে রাগটা বাড়ল। ঘড়ি দেখিয়ে বলল, সাড়ে আটটা বাজে। তোর আটটায় আসার কথা। আর কিছুক্ষণ বাদেই এসে পড়বেন প্রফেসর। কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি? নিশ্চয়ই কবিতার বৈঠক ছিল। হায়রে, কেন যে বাবলুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম!

ঠিকই ধরেছে দেবুদা। বাবলু দেবুদার ভাই। গ্যালিফ স্ট্রীটে বাড়ি। এখান থেকে খুব কাছে। আমার আবার লেখার বাতিক। লিখি-টিখি, পত্র-পত্রিকায় পাঠাই। কেউ ছাপে না, নিয়মিত ফেরত আসে। বাবলুর মাথায়ও লেখার পোকা। লেখক হবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বুদ্ধু কোথাকার! কত বড় মাইনের চাকরিটা সেজন্য ছেড়ে দিল। দেবুদার কম আপসোস! প্রায়ই এ কথা বলে।

দেবুদার রাগ যেন জলের দাগ। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট। কিন্তু ভীষণ সিনসিয়র। সেবার কী কাণ্ডই না ঘটেছিল। ছবি বিশ্বাস অ্যাকসিডেন্ট করে ইমার্জেন্সিতে ব্রট ডেড। সার্জিকাল ওয়ার্ড আর কিচেন ব্লক কোয়ার্টারের মাঝে সুন্দর একচিলতে লন। কী ভিড়! কী ভিড়! খবর পেয়ে চিত্রতারকাদের মেলা। উত্তমকুমার, সাবিত্রী—সবাই। ব্যতিক্রম শুধু সুচিত্রা সেন। গাড়ি নাকি রাস্তার জামে আটকে গেছে। কত জল্পনা-কল্পনা।

দেবুদার জন্য কিছুই দেখা হলো না। উত্তমকুমার বলে কথা। স্যারও নির্বিকার। দেবুদা প্রায় কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল অপারেশন থিয়েটারে। ইমার্জেন্সি অপারেশন, পেশেন্ট খাবি খাচ্ছে। ওদিকে ওয়ার্ডের ছাদে, জানালায়, চারদিকে ডাক্তার, সিস্টার এবং লোকজনদের ভিড়। সব উপেক্ষা করে ড্রেস বদলে স্যারের সঙ্গে ঢুকে গেছি ওটিতে। পাক্কা তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যখন বেরোলাম তখন ভিড় পাতলা। ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম সেদিন। দেবুদা স্যারের সঙ্গে এক গলায় বলেছিল,আগে ডিউটি, রোগী তারপর অন্যকিছু।

দেবুদা বলল, সকাল সাতটায় কিচেন ব্লকে তোর কাছে কলবুক গেছল। তোকে না পেয়ে আমার কাছে। তোর এখন কাজ শেখার সময়। এখানে আসার মুখে তোর ঘরে উঁকি মেরে দেখি ভীষণ ব্যস্ত। সামনে সরু-মোটা দাঁতের একগাদা চিরুনি আর কাঁচি। গোঁফের আঠা নিয়ে রিসার্চে মেতে আছিস।

আমার করুণ মুখ দেখে মায়া হলো। বলল, যাক,তোকে আর ডিস্টার্ব করিনি। নতুন কেসটা একাই ম্যানেজ করেছি। পাক্কা এক ঘণ্টা লেগে গেল। সার্জিকালে এখন ভর্তি—বেড নাম্বার ফর্টি। এখুনি গিয়ে হিস্ট্রি লিখে, রক্ত টেনে পাঠিয়ে দে। স্যার এলেন বলে—নটা বাজে। ঘাবড়াস না, আমি আসছি।

সেই বেড নাম্বার ফর্টি। সহদেব পাল। এজ ফিফটি। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে স্যালাইনের সূঁচ। লম্বা লোহার খাঁচায় পা বন্দী। একশো কুড়ি ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে বাইরের দিকে পা। হাঁটুর নিচে লোহা ফুটিয়ে কুড়ি পাউন্ড ওজনের টান। থাইবোন ফুলে কলাগাছ। কম কষ্ট নাকি! হাড় ভাঙা বলে কথা। জমিদার চেহারা। তরোয়াল গোঁফ। টকটকে ফর্সা রঙ।

কাজ-করা পাঞ্জাবি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। করমচা-লাল গোল গোল চোখ। লম্বা-চওড়া দেখতে। পয়সাকড়ি আছে।

সহদেববাবুর বেড টিকিটটা ওয়ার্ডের টেবিল থেকে তুলে দেখছিলাম। এক্সরে প্লেটে চোখ বুলিয়ে বেড নাম্বার ফর্টির দিকে তাকাতেই লক্ষ্মীবাবু বললেন, স্যার, সিরিঞ্জ রেডি। ব্লাড টেনে দিন, পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বেড টিকিট দেখে দেবুদার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছিল। আমার তো বেশি কিছু লেখার নেই, সবই কমপ্লিট করে রেখেছে দেবুদা। স্যার কি আর এমনি অত খাতির করেন?

অনিতা সিস্টারের হাতে বড় খাতা—জেনারেল অর্ডার বুক। জি.ও.বি। পাতায় পাতায় লেখা ওয়ার্ডের রোগীর নাম, ওষুধের ডিরেকশন, কোন ওষুধ, ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশন কতবার। তখন সহদেববাবুর সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যথায় ককিয়ে উঠছেন বারবার। মাঝে মাঝে চোখ দুটো বোজেন।

সিস্টারকে দেখে ব্যথাটা বাড়ল যেন। নার্ভাস মুখটা করুণ। যশোর রোডে নিজের ফ্যাক্টিরির কাছে বাস থেকে নামতে গিয়ে কি যে হয়ে গেল তারপর সব অন্ধকার। জ্ঞান ফিরে দেখেন ওয়ার্ডে শুয়ে আছেন। পায়ে লোহার এফোঁড়-ওফোঁড়, লোহার টানে পা সোজা, নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু।

খাতা দেখে একটা ব্যথার ওষুধ রোগীর হাতে ধরিয়ে দিলেন অনিতাদি। বললেন, নার্ভাস হবার কিছু নেই। হাড্ডি বলে কথা, চটজলদি সারতে চায় না। আরে মশাই যন্ত্রণা তো হবেই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ধরলে ত্রিশ আর হাড্ডি ছুঁলে পঞ্চাশ। এসব হচ্ছে যন্ত্রণার মাপকাঠি—লাঠির ঘায়ের মতো। এই নিন গ্লাশে জল, ব্যথার বড়িটা খেয়ে নিন।

সিস্টারের কথায় যন্ত্রণাটা বেড়ে গেল, ব্যথা বুঝি স্রোত হয়ে পায়ের দিকে নামে। খালি জলের গ্লাশটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, বাঘ, পুলিশ এসব ঠিক বুঝতে পারলাম না সিস্টার।

সিস্টার হাসেন, আমি অত জানি নাকি? প্রফেসর রায় যেমন বলেন। আরে মশাই বাঘের হালুম ডাকে পালাতে পারেন, পুলিশ ধরলে থানা আদালত করে, জামিনে খালাস, কিন্তু হাড্ডি ভাঙলে রক্ষা নেই। নো জামিন, নো পালানো। বিছানায় বন্দী। সারতে লাগে তিন মাস, হাঁটতে হাঁটতে এক বছর।

আর্তনাদ করে ওঠেন সহদেববাবু, চোখে জল, এ-ক-বছর!

রোগীর রক্ত টেনে পাঠাতে না পাঠাতেই ওয়ার্ডে ঢোকেন প্রফেসর রায়। সঙ্গে দলবল—দেবুদা, রেসিডেন্ট সার্জেন আর স্টুডেন্টস। স্যারের মেজাজ সবসময়ই কড়া। চিকিৎসার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসা দায়। সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল—ড্যাম, ইডিয়েট, ফুল। সবাই ভয় পায়। ওয়ার্ডে থমথমে নিস্তব্ধতা।

স্যার এক্সরে দেখতে দেখতে বলেন, বয়েজ এন্ড গার্লস, এদিকে এসো। দ্যাখো, দিস ইজ আ কেস অফ ফ্রাকচার ফেমার। উরুভঙ্গ।

রোগীর দিকে তাকিয়ে মোটা ফ্রেমের চশমাটা ঠিক করেন, নাকের ডগা থেকে তুলে ঠিক জায়গায় বসান, রোগীর মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখেন। আপনার ফ্রাকচারটা এলেবেলে নয়, জাতে কুলীন। কুরুবংশের ব্যাপার, ঠিক হয়ে যাবে, শুধু একটু ভোগান্তি।

রোগীর মুখে হাসি, যা বলেছেন। পাঁচ ভাই আমরা। পঞ্চপাণ্ডবের নামে নাম। আমি সবার ছোট। আসলে আমাদের পাল বংশ—বাংলাদেশের নামকরা রাজবংশ। বাবা শেষ বয়সে সন্ন্যেসী হয়ে যান। বামাক্ষ্যাপার চেলা গোবিন্দ অবধূতের শিষ্য। ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। বলতে বলতে রুদ্রাক্ষের মালায় হাত বোলান।

স্যার ওয়ার্ড থেকে চলে যেতেই হেসে ওঠেন অনিতাদি। আমার দিকে তাকালেন, দেখলেন তো, প্রফেসরের নজর এড়ায় না। রোগীর তরোয়াল মার্কা রাজা গোঁফ আর আপনারটা মিলিটারি সাইজ—মারদাঙ্গা ভাব।

ওদিকে রোগী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, সিস্টার, ভীষণ ব্যথা, পা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, বাঘের কামড়ের মতো বিষ যন্ত্রণা।

সিস্টার ছুটে গেলেন—আমিও। দু'জন দু'জনের গোঁফের দিকে তাকিয়ে। আর কারো গোঁফ দেখলে আমার আনন্দ হয়, মনে হয় দলের লোক। গোঁফ রাখা কত কষ্টের কত যত্নের সেটা অন্য লোকের বোঝার কথা নয়, সযত্নে লালিত গোঁফ যার আছে সেই বোঝে।

আমার দিকে তাকিয়ে কেমন আপন ভাব রোগীর, স্যার, যন্ত্রণায় মরে গেলাম যে—

আমি সিস্টারের কাছ থেকে জি.ও.বি হাতে নিলাম। নতুন অর্ডার, ইঞ্জেকশন পেথিডিন—

অনিতাদি অবাক, ঘুমের ইঞ্জেকশন! মশা মারতে কামান দাগলেন দেখছি।

সেই গোঁফ নিয়ে খোঁচা দেওয়া সিস্টারের কথায় রাগটা যেন লাফ দিয়ে ভেতর থেকে বেরোল, ডোন্ট কোশ্চেন মি হোয়াই। স্যার কি বলেন জানেন না? হাড় ভাঙায় দারুণ ব্যথা—দু'দিন রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়। ব্যথা থাকে না।

নাইট ডিউটিতে থাকে সার্জিকালের হাউস সার্জেন সুব্রত। পাশের ছোট ঘরটায় রাত জাগে। কার কখন কী হয় কে বলতে পারে। ডনবৈঠক মারা তাগড়া চেহারা—কপাট বুক। ইয়া বাইসেপ। মনোতোষ রায়ের শিষ্য। হাতের পাঞ্জায় বাঘের জোর। হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে। বলে, ইঞ্জেকশন, ঘুমের ইঞ্জেকশন? না মশাই, শেষ পর্যন্ত নেশা হয়ে যায়। ইঞ্জেকশন ছাড়া ঘুম হয় না। ওষুধের বিষে লোক পটল তোলে।

ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণা থেকে মৃত্যু অনেক ভালো। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভয় হয় রোগীর। দারুণ চেহারা, সবসময় যেন রেগেই আছে।

সুব্রত বলে, নো সিস্টার, ইঞ্জেকশন নয়, দরকার হলে আমার জুনিয়রকে কলবুক দেবেন। কাল থেকে ওর ডিউটি রাত্তিরে। প্রশান্ত কিংবা চন্দ্রশেখর একজন কাউকে পাবেনই। থাকে দেবুদাদের কোয়ার্টারে। অন্য ওষুধ দিয়ে ট্রায়াল হোক।

কিন্তু না, কলবুক পাঠাতে চান না সিস্টাররা। রাত গভীর হলেই এই হাসপাতাল দখল করে নেয় গোটা দশেক

কুকুর। লোমওঠা ঘিয়ে ভাজা চেহারা। লোক দেখলেই বাঘের মতো তেড়ে আসে। কলবুক পাঠানো মানে দু'জন ওয়ার্ডবয়, সঙ্গে দারোয়ান, হাতে বড় বড় লাঠি। সেবার রাত্তিরে রোগী দেখতে আসা ডাঃ অরুণাভকে এমন কামড়াল, পেটে একগাদা ইঞ্জেকশন—ভোগান্তির একশেষ।

রাত্তির ন'টায় ওয়ার্ডে তখন অরুণাভ, সিস্টারকে বলে, এই যে দিদি ওয়ার্ডে না এসে ঘরে বসে কুকুর এড়িয়ে দু'চার দিন ইঞ্জেকশন দিয়েছিলাম। স্যার জানতে পারলে রক্ষা নেই। একবার ফোন করে জেনে নেবেন চলবে কিনা।

সিস্টারের গলা কাঁপে, প্রফেসরকে? পাগল হয়েছেন? আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি পারব না। ডিরেকশনে লিখে দিন তাহলে দেব, নইলে নয়।

দেখি কি করা যায়, ফোনের ভয়ে অরুণাভ হাওয়া। সিস্টার বলেন, নকল ঘুম থেকে আসল ঘুম ভালো সহদেববাবু, ডিরেকশন মতো ওষুধ, বড়ি পাবেন—ইঞ্জেকশন নয়।

রোগী ঘাবড়ে যান, ইঞ্জেকশন দিন সিস্টার। আপনি তো মা, ছেলের কষ্ট মায়েরা বোঝে।

কিন্তু মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজার মতন নয়। সিস্টার নির্বিকার, নো, নেভার। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে আপনার বারোটা বাজাই কী করে বলুন! নেশা হয়ে যাবে—সর্বনাশ!

সেদিন বাবলুর সঙ্গে লেখা নিয়ে জমিয়ে আড্ডা চলছে লাইব্রেরিতে। কবি জীবনানন্দের অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে কথা। কিন্তু সেটা কী ধরনের আঘাত। বই খুলে বোঝাচ্ছিলাম।

তখন বেলা প্রায় আড়াইটা। বাবলুর হাতে মোটা খাতা। পাতায় পাতায় লেখা উপন্যাস—হাসপাতালের গল্প। ভিজিটিং আওয়ার্সের কথা লিখেছে কিন্তু ঠিক ফোটাতে পারেনি। বসে আছে, চারটে বাজলে ওকে ওয়ার্ডে নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। তাহলে লেখা দারুণ খুলবে।

হঠাৎ টেলিফোন। লাইব্রেরিয়ান সুধীরবাবু ছুটে এলেন। এই যে সুমিত্র, স্যার খুঁজছেন। অফিসেই আছেন—আর্জেন্ট।

ব্যস হয়ে গেল, আমাদের প্ল্যান বানচাল। স্যারের যেন দশটা চোখ, কে কোথায় আছে ঠিক বুঝতে পারেন। দেবুদার ওপর রাগ বাড়ছিল, নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে একদম স্যারের চেম্বারে। বাবলু দাঁড়িয়ে আছে বাইরে গেটের সামনে। স্যার মাইক্রোসকোপে কীসব দেখছিলেন। আমায় দেখে বললেন, এই যে ঘরের সামনে বেঞ্চিতে বসে থাকা ছোকরা বেড নাম্বার ফর্টির ছেলে। বাপের কথা মনে পড়াতে হঠাৎই ছুটে এসেছে, চারটে পর্যন্ত থাকতে পারবে না। তুমি সঙ্গে করে বেড নাম্বার ফর্টির কাছে নিয়ে যাও, পারমিশন দিলাম।

যাক সাধারণ ব্যাপার, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। চকরাবকরা জামা, টাইট প্যান্ট ও ছুঁচলো জুতো পরা ছেলেটির অল্প বয়েস। চুলে সিনেমার স্টাইল। লিকপিকে চেহারা—খ্যাংড়া কাঠির ওপর আলুর দম।

ওকে বললাম, চলো। এদ্দিন তোমরা কেউ আসোনি। এলেই যখন চারটেতে আসতে পারতে। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স নয়, পাঁচ মিনিটের ভেতর যা বলার বলে নিও।

প্রফেসরের রাউন্ডের সময় বেড নাম্বার ফর্টির চিৎকার বাড়ে। ব্যথায় থরথরিয়ে কাঁপেন। রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না বেশ কয়েকদিন—ইঞ্জেকশন বন্ধ।

রোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্যারের গলা দারুণ নরম, আমাদের বেলায় আবার উল্টো। সহানুভূতির সুর, ঘুমের প্রবলেম আপনার হবার কথা নয়। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। ভালো করে পরীক্ষা করেন, না হাড় তো জোড়া লাগবে বলেই মনে হচ্ছে।

না স্যার, ইঞ্জেকশন ছাড়া ঘুমুতে পারি না যে। রাত্তিরে ঘুম না হলে সারা দিন-রাত যন্ত্রণা। মরে গেলাম, বাঁচান।

স্যরি সহদেববাবু, ঘুমের ইঞ্জেকশন বিষ—শরীর-মনের ক্ষতি করে, হঠাৎ মুখে ভাবান্তর প্রফেসরের, কালো ফ্রেমের চশমাটা কপালে তুলে চোখ বুজলেন। গভীর চিন্তায় স্যার অমনই করেন। ওয়ার্ডের সিস্টার, ট্রেনি নার্স, স্টুডেন্টসরা দাঁড়িয়ে আশেপাশে।

চোখ খুলে গমগমে গলায় ডাকেন, সিস্টার।

অনিতা সিস্টার ভয় পান, ইয়েস স্যার।

ইয়েস সিস্টার, অর্ডার বুকে নোট করুন। এই যে সুমিত্র, অরুণাভ—শ্রীমানরা, সই করে দাও। হ্যাঁ ইঞ্জেকশন, পেথিডিনের চেয়েও ভালো, বিলেতি ভ্যারাইটি ইঞ্জেকশন ডি.ডব্লু—রোজ রাত্তিরে দু'বার হলে ক্ষতি নেই।

রোগীর দিকে তাকান, ইঞ্জেকশন ডি. ডব্লু—ডিভাইন ওয়ার্ল্ড। ওষুধে ঐশী শক্তি—পবিত্র ক্ষমতা। স্বপ্নের ঘুম। বিলেতে মেলে, এখনও ইন্ডিয়ার মার্কেটে আসেনি। ভাগ্যিস আমার বন্ধু ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল।

স্যার তখন কিছুদিনের জন্য বাইরে, কনফারেন্সে। হপ্তা তিনেক ঢিলেঢালা ভাব, নতুন রোগী স্যারের আন্ডারে ভর্তি বন্ধ।

তখন সকাল প্রায় এগারোটা। বাবলুর বাড়ির তিনতলার ঘরে আড্ডায় ভুলেই গেছি হাসপাতালের কথা। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। দোরে দাঁড়িয়ে দেবুদা।

রাগে চোখমুখ লাল, এই স্টুপিড, বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। জানি এখানে পাবো। রাস্কেল, কাল দিল্লী যাব, আর্মি থেকে কতকগুলো সার্টিফিকেট চেয়েছে। তোকে সব বুঝিয়ে দেব বলে সকাল থেকে বসে আছি, শ্রীমানের পাত্তা নেই। বাবলু, তোদের পাগলামি দেখে ভালো লাগে না রে। মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিল বারবার। উত্তেজনায় ওরকম করে।

ব্যস হয়েই গেল, বাধ্য হয়ে দেবুদার সঙ্গে হাসপাতালে। ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে রোগীদের সম্পর্কে বলে যাচ্ছিল দেবুদা। খুঁটিনাটি সব নখদর্পণে। কার ডিসচার্জ, পোস্ট অপারেটিভ কেসে কোন পেশেন্টের

ঝামেলা—এসব।

সহদেববাবুর নতুন এক্সরেটা দেখছিল দেবুদা। গলায় খুশি, যাক, হাড্ডি জুড়ছে। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে আনা গেছে। দুর্যোধনের মতো মারা যাননি। এবার স্যার এলেই ছুটি। কিন্তু আপনি দাড়ি রাখছেন দেখছি। কামিয়ে ফেলুন। স্যার গোঁফ টলারেট করেন, দাড়ি নয়। উকুনের ঝঞ্ঝাট, দু'চারটা রোগীর হয়েছিল। দাড়ি বেয়ে মাথায়, দারুণ চুলকানি।

সহদেববাবু মাথায় হাত ঠেকান, মা চামুণ্ডার ইচ্ছে। তিনি যা করবেন। হাসপাতালে রোগী, অসুখ, মৃত্যু দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি—মনটাই বদলে গেছে। আমিও বাবার মতো গৃহত্যাগ করবো। উদাসী বাবার আখড়ায় তন্ত্র-সাধনা—সন্ন্যেসী হয়ে যাব।

দেবুদা বলল, আগে আমরা ডিসচার্জ করি, তারপর যা ইচ্ছে করুন। স্যার বলেই গেছেন ডিসচার্জ করে দিতে। এখন ছোট একটা প্লাস্টার—বগলে ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটবেন। ঘুমের প্রবলেম তো নেই।

না নেই, স্যারের কথা ভেবে শ্রদ্ধায় গলাটা ভিজে আসে, করজোড়ে প্রণাম করেন, এই না হলে ডাক্তার? সাক্ষাৎ ভগবান। বড় ডাক্তার বলে কথা—দারুণ ইঞ্জেকশন ডি. ডব্লু। সকাল-বিকেল দু'বার নিই, কোনোদিন তিনবার। স্বপ্নে মা কালীর সঙ্গে কথা বলি—সাধে কি দাড়ি রেখেছি, জীবনটা পাল্টে গেছে মশাই। তন্ত্রসাধনার ইচ্ছে—দাড়িতে সাধক সাধক ভাব।

দেবুদা বলল, তুই ডিসচার্জ লিখে রাখ। স্যার অমনই বলেছিলেন। আমি থাকবো না, দেখিস যেন ঝামেলা না হয়।

সেদিনই ডিসচার্জ লিখে দিলাম। ক্র্যাচ এসে গেল। বললাম, ভাঙা পায়ে না ভর দিয়ে চলাফেরা করুন। শরীর একটা যন্ত্র—বসে থাকলে বিগড়ে যায়। হাঁটা-চলা ভালো।

দাড়ি রাখার পর রোগীর মুখের দিকে তাকাতে ভালো লাগতো না। দুঃখ হতো। বেশ তরোয়াল গোঁফ ছিল, দাড়ির জঙ্গলে সেটা হারিয়ে গেছে। পেশেন্টের কাছে আসতে গোঁফ দেখার যে আনন্দ পেতাম সেটা এখন মাটি। স্যার সত্যিই বলেছিলেন গোঁফে গোঁফে মাসতুতো ভাই, কেমন আপন আপন ভাব। এখন সেরকম লাগে না।

হপ্তা দুয়েক বাদে এসে গেলেন স্যার। আবার ব্যস্ততা। হাসপাতাল জমজমাট। কিন্তু সেই যে ডিসচার্জ লিখেছিলাম তবু বাড়ি যেতে চান কোথায়? হাজার অজুহাত, শরীর খারাপ, কোমর কনকন, দুর্বল শরীর। বাড়িতে রুগ্না স্ত্রী—দেখভালের অভাব—কত বায়নাক্কা। আজ যাচ্ছি কাল যাচ্ছি করতে করতে মাসই ঘুরে গেল।

অনিতাদি ফিসফিস করেন, দেবুদা নেই আপনাকেই বলি। দারুণ ঘুঘু লোক মশাই, বিলেতি ইঞ্জেকশন বাইরে পাওয়া যায় না, সারা কলকাতার দোকানে লোক দিয়ে খবর নিয়েছেন। এখনও ইন্ডিয়ায় আসেনি। আপনাদের অজিতদা দারুণ স্ট্রিক্ট। বলেই দিয়েছেন, না সহদেববাবু। আমার স্টক কম। ডিসচার্জে লেখা আছে, একটু খোঁজখবর করলেই ওষুধের দোকানে পাবেন। ভয় নেই, এমনিতেই ঘুম হবে।

রাউন্ডে এসে বিরক্তি প্রকাশ করলেন স্যার, ইউ মাস্ট গো সহদেববাবু। এখানে বেডের কত ডিমান্ড। একটা বিছানার জন্য কত পেশেন্ট অপেক্ষা করছে জানেন? কড়া গলায় বলেন, সাত দিন সময় দিলাম, না গেলে ওপরে জানাব। পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেব।

না সাত দিন নয়, তার পরদিন।

রাত দশটায় কলবুক পেয়ে ওয়ার্ডে ছুটতে ছুটতে হাজির। সঙ্গে সুব্রত।

নতুন সিস্টার বললেন, পাগল হয়ে গেছেন আপনাদের দুর্যোধনবাবু। পাগলই তো। চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, থেকে থেকে চিৎকার, আয় মা আয়, নেচে নেচে আয় শ্যামা, কালী, করালী মুণ্ডমালিনী। মুণ্ডু কেটে কেটে হাতে ঝুলিয়ে নাচ মা।

সুব্রত বলল, হঠাৎ কী ব্যাপার? কী হলো? কেন অমন করছেন? কার মুণ্ডু কাটবেন সহদেববাবু?

আগুনে বুঝি ঘি পড়ল, চিৎকার করে উঠলেন, কার আবার আপনাদের, আপনারা সবাই ধাপ্পাবাজ, চিট—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ধাপ্পাবাজ! কিসের ধাপ্পা?

ধাপ্পা নয়তো কি? রাগে গোঁ গোঁ করেন, বগলে ক্র্যাচটা আঁকড়ে ধরেন। নতুন সিস্টার এসেছেন, অনিতাদির মতন নয়। দয়ামায়া আছে। মায়ের মতো প্রাণ—মিথ্যা নয় সত্যি বলেন। আমি তান্ত্রিক বাবার কাছ গিয়ে আপনাদের কথা বলবো, মন্ত্রের বাণে সর্বনাশ করে দেবো। ছারখার হয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে চালাকি!

সুব্রত বলল, আসল কথাটা বলবেন তো!

ভেংচে উঠলেন সহদেববাবু, ওরে আমার হাবলা-গোবলা রে, ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানে না। মশাই আপনাদের পেটে পেটে এত, ডিভাইন ইঞ্জেকশন না ছাই, ইঞ্জেকশন ডি. ডব্লু। ডিসটিল ওয়াটার ইঞ্জেকশন। ছিঃ ছিঃ কী অধঃপতন! রোজ এই জল ইঞ্জেকশন নিয়ে পেথিডিন ভেবে নাক ডেকে ঘুমাই।

ঠিকই ধরেছেন। রোগীদের এরকম প্রায়ই দেওয়া হয়। রোজ ঘুমের ইঞ্জেকশনে 'এডিক্ট' হয়ে যায় রোগী। ক্ষতি হয়। নেশা হয়ে যায়। সে সব কথা এখন বোঝানো শক্ত।

আমি বললাম, আপনার ভালোর জন্যেই জল ইঞ্জেকশন, আসল ঘুমের ওষুধ নয়।

ফোঁস করে ওঠেন, ভালো? আমার ভালো না দেখে নিজেদের চরকায় তেল দিন। আপনি কবি, গোঁফ দেখে ভাবলাম দলের লোক, আপনিও বিশ্বাসঘাতক ভাবতে কষ্ট হয়!

উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রোগীর। কেঁদেই ফেললেন, আমি মামলা করব, হাইকোর্টে কেস ঠুকে দেব মশাই, জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। আমার সঙ্গে জোচ্চুরি, ফাজলামি, ইয়ার্কি—

পরদিন সাত সকালেই বেড খালি। রাউন্ডে গিয়ে দেখি চলে গেছেন বেড নাম্বার ফর্টি।

ছবিঃ সমীর সরকার

জার্মানির ঠিক এখানেই ছিল হিটলারের সদর ঘাঁটি।

হের হিটলার। জার্মান ভাষায় 'হের' মানে 'মিস্টার'। ক'বছর আগে যখন বার্লিনে হিটলারের মৃত্যুপুরীতে সপরিবারে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, কেউই ভাবতে পারিনি সহস্রাব্দের 'সেরা' মানুষের তালিকায় একই সঙ্গে থাকবেন মহাত্মা গান্ধী আর আডলফ হিটলার—দুই বিপরীত মেরুর দুই নায়ক।

হিটলারের 'থার্ড রাইখ' সারা বিশ্বের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর নাৎসি বাহিনীর প্রবল প্রতাপে দিনের পর দিন নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল মিত্রশক্তির তাবড় তাবড় সেনানায়কদের। ১৯৩৩ থেকে '৪৪—টানা প্রায় ১২ বছর মার্কিন
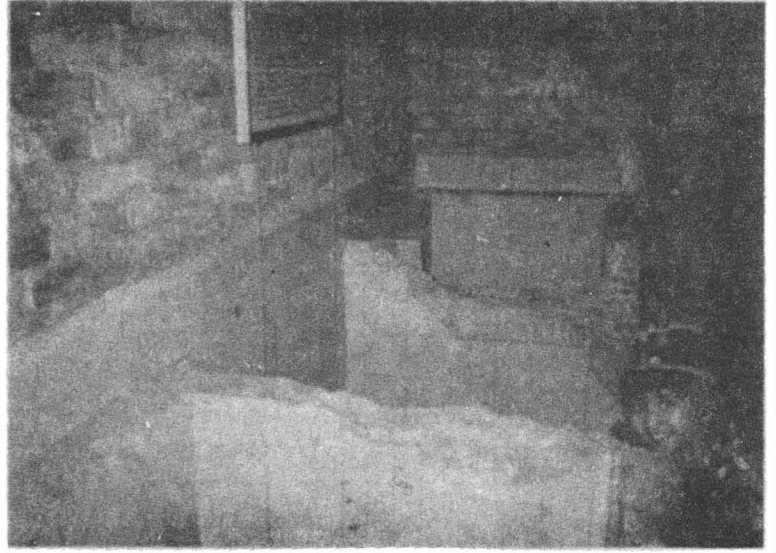
মৃত্যুপুরীতে কয়েক ঘণ্টা

মৌসুমী সেনগুপ্ত

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দাপুটে দেশগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করেও আঘাত হানতে পারেনি হিটলারের মৃত্যুপুরীতে। মিত্রশক্তির সেই চেষ্টা সফল হয় ১৯৪৫ সালে। হিটলারের পতনের পরে শেষ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

প্রিনৎস আলব্রেখটস্ট্রাসে, উইলহেমস্ট্রাসে আর আনহালটারস্ট্রাসে—বার্লিনে এই তিন রাস্তার মাঝে ছিল থার্ড রাইখের সদর দফতর। নাৎসি গোয়েন্দা-বাহিনীর মূল বিভাগগুলো ছিল ওখানে। ওই চত্বরেই ছিল স্কুল অব অ্যাপ্লায়েড আর্টের বাড়ি—গেস্টাপোদের ঘাঁটি। ৯, প্রিন্স আলব্রেখটস্ট্রাসের 'প্রিনৎস আলব্রেখট পালাইস' অর্থাৎ প্রাসাদ ছিল মিত্রশক্তির সমরনায়কদের কাছে জ্বলন্ত বিভীষিকা।

১৯৩৩ সালের ৩০ জুন জার্মানির চ্যান্সেলর হলেন হিটলার। এর পর থেকেই শুরু হলো গণতান্ত্রিক কাজকর্ম আর সংবিধানের কণ্ঠরোধ। প্রথমে নিশ্চিহ্ন করা হলো জার্মানির বিরোধী দলগুলোকে। জারি হলো জরুরি অবস্থা, গণগ্রেফতার। কর্মী সংগঠনগুলোর সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। তৈরি হলো একদলীয় রাষ্ট্র। হিটলারের কথাই শেষ কথা। জার্মানি থেকে ভয়ে দলে দলে লোক পালানোর চেষ্টা করতে লাগল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায়।

বার্লিনের এই তল্লাটে গেস্টাপোদের সদর-ঘাঁটি তৈরি হয় ১৯৩৩ সালের মে মাসে। 'গেস্টাপো' কথাটাকে টেনে বড় করলে দাঁড়ায় 'গেহেইমস স্টাটস-পোলিৎজাইআম্ট'। জার্মান ভাষায় 'স্টাটস' মানে রাষ্ট্র, 'পোলিৎজাই' মানে পুলিশ আর 'আম্ট' কথাটির অর্থ কেন্দ্র। এর আগেই প্রতিবেশী প্রুশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান সেনানায়ক হারমান গ্যোয়েরিংকে করা হয়েছে জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রধান। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মজবুত একটা রাজনৈতিক পুলিশবাহিনী তৈরির কথা বলছিলেন রবার্ট ডিলস। উনি হলেন গেস্টাপোর প্রথম অধিকর্তা। ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে হাইনরিশ হিমলার হলেন জার্মান গোয়েন্দাবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল।

নতুন দায়িত্বে আসার আগে হিমলার ছিলেন মিউনিখের পুলিশপ্রধান। পরে হন বাভারিয়ার রাজনৈতিক পুলিশ শাখার প্রধান। ১৯৩৬-এর ১৭ জুন পূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার পরে জার্মান গোয়েন্দাবাহিনীর খোলনলচে ঢেলে সাজালেন তিনি। বার্লিনে হিটলারের মৃত্যুফাঁদে রয়েছে ডিলস, হিমলার, আইকম্যান, আইকে, গ্যোয়েরিং-দের দুষ্প্রাপ্য ফোটোগ্রাফ।

জার্মান 'নাৎসি' কথাটির পুরো অর্থ 'নাৎসিওনাল সোৎজিয়ালিস্ট'। ইংরেজিতে 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট'। ১৯৩৪ সালে তৈরি হলো তাঁদের গোয়েন্দা-দফতর এস ডি। বার্লিনের 'প্রিনৎস আলব্রেখট পালাইস'-চত্বরেই হলো সেটির সদর দফতর। '৩৭-এ নাৎসিদের সঙ্গে গেস্টাপোর একটি চুক্তি হলো। গেস্টাপোর এক বড়কর্তা ছিলেন আর এক আডলফ—আডলফ আইকম্যান।

নিছকই যে গায়ের জোরে নাৎসিরা সব দখল করছিলেন তা নয়। জার্মানির একটা বড় অংশের সাধারণ মানুষের

সমর্থন ছিল হিটলারের প্রতি। জনমত যাচাই করে যখন যেখানে যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার, হিটলার-সঙ্গীরা তাই নেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই কারণে ছিল তাঁদের 'মেল্ডুঙ্গেন আউস ডেম রাইখ', মানে জার্মানিতে জনমত সমীক্ষার ব্যবস্থা।

১৯৪৩ সালে জার্মান রাষ্ট্রীয় পুলিশের ৭০টি শাখা ছিল নানা জায়গায়। এ ছাড়া ছিল ৬৬০টি ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। নজরদারির মূল কাজ ছিল 'রাইখ সিকিউরিটি' অর্থাৎ আর এস এইচ এ-র উপরে। কীভাবে, কাদের খুন করা হবে—সব পরিকল্পনা করত এরাই। ইহুদিদের হত্যা করার জন্য এরা আবিষ্কার করে গ্যাসচেম্বার।

১৯৩৩-এর গ্রীষ্মের শেষাশেষি ৮, প্রিনৎস আলব্রেখটস্ট্রাসেতে তৈরি হলো জেলখানা। এছাড়াও আলেকজান্ডারপ্লাৎস ও কলম্বিয়াহাউসেও ছিল বন্দীশিবির। কঠোর পরিশ্রমের পরেও যেসব বন্দী বেঁচে থাকতেন, তাঁদের জীবন শেষ হতো গ্যাসচেম্বারের চুল্লিতে। নাৎসিদের তত্ত্বই ছিল অনেকটা 'এক্সটার্মিনেশন থ্রু ওয়ার্ক'। কাউকে কাউকে শেষমেশ নিয়ে যাওয়া হতো পোল্যান্ডের আউসওয়াৎস বা এই ধরনের অন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে বন্দীদের কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। যাঁরা একাজে ব্যর্থ হতেন, তাঁদের কপালে অপেক্ষা করত অশেষ দুর্ভোগ। নাৎসিদের মূল টার্গেট ছিল কমিউনিস্ট, সামাজিক গণতন্ত্রী, কর্মী-ইউনিয়নের নেতা, সমাজতন্ত্রী আন্দোলনকারী, ধর্মযাজক। জাতিগতভাবে ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল নাৎসিরা।

বার্লিনের এই বন্দীশিবির এবং মৃত্যুপুরীর অবস্থা ছিল ভয়াবহ। '৪২-এর শেষ ৬ মাসে নাৎসিশিবিরের ৯৫ হাজার বন্দীর মধ্যে মারা গিয়েছিলেন ৫৭ হাজার। '৪৩-এর প্রথম আট মাসে মারা যায় ৬০ হাজারেরও বেশি বন্দী। '৪৫-এর জানুয়ারিতে বিভিন্ন নাৎসি বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন প্রায় ৭ লক্ষ লোক। এঁদের মধ্যে ২ লক্ষ ছিলেন মহিলা।

আজ ইতিহাস যেন কথা বলে বার্লিনের সেই মৃত্যুপুরীর আধুনিক সংস্করণ 'টোপোগ্রাফি অব টেরর'-এ। নিচে ভূগর্ভে রাখা হয়েছে সাবেক কালের সেই গ্যাসচেম্বার। প্রিনৎস আলব্রেখটসাইটে নাৎসি-জমানার ভয়াবহ দিনগুলি ফিরে দেখার জন্য পূর্ণ ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয় ১৯৮৭ সালে। সংরক্ষণের প্রস্তুতিপর্ব অবশ্য চলছিল অনেক আগে থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বার্লিন বিভক্ত হলো দু'ভাগে। প্রিনৎস আলব্রেখটস্ট্রাসে পড়ল সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত 'মিটে' অর্থাৎ মধ্য বরোর অধীনে। দক্ষিণাংশ অর্থাৎ যেখানে ছিল আর এস এইচ এ-র সদর দফতর, ওই অংশ পড়ল আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত ক্রয়েজবুর্গ বরোর অধীনে।

নাৎসিবিরোধী এক কমিউনিস্ট বিপ্লবীর স্মরণে '৫৪ সালেই প্রিনৎস আলব্রেখটস্ট্রাসের নাম বদলে রাখা হলো নিডারকির্শনারস্ট্রাসে। সাবেক মিউজিয়াম অব এথনোগ্রাফির বাড়িটি সংস্কারের উপযোগী থাকলেও সেটি ভেঙে ফেলা হয়। 'অয়রোপাহাউস' আর 'মার্টিন গ্রোপিউস বিল্ডুং' বাদ দিয়ে পুরো এলাকাটা ফাঁকা করে ফেলা হয়। '৫৭ সাল থেকে পরিকল্পনা চলতে থাকে, কীভাবে নাৎসি জমানার ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতি ধরে রাখা যায়। তৎকালীন পশ্চিম বার্লিনের সেনেট স্থপতি এবং নগর-পরিকল্পকদের একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করল। সামগ্রিক পরিকল্পনা '৬৫ সালে পশ্চিম বার্লিনের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলো। এর আগেই অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছে 'মৃত্যুপুরী' সংরক্ষণের কাজ।

মৃত্যুপুরীর সংগ্রহশালায় পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে নাৎসি জমানায় দেখা দিল দারুণ অস্থিরতা। এর পূর্ণ সুযোগ নিতে থাকে মিত্রশক্তি। '৪৩-এর নভেম্বর মাস থেকে বড়মাপের আক্রমণ হতে থাকে বার্লিনের এই ঘাঁটি আর আশপাশ এলাকার উপর। 'প্রিনৎস আলব্রেখট পালাইস'-এর অনেকটা ভস্মীভূত হলো। '৪৪-এর ৭ মে বোমায় মারা গেলেন বন্দীশিবিরের বেশ কয়েকজন। '৪৫-এর ২৬ এপ্রিল সোভিয়েত সেনানায়ক কর্নেল-জেনারেল চুইকভের বাহিনী 'হালেস্কেশ টোর' (জার্মান ভাষায় টোর মানে দরজা বা তোরণ) লন্ডন কানেলের দিক থেকে এগিয়ে এল। বার্লিন শহর আত্মসমর্পণ করল '৪৫-এর ২ মে। শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন নাৎসি সেনারা।

১৯৪৫-এর ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে বিমানহানার দৌলতে হিটলারের সদর-ঘাঁটির বিদ্যুৎ ও জল-সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। ২৫ এপ্রিল রাতে আবার বোমাবর্ষণের পরে গেস্টাপোরা বন্দীশিবিরের অনেককে সরিয়ে নিল। পরে তাঁদের মেরে ফেলা হলো গুলি করে। তবে, মিত্রশক্তি যখন মৃত্যুপুরীর দখল নিল, তখনও সেখানে ছিলেন ছয় বন্দী। জীবন্মৃতের মতো পড়ে ছিলেন তাঁরা। আর এস এইচ এ, থার্ড রাইখ-এর সমর নায়কেরা অধিকাংশই গা ঢাকা দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে। নাৎসি-নায়ক ওহ্লেনডর্ফ, শ্লেনবার্গ আর হিমলার বার্লিন থেকে পালালেন শ্লেশভিগ-হোলস্টাইনে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন হিমলার। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি।

১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে ইওরোপের প্রায় অর্ধেক ভেঙেচুরে একাকার। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে জাপান আর মার্কিন মুলুকের কিছু শহরও। ইওরোপের ছোট্ট নদী ইন। বয়ে চলেছে দুটি শহরের মাঝ দিয়ে। শহর দুটি হলো সিমবাখ আর ব্রাউনাউ। এই সিমবাখেই তাঁবু গেড়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ত্রয়োদশ সাঁজোয়া বাহিনী। সেনাদের নজর, কামানের মুখ—সবই নিবদ্ধ নদীর অপর পারের ছোট্ট শহর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউয়ের দিকে। দুই শহরের মধ্যে, মানে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে নাৎসিবাহিনীর যুদ্ধ লাগল বলে।

৩০ এপ্রিল সকাল আটটা নাগাদ সিমবাখের মেয়র মিত্রবাহিনীর চরমপত্র নিয়ে নদী পার হয়ে গেলেন ব্রাউনাউয়ের মেয়রের কাছে। ওই চিঠিতে নির্দেশ ছিল, বেলা বারোটার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে মিত্র-সেনারা গুঁড়িয়ে দেবেন

ব্রাউনাউ। সিমবাখের মেয়র ব্রাউনাউয়ের এক নম্বর নাগরিককে বললেন, বাঁচতে গেলে আত্মসমর্পণই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্রাউনাউয়ের সাধারণ লোকেরা শান্তিপ্রিয়। তাঁরা যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি চান না। কিন্তু এক প্রথম সারির নাৎসি-সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শহরটা। তাঁর নির্দেশ, শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। বিনা যুদ্ধে হঠবে না জার্মান বাহিনী। গোটা ব্রাউনাউয়ের বুকে ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, 'ফ্যুয়েরার' হিটলারের জন্ম হয়েছিল এই শহরে। তাই শহরের লোকেদের ভয় পেয়ে পেছিয়ে আসা হবে কাপুরুষতার নিদর্শন। নদীর এপারে মিত্রবাহিনীর জওয়ানরা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। এই বুঝি শুরু হবে গোলাবর্ষণ।

ব্রাউনাউয়ের ময়দানে জড়ো হয়েছে অজস্র লোক। তাঁদের চোখেমুখে শঙ্কা। যুদ্ধ না শান্তি—এই নিয়ে প্রকাশ্যে একমত হতে পারছেন না তাঁরা। এমন সময় নাৎসিদের রোষচক্ষুর পরোয়া না করে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, বাছারা, যুদ্ধের চেয়ে শান্তিই ভাল। হিটলার তো এই শহরে জন্মে আমাদের গৌরব বাড়াননি। উল্টে কলঙ্কিতই করেছেন ব্রাউনাউকে। দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে গিয়েছে শহরবাসীর।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। এ যেন সমবেতদের প্রায় সবারই মনের কথা। কিন্তু এগিয়ে এসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারেন কে? সবার চোখ তখন সেই বৃদ্ধার দিকে। আরে, এ যে শহরের সবার চেনা। জনতা হইহই করে উঠল। নাৎসি কমান্ডার আর তাঁর শাগরেদরা ধমক দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কারণ, জনতা তখন মরিয়া। তাঁরা মরতে চান না। বাঁচতে চান। ওই বৃদ্ধাকেই যেন নেত্রী বানিয়ে নিলেন তাঁরা। নাৎসি যোদ্ধারা ওই পরিস্থিতিতে কী করবেন বুঝে ওঠার আগেই এক শহরবাসী কমান্ডারের পিঠে পিস্তল চেপে ধরে হুকুম দিলেন, চলো।

ঘড়ির দুটি কাঁটা বারোটা প্রায় ছুঁই ছুঁই। দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ব্রাউনাউয়ের মেয়র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন নদীর দিকে। যাতে গুলিগোলা শুরু না হয়। মাঝ নদী থেকেই হাত তুলে তাঁরা চিৎকার শুরু করলেন। ব্রাউনাউ আত্মসমর্পণ করেছে। শেষ মুহূর্তে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল হিটলারের জন্মস্থান। তারিখটা ছিল ১ মে। মতান্তরে ৩০ এপ্রিল।

যাঁর জন্য ঐতিহাসিক এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, তাঁর নাম ফ্রাউ রোজা হল। ৫৬ বছর আগে দাই হিসাবে তিনি একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর নাম আডলফ হিটলার। ঐতিহাসিক ওই ঘটনার দিনই ঘটে গেল আরও একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। পরাজয় নিশ্চিত—এটা বুঝে ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে নেমে গেলেন হিটলার। বেছে নিলেন আত্মহত্যার পথ।

মিত্রশক্তির গোয়েন্দাদের ধোঁকা দিতে ঠিক হিটলারের আদলে নকল হিটলার ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়। আসল আর নকলের পার্থক্যটা জানতেন তাঁর অনুগামী গুটিকয় সেনা-অফিসার। ঠিক কোথায়, কখন হিটলার আত্মহত্যা করেছেন, আদৌ তিনি আত্মহত্যা করেছেন কী না, তা নিয়ে কিন্তু মতানৈক্য থেকেই গিয়েছে। হ্যাঁ, খোদ জার্মানিতেই।

১৯৩৮-এর শেষেই নাৎসিরা ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ছিল ৫ লক্ষ ইহুদি। নাৎসি-জমানা শুরু হওয়ার পরে ৫ বছরে তাঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৬৯ জন অন্য জায়গায় চলে যেতে সক্ষম হন। '৪১-এর অক্টোবর থেকে ইহুদিনিধনের মাত্রা বাড়তে থাকে।

সব দেখে-শুনে বার্লিনে ফেরার পথে বড় মন খারাপ হয়ে গেল। আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম হিটলারের হুঙ্কার, ইহুদিদের কান্না। সেই কান্না যাঁর জন্য সেই হিটলার হয়েছেন সহস্রাব্দের সেরা মানুষদের একজন। সহস্রাব্দের সেরা না বলে তাঁকে যদি সেরা কলঙ্কিত নায়ক বলা হতো তাহলে মনে হয় সেইটাই ঠিক হতো।

পরীর মতন

সুখেন্দু ভট্টাচার্য

না, পরী নয়, পরীর মতন
মেঘ ঘনালে দেয় হানা
হালকা হাসির জোছনামাখা
ফটিকরঙা তার ডানা।

তার টানেতে শিল্পী পাগল
কবির লেখায় বান ডাকে
ঘুমের ঘোরে কিশোর ছেলে
কাঁথার আড়ে মুখ ঢাকে।

তারই জন্যে বকুল ফোটে
শিউলি ঝরে ভোর রাতে
দুর্গা মায়ের অসুর খোকা
মন্ত্র পড়ে জোড় হাতে।

পরী সে নয়, পরীর মতন
মেঘ ঘনালে যায় জানা
জোছনা রাতে কেমন ছিল
ফটিকপানা তার ডানা।

সোনালি ছড়া

উজ্জ্বল কুমার দাস

ড্যামকুড়াকুড় বাদ্যি বাজে
শিউলি ফোটে ডালে,
দুগগা তলায় চল না ছুটি
সোনালি সককালে!

পুকুর ঘাটে জল টলমল
সাঁতার কাটে হাঁসে,
এঘর-ওঘর উঠোন জুড়ে
নাড়ুর গন্ধ আসে।

নীল আকাশে মেঘ ভেসে যায়
ফুরফুরে দুধ সাদা,
নাগর দোলায় চড়ব আমি
সঙ্গে নিবি দাদা?

মজার ব্যায়াম, ব্যায়ামের মজা

তুষার শীল

কোনো কিছু একটানা করলেই বিরক্তি আসে। বিশেষ করে ব্যায়াম। ব্যায়াম জিনিসটা বড় নীরস তবে আপাতদৃষ্টিতে নীরস মনে হলেও এর উপকারিতা ও উপযোগিতার তুলনা নেই। নারকেলের যেমন বাইরের শক্ত আবরণের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে জল ও সুমিষ্ট শাঁস, ব্যায়ামও ঠিক তেমন। কঠিন কঠিন ভাবের ভিতরে রয়েছে সুস্থ-সবল ও সুন্দর থাকার চাবিকাঠি। কিছুদিন অন্তর অন্তর ব্যায়াম ও আসনের ভঙ্গিমাগুলি পাল্টে নিও, এতে একঘেয়েমি দূর হবে। সমস্ত মাংসপেশী, শরীর অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি যথা ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী ইত্যাদির ব্যায়ামও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করতে হবে। অন্যথায় অনেক ব্যায়াম একসঙ্গে করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি অধিক পরিশ্রমের ব্যাপার। আর একটা কথা, তোমাদের হয়তো একা একা ব্যায়াম করতে ইচ্ছে করে না। সত্যিই তো, ব্যায়ামের মতো ব্যাপারে একজন সঙ্গী পেলে মজাটা জমে বেশি।
এবারে তাহলে দু'জনে একসঙ্গে মিলে যে মজাদার ব্যায়ামগুলি করা যেতে পারে তারই কয়েকটা শেখা যাক। কি বলো?
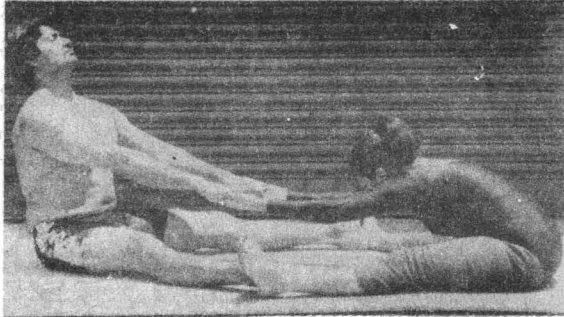
হাফ সিট আপস—দু'পা ছড়িয়ে পায়ের মাঝে ফাঁক রেখে মুখোমুখি বস। একজনের ডান পায়ের পাতা অপরজনের বাঁ পায়ের পাতার সঙ্গে লাগানো থাকবে। একে অপরের বিপরীত হাত ধরে নাও। এখন একজন শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলে অন্যজনের কপাল মেঝেতে লেগে যাবে। এই অবস্থায় যে সামনে ঝুঁকছে অর্থাৎ যার কপাল মেঝেতে লাগছে সে শ্বাস ছাড়বে এবং যে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছে সে শ্বাস নেবে। পরমুহূর্তেই অন্যজন শ্বাস নিতে নিতে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করবে ও বিপরীত জন শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কপাল মাটিতে লাগাবে। ক্রমান্বয়ে একইভাবে অভ্যাস করে যাও ১০/১৫ বার। এক ক্ষেপ হলো।

সিটিং সাইড ক্রশিং—একইভাবে বসে হাত পাশের দিকে মাটির সমান্তরাল কাঁধ বরাবর তুলে রাখ। এখন শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে একজন কপাল বাঁ হাঁটুতে লাগাও, তার সঙ্গে ডান হাত
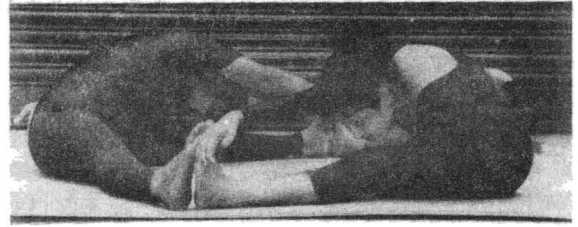
দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলগুলি স্পর্শ কর। অন্য হাত পিঠে ভাঁজ করে দাও। বিপরীত দিকে যে বসে আছে সে তখন ডান হাঁটুতে কপাল লাগাবে এবং বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করবে। তার ডান হাত ভাঁজ হয়ে পিঠে চলে যাবে। পরমুহূর্তেই দু'জনে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে মুখোমুখি বসবে। হাত কিন্তু মাটির সমান্তরাল তোলাই থাকবে। প্রতি পায়ে ১০/১২ বার করে প্রতি ক্ষেপে অভ্যাস করো।

স্ট্যান্ডিং ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক বেনডিং—দু'জনেই পিঠে পিঠ লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। দু'জনেই হাত মাথার উপর লম্বা করে তুলে দাও। একে অন্যর হাত ধরে নাও। একজন শ্বাস নিতে নিতে সামনে ঝুঁকে যাও ছবির মতো। অন্যজনের শরীর তখন পিছন দিকে বেঁকে যাবে। পরমুহূর্তেই যে পিছনে বেঁকেছ সে শ্বাস নিতে নিতে সামনে ঝুঁকে পড়। অপরজন অর্থাৎ এতক্ষণ যে সামনে ঝুঁকে ছিল সে তখন পিছনে বেঁকে যাবে এবং শ্বাস ছাড়বে ৮/১০ বার। আগের দু'টি এবং এই ব্যায়ামটি পেট ও কোমরের অতিরিক্ত মেদ কমতে ও লম্বা হতে সাহায্য করবে।
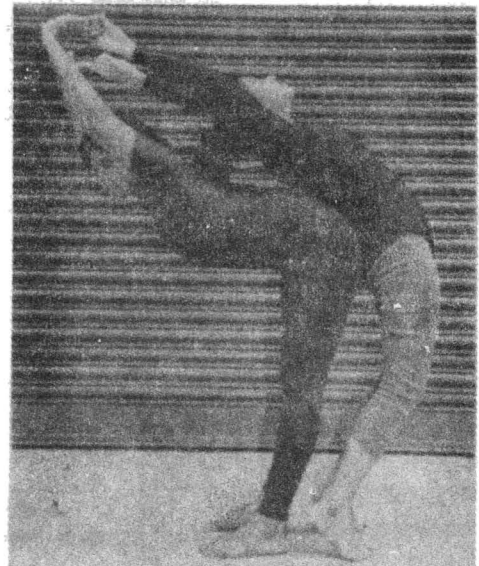
সম্পূর্ণ ভৌতিক উপন্যাস
রহস্যময় রোগী
মানবেন্দ্র পাল

হঠাৎ টেলিগ্রাম

প্রায় ষাট বছর আগের কথা বলছি। তখন আমি ডাক্তারি পাশ করে একটা নামী হাসপাতালে ঢুকেছি। সেই সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করছি। ঐ অল্প বয়সেই বেশ নামডাক হয়েছিল। ইংরিজিতে যাকে বলে 'জেনারেল ফিজিশিয়ান' হলেও আমি বেশি চিকিৎসা করতাম মানসিক রোগীদের। আর এতেই আমার খ্যাতি। মানসিক রোগী মানেই পাগল নয়। পাগল না হয়েও কেউ কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করে। যেমন—কেউ সবসময়ে গম্ভীর হয়ে থাকে। মোটে হাসে না। আপন মনে দিনরাত কি যেন ভাবে। কেউ কেউ সব সময় বিমর্ষ। কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। এই রকম নানা লক্ষণ থেকে বোঝা যায় লোকটি মানসিক রোগী হয়ে গেছে।

আমি এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসা করতে বেশি পছন্দ করতাম। মেলামেশা করে তাদের মনে কিসের দুঃখ, কিসের অভাব জেনে নিতাম। তারপর চিকিৎসা করে ভালো করে দিতাম।

হঠাৎ সেদিন আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এলো। টেলিগ্রাম এলেই মানুষ ভয় পায়—না জানি কার কী হলো।

টেলিগ্রাম খুলে নিশ্চিন্ত হলাম। না, সেরকম কিছু নয়। তবে অবাক হলাম। আমার বন্ধু নিশীথ টেলিগ্রাম করেছে বাগআঁচড়া থেকে। লিখেছে "কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে শীগগির চলে এসো এখানে। ভালো একটা কেস আছে।"

মনস্থির করা মাত্র পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম। শেয়ালদা থেকে রানাঘাট। সেখান থেকে বাসে বাগআঁচড়া। জায়গাটা কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে। শান্তিপুরের কাছে।

জায়গাটার নাম বাগআঁচড়া কেন সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

একসময়ে শান্তিপুরের বর্তমান বাবলা গ্রাম দিয়ে গোবিন্দপুর হয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হতো। পরে প্রাকৃতিক কারণে গঙ্গা দক্ষিণে সরে আসাতে গঙ্গার পুরনো খাত জুড়ে চর পড়ে যায়। কারও কারও মতে ঐ চরে কোনো ফসল হতো না বলে লোকে চরটাকে বলতো বাগআঁচড়া। আবার কেউ কেউ বলেন ওখানে খুব বাঘের উপদ্রব ছিল। লোকে প্রায় প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেত দরজার সামনে বাঘের আঁচড়াবার দাগ। মানুষের গন্ধ পেয়ে খেতে এসে বন্ধ দরজা আঁচড়ে থাবা মেরে খোলবার চেষ্টা করত। সেই থেকেই নাকি এই জায়গার নাম বাগআঁচড়া।

বাঘ ছাড়াও আরও কিছু অন্য ভয় ছিল ওখানে। ঐ যে ধু ধু চর—দুপুরের রোদে জ্বলন্ত মরুভূমির মতো। আর রাতে? রাতে ঐ চরের অন্য রূপ। জনমানবশূন্য শুধু বালি আর বালি। ভুল করে কেউ ওদিকে গেলে সে আর বেঁচে ফিরত না। কী করে কী যে হতো কেউ তা বুঝতে পারত না। শুধু সারা চর জুড়ে একটা হু হু করে দমকা বাতাস বইত। তারপর কেমন একটা গোঙানির শব্দ। তারপরই সব চুপ। পরের দিন সকালে দেখা যেত একটা মানুষ কিংবা একটা কোনো নিশাচর পাখি, নিদেন একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। কে যেন প্রবল আক্রোশে তাদের জিভ টেনে বের করে দিয়েছে।

এই ভয়ংকর চরে ঢের পরে বসবাস করতে আসেন একজন দুর্ধর্ষ সাহসী প্রবল প্রতাপ ব্যক্তি। নাম চাঁদ রায়।

কে এই চাঁদ রায়?

কেউ কেউ বলেন ইনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর এঁরই নামে) জ্ঞাতি। কেউ বলেন—না, জ্ঞাতি নয়, চাঁদ রায় ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান। আবার কারো মতে চাঁদ রায় একজন নিষ্ঠুর দস্যুসর্দার। যাই হোক না কেন তিনি যে একজন সাহসী আর প্রতাপশালী লোক ছিলেন তার প্রমাণ মিলল যখন দেখা গেল ঐ ভয়ংকর চরে এসে তিনি পাকাপাকিভাবে থাকতে লাগলেন। শুধু থাকাই নয়, ঐ চরের খানিকটা জায়গা জুড়ে চাষবাস শুরু করলেন। যে চর বেশ কয়েক শত বছর ধরে ভয়াল ভয়ংকর মৃত্যুফাঁদ হয়ে পড়ে ছিল, এখন চাঁদ রায়ের চেষ্টায় সেই চরে সোনার ফসল ফলতে শুরু করল। কয়েক বছরের মধ্যেই এই চাষের দৌলতে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন চাঁদ রায়। তারপরেই তিনি একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বলে গণ্য হলেন। কেউ কেউ তাঁকে বলত রাজা—রাজা চাঁদ রায়।

এ সব প্রায় তিনশো বছর আগের কথা।

ক্রমে চাঁদ রায়ের দেখাদেখি অনেকে এখানে এসে বসবাস করতে লাগল। আর চাঁদ রায় প্রাসাদ তৈরি করে রীতিমতো রাজার হালে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সে সময়ে রাজা-জমিদাররা প্রজাদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করলেও নিজেদের নাম চিরস্থায়ী করার জন্যে অতিথিশালা, জলাশয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। চাঁদ রায়ও কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ বাগআঁচড়ায় এখনও আছে।

চাঁদ রায় ঐ চড়ার অনেকখানি জায়গা দখল করে রাজপ্রাসাদ তৈরি করলেও যে কারণেই হোক চরের পশ্চিম দিকটা পরিত্যক্তই রেখেছিলেন। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-পারিষদরা কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি উত্তর দিতেন না। এড়িয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়, উনি আদেশ জারি করলেন একটা বিশেষ সীমার ওদিকে যেন কেউ না যায়।

চরের পশ্চিম দিকে কী ঘটেছিল—এমন কী ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা কেউ জানতে পারল

না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি নাকি পশ্চিম দিকের জানলা রাত্রিবেলায় খুলতেন না।

এরপর তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ নামকরা কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। আর তাঁদের বসবাসের জন্যে বাগআঁচড়ার কাছাকাছি একটা জায়গা ঠিক করে দেন যেখানে ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্তভাবে পূজা-অর্চনা করতে পারেন। সেই জায়গাটা ব্রাহ্মণরাই শাসন করতেন, চাঁদ রায় সেখানে নাক গলাতেন না। জায়গাটার নাম হয়েছিল তাই ব্রহ্মশাসন।

কালের নিয়মে এক সময়ে চাঁদ রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়ল। যুগ বদলে গেল। তারপর কোথা থেকে উদয় হলেন এই রাজাবাবু। তাঁর নাম চন্দ্রভানু রায়। ইনি বলেন—উনি নাকি চাঁদ রায়েরই বংশধর। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম নেই। চন্দ্রভানু রায় নামেই রাজা, রাজ ঐশ্বর্য আর আগের মতো নেই। থাকেন সেই পুরনো ভাঙা রাজপ্রাসাদেই নতুন করে সারিয়ে সাজিয়ে। যখন তিনি রাজা তখন তাঁকেও রাজার মতোই চলতে হয়। দাস-দাসী, আমলা, গোমস্তা যেমন আছে তেমনি হাল আমলের মতো রাখতে হয়েছে একজন সেক্রেটারি। সেই সেক্রেটারিই সব—রাজার ডান হাত। এই সেক্রেটারিই হচ্ছে আমার বন্ধু নিশীথ।

কঠিন ব্যাধি

রানাঘাট স্টেশনে নেমে বাস। এখনকার মতো তখন এত বাস ছিল না। সারাদিনে হয়তো দু'খানি বাস চলত। একখানি ঝরঝরে বাস দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। ছাদের ওপরেও লোক। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে ভেতরে দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিলাম। নতুন জায়গা—নতুন পথ। ভেবেছিলাম নিশীথ আসবে কিংবা কাউকে পাঠাবে। কিন্তু তেমন কাউকে তো দেখলাম না। প্রায় ঘণ্টা

দুয়েক টিকিয়ে টিকিয়ে ধুলোর মধ্যে চলার পর বাগআঁচড়া পৌঁছনো গেল।

বাস থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকালাম। প্রায় ষাট বছর আগের বাগআঁচড়া এখনকার মতো ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল। দূরে চড়ার খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। যেরকম জানা ছিল সেরকম দিগন্তপ্রসারী চড়া আর নেই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ খানিকটা পড়ে আছে। আমি কোনদিকে যাব ভেবে পেলাম না। এমন একজন কাউকে দেখলাম না যে জিজ্ঞেস করব রাজবাড়িটা কোন দিকে।

হঠাৎ দেখলাম দূরে একটা পাল্কি আসছে। কাদের পাল্কি কে জানে। পাল্কিটা আমার কাছে এসে থামল। একজন লম্বা লাঠি হাতে পাগড়ি মাথায় লোক এসে দাঁড়াল। সেলাম করে বলল, আপনি ডাগতারবাবু? কলকাতা থেকে আসছেন?

বললাম, হ্যাঁ। নিশীথবাবু পাঠিয়েছেন?

লোকটা বললে, সেকরিটারিবাবু পাঠিয়েছেন।

যাক, বাঁচা গেল।

জীবনে কখনো পাল্কি চড়িনি। এখানে আসার দৌলতে পাল্কি চড়া হলো। কিন্তু সেও তো এক ফ্যাসাদ। গুটিসুটি মেরে কোনোরকমে তো খোলের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর বেহারারা যতই দৌড়য় ততই আমার দুলুনি লাগে। বারে বারে কাঠে মাথা ঠুকে যায়।

পাল্কির দু'পাশের দরজা খোলা ছিল। দেখতে দেখতে চলেছিলাম। দু'দিকেই জলাজঙ্গল—হোগলার ঝোপ। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে বিরাট বিরাট দেবদারু গাছ। হু হু করে বাতাস বইছে। কিন্তু বাতাসটা যেন কিরকম। সে বাতাসে গা জুড়োয় না। কেমন যেন শুকনো—আগুনের হলকা মাখানো। অথচ এতক্ষণ বাসে এলাম এরকম বাতাস পাইনি।

দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলাম,

হঠাৎ একটা চেঁচামেচি কানে এল। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একটা থুত্থুড়ে বুড়ি এক ঝুড়ি শুকনো ডালপালা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর একপাল. কালো কালো প্রায়-উলঙ্গ ছেলে মজা করে তাকে ঢিল মারছে। বুড়ি কিন্তু তাদের কিছুই বলছে না। শুধু ঢিল থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। বেহারাদের পাল্কি নামাতে বলে নেমে পড়লাম। তারপর ছুটে গিয়ে ছেলেদের আচ্ছা করে বকুনি দিলাম। আমার মতো একজন পাল্কিচড়া বাবু দেখে ছেলেগুলো ভয়ে ছুটে পালাল। আমি বুড়ির কাছে গিয়ে বললাম, তোমাকে ওরা মারছে কেন?

বুড়ি খোনা খোনা স্বরে বলল, আঁমায় তোঁ সঁবাই মাঁরে। রাঁজাবাবুই তাঁড়িয়ে দিঁল ওঁর সীঁমানার বাঁইরে এঁই জঁঙ্গলে, তোঁ ছেঁলেরা মাঁরবে তোঁ বঁটেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাজাবাবু তাড়িয়ে দিলেন কেন?

বুড়ি কুঁজো। অতি কষ্টে মাথার ঝুড়িটা ঠিক করে নিয়ে বলল, আঁমাকে সঁবাই যেঁ ডাঁইনি বঁলে।

শুনে আমার বুকের রক্ত ছমছম করে উঠল। ডাইনির কথা অনেক শুনেছি। এই বুড়িটা সত্যিই ডাইনি হোক বা না হোক লোকে তো একে ডাইনি বলে।

বললাম, তা তুমি তো সত্যিই ডাইনি নও।

বুড়ি বললে, ঐঁ তোঁ বঁলে কেঁ। আঁমায় নাঁকি ডাঁইনির মঁতো দেঁখতে। এঁই হঁলো আঁমার অঁপরাধ। তাঁ ভাঁলো। মাঁথার ওঁপর ধঁম্ম আঁছে। তিঁনিই বিঁচার কঁরবেন। বলতে বলতে বুড়ি যেন কোমর সোজা করে দাঁড়াল। আর তার কুৎকুতে চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

আমি ডাইনি কখনো দেখিনি। ডাইনি বলে কিছু আছে তাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই মুহূর্তে ঐ কুঁজো থুত্থুড়ে বুড়িকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে আর চোখ দুটো সত্যি সত্যি জ্বলে উঠতে দেখে কেমন ভয় পেলাম। বুঝলাম আর কিছু হোক বা না হোক এ যে সাধারণ একটা বুড়ি তা মোটেই নয়।

ঝুড়িটা আবার একটু ঠিক করে নিয়ে বুড়ি এবার হঠাৎ একটু হাসল। সামনের সারিতে মাত্র তিনটি লম্বা লম্বা হলদে ছোপধরা দাঁত। একটা দাঁত বোধহয় নড়ছে। বলল, কোঁথা থেঁকে আঁসা হঁচ্ছে?

বললাম, কলকাতা থেকে।

কোঁথায় যাঁচ্ছ? রাঁজবাঁড়িতে?

বললাম, হ্যাঁ।

রাঁজাবাবুর মেঁয়েকে দেঁখতে?

আমি একটু অবাক হলাম। কি করে জানল ও?

বললাম, এখানে আমার এক বন্ধু আছে। সেই ডেকেছিল।

বুড়ি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, যাঁচ্ছ যাঁও। তঁবে সাঁবধান।

বলেই আবার কুঁজো হয়ে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি পাল্কিতে এসে উঠলাম বটে কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। প্রথমত এখানকার বাতাসটা একটু অন্যরকমের। দ্বিতীয়ত ঐ বুড়ি। কুঁজো হয়ে গেছে। তবু চোখের সামনেই তো দেখলাম হঠাৎ কিরকম সোজা হয়ে দাঁড়াল। তৃতীয়ত ওর ঐ ঘোলাটে চোখেও দৃষ্টিটা কিরকম জ্বলে উঠেছিল।

এ আবার কিরকম বুড়ি? সবচেয়ে ভাবনা হলো— কেন ও আমায় সাবধান করে দিল? তা হলে যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে?

কিছুই জানি না। নিতান্তই নিশীথ টেলিগ্রাম করেছিল—'চলে এসো। এখানে ভালো একটা কেস আছে।'

কিসের কেস কে জানে? তবে বুড়ির মুখে শুনলাম রাজাবাবুর একটা মেয়ে আছে। আর ডাক্তার হিসেবে নিশীথ যখন আমায় ডেকেছে তখন নিশ্চয় মেয়েটার কোনো অসুখ আছে। আর যা-তা অসুখ নয়, জটিল কোনো মানসিক রোগ। নইলে নিশীথ আমাকে ডাকতে যাবে কেন? কাছেপিঠে কি ভালো ডাক্তারের অভাব আছে?

রাজাবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে আলাপ করিয়ে দিয়েই নিশীথ সেই ভাঙাচোরা রাজপ্রাসাদের একতলার একটা ঘরে এনে বসাল। বলল, এই ঘরটাতেই তুমি থাকবে। পুরনো বাড়ি, কিন্তু বাথরুম, জলের কল সব নতুন করে করা হয়েছে। এখানে সাপের ভয় আছে বটে তবে বাড়িতে সাপ নেই। ডজনখানেক বেঁজি পোষেন রাজাবাবু। দিনরাত বেঁজিগুলো ঘোরে বাড়িময়, ওদের ভয়ে সাপ ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

'ঘেঁষতে পারে না' বলে যতই আশ্বাস দিক তবু সাপ বলে কথা। খুব ভরসা পেলাম না। প্রচুর জলখাবার আর কফি খাওয়ার পর নিশীথ যা বললে তা এইরকম—

বর্তমান রাজাবাবুর একটাই দুঃখ ছিল তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। অনেক যাগযজ্ঞ করেছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। একদিন রাজাবাবু আর রানীমা গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে চরের ওপরে একটা সদ্যোজাত শিশুকে পড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেন। রানীমার মাতৃহৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে।—আহা! কার এত সুন্দর মেয়ে গো। এর মা-বাবা কী নিষ্ঠুর। এমন মেয়েকে ফেলে দিয়ে গেছে! বলে, তাকে বুকে তুলে নেন। তারপর তাকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করতে লাগলেন।

কিন্তু মেয়ে যত বড়ো হতে লাগল ততই তাকে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো সবার। মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু গলার স্বর পুরুষের মতো মোটা। তার

চোখের মণি কটা। আর মাঝে মাঝে মণিদুটো ঘোরে। মেয়েটি খুব চঞ্চল। কিছুতেই এক জায়গায় বসে থাকে না। গোটা প্রাসাদ ঘুরে বেড়ায়। কেন যে অমন করে ঘোরে কে জানে। বয়স এখন তার দশ-এগারো। আর ওকে ঘরে রাখা যায় না। কেবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

কোথায় যায়? কথার মাঝখানে আমায় জিজ্ঞেস করতে হলো।

নিশীথ বললে, ঠিক কোথায় যায় কেউ জানে না। তবে বনের দিকে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ও নিজেই ফিরে আসে?

কখনও প্রহরীরা গিয়ে ধরে আনে। কখনও নিজেই চলে আসে। তবে তখন ওকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। এসেই শুয়ে পড়ে।

কোথায় যায় জিজ্ঞেস করলে ও কি বলে?

কিছুই বলে না, উল্টে ভীষণ রেগে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, ও কি খুব রাগী?

সাংঘাতিক। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর যেন রাগ বাড়ছে। রেগে গেলেই ও দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি শুরু করে। হাতের কাছে যা পায় ভেঙে চুরমার করে দেয়।

ডাক্তার দেখানো হয়েছিল?

নিশীথ বলল, ডাক্তার? ডাক্তার দেখলেই মারতে যায়। একবার একজন ডাক্তারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরেছিল।

একথা শুনেই বুড়ির কথাটা মনে হয়েছিল। সে যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল সে কি এইজন্যেই?

নিশীথ বলল, এর রোগটা মানসিক বলেই মনে হয়। আর সেইজন্যেই রাজাবাবুকে তোমার কথা বলেছিলাম।

বললাম, কিন্তু ডাক্তার দেখলেই যদি ক্ষেপে যায় তা হলে আমি কাছেই বা যাব কি করে, চিকিৎসাই বা করব কি করে?

নিশীথ বলল, তুমি যে ডাক্তার একথা বলা হবে না। তারপর ওকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলে তুমি যা করতে পার কোরো।

কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হবে কি করে? কি বলেই বা আলাপ করব?

সে কথাও আমরা ভেবে রেখেছি। ওকে বলা হবে কলকাতা থেকে একজন এসেছে যে কাক ধরতে পারে।

আমি কাক ধরতে পারি। শুনে তো হতভম্ব।

হ্যাঁ। ও কাক খুব পছন্দ করে। ওর মর্জিমতো কত যে কাক দূর দূর পাহাড়ের দেশ থেকে ধরা হয়েছে তা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

বললাম, কিন্তু আমি কাক ধরব কি করে?

নিশীথ বলল, তার ব্যবস্থাও হয়েছে। এ ঘরে এসো।

ও আমাকে নিয়ে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা অন্ধকার। তার মধ্যেই গোটা তিনেক খাঁচা চোখে পড়ল। তিনটে খাঁচাতেই বোধহয় কাক রয়েছে।

নিশীথ বলল, এসবই অম্বুজার কাক। তিনটে লুকিয়ে নিয়ে এসে রেখেছি।

আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। এইভাবে ধাপ্পা দিয়ে কি রোগীর চিকিৎসা করা যায়? অসম্ভব।

নিশীথ বলল, এবার তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। ঐদিকে বাথরুম। চৌবাচ্চাভর্তি জল আছে। তারপর ঠাকুর এ ঘরেই খাবার দিয়ে যাবে। তোমায় কোথাও যেতে হবে না। আমি এখন যাচ্ছি।

সবেমাত্র নিশীথ চৌকাঠের বাইরে পা রেখেছে হঠাৎ দুমদাম শব্দ। শব্দটা এল দোতলার কোনো ঘর থেকে। আমি চমকে উঠলাম। নিশীথ বলল, ও কিছু নয়। অম্বুজা দরজা ঠেলছে।

অম্বুজা?

রাজকুমারীর নাম। জলের ধারে পাওয়া গিয়েছিল বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। অম্বু মানে তো জল।

নাম নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বললাম, ও কি ঘরে আটকে আছে?

হ্যাঁ, যখন-তখন পালিয়ে যায় বলে ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়।

বলেই নিশীথ চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চিৎকার, দরজা খোলো—দরজা খোলো—

বললে কেউ বিশ্বাস করবে না গলাটা পুরোপুরি একটা রাগী পুরুষের।

ঐ গলা শোনা মাত্র বাড়ির পিছনের গাছে গাছে যে-সব পাখিরা কিচমিচ করছিল তারা থেমে গেল। উঠোনে একটা কুকুর চোখ বুজিয়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ সোজা হয়ে কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াল। আমি শব্দ লক্ষ্য করে দোতলার সার সার ঘরগুলোর দিকে তাকালাম। কিন্তু কোন ঘর থেকে অম্বুজা চিৎকার করেছিল তা বুঝতে পারলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার পর লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। বিশ্রামটা হচ্ছিল শরীরের, মনের নয়। একটা চিন্তাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল—যে কণ্ঠস্বরটা শুনলাম সে কি একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের? মেয়েদেরও গলার স্বর কারো কারো মোটা হয়, কিন্তু এ যে কোনো ক্রুদ্ধ দানবের গলা। তা হলে এ তো কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগগ্রস্ত মেয়ে নয়, অন্য কিছু। সে অন্য কিছুটা কী? আমি তার কী-বা চিকিৎসা করব?

নিস্তব্ধ দুপুর। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগের একটা গ্রাম মাত্র। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে একমাত্র তারাই জানে দুপুরের নিস্তব্ধতা ওসব জায়গায় কেমন।

আমি আর শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘরটা ভালো করে দেখলাম। সে আমলের মোটা মোটা কড়ি। আলকাতরা মাখানো। ঘরখানা ছোটোই। তিনদিকে জানলা। জানলার গায়ে লোহার জাল

দেওয়া। বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ঘন জঙ্গল। সে জঙ্গল কতদূর পর্যন্ত গেছে কে জানে! একবার ওদিকের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি বরাবর শহরে-থাকা মানুষ। ঘরের গায়ে একেবারে জানলার ধারেই এমন জঙ্গল কখনো দেখিনি। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। কিসের ভয় তা জানি না। তবু ভয়। মনে হলো কিছু একটা ঘটবে। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। এই জঙ্গলের ধারে—এই ঘরে আমাকে একা রাত কাটাতে হবে।

এ ঘরের মাঝখানে যে খাটটা সেটা রাজবাড়িরই উপযুক্ত। কালো বার্নিশ করা মোটা মোটা পায়া। খুব উঁচু। পুরু গদি। কবেকার গদি। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে গেছে।

এবার চারপাশের জায়গাটা কিরকম দেখার জন্যে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কোন দিকে যাব?

ঠিক করলাম বাড়িটার চারদিক আগে দেখা দরকার। বিশেষ করে দোতলার কোন ঘরে অম্বুজাকে আটকে রাখা হয়েছে সেটার যদি হদিস পাওয়া যায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশেই কাছারিবাড়ি। সেখানে নায়েব-গোমস্তারা একটা করে কাঠের বাক্স নিয়ে তার ওপর হিসেব-পত্তর কষছে। কিন্তু সবাই যেন বোবা হয়ে রয়েছে। কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে বাঁদিকে চললাম। গোড়ালি-ডোবা ঘাস। ওদিকে কলাবাগান। সজনে গাছ। কুল গাছ। একটু দূরে লম্বা লম্বা কতকগুলো দেবদারু গাছ।

আশ্চর্য হলাম সব গাছগুলোই যেন শুকিয়ে গেছে। দুটো নারকেল গাছ। একটাতেও পাতা নেই। পায়ের নিচে ঘাসগুলো কেমন হলুদবর্ণ। এমন কেন হলো?

ক্রমে গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়িটা। কত যে ঘর তার হিসেব নেই। সব ভেঙে পড়ছে। ভেবে পেলাম না এখানে মানুষ কী করে থাকতে পারে।

হঠাৎ কি যেন একটা পায়ের কাছ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে লাফিয়ে উঠলাম। একটা বেঁজি।

কিন্তু এই যে বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—ঠিক কী যে খুঁজছি তা আমি নিজেও জানি না। আমি তো এই রাজবাড়ির একটি মেয়ের চিকিৎসা করার জন্যে এসেছি। তবে কেন একজন গোয়েন্দার মতো চারিদিক লক্ষ্য করে বেড়াচ্ছি?

নিজেই উত্তর খুঁজে পেলাম। আমি যে রোগীকে দেখতে এসেছি, সে সাধারণ রোগী নয়। এখানে এসে পর্যন্ত অস্বস্তিকর বাতাস, চারিদিকে থমথমে ভাব, সেই ভয়ংকর চড়া, অদ্ভুত বুড়িটা, শুকনো গাছপালা আর—আর রাজকন্যার পুরুষ মানুষের মতো গলা, কাক পোষা, বাড়ি থেকে যখন-তখন পালিয়ে যাওয়া—এসবই যেন কেমন রহস্যময়। শুধু রহস্যময়ই নয়, অশুভ কোনো কিছুর দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছে মেয়েটা তাহলে আসলে কী? আমার আবার বুড়ির সেই কথাটাই মনো হলো—সাবধান!

সেই দিন রাতে

নিশীথ সেই যে চলে গিয়েছিল আর পাত্তা নেই। বুঝি তার অনেক কাজ—রাজাবাবুর সেক্রেটারি, তবু অপরিচিত জায়গায় আমাকে এভাবে একা ফেলে রাখাটা ঠিক হয়নি। এই স্তব্ধ নির্জন ঘরে কথা বলারও তো মানুষ চাই।

সারা দুপুর রাজবাড়ির চারিদিক ঘুরে পড়ন্ত বেলায় দরজার তালা খুলে ঘরে এসে ঢুকলাম।

ক্রমে সন্ধ্যে হলো। অমনি মশার ঝাঁক ছেঁকে ধরল। বাড়ির চাকর গুটিগুটি এসে একটা লণ্ঠন দরজার কাছে রেখে গেল। আশ্চর্য, সেও একটা কথা বলল না। যন্ত্রের মতো শুধু ঘরে ঘরে, দালানে লণ্ঠন রেখে দিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে বাইরে জুতোর শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি নিশীথ আসছে। আর তারই সঙ্গে বাবুর্চির মতো একটা লোক ট্রেতে করে চা আর ডিমের ওমলেট নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে গেল।

আমি কিছু বলার আগেই নিশীথ বলল, জানি তুমি রাগ করেছ। কিন্তু আমার সমস্যা যে কতরকম তা ভাবতে পারবে না। আজকেই একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। খাবার জন্যে অম্বুজার দরজা খোলা হয়েছিল আর সেই ফাঁকে দৌড়। ভাগ্যি প্রহরীরা ধরে ফেলেছিল। তবু ঐটুকু মেয়েকেও কায়দা করতে পারছিল না। মওকা বুঝে একজন প্রহরীকে আঁচড়ে কামড়ে এমন ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

বললাম, ও কি বরাবর এইরকম হিংস্র প্রকৃতির ছিল?

না। যত বড়ো হচ্ছে ততই যেন হিংস্র হয়ে উঠছে।

একটু থেমে বলল, যাক, একটা কথা বলে নিই। অম্বুজা শান্ত হলে ওকে তোমার কথা বলেছি। তুমি কাক ধরতে পার জেনে ও চুপ করে রইল। কালকে তোমার কাছে নিয়ে আসব বলেছি। সেই সময়ে তুমি ওকে ভালো করে স্টাডি করে নিও।

আমি নিঃশব্দে মাথা দোলালাম। ন'টার মধ্যেই রাতের খাওয়া সেরে ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে লণ্ঠনটা একটু কমিয়ে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম। বালিশের পাশে রাখলাম টর্চটা যেন দরকার হলেই পাই।

সারা দিনের ক্লান্তি আর চাপা উত্তেজনা ছিল। যতক্ষণ না ঘুম আসছিল ততক্ষণ অম্বুজার কথাই ভাবছিলাম। তাকে এখনও চোখে দেখিনি কিন্তু যা সব শুনলাম তাতে তো বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি। একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে একজন দারোয়ানের টুঁটি কামড়ে ধরে! তাছাড়া আশ্চর্য ঐ রাজবাবু মানুষটি। থমথমে

মুখ। নিশীথ যখন আলাপ করিয়ে দিল তখন উনি কোনো কথাই বললেন না। শুধু মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে গেলেন। এ আবার কিরকম রাজা! এত বিষণ্ন কেন?

ভাবতে ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই কিসের যেন একটা মৃদু শব্দ পেলাম। ঘুমের ঘোরে প্রথমে মনে হয়েছিল এদিকের জানলার ধারে টানা বারান্দা দিয়ে বুঝি কেউ আসছে। কিন্তু তারপরেই মনে হলো—না, শব্দটা বাইরে থেকে আসছে না। ঘরের ভেতরেই। আর তা আমার খাটের কাছেই।

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সব দরজা-জানলা বন্ধ তবু কে ঘরে আসতে পারে? যেই আসুক সে যে কখনোই মানুষ হতে পারে না এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে রইলাম।

মৃদু শব্দটা তখন ঘুরছে—খাটের এদিক থেকে ওদিক। লক্ষ্য যে আমিই, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করতে পারলাম। কিন্তু—কী ওটা? পায়ের শব্দ নেই, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই, অথচ ঘরের মধ্যেই কিছু একটা আছে। আমি ইচ্ছে করেই টর্চ জ্বাললাম না। অন্ধকারের মধ্যেই এতটুকু না নড়ে ঠাওর করার চেষ্টা করলাম। কিছু দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ আমার পায়ের দিকের মশারিটা নড়ে উঠল। মনে হলো কেউ যেন মশারিটা তোলবার চেষ্টা করছে। ভয়ে পা দুটো টেনে নিলাম। তারপরেই বস্তুটা যেন জানলার ধারে চলে গেল। গিয়ে পাশ থেকে মশারিটা তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ দিকে গড়িয়ে এলাম। সেও এবার সরে এল মাথার কাছে। এখন কোনো শব্দ নেই। শুধু নিঃশব্দে চেষ্টা চলছে আমার মশারির মধ্যে ঢোকবার। এবার মাথার দিকের মশারিটা তুলছে...আমি

বালিশ দিয়ে জোরে মশারির প্রান্তটা চেপে ধরলাম। আর তখনই দেখলাম দুটো ছোটো গোল গোল চোখ আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

যা থাকে কপালে ভেবে টর্চটা টেনে নিয়ে জ্বাললাম। একটা বিকট কাক। বেশ বড়োসড়ো। বোধহয় পাহাড়ী কাক। এরকম অদ্ভুত কাক দেখা যায় না। কিন্তু...ঘরের মধ্যে কাক এল কোথা থেকে? সে কথা ভাবার সময় পেলাম না। চোখের ওপর টর্চের আলো পড়া মাত্র কাকটা লম্বা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ফের মশারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টর্চ দিয়ে তাড়া করতে এবার মশারির চালে এসে বসল। বসামাত্রই তার ভারে মশারিটা অনেকখানি ঝুলে পড়ল। আমি প্রমাদ গুনলাম। ভয়ংকর কাকটা চালের ওপরে। ক্রমশই চালটা নিচু হচ্ছে। নড়েচড়ে যে আত্মরক্ষা করব তার উপায় নেই। মশারি থেকে বেরোতেও সাহস হয় না। তা হলে তো চোখ দুটো খুবলে নেবে। কোনোরকমে উপুড় হয়ে শুয়ে কি কর্তব্য ভাবতে লাগলাম।

কেমন সন্দেহ হওয়ার আবার টর্চ জ্বাললাম। আঁৎকে উঠলাম। কাকটা মশারির চাল ফুটো করে গলা আর বুক ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুটো লম্বা ঠোঁট আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আর এতটুকু দেরি না করে টর্চ দিয়ে জোরে এক ঘা বসিয়ে দিলাম। আঘাতটা বোধহয় মাথায় না লেগে পিঠে লাগল। দারুণ যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটে মশারি থেকে উড়ে গিয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ল।

আমি তবু বেরোতে পারলাম না। মশারির মধ্যেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইলাম। হাতের মুঠোয় ধরা টর্চটা। ঐ রাক্ষুসে কাকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ওটাই এখন আমার একমাত্র অস্ত্র।

সকালে উঠেই মেঝের দিকে তাকালাম। কাকটা নেই। অবাক হলাম। যে কাকটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, সে উড়ে পালাল কি করে? কাকটা ঘরে ঢুকলই বা কি

করে? তখনই মনে পড়ল—তাই তো পাশের ছোটো ঘরটায় তিনটে খাঁচায় তিনটে কাক ছিল। বোধহয় একটার খাঁচা খোলা ছিল। বেরিয়ে পড়েছিল।

পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই ধাক্কা খেলাম। দরজায় তো শেকল তোলা।

তা হলে?

শেকল খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি তিনটে খাঁচারই দরজা বন্ধ। আর তার মধ্যে তিনটে কাকই ঘাড় বেঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে আমাকে দেখছে।

একটু বেলায় নিশীথ এসে যখন জিজ্ঞেস করল, রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? তখন সব ঘটনা খুলে বললাম। শুনে ওর মুখ-চোখের ভাব এমনিই হয়ে গেল যে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কি হলো? এত কী ভাবছ?

নিশীথ বললে, ভাবছি অনেক কিছু।

বললাম, আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কাকটা পালাল কোথা দিয়ে? সব দরজা-জানলাই তো বন্ধ ছিল।

ও বলল, যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে আঙুল দিয়ে কোণের ঘুলঘুলিটা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। নিশীথ বলতে লাগল, আমি ভাবছি অম্বুজা তোমার ওপর চটল কেন? তোমাকে এখনও দেখেইনি। তুমি যে ডাক্তার সে কথাও বলিনি। তাহলে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ও আমার ওপর চটেছে বুঝলে কি করে?

নিশীথ গম্ভীর গলায় বলল, কাকগুলো সব ওর পোষা। ঐ কাকটাকে ও-ই পাঠিয়েছিল তোমার টুঁটি ছিঁড়ে দেবার জন্যে। একটু থেমে বলল, শোনো ভাই, তুমি না হয় কলকাতায় ফিরেই যাও। এখানে থেকে দরকার নেই।

বললাম, এসেছি যখন তখন দু'দিন থেকেই যাই। রাজনন্দিনী অম্বুজাকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখে যাব।

চোখের দেখা হলো সেদিন বেলা দশটা নাগাদ। ভাগ্যিস হলো, না হলে আমার ওপর রাগের কারণ জানতেই পারতাম না।

নিশীথই সঙ্গে করে এনেছিল।

সে দেখল আমায় অবাক হয়ে। তার চঞ্চল দৃষ্টি আমার গলার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে গেল। কেমন যেন হতাশ হলো। ক্রুদ্ধ হলো। বোধহয় ও নিশ্চিত ছিল ওর পাঠানো কাকটা গত রাতে আমার চোখ খুবলে নিয়েছে, নয় তো টুঁটি কামড়ে দিয়েছে।

আমিও ওকে ভালো করে দেখলাম। এই কি সেই পরমাসুন্দরী মেয়ে যাকে মহারানী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন? দেখলে কে বলবে দশ-এগারো বছরের মেয়ে। ফর্সা রঙ। কিন্তু মুখটা যেন ইঁটের তৈরি। শক্ত কঠিন। সরলতা বা লাবণ্যের ছিঁটেফোঁটা নেই। চোখ দুটো যেন সবসময়ে অপ্রসন্ন। কপালে ভ্রূকুটি সেঁটেই আছে। ঐটুকু মেয়ের চুল কোমরের নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। খসখসে চুল। পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা শাড়ি। গায়ে বেনিয়ান।

নিশীথ বিনীতভাবে বললে, রাজকুমারী, এই আমার বন্ধু অসিত। কলকাতায় থাকে। ওর ব্যবসা পাখি ধরার। চিড়িয়াখানার যোগান দেয়। আর কাক ধরতেও ওস্তাদ। কাক ধরবার জন্যে পশ্চিমে পাহাড় পর্যন্ত যায়। এই দ্যাখো, কয়েকটা নমুনা এনেছে। বলে খাঁচা তিনটে এনে সামনে রাখল।

রাজকুমারী কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাল না। কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে বললে, তুমি কি জন্যে এখানে এসেছ?

বললাম, আপনি কাক পছন্দ করেন। আমি কাক ধরতে পারি। তাই নিশীথ আসতে বলেছিল।

রাজকুমারী হুংকার দিয়ে বললে, মিথ্যে কথা। তুমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেছ।

বললাম, না-না, আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

উদ্দেশ্য নেই? অম্বুজার দু'চোখ জ্বলে উঠল। উদ্দেশ্য নেই তো কাল সারা দুপুর চোরের মতো আমার ঘরের নিচে ঘুরছিলে কেন?

আশ্চর্য। এই কি একটা দশ-এগারো বছর বয়েসের মেয়ের কথা?

বললাম, আপনার কোন ঘর তা তো জানি না। আমি নতুন এসেছি। এত বড়ো ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ—তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

রাজকুমারী পুরুষের গলায় বলল, ওসব জানি না। যত শীগগির পার এখান থেকে চলে যাও। বলে বাঁ হাতটা তুলে বাইরের পথটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বাইরের পথটা আমার তখন দেখার অবসর ছিল না। আমি দেখছিলাম ওর বাঁ হাতটা। বেঁটে বেঁটে মোটা আঙুল। আর হাতটা ছিল লোমে ঢাকা।

নিশীথের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বললে, কাজ নেই ভাই, তোমার এখানে থেকে। তুমি চলেই যাও।

আমি হেসে বললাম, এসেছি যখন তখন অত সহজে যাব না। তুমি এক কাজ করো। ওকে গিয়ে বলো আমার জ্বর এসে গিয়েছে। নড়তে পারছি না। যা হোক করে দু'তিনটে দিন আমায় থাকতেই হবে।

সন্ধ্যেবেলায় টেবিলের ওপর উঠে ঘুলঘুলিটা একটা ইট দিয়ে বুজিয়ে দিলাম। তবুও ভয়ে ভয়ে রাতটা কোনোরকমে কাটালাম। চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছিল অম্বুজার সেই বীভৎস হাতটা। ও কি মানুষের হাত? এইরকম একটা হাত দেখেও রাজবাড়ির সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কি করে?

সেদিনও দুপুরবেলায় ফের রাজবাড়ির পিছনের দিকে যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করে যাইনি। খাওয়া-দাওয়ার পর চেয়ারটা ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে বসে বসে আমার কর্মপন্থার কথা ভাবছিলাম। থেকে তো গেলাম। কিন্তু কেন থাকলাম? অম্বুজার রহস্য-উদ্ঘাটন? তা সম্ভব কি

করে? ওর তো দেখা পাওয়াই ভার। তখন ঠিক করলাম যেমন করে হোক দোতলায় আমায় একবার গোপনে উঠতেই হবে। কিন্তু—

হঠাৎ সোঁ সোঁ করে কিসের একটা আওয়াজ শুনে চমকে ওপর দিকে তাকালাম। বিশাল একটা কাকের মতো কী যেন সেই চরের দিক থেকে সাঁ করে উড়ে এসে রাজপ্রাসাদের পিছন দিকে চলে গেল। জিনিসটা কি দেখার জন্যে তখনই সেই দিকে ছুটলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমি গোটা বাড়িটার চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেকটি গাছের ডালের দিকে তাকাতে লাগলাম। তারপর দোতলার ঘরগুলোর দিকে—যদি কোনো জানলা খোলা থাকে হয়তো তার ভেতর দিয়েই ঢুকে পড়েছে। জানলাগুলোও তো সাবেক আমলের মতো বড়ো বড়ো। গরাদ নেই। শুধু বিবর্ণ রঙের পাল্লা। কোনো কোনোটার পাল্লা ভেঙে ঝুলছে। তবু নাকি এটা রাজপ্রাসাদ। সেখানে একজন রাজাও থাকেন যাকে বড়ো একটা দেখা যায় না। গলার স্বরটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না।

হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম। ভিজে ঘাস—কোথাও মাটি। পায়ে একটা পিঁপড়ে কামড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ে দু-আঙুলের চাপে পিঁপড়েটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলাম। আর তখনই চোখে পড়ল মাটিতে কয়েকটা পায়ের ছাপ। সে ছাপ বেশ বড়ো। সাধারণ মানুষের মতো নয়। ছাপগুলো দেখে মনে হলো পায়ের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক বেঁটে বেঁটে।

দোতলার একটা ঘরের ঠিক নিচে এই পায়ের ছাপ এল কি করে?

আমি পায়ের ছাপের বিশেষজ্ঞ নই। তবু এটুকু বুঝতে পারলাম এই পায়ের অধিকারী যে সে দৌড়ে বনের দিকে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছিল তার কোনো চিহ্ন নেই।

আমি সেখানে বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে সাহস পেলাম না। কি জানি দোতলা থেকে যদি অম্বুজা দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষে নেই। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম।

একে তো অম্বুজার চেহারা, তার অদ্ভুত গলার স্বর, আচরণ আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল, তার ওপর এই এক উটকো চিন্তা মাথায় ঢুকল। অত বড়ো কালো পাখির মতো জন্তুটা মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐ পায়ের ছাপগুলোই বা কার? আমি কি কোনো অলৌকিক জগতে বাস করছি? আমি কি ভুলে যাচ্ছি আমি কলকাতায় থাকি আর আমি একজন ডাক্তার?

সন্ধ্যের পর নিশীথ এল দেখা করতে। মুখটা যেন দুশ্চিন্তায় কালো।

চা খেয়েছ?

বললাম, হ্যাঁ।

কি ঠিক করলে?

বললাম, দু'তিন দিনের মধ্যে যাচ্ছি না। তুমি অম্বুজাকে বলেছ তো আমি অসুস্থ?

তা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না।

আচ্ছা, রাজাবাবুর সঙ্গে কাল সেই একবার দেখা হয়েছিল। আর তো দেখিনি এর মধ্যে?

নিশীথ আমার প্রশ্নে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, মেয়েটিকে নিয়ে তো ওঁর সব সময়েই মাথা খারাপ। দিন দিনই কিরকম হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনো উপায় নেই।

রানীমা?

নিশীথ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, দেড় বছর হলো উনি মারা গেছেন।

কেন জানি না শুনে যেন ধাক্কা খেলাম। বুঝতে পারলাম কেন রাজাবাবু নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন।

আচ্ছা, রানীমা—

নিশীথ আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, প্লিজ ভাই, আর প্রশ্ন কোরো না।

আচ্ছা, আমায় একটু সাহায্য করবে?

নিশীথ যেন বিব্রত হয়ে বলল, কি বলো।

আমায় একবার দোতলায় নিয়ে যেতে পার?

দোতলায় কেন?

এলাম যখন পুরনো রাজপ্রাসাদের দোতলাটাও দেখে যেতে ইচ্ছে করছে। জীবনে তো নতুন বা পুরনো কোনো রাজবাড়িরই দোতলায় ওঠা সম্ভব হয়নি।

নিশীথ ভুরু কুঁচকে বলল, তোমার মতলবটা কী বলো দেখি।

আমি হেসে বললাম, অম্বুজার ঘরটা একবার দেখতে চাই।

ঐ সাংঘাতিক মেয়েটার ঘর দেখবে! তুমি কি এখনও ওকে বুঝতে পারনি?

বললাম, কিছুটা পেরেছি। পুরোটা পারিনি।

নিশীথ বললে, না ভাই, ও আমি পারব না।

বললাম, আমার এ অনুরোধ তোমায় রখতেই হবে। বেশ, আমি ওর মুখোমুখি হতে চাই না। আড়াল থেকে ওর একটা ছবি তুলতে চাই।

বাঃ! চমৎকার। তারপর কাগজে কাগজে ছবিটা ছেপে রাজাবাবুর মাথা হেঁট করে দাও। ছিঃ!

আমি ওর হাত ধরে বললাম, আচ্ছা, কথা দিচ্ছি ছবি তুলব না। কিন্তু তুমি আমায় একটিবার দোতলায় নিয়ে চলো। না হয় ওকে যখন ঘরে তালা এঁটে রাখা হয় তখনই নিয়ে যেও। আমি দোতলাটা শুধু একবার দেখব।

নিশীথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধ ঠেলতে পারল না। রাজী হলো।

ও চলে যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললাম, আচ্ছা, তোমাদের এখানে কাকজাতীয় বিরাট কোনো কিছু উড়তে দেখেছ?

নিশীথ অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী! এতকাল এখানে আছি

অমন কিছু তো দেখিনি। কেন? তুমি কিছু দেখেছ নাকি?

বললাম, ঐরকম যেন কিছু দেখলাম দুপুরবেলায়।

কোন দিক থেকে এল?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ঐ দিক দিয়ে।

তার মানে পুরনো চরার দিক থেকে। কোথায় গেল?

কি জানি। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশীথের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, এবার আমাকেও বোধ হয় চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

রাজপুরী নয়তো যেন মৃতের পুরী

পরের দিন দুপুরে নিশীথ আমাকে দোতলায় নিয়ে চলল। ও একটা কথাও বলছিল না। বুঝতে পারছিলাম ও চাইছে না আমি ওপরে যাই।

চওড়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো ভাঙা ভাঙা। দেওয়ালেও অজস্র ফাঁক-ফোকর। সিঁড়িটা অনেক ঘুরে ওপরে উঠেছে। এক-একটা বাঁকে ছোটো ছোটো খুপরি ঘর—বেশির ভাগই তালাবন্ধ। মর্চে ধরা পুরনো তালা। কবে যে সে তালা শেষ লাগানো হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। সেসব ঘরের দরজাগুলোও ভেঙে পড়ার মতো। কি আছে ওসব ঘরে কে জানে!

দোতলায় উঠে টানা বারান্দা। দু'পাশে ঘর। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই লোকজন আছে। এত লোক আছে অথচ এই দু'দিনে তা বোঝাই যায়নি। কয়েকজনকে দেখলামও। কিন্তু তাদের জীবন্ত মানুষ বলে মনে হলো না। মুখে কথা নেই, আমি যে একজন নতুন মানুষ ওপরে এসেছি—তা কোনো কৌতূহলই নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য এই যে, এরা যেন সবাই মুখে কুলুপ এঁটে আছে। কথা নেই। সবারই চোখের চাউনিতে ভয় ভয় ভাব—এই বুঝি কিছু হয়।

আমার মনে হলো এরা যেন এ জগতের বাসিন্দা নয়। কোথা থেকে কোথায় এসেছে জানে না। কেউ কাউকে যেন চেনে না। অথচ পরে নিশীথের কাছ থেকে জেনেছিলাম এরা সবাই রাজপরিবারেরই। বসে বসে রাজার অন্নধ্বংস করছে। তাদের অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই বলেই দু'চোখে চাপা আতঙ্ক নিয়ে এখানে পড়ে আছে। আতঙ্ক কাকে নিয়ে তা বুঝতে বাকি রইল না।

বললাম, রাজাবাবু কোন ঘরে থাকেন?

ঐ দিকে। কিন্তু ওখানে যাওয়া নিষেধ।

একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এটা কার ঘর?

অম্বুজার।

ও এখন ঘরে কি করছে?

নিশীথ গম্ভীরভাবে বলল, জানি না। এবার চলো। আর নয়।

হঠাৎ দরজার ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ গলা পাওয়া গেল, কে ঘুরছে বারান্দায়?

নিশীথ দরজার কাছে মুখ এনে বলল, আমি নিশীথ।

দরজা খুলে দাও।

নিশীথ আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল। চলে আসবার সময় দেখলাম অম্বুজার ঘরের এদিকে একটা জানলা আছে। পাছে খোলে সেজন্যে শেকল বাঁধা।

আমরা সবে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দরজায় দুমদাম শব্দ। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ মোটা গলায় চিৎকার, দরজা খোলো, দরজা খোলো।

সন্ধ্যের পর নিশীথ যথারীতি এল। ও যেন এ দু'দিনে কেমন হয়ে গেছে। আমার চেয়েও যেন ও-ই বেশি ভয় পেয়েছে। বিনা ভূমিকায় বলল, শোনো, ঐ কাক-টাকের কথা কাউকে বোলো না যেন। সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে যাবে।

মনে মনে হাসলাম, তাও তো অম্বুজার ঘরের নিচে মাটিতে সেই পায়ের ছাপের কথা প্রকাশ করিনি।

বললাম, বলব আর কাকে? এত বড়ো বাড়িতে লোক বলে কেউ আছে? ওপরে যাদের দেখলাম ওরা তো সবাই এক-একটা মমি। সেই রূপকথায় রাক্ষসের গল্প পড়েছিলাম রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে মড়ার মতো করে রেখেছিল, সেই রকম।

নিশীথ চুপ করে রইল।

বললাম, আচ্ছা, অম্বুজা ঘরে একলা থাকে কেন? সঙ্গে কেউ থাকলে তো পালাতে পারবে না।

নিশীথ বলল, ও কাউকে নিয়ে শুতে চায় না। অবশ্য এতগুলো আত্মীয় রয়েছে, তাদের কাউকে বললে শোবেও না।

কেন?

কেন তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তা ছাড়া—এই পর্যন্ত বলে নিশীথ থেমে গেল।

থামলে কেন?

তা ছাড়া এ বাড়ির সকলের ধারণা হয়েছে ওর সঙ্গে যে শোবে সেই মরে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে আবার কি?

হ্যাঁ, রানীমা ওকে খুব ভালোবাসতেন। তাই ওর কাছেই সেই ছোটবেলা থেকে বরাবর শুতেন। কিন্তু হঠাৎ দেড় বছর আগে ঐ মেয়ের পাশে শুয়েই মরে গেলেন। অথচ কোনো রোগ হয়নি। তারপর আরও তিনজন মেয়েকে ওর ঘরে শোবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। জলজ্যান্ত মেয়ে। পরপর তিনটেই মরে গেল।

কিসে মরত?

কেউ বলতে পারল না। কোনো রোগ ছিল না। শুধু সকালে দেখা যেত ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। একটু থেমে বলল, বোধ হয় সাপে কামড়েছিল।

কথাটা যে সেও বিশ্বাস করে না তা ওর গলার টোন শুনেই বোঝা গেল।

এটাও আমার কাছে নতুন তথ্য। বিষে নীল হয়ে যেত। এমনি সময়ে হঠাৎ একজন প্রহরী ব্যস্ত হয়ে নিশীথকে ডেকে নিয়ে গেল। নিশীথ চা খাচ্ছিল, অর্ধেক খেয়েই 'আমি আসছি' বলে উঠে গেল। আমি হতভম্বর মতো বসে রইলাম। না জানি আবার কী রহস্যজনক খবর শুনব।

খবরটা রহস্যজনকই বটে। সেদিন দুপুরে দরজা খোলা পেয়ে অম্বুজা যখন পালাচ্ছিল তখন যে প্রহরীর টুঁটি কামড়ে দিয়েছিল, হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে সে এই মাত্র মারা গেছে।

অত অল্প ক্ষতে মরবার কথা নয়, রক্তপাতও বেশি হয়নি। তবু মরল। ডাক্তাররা বলেছে তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু।

আমি চমকে উঠলাম। অম্বুজার দাঁতে এত বিষ। কি করে?

আবার দোতলায়

গভীর রাতে সেদিন যখন আমি দোতলার সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ভরা অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যের পর থেকেই বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয় গোটা বাড়িটাই যেন কোনো অশুভ শক্তির মুঠোর মধ্যে চলে গেছে। কারও কিছু করার নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকা কবে সেই চরম সর্বনাশের মুহূর্তটি আসবে।

এ ক'দিনে অম্বুজা সম্বন্ধে আমার এই ধারণাটাই হয়েছে—দশ-এগারো বছরের বালিকাটি নিমিত্তমাত্র। তার আড়ালে লুকিয়ে আছে একটা ভয়ানক দানব। সেই দানবটিকে দেখতে চাই।

সমস্ত প্রাসাদটা নিঝুম। মাঝে মাঝে বাগানের কোনো গাছে রাতজাগা পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উঠছে। তারাও কি কোনো কিছুর ভয় পাচ্ছে?

আমি হাতের মুঠোয় টর্চটা ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগলাম। সেদিন দিনের বেলায় নিশীথের সঙ্গে এসে সিঁড়ি, ঘরগুলো সব চিনে রেখেছি।

নিঃশব্দে একটার পর একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমার পিছনে কেউ যেন আসছে। যে কোনো মুহূর্তে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পিছু ফিরে দেখি কেউ নেই।

থাকবেই বা কে? সবাই তো ঘুমে অচেতন।

আরো কয়েক ধাপ উঠতেই একেবারে আমার গায়ের কাছে বাঁ দিকে কেমন যেন একটু শব্দ হলো। আমি চমকে তাকাতেই দেখলাম সেই তালা দেওয়া একটা ঘুপচি ঘরের দরজার ওপর দুটো চোখ জ্বলছে। একটু ঠাওর করতেই আঁৎকে উঠলাম। কাক। সেই ভয়ংকর কাক।

সেদিনের রাতের ঘটনার পর থেকে আমার কেমন কাকের ওপর ভয় ধরে গেছে।

আমি নিঃশব্দে আরও দু'ধাপ উঠে এলাম। আবার একটা ঘুপচি ঘর। আবার একটা কাক। এইরকম পরপর পাঁচটা। কাকগুলো কোনো শব্দ করছে না। শুধু আমায় লক্ষ্য করছে।

একই ধরনের এত কাক এলো কোথা থেকে?

তখনই মনে পড়ল অম্বুজার কাক পোষার কথা। শুধু পোষাই নয়, কাকগুলো সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে যেন পাহারা দিচ্ছে।

আমি দোতলার টানা বারান্দায় উঠে এলাম। সেই ঘরগুলো যেখানে আগের দিন মানুষজন দেখেছিলাম সব বন্ধ। শুধু দরজাই বন্ধ নয়, জানলাগুলোও। এত ভয়?

আমি এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম অম্বুজার ঘরের সামনে। দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। আমি দরজায় কান পেতে শুনলাম ঘরের ভেতরে একটা মৃদু শব্দ হচ্ছে—ধুপ ধুপ ধুপ—

এত রাতে অম্বুজা একা কি করছে?

আমি তখনই এদিকের সেই শেকলবাঁধা জানলাটার কাছে চলে

এলাম। একটা খড়খড়ি সামান্য একটু ফাঁক করে দেখতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে একটা পিলসুজের ওপরে মস্ত একটা পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। আর একটা লম্বা ধূপ নিঃশব্দে পুড়ছে। অম্বুজা মাতালের মতো নাচছে।

তার সেই অদ্ভুত নাচ দেখতে দেখতে আমার চোখ পড়ল ধূপকাঠিটার দিকে। ওটা সাধারণ ধূপকাঠি নয়। গলগল করে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে। আর আশ্চর্য—সেই ধোঁওয়া অম্বুজার নাচের তালে তালে একটা অস্পষ্ট মূর্তি ধরে কেঁপে কেঁপে নাচছে। সে মূর্তি কোনো মেয়ের কি ছেলের, মানুষের কি দানবের বোঝা গেল না।

আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সেই ধূপের ধোঁওয়ার অলৌকিক নাচ দেখছিলাম। কতক্ষণ ঐভাবে আচ্ছন্নের মতো কেটেছে জানি না। একসময়ে ধূপটা নিঃশেষ হয়ে গেল। একগাদা ছাই মেঝের ওপর পড়ে রইল। অম্বুজা সেই ছাই কপালে মেখে হঠাৎ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে তিনবার কাকে যেন প্রণাম করল। আমি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছি।

হঠাৎ এ কী...এ কী।

অম্বুজা ছুটে গেল খোলা জানলাটার দিকে। তারপর মুহূর্তমধ্যে ঝাঁপ দিল দু'হাত তুলে। এদিকে ওর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

অম্বুজাকে ধরবার এই মস্ত সুযোগ মনে করে আমি তখনই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু—এ আবার কী।

গোটা কুড়ি বিদকুটে দেখতে কাক লাইন করে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

কি করব—কোন দিক দিয়ে পালাব ভাবছি কাকগুলো সার বেঁধে তাদের লম্বা লম্বা ঠোঁট ফাঁক করে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম এখনি ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় খুবলে খুবলে শেষ করে দেবে। অগত্যা আমি আমার একটি মাত্র অস্ত্র টর্চটাকে সহায় করলাম। বোতাম টিপলাম। টর্চের জোরালো আলো ওদের চোখে পড়তেই ওরা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সেই সুযোগে দালান থেকে সিঁড়ির ধাপ লক্ষ্য করে জোরে লাফ মারলাম। ওই কাকগুলোকে ডিঙিয়ে একটা চওড়া সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাঠের সিঁড়ি। জোর শব্দ হলো। ভাবলাম এখনি বুঝি লোকজন ছুটে আসবে। কিন্তু কেউ এল না। ভয়ে সবাই দরজায় খিল এঁটে শুয়ে রইল।

আমি উঠে নিচের তলায় আসার আগেই কাকগুলো আক্রমণ করল। মাথার ওপর, কাঁধে, পিঠে কালো কালো ডানার ঝাপটা—উঃ কী দুর্গন্ধ ওদের পাখায়! আমি টর্চটা হাতের মুঠোয় ধরে এলোপাথাড়ি ওদের পিটোতে পিটোতে কোনোরকমে নিচে নেমে ছুটে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলাম।

খিল বন্ধ করেও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। সারারাত কাকগুলো আমার দরজা ঠুকরেছে।

পরের দিন সকালবেলায় চা খাবার সময়ে নিশীথ এল। তার প্রথম কথাই হলো, কবে যাচ্ছ?

হেসে বললাম, আর দু'একটা দিন।

ও খুশি হলো না। বলল, যে জন্যে তোমাকে আনালাম তার তো কিছুই হলো না।

বললাম, রোগীকে ভালো করে দেখতেই পেলাম না তো চিকিৎসা করব কী?

তা শুধু শুধু এখানে বসে করছটা কি?

বললাম, তোমাদের অম্বুজার রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছি।

নিশীথ অবাক হয়ে বললে, এ কি খুন-খারাপির ব্যাপার যে রহস্যভেদ করবে?

বললাম, খুন-খারাপি হয়নি? রানীমার মৃত্যু হলো কিসে? রাত্তিরে ওর পাশে যে-ই শোয় তার মৃত্যু হয় কেন? কেন ওদের ঠোঁট বিষে নীল হয়ে যায়? কেন প্রহরীটা মরল? কেন ডাক্তার বললে, বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়েছে? রাজবাড়ির কেউ একবারও ভাবল না কেন—কোথা থেকে এই বিষ এল? একবারও তোমরা চিন্তা করে দেখলে না কেন—কেমন করে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের গলার স্বর পুরুষের মতো হতে পারে? কেমন করে তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক মোটা মোটা হয়? শুধু ঐ হাতটাই বা কেন বনমানুষের মতো লোমশ? কেন তোমরা কেউ তলিয়ে দেখলে না ঘর থেকে পালিয়ে কোথায় যেতে চায় অম্বুজা? ঘরের ভেতরে একা ও কী করে তারও কি খোঁজ রাখ? রাখ না। তা যদি রাখতে তা হলে বুঝতে মেয়েটা সামান্য একটা রোগী নয়। সে আরও ভয়ংকর। একটা বাচ্চা নিষ্পাপ মেয়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একটা দানবশক্তি। সেই দানবের আমি তল্লাশ করব। দেখব কোথা থেকে সে এল, কেন এল?

নিশীথ হাঁ করে আমার কথাগুলো শুনে গেল—যেন কথাগুলো বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ ও বললে, কাল অনেক রাতে দোতলায় সিঁড়িতে একটা জোর শব্দ পেয়েছিলে?

মনে মনে হেসে বললাম, কই না তো।

ওরে বাপরে! মনে হলো কেউ যেন কাউকে সিঁড়ির ওপর আছড়ে ফেলল।

তুমি বেরিয়েছিলে নাকি দেখতে?

নিশীথ শুধু একটা কথাই বলল, পাগল!

বললাম, অম্বুজা কি জানে আমি এখনও এ বাড়িতে আছি?

বোধহয় না। জানলে কি আর তোমার রক্ষে ছিল?

জানলে কি করতে পারত?

নিশীথ অন্যমনস্কভাবে বলল—ঠিক বলতে পারি না। তবে কিছু ক্ষতি ও

করতে পারেই। নইলে বাড়ি সুদ্ধু লোক কি আর এমনি এমনি একটা দশ এগারো বছরের মেয়েকে ভয় পায়।

এক সময়ে নিশীথ চলে গেল। আমি ঘর থেকে আর বেরোলাম না। বসে বসে একটা খাতায় অম্বুজার ব্যাপারটা লিখতে লাগলাম। শেষে লিখলাম—আমি জানি আজ রাত্তিরেই ঘটবে সেই চরম ঘটনাটা যা এখনও আমি কল্পনা করতে পারছি না। আপনা-আপনি ঘটবে না। ঘটাব আমিই।

বিপদের মুখে

রাত একটা।

শুধুমাত্র টর্চটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গোটা বাড়িটা নিঝুম। সব ঘরের জানলাগুলো পর্যন্ত বন্ধ। আমি ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এবার যেতে হবে বাঁয়ে রাজবাড়ির পিছন দিকে। খুব সাবধানে পা ফেলে গোড়ালি – ডোবা ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। নিজের সামান্য পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার পিছনে যেন কেউ আমারই মতো পা টিপে টিপে আসছে। এ কথা মনে হতেই বুক কেঁপে উঠছিল। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কী দরকার এভাবে গিয়ে? কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই। অম্বুজার ঘরের ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। পায়ে কী একটা নরম নরম লাগল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম সাদা মতো কি একটা পড়ে আছে। সাবধানে হাতের আড়ালে টর্চটা জ্বাললাম। একটা মড়া বেড়াল, গলার কাছে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

শিউরে উঠলাম। বুঝতে পারলাম হতভাগ্য বেড়ালটা বোধহয় কাল রাতে অম্বুজার ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

ঘড়িটা দেখলাম। একটা বেজে কুড়ি মিনিট। গতকাল অম্বুজা যখন জানলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল রাত তখন পৌনে দুটো। তাহলে এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় আছে। অবশ্য রোজই যে একই সময়ে লাফিয়ে পড়বে তার কোনো মানে নেই। আমি একটা বেশ ঘন ঝোপ দেখে তার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

মশার কামড় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মাথা ঘিরে রঙিন বিছানার চাদরটা জড়িয়ে নিয়েছি। টর্চটা হাতের ঘামে ভিজে গেছে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। ঘড়ি দেখবার জন্যে টর্চ জ্বালতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দোতলার ঠিক সামনের ঘরে খুট করে শব্দ হলো। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যেই এদিকের জানলাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো লম্বা পা বেরিয়ে এল।

জানি অম্বুজা এখনি লাফিয়ে পড়বে—কিন্তু এটুকু মেয়ের অত বড়ো পা!

লাফিয়ে পড়ল তবে এতটুকু শব্দ হলো না।

ও মাটিতে পড়ার আগেই আর একটা কাণ্ড ঘটল। আমি যে ঝোপটার মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, ঠিক তার পিছনেই ছিল একটা লম্বা দেবদারু গাছ। হঠাৎ সেই গাছের সমস্ত পাতা কাঁপিয়ে শোঁ শোঁ করে একটা শব্দ। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি সেদিনের সেই উড়ন্ত বিরাট কাকের মতো জন্তুটা ডানা নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে চলেছে। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো পিছনে পিছনে ছুটছে অম্বুজা বনের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই দেখি রাজবাড়ির আনাচে-কানাচে থেকে এক ঝাঁক কাক উড়ে চলল অম্বুজার পিছু পিছু। আমার মনে হলো আগের বড়ো প্রাণীটা অম্বুজাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর বাকি কাকগুলো অম্বুজাকে পাহারা দিতে দিতে চলেছে। আশ্চর্য এই কাকগুলো কি রাতেও দেখতে পায়? আমি আর এতটুকু দেরি না করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে দূর থেকে অম্বুজাকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু অম্বুজার সঙ্গে ছুটে পারি সাধ্য কী। ওতো ছুটছে না, যেন উড়ে যাচ্ছে। তার অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা পাগুলো (যা কখনোই ওর পা হতে পারে না) হিলহিল করে নড়ছিল। তার পরনের কাপড়খানা বাতাসে ভাসছে। মাথার উপর কাকের ঝাঁক—সামনে সেই বিরাট কাকটা...

আমি আর নিচু হয়ে ছুটতে পারছি না। এখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছি। অম্বুজাকে ধরতেই হবে। আর ধরতে গিয়ে আমার কী পরিণতি হবে তা ইচ্ছে করেই ভাবতে চাইছি না। বোধহয় একেই বলে নিয়তির ডাক।

কখনো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনো জলার ওপর দিয়ে, কখনো এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছি... অম্বুজাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না।

কতদূর চলে এসেছি তার হিসেব নেই। এইটুকু জানি চলেছি সোজা পশ্চিম দিকে। একবার যেন মনে হলো দূরে সাদা মতো কি চকচক করছে। তবে কি সেই ভয়ংকর চরের কাছে এসে পড়েছি?

সেই তিনশ' বছর আগে এই জায়গার সবটাই তো চর ছিল। তারপর একদিন চাঁদ রায় এসে এই চরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনিও সব চরটা দখল করে নিতে পারেননি। খানিকটা বাদ ছিল। সেখানে নিষেধ ছিল কেউ যেন না যায়। এমনকি রাজা নিজেই রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকের জানলাগুলো খুলতেন না। কেন খুলতেন না তার উত্তর কারো জানা নেই।

তবে কি অম্বুজাকে অনুসরণ করতে করতে সেই পশ্চিমের চরের কাছে এসে পড়েছি? সর্বনাশ! কিন্তু তখন আর থামবার উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছিলাম কোন এক অশুভ শক্তি যেন আমায় টেনে নিয়ে চলেছে।

আমার গায়ে জড়ানো সেই চাদর

কখন উড়ে গেছে, জামার বোতাম খোলা, চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। বুকটা এমন ওঠানামা করছে যেন মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। কেন জানি না চোখ দুটোও যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

একটা ছোটোখাটো ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটছিলাম। গায়ে আর জোর নেই। হঠাৎ কিসে পা জড়িয়ে পড়ে গেলাম। তখনই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে গেল।

একটা কাক দলছুট হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করিনি কখন সেটা আমার মাথার ওপরে ঘুরছিল। আমাকে পড়তে দেখে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় কা-কা-করে ডেকে উঠল।

আমি পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। সেটাই হলো আমার মারাত্মক ভুল। অমনি অম্বুজা ছোটা বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমায় দেখে ঘুরে দাঁড়াল। লক্ষ্য করলাম মুহূর্তমধ্যে অম্বুজার শরীরটা যেন বদলে যাচ্ছে। প্রথমে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। তারপর তার শরীর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা কী। কঙ্কালসার দুখানা হাত বের করে আমার দিকে সেটা এগিয়ে আসতে লাগল। ঐ হাড্ডিসার হাত দুটো ছাড়া তার সর্বাঙ্গ যেন কালো কাপড়ে মোড়া। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু দুটো জ্বলন্ত চোখ। সেই চোখ দুটো যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমি প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। কোনদিকে যাচ্ছি তাও জানি না। শুধু একটাই চেষ্টা যেন চরটার দিকে না যাই। কিন্তু কি আশ্চর্য কাকগুলো আর নেই। কঙ্কালটা অম্বুজার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসামাত্র সেই অলৌকিক কাকগুলো উধাও।

আমি ছুটছি—আর পিছনে একটা হু হু করে শব্দ। শব্দটা যে ঐ ভয়ংকর মূর্তিটার কাছ থেকেই আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই—ধরে ফেলল বলে...মৃত্যু নিশ্চিত...

হঠাৎ দেখলাম সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে যেন একটা কুঁড়ে ঘরের মতো। আমি শুধু 'কে আছ বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম কতকগুলো শুকনো খড়ের ওপর আমি শুয়ে আছি। মাটির ঘর, মেঝেটাও মাটির। ঘরের মধ্যে একটা পিদিম জ্বলছে টিমটিম করে।

আমার কোনো চোট লাগেনি বলে বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকিনি। এদিক-ওদিক তাকাতে দেখলাম একটা থুত্থুড়ে বুড়ি কতকগুলো শেকড়-বাকড় দরজার বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর ঘরের কোণে একটা ধুনুচি থেকে ক্রমাগত ধোঁওয়া উড়ছে। ঐ ধোঁওয়ায় আমার শরীরটা যেন তাজা হয়ে উঠল।

আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে বুড়ি কাছে এল। পিদিমের আলোয় আমি তাকে চিনতে পারলাম। এখানে আসবার সময়ে একেই দেখেছিলাম। কতকগুলো ছেলে একে ইঁট মারছিল। পাল্কি থেকে নেমে আমি ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

বুড়ি একবার বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই একটা মাটির ভাঁড়ে খানিকটা দুধ নিয়ে এল। একটি কথাও না বলে বুড়ি ভাঁড়টা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ভাঁড়টা নিয়ে দুধটুকু খেয়ে ফেললাম। কেমন একটু বোটকা বোটকা গন্ধ লাগল। বোধহয় ছাগলের দুধ। কিন্তু বেশ গরম। দুধ কখন কি করে গরম করল কে জানে।

এবার বুড়ি আমার কাছে এসে বসল। বললাম, আমি কোথায়?

বুড়ি খোনা খোনা স্বরে বলল, আঁমার ঘঁরে।

যে আমাকে তাড়া করে আসছিল সে কোথায়?

বুড়ি তিনটে দাঁত বের করে বোধহয় একটু হাসল। বলল, ভঁয় নেঁই। ওঁরা চঁলে গেঁছে।

কোথায় গেছে?

যেঁ যাঁর নিঁজের জাঁয়গায়।

সেটা কোথায়?

এর উত্তরে বুড়ি ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী আমায় জানাল।

অম্বুজা রহস্য

কলকাতায় ফিরে এসেছি। আবার চলছে আমার ডাক্তারি, মানে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা। নিশীথ আমাকে যে কারণে বাগআঁচড়ার রাজবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তা সফল হয়েছে। নিশীথ নিয়ে গিয়েছিল রাজকন্যা অম্বুজার রোগ সারিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু তার যা ব্যাপার দেখলাম সেটা রোগ নয়, আরও ভয়ংকর কিছু। আমি তার কাছেই ঘেঁষতে পারিনি তো তার চিকিৎসা করব কী। তবে অম্বুজার রহস্য আমি ধরে দিতে পেরেছি। আর এই রহস্যের জাল খোলবার জন্য আমাকে যা-যা করত হয়েছিল তা কলকাতায় ফিরে এসেও ভুলতে পারি না।

কলকাতায় আমার চেম্বারে বসে এক-এক সময়ে আমি যখন বাগআঁচড়ার সেই ভাঙাচোরা রাজবাড়িটার কথা ভাবি তখন মনে হয় সেসব যেন একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। কোথায় গেল রাজা চন্দ্রভানু রায়—তাঁর পরিবারের সেইসব মমির মতো বোবা মানুষগুলো, কোথায় গেল অম্বুজা আর সেই ভয়ংকর কাকগুলো?

সেদিন শেষ রাত্রে সেই থুত্থুড়ে বুড়ির দয়ায় আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। কেন ও আমায় বাঁচাল? আমার মনে হয় ওকে সেইসব দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলেই। একথা তো চিরসত্য—সংসারে কিছু কিছু অকৃতজ্ঞ লোক থাকলেও তুমি যদি কোনো দিন কারোর উপকার কর তা হলে হয়তো তার কাছ থেকেও বিপদের সময়ে উপকার পেতে পার।

যাই হোক সেদিন রাতে বুড়ির দেওয়া গরম ছাগলের দুধ খাওয়ার পর

যখন আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম তখন তার মুখ থেকেই অম্বুজার কাহিনী শুনেছিলাম। সে কাহিনী হয় তো আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে তবু তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সেদিন ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে খোনা খোনা গলায় ধীরে ধীরে কেটে কেটে অস্পষ্ট উচ্চারণে বৃদ্ধা যা বলেছিল আমি কলকাতায় ফিরে এসে একটা ডায়রিতে তা নিজের ভাষায় লিখে রেখেছিলাম। ঘটনাগুলো বৃদ্ধা বেশ গুছিয়ে বলতে পারেনি। তাই আমিও যা লিখে রেখেছি তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আসলে তিনশো বছর আগের কাহিনী তো—কেউ প্রত্যক্ষদর্শী নেই। এ মুখ থেকে অন্য মুখ, এ কান থেকে অন্য কান এইভাবেই কিংবদন্তীর জন্ম হয়। ষাট বছর আগে আমার দেখা অম্বুজাও সেই কিংবদন্তীর একটি অস্পষ্ট নায়িকা হয়ে গেছে।

একদিন গঙ্গার স্রোত বইতে বইতে অন্য দিকে সরে গেলে এই বাগআঁচড়ার কাছে কয়েক মাইলব্যাপী চর পড়েছিল। আগে কাছেপিঠের গ্রাম থেকে মৃতদেহ সৎকারের জন্যে গঙ্গায় নিয়ে আসা হতো। কিন্তু গঙ্গা দূরে সরে যেতে তাদের অনেকেই মৃতদেহ ঐ চরে পুঁতে দিয়ে যেত। ভাল করে চাপাও দিত না কোনোরকমে কাজ সেরে সরে পড়ত। তারপর শেয়াল-শকুনে সেইসব মৃতদেহ টেনে বের করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। তাই ঐ চরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত মড়ার খুলি, কঙ্কাল। এইরকম দৃশ্য চোখে পড়ার ভয়ে দিনের বেলাতেও কেউ ওদিকে যেত না। আর রাত হলে ঐ চরে নেমে আসত বিভীষিকা। কত রকমের শব্দ শোনা যেত—কখনও নিঃশব্দ চরের বুকে জেগে উঠত হু হু শব্দ, কখনও ঝড়ের গোঙানি। সময়ে সময়ে নাকি দেখা যেত চরের এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। লোকে বলত ঐ চড়াটা হচ্ছে প্রেতাত্মাদের অবাধে ঘুরে

বেড়াবার জায়গা। আশপাশের গ্রামে একটা চলতি ছড়াই আছে—

ভুলে কভু যেও নাকো চরে
ভূতে এসে টুঁটি টিপে ধরে।

তা কথাটা সত্যি। রাতের বেলায় মানুষ তো দূরের কথা—কোনো পাখি, কিংবা শেয়াল কিংবা কুকুরও যদি ঐ চরে যায়, পরের দিন পাওয়া যেত তার মৃতদেহ। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—জিভটা ঝুলছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

এই ভয়ংকর চরেই একদিন নদীয়া থেকে এল এক দুঃসাহসী জমিদার নাম চাঁদ রায়। তিনি শুরু করলেন চাষ। গড়ে তুললেন রাজপ্রাসাদ। হলেন এক মহাশক্তিধর রাজা। যত শক্তিধরই হন গোটা চরটা দখল করতে পারলেন না। পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইলের মতো চর পড়ে রইল তাঁর সীমানার বাইরে।

রাজা চাঁদ রায় দোতলার পশ্চিম দিকের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটি নিজের জন্যে রাখলেন। ঘরে খাট-পালংক সাজিয়ে সবেমাত্র ঢুকেছেন তখনই ঘটল একটা ঘটনা।

গরমের জন্যে তিনি সেদিন সব জানলা খুলে রেখে দিয়েছিলেন। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে মনে হলো যেন ঝড় উঠেছে। তিনি জানলা বন্ধ করবার জন্যে ধড়মড় করে উঠলেন। কিন্তু কোথাও ঝড়ের কোনো লক্ষণ দেখতে পেলেন না। হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানলার ওপর চোখ পড়তেই তিনি থমকে গেলেন। দেখলেন দূরে চরার বুকে বালির ঝড় উঠেছে। মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি হতভম্ব। তিনি হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতেন কিন্তু মনে হলো সেই ধূলিঝড় যেন এইদিকে ধেয়ে আসছে। চাঁদ রায় তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আবার একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখলেন পশ্চিম দিকের ঐ চড়ার বুকে দাউ দাউ করে আগুন

জ্বলছে। তিনি তো অবাক। বালির চড়ায় আগুন কি করে সম্ভব? তিনি তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলেন।

পরের দিন রাজসভাপণ্ডিতকে সব কথা বললেন চাঁদ রায়। রাজসভাপণ্ডিত রাজজ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছক কেটে অঙ্ক কষে জানালেন, বড়োই অশুভ লক্ষণ। মহারাজ, পশ্চিম দিকের জানলা অন্তত রাতের বেলায় খুলবেন না।

তাই হলো। রাত্তিরে চাঁদ রায় আর ওদিকের জানলা খুলতেন না।

তারপর আবার একদিন—অনেক রাতে চাঁদ রায়ের ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলেন একটা ঠকঠক শব্দ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। শব্দটা আসছে মাথার কাছে পশ্চিম দিকের জানলায়। তিনি জানলার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও জানলার কপাটে শব্দ হচ্ছে ঠক-ঠক-ঠক।

জানলা খুলবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। তিনি ছিলেন দুর্দান্ত সাহসী। তাই মনে জোর সঞ্চয় করে জানলাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে পাঁচ পা পিছিয়ে এলেন। দেখলেন একটা বিশাল কাক জানলার ওপর বসে রয়েছে। তার ডানা দুটো এতই বড়ো যে গোটা জানলাটা ঢেকে গেছে। তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ। যেন জ্বলছে। বড়ো বড়ো বাঁকানো ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কর্কশ স্বরে সেটা তিনবার শব্দ করল ক্যাঁক—কোঁ—ক্যাঁক, তারপরেই ঠোঁট দিয়ে জানলার শিকগুলো কামড়াতে লাগল।

চাঁদ রায়ের মতো দুর্ধর্ষ রাজাও ঐরকম কাক দেখে আর ঐ ডাক শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। দু'বার হুশ হুশ শব্দ করে কাকটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কাকটা নড়ল না। সে ঠোঁট দিয়ে শিকটা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন চাঁদ রায় দেওয়ালের কোণ থেকে তাঁর বর্শাটা নিয়ে এসে কাকটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

বর্শাটা কাকের বুকে গিয়ে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঝটপট করতে করতে কাকটা নিচে পড়ে গেল।

পরক্ষণেই সেই কাকের দেহ থেকে একটা কঙ্কাল দুলতে দুলতে জানলার দিকে এগিয়ে এল। ভয়ে চাঁদ রায় তখনই জানলা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু পরের দিন আহত বা নিহত কোনো অবস্থাতেই কাকটাকে দেখা গেল না।

চাঁদ রায় আবার সভাপণ্ডিত, রাজজ্যোতিষীকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁরা অনেক চিন্তা করে বললেন কাক যে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করেছিল সেটার অর্থ কী আগে জানা দরকার।

কিন্তু কাকের ভাষা কে বুঝবে?

সে সময়ে দেশে কাকচরিত্রজ্ঞ কিছু অসাধারণ গুণী লোক থাকত। তারা অন্য পশুপাখির ভাষা বুঝতে না পারলেও কাকের ভাষা বুঝত। কেননা কাক যখন ডাকে তখন যেন অনেকটা বুঝতে পারা যায় কি বলতে চাইছে। অন্য পাখিদের চেয়ে কাকের ডাক অনেক স্পষ্ট। একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যায় কি বলতে চায়।

বাগআঁচড়ায় সে সময়ে একজন কাকচরিত্র বিশেষজ্ঞ ছিল। তাকে ডেকে আনা হলো। সে নিজে কাকটার ডাক শোনেনি। কিন্তু স্বয়ং রাজা যা শুনেছিলেন সেই তিনটে শব্দ—ক্যাঁক—কোঁ—ক্যাঁক শুনে আর কাকের বর্ণনা জেনে লোকটি বললে, মহারাজ, এই কাক আসলে একটা অশুভ আত্মা। সে আপনার ওপরে খুবই ক্রুদ্ধ। ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে দিয়ে সে বলতে চেয়েছিল এই চর দখল করে মহারাজ যে ঘোরতর অন্যায় করেছেন তার প্রতিফল শীঘ্রই পাবেন।

মহারাজের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু দুর্বল হলেন না। বললেন, আমি অন্যায় করিনি। ঐ চরে চাষ করে, লোকবসতি তৈরি করে আমি জনসাধারণের উপকারই করেছি। প্রেতাত্মাদের জন্যে তো খানিকটা চর ছেড়ে রেখেছি। ওখানে ওরা যা খুশি তাই করুক। কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমি রাজপ্রাসাদ ভেঙে সমস্ত বসতি তুলে দিয়ে আবার চর করে দিতে পারব না।

এ যেন প্রেতাত্মাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। তার ফল ফলতেও দেরি হলো না। দিন সাতেকের মধ্যেই একজন প্রজা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, মহারাজ, আমার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই রকম পরপর খবর আসতে লাগল। মহারাজ ভেবে পান না ছেলেগুলো কীভাবে কোথায় গেল। যারা হারিয়ে গেল তারা কিন্তু আর ফিরল না।

তারপর একদিন একজন এসে বলল সে গতকাল গভীর রাতে হরিহর মণ্ডলের ছেলেকে একা একা বেরিয়ে যেতে দেখেছে। আর তার আগে আগে উড়ে যাচ্ছিল মস্ত একটা কাক।

আবার কাক! চাঁদ রায় চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ, মহারাজ। মস্ত বড়ো কাক। সে যখন উড়ছিল তখন তার ডানায় শব্দ হচ্ছিল গোঁ গোঁ করে।

কোন দিকে গেল?

ঐ চরের দিকে।

হরিহর মণ্ডলের ছেলে আর ফেরেনি।

রাজা চাঁদ রায় নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মশাসন, যেখানে ব্রাহ্মণদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে সব ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, মহাযজ্ঞ করুন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করুন। যত খরচ হয় হোক।

শুধু ব্রহ্মশাসনের ব্রাহ্মণরাই নয়, নদীয়া, ভাটপাড়া থেকেও নামকরা পুরোহিতদের আনালেন। তা ছাড়াও কাছে-পিঠে যত ওঝা, গুণিন আছে সবাইকে ডাকলেন। যেমন করে হোক

প্রেতের কবল থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে হবেই।

রাজকন্যা সুভদ্রা সকাল দশটার সময়ে স্নান সেরে নিরম্বু উপবাস করে খড়্গ পুজো করছিল। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। যে খাঁড়াটা সে পুজো করে তার একটা ইতিহাস আছে। রাজা চাঁদ রায় প্রতি বছর কালীপুজোর রাতে ছিন্নমস্তার পুজো করতেন। এ পুজো বড় সাংঘাতিক। একটু খুঁত থাকলে আর রক্ষে নেই। তা সেবার ঠাকুর বিসর্জন দিতে যাবার সময়ে খাঁড়াটা কেমন করে জানি পড়ে যায়। সকলে হায় হায় করে ওঠে। এ খুবই দুর্লক্ষণ। না জানি কী হয়।

ব্রহ্মশাসনের ব্রাহ্মণেরা বিচার করে বললেন, এ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া এখন যাবে না। নতুন ঠাকুর গড়ে নতুন খাঁড়া দিয়ে আবার পুজো করতে হবে।

দ্বিতীয়বার পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন দেবার সময়ে আগের প্রতিমাও বিসর্জন দেওয়া হলো। সেইসঙ্গে আগের খাঁড়টাও বিসর্জন দেওয়া উচিত ছিল। সেটা কারো আর খেয়াল ছিল না। তখন সুভদ্রা সেই খাঁড়াটা নিজের ঘরে এনে রোজ পুজো করতে লাগল।

কেন সে পুজো করত তা সে কাউকে বলেনি। অনুমান করা যায় খাঁড়া নিয়ে যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়ে গেছে, এই পরিবারের মেয়ে হয়ে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

এই পরিবারের মেয়ে—কিন্তু তার শরীরে এ বংশের রক্ত ছিল না। খুব ছোটবেলায় মহারাজ তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই থেকে সুভদ্রা রাজার দুলালীর মতো মানুষ হয়ে আসছে। এখন তার বয়স এগারো।

এগারো বছরের মেয়ে হলে কি হবে, তার বুদ্ধি, অনুভূতি একটা বড়ো মেয়ের মতোই। প্রতিদিনই সে শুনছে একটা করে লোক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে তার মুখ শুকনো। তার বাবাকেও একটা বিরাট কাক আক্রমণ করতে এসেছিল। ক্ষতি করতে পারেনি। এবার কি তবে তার পালা?

এদিকে যাগ-যজ্ঞ শুরু হয়েছে। সাত দিন পূর্ণ হলে তবেই প্রেতেদের উৎখাত করা যাবে। সবে চার দিন যজ্ঞ চলছে। লোকে লোকারণ্য। সবাই সেই অভূতপূর্ব যজ্ঞ দেখছে। কত মণ ঘি যে পুড়ল তার হিসেব নেই। সেই ঘৃতাহুতির সঙ্গে সঙ্গে চলছে মিলিত কণ্ঠের গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ।

তারই মধ্যে একদিন—

সুভদ্রা তার নিজের ঘরে একাই শুত। কারো সঙ্গে শুতে তার ইচ্ছে করে না—

এই পর্যন্ত বলে বুড়ি তার ঠাণ্ডা কনকনে হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, তিনশো বছর আগে এই সুভদ্রার সঙ্গে চন্দ্রভানু রায়ের মেয়ে অম্বুজার মিলটা দেখছ? দু-জনেই একলা শুতে চাইত। দুজনেই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। দুজনেই সমান বয়সী।

বললাম, হুঁ, তাই তো দেখছি। তারপর?

সেদিনও সুভদ্রা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। তার ঘরের সামনেই একটা ছোটো ছাদ। তার মনো হলো কেউ যেন ছাদের ওপর নিঃশব্দ পায়ে চলে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দ কিন্তু তার পায়ের ভারে ঘরটা কাঁপছে।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ কান পেতে চুপ করে পড়ে রইল। না, ভুল শোনেনি। আবার সেই ভারী ভারী পা ফেলার শব্দ। এবার আরও স্পষ্ট। সুভদ্রা উঠে পড়ল। একটা পিদিম জ্বালল। তারপর সাবধানে দরজার খিল খুলে ছাদে বেরিয়ে পড়ল। পিদিম হাতে সুভদ্রা এক পা করে এগোয় আর পিছু ফিরে তাকায়। এমনি করে গোটা ছাদটা দেখল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তখন ও নিশ্চিন্ত হলো শব্দটব্দ কিছুই না। তার শোনারই ভুল।

তবু যেন তার কিরকম মনে হতে লাগল। কাছেপিঠে কেউ যেন আছে। যে কোনো মুহূর্তে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

সুভদ্রা আর বাইরে থাকতে চাইল না। তাড়াতাড়ি খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আর তখনই ভয়ে আঁৎকে উঠল সে। পিদিমের আলোয় দেখল এতক্ষণ যাকে ছাদে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে বিরাট দুটো ডানা ছড়িয়ে বসে আছে তারই বিছানার ওপর।

সুভদ্রার হাত থেকে পিদিমটা পড়ে নিভে গেল।

সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর দূত কাকরূপী প্রেত আর মাত্র পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে সে। কাকটা গোল গোল লাল চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখছে আর তার বড়ো বড়ো ঠোঁট দুটো ফাঁক করছে।

সুভদ্রা বুঝতে পারল এই ভয়টাই সে করছিল। একদিন তার বাবাকে মারবার জন্যেই কাকটা এসেছিল। কিন্তু মারতে পারেনি। এবার তার পালা।

কাকটা বসে বসেই তার ডানা দুটো তিনবার নাড়ল। খাট থেকে নামল। বড়ো বড়ো নখওলা দুটো পায়ে ভর করে এগিয়ে আসতে লাগল।

আর রক্ষে নেই। সুভদ্রা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু এত বড়ো রাজপ্রাসাদের ছাদ, দেওয়াল, সিঁড়ি ডিঙিয়ে সে চিৎকার তার বাবার কানে পৌঁছল না।

নিজেকে লুকোতে সুভদ্রা অন্ধকার ঘরের এক কোণে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল। কিন্তু কাকটার জ্বলন্ত দৃষ্টি এড়াতে পারল না। কাকটা সেই দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। সুভদ্রা সরে আর একটা কোণে গিয়ে দাঁড়াল। তার গায়ে লেগে কি একটা ঠক করে মাটিতে পড়ল। ছিন্নমস্তার সেই খাঁড়াটা। কাকটা তখন তার ওপর ঝাঁপ দিয়েছে। মুহূর্তে সুভদ্রা খাঁড়াটা দু'হাতে তুলে

নিয়ে জোরে এক কোপ বসিয়ে দিল। অন্ধকারে কোপটা কাকটার মাথায় লাগল না। লাগল একটা ডানায়। ডানাটা কেটে মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল। আর কাকটা এই প্রথম বিকট একটা শব্দ করে একটা ডানায় ভরে দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেল। সুভদ্রা মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে খাঁড়াটা হাতে নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটল। ওটাকে মারতেই হবে।

কিন্তু কাকটাকে আর দেখতে পেল না। এদিক-ওদিক তাকাল। হঠাৎ—

ওটা কি?

দেখল রাজবাড়ির বাগানে একটা আমগাছের ডালে ঝুলছে একটা কঙ্কাল। তার একটা হাত কাটা।

বুড়ি এই পর্যন্ত বলে তার বক্তব্য শেষ করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুভদ্রার কি হলো?

বুড়ি একটু থেমে মনে করবার চেষ্টা করে যা বলল তা এই—পরের দিন থেকে বেচারি মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। এদিকে যাগ-যজ্ঞও শেষ। চরে আর ভূতের উপদ্রব নেই। আর কোনো মানুষ রাতে নিশির ডাক শুনে চরের দিকে গিয়ে প্রাণ হারায় না। কিন্তু—

বুড়ি আবার একটু থেমেছিল। তারপর বলেছিল, কিন্তু সুভদ্রা পাগল হয়ে আর রাজবাড়িতে থাকত না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে কোথায় হারিয়ে গেল। আর তাকে পাওয়া গেল না।

হারিয়ে গেল।

আমি সেই তিনশো বছর আগের এক না দেখা রাজকন্যার জন্যে দুঃখ পেলাম।

আমরা দুজনেই চুপ করে আছি। বুড়ির ঘরের কোণে পিদিমটা তখনও জ্বলছে। বললাম, সেই সুভদ্রার সঙ্গে আজকের এই অম্বুজার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

বুড়ি তার তিনখানা মাত্র দাঁত

নাড়িয়ে একটু হাসল। বললে, কি মনে হয়?

বললাম, মনে হয় যেন আছে।

তবে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? এক জন্মের সুভদ্রা আর এক জন্মেতে অম্বুজা। সব নিয়তির খেলা।

এবার বুড়ি আরও একটু পরিষ্কার করে যা জানালো তা এইরকম—

চন্দ্রভানু নিজেকে চাঁদ রায়ের বংশধর বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আসছিল বলেই এমন একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিল যাকে নিয়ে তার অশান্তির শেষ ছিল না। তার মিথ্যে রাজপুরী মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছিল। মিথ্যে কথার এই শাস্তি। তবু যেহেতু তিনি বেশ কয়েকটা দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই পুণ্যে তিনি কিছুটা শাপমুক্ত হয়েছিলেন পরে।

নিষ্পাপ মেয়ে অম্বুজার ওপর তার জন্মলগ্ন থেকেই ভর করে রইল চরের সেই কঙ্কালটা যে কাক হয়ে সুভদ্রার ক্ষতি করতে গিয়ে ছিন্নমস্তার খাঁড়ার আঘাতে একটা ডানা হারিয়েছিল। সেই রাগ পুষে রেখে এতকাল পর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেল অম্বুজারূপী সুভদ্রার ওপর। সেই অপদেবতা তার ওপর ভর করে থাকার জন্যেই অম্বুজা অত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। সেই অম্বুজারূপী সুভদ্রা কাককে এতই ভয় পেয়েছিল যে প্রতি রাতে নাচের মধ্যে দিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় তাকে পুজো করত। কিন্তু কাকরূপী শয়তান সেই পুজোয় ভুলত না। অম্বুজাকে সেই ভয়ংকর চরের দিকে টেনে নিয়ে যেত।

নিরুপায় অম্বুজা তখন দেখাতে চেষ্টা করল সে নিজেই কাকের কত ভক্ত। তাই সে নানা জায়গা থেকে কাক যোগাড় করে রাজপুরী ভরিয়ে ফেলল। লোকে ভাবত অম্বুজার এটা একটা উৎকট শখ। কিন্তু অম্বুজার আসল উদ্দেশ্য জানত না।

পোষা কাকগুলো তার এতই বাধ্য হয়ে উঠেছিল যে অম্বুজা যেভাবে তাদের

চালাত সেই ভাবেই তারা চলত। তাকে পাহারাও দিত। অম্বুজার এমনও গোপন ইচ্ছে ছিল যে সুবিধে পেলে তার এই পোষা কাকগুলোকে দিয়ে ঐ শয়তান কাকটাকে শেষ করে দেবে।

কিন্তু পারেনি। পারবে কি করে? শয়তান কাকটা তো সাধারণ কাক নয়।

এই পর্যন্ত বলে বুড়ি আবার থেমেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু অম্বুজা তো পালিয়ে গিয়েও ফিরে আসত। শয়তান কাকটা কি চর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারত না?

বুড়ি হেসে বলল, কিঁ কঁরে পাঁরবে? এঁইখানে এঁই বঁনের ধাঁরে আঁমি বঁসে আঁছি যেঁ। আঁমাকে ডিঁঙিয়ে যাঁবে এঁমন সাঁধ্যি কোঁনো ভূঁত-প্রেঁতের নেঁই।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, বুড়িমা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কঁরো। কঁরো। তাঁড়াতাড়ি কঁরো। রাঁত ফুঁরিয়ে আঁসছে। আঁমি ঘুঁমুবো।

জিজ্ঞেস করলাম, আমায় যে তাড়া করে আসছিল সে কোথায়? অম্বুজার কি হলো?

বুড়িমা আবার হাসল। বলল, ওঁরা চঁলে গ্যাঁছে যেঁ যাঁর জাঁয়গায়।

মানে?

বুড়িমা বললে, তুঁমি তোঁ রাঁজকন্যেকে সাঁরাতে এঁসেছিলে। তাঁই নাঁ?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু পারিনি।

বুড়িমা আবার ফিক করে হাসল। বললে, পেঁরেছ। পুঁরোপুরি সাঁরিয়ে দিঁয়েছ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

হ্যাঁ গোঁ। ভাঁগ্যি তুঁমি ভঁয় নাঁ পেঁয়ে ঐঁ গঁভীর রাঁতে পিঁছু নিঁয়েছিলেঁ। ভাঁগ্যি তুঁমি পঁড়ে গিঁয়েছিলেঁ। তঁবেঁই নাঁ প্রেঁতটা অঁম্বুজার ভিঁতর থেঁকে বেঁরিয়ে এঁসে তোঁমায় তাঁড়া কঁরে আঁসছিল। আঁর যেঁই অঁম্বুজাকে এঁকবার ছেঁড়েছে, আঁর ওঁর ভিঁতর ঢুঁকতে পাঁরবে নাঁ।

বলে বুড়িমা তার শণের নুড়ির মতো মাথাটা দোলাতে লাগল।

ব্যাঁস! রাঁজকন্যে ভাঁলো হঁয়ে গেঁল। আঁর প্রেঁতটাকে পাঁঠিয়ে দিঁলাম ওঁর স্থাঁনে। বলে হলদেটে শুকনো আঙুল তুলে চরটা দেখিয়ে দিল।

অম্বুজা তা হলে এখন কোথায়?

যঁথাস্থাঁনে।

যথাস্থানটা কোথায় তা জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হলো না।

কিঁন্তু আঁর নঁয়। ওঁঠো। তোঁমায় রাঁজবাড়ির দিঁকে এঁগিয়ে দিঁই।

বুড়িমা ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে বুড়ি হঠাৎ অন্যদিকে পা বাড়াল।

এঁদিকে এঁকটু এঁসো।

এটা সেই জায়গা যেখান থেকে প্রেতটা তাড়া করেছিল।

ঐঁ দ্যাঁখো। বলে বুড়ি দূরে মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

দেখলাম মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে রাজকন্যা অম্বুজা। ঠিক যেন একগাদা ফুলের মালা।

ও কি মরে গেছে?

বুড়ি বললে—নাঁ। ওঁ এঁকেবারে ভাঁলো হঁয়ে গেঁছে। ঘুঁমোচ্ছে। তুঁমি ওঁকে কোঁলে তুঁলে নিঁয়ে রাঁজবাড়িতে চঁলো।

আমি স্বচ্ছন্দে অম্বুজাকে কোলে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়ে বুড়িমা বলল, আঁর যেঁতে পাঁরব না। রাঁজা মঁশাই তোঁ আঁমায় তাঁড়িয়ে দিঁয়েছেন।

আমি বুড়িমাকে প্রণাম করলাম। বললাম, আর একটা কথা। আপনি কে বলুন তো।

বুড়িমা হঠাৎ গলা চড়িয়ে উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলল, আঁমি? তিঁনশো বঁছরেরও বেঁশি হঁলো আঁমি ঐঁ চঁরে বাঁস কঁরতাম। তাঁরপর মাঁনুষজন দেঁখব বঁলে রাঁজবাঁড়ির কাঁছে থাঁকতাম। লোঁকে বঁলে আঁমি ডাঁইনি। ছেঁলেরা ঢিঁল মাঁরে। রাঁজা খেঁদিয়ে দিঁলে আঁমায়। তঁবু আঁমায় থাঁকতে হঁবে এঁখানে। নঁইলে প্রেঁতদের ঠ্যাঁকাবে কেঁ?

বলে বুড়িমা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা ঝোড়ো বাতাসে তার পাকা চুলগুলো উড়তে লাগল। সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে একরকম ভাসতে ভাসতে বুড়িমা চরের দিকে চলে গেল।

রাজবাড়িতে যখন ঘুমন্ত অম্বুজাকে কোলে নিয়ে পৌঁছলাম তখন ভোর হয়েছে।

আজ এই প্রথম আমি হাঁকডাক করে রাজবাড়িতে ঢুকলাম।

কোথায় নিশীথ। আর কত ঘুমোবে তোমরা। ওঠো, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।

রাজবাড়ির ঘুম ভাঙল। দোতলার জানলাগুলো ফটাফট খুলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখছে এত ভোরে কে হাঁকডাক করছে।

রাজামশাই যে রাজামশাই যাঁকে বড়ো একটা দেখাই যেত না তিনিও নেমে এসেছেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিশীথও এসে হাজির।

কী ব্যাপার। রাজকন্যাকে কোথায় পেলে?

আমি সব ঘটনা ওঁদের বললাম। শুনে ওঁরা অবাক।

রাজকুমারী অম্বুজার তখন ঘুম ভেঙেছে। একজন অপরিচিত লোকের কোলে রয়েছে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমায় চিনতে পারল না।

রাজকন্যাকে দেখিয়ে রাজামশাইকে বললাম, এই নিন মহারাজ আপনার কন্যাকে। আর ভয় নেই। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

অম্বুজা রাজামশাইকে চিনতে পারল। বহুকাল পর "বাবা" বলে রাজমশাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাজামশাই আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ছবি : সরোজ সরকার

আমার তৃতীয় মক্কেল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এক

রাস্তার এক পাশে একটা লাল মারুতি ভ্যান দাঁড় করিয়ে এক ভদ্রলোক যখন এদিক-ওদিক বাড়ির নম্বর খুঁজছিলেন তখন বারান্দা থেকে ঋতুরই প্রথম চোখে পড়ল।

আমি সেদিন দূরদর্শনে সন্ধ্যার খবর শুনছিলাম। তেমন কোনো জোর খবর কিছু নেই। তবে বড়বাজার এলাকা থেকে আবার একজন ব্যবসায়ী নিখোঁজ হয়েছেন এই খবরটি আমার মন কাড়ল। কারণ গত এক মাসে পরপর চারজন ব্যবসায়ী এভাবে শহর থেকে নিখোঁজ হলেন।

ঋতু বলল, দাদা এক ভদ্রলোক বাড়ি খুঁজছেন। মনে হচ্ছে তোর খোঁজেই বোধহয় এসেছেন।

আমি বললাম, যদি আমার খোঁজে কেউ এসে থাকেন তাহলে তাঁরই গরজ আমাকে খুঁজে বার করার। বাড়ির সামনে বড় বড় হরফে নেমপ্লেট ঝুলিয়ে রেখেছি। নেহাত অন্ধ না হলে নজর এড়াবে না।

ঠিক এমন সময় বেল বেজে উঠল। ঋতু বলল, হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। ওই ভদ্রলোকই। মনে হচ্ছে মক্কেল। যা টিভি বন্ধ করে তুই নিচে গিয়ে কথা বল।

আমি বললাম, তুই ভদ্রলোককে বসা, আমি যাচ্ছি।

একটু ইচ্ছে করেই ভদ্রলোককে মিনিট পাঁচেক বসিয়ে রাখলাম। এটি আমার একটা কৌশল। আমি যে কত ব্যস্ত লোক তা মক্কেলদের জানানো দরকার। সঙ্গে সঙ্গে দেখা করলে ভাবতে পারে আমি বুঝি মাছিই তাড়াচ্ছি।

সত্যিই মাছি তাড়াচ্ছিলাম, গত আট মাসে মাত্র দুটো মক্কেল জুটেছে। যদিও দুটো কেসেই আমি সফল তবু পকেটে তেমন কিছু আসেনি। তাছাড়া বাজারে এখন প্রচুর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এসে গেছে। প্রত্যেক রবিবার কাগজ খুললেই তাদের বিজ্ঞাপন থাকে। আমি যে মাঝে মাঝে টেলিফোন পাই না তা নয়, কিন্তু আমি ঠিক করেছি মনের মতো কেস না পেলে বাড়ি বসে বই পড়ে আর টিভি দেখে কাটিয়ে দেব।

ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশ। একটি ঘি রঙের সাফারি স্যুট পরে এসেছিলেন। মাথায় টাকের আভাস। নাকের তলায় সুপুষ্ট গোঁফ। দোহারা চেহারা। তবে গোলগাল মুখ। ফর্সা রঙ। দু' আঙুলে গোটা কয়েক আংটি। দেখে মনে হয় ভদ্রলোক জ্যোতিষে ভীষণ বিশ্বাস করেন, নয়তো সমস্ত গ্রহদেবতাকে দু'হাতের আঙুলে বন্দী করে রাখার এই দুরূহ চেষ্টা করবেন কেন?

আমাকে দেখে যথারীতি সৌজন্য বিনিময় করলেন। তারপর বললেন, কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। আমি থাকি কেয়াতলায়। আমার নাম মহিমরঞ্জন চৌধুরী। কিছুদিন ধরে আমাদের পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক ডাকে এক অদ্ভুত ধরনের চিঠি পাচ্ছেন। আমাকে এই চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে বলেন সত্যরঞ্জন দত্ত মশাই। তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু। তাঁর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা আছে। আজ থেকে পনের দিন আগে তিনি চিঠিটা আমায় দেখান। আমি ওঁকে বলেছিলাম, এই চিঠি ছিঁড়ে

ফেলে দিন। কেউ ভয় দেখাবার জন্য লিখেছে। তিনি পুলিশে যেতে চেয়েছিলেন, আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, পুলিশে যাবেন না মশায়, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। চেপে যান। দেখুন না, কী হয়। এরপর পাড়ার আরও পাঁচ-ছ'জন এই চিঠি পেলেন। গতকাল আমিও ঠিক একই চিঠি পেয়েছি। ব্যাপারটা নিয়ে দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। তাঁরা উপদেশ দিলেন, নিশ্চয়ই কোনো বদমায়েশ লোকদের কাণ্ড। পুলিশে না গিয়ে কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যাওয়া ভাল। তাঁদের কথামতোই আপনার কাছে এসেছি। আপনার বিজ্ঞাপন অনেকেরই চোখে পড়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু আপনি চিঠিটা যতক্ষণ না দেখাচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কোনো মন্তব্য করতে পারছি না।

ভদ্রলোকের হাতে একটি চামড়ার হাত-ব্যাগ ছিল। বাজারে যে ধরনের খেলো প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ থাকে বা সেমিনার-টেমিনারে যে ধরনের ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়, ব্যাগটা সে ধরনের নয়। বেশ সুদৃশ্য ও দামী। তিনি একটি ভাঁজ-করা চিঠি বার করে আমার হাতে দিলেন।

চিঠিটা সাদা কাগজের ওপর বাংলায় কম্পিউটারে ছাপা। তারিখ দেওয়া আছে আজ থেকে চোদ্দ দিন আগের। চিঠির ভাষা ভদ্রলোক যা মুখে বলেছিলেন হুবহু এক। আমি বললাম, এই চিঠি মোতাবেক কেউ কি এক লাখ টাকা রেখে দিয়েছে?

তিনি বললেন, না। কেউ কেউ ভয় পেয়ে টাকা দিয়ে ঝামেলা এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা একটা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে টাকা দেব না। আমাদের যে বিপদ আসুক না কেন, সবাই একযোগে রুখে দাঁড়াবো।

এতবড় একটা ঘটনা, বিশেষ করে কলকাতায় যখন মুক্তিপণের ভয় দেখিয়ে এইভাবে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় চলছে তখন বিষয়টি আপনাদের পুলিশের নজরে আনা উচিত ছিল। কোনো একটা কিছু হয়ে গেলে পুলিশ তখন আপনাদের ওপরেই দোষ চাপাবে।

আপনার কাছে সেজন্যই আসা উদ্দালকবাবু। আপনি যদি পরামর্শ দেন, তাহলে পুলিশের কাছে যাবো। কিন্তু তার আগে আমরা চাই আপনি এই ব্যাপারটার একটা প্রাথমিক তদন্ত করুন।

আমি আর একবার চিঠিটি পড়লাম। চিঠির বয়ানটি এই:

মহাশয়,

এই চিঠি পাইবার এক সপ্তাহের মধ্যে একটি প্ল্যাস্টিক ব্যাগের ভেতর এক লক্ষ টাকা রাখিয়া ব্যাগটি একটি রেশনের থলির মধ্যে ঢোকাইবেন। অতঃপর ওই থলিটি আগামী শনিবার ভোর চারটার আগে আপনার বাড়ির সামনে রাখিয়া দিবেন। এই আদেশের অমান্য করিলে আমরা একে একে আপনার পরিবারের সকলকে হত্যা করিতে বাধ্য থাকিব।

কোনোক্রমে চালাকি করিয়া পুলিশে খবর দিতে যাইবেন না। ব্যাগে টাকা রাখিয়া ব্যাগটি বাইরে রাখিবার পর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবেন। কোনোভাবে দেখিবার চেষ্টা করিবেন না। অন্যথা করিলে সমান শাস্তি পাইবেন।

ইতি

আপনার যম।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, এই চিঠিটা যে খামে এসেছিল, সেই খামটা দেখাতে পারেন?

মহিমবাবু বললেন, দেখাচ্ছি। বলে তিনি ব্যাগ থেকে একটি বাদামী খাম বার করলেন। খামের ওপর টাইপ করে ঠিকানা লেখা। তিন টাকার টিকিট মারা। চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ দেখলাম আমহার্স্ট স্ট্রিট।

আমি বললাম, যাঁরা এই ধরনের চিঠি পেয়েছেন তাঁদের সবারই কি টাকা দেবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে?

মহিমবাবু বললেন, সকলের হয়নি। চারজন ভদ্রলোকের টাকা দেবার মেয়াদ এক হপ্তা হলো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

তাঁরা বহাল তবিয়তে আছেন তো?

হ্যাঁ, তা আছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের গায়ে আঁচড়টুকু লাগেনি। বলতে পারেন ঈশ্বরের পরম দয়া। কিন্তু তাঁরা খুব ভয়ে ভয়ে আছেন। দুটি মাড়োয়ারি পরিবার তো ঘরবাড়ি দারোয়ানের হাতে দিয়ে মুলুকে চলে গেছেন। যাবার সময় অবশ্য বলে গেছেন তাঁরা আত্মীয়র বিয়েতে যাচ্ছেন।

আপনার কী মনে হয় না এই চিঠিগুলি লেখার পিছনে কোনো ক্রিমিন্যাল মোটিভ নেই? পাড়ার কোনো অকালপক্ব ছেলে নেহাৎ মজা লোটবার জন্যই এসব লিখেছে?

ঠিক তাই-ই আমার মনে হয়। আর সেই বদমায়েশ ছোকরাকে খুঁজে বার করার জন্যই আপনার কাছে আসা।

চিঠিটি মহিমবাবুর হাতে আবার তুলে দিতেই তিনি সেটিকে ব্যাগবন্দী করলেন। ততক্ষণে চিঠিটা আমি বার তিনেক পড়ে ফেলেছি। এই চিঠির ভাষাটা আমার যেন চেনা চেনা ঠেকেছে। মনে হচ্ছে কোথায় কোন বইতে পড়েছি। ছোটবেলায় আমি গোয়েন্দা বই-এর রাক্ষস ছিলাম। কত অসংখ্য বই যে গপ গপ করে গিলে খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আলাদা করে সব মনে রাখা শক্ত এখন।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি কেসটা নিলাম। কত ফিস দেবেন?

ফিসের কথাটা বললাম এই কারণে যে আগের ক্লায়েন্টরা আমার প্রত্যাশা পূরণ করেননি। কাজ ফুরিয়ে গেলে অনেক মক্কেলই যা হোক কিছু দিয়ে যে যার সরে পড়তে চান সেটা আমি লক্ষ্য করেছি।

একটু পরে ঋতু দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকল। মহিমবাবু চা দেখে বললেন, আমি তো চা—

ঋতু বলল, আমি আপনার জন্য চিনি ছাড়া চা এনেছি।

এবার একগাল হেসে মহিমবাবু বললেন, তুমি কী করে বুঝলে মা, আমি ডায়াবেটিক?

আমি বললাম, আমার বোন এবং আমার সহকারী ঋতু। গোয়েন্দাদের সহকারীদেরও একটি তৃতীয় নয়ন থাকে, সেটা দিয়ে তারা আগেভাগে সব বুঝে নেয়।

ঋতু হেসে বলল, আজকাল পঞ্চাশোর্ধ্ব অধিকাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে ভোগেন। অনেকে না ভুগলেও ভয়ে চিনি ছেড়ে দেন। তবে অনেকেই বেশি বয়সেও গপ গপ করে মিষ্টি খান দেখেছি। তাই আপনার জন্য চিনি আলাদা করা আছে।

মহিমবাবু একগাল হেসে বললেন,

তুমি মা সুগৃহিণী হতে পারবে। আমি চায়ের সঙ্গে চিনি খাই না। তবে এখন চায়ের ঝামেলা করা উচিত ছিল না। আমি এমনিতেই চা কম খাই। ইদানীং নানা টেনশনে সিগারেটের মাত্রাটা একটু বেড়ে গেছে। তোমার দাদাকে বলেছি, কীরকম টেনশনে আমাদের দিন কাটছে।

আমি বললাম, মহিমবাবু, আমার কাছে যখন এসে পড়েছেন তখন একদম টেনশন করবেন না। আপনার কেসটা আমি নিলাম। আজ বুধবার। আগামী রবিবার আপনার বাড়িতে যাবো। তার আগে আপনাকে দুটো অনুরোধ করবো। যাঁরা এই ধরনের চিঠি পেয়েছেন, তাঁদের সকলের ঠিকানা আপনার জানা আছে?

মহিমবাবু বললেন, সকলের নাম বলতে পারব। বাড়িও চিনি। কয়েকজনের ফোন নম্বরও জানি। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা মনে রাখি না, দরকার হয় না।

বেশ তো, আপনি নাম ও টেলিফোন নম্বরগুলি বলুন। ঋতু যা তো ওপর থেকে আমার ডায়রিটা নিয়ে আয়। আর এঁর কাছ থেকে নামগুলো লিখে নে।

ডায়রি আনতে ঋতু ওপরে চলে গেল। এবার আমি বললাম, আপনার সম্পর্কে একটু জিজ্ঞাসা করি, এতে আমার কেসটা বুঝতে সুবিধা হবে।

বলুন। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে মহিমবাবু বললেন।

আপনি কি করেন মহিমবাবু?

আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। তবে আমার একার নয়। আমার ছোটভাই শ্যামলও এর অর্ধেক অংশের মালিক। ব্যবসাটা বাবাই করেছিলেন। তিনি আমাদের দুই ভাইকে লিখে দিয়ে যান।

ব্যবসাটা কী জানতে পারি কি?

প্রিন্টিং প্রেস।

কেমন চলে?

খুব একটা খারাপ না। একটা সময় খুব বড় ইউনিট ছিল। এখন একটা দু'কালারের অফসেট মেশিন আছে আর দুটো ডিটিপি। প্রেসটা বউবাজারে। মেট্রো রেলের জন্য আমাদের প্রেসেরও কিছুটা জায়গা ছাড়তে হয়েছে। বাড়াবার আর কোনো সুযোগ নেই।

আপনার কোনো শত্রু আছে?

মহিমবাবু বললেন, কোন মানুষের শত্রু নেই বলুন! তেমন কেউ থাকতেও পারে। তবে বড় রকমের শত্রুতা কখনও কারও সঙ্গে হয়নি। আপনি কি ভাবছেন, শত্রুতা করে কেউ আমাকে এ চিঠি দেবে? তাহলে তারা তো আমাকে একাই দিত। পাড়ার অন্তত আরও পাঁচজন এ চিঠি পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন তপনবাবুর সঙ্গে পাড়ার পুজো কমিটির ব্যাপারে আমার মনোমালিন্য হয়। উনি আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে কনটেস্ট করেছিলেন। উনি মাত্র চারটি ভোট পান। আমিই সেবার প্রেসিডেন্ট হই। তারপর থেকে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। আমিও বলতাম না। ব্যস এই পর্যন্ত। এটা এমন কিছু নয় যে এজন্য তিনি আমার পিছনে তিন বছর পরে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবেন। তাছাড়া তিনিও একই চিঠি পেয়েছেন।

আমি বললাম, আপনার প্রেসের ঠিকানাটা আমায় দিন।

মহিমবাবু বললেন, আমি রোজ প্রেসে যাই না। আমার ভাই-ই থাকে। আসার আগে ফোন করে আসবেন।

প্রেসের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর মহিমবাবু একটা চিরকুটে লিখে দিলেন। ঋতু তাঁর প্রতিবেশীদের নাম লিখে নিল। এঁরা সবাই একই ধরনের চিঠি পেয়েছেন।

ঋতুর লেখা শেষ হতে বললাম, তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক মহিমবাবু। আমাদের আবার রবিবার দেখা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলাম, ও হ্যাঁ, ওই চিঠির কোনো কপি আপনার কাছে আছে? আমাকে একটা দিতে হবে।

মহিমবাবু বললেন, ওর একটা জেরক্স কপি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। অরিজি-ন্যালটা আমার কাছে থাকল। তেমন দরকার হলে আপনাকে দিয়ে দেব।

আমি বললাম, তার দরকার নেই, জেরক্স কপি হলেও চলবে।

মহিমবাবু তাঁর ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে আর একটি ভাঁজ-করা কাগজ বার করে আমার হাতে দিলেন। আমি কাগজটা খুলে এক পলকে দেখে নিলাম, হ্যাঁ, সেই ভয় দেখানো চিঠি। মহিমবাবু ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মহিমবাবু চলে যেতেই চিঠিটা আমি আবার বার করে পড়লাম। আর পড়তে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মনে হলো এই চিঠিটার মধ্যেই যেন আমি এই চাঞ্চল্যকর রহস্যের সমাধান দেখতে পাচ্ছি।

আমাকে হঠাৎ উত্তেজিত হতে দেখে ঋতু বলল, গোয়েন্দা মশাইকে হঠাৎ যে বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে। কিছু রহস্যের হদিস পেলে নাকি?

আমি বললাম, গোয়েন্দাদের অত চট করে কিছু মন্তব্য করা নিষেধ।

দুই

রবিবার মহিমবাবুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমি তার আগেই কিছু প্রাথমিক তদন্ত সেরে নিলাম। সেটা সারতে দু'দিন লাগল।

শনিবার বেলা দশটা নাগাদ বসে একটা ইংরাজি উপন্যাস পড়ছি, ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে হ্যালো বলতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে একজন বলল, আমি কী মিঃ উদ্দালক প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

বললাম, আমিই উদ্দালক প্রধান। আপনি কে বলছেন?

ওপাশ থেকে উত্তর এল, আমার নাম শ্যামলরঞ্জন চৌধুরী। কিছুদিন আগে আমার দাদা মহিমরঞ্জন চৌধুরী আপনার কাছে এসেছিলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মহিমবাবু কোথায়? কালই তো আমার আপনাদের বাড়িতে যাবার কথা।

শ্যামলবাবু কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, কাল রাত্তির থেকে দাদা নিখোঁজ। অন্যদিন রাত আটটার মধ্যে ফিরে আসেন। কাল বারোটা পর্যন্তও যখন ফিরলেন না তখন বৌদি বললেন, পুলিশে খবর দিতে। দাদা আমাকে বলেছিলেন, পুলিশে তিনি চট করে যেতে চান না। পুলিশ এখন আর মানুষের কোনো উপকার করে না। শুধু লোককে হ্যারাস করে। সেজন্যই তিনি প্রাইভেট গোয়েন্দার কাছে গিয়েছেন—

আমি বললাম, আমার কাছে উনি যে এসেছিলেন, তা আপনি জানেন?

হ্যাঁ, আমি কেন, আমাদের বাড়ির সবাই জানে। আপনি আগামীকাল যে আমাদের বাড়িতে তদন্তে আসবেন, দাদা এটা আমাদের সবাইকে বলেছেন। যাঁরা ওই ধরনের চিঠি পেয়েছেন, সবাইকেই আমি আসতে বলে দিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখন আমি কী করবো বলুন। পুলিশে তো এবার না গেলেই নয়। এদিকে আজ সকালেই কাগজের অফিসগুলো থেকে ফোন আসছে জানতে চেয়ে—

কাগজ? কাগজের লোক খবর পেল কি করে? আমি আশ্চর্য হলাম।

সে ওরাই জানে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা ওরা বলল, কে ওদের ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে অমুক ব্যবসায়ী কাল রাত থেকে নিখোঁজ। তার ফলে আমাদের অবস্থা জেরবার। একে দাদা নিখোঁজ, তার ওপর কাগজওয়ালাদের উৎপাত। শ্যামলবাবুর কণ্ঠে বিরক্তি ও অসহায়তা ঝরে পড়ল। তারপর ভেঙে পড়া গলায় তিনি বললেন, আমাদের কি হবে বলুন তো মিঃ প্রধান? দাদাকে ওরা মেরে ফেলবে। আমাদের এক লাখ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই।

আমি বললাম, টাকা দেওয়ার কথা ভাবছেন কেন? এমনও তো হতে পারে আপনার দাদা মানে মহিমবাবু কোনো কাজে বাইরে আটকে পড়েছেন। কলকাতার বাইরে আপনাদের আত্মীয়স্বজন বা ওঁর তেমন কেউ বন্ধুবান্ধব থাকলে খোঁজ করে দেখতে পারেন।

শ্যামলবাবু বললেন, আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজন কলকাতার বাইরে নেই। দাদার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন, থাকেন শিলচরে। গতকাল বিকেলে দাদা যখন বাড়ি থেকে বেরোন তখন প্লেনের টাইম নয়। গেলে আজ সকালের ফ্লাইটে যেতে পারেন। কিন্তু না বলে সেখানে হুট করে যাবেন কেন? আর রাত্তিরটাই বা থাকলেন কোথায়? ট্রেনে তিনদিনের জার্নি। ট্রেনে করে সেখানে যাবেন না। তবু আমি দুপুরে তাঁকে ফোন করে জেনে নেব আজ সকালের ফ্লাইটে গিয়ে দাদা শিলচর পৌঁছেছেন কিনা। কিন্তু আপনার একবার আসা দরকার মিঃ প্রধান।

আমি কাল সকালেই যাবো। আপনি আজকের দিনটা দেখুন। পুলিশে খবর দেবো কি? কালকের কাগজেই তো সব বেরিয়ে যাবে। তখন পুলিশ বলবে আমাদের কেন জানাননি।

আমি একটু ভেবে বললাম, আমার তো মনে হয় থানায় একটা ডায়েরি করে রাখা ভাল।

বেশ, আমি এখনই থানায় যাচ্ছি। কিন্তু পুলিশের ওপর আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা আপনার ওপরেই বেশি ভরসা করি।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে আমি একটু গর্ব অনুভব করলাম। মহিমবাবু যে নিখোঁজ হবেন, এমন একটা অনুমান আমি করে রেখেছিলাম। তবে তাঁকে যারা অপহরণ করেছে তারা কি কিছুই খবর রাখে না?

আমি গত দু'দিন ধরে তদন্ত করে জেনেছি, মহিমবাবুদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মেট্রো রেল তাঁদের প্রেস বাড়িটার অর্ধেকটাই অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফুট প্রেসের বেশির ভাগ অংশ কাটা পড়েছে। এখন এক হাজার স্কোয়ার ফুট পড়ে আছে। তাতে কোনোক্রমে একটা দু'কালার

এখনই এঁদের গ্রেফতার করুন।

অফসেট মেশিন ও দুটো ডিটিপি বসিয়ে তাঁরা কাজ চালাচ্ছেন। এজন্য প্রায় পনেরোজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে হয়েছে। তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে পারেননি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে সারা পশ্চিমবঙ্গ ছাপাখানা কর্মী পরিষদ লাগাতার ধর্মঘট করার হুমকি দিয়েছে। প্রেসে জায়গার অভাবে অনেক বাঁধা খদ্দেরকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তাঁদের ছাপাখানা থেকে পাঠ্যপুস্তক ছাপাতেন। এখন তাঁরাও আর অর্ডার দেন না। কারণ মহিমবাবুরা পুরনো হাইস্পিড চার কালার ওরিয়েন্ট মেশিনটা জায়গার অভাবে জলের দামে বেচে দিয়েছেন। ছাপাখানার ছাঁটাই কর্মীরা প্রায় দশ লাখ টাকার মতো ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল। কিন্তু মহিমবাবুর কাছে অত টাকা নেই। তার ওপর তাঁর কোম্পানির অনেক দেনা। ব্যাঙ্কের দেনা প্রায় লাখ পনের। এছাড়া পাঁচ মাসের মতো বিদ্যুৎ বিল বাকি। সি ই এস সি জানিয়ে দিয়েছে পরের মাসের মধ্যে এক লাখ টাকা জমা না দিলে তারা লাইন কেটে দেবে। মহিমবাবুর এই বৈষয়িক অবস্থার কথা বদমায়েশ লোকগুলি জানে না?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল চিঠিটির কথা। আমি ঋতুকে বললাম, তুই একবার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটে মহিমবাবুর মিনার্ভা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে যা। যাহোক একটা কিছু ছাপার অর্ডার দিতে যা। বলবি খুব জরুরি অর্ডার। দু'ঘণ্টার মধ্যে এই ম্যাটারটার প্রুফ দিতে হবে। আর্জেন্ট চার্জ দেব।

ঋতু বলল, ম্যাটারটা কোথায়?

আমি বললাম, আধঘণ্টার মধ্যে বানিয়ে দিচ্ছি। ম্যাটারটার প্রুফ আনার সময় ওদের ছাপার নমুনাও কিছু নিয়ে আসবি।

বিকেলবেলাই ঋতু আমার দেওয়া ম্যাটারের প্রুফ নিয়ে এল। প্রুফ কপি হাতে নিয়ে আমি মহিমবাবুকে লেখা উড়ো চিঠির পাশাপাশি রাখলাম।

দুটো চিঠিরই টাইপ ফন্ট একেবারে হুবহু এক।

তিন

বালিগঞ্জ থানার ওসি রমানাথ মণ্ডলের সঙ্গে আমার আগে একবার আলাপ হয়েছিল। একবারের আলাপে কাউকে মনে রাখা হয়তো সম্ভব নয়। সেজন্য আমি ফোনে যখন বললাম, আমি ফাকুদার ভাগ্নে। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ফাকুদা। আমার নাম উদ্দালক। লোকে ইউপি বলে ডাকে। ওসি রমানাথ-বাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে উদ্দালকবাবু, আপনি তো এখন ফেমাস প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ডিসি ডিডি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। কী ব্যাপার বলুন।

কেয়াতলায় মহিমরঞ্জন চৌধুরী বলে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন, খবর পেয়েছেন?

রমানাথবাবু বললেন, আজ দুপুরে ওঁর ভাই শ্যামলবাবু এসে একটা ডায়েরি করে গেলেন। এদিকে সকাল থেকে কাগজের লোকেরা ফোন করছে। আমি তো এইমাত্র জানলাম। আপনি জানলেন কীভাবে?

আমি ওঁকে সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম।

সব কথা শোনার পর রমানাথবাবু বললেন, এতদিন ধরে ব্যাপারটি চলছে, অথচ তাঁরা কেউ একবার থানায় জানালেন না। এখন গোড়া কেটে আগায় জল দিতে এসেছেন। যতো সব।

আমি বললাম, আপনি কাল সকালে মহিমবাবুর বাড়ি আসতে পারবেন? আমি আশা করছি মহিমবাবুর অপহরণকারীকে ধরার ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারব। তবে তার আগে আজকের মধ্যে আপনি কলকাতার পুরনো বদমাশদের ডেরায় রেইড চালাতে পারেন?

আপনার কী মনে হয় এটা পুরনো দাগীদের কাজ?

আমি বললাম, অন্তত এটা যে তাদের কাজ নয়, সে বিষয়ে আমাকে স্থিরনিশ্চয় হতে হবে।

চার

কেয়াতলায় মহিমবাবুদের বাড়িতে আমি ও ঋতু সকাল ন'টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। উদ্বিগ্ন মুখে শ্যামলবাবু আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আমি এইমাত্র আপনার বাড়ি ফোন করেছিলাম। বলল, আপনি বেরিয়ে গেছেন। দাদা কাল রাতে ফিরে এসেছেন।

বলেন কী? কীভাবে ফিরলেন? আমি অবাক হলাম।

সে এক কাহিনী। উনি শুক্রবার বিকেলে অন্যমনস্কভাবে চৌরঙ্গী রোড ধরে হেঁটে কার্জন পার্কের দিকে মিনিবাস ধরার জন্য যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর পাশে একটি ট্যাক্সি এসে থামে। ট্যাক্সির ভেতর দুটো লোক বসেছিল। একজন তাঁর নাম ধরে ডাকে। তিনি ট্যাক্সির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকান। অমনি ট্যাক্সির গেট খুলে একটি লোক তাঁকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়। আর একজন তাঁর নাকে একটি রুমাল চাপা দিতেই তিনি জ্ঞান হারান।

জ্ঞান হবার পর তিনি দেখেন, তিনি একটি ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে আছেন। ট্রেন ছুটে চলেছে। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন ওটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লিপার কোচ। এদিক-ওদিক চাইতে ট্যাক্সির সেই লোক দুটিকেও দেখতে পান নিচে বসে রয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ট্রেনটি একটা স্টেশনে থামে। লোক দুটি বোধহয় চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমে যায়। দাদা তখন চুপি চুপি বাঙ্ক থেকে নেমে করিডর দিয়ে তিনটে কামরা টপকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েন। তারপর প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে কুলি বস্তির ভেতর দিয়ে শহরের ভেতর ঢুকে পড়েন। জানতে পারেন শহরটি হলো আসানসোল। ট্রেনটি চলে গেলে দাদা আসানসোল থানায় গিয়ে সব খুলে বলেন। তাঁরা দাদার কাছ থেকে একটা এজাহার নিয়ে তাঁকে ব্ল্যাক ডায়মন্ডে তুলে দেন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দাদা বাড়ির বেল বাজান। আমরা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম অমন একটানা বেলের আওয়াজ শুনে। তারপর দেখি দাদা। একেবারে ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা। বাড়িতে আসার পর একটু সুস্থ হয়ে তিনি সব কথা খুলে বলেন।

তিনি এখন কোথায়?

ঘুমোচ্ছেন।

কখন উঠতে পারেন?

ন'টার সময় তুলে দেব। মিঃ প্রধান, এবার মনে হচ্ছে অপরাধীরা ধরা পড়বে, তাই না?

আমি বললাম, আমার তো তাই মনে হয়। পাড়ার ভদ্রলোকেরা সবাই আসছেন তো?

হ্যাঁ, সবাইকে বলেছি। বিশেষ করে কাল রাতে দাদার ফিরে আসার খবরটা আজ সকালেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি। তাঁরা এতদিন ভেবেছিলেন এটি কোনো বদ ছেলের ঠাট্টা। এখন তাঁরা এটা বিশ্বাস করেছেন এবং মনে হলো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

ঠিক আছে। ততক্ষণ আমরা না হয় অপেক্ষা করি।

আমরা মহিমবাবুর বৈঠকখানায় বসলাম। মহিমবাবুরা দোতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। এই বাড়িটা তাঁদের নিজেদের নয়। অনেকদিন আগে মহিমবাবুর বাবা এই ফ্ল্যাটটা দীর্ঘমেয়াদী লিজ নিয়েছিলেন। ড্রইংরুম কাম অফিস ঘর তেমন সাজানো-গোছানো নয়। একটি বড় সেক্রেটারিয়েট টেবল। কয়েকটি চেয়ার। সবই পুরনো আসবাব। সোফা সেটটিও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটি সার্টিফিকেট। মাস্টার্স প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আজ থেকে পনেরো বছর আগে মিনার্ভা প্রিন্টার্সকে মুদ্রণ কাজে কৃতিত্বের জন্য প্রথম পুরস্কার দিচ্ছে।

শ্যামলবাবু বললেন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। আমি চা খাবো না। ঋতুও চা খায় না। ওকে বরং আজ সকালের খবরের কাগজগুলো এনে দিন।

টেবলের ওপরেই সে দিনের বাংলা-ইংরাজি দুটো কাগজ ছিল। ঋতু কাগজ দুটো তুলে নিয়ে এক নজরে দেখে বলল, দাদা, দুটো কাগজেই প্রথম পাতার খবর ব্যবসায়ী নিরুদ্দেশ।

আমি একটু মুচকি হেসে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

গোলপার্ক পর্যন্ত যেতে হবে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করতে।

পাঁচ

ফোন সেরে খুশি মনে মহিমবাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে থানার জিপ দাঁড়িয়ে। গেটে দু'জন কনেস্টবল। বুঝলাম রমানাথবাবু ভেতরে চলে গেছেন। তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে ড্রইংরুমে গিয়ে দেখি পাড়ার পাঁচ-ছ'জন ভদ্রলোকও এসে গেছেন। মহিমবাবু এসে বসেছেন। তাঁর পরনে পাজামা। গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি। একমুখ দাড়ি। তিনি ওসির সঙ্গে কথা বলছেন।

মহিমবাবু আমাকে দেখে বললেন, আসুন উদ্দালকবাবু।

রমানাথবাবু বললেন, এই যে উদ্দালক এসে গেছেন। মহিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। আমি পুরো কেসটা বুঝে গিয়েছি। এ নির্ঘাৎ বিহারের গ্যাং। ধানবাদে নিয়ে যেতে চাইছিল। একবার নিয়ে যেতে পারলে মোটা টাকা না দিলে ছাড়া পেতেন না। ধানবাদের তিনটে কিডন্যাপার গ্যাং কলকাতায় অপারেট করছে। কোন গ্যাং-এর কীর্তি সেটা দেখতে হবে।

আমি বললাম, রমানাথবাবু, এটি আর কোনো গ্যাং নয়, মহিম অ্যান্ড শ্যামল চৌধুরী গ্যাং-এর কীর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাই প্রতিবাদ করে উঠলেন, তার মানে? কী বলতে চান আপনি?

আমি বললাম, দারোগাবাবু এখনই এঁদের গ্রেফতার করুন। মিথ্যে কিডন্যাপিং-এর ধুয়ো তুলে এঁরা জনগণ ও সরকারকে বিভ্রান্ত করেছেন।

মহিমবাবু বললেন, আমরা বিভ্রান্ত করেছি! এতে আমাদের লাভ কি?

আমি বললাম, এক ঢিলে দুই পাখি মারার ইচ্ছা ছিল আপনাদের। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবেশীরা যদি কেউ ভয় পেয়ে এক লাখ টাকা করে বাড়ির সামনে ফেলে রাখেন, উনি মর্নিং ওয়াক করতে যাবার সময় সেটা তুলে নেবেন। আমি তদন্ত করে জেনেছি মহিমবাবুর প্রেসের অবস্থা খুব খারাপ। ব্যাঙ্কের টাকা শোধ দিতে পারেননি বলে তাঁর নামে মামলা চলছে। ছাঁটাই কর্মচারীরাও তাদের টাকার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এদিকে মেট্রো রেলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা তিনি পাননি। এমন অবস্থায় তিনি চাইছিলেন আপাতত পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে।

কিন্তু মহিমবাবুর প্ল্যান কার্যকর হলো না। কেউ লাখ টাকা বাড়ির সামনে রাখলেন না। তখন মরিয়া হয়ে চরম পন্থা বেছে নিলেন মহিমবাবু। নিজেই নিজেকে নিখোঁজ বলে ঘোষণা করলেন। এই কাজে লাগালেন তাঁর ভাইকে—

মহিমবাবু এবার চিৎকার করে উঠলেন, ভুলে যাবেন না, আমি আপনাকে গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম। আপনি আবোল-তাবোল বকছেন।

আমি বললাম, আমি যে আবোল-তাবোল বকছি না তার প্রমাণ আপনার ছাপাখানায় ছাপা এই চিঠি। মনে আছে আমি যখন আপনার কাছে চিঠির ডুপ্লিকেট চেয়েছিলাম তখন আপনি জেরক্স কপি বলে আর একটি কপি দিয়েছিলেন। প্রথমে যে প্রিন্ট আউট তুলেছিলেন তাতে 'রেশনের থলি' কথাটি ভুল করে কম্পোজ হয় 'বেশনের থলি'। আপনার যখন চোখে এটা পড়ে তখন কারেকশন করে আরও কয়েকটি প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখেন। আমি যখন ওঁর কাছে একটি ডুপ্লিকেট চাই তখন উনি আমাকে কারেক্টেড কপিটাই দেন। অর্থাৎ প্রথম কপির র-এর একটা ফুটকি যে পড়েনি, তা অভিজ্ঞ মহিমবাবু লক্ষ্য করে বে অক্ষরটি সংশোধন করে রে বসিয়েছিলেন। তারপর অনেকগুলি প্রিন্ট আউট টেনে নিয়েছিলেন। দুটি চিঠিই তিনি পাশাপাশি ব্যাগে রেখে দিয়েছিলেন। প্রথমবার 'বেশনের থলি' লেখা চিঠিটি আমাকে পড়তে দেন। আমি পড়ার পর সেটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখেন। শেষে যাবার সময় আমি যখন তাঁর কাছে চিঠির জেরক্স কপি চাই, তখন তিনি জেরক্স কপি বলে ভুল করে আমাকে সংশোধিত কপিটাই দেন। ওটি জেরক্স কপি ছিল না। ছিল আর একটি অরিজিন্যাল প্রিন্ট আউট—কম্পিউটার থেকে বার করা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দেহ দানা বাঁধে। কারণ উড়ো চিঠি যারা দিচ্ছে তারা একটি করেই চিঠি দেবে। একাধিক কপি দেবে না। র-এর ফুটকি বসল কি বসল না তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা থাকবে না। তারা সেটি সংশোধন করে আর একটি চিঠিও

শরৎ

শিখা দেব

শিশিরমাখা নরম পাতায়
মন ছুটেছে সুরে,
ছলাৎ ছলাৎ ভাসছে তরী
ঢেউ চলেছে দূরে।
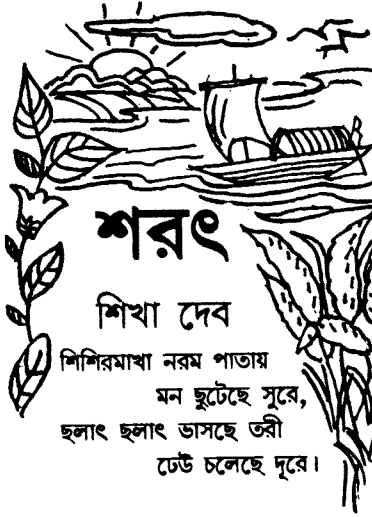
রোদের ঝিলিক ঝরায় সোনা
সবার প্রাণে প্রাণে,
হারিয়ে যাবো এইতো সময়
স্বপ্ন মাটির টানে।

পাহাড় নদীর কতই ছবি
রঙ তুলিতে আঁকা,
শরৎ মানে খুশির জোয়ার
অবাক চোখে দেখা।

পড়া-শোনা

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

এখন তো পড়াশোনার সময়,
রেডিওটা কেন খুলেছিস?
বুঝেছি এবার, কাল ইতিহাস
পড়া দিতে কেন ভুলেছিস!
আসুক না তোর বাবা বাড়ি ফিরে,
তুলবই তার কানেতে,
পড়াশোনা ছেড়ে দেখি ঝোঁক তোর
বেশি রেডিওর গানেতে।
মা-র অভিযোগে রামু বলে, ও মা,
শুধু শুধু দোষ দিলে তো,
বই থেকে পড়া, রেডিওতে শোনা,
দুয়ে মিলে পড়া-শোনা তো!

পাঠাবে না। আমার ধারণা হয় এই চিঠি মহিমবাবুই বানিয়েছেন। কিন্তু তিনি এটা করতে যাবেন কেন? তখন আমি তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে তদন্ত করতে থাকি। বুঝতে পারি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মহিমবাবু ও তাঁর ভাই দু'জনেই খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছেন। তাঁরা কারবার বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন। অথচ কর্মচারীরা কিছুতেই মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ ছাড়া কারবার বন্ধ করতে দেবে না। তাদের দু'মাসের বেতনও বাকি পড়েছে। হয় মহিমবাবুকে মোটা টাকা সংগ্রহ করতে হবে, না হয় তাঁকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যে কর্মচারীরা সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে আপাতত তাঁকে টাকার জন্য চাপ না দেয়।

উপস্থিত এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, আমরা জানি, মহিমবাবুই নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, যাতে এই রহস্যজনক চিঠির লেখককে ধরা যায়। তিনিই যদি অপরাধী হবেন, তাহলে নিজেই পুলিশের কাছে যাবেন কেন?

আমি বললাম, সবার আগে মহিমবাবুর চেষ্টা ছিল যাতে কোনোক্রমে তাঁর ওপর সন্দেহ না গিয়ে পড়ে। মহিমবাবু রোজ চারটের সময় উঠে লেকে বেড়াতে যান। এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। কাজেই তিনি যদি ভোরবেলা সবার অজান্তে রাস্তা থেকে কিছু কুড়িয়ে পেয়ে পকেটস্থ করেন লোকে তাঁকে সন্দেহ করবে না। তিনিই পুলিশে যেতে সবাইকে বারণ করেন কিন্তু নিরপরাধ সাজার জন্য প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যেতে বলেন।

কিন্তু তিনিই তো থানায় ডায়েরি করেছিলেন? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

সেটা শেষ রাতে ওস্তাদের মারের মতো। বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থেকে মহিমবাবু রটিয়ে দেন তিনি নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ হওয়ার গল্পটি নিজেই ফোন করে খবরের কাগজগুলিকে বলে দেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যাচাই করতে গিয়ে শ্যামলবাবুর কাছ থেকে জানতে পারে সত্যিই মহিমবাবু নিখোঁজ হয়েছেন। শ্যামলবাবু পুলিশে ডায়েরি করেন শেষ মুহূর্তে। কারণ সাজানো এই ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণ করে একটা বড় পাবলিসিটি পাওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এই পাবলিসিটি পেলে তাঁর কর্মচারীরা ও পাওনাদাররা অন্তত এখন বকেয়া টাকার জন্য চাপ দিত না। আর পুলিশ তদন্ত শুরু করার আগেই মহিমবাবু যে আসানসোল থেকে ফিরে এসেছেন এই প্রচার শুরু করে দিলেন শ্যামলবাবু।

শ্যামলবাবু চিৎকার করে উঠলেন, আপনি কী বলতে চান, দাদাকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারটা বানানো? দাদার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না কী দারুণ ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে গিয়েছে?

আমি বললাম, না। ওটা একদম অভিনয়। অভিনেতাকে দৃশ্য অনুসারে মেকআপ বদলে নিতে হয়। আপনার দাদা যে ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে আদৌ ফেরেননি তার প্রমাণ আমি ফোন করে জেনেছি। ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস গতকাল রাতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেট করে হাওড়ায় এসেছে। ন'টা পনেরোয় ট্রেনটি আসার কথা। এসেছে রাত বারোটায়। অধিকাংশ প্যাসেঞ্জারই হাওড়া স্টেশনে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ রাত দশটার পর হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিওয়ালাদের দৌরাত্ম্য যে কি মারাত্মক তা সকলেরই জানা। কাজেই রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তিনি ফিরেছেন বলেছেন, এটা সর্বৈব মিথ্যা। আমার অনুমান তিনি বাড়ি থেকে একদম বার হননি। তিনি জানতেন, কাগজে তাঁর নিরুদ্দেশের খবর বার হলে পুলিশ শহরের সব হোটেল তন্ন তন্ন করে খুঁজতে পারে। কাজেই তাঁর নিজের বাড়ির মতো নিরাপদ জায়গা আর হতে পারে না।

আমি এবার চুপ করলাম। তারপর একটু থেমে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলাম, আমার তৃতীয় মক্কেলকে এভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু গোয়েন্দা হিসাবে আমার একমাত্র দায় সত্যের কাছে। সেই সত্যের খাতিরেই আমি মহিমবাবু ও শ্যামলবাবুর দায়-দায়িত্ব ওসি রমানাথবাবুর হাতে তুলে দিলাম।

ছবি: রঞ্জন দত্ত

তবে কে তিনি

অজেয় রায়

বোলপুর শহরে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তার সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতির ছোট্ট অফিস কামরায় সকালবেলা একবার উঁকি দিল দীপক। দীপককে দেখেই কুঞ্জবিহারী গমগমে গলায় হেঁকে উঠলেন, এই যে রিপোর্টার, তোমার কথাই ভাবছিলুম।

কেন? জানতে চায় দীপক।

তোমাকে কয়েকটা ইনফর্মেশন যোগাড় করে দিতে হবে। মানে একটু গোপনে। তুমি ছাড়া আর কাউকে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

কি ইনফর্মেশন?

দীপকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সম্পাদক বললেন, তুমি তো বীরভূমের প্রাচীন অট্টালিকাগুলো নিয়ে স্টোরি করছ বঙ্গবার্তায়। বেশ হচ্ছে। তেমনি আর একটা বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। অন্তত দুশো বছরের পুরনো মস্ত বাড়ি। যাও দেখে এস। আর সেই সঙ্গে ওই বাড়ির কিছু খবর এনে দাও আমায়।

কি খবর?

ওই বাড়িতে নাকি প্রচুর পুরনো আমলের ফার্নিচার আছে। খাসা কারুকার্য করা। উত্তম কাঠে তৈরি। কাচের ঝাড়বাতিও আছে কিছু। শুনলাম, বাড়িটা শীগগিরি ভেঙে ফেলা হবে। তাহলে ওই সব ফার্নিচারও নিশ্চয় কিছু বিক্রি করে দেবে। তুমি বাড়িটা ঘুরে দেখতে দেখতে নজর করবে ওই ফার্নিচারগুলো কি অবস্থায় আছে? তাদের ডিজাইন কেমন? আর সত্যি বাড়িটা ভাঙা হলে—কবে নাগাদ? তখন ফার্নিচার, ঝাড়লণ্ঠন এসব কিছু বিক্রি করবে কিনা? এই খবরগুলো চাই।

কেন আপনি পুরনো ফার্নিচার, ঝাড়লণ্ঠন কিনবেন নাকি বাড়ি সাজাতে? দীপক অবাক।

দুর আমি নয় হে। সে অন্য খদ্দের। আমার এক বন্ধু কিনবে। সে পুরনো আমলের শৌখিন ফার্নিচারের ব্যবসা করে। এমনি পুরনো বাড়ি থেকে কেনে। আর বিক্রি করে হাল আমলের বড়লোকদের কাছে। মোটা লাভে। ওগুলো নিলামেও চড়ায়। আবার সিনেমা কোম্পানিকেও ভাড়া দেয়, পুরনো প্রাসাদের সেট সাজাতে। আমাকে বলে রেখেছে, পুরনো ভাল ফার্নিচারের খোঁজ পেলে ওকে খবর দিতে। দরে পোষালে কিনবে। বেশ খেয়াল করে দেখবে ঘুরে।

কদ্দূরে বাড়িটা?

বেশি দূরে নয়। নানুরের কাছে। কুসুমপুর নাম গ্রামটার। নাকি বেশ বড় গ্রাম। বাসরাস্তা থেকে মাইলখানেক ভেতরে। দত্তবাড়ি।

তা আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসছেন না কেন?

আরে আমার সময় কোথা? আগামী সংখ্যাটা বের করেই ছুটতে হবে ভাগনীর বিয়েতে। তাছাড়া পুরনো বাড়ির সাবজেক্টটা নিয়ে লিখছ তুমি। তোমার যাওয়াটাই মানাবে ভাল। ফার্নিচার বিক্রি নিয়ে বেশি ইন্টারেস্ট দেখিও না হে। তাহলে দর বাড়াবে মওকা বুঝে। সে যাব আমি বন্ধুকে নিয়ে আসল বিক্রির সময়।

দর তো তখনও হাঁকতে পারে?

আরে দূর! আসল পরিচয় কি দেব তখন? বন্ধুর সঙ্গে তার দু'চারজন কর্মচারীও যাবে, আলাদা আলাদা ভাবে। ভান করবে কেউ কাউকে চেনে না। সবাই বলবে, এই বীরভূম-বর্ধমানের লোক। শখ করে দু'একখানা পুরনো আমলের ফার্নিচার কিনতে চায়—যদি অবশ্য দরে পোষায়। ধরতেই পারবে না কলকাতার পার্টি—একই দলের।

তা দত্তবাড়ির ইতিহাসটা একটু বলুন। জানতে চায় দীপক।

যা শুনেছি দত্তদের এক আদি পুরুষ ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে কলকাতায় ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সেই টাকায় দেশ-গাঁ কুসুমপুরে অনেক জমি-জায়গা কেনেন। প্রকাণ্ড বাড়ি বানান। মানে ছোটখাটো জমিদার বনে যান। তিনি শেষ বয়সে কুসুমপুরে কাটান। তারপর থেকে দত্তরা কুসুমপুরেই বাস করতে থাকেন। ওইখান থেকে টুকটাক ব্যবসা-বাণিজ্যও চালান। তবে অবস্থা ক্রমে পড়তে থাকে। এখন আর বিশেষ কিছু নেই। বর্তমান মালিক দুই ভাই—কেউ এখানে পার্মানেন্টলি থাকেন না। একজন থাকেন বাঙ্গালোরে। আর একজন শিলিগুড়িতে। তাঁরা কদাচিৎ আসেন দেশের বাড়িতে। সম্প্রতি এক ভাই চুনিলাল দত্ত, যিনি শিলিগুড়িতে থাকেন এসেছেন কুসুমপুরে। কয়েক দিন মাত্র থাকবেন। ব্যস এইটুকু জেনেছি। এতেই আশা করি তোমার কাজ চলে যাবে।

বেশ যাব কুসুমপুর কাল-পরশুর মধ্যে। উঠে পড়ে দীপক।

হঠাৎ কুঞ্জবিহারী মিচকে হেসে বললেন, খোঁজ নিও তো বাড়িটায় ভূত-টুত আছে কিনা?

ভূত আছে নাকি?

জানি না ঠিক। থাকতেও পারে। এত বছরের প্রাচীন বাড়ি। থাকলে মানে খোঁজ পেলে তোমার স্টোরিটা জমবে বেশি।

কুসুমপুরে দত্তবাড়ির হদিস পেতে অসুবিধা হলো না দীপকের।

সত্যি বিশাল বাড়িখানা। বহু পুরনো, দেখলেই বোঝা যায়। বাইরের দেয়ালের বেশির ভাগ জায়গায় ইঁট বেরিয়ে পড়েছে পলস্তরা খসে। গাদা বট-অশত্থের চারা গজিয়েছে দেয়ালের ফাটলে। অজস্র জানলা-দরজাগুলো রংচটা, কোনওটা বা ভাঙা। বাড়িটা দোতলা।

সেই অট্টালিকা ঘিরে বড় বড় আম কাঁঠাল জাম ইত্যাদি নানান গাছের প্রায় জঙ্গল বলা যায়। কিছু পাতাবাহার আর ফুলের গাছও রয়েছে বাগানে। তবে বোঝা যায় যে বাড়ি ঘিরে এই গাছ-গাছালির এখন আর যত্ন হয় না। অবশ্য বাড়ির সামনেটা মোটামুটি পরিষ্কার। একটা পায়ে চলা মেঠো পথ বাড়ির সদর দরজা থেকে শুরু হয়ে মিশেছে গ্রামের রাস্তায়। নিস্তব্ধ চারধার। বাড়িতে লোকজন থাকলেও কারও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দত্তবাড়ির হাট করে খোলা বিরাট সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-উদিক চাইছে দীপক, যদি বাড়ির কারও দেখা মেলে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বছর চল্লিশ বয়সী ফুলপ্যান্ট-শার্ট পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন বাড়ির ভিতর থেকে। তাঁর হাতে একটা থলি। তিনি থমকে দাঁড়ালেন দীপককে দেখে।

দীপক অমনি এগিয়ে গিয়ে বলে, চুনিলালবাবুর খোঁজে এসেছিলাম।

আমিই চুনিলাল দত্ত। জবাব দেন ভদ্রলোক।

নমস্কার। আমি দীপক রায় বোলপুর থেকে আসছি। সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের রিপোর্টার। আপনাদের এই বাড়ি নিয়ে কিছু লিখতে চাই। বীরভূম জেলার প্রাচীন অট্টালিকাগুলো নিয়ে একটা সিরিজ লিখছি বঙ্গবার্তায়। আপত্তি না থাকলে আপনাদের বাড়িটা যদি একবার ঘুরিয়ে দেখান মানে ভিতরটা আর বাড়িটার হিস্ট্রি কিছু বলেন তো ভাল হয়।

চুনিবাবু বিব্রত ভাবে বললেন, লিখুন। আপত্তির কি আছে? তবে এখন একটা জরুরি কাজে বেরুচ্ছি। আপনি বরং একটু ঘুরে আসুন। নয়তো অপেক্ষা করতে পারেন নিচে বসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। তখন দেখাব, বলব।

দীপক ভাবল, অচেনা গাঁয়ে পথে পথে ঘুরব কোথায়? তার চেয়ে বরং ভিতরে থাকলে কিছুটা দেখে নেওয়া যাবে বাড়িখানা। সে বলল, ভিতরেই বসে অপেক্ষা করি বরং।

বেশ। মহাদেব মহাদেব। ডাক দিলেন চুনিলাল।

একটু বাদে একজন মাঝবয়সী, ধুতি-গেঞ্জি পরা শ্যামবর্ণ জোয়ান পুরুষ হাজির হলো সেখানে।

এই বাবুকে নিচে বেঞ্চিতে বসা। আমি ফিরে এসে কথা বলব। নির্দেশ দিয়ে চুনিলাল হনহন করে চলে গেলেন।

মহাদেব দীপককে নিয়ে ভিতরে ঢোকে। মস্ত সিমেন্ট বাঁধানো চৌকো চত্বর ঘিরে চারপাশে উঁচু খোলা বারান্দা। বারান্দার লাগোয়া সার সার ঘর। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় ওঠে দীপক মহাদেবের পিছু পিছু। বারান্দায় দুটো কাঠের বেঞ্চি পাতা—পিঠে ঠেসওলা চওড়া বেঞ্চি। তারই একটা দেখিয়ে মহাদেব বলল, বসুন আপনি। আমার কাজ আছে, যাচ্ছি। নিচতলায় কোণের দিকে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো মহাদেব। দীপক একা বেঞ্চিতে বসে রইল। একতলায় আর কারও দেখা পাওয়া গেল না। তবে দোতলায় যে লোক আছে বোঝা যায়। কারণ দোতলার বারান্দায় দড়িতে শাড়ি শুকোচ্ছে। স্ত্রীকণ্ঠের কথাও শোনা গেল বারকয়েক।

দীপক বসে বসে লক্ষ্য করে। দোতলার প্যাটার্নটা একতলারই মতন। তবে বারান্দায় লোহার গ্রিলের রেলিং দেওয়া। নিচের তলার কিনার ঘেঁষে মোটা মোটা গোল থাম দোতলার বারান্দার ভার বইছে। থামগুলোর গায়ে সুন্দর নকশা। তবে সে সব কারুকার্য দীর্ঘদিনের অবহেলায় বিবর্ণ চটা ওঠা। এই অট্টালিকা

একদা বহু খরচে সযত্নে বানানো হয়েছিল কিন্তু আজ এর দশা অতি জীর্ণ। উল্টো দিকের বারান্দায় আর এদিককার এক কোণে লম্বা লম্বা মোটা বাঁশ দিয়ে মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঠেকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওইসব জায়গায় ছাদ বসছে।

দীপক উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করে। নিচের ঘরগুলোর বেশির ভাগ দরজা বন্ধ। বারান্দায় একটা মস্ত কাঠের টেবিল। তার মাথায় গোল শ্বেতপাথর লাগানো। মূল্যবান কাঠে তৈরি টেবিল নিশ্চয়। ভালো পালিশ পড়লে আর দাগ লাগা পাথরটা পুঁছলে টেবিলের চেহারাটা দেখার মতন হবে সন্দেহ নেই। এমন ফার্নিচার এ বাড়িতে নিশ্চয় অনেক আছে।

একটা ঘরের আধখোলা দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দীপক দেখল যে ঘরে একটা পালঙ্ক পাতা। পালঙ্কে মশারির কাঠের স্ট্যান্ডগুলোয় সাপের মতো প্যাঁচালো কারুকাজ। কিন্তু পালঙ্কে বিছানো একটা ছেঁড়াখোঁড়া গদি।

হলঘর টাইপের একটা বড় ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে ঘরে ঢুকে একবার পর্যবেক্ষণের মতলবে ইতস্তত করছে দীপক এমন সময়—কি বাড়িটা দেখতে এসেছেন? ধীর ভরাট গলার কথা পিছনে শুনে চমকে ফিরল দীপক। দেখল, এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। সাত-আট হাত তফাতে দাঁড়িয়ে। মুখে স্মিত হাসি।

বৃদ্ধের রং ফর্সা। দোহারা গড়ন। সুশ্রী চোখ-মুখ। মাথায় অর্ধেক টাক আর অর্ধেক সাদা ধবধবে চুল। পরনে ফতুয়া আর ধুতি। খালি পা।

ওই ঘরটা দেখার ইচ্ছে? হাসিমুখে জানতে চান বৃদ্ধ।

হ্যাঁ ভাবছিলাম তাই। সঙ্কুচিত ভাবে জানায় দীপক।

বেশ। আসুন দেখাচ্ছি। বৃদ্ধ দরজার দিকে এগোন দীপকের পাশ কাটিয়ে।

আজ্ঞে আপনি? দীপক জিজ্ঞেস করে।

আমি? আমি এ বাড়িরই একজন। আসুন। এর বেশি বলেন না বৃদ্ধ। হয়তো এর বেশি বলতে চান না কোনো কারণে। তা যাকগে—

বৃদ্ধ ঘরের ভিতর পা দিয়ে বলেন, এই ঘরটা দত্তবাড়ির বৈঠকখানা ছিল। লোকজন বসত। জলসা হতো। আবার এ ঘরটাকে দত্ত ফ্যামিলির অ্যালবামও বলতে পারেন। না না, ফোটোগ্রাফ নেই। আছে দত্ত পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রায় সব কর্তাদের পোর্ট্রেট। হাতে আঁকা ছবি। ওই দেখুন।

দীপক দেখল, ঘরের একদিকের দেয়ালে বেশ উঁচুতে পরপর ঝুলছে মস্ত মস্ত প্রতিকৃতি। নানান পোশাকে সজ্জিত, নানান ভঙ্গিতে আঁকা ছবির মানুষগুলি। প্রতিটি ছবির ফ্রেম দামী চওড়া কাঠ বা পেতলে বাঁধানো।

এক নজরে পোর্ট্রেটগুলি দেখে নিয়েই দীপকের চোখ ঘুরতে থাকে হলঘরের অন্য বস্তুগুলির ওপর।

প্রথমেই তার দৃষ্টি গেল ছাদ থেকে টাঙানো একটা মস্ত ঝাড়লণ্ঠনের দিকে। এমন চমৎকার বেলোয়ারী কাচের ঝাড়বাতি সে আগে দেখেনি কখনো। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো চেয়ার টেবিল টুল এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই চমৎকার কারুকার্য করা পুরনো আমলের দামী কাঠে তৈরি মূল্যবান আসবাব। ঘরের একধারে দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা তক্তাপোশের ওপর একখানা পুরু দামী কার্পেট বিছানো রয়েছে। তবে সেটি বহু পুরনো এবং জায়গায় জায়গায় লোমওঠা। একদিকের দেয়ালে একখানা বিরাট আয়না ঝোলানো। একটা স্তব্ধ দেয়ালঘড়িও ঝুলছে। ঘরের আয়না আসবাব ছবি, সব কিছুতেই ধুলোর আস্তরণ। ছাদে ঝুল। মেঝে নোংরা।

বৃদ্ধ একমনে মুগ্ধ চোখে দেখছেন দত্ত পরিবারের ছবিগুলি। তিনি দীপককে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই প্রথম ছবিটা হচ্ছে ঈশ্বর মণীন্দ্রলাল দত্তের। উনিই এই বাড়ি তৈরি করেন। ওঁর উদ্যোগেই দত্ত পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা। বাকিগুলো দত্ত বংশের অন্য পুরুষদের ছবি। আরও একজনের পোর্ট্রেট আছে। এখানে নেই, দোতলায়।

দীপক লক্ষ্য করে যে দত্তদের ছবিতে চেহারায় একটা মিল আছে। এমনকি চুনিলালবাবু এবং এই বৃদ্ধের চেহারাতেও সেই মিল পাওয়া যায়।

বৈঠকখানাটা দেখে নিয়ে আরও দুটো ঘরে ঢুকল দু'জনে। বোঝা যায় যে ঘরগুলো ইদানীং ব্যবহার করা হয় না। পরিষ্কার করাও হয় না। তবে দুটো ঘরেই কয়েকটা পুরনো আমলের ভালো ফার্নিচার রয়েছে। একটা ঘরে মেঝে থেকে ছাদ অবধি বাঁশের ঠেকা। অর্থাৎ এই ঘরেরও ছাদ নামছে তাই ঠেকা দেওয়ার ব্যবস্থা।

দীপক বলল, এই বাড়ির হাল দেখছি কয়েক জায়গায় বেশ খারাপ।

হুঁ। বিষণ্ণ ভাবে সায় দেন বৃদ্ধ, কত কালের বাড়ি। বহু বছর মেরামত হয়নি।

যদি ভেঙে পড়ে? ঘরে ঘরে এত ফার্নিচার, ছবি, এগুলোর কি হবে?

জানি না! বৃদ্ধ বেশ মনমরা হয়ে পড়েন যেন।

ঘরের বাইরে এসে বৃদ্ধ বলেন, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এ বাড়ি গমগম করত। আজ দেখছেন কেমন খাঁ খাঁ করছে।

দীপক এবার তাক বুঝে সম্পাদক কুঞ্জবিহারীর শেষ অনুসন্ধানটির খোঁজ নেয়, আচ্ছা এই বাড়িতে যে কত লোক ছিলেন জীবনভোর, তাঁরা কি সবাই এ বাড়ির মায়া ত্যাগ করতে পেরেছেন পরলোকগত হয়েও?

কে জানে? বৃদ্ধ উদাসভাবে বলেন।

উৎসাহিত দীপক বলে, আচ্ছা এ বাড়িতে কোনও প্রেতাত্মা মানে ভূত-টুত আছে নাকি? তেমন কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়?

ভূত? বৃদ্ধ ভুরু কুঁচকিয়ে তাকান।

হ্যাঁ, মানে এই গ্রামের একজন বলছিল বোলপুরে—তাদের নাকি রাতে এ বাড়িতে ঢুকতে এখন ভয় লাগে।

বৃদ্ধ থমথমে মুখে গম্ভীর স্বরে বললেন, দেখুন মশাই, আমি বহু বছর এই বাড়িতে আছি। ভয়ের কিছু দেখিনি। শুনিওনি। যত বাজে লোকের রটনা।

বৃদ্ধের মনে ঘা লেগেছে বুঝে দীপক তাড়াতাড়ি কথা ঘোরায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। তা দোতলাটা একবার দেখলে হতো।

সরি। এখন ওপরে যাব না। চুনিকে বলবেন বরং যদি দেখায়। চলি। বৃদ্ধ ধীর পায়ে হেঁটে বারান্দার কোণ ঘুরে আড়ালে
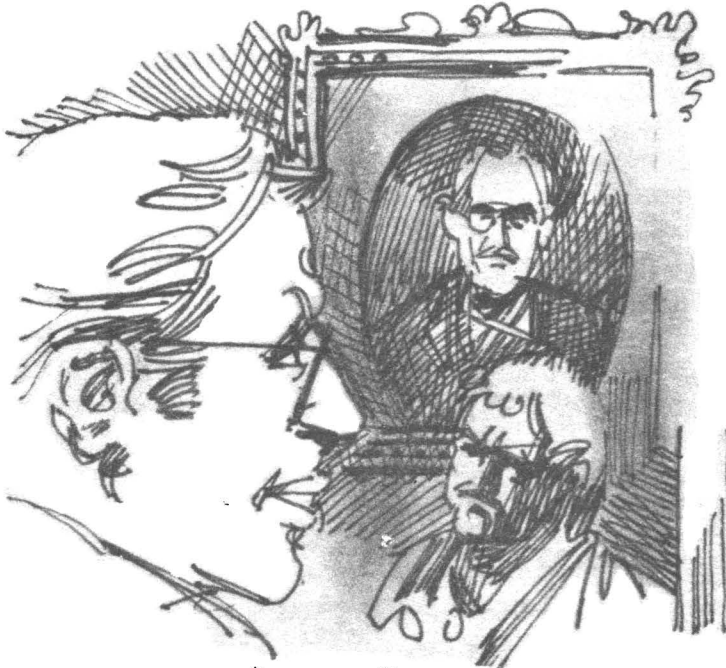
একটা অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে।

চলে গেলেন।

যাঃ ভদ্রলোক চটে গেলেন বোধহয় ভূতের প্রসঙ্গ তুলতে। যাকগে। দীপক এবার সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় চুনিলালের প্রতীক্ষায়।

চুনিলাল মিনিট দশেক বাদেই ফিরলেন। দীপককে দেখে বললেন, ও আপনি এখনো রয়েছেন! চলুন চলুন দেখাচ্ছি।

একতলার বারান্দায় উঠে দীপক বলল, নিচতলাটা দেখে নিয়েছি মানে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কে? অবাক হলেন চুনিলাল।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নাম বললেন না। বললেন, এই বাড়িরই একজন। ফর্সা। মাঝারি হাইট। টাক মাথা।

বুঝেছি, বিশ্বনাথ কাকা।

কে তিনি?

আমাদের নায়েব ছিলেন। সম্পর্কে আমাদের আত্মীয়ও বটেন। এখনো যেটুকু জায়গা-জমি আছে আমাদের আর এই ঘরবাড়ি—উনিই দেখাশোনা করেন। আমরা আর থাকি কতটুকু? তা ওঁকে এ বাড়িরই একজন বলা যায় বৈকি। আগে এ বাড়িতেই থাকতেন। এখন কাছেই নিজের বাড়ি করে আলাদা থাকেন ফ্যামিলি নিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে দীপক সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, শুনলাম এই বাড়ি ভেঙে ফেলে আপনারা নতুন বাড়ি বানাবেন?

হুঁ তাই প্ল্যান। মশাই এই বাড়ি রক্ষা করা আমাদের সাধ্যি নেই। ভালোমতো মেরামতির প্রচুর খরচ। ভেবেছি, আমি আর দাদা এই জমিতেই দুটো আলাদা আলাদা ছোট বাড়ি বানিয়ে নেব। এ বাড়ির দরজা-জানলার কাঠ-টাটগুলো পাওয়া যাবে।

এত ফার্নিচার, ছবি-টবি, এগুলোর কি হবে?

কিছু ফার্নিচার বিক্রি করে দেব। তবে ফ্যামিলি পোর্ট্রেটগুলো রাখতে তো হবেই।

কবে ভাঙছেন এ বাড়ি?

দেরি আছে। দাদার সঙ্গে বসে ঠিক করব। টাকার যোগাড়ও করতে হবে।

দোতলার ঘরের ও বারান্দার আসবাব মোটামুটি দেখতে দেখতে দীপক বলল, বিশ্বনাথবাবু বলছিলেন যে দোতলাতেও আপনাদের ফ্যামিলির একজনের পোর্ট্রেট আছে।

হ্যাঁ এই ঘরে। আমার বাবার ছবি।

ঘরটা মনে হলো লাইব্রেরি ঘর। ঘরে প্রচুর বই। দেয়ালে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটা অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে। বেশ বড় সাইজের পোর্ট্রেট। তবে নিচের পোর্ট্রেটগুলোর মতো অত বড় নয়। বুক অবধি আঁকা ছবিটা। চুনিবাবু দেখালেন, আমার বাবা শোভনলাল দত্ত।

চুনিবাবুর বাবার ছবির ওপর চোখ পড়তেই দীপক চমকে ওঠে। আরে এ যেন বিশ্বনাথবাবুর মুখ। সে প্রশ্ন করে, আপনার বাবা তো শুনছি গত হয়েছেন?

হ্যাঁ। চার বছর আগে। আটাত্তর বছর বয়সে। এমনি ভালোই ছিলেন। এ বাড়িতেই কাটিয়েছেন সারা জীবন। হঠাৎ চলে গেলেন হার্ট অ্যাটাকে। মা এখন থাকেন দাদার কাছে।

আপনার বাবার সঙ্গে বিশ্বনাথবাবুর চেহারার ভীষণ মিল আছে তো!

চুনিবাবু দোনামনা ভাবে বললেন, হুঁ আছে মিল। কিন্তু বাবার নাক আরও চোখা ছিল। চোখও একটু বড়। বিশুকাকার মুখ একটু গোলচে। বাবার ছিল লম্বাটে। আর বিশুকাকা বাবার তুলনায় একটু রোগাও। তবে রং দু'জনেরই ফর্সা। হাইট প্রায় একই। মুখেও দু'জনের আদল আছে বটে।

এ বাড়িতে আর কেউ আছে আপনার বাবার মতন দেখতে?

না তো।

দীপক আর কথা না বাড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখে চুনিবাবুর বাবার ছবিখানা। নিচে যাঁকে দেখেছে দীপক, যাঁর সঙ্গে ঘুরেছে সে—এ যে হুবহু তাঁর মুখ। সেই নাক চোখ ঠোঁট চিবুক। এমনকি ঠোঁটের কোণে তেমনি চাপা হাসি। সেই বৃদ্ধ স্বয়ং শোভনলাল না হয়ে যান না। কিন্তু তাহলে? দীপক থ হয়ে যায়। বলতে গিয়েও আসল ব্যাপারটা সে চেপে গেল। কি দরকার? ভয় পাবেন। তবে বঙ্গবার্তায় সত্যি ঘটনাটা লিখতে হবে বৈকি। চুনিলাল বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে কথা বললেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথবাবু দীপককে দেখাননি ঘুরিয়ে। চুনিলাল তখন নিশ্চয় ভাববেন তবে কে? কে দেখাল? লোকটিকে দেখতে আবার অবিকল স্বর্গীয় শোভনলালের মতন। চুনিলাল কি আঁচ করতে পারবেন না ব্যাপারটা? ঠিকই পারবেন।

ছবিঃ অরূপ ব্যানার্জী

কোঠ কল্লাঁওয়ালা

অনিন্দ্য গোস্বামী

হেলিকপ্টারের দরজা খুলতেই লাফিয়ে নামি। এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে হাতিয়ার, পিঠে রুকস্যাক। পায়ের তলায় মাটি নরম ঠেকে, খানিকটা বসে যায় যেন। দূরে দাঁড়ানো সৈন্যদের একজন দৌড়ে আসে, আমার দিকে হাত বাড়ায়। সুটকেস আর রুকস্যাক বাড়িয়ে দিই ওর দিকে। হেলিকপ্টারের আওয়াজকেও ছাপিয়ে সতনাম চেঁচায়, সৎ শ্রী অকাল সাব।

সৎ শ্রী অকাল। আমি হাসি। দাঁড়িয়ে সৈন্যদের ওঠানামা দেখি।

আপনি এগোন সাব। সতনাম বলে, আমি দেখছি এদিকটা।

আমি ওর কথায় কান না দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকি। আমার কোম্পানিতে এসে পড়েছি, ব্যস।। এখন থেকে আমিই অধিনায়ক। চলে যাওয়া সৈন্যদের মুখগুলো একদৃষ্টে দেখতে থাকি। এক সময় হেলিকপ্টারের দরজা বন্ধ হয়, ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে যায়, রোটর আরো জোরে ঘুরতে শুরু করে, চারদিকে ঝড়ের মতো ধুলো ওড়ে। আমি টুপি চেপে ধরে নিচু হয়ে দৌড় লাগাই, অন্য সৈন্যরাও। হেলিপ্যাড থেকে ঐ দূরে সিগনালের তাঁবুটাও প্রচণ্ড জোরে ওড়ে, যেন প্রায় পোল থেকে ছিঁড়ে আসবে।

চারদিকে ধুলোর ঘূর্ণিঝড় তুলে হেলিকপ্টার উড়ে চলে যায় পশ্চিমদিকে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে। আমি লক্ষ্য করি অভ্যর্থনা দল এগিয়ে আসছে। মৃদু হেসে ওদিকে এগোই, এত ভাল লাগে, যেন নিজের বাড়ি ফিরলাম। নাইন শিখ রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানি, এর অধিনায়ক আমি, ক্যাপ্টেন প্রিয়জিৎ রায়। সৈন্যবাহিনীর পদাতিক সেনার রেজিমেন্টাল লাইফ একটা অন্য ব্যাপার। বছরে দশটা মাস তো এখানেই কাটে, পরিবার-পরিজনের চাইতেও নিকট হয়ে ওঠে সহযোদ্ধারা। বিশেষত শ্রীলংকার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে সহযোদ্ধার দক্ষতা-আন্তরিকতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের জীবনের দায়িত্ব।

সুবেদার হরজিৎ সিং স্যালুট করে, সৎ শ্রী অকাল সাব।

কোম্পানির কি খবর সাব? আমি প্রশ্ন করি, সব ঠিক আছে তো?

হৌসলা বুলন্দ হ্যায় সাব! সুবেদার হাসে, হোর তুমি আ গয়ে নে!

আমি চলতে চলতে ছোট ছোট প্রশ্ন করি। সুবেদারের বক্তব্য হচ্ছে, কোম্পানির সৈন্যদের মনোবল যথেষ্ট ভালো আর অধিনায়ক স্বয়ং এসে পড়ায় তাদের মনোবল এবার তুঙ্গে উঠবে। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, মোট কতজন সৈন্য রয়েছে ক্যাম্পে?

বালুকাবেলার বালি উড়ে পড়ছে জলে। শ্রীলংকার পূর্ব উপকূলের এক জায়গায় আমাদের কোম্পানির ক্যাম্প। ছোট্ট একটুকরো, আধ কিলোমিটারের চেয়েও সরু একফালি বালুকাবেলা। তার ওপার থেকে সবুজ অরণ্য। তিনদিকে সমুদ্র আর একদিকে জঙ্গল। বড় অদ্ভুত এই ক্যাম্পের লোকেশান! ঐ ছোট্ট বালুকাবেলাটুকু ছেড়ে দিলে বাকি জায়গাটাতে সমুদ্রতীরে

শুধু রকফেস। ডুবো পাহাড় এবং তীক্ষ্ণ খাঁজকাটা রকফেসের জন্য এখানকার সমুদ্রতীর বিপজ্জনক।

আমরা খুঁজেপেতে অরণ্যদেবের স্বর্ণবেলা মার্কা এরকম একটা জায়গায় ক্যাম্প করেছি এক বিশেষ স্ট্র্যাটেজিগত কারণে। এই বালুকাবেলা ঘিরে আছে বিশাল এবং প্রায় অনতিক্রম্য পালমপাসি জঙ্গল। তার গভীরে কোথাও রয়েছে পাসিলন ক্যাম্প—টাইগার গেরিলাদের ফিল্ড হেডকোয়ার্টার। ভারতীয় শান্তিসেনার হেডকোয়ার্টার এবং স্থানীয় নাগরিক সকলের মনেই পাসিলন ক্যাম্প সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব অনেকরকম উপকথা বাসা বেঁধে আছে। ক্যাম্প থেকে সমুদ্রপথে ছিটকে বেরোবার মূল রাস্তা এইটে। তেমনই পাসিমানার খাঁড়ি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র-ভর্তি ফেরিবোট আনতে হলে সমুদ্রপথের এই অংশ ব্যবহার করতে হবে। আর ক্যাম্পে বসে আমরা সেই সমুদ্রপথের ওপর নজরদারি করতে পারি।

ক্যাম্পে ফিরে সবে গাছের গুঁড়ি-কাটা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চা আনতে বলেছি এমন সময় রেডিও বীপ বীপ করে ওঠে। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই শুনি কর্নেলের কণ্ঠ, মাইক ফর শেরা, ওভার!

শেরা হিয়ার। শেরা হিয়ার। পাস ইওর মেসেজ ওভার।

শেরা নাকি হে? ওপারে কর্নেল স্ট্রানজেনের গলা গমগম করে, কেমন আছ? কলকাতার কি খবর? জয়নগরের মোয়া এনেছ?

কর্নেল মাইকেল স্ট্রানজেন আমাদের নাইন শিখ রেজিমেন্টের কমানডিং অফিসার। সমরবিজ্ঞানের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র হিসেবে মিলিটারি অ্যাকাডেমির ইতিহাসে রেকর্ড নম্বর পান। বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ উনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েলের মতো দেশের মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে ওনাকে লেকচার দিতে ডেকে নিয়ে যায়। তবে ছোটবেলাটা কেটেছে কলকাতায় ইলিয়ট রোডে। তাই নাহুমের পেস্ট্রি, পুঁটিরামের জলভরা, জিমিস কিচেনের প্রন গারলিক সস ওঁকে আজো স্বপ্নপ্রবণ করে তোলে। আমি এখান থেকে যাবার আগে উনি বলেছিলেন এক বাক্স জয়নগরের মোয়া নিয়ে আসতে শিয়ালদা বাজারের সতীশ ময়রার দোকান থেকে।

এনেছি। আমি রেডিওতে বলি, ওরিজিনাল সতীশ ময়রা। ওভার।

ঠিক আছে। নিজের জায়গা দেখে নাও। আমি শীঘ্রই আসব। ওভার অ্যান্ড আউট।

কর্নেল ওপারে রেডিও রেখে দেন। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। সতনাম ইতিমধ্যে চা নিয়ে এসেছে। আমি ওকে বলি, শীগগির সুবেদারকে ডাকো।

সতনাম মৃদু হাসে। বলে, চা নিন সাব। ডাকছি।

সিপাহী সতনাম সিং আমার পুরোনো আর্দালি। খানিকটা গার্জেনও বটে। ও জানে, আমার একটু তড়বড় করা স্বভাব। তাই ও নিজে খানিকটা ধীরেসুস্থে করে। কোম্পানির সৈন্যরা নাকি পেছনে বলে, সতনাম সিং ক্যাপ্টেন সাবকা স্পিড অ্যাডজাস্ট কর দেতা হ্যায়।

আমি ঢকঢক করে চাটুকু খেয়ে নিই। ইতিমধ্যে সুবেদার আসে। আমি বলি, সাব। কর্নেল সাব আসছেন পরিদর্শন করতে। এক্ষুণি সব ব্যবস্থা কর। সুবেদার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে।

আমি বলি, লেফটেনান্ট কোথায়? উনি ফিরলেই আমার কাছে পাঠাও।

সুবেদার এবার ইতস্তত করে। আমার প্রশ্নের উত্তরে আমতা আমতা করে বলে, লেফটেনান্ট সাহেব তো বাইরে গেছেন অ্যামবুশে। টহলদারি করতে। উনি ফিরলেই ওঁকে রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে ফেরত পাঠাতে হবে, ওপর মহলের নির্দেশ।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি।

আমাদের রেজিমেন্ট দ্বীপরাষ্ট্রে এসেছে প্রায় দশ মাস। মাসখানেক আগে আমি একটা ট্রেনিং কোর্স করতে ভারতে যাই। তিন সপ্তাহের কোর্স এবং এক সপ্তাহের ছুটি। এই এক মাসের মধ্যে কোম্পানির অধিনায়ক হিসেবে হেডকোয়ার্টার থেকে তিনজনকে পাঠানো হয়েছে। কেউই আট-দশ দিনের বেশি থাকেনি। পৃথিবীর প্রাচীনতম অরণ্যের এই গহীনতম প্রান্তে মাসের পর মাস থাকতে হলে কয়েকটা জিনিস একান্ত দরকার। ফিজিক্যাল টাফনেস, মেন্টাল রোবাস্টনেস এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে সৈন্যদের সঙ্গে একাত্মবোধ।

আমি বলি, ঠিক হ্যায় সাব। লেফটেনান্ট তো চলে যাবেন। ক্যাম্পে যেসব সৈন্য থাকবে, তারা যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে পরিদর্শনের জন্য।

সুবেদার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি চুলকোয়। আমি ধমকে উঠি, কি হলো, সাব?

সৈন্য কোথায় সাব? সুবেদার মৃদু-স্বরে বলে।

পরদিন সকালে কর্নেলকে সেকথাই বলি। বালুকাবেলা শেষ হয়ে যেখানে অরণ্যরেখা শুরু, তার থেকে কয়েকশো গজ ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় ক্যাম্প। মাটি খুঁড়ে, সেই খোঁড়া গর্তের মধ্যে তাঁবু। চারদিকে পরিখা কাটা রয়েছে, পরিখা এবং তাঁবুর গর্তের ধারে খুঁড়ে তোলা মাটির তৈরি দেওয়াল। বাইরের দিকে রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, গাছে গাছে সশস্ত্র প্রহরীর অবজার্ভেশান পোস্ট। আমার তাঁবুর সামনে মাটির তৈরি বেদি, ওপরে গাছের ছালের কভার। সেখানে বসে কর্নেল স্ট্রানজেন চুরুট চিবোন, কতজন সৈন্য দরকার তোমার?

স্যার। চিরাচরিত যুদ্ধপ্রথায় আমার দরকার আশিজন সৈন্য, গেরিলা যুদ্ধে অন্তত একশো দশ।

কর্নেলকে বোঝাতে চেষ্টা করি। এটা গেরিলা যুদ্ধ, সাধারণ যুদ্ধের মতো নয়। এখানে কে শত্রু তা জানা নেই, তার আস্তানা এলাকাও নির্দিষ্ট নয়। কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই, চারপাশে শত্রু। তাছাড়া, এটা সারা দিনরাতের লড়াই। রাতে টহলদারি অ্যামবুশ সেরে সৈন্যরা ক্যাম্পে ফিরে বিশ্রাম করতে পারে না। তাদের আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডিউটিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়।

আনডার-স্টাফিং। কর্নেল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দেন, ফৌজে এটা চিরকালীন সমস্যা। যুদ্ধের সময় আরো বেশি। আজকাল ইয়াং ছেলেরা নাকি

ফৌজে আসতে চায় না। দেশাত্মবোধ ব্যাপারটাই আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। চলো, দেখি তোমার সৈন্যদের...

বড় বড় পায়ে এগিয়ে যান দীর্ঘদেহী মানুষটি। কোম্পানির সৈন্যদের একটি ছোট্ট দল ফল-ইন করে সমবেত। সুবেদার চিৎকার করে কমান্ড দেয়, স্কোয়াড। সা—বধান!

কর্নেল হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন, নাইন শিখ রেজিমেন্টের বাহাদুর জওয়ান। কোনো কষ্ট আছে, অসুবিধে, ক্ষোভ?

নেহি সাব। সৈন্যরা মৃদুস্বরে বলে।

ফিসফিস করছ কেন? ঠিক করে বল, এই লড়াইয়ে কি হবে?

হাম জিতেঙ্গে, সাব। গর্জন করে ওঠে শিখসৈন্য।

কর্নেল হাসিমুখে ফেরেন নিজস্ব কায়দায় সমস্যার সমাধান করে। ওনার হেলিকপ্টার উড়ে চলে যাবার পর আমি আর সুবেদার মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। কর্নেল বলে গেছেন, এই অঞ্চলে নাকি গেরিলাদের আনাগোনা বেড়েছে। ধারালো রকফেস, ডুবো পাহাড় থাকা সত্ত্বেও তারা এই অঞ্চল দিয়ে পাসিলন ক্যাম্পে অস্ত্র আমদানি করছে।

কি করছ মাই বয়? কর্নেল কাঁধ চাপড়ে দিয়েছিলেন, গীয়ার আপ। গীয়ার আপ—গেট দেম।

সাব। এখন ফাঁকা হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে আমি সুবেদারকে বলি, আমি অ্যামবুশ টহলদারিতে যাব আজ। আপনি ক্যাম্পে থাকবেন। আমাকে যে কটা পারেন, সৈন্য দিন। বেশি চাই না।

হেলিপ্যাড বালুকাবেলায় অবস্থিত বলে, বিশেষভাবে তৈরি ইস্পাতের বিশাল বিশাল প্লেট পেতে হেলিকপ্টার নামবার ফার্মবেস বানানো হয়েছে। তার ওপর সুবেদার অ্যাটেনশনে দাঁড়ায়। ধাতব প্লেটে বুটের নালের সংঘর্ষে কড়াং শব্দ ওঠে। ও বলে, সাব। ক্লান্ত ঘোড়াকে চাবকালে সে কি আর দৌড়োয়?

মানে?

অপরাধ নেবেন না সাব। আপনার অর্ডারই শেষ কথা, সৈন্যদের তৈরি করছি।
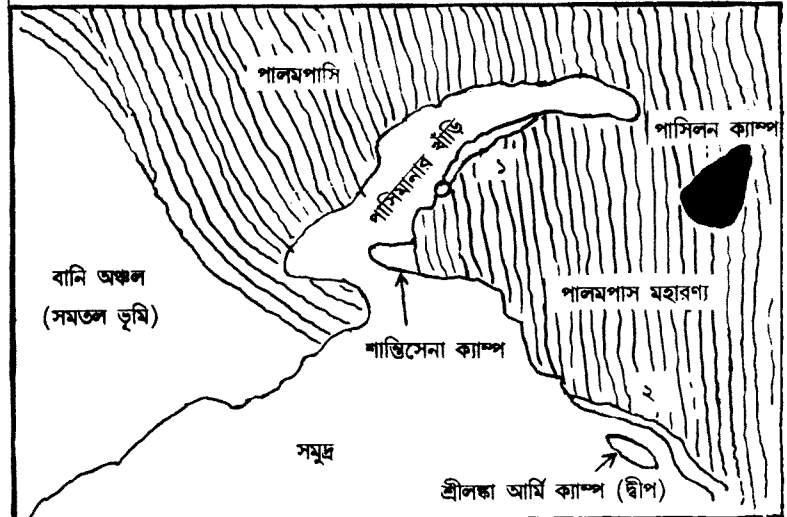
ঠিক এমন সময় রেডিওবাহী সৈন্য দৌড়ে আসে। ব্যাটেলিয়ান হেডকোয়ার্টার খবর দিচ্ছে যে, আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে এক প্লাটুন সৈন্য আসছে এখানে। রি-ইনফোর্সমেন্ট।

দুই

শ্রীলংকার যুদ্ধটা একটু অন্যরকমের। মূলত সিংহলি সৈন্যবাহিনী এবং তামিল গেরিলাসেনার মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে শান্তিসেনার এদেশে আসবার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই তামিল গেরিলাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ল ভারতীয় সেনা। আর দুই দেশের সরকারের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি অনুযায়ী শ্রীলংকা [সিংহলি] সেনা ফিরে গেল ব্যারাকে।

নতুন এক প্লাটুন সৈন্য আসবার পর আমরা বেশ বহাল তবিয়তে। এরা অনেক সতেজ, চনমনে এবং উৎসাহী। একদিন দুপুরে ওরা ভাংড়া নাচের আসরও বসায়। আমি গাছের গুঁড়িতে বসে দেখতে দেখতে ফিসফিস করি, নাচে তো ভালই দেখছি। কাজ কেমন করবে?

দারুণ প্লাটুন সাব। সুবেদার ফিসফিস করে, গুলি করে মাছি মারতে পারে এরা। ক্র্যাকশট সব কটা।

গুড। এদের ভাগ করে দাও বিভিন্ন গ্রুপে। কোম্পানির সৈন্যরা উদ্বুদ্ধ হবে।

সন্ধ্যেবেলা টেন্টে বসে রেডিওর নব ঘোরাই। পুরো উত্তর এবং পূর্ব প্রদেশে ঘনঘোর যুদ্ধ চলেছে। আমার এলাকা তুলনায় শান্ত। আশেপাশের জঙ্গল ছাড়াও সৈন্যরা উত্তরে সমুদ্র উপকূলে সিংহলি ফার্ম সেটলমেন্ট এলাকা এবং দক্ষিণে তটরেখার তামিল গ্রামগুলিও চষে ফেলে। কিন্তু ঐ ঘোরাঘুরিই সার। গেরিলাসৈন্যের ছায়াও দেখতে পাই না আমরা। তবে কর্নেল রোজ বেতারে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন, সাবধান! হোশিয়ার, রায়। ওরা সাপের চেয়েও ভয়ানক, সবচেয়ে শান্ত মুহূর্তে ছোবল মারে—

রেডিওতে শর্টওয়েভে বিবিসি ধরবার চেষ্টা করি, প্রথমে বাংলা তারপর হিন্দী। সতনাম আসে চা নিয়ে। কিন্তু কাপ রেখে বেরিয়ে যায় না। টেন্টের মধ্যে এটা গুছোয়, ওটা নাড়াচাড়া করে ঠিক করে রাখে। কিছু অনুমান করে আমি বলি, কিরে? কিছু বলবি?

না সাব। মানে, হ্যাঁ সাব। একটা মুরগা কেস আছে।

সতনাম আমার খাস আর্দালি। আমি ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলি। বলি, কি ব্যাপার? আবার তোকে ধরেছে? কি চাই?

ছুটি চাইছে সাব। নতুন ছেলেদের একজন।

সাধারণত ফৌজী কানুন অনুযায়ী ছুটির আবেদনপত্র প্রথমে হাবিলদার, তারপর সুবেদার হয়ে আমার কাছে আসে। কিন্তু এখন হেডকোয়ার্টারের নির্দেশানুযায়ী ছুটিছাটা বন্ধ। নেহাৎ এমার্জেন্সি কারণ না হলে কাউকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে না। সেজন্যই হয়তো এই সৈন্যটির ছুটির আবেদনও আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি।

তোকে পেয়েছে ভালোই ওরা। আমি হাসি, সব কানুন এড়িয়ে—

না সাব। সতনাম চায়ের কাপ তুলে নেয়, আপনি ওর ইন্টারভিউ নিন। যদি মনে হয়, দেওয়া উচিত তবেই দেবেন, নইলে নয়। গরম জল দিয়েছি সাব, বাথরুমে—

হুঁ। আমি উঠে দাঁড়াই। বাথরুম একটা ছোট্ট টেন্ট, তার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও যায় না। স্নান করে এবার বেরিয়ে যেতে হবে, সারারাতের জন্য। জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকতে হবে, অন্ধকারে মিশে, গাছের পাতার চেয়েও নিঃশব্দে, গুঁড়ির সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। এরই নাম অ্যামবুশ, অর্থাৎ শত্রুর জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকা।

সৎ শ্রী অকাল সাব! লান্স নায়েক হরজিন্দার সিং আপকে ইন্টারভিউকে লিয়ে তৈয়ার শ্রীমান—

সাড়ে ছ'ফিট লম্বা সৈনিক নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। পরের দিন সকাল। আমি আমার গাছের গুঁড়িতে বসে। সারারাত ঘুম হয়নি, চোখ জ্বালা করে। আমি চোখ রগড়ে তাকাই ওর দিকে, ফ্যাঁসফেসে গলায় বলি, ছুটি চাইছ কেন?

সাব। বাড়ি যেতে চাই। অনেক দিন হলো—

তুমি কি জানো না হেডকোয়ার্টার ছুটি দিতে বারণ করছে?

সাব। যুদ্ধে আসবার পর আমার ছেলে হয়েছে। একবারও দেখিনি বাচ্চাটাকে।

চোখ কচলাতে কচলাতে এবার আমি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাই। দেখি লোকটা মাটির দিকে মুখ নামিয়ে তাকিয়ে। এমন সময় সতনাম আসে দৌড়ে। বলে, সাব। হেলিকপ্টারে ব্রিগেডিয়ার আসছেন। হেলিপ্যাডে নেমে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। এক্ষুণি খবর এল।

তড়াক করে আমি উঠে দাঁড়াই। হেলিকপ্টারের আওয়াজ ইতিমধ্যে বেশ স্পষ্ট। আমি চেঁচাই, কি হচ্ছে কি এসব? একটু আগে থেকে ওরা জানাতে পারেনি?

বেল্টটা কোমরে আটকাতে আটকাতে দৌড়োই হেলিপ্যাডের দিকে।

সন্ধ্যেবেলা সতনাম বলে, সাব। মনে হয়, হরজিন্দার ঠিক কথাই বলেছে। রেজিমেন্ট শ্রীলংকায় আসবার পর সত্যিই ওর বাচ্চা হয়েছে। এখনও বাচ্চার মুখ দেখেনি।

ফের ওকালতি করছিস? আমি হাসি, তুই ব্যাটা—

না সাব। ও তো কোঠ কল্লাঁওয়ালার ছেলে, তাই—

কোঠ—কি? আমি অবাক হই।

কোঠ কল্লাঁওয়ালা। সতনাম এবার অবাক হয়। সে কি সাব? জানেন না?

সেদিন সন্ধ্যায়, পূর্ব শ্রীলংকার সেই গহীন জঙ্গলে বসে সিপাহী সতনাম সিং আমাকে এক আশ্চর্য উপকথা শোনায়। পঞ্চনদীর দেশে শিখধর্ম প্রচার হওয়ার আগে থেকেই সেখানকার মানুষ ভয়ংকর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই প্রাত্যহিক জীবন কাটাত। সেজন্যই গোর্খা বা রাজপুতদের মতো শিখদেরও মার্শাল রেস বা যোদ্ধৃজাতি বলে গণ্য করা হয়। এই শিখদের মধ্যেও আবার একেকটি ছোট ছোট উপদল বীরত্বের জন্য নিজেদের একটি পৃথক আসন করে নিতে পেরেছে। যেমন কোঠ কল্লাঁওয়ালার লোকেরা। 'কোঠ' শব্দের অর্থ গ্রাম। যেমন, কোঠ কাপুরা, পুরো এলাকায় কাপুর বংশের লোকেরা বসবাস করে। তেমনই কোঠ মঙ্গট, কোঠ চাওলা, কোঠ রণধাওয়া ইত্যাদি।

কোঠ কল্লাঁওয়ালা হচ্ছে গুরুদাসপুর জেলার একটি গ্রাম, ডেরা বাবা নানক সীমান্তের কাছে। সেই গ্রামের প্রতিটি মানুষ নাকি সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা চিরকাল বীরত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে। মহাবীরচক্র, বীরচক্র বিজেতা যোদ্ধা সেখানে ঘরে ঘরে। ব্রিটিশ আমলে, পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির শিখ যোদ্ধারা রণসম্মান জয় করে এনেছে।

'দশমে পাদশাহ' গুরু গোবিন্দ সিংজী মহারাজ এখানেই তাঁর শিষ্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহের ফৌজেও অধিকাংশ সেনানায়কেরা কোঠ কল্লাঁওয়ালারই মানুষ ছিলেন।

মুনডা হ্যায় গা কোঠ কল্লাঁওয়ালা দা। সতনাম বলে হরজিন্দারের সমর্থনে।

এমন সময় বেতারবাহী সৈন্য আসে। কর্নেলের তলব। রিসিভার তুলতেই উনি গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, তৈরি হয়ে যাও, রায়। তামিল গেরিলাদের বেতারবার্তা ইন্টারসেপ্ট করে জানা গেছে, ওরা উত্তর সমুদ্রতটে সিংহলি ফার্ম এলাকা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার আনবে। পাচার করবে অরণ্যের গভীরে পাসিলন ক্যাম্পে।

ক্যা সাব? সতনাম বলে, ফৌজ এই পাসিলন ক্যাম্পটা ধ্বংস করছে না কেন? তাহলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়।

বকওয়াশ কোর না। ওকে ধমকাই। ওপরতলার কাজের পদ্ধতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা ফৌজে নিষিদ্ধ। চোখ কচলাতে কচলাতে বলি, যাও। আমার প্যাক তৈরি করো। আর সুবেদারকে ডাকো।

কিন্তু সেদিন রাতেও খালি হাতে ফিরতে হয় আমাদের। মাইলের পর মাইল জঙ্গল ভেঙেও কোনো গেরিলা সৈন্যদলের চিহ্ন খুঁজে পাই না আমরা।

তিন

অবশেষে হেডকোয়ার্টার অনুমতি দিল দশজন সৈন্যকে ছুটি দেবার।

তার মধ্যে হরজিন্দার সিংও আছে। যদিও সুবেদার এবং হাবিলদাররা অসন্তুষ্ট, তবু সতনামের কথার দাম রাখতেই ওকে ছুটি দিলাম। ও নতুন দলের সৈন্য, পুরনোদের অনেকেই এখনও ছুটি পায়নি, তবু ঐ বাচ্চা হয়েছে, এসব শুনে আর আটকাতে চাই না ওকে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে অস্ত্রাগারের সামনে সৈন্যরা বসে। ওরা গান গায়। আমি উঠে

ওদিকটায় যাই। দেখি নতুন প্লাটুনের সৈন্যরা নিচুস্বরে গান গাইছে। সতনাম বলে, ওরা বেশির ভাগই কোঠ কল্লাঁওয়ালার ছেলে। তাই খুব মিল ওদের।

আমি ওখানে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়াই। ওদের হাবিলদার একটা ক্যাম্পচেয়ার এনে দেয়। একটি ছেলে লাফ মেরে উঠে ঘুরে ঘুরে গান গায়—

উথোঁ আয়া সী মুনডা কোঠ
কল্লাঁওয়ালা দা—

ইথোঁ গয়া সী মুনডা কোঠ কল্লাঁওয়ালা
দা—

বোলে, বোলে। বাকি সৈন্যরা হর্ষধ্বনি করে ওঠে। দুজন সৈন্য উঠে চরকি লাট্টুর মতো বন বন করে ঘোরে। মূল গায়ক আবার গায়,

ফৌজ গয়া সী ইথোঁ, কোঠ
কল্লাঁওয়ালা দা—

রাতে সুবেদার হরজিৎ সিং আসে। সঙ্গে একটা নতুন ছেলে। সতনাম তখন আমার মশারি টাঙাচ্ছে। ও বলে, সাব! এই জার্নেল বলছে, হরজিন্দারকে পাকাপাকি ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দিতে। ছুটির পর ওকে এখানে আনার দরকার নেই। ও নাকি একদম বেকার, ফালতু—

নতুন ছেলেটা, জার্নেল আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলে, সাব। আমরা কোঠ কল্লাঁওয়ালার ছেলে। হরজিন্দারদের হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর বাপের জন্য পঁয়ষট্টির যুদ্ধে একত্রিশ নম্বর শিখ রেজিমেন্টের নাক কাটা যায়—

মানে? সুবেদার ভ্রূ কুঁচকোয়, কি নাম ওর বাপের?

কোম্পানি হাবিলদার মেজর নায়েব সিং—

হুঁ। ঘটনাটা জানি। সুবেদার মাথা নাড়ে, কিন্তু সে তো হেডকোয়ার্টারের অর্ডার ছিল। ওর কি দোষ?

না সাব। কোঠ কল্লাঁওয়ালার প্রত্যেকটা বাচ্চাও জানে। নায়েব সিং-এর প্লাটুন অ্যাটাক করলে, সেদিনই লাহোর রোডে পাকিস্তান আর্মির সুলতানগঞ্জ পোস্টের পতন হতো, একত্রিশ শিখের জয়জয়কার হয়ে যেত—

কি বলছিস? সুবেদার বলে, জানিস? বুদ্ধি করে কাজ করবার জন্য হেডকোয়ার্টার নায়েব সিং-এর প্রশংসা করে।

না সাব। জার্নেল একগুঁয়ের মতো বলে, আমরা কোঠ কল্লাঁওয়ালার ফৌজ লড়াই করি জেতার জন্য, প্রাণ বাঁচিয়ে বাহবা কুড়োবার জন্য নয়। পঁয়ষট্টির ঐ প্লাটুনে সব আমার গ্রামের লোকেরা ছিল। ওরা বলে, হরজিন্দারের বাপ সেদিন জান ঝুঁকি রাখেনি বলেই রেজিমেন্ট ফতেহ করতে পারেনি।

ওদের বিদায় করে চটপট বিছানায় ঢুকি। পরপর বেশ কয়েকদিন রাতে ঘুম হয়নি, ক্যাম্পের বাইরেই রাত কেটেছে। আজো যে ঘুম হবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই, যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি হতে পারে। মেশিনগান রাখা থাকে বিছানাতেই বাঁদিকে, যাতে মুহূর্তের রিফ্লেক্সে ডান হাতে তুলে নেওয়া যায়। কল্লাঁওয়ালার গল্প ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে, আবার ঘুম ভাঙে। কোথায় অনেক দূরে আর্টিলারি ফায়ারিং হচ্ছে। দূরাগত মেঘের ডাকের মতো শোনায় কামানের শব্দ। সেই শব্দের একঘেয়ে নির্ঘোষ শুনতে শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

সতনাম যখন ঘুম ভাঙায়, তখন ঘড়ি দেখে বুঝি ব্যায়ামের সময় পেরিয়ে গেছে। চা খেয়ে সবে গোটা বিশেক পুশআপ করেছি এমনসময় আবার আসে ও। বলে, হেলিকপ্টার আসবে সকাল সকাল। হেডকোয়ার্টার খবর দিয়েছে।

সে কি? আমি তড়াং করে উঠে দাঁড়াই, ছুটির সৈন্যদল তৈরি আছে তো?

হাঁন-জী। সুবেদার ওদের হেলিপ্যাডে চলে যেতে বলেছে।

দূরাগত হেলিকপ্টারের শব্দ স্পষ্ট হলে আমিও এগোই হেলিপ্যাডের দিকে। হেলিপ্যাড প্রোটেকশানের সৈন্যরা ওদিকের জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে। হেলিপ্যাডে স্মোক কার্টিজ দিয়ে ধোঁয়া ওড়ানো হয়।

একটি সৈন্য লাফিয়ে নামে।
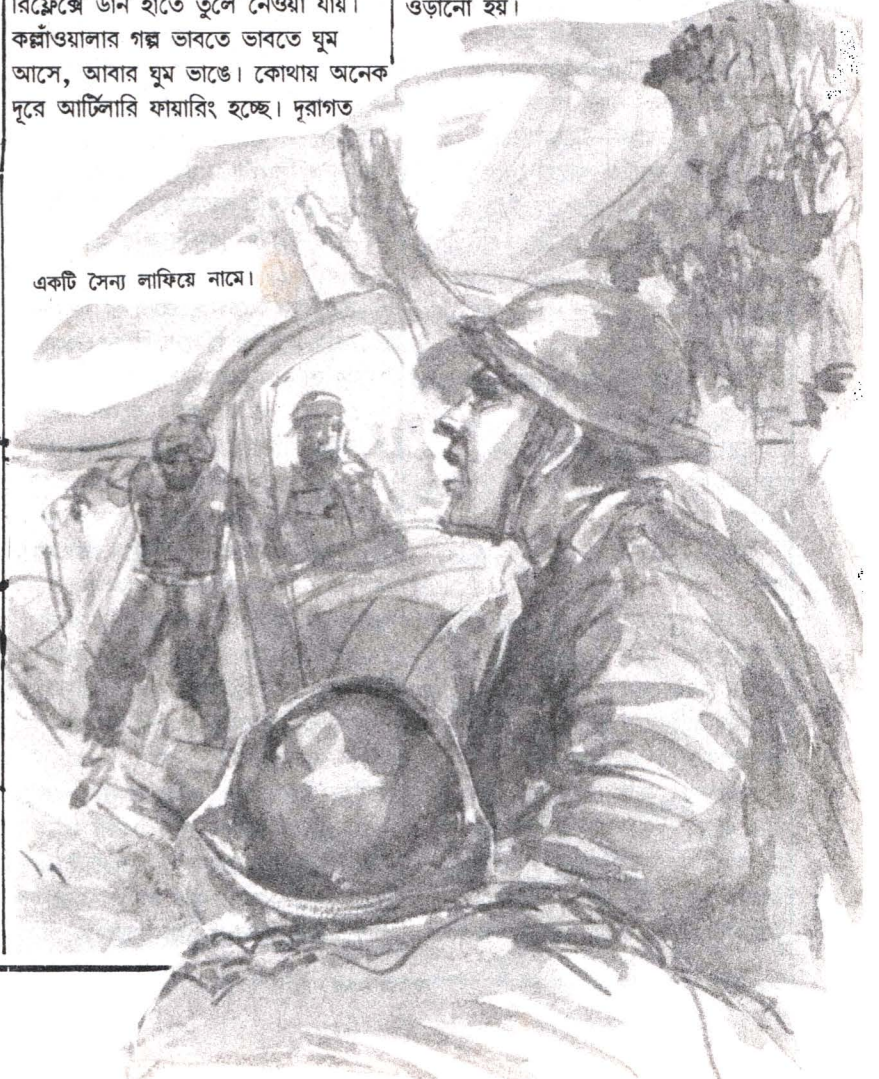
হেলিকপ্টার যখন হেলিপ্যাডে এসে নামে, তখন প্রথম ফায়ারিং শুরু হয়।

প্রথমে উত্তরের জঙ্গলে ক্যাট-ক্যাট—ক্যারাক্যাট স্বয়ংক্রিয় মেশিনগানের শব্দ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব তিনদিকের জঙ্গলে মেশিনগান ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। উত্তরের জঙ্গলে বুম—বুম-ম-ম—রকেট ফায়ারিং-এর শব্দ। দিশেহারা লাগে নিজেকে। ছুটি পাওয়া সৈন্যরা ততক্ষণে হেলিকপ্টারে উঠে পড়েছে। ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার, কত সব ক্যাম্প থেকে ছুটি পাওয়া সৈন্যদের নিয়ে আসছে। এখন হেলিকপ্টারে একটা জ্বলন্ত রকেট এসে ফাটলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। রোটরের ভীষণ শব্দ, আমি চিৎকার করে পাইলটকে বলি, উড়ে যান—তাড়াতাড়ি—শীগগির—সমুদ্রের দিকে।

আচমকা হেলিকপ্টারের দরজা খুলে যায়। একটি সৈন্য লাফিয়ে নামে। আমি হতবুদ্ধি হই, রোটর জোরে ঘুরছে, চারদিকে ধুলো, ঝড়ের মতো হাওয়া বয়। আমি চেঁচাই, যাও—উড়ে যাও।

চারদিকে ফায়ারিং আরো বেড়েছে। বিকট শব্দ করে হেলিকপ্টার উড়ে চলে যায়। আমি দেখি ছুটি পার্টির একটি সৈন্য নেমে এসেছে, লান্স নায়েক হরজিন্দার। রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়, বলি, কি হলো? ফিরে এলে কেন?

সাব। হরজিন্দার বলে, ক্যাম্পের ওপর অ্যাটাক হচ্ছে।

তো? আমি দাঁত খিঁচিয়ে বলি, তোমার কি দরকার? তুমি অর্ডার অমান্য করলে কেন?

গলতি হো গ্যয়া সাব। ও মাথা নিচু করে।

এমন সময় রেডিওবাহী সৈন্য দৌড়ে আসে। জানা যায়, ক্যাম্পের বাইরে তিনটে সৈন্যদলের ওপর একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছে গেরিলারা। ওরা এখন ক্যাম্পের দিকে এগোতে চেষ্টা করছে।

খবরদার! আমি রেডিওতে চেঁচাই, জান যায়ে, পর পাগড়ি নেহি।

কথার অর্থ প্রাণ গেলেও পরাজয় স্বীকার করবে না। আমি দৌড়ে যাই ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পে পরিখা বরাবর মজবুত রক্ষণব্যবস্থা গড়ে তোলা আছে, সৈন্যরা আমার অপেক্ষায়। সুবেদারকে ক্যাম্পে রেখে আমি এগিয়ে যাই উত্তরের সেনাদলের সাহায্যে। ওখানকার হাবিলদার এস ও এস পাঠায়, অবিলম্বে লিংক আপ করার জন্যে।

সুবেদার বিকৃত কণ্ঠে চেঁচায়, সাব। আমিও যাই। ওদের মাত্র জনা চারেক বেঁচে আছে।

হোয়াট? আমি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাই। তারপর চেঁচিয়ে বলি, না সাব। আপনি এখানেই থাকবেন। যদি শত্রু এসে শিখ রেজিমেন্টের ক্যাম্প দখল করে নেয়, তবে রেজিমেন্টে আমাদের কেউ ক্ষমা করবে না, মরবার পরও—

আমি উত্তরের দিকে এগোই, ফায়ার—রান—টেক কভার—ফায়ার—পদ্ধতিতে। আমার সঙ্গে জনা আষ্টেক সৈন্য, সেকশন ওয়ান। কিন্তু কয়েকশো গজ গিয়ে বুঝি শত্রু আমাদের এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়বে না। ইতিমধ্যে হেডকোয়ার্টার থেকে কর্নেলের বেতারবার্তা পাই। কর্নেল বলছেন গেরিলাসৈন্য একইসঙ্গে সিংহলি ফার্ম সেটেলমেন্ট এলাকার দিকেও এগোচ্ছে। আমরা যেন অবিলম্বে ফার্মের সুরক্ষার জন্য এগিয়ে যাই।

স্যর। আমি চেঁচাই, জানি না আমরা নিজেরাই অতক্ষণ টিঁকবো কি না। এখানে আমার সঙ্গে মাত্র আটজন, আর—

হোয়াট? ও মাই গড! কর্নেল এতক্ষণে পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করেন, তোমাদের কতজন ক্যাজুয়ালটি, কি রিপোর্ট—

সাব। সুবেদারের গলা ভাসে বেতারে। এস ও এস। অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন, নইলে এই ক্যাম্পও রক্ষা করা যাবে না।

রাইট। কর্নেল এবার গর্জন করেন, টিঁকে থাকো। আমরা আসছি।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আমরা একটা জায়গায় আটকে আছি, প্রায় মাটিতে মিশে গিয়ে। মাথা একটু তুললেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। একটু আগে জেনেছি উত্তরের সেনাদল আর নেই। কর্নেলের সেনাদলও মূল ক্যাম্পে নামতে পারছে না, কারণ খাঁড়ির সমুদ্রে গেরিলাদের মোটরবোট ঘুরছে মিসাইল নিয়ে, হেলিকপ্টার এলেই মিসাইল ছুঁড়ে মারবে। সুবেদার কোনোরকমে ক্যাম্প টিঁকিয়ে রেখেছে।

আরো কতক্ষণ কেটে যায়, কে জানে। হঠাৎ রেডিওতে কর্নেলের কণ্ঠ ভেসে আসে, মাইক ফর শেরা, ওভার। আমি সাড়া দিতে উনি বলেন, আমি দুই প্লাটুন সৈন্য নিয়ে সিংহলি ক্যাম্প অঞ্চলে রোপড্রপ করে নেমেছি। তোমাদের সাহায্যের জন্য আসছি।

আনন্দের খবর। কিন্তু আমার সৈন্যদের মুখে ম্লান হাসিও ফোটে না। কারণ সমরবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী শত্রু এখন আমাদের এবং কর্নেলের মধ্যে। অন্য শত্রুদল ক্যাম্প এবং আমাদের মধ্যে। সুতরাং কর্নেল ক্যাম্পে এসে পৌঁছবেন ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে স্যান্ডউইচের মতো আমরা হাওয়ায় মিলিয়ে যাব।

আমি সেকথা সৈন্যদের বলি না। বলি, গুরু গোবিন্দ সিংজীর বাণী স্মরণ কর।

সৈন্যরা বিড়বিড় করে, দেহে শিবা। দেহে শিবা বর মোহে এহে, শুভ কর্মনতে কভু ন ডরুঁ। ন ডরুঁ অর সো জব জায়ে লড়ুঁ, নিশ্চে কর অপনী জীত করুঁ।

শিখ জাতিকে তাদের গুরুজী শিখিয়ে গেছেন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার না করবার মন্ত্র। শুভ কর্মপথে যখন করব লড়াই, নিশ্চিত করিব আপনার জয়। সৈন্যরা বাণীমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে উদ্দীপিত হয়। কর্নেল রেডিওতে আবার বলেন, মনে রেখো। এই লিংক আপ করলে তবেই গেরিলা দলের ওপর কাউন্টার অ্যাটাক করা যাবে। উই শ্যাল স্লটার দেম—আমরা ওদের জবাই করবো—এগোও সকলে, গীয়ার আপ বয়েজ।

কর্নেলের মতো এরকম সমরাধিনায়ক দুর্লভ। নিজে যুদ্ধে নেমে পড়েন এবং সেই সঙ্গে রেডিওতে গরমাগরম কথা বলে সৈন্যদের উদ্দীপিত করেন। কিন্তু—

নাঃ। আমি আপন মনে মাথা নাড়ি, এ লড়াইটা কর্নেলেরও কাজ নয়।

সাব। হঠাৎ একজন সৈন্য চেঁচায়, জয়কারা দাও।

মানে? আমি অবাক হয়ে যাই। দেখি লান্স নায়েক হরজিন্দার সিং হাসছে। ও পাশের সৈন্যের হাত থেকে হেভি মেশিনগানটা নিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কোঠ কল্লাঁওয়ালার ফৌজ কখনও হারেনি। আপনি আমাকে অর্ডার দিন, চার্জ করতে।

হোয়াট? আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই, তুমি চার্জ করবে? মানে?

এইটে। হেভি মেশিনগান। ও ইঙ্গিত করে।

আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। ওর কথার যুক্তি বুঝি না। ও এবার ফিসফিস করে, সাব। হারাবার তো কিছু নেই। অর্ডার দিন, দেখুন, আমরা জিতবই।

ও কে। আমি মাথা নাড়ি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। হরজিন্দার হাসে। তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, জো বোলে সো—নিহাল!

জনা সাতেক সৈন্যও ওর দেখাদেখি উঠে দাঁড়ায়। মেঘগর্জনের মতো গর্জন করে ওঠে ওরা, সৎ—শ্রী—অকাল!

কোঠ কল্লাঁওয়ালার ফৌজ কখনও হারেনি।

ট্রিগারে হাত রেখে গুলিবর্ষণ করতে করতে ওরা দৌড়ে যায় সামনের দিকে ঘন জঙ্গল ভেঙে। আমিও দৌড়োই সেই সঙ্গে। শত্রুর দিক থেকে গুলি আসে, কিন্তু বিকট কণ্ঠে জয়ধ্বনি এবং হরজিন্দার সিংহের হেভি মেশিনগান থেকে বৃষ্টির ধারার মতো গুলিবর্ষণে শত্রু বোধহয় ঘাবড়ে যায়। ওরা ভাবে বিশাল ইন্ডিয়ান আর্মি এসে হাজির হয়েছে অরণ্যের কোনো পথ বেয়ে। যে কোনো শিক্ষিত সৈন্যদলের মতো গেরিলারাও ছত্রভঙ্গ হয়, তবে পুরোটা নয়। কারণ গেরিলাদের নীতি হচ্ছে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়া। তাই মরণ কামড়ে মাটি আঁকড়ে গেরিলাসেনা মোকাবিলা করে আমাদের।

দেড় ঘণ্টা লড়াইয়ের পর কর্নেলের দলের সঙ্গে আমরা লিংক আপ করি। কিন্তু তখন আমার অবস্থা মহাপ্রস্থানের যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বিশেষ ভালো নয়। মাত্র একজন সৈন্য তখনও অবশিষ্ট, সে আমার বাঁদিকে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে গুলি ছুঁড়ছিল কৃপণের মতো টিপে টিপে, একটা একটা করে।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটা কিছু বলতে চায়। আমার তলপেটেও গুলি বিঁধেছে। আমি বলি, হরজিন্দার। হিম্মত রাখো। ডাক্তার এসে পড়বেন, কর্নেলের সঙ্গেই...

কথাটা বলবার কারণ ঝাপসা দৃষ্টিতেও আমি বুঝতে পারছিলাম ওর বাঁ পা বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। এরকম আহত সৈন্য যদি ভাবলেশহীন মুখে বসে গুলি ছুঁড়তে থাকে!

হরজিন্দার আমার কথা শুনে ঘাড় ঘোরায়। তারপর একগাল হেসে বলে, লিংক আপ হো গ্যয়া সাব। এবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাব। আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে দেখতে পাব—

জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে কর্নেলের চেহারাটা দেখি ঝাপসা কাঁপা কাঁপা। ঠিক যেন বৃষ্টিভেজা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা। উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন বোধহয়।

লান্স নায়েক হরজিন্দার সিংহের আর বাড়ি ফেরা হয়নি। হাসপাতাল থেকে দেড়মাস পর ছুটি পেয়ে আমি গিয়েছিলাম ওর বাড়ি। আমার খাস আর্দালি সতনামও আমার সঙ্গে যায় কোঠ কল্লাঁওয়ালায়। আমি বারণ করলে হাসে, চোখের জল আড়াল করে। বলে, কেন সাব? মুরগা বলেছিলাম ওকে, ওর বাড়িটা দেখব না? তীর্থস্থানে মাথা ঠেকাতে যাব না?

শিখধর্মে বলা আছে গুরুদ্বারে, ভগবানের দরবারে, তীর্থস্থানের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে। আমি সতনামকে বারণ করিনি। আমরা যখন সেই গ্রামে পৌঁছই, ঠিক সন্ধ্যের আগে তখন আকাশবাণী জলন্ধর প্রচার করে দৈনিক বিশেষ কার্যক্রম, বীর পিতা সে মিলো—

মহাবীরচক্র হরজিন্দার সিংহের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার!

পুরো গ্রাম স্তব্ধ হয়ে শোনে সেই কথোপকথন। আমরাও। তারপর গিয়ে পৌঁছোই ওর বাড়ি।

তবে সে এক অন্য কাহিনী।

ছবি : বিজন কর্মকার

মহাকাল

সঙ্কর্ষণ রায়

ধুপ-ধাপ শব্দ। মাটি কাঁপছে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাঁবুর মধ্যে রাখা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় আমার ক্যাম্প খাটের পাশে ছোট টেবিলে রাখা ঘড়িতে দেখি দুটো বেজেছে। মাটির সঙ্গে আমার ক্যাম্প খাট, টেবিল এবং ঘড়িটাও কাঁপে। ভূমিকম্প নাকি? ওড়িশার 'মহাকাল' পর্বত তো ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে না! টর্চ জ্বেলে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বেরোতে যাব এমন সময় পাশের তাঁবু থেকে মায়াধর মহারানা বললে, বেরোবেন না স্যার, তাঁবুর মধ্যেই থাকুন।

ভূমিকম্প হচ্ছে যে! আমি বললাম, টের পাচ্ছ না! তাঁবু থেকে না বেরোলে তাঁবু ভেঙে পড়বে না!

না, ভূমিকম্প নয়। মায়াধর বললে, মহাকাল। বনের মধ্যে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে মাটি কাঁপছে। খবর্দার বেরোবেন না তাঁবু থেকে। তাঁর মুখোমুখি হলেই তিনি আপনাকে পিষে মারবেন।

কে মহাকাল?

ভোর হলে তিনি শান্ত হবেন, তখন বলব। এখন চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার-আমার গলার স্বর তাঁকে উত্তেজিত করে তুলবে, কাজেই একেবারে চুপ...

চুপচাপ আমার পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফাইভ বোরের রাইফেল নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসি পা টিপে টিপে। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার। গাঢ়তর অন্ধকারের মতো আমার তাঁবুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে 'মহাকাল পর্বত'। প্রায় এক হাজার মিটার উঁচু পুব থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত এই পাহাড়কে স্থানীয় মানুষরা 'পর্বত' বলে। আমি 'পাহাড়' বলাতে মায়াধর বলেছিল, পর্বতকে পাহাড় বলবেন না স্যার, পর্বত রাগ করে আমাদের মাথার ওপরে ভেঙে পড়বেন...

পর্বত ও উপত্যকার সমতলভূমি জোড়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখতে পাই না, 'শব্দ' যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকিয়েও কিছু চোখে পড়ে না। পায়ে পায়ে শব্দের উৎস সন্ধানে নিঃশব্দে এগিয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে মাটি-কাঁপানো শব্দটি যেন আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসে। চোখে কিছু দেখি না, একটা অদৃশ্য দানব যেন তেড়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মায়াধর তাঁবু থেকে বেরিয়ে তার তাঁবুর মধ্যে টেনে নিয়ে যায় আমাকে।

আমার নিষেধ না মেনে বেরিয়ে এলেন! ফিসফিসিয়ে ধমকের সুরে বললে মায়াধর, আত্মহত্যা করতে চান নাকি!

আত্মহত্যা করতে চাইব কেন! আমতা আমতা করে আমি বললাম, ওকে একটু চোখে দেখতে চেয়েছিলাম...

চোখে দেখা তো যায় না ওকে। কিন্তু অদৃশ্য হলেও আপনাকে-আমাকে পোকা-মাকড়ের মতো পিষে মারতে পারে...

পরদিন সকালে চা নিয়ে এসে আমার ঘুম ভাঙায় মায়াধর। বলে, অনেক বেলা হলো, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে নিন। সবুজ পাথর দেখতে যাবেন তো?

'সবুজ পাথর' মানে ক্রোমাইটের দাগযুক্ত সবুজ সার্পেন্টিনাইট। মহাকাল পর্বতের বনের মধ্যে সবুজ গাছপালার সঙ্গে একাকার হয়ে আছে বলে তাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে এখানকার বনের প্রহরী (ফরেস্ট গার্ড) মায়াধর মহারানা তাদের খবর রাখে। মহাকালের সব পাথরই তার চেনা। বনবিভাগের স্থানীয় অধিকর্তা আমাকে বলেছিলেন, মহাকাল পর্বতের সব কিছুই মায়াধরের মুখস্থ, বনের মধ্যে পথ না থাকলেও সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চান।

আমার বিশেষ অনুরোধে অধিকর্তা মায়াধরকে আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন ক্যাম্পে, আমার পাশের তাঁবুতে ফিল্ড অর্ডারলির সঙ্গে থাকতে শুরু করে সে। আজ আমাকে সবুজ পাথর দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা তার, কিন্তু আমি কাজ শুরু করার আগে মহাকালের রহস্যভেদ করতে চাই।

মহাকালের রহস্যভেদ করা যাবে কিনা জানি না। মায়াধর বললে, তবে তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখা যেতে পারে।

পরোটা, তরকারি ও আর এক দফা চা খেয়ে আমরা মহাকাল পর্বতের নিচে বনভূমির মধ্যে মহাকালের দাপাদাপির চিহ্ন দেখি। ঘাসবনের তলার শক্ত লাল মাটি নরম হয়ে গিয়েছে তার পায়ের চাপে। পায়ের চিহ্ন নয়, অসংখ্য গর্ত দেখতে

পাই। আমি বললাম, পায়ের ছাপ দেখা না গেলেও, এগুলো কোনো বড় আকারের জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে...

জানোয়ার কাকে বলছেন! মায়াধর আঁতকে উঠল, অশরীরী মহাকালের পায়ের চিহ্ন...

'মহাকাল' মহাকাল পর্বতের শেষ হাতি। আর সব হাতি মহাকাল পর্বত থেকে নেমে মহাগিরি পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছিল, কারণ তাদের প্রিয় খাদ্য বুনো কলাগাছের অভাব ঘটেছিল এখানে, মহাগিরি পাহাড়ে নাকি এই কলাগাছের প্রাচুর্য আছে। সবাই চলে গেলেও মহাকাল কেন থেকে গিয়েছিল আমার এই প্রশ্নের জবাবে মায়াধর বললে, এখানকার গরীব আদিবাসীদের ওপরে বড় দয়া তাঁর, তাই থেকে গিয়েছিলেন। রোজ সকালে মহাকাল পর্বত থেকে নেমে তিনি বনের মধ্যে চরে বেড়ান বনের মাটিকে নরম করে দেবার জন্য। তাঁর পায়ে পায়ে মাটি এমনি নরম হয়ে যায় যে মাটি থেকে সহজেই তুংগা খুঁড়ে বের করতে পারে এখানকার দেওরি স্ত্রীলোকরা। তুংগা হলো বুনো মেটে আলু, ওদের প্রধান খাদ্য। বুনো কলাগাছের অভাবে তুংগা দিয়ে তিনিও তাঁর পেট ভরান।

বেঁচে থেকে তিনি যা করতেন এখন মরে গিয়েও তা করছেন। মায়াধর বলে চলে, আগে সকালে পর্বত থেকে নামতেন, এখন রাতে নামেন, বনময় অশরীরী শরীর নিয়ে দাপাদাপি করে মাটি নরম করেন। অশরীরী শরীরে আগের চেয়েও বেশি শক্তি ধরেন, মাটিতে গর্ত করে দেন আজকাল। আর জানেন, অশরীরী শরীর দিয়েই তিনি পিষে মেরেছেন সেই শিকারীকে, যে দাঁতের লোভে তাঁকে শিকার করেছিল।

আমার কাঁধের ঝোলা থেকে ক্যামেরা বের করে আমি বললাম, একটু দাঁড়াও এখানে মায়াধর, হাতি-ভূতের পায়ের চিহ্নের ছবি তুলে রাখি।

ভূত কাকে বলছেন! ভূত কথাটা বড় বিচ্ছিরি...

ভূতকে ভূত বলব না তো কি!

কিছুই বলার দরকার নেই। চুপচাপ দেখে যান দেওরি মেয়েরা কত সহজে গর্তগুলি থেকে তুংগা বের করছে।

সত্যিই তাই। না খুঁড়ে গর্তে হাত ঢুকিয়েই দেওরি মেয়েরা তুংগা বের করে আনছে। তাদের প্রশ্ন করে জানি যে জীবিত মহাকালের মতো মৃত মহাকালও তাদের পরম বন্ধু। মহাকাল পর্বতের নিচে ঘাসবনের তলার মাটি খুবই শক্ত, তার মধ্যে গর্ত খুঁড়তে এই মহাকালই পারে। তার সাহায্য ছাড়া তুংগা সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না তাদের পক্ষে।

প্রচুর তুংগা মজুত আছে এখানে। মহাকাল রোজ রাতে যে সব গর্ত তৈরি করে তাদের মধ্য থেকে দেওরি মেয়েরা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুংগা কুড়িয়ে তোলে।

মহাকালের পায়ের চাপে অসংখ্য গর্তই শুধু তৈরি হয় না, অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাটিও আলগা হয়ে যায়। এই আলগা নরম মাটিতে দেওরি পুরুষরা এক ধরনের ফসল ফলায়, যার নাম 'মারিয়া'। মারিয়ার দানা সেদ্ধ করে তারা ভাত বানায়। মারিয়ার ভাত নাকি মিষ্টি।

মারিয়া যতই মিষ্টি হোক, সবার চেয়ে, এমনকি গুড়ের চেয়েও মিষ্টি হলো তুংগা। লম্বাটে শোলা কচুর মতো একটি বস্তু। মাটি থেকে তুলে আমাকে দেখাল একজন দেওরি বুড়ি, মেয়েরা তাকে তাদের ভাষায় 'মাসি' বলে ডাকে।

খেয়ে দেখ, কি রকম মিষ্টি, দেওরি বুড়ি বললে।

কাঁচা খাব নাকি? আমি প্রশ্ন করি।

হাতে ধরা তুংগাটিকে ভেঙে তার মধ্যে সাদা রঙের শাঁস বের করে দিয়ে দেওরি বুড়ি বললে, কাঁচাই খেয়ে দেখ। আমরা কাঁচা খেতেই ভালবাসি।

তারপর সে যখন বুঝল যে আমাদের খাওয়ার রুচি তাদের, মানে আদিবাসীদের রুচির সঙ্গে মেলে না, সে নিজেই কড়মড়িয়ে খেতে থাকে কাঁচা তুংগার শাঁস। তারিয়ে তারিয়ে খায়। তার মুখের ভাবে মনে হয় যেন সে অমৃত খাচ্ছে।

খেতে খেতে দেওরি বুড়ি বললে, তুমি খেতে পারছ না, কিন্তু তোমার মতো ভদ্দরলোক সওদাগর আমাদের কাছ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি তুংগা কিনে নিয়ে যায়। খাবার জন্যই কেনে নিশ্চয়ই।

কে সেই সওদাগর? আমি প্রশ্ন করি।

তোমার মতো ভদ্দরলোক, অনেক রাতে আমাদের ঝুপড়িতে আসে তুংগা কিনতে। মহাকাল যে সব গর্ত তৈরি করে, তা থেকে অনেক অনেক তুংগা পাই, আমাদের যা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি। এই সব তুংগা সে কিনে নেয় ভাল দাম দিয়ে।

কি যে বল তুমি বুড়ি তার ঠিক নেই! মায়াধর বললে, জঙ্গলের মাটির ফসল তুংগা, যা বনের আদিবাসীরা ও মহাকাল ছাড়া কেউ খায় না, তা কেউ দাম দিয়ে কেনে! তা ছাড়া রাত্রে বনের মধ্যে মহাকাল যখন দাপিয়ে বেড়ায়, তখন কি কেউ তার ঘর থেকে বেরিয়ে তোমাদের ঝুপড়িতে যেতে পারে!

এই সওদাগর পারে। বুড়ি শান্তভাবে বললে।

আমি বললাম, হয়তো সে তার গাড়িতে করে আসে।

গাড়ির কোনো আওয়াজ পাইনি। দেওরি বুড়ি বললে, ও যখন আসে, তখন মহাকালের দাপাদাপির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ পাই না। মহাকালের নজর এড়িয়ে চুপি চুপি আসে...

মহাকালের নজরে এলেই মরবে। মায়াধর বললে, তোমাদের খাবার জিনিসে বাইরের কেউ ভাগ বসালে সে তাকে শেষ করে দেবে।

মনে হয়, আমাদের আস্তানার কাছাকাছিই থাকে এই সওদাগর। তাই চট করে চলে আসতে পারে তাঁর নজর বাঁচিয়ে। ওর দেওয়া বস্তায় তুংগা ভরেই রাখি, সেটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে চলে যায়।

কিন্তু বুড়ির আস্তানার কাছাকাছি বিস্তর সন্ধান নিয়েও ঐ সওদাগরের হদিস পাই না। মহাকালের কোলে দেওরিদের একটি গ্রাম আছে, সেই গাঁয়ের মুদি বললে, ঐ ব্যবসায়ী লোকটা হয়তো কেওনঝরগড় থেকে আসে, মাল নিয়ে কেওনঝরগড় ফিরে যায়। বনের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ আছে, সেই পথ দিয়েই হয়তো যাতায়াত করে।

মায়াধরকে বললাম, চল বুড়ির আস্তানায়, তুংগা নিতে যখন আসবে ঐ সওদাগর, তখন তার সঙ্গে আলাপ করব।

কিন্তু সে তো আসে গভীর রাতে! মায়াধর বললে, তখন বনময় চলবে মহাকালের দাপাদাপি, তাঁবু থেকে বেরোবো কি করে?

রাত হওয়ার আগেই যাব। দিনের আলো নিভে যাওয়ার আগে বুড়ির ঝুপড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করব তার জন্য...

সেদিন শুধু নয়, পর পর তিন দিন গেলাম বুড়ির ঝুপড়িতে, কিন্তু দেখা পেলাম না ঐ সওদাগরের। স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে চায় না আমাদের মুখোমুখি হতে, গোপনে চালিয়ে যেতে চায় তার কারবার।

যা নিয়ে এই গোপন কারবার, সেই তুংগা কি এমন মূল্যবান জিনিস? তার দ্রব্যগুণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করতে বললাম কেওনঝরগড়ে আমাদের রাসায়নিক পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ বিভূতি বসুকে। গোটা কয়েক তুংগা আমি দেওরি বুড়ির কাছ থেকে নিয়েছিলাম, তা-ই দিলাম ওঁকে।

তুংগা হাতে নিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বিভূতিবাবু বললেন, এই বস্তুটি আগেই আমার পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। এখানে মিনারেল গোডাউনে কাজ করে আমার পরিচিত একটি ছেলে, সে গোডাউনের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ ওরের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা এই বস্তুটির একটি নমুনা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল...

এই ম্যাঙ্গানিজ ওর তো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আমি বললাম, তার সঙ্গে তুংগা মিশিয়ে রাখার অর্থ?

তুংগাও এক্সপোর্ট করা হচ্ছে। খনিজ হিসেবে তা ব্যবহারযোগ্য কি না তা আমি কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম।

কি বুঝলেন শুনি?

জিনিসটি খনিজ হিসেবে নয়, ভেষজ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। ওর মধ্যে গ্লুকোজের অস্বাভাবিক আধিক্য, ক্যালসিয়ামের সঙ্গে পটাশিয়াম মিশে আছে।

খনিজের সঙ্গে মিশিয়ে খনিজ হিসেবে তা এক্সপোর্ট করা হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

এ তো চোরাই চালান?

অবশ্যই।

বনবিভাগের স্থানীয় অধিকর্তা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তুংগার চোরাই চালানের কথা শুনে। তদন্ত শুরু করলেন এবং মায়াধর মহারানাকে ঐ সওদাগরকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে বললেন।

অধিকর্তার মুখের ওপরে কোনো কথা না বলতে পারলেও মায়াধর আমাকে বললে, ওকে ধরি কি করে বলুন তো! আপনি ও আমি তো কম চেষ্টা করিনি ওকে খুঁজে বের করার জন্য। দিনের বেলায় ওর কোনো হদিস মেলেনি, রাতে দেওরি বুড়ির ঝুপড়িতে অপেক্ষা করেও কোনো ফল হয়নি।

আমি বললাম, বুড়ির ঝুপড়িতে নয়, ঝুপড়ির কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে ওর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তুংগার জন্য বুড়ির ঝুপড়ির মধ্যে সে ঢুকলেই তাকে ধরবে। আমিও থাকব তোমার সঙ্গে।

মায়াধরকে সাহায্য করতে এসেছিল একজন আদিবাসী বন-চৌকিদার, নাম তার তুরাম মুনডা। আমরা তিনজন সেদিন সন্ধ্যার আগে দেওরি বুড়ির ঝুপড়ির কাছাকাছি কালো পাথরের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। দেওরি বুড়ি ও তার সঙ্গিনীদের না বলেই গেলাম সেখানে, আমাদের উপস্থিতি তারা টের পেল না।

সন্ধ্যা হতেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মহাকাল পর্বতের ঠিক নিচে আছি আমরা, অন্ধকার এখানে গাঢ়তম।

হঠাৎ মাটি-কাঁপানো ধুপ-ধাপ শব্দ। মহাকাল জেগেছে, দাপাদাপি শুরু করেছে।

মাঝরাতে পুব আকাশে বনের প্রান্তে চাঁদ ওঠে। কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি বাঁকা চাঁদ। তার অস্ফুট আলোয় বনের গাছপালাগুলি ধূসর ছবির মতো ফুটে ওঠে। দেওরি বুড়ির ঝুপড়ির সামনের গাছগুলির মধ্যে একটি গাছ যেন নড়ে ওঠে। পরে বুঝি, গাছ নয়, মানুষের ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তিটি দেওরি বুড়ির ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। খানিকক্ষণ বাদেই বেরিয়ে এসে চলতে থাকে মহাকাল পর্বতের দিকে।

যাও, ধরে ফেল ওকে। আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, তুংগাভরা বস্তা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে, বমালসুদ্ধ ধর ওকে মায়াধর...

ধরব কি করে! চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে মায়াধর, মহাকাল যে তেড়ে আসছেন।

কোথায় মহাকাল?

ঐ যে দেখুন...

কাঁপতে থাকে মায়াধরের গলার স্বর।

অস্ফুট জ্যোৎস্নার আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে ফুটে ওঠে একটি কুয়াশার স্তম্ভ।

দ্রুতগতিতে তা ছুটে আসে এদিকে। তার লক্ষ্য ঐ ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ ধ্বনিত হয়ে ওঠে চাপা বৃংহিত ধ্বনি। উত্তেজিত স্বরে মায়াধর বললে, শুনছেন তো? তাঁর গলার স্বর! ক্ষেপে গিয়েছেন তিনি...

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশার স্তম্ভটি ছায়ামূর্তিকে গ্রাস করে, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বিকট আর্তনাদ।

পরদিন সকালে একটি অর্জুন গাছের তলায় দলিত পিষ্ট মৃতদেহটি দেখতে পেলাম। তার পাশে পড়ে আছে বস্তাভরা তুংগা। তুংগাগুলো অবশ্য অক্ষত আছে।

কেওনঝরগড়ের গির্জার পাদ্রী সেদিন বলেছিলেন, পাপের বেতন মৃত্যু। মায়াধর বললে, এখানকার গরিব আদিবাসীদের খাদ্য নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে যে পাপ করেছে ঐ সওদাগর, তার বেতন পেয়েছে সে মহাকালের কাছে।

ছবিঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী
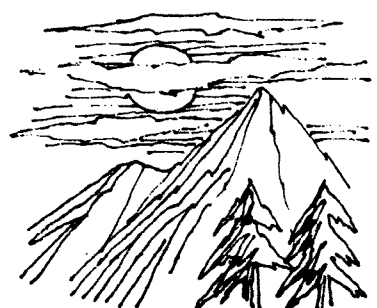
সম্পূর্ণ উপন্যাস
ভয় যখন ভয়ংকর
পরেশ ভট্টাচার্য
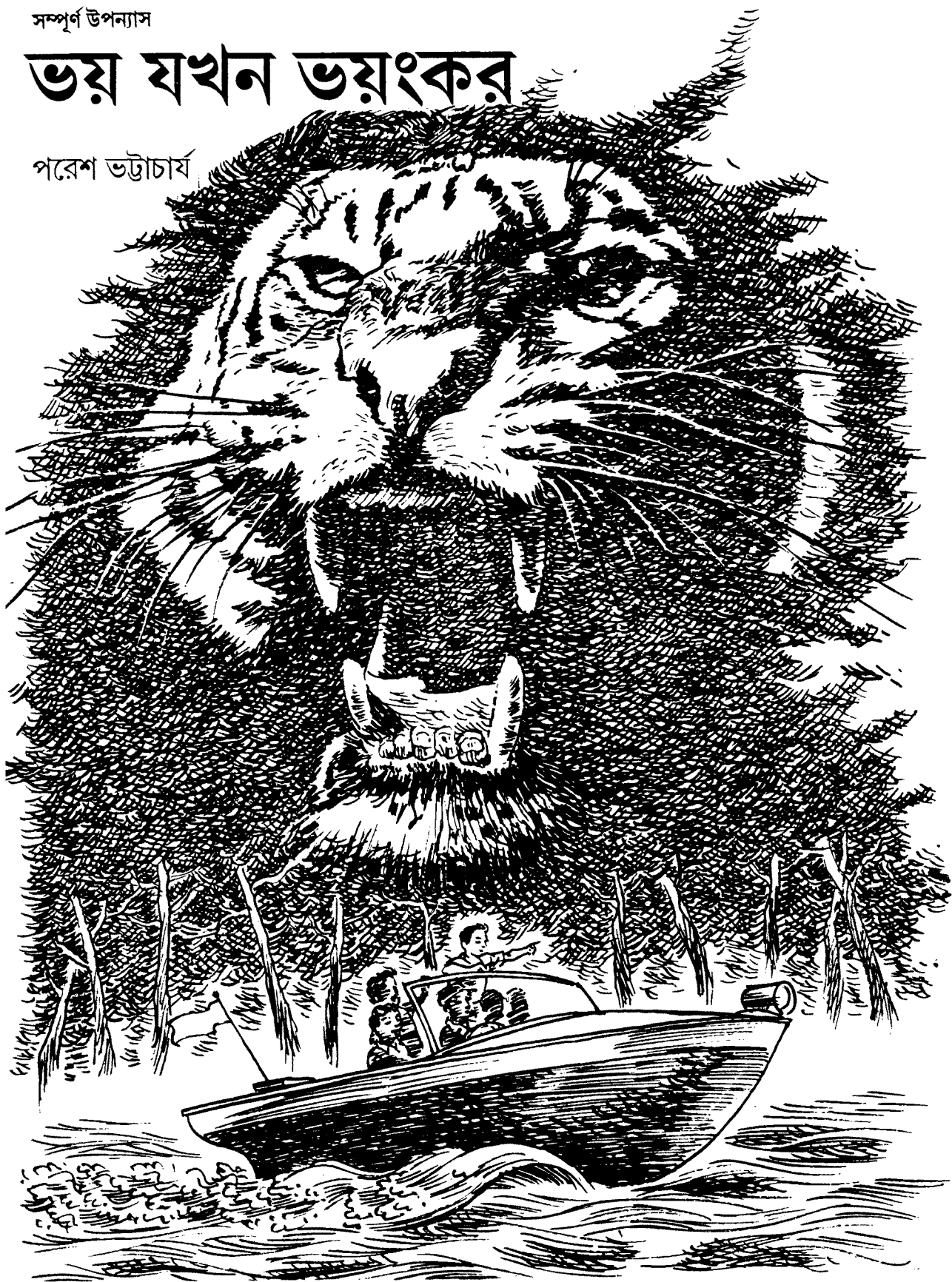
রাত এখন গভীর। শীতের রাত। চারদিকে থমথমে নীরবতা। এই নীরবতার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক বিচিত্র সুর-ঝংকার সৃষ্টি করেছে। সুন্দরবনের ঝিঙেখালি বন-অফিসের কোণের ছোট্ট ঘরটিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দুই ভাই। ধীমান আর বিমান। ওরা দু'জন একই তক্তাপোশে ঘুমিয়ে আছে।

ঘরে আর একজন আছে। নাম বিশু হাজরা। বন-অফিসে ঠিকা কাজ করে সে। বিশু ঘুমিয়ে আছে ঘরের মেঝেয়।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল ধীমানের। পায়ের নিচে কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

তড়াক করে উঠে বসলো ধীমান। বালিশের নিচে টর্চ ছিল। জ্বালালো। কিন্তু কোনো কিছুই দেখতে পেল না।

আবার কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবলো, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে।

কেমন যেন অস্বস্তি ধীমানের মনের মধ্যে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভাবছে, পায়ের নিচে সুড়সুড়ি দেওয়াটা তো স্বপ্ন না হয়ে সত্যিও হতে পারে।

ঘরের কোণে হ্যারিকেন জ্বালা আছে। জোর কমানো। পাছে সরাসরি আলো চোখে পড়ে, তাই এক টুকরো পিচবোর্ড দিয়ে আলো আড়াল করে রেখেছে বিশু।

ভাবনার মধ্যে ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলো ধীমান। আবার ঘুম ভেঙে গেল। পায়ের গোড়ালির নিচে কি যেন নড়াচড়া করছে। এবারেও উঠে বসলো। টর্চের আলোয় কিছু দেখতে পেল না।

একবার মনে হলো বিশুদা আর বিমানকে ডাকে। কিন্তু ডাকলো না। ভাবলো, ব্যাপারটা শুনে ওরা হয়তো হাসাহাসি করবে।

শুয়ে পড়লো ধীমান। এবারে গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে বালিশে চিবুক রেখে উপুড় হয়ে শুয়েছে।

মাথার কাছে জানালার একটা কপাট নেই। কব্জা থেকে খুলে গেছে। এখনো লাগানো হয়নি। জানালার খোলা জায়গায় পুরনো তোয়ালে দেওয়া ছিল, সেটাও নেই।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের টুকরো দৃশ্যপট। জানালার পাশে রয়েছে একটা সাঁইবাবলা গাছ। একটু তফাতে দুটি নারকেল গাছ। তারপরই গরান খুঁটি আর কাঁটাতারের বেড়া। যেমন তেমন বেড়া নয়, রীতিমতো মজবুত। বেড়ার গায়ে জংলী কাঁটালতা। কাঁটালতায় হলুদ রঙের থোকা থোকা ফুল। মৃদু গন্ধও আছে।

নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝোপঝাড় চোখে পড়ে। টুকরো আকাশও দেখা যায়।

চাঁদ-জাগা রাত। যদিও ফিকে কুয়াশা, তবু জ্যোৎস্না খুব অস্পষ্ট নয়। ধীমান খোলা জানালা দিয়ে দেখছে বাইরের দৃশ্যপট। বেশ লাগছে দেখতে। মনে হয় ক্যানভাসে আঁকা সুন্দর ছবি দেখছে।

পায়ে সুড়সুড়ির কথা এখন আর মনে নেই ধীমানের। সে ডুবে আছে সত্যি ছবির মধ্যে।

টিকটিকি ডেকে উঠলো। চমক ভাঙলো ধীমানের। ভালোই হলো। মনে মনে ঠিক করলো দরজা খুলে বাইরে যাবে। দেখবে জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্য।

উঠে বসলো ধীমান। হঠাৎ চোখে পড়লো তক্তাপোশের পায়ার কাছে দুটো চোখ জ্বলছে।

টর্চটা হাতে নিতে গেল তাড়াতাড়ি। মেঝের ওপর পড়ে গেল টর্চ। শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বিমানের। ধীমানকে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কিরে ভাই, বসে আছিস কেন?

ওই দ্যাখ। ধীমান বললে, দেখেছিস? দুটো চোখ কিরকম জ্বলছে।

তাই তো রে। বিমান বললে, দে তো টর্চটা।

দিচ্ছি। ধীমান বললে, টর্চটা পড়ে গেছে মেঝেয়।

হাত বাড়িয়ে টর্চটা তুলে নিলে ধীমান। আলোয় দেখলো, বিশুদার আদরের কালো রঙের হুলো বিড়াল কালুয়া বেশ মেজাজ নিয়ে বসে আছে তক্তাপোশের পায়ার কাছে।

দুই ভাই হাসিতে ফেটে পড়লো। ওদের হাসির দাপটে ঘুম ভেঙে গেল বিশুর। বললে, কি হলো, রাতদুপুরে অতো হাসির ঘটা কেন?

হাসছি কেন? ওই দ্যাখো তোমার আদরের কালুয়া। বিমান বললে, বাপরে ওর চোখ দুটো কিরকম জ্বলছিল। সত্যিই ওরা বাঘের মাসি।

বিশু হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে বললে, ও মাসিও নয়, মেসোও নয়, ও হলো বাঘবাবার মাসতুতো ভাই, বুঝেছো।

বিমান বললে, ব্যাটা বসে আছে দ্যাখো কেমন মেজাজে। রায়মঙ্গলের মাছ খেয়ে চেহারাটা বাগিয়েছে বটে। বুঝলে বিশুদা, জঙ্গলে ছেড়ে দিলে ও তোমাদের বাঘবাবার সঙ্গে লড়ে যাবে।

কালুয়া এতক্ষণে বড় বড় গোঁফ কাঁপিয়ে যেন কিছুটা বিরক্তি মিশিয়ে আওয়াজ করলো, ম্যাঁও।

ধীমান এবারে তার পায়ে সুড়সুড়ি লাগার একটা কারণ খুঁজে নিলে মনে মনে। নিশ্চয়ই কালুয়ার শীত করছিল, তাই ও নীরবে পায়ের দিক থেকে কম্বলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছিল। ঢুকতে না পেরে তক্তাপোশের পায়ার কাছে অমন করে বসে আছে। বিড়ালরা যে শীতকাতুরে এ কথা সবাই জানে।

কিন্তু পায়ের সুড়সুড়ির ব্যাপারটা প্রকাশ করলো না। তাতে হয়তো বিমান হাসাহাসি করবে।

বিমান জানালার ধারে গেল। বাইরের দিকে তাকালো। জ্যোৎস্নাঝরা রাত। শিশির ভেজা গাছের পাতায় পাতায় পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। শিশিরবিন্দু নয়, যেন মুক্তাবিন্দু।

বিমানের মন আনচান করে উঠলো বাইরে যাবার জন্যে। বিশুদাকে বললে, চলো না, বাইরে যাই, টাওয়ারে উঠি।

বিশু বললে, না, বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া সাহেব যদি জানতে পারেন, তাহলে আমার চাকরি খতম।

ধীমানেরও মন উসখুস করে উঠলো বাইরে যাওয়ার জন্যে। বললে, আরে বিশুদা, তোমাদের রানা সাহেব তো আমাদের কাকা, মানে ছোটকা।

বিশু বললে, তা হোক, আমরা বনের বাঘকে যত না ভয় করি, তার চেয়ে বেশি ভয় করি রানা সাহেবকে। তোমরা তো তোমাদের ছোটকাকে চেনো, জঙ্গল অফিসের রানা সাহেব হিসাবে তো জানো না। ওনার মুখোমুখি হলে বনের বাঘও পিছু হটে।

বিমান বললে, আরে বিশুদা, ভয় কি! আমরা তো কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাবো না। শুধু টাওয়ারটার ওপরে উঠে রাতের বন দেখবো।

বিশু বললে, এই তো তিন দিন হলো এসেছো, এর মধ্যে কতোবার টাওয়ারে উঠেছো বল তো?

তা অনেকবার উঠেছি। ধীমান বললে,

কিন্তু রাতে তো উঠিনি। এই জোছনা রাতে সুন্দরবনের রূপ দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

বিশু বললে, আমার কথা ছেড়ে দাও, গেটের মুখে সান্ত্রীরা পাহারায় আছে। তারা যদি দেখতে পায়?

বিমান বললে, আরে তারা তো খুব ভালো লোক। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। আমরা তাদের বলে, তারপর টাওয়ারে উঠবো।

বিশু বললে, সে না হয় আমিই বলে আসছি। কিন্তু একটা কথা, এক ঘণ্টার মধ্যেই টাওয়ার থেকে নেমে ভালো ছেলের মতো ঘরে ঢুকতে হবে।

তাই হবে, বিমান বললে, এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফিরে আসবো।

ঠিক আছে, বিশু বললে, তোমরা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নাও, আমি সান্ত্রীদের বলে ম্যানেজ করে আসছি। তবে কি জানো, একটা ভয় থেকেই যাচ্ছে।

কিসের ভয়? ধীমান জিজ্ঞেস করলো।

রানাবাবু স্পীডবোট নিয়ে বেরিয়েছেন। যদিও তিনি গেছেন নেতি ধোপানির জঙ্গলের দিকে, তবু সাহেবের খেয়াল তো, হয়তো আচমকা ফিরে এলেন।

ধীমান বললে, আরে বিশুদা, অতো ভাবতে গেলে কি চলে! তাছাড়া ছোটকাকে তোমাদের চেয়ে আমরা কম জানি না, অমন মানুষ হয় না। তোমরা ওঁকে ভয় পাও কেন বুঝতে পারছি না। যাক, তুমি যাও, সান্ত্রীদের বলে এসো।

বিশু বললে, আর বলে আসবো কি, চলো একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি।

আর তিন দিন বাদেই পূর্ণিমা। কুয়াশার চাদরের আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চাঁদকে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল চারদিকের দৃশ্যপট। আর কুয়াশার চাদর জড়ানো বলে সবকিছু যেন আরো অপরূপ হয়ে উঠেছে।

ধীমান আর বিমান টাওয়ারে উঠেছে বিশুকে নিয়ে। বেশ উঁচু টাওয়ার। কাঠের তৈরি। টাওয়ারের ওপরে একজন সান্ত্রীও থাকে।

টাওয়ার থেকে জ্যোৎস্না-ঝরা রাতের সুন্দরবনের দৃশ্যপট দেখে দুই ভাই মুগ্ধ হলো। মনে হয় এ এক স্বপ্নের দেশ।

নিবিড় বনভূমি। গাছের পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু। শিশিরবিন্দু নয় যেন মণিমুক্তা ছড়ানো।

টাওয়ার থেকে দুরন্ত নদী রায়মঙ্গলও স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর বুকে কুয়াশা যেন আরো ঘন। দূর থেকে হঠাৎ মনে হয়, ওখানে আকাশ, নদী একাকার হয়ে গেছে।

দুই ভাই অবাক চোখে চারদিকের দৃশ্যপট দেখছে। হঠাৎ কানে এলো বুক-কাঁপানো গুরুগম্ভীর আওয়াজ। কতকটা শাঁখের আওয়াজের মতো। রাজা বাঘ ডাকছে বনের ভিতর থেকে।

আজই প্রথম বাঘের ডাক শুনলো ধীমান আর বিমান। তবে এর আগে সার্কাস দেখতে গিয়ে বাঘের ডাক শুনেছে। তবে সে ডাক এমন গম্ভীর নয়।

সান্ত্রী বটুক ওঝা বললে, কি, কেমন লাগছে?

ছানা দুটো নিতান্তই শিশু।

বিমান জিজ্ঞেস করলে, তুমি বাঘ দেখেছো সাস্ত্রী কাকা?

সাস্ত্রী বটুক না হেসে পারলো না। বললে, সান্ত্রী কাকা নই, বটুক কাকা, বুঝলে। হ্যাঁ, কি যেন জানতে চাইলে—বাঘ দেখেছি কিনা? বনে বনে আমাদের কাজ, শুধু বাঘ কেন, অনেক রকম পশু-পাখি দেখেছি। বাঘ, হাতি, হরিণ, নেকড়ে, চিতা, বুনো শুয়োর—আরো কত কী। তবে যাই দেখি না কেন, সুন্দরবনের রাজা বাঘের তুলনা নেই। যেমনি সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর। জানো বছরখানেক আগে এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

দুই ভাই কৌতূহলী হলো।

বটুক বলতে লাগলো ঘটনার কথা। সে ঘটনার কথা এই বন-অফিসের সবাই জানে। সবাই স্বচক্ষে দেখেছে। এমন কি বাইরে থেকেও সেই সময় প্রচুর লোক আসতো এই ঝিঙেখালি অফিসে। কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোকও এসেছিল, এসেছিল দূরদর্শনের লোক। জানো, একদিন গভীর রাতে, এই অফিসের মানুষ শুনতে পেল বাঘের ডাক। অবশ্য সেটি বাঘ ছিল না, ছিল বাঘিনী। আর তার সেই ডাকের মধ্যে ভয়ংকর ভাব ছিল না। ছিল অন্য এক সুর।

অবাক কাণ্ড! সেই গভীর রাতে অফিসের যত লোক, সবাই দেখলো একটা বাঘিনী তার দুটো বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে কাঁটাতারের বেড়ার ধারে।

কেন? ভয়ে, বাঘের ভয়ে। কিছু কিছু বাঘ আছে, যারা তাদের ছানাকে খেয়ে ফেলে। সেই জন্যে বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে এসেছে বন-অফিসের কাছে। যাতে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পায় বাচ্চা দুটো।

রানা সাহেব জঙ্গলের জীবজন্তুকে ভালোবাসেন। তিনি দুজন সান্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, রাইফেল নিয়ে ওখানে পাহারা দিতে। বাঘ যেন কোনো ভাবে এদিকে ঘেঁষতে না পারে। আর নিজে কাঁটাতারের বেড়ার এক জায়গায় মাটি সরিয়ে দিয়ে বাচ্চা দুটোর ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলেন।

ছানা দুটো নিতান্তই শিশু। তারা তাদের বাঘিনী মায়ের কাছে থাকতে চায়। তবু এক সময় দেখা গেল বাঘিনী তার সন্তানদের মাথা দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে কাঁটাতারের বেড়ার এধারে। কিন্তু বাচ্চা দুটো কিছুতেই ভেতরে ঢুকবে না।

রানা সাহেব তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন, বাচ্চা দুটোকে হাত দিয়ে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। আশ্চর্য! বাঘিনী কিছুই করলো না। তার হাবভাব দেখে বোঝা গেল সে যেন খুশিই হয়েছে। তারপর কি হলো জানো?

ধীমান আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলো, কি হলো বটুক কাকা?

বটুক বলতে আরম্ভ করলো তার পরের কথা। রানা সাহেব বুঝতে পারলেন বাঘিনী চায় তার বাচ্চা দুটো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরেই থাক। শুধু মাঝে মাঝে তার কাছে আসুক। তিনি বাচ্চা দুটোকে আশ্রয় দিলেন। তাদের নাম রাখলেন দীপ আর আলো।

দীপ আর আলো ভেতরে ঢুকলে তাদের যাওয়া-আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো একটা তক্তা দিয়ে। কাঁটা-তারের বেড়ার ভেতর মনের আনন্দে খেলা করতো বাচ্চা দুটো। কিন্তু খিদে পেলেই তারা কাঁটাতারের বেড়ার ধারে গিয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতো, মাটি আঁচড়াতো। তখন তক্তার বাধা সরিয়ে নেওয়া হতো। আলো আর দীপ চলে যেতো মায়ের কাছে। বাঘিনী মা তাদের গা চেটে দিতো, নানাভাবে আদর করতো। অনেক সময় তাদের সঙ্গে খেলাও করতো। তারপর আবার তাদের মাথা দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিতো কাঁটাতারের ভেতরে। বাঘিনী ঠিকই বুঝেছিল জঙ্গলের অফিসের কাছে থাকাই বাচ্চা দুটোর পক্ষে নিরাপদ।

ধীমান জিজ্ঞেস করলো, বাঘিনী কি খেতো?

কি আবার খাবে! বাঘে কি খায় তাও বলে দিতে হবে! বটুক বললে, বাঘিনীর জন্যে রোজ পলিথিনের প্যাকেটে মাংস দেওয়া হতো। তারপর শোনো—বলে চুপ করে গেল বিশু।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বেশ বড়ো একটা পুকুর। পুকুরের তিন পাড়ে বন-বিভাগের লাগানো ইউক্যালিপটাস গাছ। আর পুকুরের পাড় বরাবর চারদিকেই নারকেল গাছের সারি। কিছুটা দূরেই জঙ্গল। মাঝে মাঝে বনের হরিণরা পুকুরের মিষ্টি জল পান করতে আসে। ইউক্যালিপটাস বনেও হরিণের দেখা মেলে প্রায়ই।

বটুক বেশ কিছু সময় চুপচাপ রইলো। তারপর বললে, ওই যে পুকুরটা দেখছো, পুকুরের পুবপাড়ে বাঘ আসতো। আর বাঘ এলেই বাঘিনী গর্জে উঠতো। সান্ত্রীরা তখনই বুঝতো কাছাকাছি কোথাও বাঘের আবির্ভাব হয়েছে, তারা সতর্ক হতো। রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো বাঘিনীর কাছাকাছি। একদিন আমি ডিউটিতে ছিলাম। বাঘিনী তখন দীপ আর আলোকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ সে ভয়ংকর ভাবে গর্জন করে উঠলো। তখন অন্ধকার রাত। চারদিকে টর্চ ফেলেও কিছু দেখতে পেলাম না। অথচ বাঘিনী গর্জন করে চলেছে একটানা। দীপ আর আলোকে আমিই হাত বাড়িয়ে ভেতরে টেনে নিতে গেলাম। পারলাম না। তারা নাগালের বাইরে। এদিকে আরো সান্ত্রী এসে গেছে। রানা সাহেবেরও ঘুম ভেঙে গেছে। তিনিও বেরিয়ে এসেছেন। আশ্চর্য মানুষ রানা সাহেব, ভয় কি তা জানেন না। দু'জন সান্ত্রীকে নিয়ে গেটের বাইরে চলে গেলেন। আমি তখন বাঘিনীর কাছে। কাঁটাতার আর গরানখুঁটির বেড়ার একদিকে আমি, অন্যদিকে বাঘিনী। হঠাৎ দেখলাম, বাঘিনী ছুটছে কাঁটাতারের বেড়ার ধার দিয়ে। যারা টাওয়ারের ওপর ডিউটিতে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, স্যার, আপনার পিছনে স্যার—

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল বাঘের গর্জন, তার সঙ্গে রাইফেলের গুলির আওয়াজ। কিন্তু কোনো কিছুই দেখা গেল না। বাঘিনী ছুটছিল, সে আবার ফিরে এলো দীপ আর আলোর কাছে। এরপর দীপ আর আলো নিজে থেকেই ঢুকলো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। বাঘিনী তখন নিশ্চিন্ত হলো।

ধীমান আর বিমান অবাক হয়ে শুনছে বটুক ওঝার গল্প। গল্প নয়, সত্যি কাহিনী।

বটুক বলছে, এর পরেও মাঝে মাঝে বাঘের গর্জন শোনা যেতো পুকুরের পুব দিক থেকে। বাঘিনীও থেকে থেকে গুমরে উঠতো, গর্জন করতো। এদিকে দীপ আর আলোও ক্রমশ বড় হচ্ছে। শেষে এমন একদিন এল যখন রানা সাহেব দেখলেন ওদের আর কাঁটাতারের ভেতরে অবাধে চলাফেরা করতে দেওয়া ঠিক নয়। যে কোনো সময় কাউকে কামড়ে দিতে পারে। তখন তিনি বেড়ার কাছে খানিকটা

জায়গা ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দীপ আর আলো খেয়ালখুশি মতো সেখানে আসে। তখন তারা একটু-আধটু মাংস খেতে শিখেছে। মায়ের সঙ্গে খায়ও।

এভাবে প্রায় মাসখানেক এখানে বাঘিনীটি ছিল দীপ আর আলোকে নিয়ে। তারপর একদিন তাদের নিয়ে বাঘিনী চলে গেল জঙ্গলে।

আর আসেনি? বিমান জিজ্ঞাসা করলে।

না। বলেই বটুক বললে, জানো, দীপ আর আলো চলে যেতে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হতো ওরা যদি থাকতো, খুব ভালো হতো। কিন্তু তারা থাকবে কেন? তারা বনের পশু, বনে থাকতেই চায়। দীপ আর আলো চলে যাওয়ার পর রানা সাহেব বলেছিলেন, আমরা মানতে চাই না, কিন্তু একটা কথা সবারই মনে রাখা দরকার, বনের পশু-পাখিদেরও আমাদের মতো মন আছে। এই যে আমরা বাঘকে হিংস্র বলি, এটা ঠিক নয়। প্রকৃতি ওদের মাংসাশী করেছে। নয়তো ওদেরও মন আছে, ওদেরও স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা সবই আছে। এই যে বাঘিনী দুটো বাচ্চাকে নিয়ে এখানে এসেছিল, সে তো বুঝেছিল জঙ্গলের অফিসই তাদের নিরাপদ আশ্রয়। কই, যে মানুষকে ওরা শত্রু ভাবে, সেই মানুষের হাতে রাইফেল দেখেও তো বাঘিনী ভয় পেতো না। সে কিন্তু বিশ্বাস করেছিল আমাদের।

চাঁদ ডুবছে আকাশের কোণে। রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। টাওয়ারে বসে সান্ত্রী বটুক ওঝা আরো অনেক গল্প শোনালো, সবই জঙ্গলের গল্প। ধীমান আর বিমান অবাক হয়ে শুনলো সে-সব।

আরো গল্প শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাদ সাধলো বিশু। বললে, ভাই আর নয়, এবারে চলো। ঘরে গিয়ে শান্ত ছেলের মতো শুয়ে পড়ো। আর গল্প যদি শুনতে চাও, আমি শোনাবো। তবে আজ এই শেষ রাতে নয়, এখন বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে নাও। মনে নেই কাল আমাদের বন দেখতে যাওয়ার কথা।

বিমান জিজ্ঞাসা করলে, কাল কখন আমরা যাবো বিশুদা?

বিশু বললে, রানা সাহেব যখন ব্যবস্থা করবেন তখন যাবে। তবে জানি না আমার যাওয়া হবে কিনা।

ধীমান বললে, কেন, তুমি যাবে না বিশুদা?

বিশু বললে, সাহেব যদি যেতে বলেন তোমাদের সঙ্গে, তা হলেই যাবো। নয়তো নয়।

কথা বলতে বলতে ঘরে এলো ওরা। ঘরে ঢুকেই দেখলো, কালুয়া তক্তাপোশের কোণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে গোঁ গোঁ করছে।

বিশুর আদরের বিড়াল কালুয়া। বাইরে থেকে ঘরে এলেই ছুটে এসে বিশুর পায়ে মাথা ঘষতে আরম্ভ করে। হঠাৎ কি হলো তার?

বিশু জিজ্ঞেস করে, কি রে কালুয়া, অমন গোঁ গোঁ করছিস কেন। রাগে তোর গায়ের লোম তো খাড়া হয়ে উঠেছে। কার ওপর রাগ?

কালুয়া এবারে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতে লাগলো। বিশুর কেমন ধন্দ লাগলো। নিশ্চয়ই কোনো কিছু দেখেছে, নয়তো অমন করবে কেন?

তক্তাপোশের কাছে গিয়ে কালুয়ার পিঠে হাত বুলোতে গেল বিশু। কালুয়া ভীষণ রেগে ছিল। সে থাবা মারতে গেল বিশুর হাতে। আর সেই মুহূর্তে দেখা গেল বিছানার চাদরের নিচে কি যেন নড়ছে।

হাত দিয়ে চাদরের কোণ তুলে ধরেই পিছু হটলো বিশু। একটা সাপ হিলিহিলিয়ে নিচে নেমে এলো। ধীমান আর বিমান টেবিলের ওপর উঠে পড়লো। কালুয়া তড়াক করে লাফিয়ে সাপটার লেজে থাবা মারলো।

সাপটা কালাচ সাপ। ফণা না ধরলেও ভয়ানক বিষাক্ত। ঘরের কোণে বাঁশের লাঠি ছিল। সড়কিও ছিল। লাঠিটা হাতে নিয়ে সজোরে সাপটার মাথায় মারলো বিশু। সাপটা আহত হয়ে ছটফট করতে লাগলো।

আরো বারকয়েক লাঠির ঘা মারতে সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কিন্তু তখনো তার লেজের দিকটা নড়ছে।

কালুয়া এবারে বিশুর পায়ে মাথা ঘষতে লাগলো।

এখন ধীমান ভাবছে পায়ের নিচে গোড়ালির কাছে সুড়সুড়ির কথা। এই সাপটাই তাহলে ছিল চাদরের নিচে। কালুয়ার জন্যেই বেরোয়নি। কথাগুলো মনে হতেই ধীমানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

বিমান বললে, দেখলে কেমন গা শিরশির করছে। চলো বিশুদা, সাপটা ফেলে দিয়ে আসি।

সাপটাকে পোড়াতে হবে। বিশু বললে, তবে এখন নয়, রাত শেষ হোক, তারপর।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পুবের আকাশে আলোর আভাস। লাঠির মাথায় সাপটাকে নিয়ে বাইরে এলো বিশু। পিছনে ধীমান আর বিমান।

বাইরে বেরোতেই দেখা গেল রানা সাহেব, মানে ধীমান, বিমানের ছোটকা বিভূতি রানা বাবলার দাঁতন মুখে দিয়ে অফিস প্রাঙ্গণে পায়চারি করছেন। লাঠির ডগায় সাপ দেখেই বলে উঠলেন, আরে এ যে দেখছি কালাচ সাপ। কোথায় ছিল?

ধীমানই বলে উঠলো, আমার বিছানায়, পায়ের কাছে চাদরের নিচে।

রানা বললেন, বলিস কি!

ধীমান বললে, জানো ছোটকা, আমার পায়ের নিচে সুড়সুড় করছিল, তাইতে ঘুম ভেঙে যায়।

রানা বললেন, বুঝেছি। তারপর আর না ঘুমিয়ে টাওয়ারে উঠেছিলে, তাই তো।

ছোটকা, তুমি—বলেই চুপ করে গেল বিমান।

বেরিয়েছিলাম বন টহল দিতে, রানা বললেন, ভাবছিস, কখন ফিরলাম, কি করে জানলাম—এই তো? যাকগে সে কথা, এখন বল রাতে চাঁদের আলোয় বন কেমন লাগলো?

বিমান বললে, চমৎকার ছোটকা।

ধীমান বললে, আমার মনে হচ্ছিল সুন্দর একটা স্বপ্নের জগৎ দেখছি।

সত্যি স্বপ্নের জগৎ। রানা বললেন, এখন বুঝতে পারছিস তো কেন আমি ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্টের শহরে থাকতে চাই না।

কথার মধ্যে আরো কয়েকজন এসে গেছে। কালাচ সাপটা দেখলো সবাই। এখানে যারা থাকে তাদের কাছে সাপ নতুন কিছু নয়। তবে এখন শীতকাল, এই সময়ে সাপ খুব বেশি দেখা যায় না।

রানা বললেন, তোরা যদি টাওয়ারে না গিয়ে ঘরে থাকতিস, তাহলে হয়তো একটা বিপদ ঘটে যেতো। জানিস, অলক্ষ্যে অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা

ঘটে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যার কারণ খুঁজে বার করা যায় না।

রানা সাহেব আর দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন জেটির দিকে। প্রতিদিন ভোরে কাঠের জেটির ওপর গিয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস।

রায়মঙ্গলের ধারে ঝিঙেখালি জঙ্গল অফিসের জেটিঘাটে বনবিভাগের স্পীড-বোট বাঁধা। এই বোটে আজ ধীমান, বিমান বেড়াতে যাবে সুন্দরবনের গভীরে।

স্পীডবোটের চালক গোলাম রহমান। বয়স যদিও তার পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কিন্তু চেহারা এখনো তরতাজা যুবকের মতো। অমন মজবুত শরীর এই অফিসে আর কারো নেই।

ক'দিন ছুটিতে ছিল গোলাম। গতকাল রাতে এসেছে। এখনো তার দেখা হয়নি রানা সাহেবের ভাইপো দুটির সঙ্গে। রানা সকালেই বলে দিয়েছেন ভাইপো দুটিকে জঙ্গল এলাকা ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাতে। কিন্তু যেখানেই যাক, যেন সন্ধ্যের আগে ফিরে আসে।

বেলা এখন নটা। গোলাম রহমান রওনা হবার জন্যে তৈরি।

ধীমান, বিমানের সঙ্গে তাদের বিশুদা তো আছেই, আর যাচ্ছে সান্ত্রী ভজগোবিন্দ তেওয়ারি ও বটুক ওঝা। যদিও বটুকের রাত ডিউটি ছিল, তবু সে নিজে থেকেই যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

পানীয় জল, দুপুর আর বিকালের খাবার সবই নিয়েছে বিশু। খাবারদাবার সঙ্গে রাখতেই হবে। বনের রাজ্যে ঢুকলে কোথাও কিছু মিলবে না। আর জলের দেশ হলে হবে কি সে জল মুখে দেবার উপায় নেই। এতই নোনা।

ধীমান আর বিমান আসছে। সুন্দর ফুটফুটে দুটি কিশোর। পিছনে রাইফেলধারী দুই বনরক্ষী ভজগোবিন্দ আর বটুক।

রানা সাহেবের সঙ্গে বিশুও আসছে। রানা সাহেব যাবেন না, জেটিঘাট অব্দি আসবেন।

গোলাম রহমান অবাক চোখে দুই ভাই-এর দিকে তাকিয়ে। দুই ভাই পাশাপাশি হেঁটে আসছে। দেখতে একই রকম। কে ধীমান, কে বিমান হঠাৎ চিনে নেওয়া যায় না। তবে মিলের মধ্যেও কিছু অমিল থাকে। প্রকৃতির নিয়ম এমনই, দুটি মানুষ কখনো এক হয় না। শুধু মানুষ কেন, কোনো দুটি প্রাণী, পাখি কিংবা অন্য কোনো কিছু এক হয় না।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় কে ধীমান, কে বিমান। ধীমানের কপালে পাশাপাশি দুটি তিল আছে। আর বিমানের চিবুক একটু সরু। ওরা যমজ ভাই। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দু'জনের জন্ম। মিনিটের হিসাবে ধীমান বড়। দুই ভাইয়ের দারুণ ভাব। একে অপরকে ভাই বলে ডাকে।

দুই ভাই-এর চেহারায় যত মিলই থাকুক, স্বভাবে কিন্তু দারুণ অমিল। ধীমান শান্ত, ধীর-স্থির আর বিমান চঞ্চল ও অস্থির।

লেখাপড়ায় দু'জনেই সমান। একই ক্লাসে পড়ে। পরীক্ষায় ওরা প্রথম ও দ্বিতীয় হবেই। তবে কে কোনবার প্রথম হবে তার ঠিক নেই। এখন ওরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে ঝাড়গ্রাম স্কুলে।
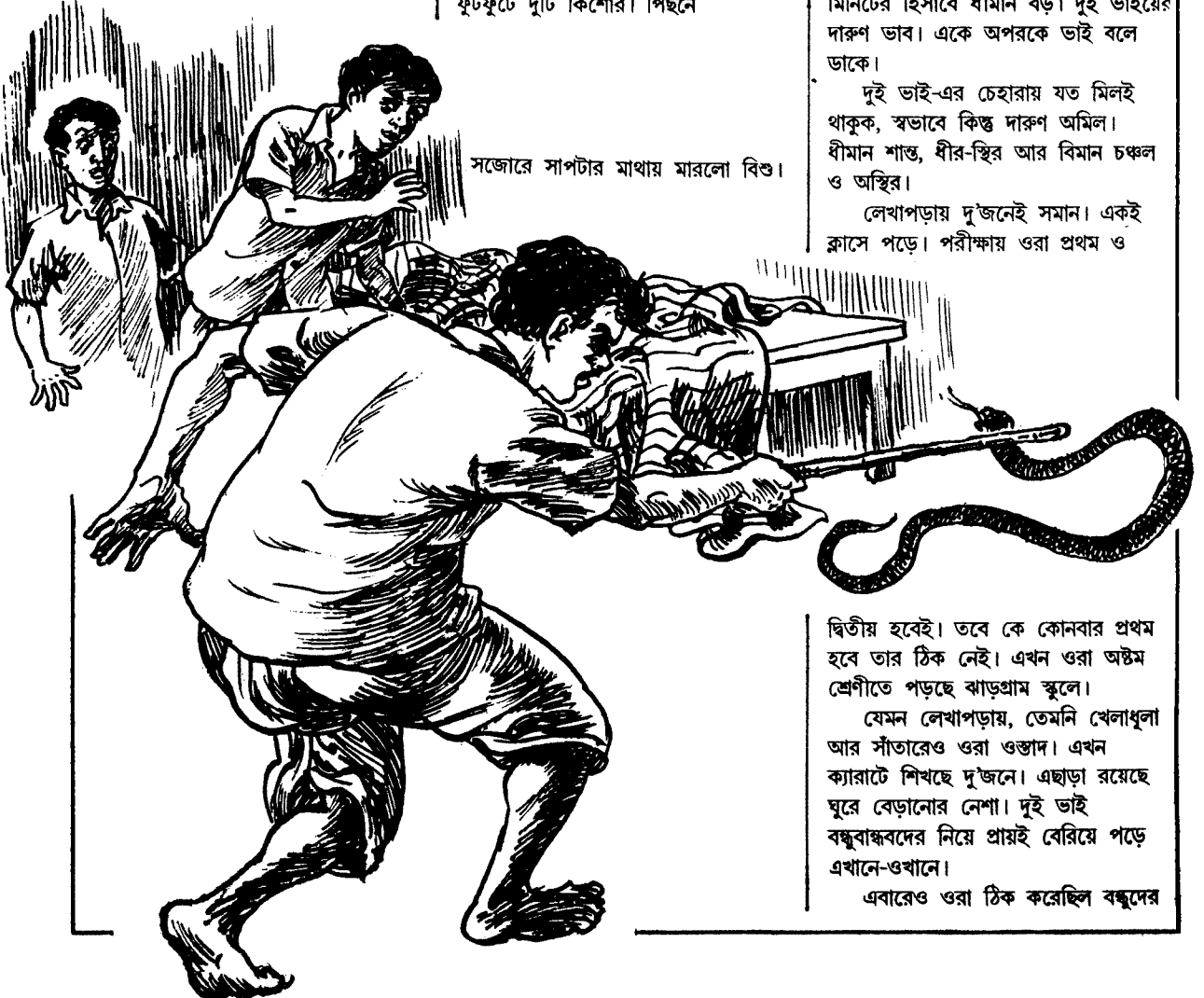
সজোরে সাপটার মাথায় মারলো বিশু।

যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলা আর সাঁতারেও ওরা ওস্তাদ। এখন ক্যারাটে শিখছে দু'জনে। এছাড়া রয়েছে ঘুরে বেড়ানোর নেশা। দুই ভাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে।

এবারেও ওরা ঠিক করেছিল বন্ধুদের

নিয়ে আসবে সুন্দরবনে। কিন্তু তাদের অভিভাবকরা আসতে দেননি। তাঁদের কথা হলো, ওখানে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ, এছাড়া সাপখোপ তো আছেই, ওখানে যাওয়া ঠিক নয়।

শেষটা ছোটকার সঙ্গে দুই ভাই চলে এসেছে। বন্ধুরা কেউ আসেনি বলে তাদের মন একটু খারাপ হয়েছিল।

জঙ্গল অফিসের একান্তে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে একটা চালায় বনবিবি, দক্ষিণরায় আর শা-জঙ্গলির মূর্তি। এই তিন লৌকিক দেব-দেবীকে এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে। যখনই তারা নদীপথে কোথাও যায়, কিংবা জঙ্গলে ঢোকে— তখনই এই দেব-দেবীকে প্রণাম করে যায়।

বনবিবির মূর্তিটি অন্যান্য দেবী প্রতিমার মতো। দক্ষিণরায় কিন্তু ঠিক মানুষের মতো। পরনে ধুতি-জামা, কাঁধে বন্দুক, পায়ে শুঁড়তোলা জুতো তো আছেই। শা-জঙ্গলিও মানুষের মতো। দক্ষিণরায় আর শা-জঙ্গলিকে নিয়ে নানা বিচিত্র কাহিনী এখানকার লোকের মুখে-মুখে শোনা যায়।

সাড়ে নটা বাজে।

এবারে সবাই স্পীডবোটে উঠলো। গোলাম রহমান যেমন দুঃসাহসী তেমনই একগুঁয়ে। তবে স্পীডবোটের চালক হিসাবে দারুণ দক্ষ।

রানা সাহেব বারবার গোলাম রহমানকে একই কথা মনে করিয়ে দিলেন, যেন কোনো রকম ঝুঁকি না নেয়। আর কোথাও কোনো কারণে যেন কেউ ডাঙায় না নামে।

স্পীডবোট স্টার্ট দেবার মুহূর্তে রানা সাহেব বললেন, রহমান ভাই, আমি দেখতে চাই সন্ধ্যের মধ্যে তোমার স্পীডবোট এসে দাঁড়িয়েছে জেটিতে।

ওই এক মানুষ গোলাম রহমান। কোনো কথাতেই সহজে কথা বলবে না। তবে সব কথাই মন দিয়ে শুনবে।

রানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি, আমার কথা মনে থাকবে তো?

গোলাম রহমান শুধু মাথাটা একটু নাড়লো। কোনো কথা বললে না। তবে স্পীডবোটে স্টার্ট দিয়ে গোলাম রহমান একবার রানা সাহেবের দিকে তাকালো। রানা সাহেব হাত নাড়লেন।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন গুমরে উঠলো। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলো স্পীডবোট। গোলাম রহমানের মুখে এই প্রথম কথা শোনা গেল। ধীমান আর বিমানকে উদ্দেশ করে বললে, ঠিক-ঠাক বসে থাকবে ভাইয়েরা। একদম এদিক-ওদিক করবে না।

স্পীডবোট কাজল ছুটছে রায়মঙ্গলের বুকের ওপর দিয়ে। নদীতে এখন জোয়ার, বোট ছুটছে স্রোতের বিপরীতে। দুরন্ত তার গতি। জল ছিটকে ছিটকে উঠছে স্পীডবোটে।

ধীমান আর বিমানের কাছে এ এক রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো। কাজল ছুটছে ঝড়ের গতিতে। এমন ভাবে জল কেটে যাচ্ছে, সামনের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে ফোয়ারা। গোলাম রহমান একভাবে বসে আছে। কোনো দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না।

এখনো জঙ্গল এলাকায় ঢোকেনি তারা। এখানে রায়মঙ্গলের একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে গ্রাম-জনপদ।

বটুক ওঝা রাইফেল কোলের ওপর রেখে সুন্দরবনের গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু গল্প শোনায় মন নেই ধীমান আর বিমানের। তাদের দু' চোখে দেখার নেশা।

জঙ্গলের পাড় ঘেঁষে ছুটছে কাজল। রূপালি রোদ্দুরে ঝলমল করছে রায়মঙ্গলের জল। এখন শীতকাল, নদী শান্ত, কিন্তু তরঙ্গহীন নয়।

নদীতে আরো নৌকা যাওয়া-আসা করছে। তবে বেশির ভাগই চলেছে স্রোতের টানে। উজানেও চলেছে কিছু নৌকা। মাঝে মাঝে এক-একটা লঞ্চও চোখে পড়ছে। যাত্রীবাহী লঞ্চ।

ঘণ্টাখানেক একটানা ছুটে এসে বাঘনা জঙ্গল অফিসের জেটিতে কাজল দাঁড়ালো।

এখানকার জঙ্গলবাবু তারণ মানডি জেটির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন। রানা সাহেব ঝিঙেখালি অফিস থেকে ওয়ারলেসে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দুই ভাইপো যাচ্ছে জঙ্গল দেখতে। তারা বাঘনা এলাকা দিয়েই জঙ্গলের ভেতরে ঢুকবে।

তারণ মানডির চিনে নিতে অসুবিধে হলো না রানাবাবুর দুই ভাইপোকে। তাদের দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন, নেমে এসো তোমরা। ভেবো না সুন্দরবনে তোমাদের একজনই কাকা আছেন, আমিও তোমাদের আর এক কাকা।

সবাই নেমে এলো। কাজলকে জেটির খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নেমে এলো গোলাম রহমানও। তারণ মানডি সবাইকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে তিনি জলযোগের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। হালুয়া আর ডিমভাজা।

খাইয়েই তৃপ্ত হলেন না তারণ মানডি। যাওয়ার সময় খানিকটা হালুয়া আর কয়েকটি নারকেল নাড়ু তিনি তুলে দিলেন দুই ভাইয়ের হাতে। ধীমান আর বিমানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাদের ছোটকাকে নিয়ে একদিন এখানে চলে আসবে। কেমন?

ধীমান বললে, নিশ্চয়ই আসবো।

তারণ মানডি বললেন, আর একটা কথা জেনে রাখো। ঝাড়গ্রামের মানিক-পাড়ায় আমার বাড়ি। তাহলে আমি হলাম গিয়ে তোমাদের ঝাড়গ্রামতুতো কাকা।

দুই ভাই না হেসে পারলো না।

তারণ মানডি বললেন, হাসছো কেন?

আপনার কথা শুনে। বিমান বললে, আপনাকে আমরা ভালোকাকা বলে ডাকবো।

ভালোকাকা! তারণ মানডির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, সেই ভালো। তোমরা আমাকে ভালোকাকা বলেই ডাকবে। ঠিক আছে, আর দেরি কোরো না। এগারোটা বেজে গেছে। শীতের দিন, দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যাবে।

জেটিঘাটের কাছাকাছি এসে গোলাম রহমানকে একান্তে ডেকে কিছু বললেন মানডি। কি বললেন বোঝা গেল না। গোলাম রহমানও কোনো কথা বললে না। মানডি সাহেবের কথা শুনলো এই পর্যন্ত।

আবার যে যার মতো স্পীডবোটে উঠে বসলো। গোলাম রহমান মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে। গুমরে উঠলো ইঞ্জিন। এক ঝাঁক বক বসেছিল গাছের ওপরে। ইঞ্জিনের শব্দে বকগুলো উড়ে গেল। তাদের সঙ্গে কিছু পাখিও।

এখানে নানা জাতের পাখি আছে। বিদেশের পাখিরাও শীতের মরশুমে এই সুন্দরবনে আসে। এমন কি সুদূর সাইবেরিয়ার পাখিরাও হাজার হাজার মাইল আকাশ সাঁতরে চলে আসে সুন্দরবনে।

সুন্দরবনের গাছপালার পরিচয় বিশুর

বোট ছুটছে স্রোতের বিপরীতে।
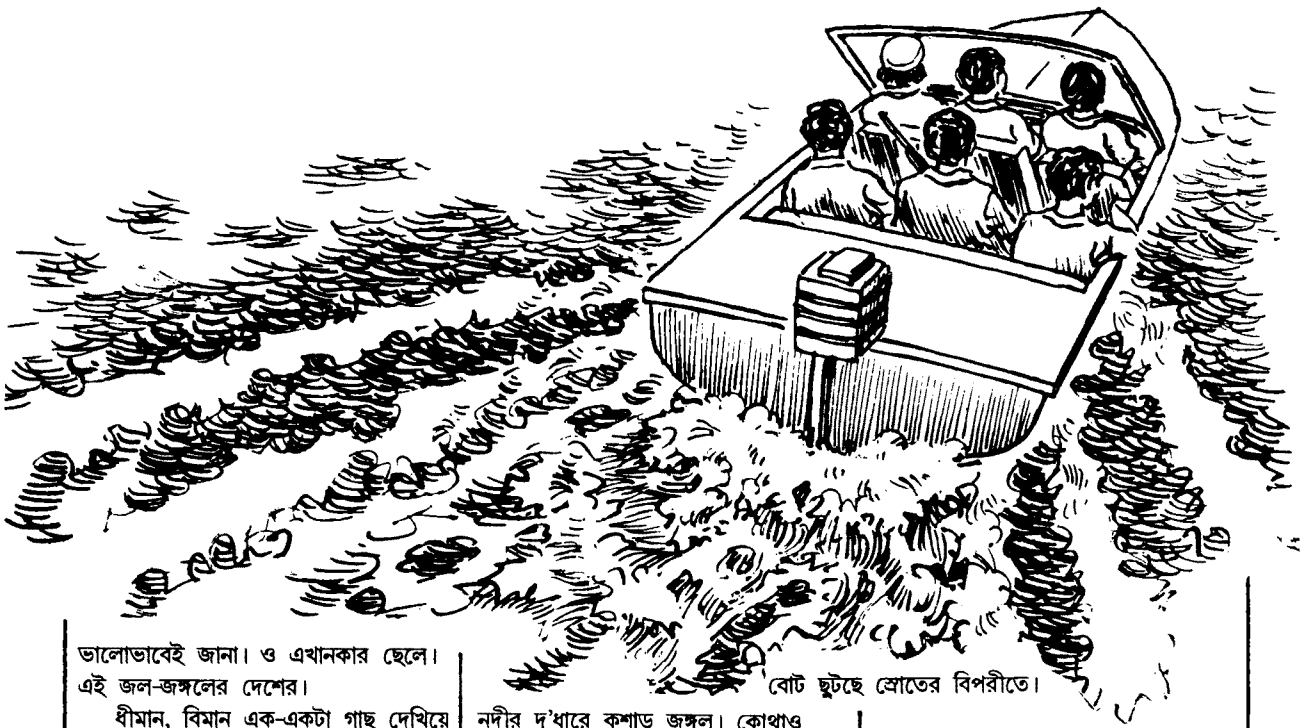
ভালোভাবেই জানা। ও এখানকার ছেলে। এই জল-জঙ্গলের দেশের।

ধীমান, বিমান এক-একটা গাছ দেখিয়ে জানতে চাইছে, এটা কি গাছ, ওটা কি গাছ। বিশু গাছের নাম বলে দিচ্ছে। কেওড়া, গরান, গর্জন, ওড়া, পিটুলি, পশুর, ধুন্দুল ছাড়া আরো কত নামের গাছ। আর সুন্দরী গাছ তো আছেই। সবচেয়ে সুন্দর দেখতে কাকড়া গাছগুলোর পাতা। হেতাল গাছও দেখতে চমৎকার। আর এই হেতাল ঝোপেই রাজা বাঘেরা থাকতে ভালোবাসে।

রায়মঙ্গলের বুকে জলের ওপর ভাসতে দেখা যাচ্ছে জলপিপিদের। ত্রিভুজ সৃষ্টি করে জলপিপিরা নদীর জলে ভাসছে। স্পীডবোট কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পানকৌড়ি।

সাদা বক ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আছে নদীর ধারের গাছের ডালে ডালে। আবার নদীর ধারের পলির ওপরেও লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে খাদ্যের সন্ধানে। ছোট ছোট মাছ খেতে ওরা ভালোবাসে। পলির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া, মেনি মাছ। বকেরা ধরে ধরে খাচ্ছে। ধীমান আর বিমান অবাক চোখে দেখছে চারদিকের দৃশ্যপট।

এবারে রায়মঙ্গল নয়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিদ্যে নদী ধরে চলেছে স্পীডবোট কাজল।

মাকড়সার জালের মতো সুন্দরবনকে জড়িয়ে রেখেছে নদী, খাল, খাঁড়ি। বিদ্যে নদীর দু'ধারে কশাড় জঙ্গল। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত গভীর যে, সূর্যের আলো পড়ে না মাটিতে।

স্পীডবোটের গতি এখন কিছুটা মন্থর। দুই ভাই অবাক চোখে দেখছে গভীর বনভূমি।

হঠাৎ চোখে পড়লো বিচিত্র এক দৃশ্য। দলে দলে বানর বসে আছে গাছে, আর নিচে অজস্র হরিণ। বানরের দল কচি কচি ডাল ভেঙে নিচে ফেলে দিচ্ছে, হরিণেরা সেই ডালের পাতা আনন্দ করে খাচ্ছে।

স্পীডবোটের শব্দে হরিণেরা একটু ভীত হলো। কিন্তু ছুটে পালালো না। ওরা বনের পশু হলেও, বুঝতে পারে কে ওদের শত্রু, কে মিত্র।

বটুক বললে, বনবিভাগের লঞ্চ কিংবা স্পীডবোট দেখলে ওরা বুঝতে পারে। ওরা জানে আমাদের রাইফেলের গুলি ওদের বুকে বিঁধবে না।

নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে আরো এক সুন্দর দৃশ্য অপেক্ষা করছিল দুই ভাই-এর জন্য। ধীমান আর বিমান দেখলো পাড়ে খানিকটা জায়গা ফাঁকা মাঠের মতো। সামান্য ঝোপঝাড় ছাড়া কোনো গাছপালা নেই। ওখানে বন এলাকা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেশ উঁচু একটা টাওয়ার আছে। নদীর ধার থেকে একটা পথ চলে গেছে টাওয়ারের দিকে। পথের দু'দিক গরানখুঁটি আর কাঁটাতার দিয়ে মজবুত করে ঘেরা, ওপরেও তারের জাল। যাতে টাওয়ারে ওঠার পথে কোনো বিপদ না হয়।

ধীমান আর বিমান জিদ ধরলো টাওয়ারে উঠবে। গোলাম রহমান স্পীডবোট দাঁড় করালো। হর্ন দিতে লাগলো বার বার। মিনিট দশেক বাদে দেখা গেল দু'জন সান্ত্রী এদিকে আসছে। তারা এখন ডিউটিতে।

এরা চামটা অফিসের লোক। বনরক্ষী। টহল দিতে বেরিয়েছে বন এলাকায়। দু'জন সান্ত্রীকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বাকিরা স্পীডবোট নিয়ে চলে গেছে নেতি ধোপানির বাদাবনের দিকে। ফেরার পথে এদের তুলে নিয়ে যাবে।

বেলা একটা বাজতে চললো। এবারে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে নিতে হবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া হবে কোথায়? স্পীডবোটে না টাওয়ারে?

কাঠের টাওয়ার। বেশ উঁচু। ধীমান, বিমানের ইচ্ছে টাওয়ারে উঠে খাওয়া-দাওয়া করে। কিন্তু টাওয়ারে একসঙ্গে এত মানুষের ওঠা নিষেধ। অগত্যা বোটেই খাওয়া-দাওয়ার পালা সারতে হলো।

খাওয়ার আয়োজন বেশ জবর। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পরোটা, আলুর দম, কষা মাংস তো আছেই, এর ওপরেও আছে ভালোকাকা অর্থাৎ তারণ মানডির দেওয়া

হালুয়া আর নারকেল নাড়ু। ভজগোবিন্দ শিশিভর্তি আচারও এনেছে। যা কিছু খাবার ভজগোবিন্দ নিজের হাতেই বানিয়েছে। খাওয়ার ব্যবস্থা রানা সাহেব তাকেই করতে বলেছিলেন।

বিশু সকলের জন্যে খাবার ভাগ করছে। হিসেব মতো খাবার দিয়ে বাকি খাবার পাত্রে রেখে দিলে। প্রয়োজন মতো যে যার চামচ দিয়ে তুলে নেবে।

হঠাৎ বিমান বলে বসলো, আমার সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে।

ও ইচ্ছেটা মনের মধ্যে থাক। বিশু বললে, এখানকার নদীতে কি থাকে জানো তো।

ভজগোবিন্দ' বললে, যা আছে তা আছে। নাম করার কি দরকার! এখন সব খেতে আরম্ভ করো। ক্ষিধেয় আমার পেট চুঁইচুঁই করছে।

বটুক বললে, কেন সকালে কিছু খাওনি? নিজের হাতে খানা বানালে তেওয়ারি, আর একটু চেখে দ্যাখনি? তুমি তো পেটটা নিয়েই আছো।

ভোজন পর্ব আরম্ভ হলো। খেতে খেতে বিশু বললে, আচ্ছা রহমান দাদা, নেতি ধোপানির দিকটা পাক দিয়ে ফিরলে কেমন হয়?

ভালোই তো হয়। গোলাম রহমান বললে, কিন্তু আকাশের ভাব দেখেছো? তাছাড়া শীতটা আজ কেমন কম।

ভজগোবিন্দ বললে, আরে এখন তো শীতকাল। পোষ মাসে আকাশে অমন মেঘ-মেঘ ভাব এক-এক দিন হয়। অনেক সময় ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে। এ তো বোশেখ মাস নয়, যে মেঘ দেখলেই ঝড়ের ভাবনা ভাববে।

বটুক বললে, এ-যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। রহমান ভাই-এর মনেও তাহলে ভয় আছে!

রহমান সে কথায় কানই দিলে না যেন। বললে, সাহেবের ভাইপো দুটি বেড়াতে এসেছে, তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবো বনের রাজ্য, এতে তো আমারই সব চেয়ে বেশি আনন্দ হওয়ার কথা। দেখি কি হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো নানা কথা, নানা গল্পের মধ্যে। তারপর ধীমান আর বিমানকে নিয়ে টাওয়ারের ওপরে উঠলো বিশু। এখানকার দুই সান্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে বসলো ভজগোবিন্দ আর বটুক। কোনো কথায় বা গল্পে মন নেই গোলাম রহমানের। সে বারবার আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে তাকাচ্ছে। যেখানে ধূসর রঙের মেঘ ছোট একটি পাহাড়ের রূপ নিয়েছে।

চব্বিশ বছর এই জল-জঙ্গলের দেশে বনদপ্তরের স্পীডবোট চালাচ্ছে রহমান। বাদাবন এলাকার নদী-নালার নাড়িনক্ষত্র তার জানা।

রহমান জানে কোন নদীতে কোথায় ডুবো চর আছে, জানে কোথায় চোরা ঘূর্ণি আছে, তবু মাঝে মাঝে তার ভুল হয়ে যায়। কত সময় চরম বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে। সাহসের সঙ্গে সে বিপদের মোকাবিলাও সে করেছে।

এই তো গত বছর, বর্ষার সময়—বাদা-বনের দেশের নদী-নালা যখন অথৈ জলে টইটম্বুর, জঙ্গলের ভিতরে টহল দিচ্ছিল স্পীডবোট নিয়ে। বোটে ছিলেন রানা সাহেব আর তিনজন সান্ত্রী। গিয়েছিল বিপদসঙ্কুল চামটা এলাকায়। জোয়ারের সময় খাঁড়ি দিয়ে ঢুকেছিল জঙ্গলের গভীরে। মাকড়সার জালের মতো অজস্র খাল, খাঁড়ি, নালি জঙ্গলের গভীরে। ফেরার পথে দিক ভুল হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে গিয়েছিল কালিন্দীর পারে বাংলাদেশের সীমানায়। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরে স্পীডবোটের মুখ ঘুরিয়ে দুরন্ত গতিতে বিপদসীমার বাইরে চলে এসেছিল। তখন ছিল রাত, টিপটিপ করে বৃষ্টিও হচ্ছিল।

রহমানকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ভজগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো রহমান ভাই?

রহমান কোনো কথা না বলে স্পীড-বোটের হর্ন বাজাতে লাগলো। আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এখনি বোট ছাড়া দরকার। এই সময় তার মনে পড়লো রানা সাহেবের কথা, যেন সন্ধ্যের আগে সে ঝিঙেখালি ফিরে আসে।

টাওয়ারের ওপর থেকে জঙ্গলের রূপ দেখে ফিরে এলো ধীমানেরা। ওরা বোটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রহমান মেরুদণ্ড সোজা করে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। একবার হাতের ঘড়িতে সময়ও দেখে নিলে রহমান। আড়াইটে বাজে।

এবারে আর নদীপথে নয়, একটা খালের মধ্যে ঢুকে পড়লো রহমান। খালটা খুব সংকীর্ণ নয়। এই খাল দিয়ে আড়াআড়ি পথে যাবে হেড়োভাঙা নদীতে।

তীব্র গতিতে ছুটছে কাজল। ইঞ্জিন গুমরে গুমরে উঠছে। এখানে খালের দু'ধারে গভীর অরণ্য। দেখা যাচ্ছে হরিণ, বানর। নানা জাতের পাখ-পাখালিও চোখে পড়ছে।

ভজগোবিন্দ রাইফেল বুকের ওপর নিয়ে শুয়ে পড়লো। বটুক কিন্তু স্পীড-বোটের পিছনেই বসে আছে। সান্ত্রীর যা কাজ, শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে রাইফেল।

বিমান এক সময় ভজগোবিন্দর রাইফেলটা হাতে নিতে গেল। ভজগোবিন্দ বললে, উঁহু, ওটি হবে না খোকাবাবু।

বিমান বললে, আমাকে রাইফেল চালানো শিখিয়ে দেবেন তেওয়ারি কাকা?

ভজগোবিন্দ বললে, বড়ো হও, শিখবে।

হঠাৎ সবাই সচকিত হলো বাঘের ভয়ংকর গর্জনে। দূরে নয়, গর্জন ভেসে আসছে খুব কাছ থেকে।

ভজগোবিন্দ উঠে বসলো। শক্ত মুঠোয় ধরলো রাইফেল। স্পীডবোটের গতি এখন খুবই মন্থর। ইঞ্জিনেও তেমন আওয়াজ নেই।

বাঘের গর্জন শুধু নয়, একটা গোঙানির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

স্পীডবোট কাজল খালের মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে বাঘের গর্জন।

ধীমান আর বিমান উঠে দাঁড়াতে গেল। রহমান বলে উঠলো, যেমন বসে আছো, তেমন বসে থাকো। কেউ নড়াচড়া করবে না।

খাল যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে দেখা গেল, ভয়ংকর এক রোমহর্ষক দৃশ্য। হেতাল ঝোপ তোলপাড় করছে রাজা বাঘ আর বুনো শুয়োর। বুনো শুয়োরের মুখে ছুঁচলো দুটি বড় বড় দাঁত। এই জাতীয় বুনো শুয়োরকে এই এলাকার লোক দাঁতাল বলে। সুন্দরবনের রাজা বাঘের চেয়ে এরা কম ভয়ংকর নয়। বাঘের হাত থেকে যদি বা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু দাঁতাল যদি ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে আসে তাহলে রক্ষা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বুনো শুয়োর সমানে লড়ে যাবে।

হেতাল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো বাঘ আর দাঁতাল। বাঘের পেট ফুটো করে দিয়েছে দাঁতাল। দাঁতালের সাদা দাঁত দুটি রক্তে লাল। শুয়োরেরও সর্বাঙ্গ ক্ষত-

বিক্ষত। বাঘ খানিক পিছু হটে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে দাঁতালের ওপর, দাঁতালও তেমনি সজোরে গোঁত্তা মারছে বাঘকে।

ধীমান রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে। আর দেখতে চাইছে না সে। বারবার চোখ বন্ধ করছে।

বাঘ আর শুয়োর খালের কিনারায় চলেছে। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েও ওরা সমানে লড়ে যাচ্ছে। বাঘ যে কামড় বসাবে দাঁতালের গায়ে সে সুযোগই পাচ্ছে না।

বাঘ পিছু হটে নরম পলির ওপর এসে পড়লো। তার পিছনের পা দুটি নরম পলির মধ্যে। পা টেনে তুলতে পারছে না। দাঁতালও নেমে এলো পলির ওপর। বাঘ এই সুযোগে সামনের দুটো থাবা তুলে দিল দাঁতালের ওপর। পলিতে ঢুকে গেল দাঁতালের চারটে পা। বাঘ ভয়ংকর গর্জন করে দাঁতালের ঘাড়ের কাছে কামড় বসালো।

এই মুহূর্তে আরো দৃশ্য—খালের ধারের গাছের ওপর দলে দলে জড়ো হয়েছে বানর, তারা উপভোগ করছে এই দৃশ্য।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন চালু আছে। ভজগোবিন্দ আর বটুক রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে। আহত বাঘ আর আহত দাঁতাল—ওরা এখন প্রচণ্ড ক্ষেপে আছে। যে কোনো মুহূর্তে বাঘ জলে এসে পড়তে পারে।

নরম পলির ওপর পড়ে গেল বাঘ। দাঁতালের চোখে-মুখে কাদা। হয়তো ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে বাঘটাকে মরিয়া হয়ে গোঁত্তা মারতে লাগলো।

বাঘ নরম পলির ওপর শুয়ে। শুয়োরকে বাগে পেয়ে সামনের দুই থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। শুয়োরও ছাড়বে না। সে তার ছুঁচলো দাঁত দুটো বসিয়ে দিয়েছে বাঘের তলপেটে।

পলিকাদা লাল হয়ে গেছে। পলির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাঘ দাঁতালকে নিয়ে পড়ে গেল জলে।

জলে পড়ে বাঘ আর দাঁতাল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়, স্পীডবোট আবার চালাতে আরম্ভ করলো রহমান। বারকয়েক হর্ন বাজালো।

দেখা গেল জল থেকে আবার ডাঙায় উঠছে আহত বাঘটা। কিন্তু দাঁতালকে আর দেখা গেল না।

আবার তীব্র গতি পেল কাজল। জল কেটে কেটে ছুটছে।

সূর্য এখন পশ্চিমে। শীতের দিন, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

রহমানের দৃষ্টি পশ্চিম আকাশের দিকে। ধূসর রঙের মেঘ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও পৌষ মাস, তবু কেমন গুমোট ভাব। শীতের উত্তুরে হাওয়াও নেই।

পৌষ মাস বড় বিচিত্র মাস। এই মাসে ছয় ঋতুর প্রকাশ ঘটে। এবারে এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। আকাশে মেঘের যে চেহারা তাতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হয়, সে একরকম। কিন্তু যদি ঝড় ওঠে!

ভয় কি তা জানে না রহমান। কিন্তু আজ যেন ভয়ের ভূত ওর মনে চেপে বসেছে। এমন সাধারণত হয় না। এখন

ওরা সমানে লড়ে যাচ্ছে।
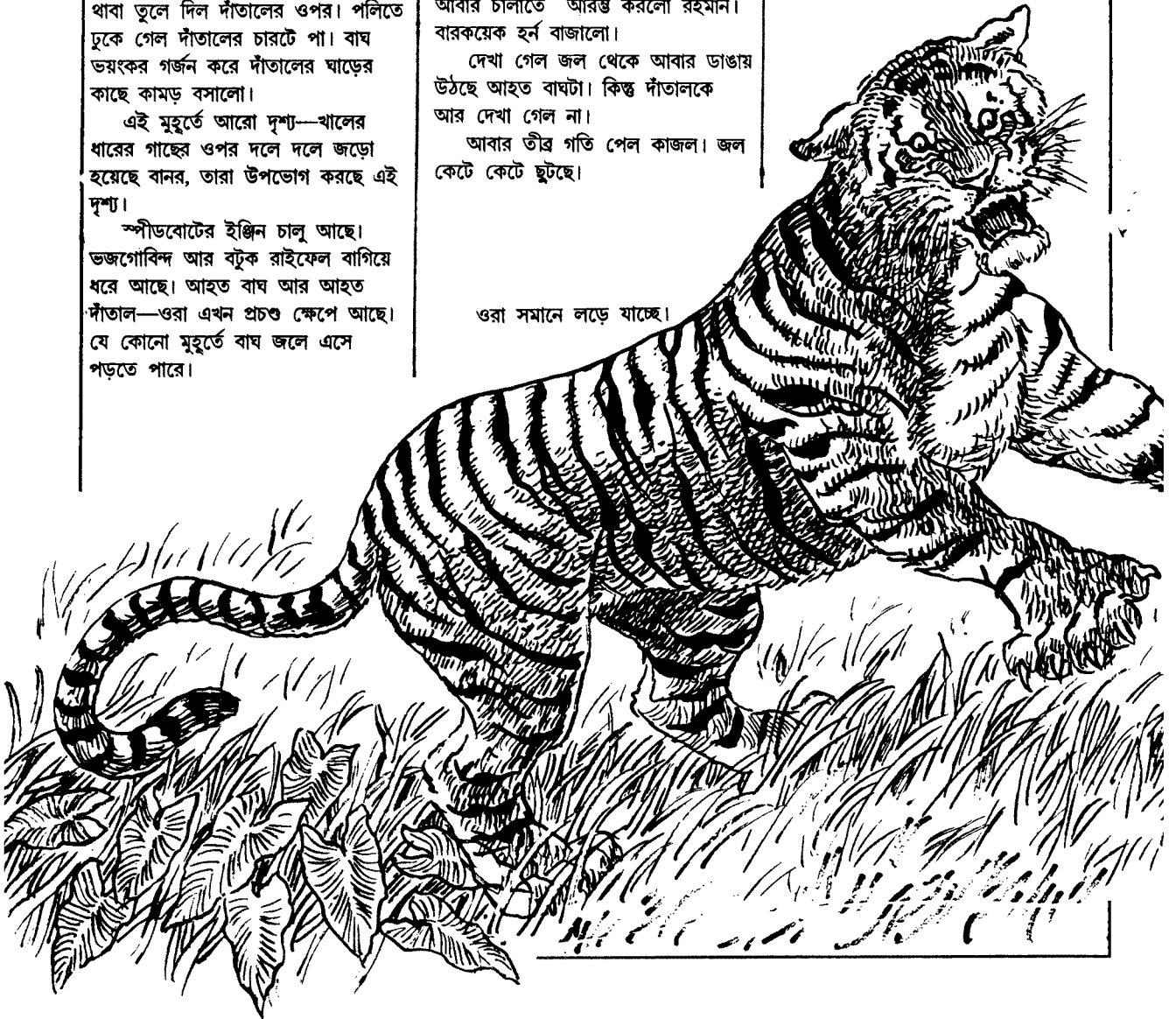
বার বার মনে হচ্ছে তার, রানা সাহেবের কথা। তিনি সন্ধ্যের মধ্যে ফিরতে বলেছেন। কিন্তু তা একরকম অসম্ভব। এখন চারটে বাজে। পাঁচটার আগেই সূর্যাস্ত। যদি ছ'টার মধ্যে ফিরতে পারে তাও ভালো। মনে মনে হিসেব করে দেখলো তাও সম্ভব নয়। আসার সময়ে আসতে হয়েছে স্রোতের বিপরীতে, আর ফিরতেও হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে। আসার সময় ছিল জোয়ার আর এখন ভাঁটা। স্রোতের বিপরীতে না হলে যাহোক করে হয়তো সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে ফিরতে পারতো।

যতটা গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব, বাড়িয়েছে রহমান। স্পীডবোট কাজলের সামনের দিকটা কেমন উঁচু হয়ে আছে। ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠছে।

এখন খাল নয়, বিদ্যে নদীর মাঝ বরাবর ছুটছে কাজল। ধীমান আর বিমানের মনের মধ্যে আনন্দ শিহরন। তাদের মনে হচ্ছে, যেন এক রোমাঞ্চকর অভিযান শেষ করে ঘরে ফিরছে।

এখন কারো মুখে কোনো কথা নেই। রহমান এবারে রায়মঙ্গল দিয়ে ফিরবে না। ফিরবে কালিন্দী দিয়ে। যদিও ঝড় উঠলে কালিন্দীও দামাল হয়ে ওঠে, কিন্তু রায়-মঙ্গলের মতো নয়। হয়তো দু'দশ মিনিট সময় বেশি লাগবে, তবু কালিন্দী দিয়েই ফিরবে ঠিক করেছে।

মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবছে। যদিও মেঘ ঘন ধূসর-কালো তবু পশ্চিম আকাশ কিছুটা রঙিন।

পাখিরা নীড়ে ফিরছে। হয়তো একটু আগেভাগেই। তবে নদীতীরের গাছের ডালে কোথাও সাদা বকের দল বসে আছে তপস্বীর মতো।

স্পীডবোট কাজল একটানা ছুটছে জল কেটে কেটে। বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে রহমান। আর পিছন ফিরে বার বার মেঘের দিকে তাকাচ্ছে।

মেঘ এখন আরো জমাট বেঁধেছে। মনে হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি হবে। ভাবছে আর যদি আধঘণ্টা সময় পায় তাহলে কালিন্দীর বন এলাকা পেরিয়ে যেতে পারবে। বন এলাকা পেরোতে পারলে আর তেমন চিন্তা নেই।

রহমান এবারে স্পীডবোটের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে। জানে এটা ঠিক নয়, তবুও। একবার চিৎকার করে বললেও, তোমরা যে যার সামলে বোসো। কেউ একটু এদিক-ওদিক করবে না।

সূর্য ডুবছে মেঘের আড়ালে। সূর্য ডুবলেও নদীর বুকে অন্ধকার তেমন ঘন হয়ে নামে না।

কালিন্দীর বুকে কোনো নৌকা বা কোনো কিছু চোখে পড়ছে না। জঙ্গল এলাকায় নৌকার যাওয়া-আসা এমনিতেই কম। যারা মাছ ধরে আর মধু সংগ্রহ করে, তাদের নৌকাই জঙ্গল এলাকায় যায়। মাছ ধরার কোনো মরশুম নেই, তবে মধু সংগ্রহের মরশুম আছে। মধু সংগ্রহের সময় এখনো আসেনি।

স্পীডবোটের ইঞ্জিন দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। গরম হয়ে গেছে ইঞ্জিন। এক নাগাড়ে স্রোতের বিপরীতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে রহমান।

ধীমানের মনের মধ্যে ভয়। বটুক আর ভজগোবিন্দ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। বিশু চুপচাপ। আর বিমান এর মধ্যে হঠাৎ গাইতে আরম্ভ করলো, খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে—

যদিও বিমানের সুরে সুর মেলালো ধীমান, কিন্তু তার বুক তখন ভয়ে দুরু দুরু করছে। গান গাইতে গাইতে তার মনে কিছুটা সাহস ফিরে এলো।

জঙ্গল এলাকা প্রায় পেরিয়ে এসেছে রহমান। আর দশ-বারো মিনিট সময় পেলে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে যাবে। সন্ধ্যা হয়েছে। এদিকে প্রায় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে। চারদিকের পরিবেশ থমথমে।

সামনেই চর আছে। ডুবো চর। রহমান স্পীডবোটের গতি কিছুটা মন্থর করলো। জোয়ারে এই চর জলের নিচে তলিয়ে যায়। ভাঁটায় কিছুটা জেগে ওঠে। চরের বালিতে যদি আটকে যায় স্পীডবোট, তাহলে বিপদ।

চর আছে নদীর মাঝ বরাবর। তাই তীর ঘেঁষে চলছে রহমান। হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে একটা শব্দ কানে এলো। ঝড়ের শব্দ। রহমান রীতিমতো শঙ্কিত। কালিন্দীর এই চর এলাকা দারুণ বিপদ-জনক। চর থাকার দরুন ঝড়ের সময় নদীতে এলোমেলো ঢেউ ওঠে। এখানে কয়েক জায়গায় চোরা ঘূর্ণিও আছে।

এবারে সার্চলাইট জ্বাললো রহমান। একটানা হর্ন বাজাতে আরম্ভ করলো। ঝড়ের গর্জন আরো স্পষ্ট।

দুরন্ত গতিতে ছুটে এলো ঝড়। মুহূর্তে ক্ষেপে উঠলো কালিন্দী। চিৎকার করে উঠলো রহমান, যে যেমন আছো, বোট আঁকড়ে ধরে বসে থাকো। ভয় নেই, মনে জোর রাখো।

স্পীডবোট টালমাটাল করছে। জল উপচে উঠছে বোটে। পরনের পোশাক-আশাক ভিজে গেল।

সেই ভয়ংকর ঢেউ-এর মোকাবিলা করে কাজল এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কাজলের অবস্থা কাগজের নৌকার মতো। মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেল।

সোজাসুজি নয়, একটু কোনাকুনি স্পীডবোটকে নিয়ে চলেছে রহমান। আর

থেকে থেকে চিৎকার করে বলছে, ভয় নেই, আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো।

চরের ডান দিক দিয়ে চলেছে রহমান। কালিন্দী এখানে উন্মাদ। মুখে যাই বলুক, রহমান বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। তারও মনের গভীরে চিন্তা, শেষটা অঘটন না ঘটে।

কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। কোনাকুনি ভাবে চলতে চলতে স্পীডবোটটা পাড়ের দিকে এলো। ওখানে ঢেউ আরো বেশি। কিন্তু রহমান জানে এখানে কড়েখালি নামে একটি খাল আছে।

অবশেষে দুরন্ত ঢেউ-এর মোকাবিলা করে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে স্পীডবোট। এতক্ষণে মনের মধ্যে একটু স্বস্তি। খাল বরাবর কিছুটা গেলেই কালিন্দী ফরেস্ট অফিস।

জঙ্গলের শেষ এইখানেই। এখানে খালের এক তীরে বাদাবন, অন্য তীরে গ্রাম। এখন ভাঁটা। খালে তেমন জল নেই। তবে ছোট স্পীডবোট কোনো রকমে চলতে পারে।

একবার মনে হলো রহমানের, ডান পাড়ে সবাইকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখলো, সেটা ঠিক নয়। এখানে জঙ্গলে যেমন ভয়, রাতে গ্রামের দিকে ঠিক তেমন না হলেও ভয় আছে। এই এলাকায় অগভীর খাল পেরিয়ে বনের বাঘ মাঝে মাঝে গ্রামে ঢোকে। সন্ধ্যের পর তাই এলাকার মানুষ খুব দরকার না হলে ঘরের বার হতে চায় না।

ঝড়ের তাণ্ডব সমানে চলেছে। মনে হয় হাজার হাজার দৈত্য লড়াই করছে। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে গাছ ভেঙে পড়ার। চোখের সামনেই গাছপালার ডাল ভেঙে পড়ছে। একটি গাছ যদি মাথার ওপর ভেঙে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই।

খালের মধ্যে দিয়ে একটানা হর্ন বাজিয়ে স্পীডবোট নিয়ে চলেছে রহমান। তবে খুবই মন্থর গতিতে। পায়ে পায়ে হেঁটে চলার মতো গতি।

ওই দ্যাখো রহমান কাকা, বিমান বলে উঠলো, হরিণের মতো কি যেন একবার ডুবছে, একবার ভাসছে।

সত্যি একটা হরিণশিশু, খালের জলে ডুবছে আর ভাসছে।

বটুক ওঝা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে শিশু হরিণটিকে। হরিণশিশুটি কেমন নিথর হয়ে গেছে।

বিশু গামছা দিয়ে হরিণশিশুকে পরিষ্কার করে মুছিয়ে দিলে। জলে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছে শিশু-হরিণ। বিশু তাকে তুলে দিলে বিমানের কোলে। বিমান কোলে নিয়ে বসলো শিশু-হরিণটাকে। হরিণটার বুক তখন ধুকপুক করছে।

ঝড়ের সঙ্গে এবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। রহমান বলে উঠলো, খোদা আর কি খেল দেখাবে!

বিমান বললে, এই তো মজা, রহমান কাকা।

ধীমান বললে, কি বাজে বকছিস! চুপ কর।

বিমান রাগ করলো না ধীমানের কথায়। বললে, আমি চুপ করলে কি ঝড়- বৃষ্টি থেমে যাবে!

কালিন্দী জঙ্গল অফিস আর খুব দূরে নয়। যে গতিতে চলছে, তাতে মিনিট দশেক লাগবে পৌঁছতে।

রহমানের মনে এখন আর তেমন দুশ্চিন্তা নেই। ও ধরেই নিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে।

সামনেই আবার বাধা। একটা বেশ বড় কেওড়া গাছ খালের ওপর আড়া-আড়ি ভাবে উপড়ে পড়ে আছে। এমন ভাবে ডালপালা নিয়ে পড়েছে, স্পীডবোটের যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

স্পীডবোট থামানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঝড় আর বৃষ্টি তখনো চলেছে। তবে ঝড়ের দাপট কিছুটা কম।

ইঞ্জিনের স্টার্ট এখনো বন্ধ করেনি রহমান। কালিন্দী অফিস দূরে নয়, কাছেই। পাড় দিয়ে পায়ে হেঁটে গেলে দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছানো যায়।

বার বার হর্ন বাজালো রহমান। নিশ্চয়ই হর্নের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে কালিন্দী বন অফিস থেকে। আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারবে বনবিভাগের স্পীডবোট আটকে পড়েছে এখানে। তারপর সার্চলাইট তো দূর থেকেই চোখে পড়বে। বন-অফিস ছাড়াও মাইল খানেক দূরে কালিন্দীর ধারে রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছাউনি। হর্নের আওয়াজ শুনে সেখান থেকেও নিশ্চয়ই রক্ষী বাহিনীর লোকজন ছুটে আসবে।

রাত এখন সাড়ে আটটা বাজতে চললো। ঝিঙেখালি জঙ্গল অফিস থেকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বার্তা পৌঁছে গেছে বিভিন্ন জঙ্গল অফিসে। যে স্পীডবোট সন্ধ্যের মধ্যে ঝিঙেখালি অফিসে ফেরার কথা, সেই স্পীডবোট এখানো ফেরেনি। তারপর এই স্পীডবোটে রয়েছে রানা সাহেবের দুই ভাইপো।

রহমান আরো ভাবছে রানা সাহেব নিশ্চয়ই এই দুর্যোগের জন্যে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন।

কিছু সময় বাদেই দেখা গেল, চারটি জোরালো আলো এগিয়ে আসছে জঙ্গলের পাড় বরাবর।

এতক্ষণে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

একে পৌষ মাস, তারপর ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজা, এতক্ষণে শীতের কথা মনেই হয়নি কারো। সবাই ছিল ভয় আর প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে—শীতের কোনো অনুভূতিই ছিল না। কিন্তু এবারে মালুম হলো শীতের কামড়।

কালিন্দী অফিসের সহকারী রেঞ্জার ভোলানাথ চাটুজ্যে নিজে এসেছেন তিনজন সশস্ত্র সান্ত্রীকে নিয়ে। স্পীডবোট দেখেই চিনতে পারলেন। আর বনকর্মীদের সবাই তো তাঁর জানা-চেনা।

সেই জল-কাদার মধ্যে স্পীডবোটে উঠে এলেন ভোলানাথবাবু। বিমানের কোলে হরিণশিশুটাকে দেখে বলে উঠলেন, এটি কোথায় পেলে?

কি ভাবে হরিণশিশুটিকে পেয়েছে সে কথা জানালো বিমান। শুনে ভোলানাথবাবু বললেন, ওর ভাগ্য ভালো বেঁচে গেছে।

হরিণশিশুটা তখনো থরথর করে কাঁপছে। আর মাঝে মাঝে সুন্দর চোখ মেলে ফিরে চাইছে বিমানের মুখের দিকে।

ধীমান, বিমানের মুখের দিকে চেয়ে ভোলানাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ধীমান আর কে বিমান?

বিমান বললে, আপনি আমাদের নাম জানলেন কি করে?

ভোলানাথবাবু বললেন, তোমাদের কথা এখন এখানকার সব অফিসই জেনে গেছে। রানাবাবুর জরুরি বার্তা পৌঁছে গেছে। যাক, আর দেরি নয়, এবারে উঠে এসো তোমরা। রানাবাবুকে খবরটা তো জানাতে হবে।

এদিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর

শিশু-হরিণ ছুটে চলে গেল
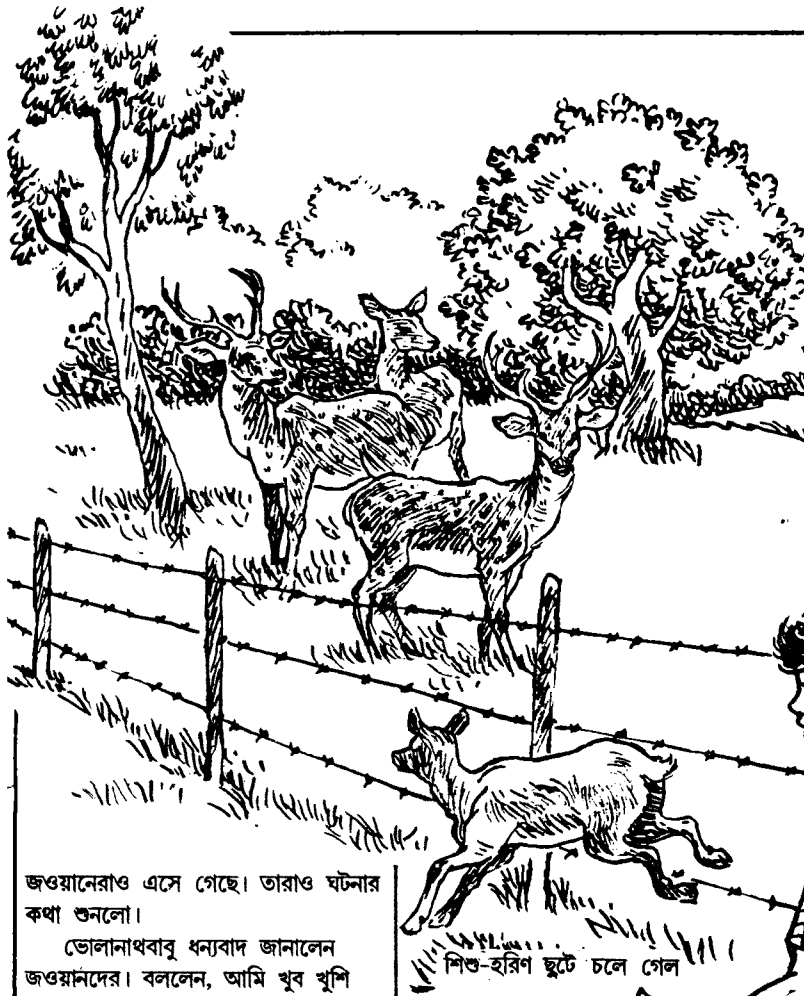
জওয়ানেরাও এসে গেছে। তারাও ঘটনার কথা শুনলো।

ভোলানাথবাবু ধন্যবাদ জানালেন জওয়ানদের। বললেন, আমি খুব খুশি হবো যদি আপনারা আমাদের অফিসে আসেন।

জওয়ানদের একজন বললে, ঠিক আছে রেঞ্জারবাবু। তবে আজ তো যেতে পারছি না। পরে একদিন আসবো। আমরা চলি স্যার। অফিসের সবাই ভাবছে। খবরটা আগে পৌঁছানো দরকার।

স্পীডবোট আপাতত এখানেই নোঙর করা রইলো। গাছ না কাটা পর্যন্ত বোট এখানেই থাকবে। এই জল-ঝড়ের মধ্যে গাছ কাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

জওয়ানেরা চলে গেল জল-ঝড়ের মধ্যে। এরাও খালের পাড় বরাবর ফিরছে কালিন্দী বন-অফিসে। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে প্যাচপেচে জলকাদার ওপর দিয়ে।

গা ছমছম করছে ধীমানের। যদি এই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

জোরালো টর্চের আলো চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফেলছে সান্ত্রীরা। শক্ত মুঠোয় রাইফেলও ধরা আছে।

গোলাম রহমান চলেছে সবার আগে ভাগে। মনে মনে সে ঠিক করেছে জঙ্গল অফিস থেকে দা-কুড়াল এনে আজ এখনই কেটে ফেলবে কেওড়া গাছটাকে। স্পীডবোট কাজলকে ওখানে রেখে তার স্বস্তি নেই।

কালিন্দী বন-অফিসে এখন উৎসবের আমেজ। রানাবাবুকে বার্তা পাঠিয়েছেন ভোলানাথবাবু। এছাড়া অন্যান্য বন-অফিসেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পীড-বোট কাজল আর যাত্রীদের নিরাপদে ফিরে আসার খবর।

একে শীত তায় এই রকম ঝড়-বৃষ্টি, ভোলানাথবাবু বলেছেন খিচুড়ি আর ডিম ভাজার ব্যবস্থা করতে। তার আগে অবশ্য চা, মুড়ি আর চানাচুর দিয়ে জলযোগটা বেশ ভালই সারা গেছে।

এখানে তো ধীমান আর বিমানের বয়সী কেউ নেই। ওরা ভিজে পোশাক ছেড়ে পরেছে লুঙ্গি আর বড় বড় জামা। আর আলোয়ান তো আছেই।

সবাই যখন একটা ঘরে বসে গল্প জমিয়েছে, গোলাম রহমান তখন একজন সান্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কেওড়া গাছ কাটতে গেছে। শুধু ভোলানাথবাবু নয়, সবাই তাকে এখন এই রাত্তিরে যেতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু এমনই একগুঁয়ে, ক্যারো কথা কানে নেয়নি। তার কথা হলো, সে এখানে বসে আরাম করবে, আর স্পীডবোট কাজল পড়ে থাকবে খালে সে হয় না।

রাত বারোটা। ঝড়ের দাপাদাপি আর নেই। তবে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের কোণের দিকে মেঘ ভেঙে গেছে। ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আভাস দেখা যাচ্ছে।

শীত পড়েছে হাড় কাঁপানো। ঝড় না থাকলেও মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে।

এবারে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। রান্না হয়ে গেছে।

কাঠের বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় খাবার জায়গা করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে সবাই আজ একসঙ্গে বসে খাবে।

সবাই খেতে বসবে, ঠিক সেই সময় জেটিঘাটে স্পীডবোট থামার আওয়াজ হলো। সবাই ভাবলো, গোলাম রহমান এলো। কিন্তু না। দেখা গেল রানাবাবু আসছেন। সঙ্গে একজন বনরক্ষী।

আরো দুটি পাত পাততে হবে ভোলানাথবাবু। রানাবাবু বললেন, খিচুড়ির গন্ধে গন্ধে নিজেই স্পীডবোট চালিয়ে চলে এলাম।

ভোলানাথবাবু খেতে বসেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠতে গেলেন। রানাবাবু বললেন, আরে কেন উঠছেন আপনি। বসুন। আমরাও বসে যাচ্ছি।

ধীমান আর বিমান বসেছে ভোলানাথবাবুর পাশে। রানাবাবু এগিয়ে এলেন। আদরের ভাইপো দুটির সামনে উবু হয়ে বসে বললেন, কি, কেমন অভিজ্ঞতা হলো বীরপুরুষেরা। ছোটকা আমরা সুন্দরবন দেখতে যাবো, শখ মিটলো তো সুন্দরবন দেখার।

দুই ভাই তখন মুখ টিপে হাসছে।

রানাবাবু এবারে বারান্দার এদিক থেকে ওদিক তাকালেন। বললেন, গোলাম রহমানকে দেখছি না তো।

আবার স্পীডবোট থামার আওয়াজ এলো। নিশ্চয়ই গোলাম রহমান ফিরছে।

গোলাম রহমানই এলো। কিন্তু তাকে হঠাৎ চেনাই যায় না। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। এমন কি মুখেও।

কুড়াল কাঁধে এসে দাঁড়ালো গোলাম রহমান। রানাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সাহেব, আমার ছোট্ট বন্ধুদের ঠিক মতো জঙ্গল দেখাতে পারিনি, ইচ্ছে আছে আর একদিন নিয়ে যাবো।

রানাবাবু বললেন, বেশ তো, যাবে। তুমি যে ওদের ফিরিয়ে এনেছো, এইটাই আশ্চর্য। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম—

কথা শেষ করলেন না রানা সাহেব।

রাত শেষ হয়ে আসছে। এখন আর এতটুকু মেঘ নেই আকাশে। পরিষ্কার জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ।

পাহারারত সান্ত্রীরা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রাত জাগা পাখি ডাকছে। ঝড়ে বোধহয় তাদের নীড় ভেঙে গেছে।

বিমানের ঘুম ভেঙে গেছে। সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে।

একসময় কানে এলো হরিণের করুণ ডাক। হরিণের ডাক সে পালামৌ-এ শুনেছে। কিন্তু এ ডাক যেন একটু করুণ।

ধীমানকে ডাকলো বিমান। ধীমান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, আমরা এখন কোথায় রে ভাই?

বিমান বললে, পাগলের মতো কি বলছিস। আমরা কালিন্দী ফরেস্ট অফিসে।

ধীমান দু'চোখ রগড়ে উঠে বসলো।

বিমান বললে, বাইরে যাবি ভাই?

ধীমান বললে, না। ছোটকা আছে না।

বাইরে তখনো হরিণ ডাকছে।

হরিণশিশুটা ঘুমিয়ে ছিল। সে-ও উঠে মিহিসুরে ডাকতে আরম্ভ করলো। বাইরে থেকেও সমানে আসছে হরিণের ডাক। হরিণশিশু ছটফট করতে আরম্ভ করলো।

রাত শেষ। পুব আকাশ লাল। হরিণ-শিশুকে নিয়ে বাইরে এলো ধীমান আর বিমান। দেখলো কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে তিনটে হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। মা-হরিণের চোখে জল।

দুই ভাই অবাক চোখে দেখছে তিনটে হরিণকে। আর হরিণশিশু বিমানের কোলের মধ্যে ছটফট করছে।

হরিণশিশুটাকে ছেড়ে দে। ছোটকার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো দুই ভাই। ভোলানাথবাবু আর তাদের ছোটকা এদিকেই আসছেন।

ছোটকা।

হ্যাঁরে বিমান, হরিণশিশুটাকে তোর ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, তাই না।

বলে বিমানের মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন বিভূতি রানা। বললেন, জানিস, কাল সন্ধ্যায় যখন ঝড় উঠলো, তখন তোদের জন্যে মনের মধ্যে কি ছটফটানি! এই রকম সময় আমার জীবনে কখনো আসেনি। যতক্ষণ না তোদের খবর পেয়েছি, ততক্ষণ আমার মাথার ঠিক ছিল না। এখন ভেবে দ্যাখ তো এই শিশু-হরিণটার মায়ের মনের কি অবস্থা! ওদেরও তো মন আছে আমাদের মতো।

হরিণশিশুকে আদর করে ছেড়ে দিলে বিমান। শিশুহরিণ ছুটে চলে গেল তার মায়ের কাছে। আর দাঁড়ালো না হরিণেরা। ছুটে চলে গেল বনের দিকে।

ভোলানাথবাবু বললেন, জানো ছোট্ট বন্ধুরা, এই সব বনচারীরা বড়ো ভালো। ওদের আলাদা একটা জগৎ আছে। সে জগৎ হলো বন। চলো, জেটিঘাটের দিকে যাই। ওখান থেকে সূর্য ওঠা দেখবে।

সূর্য উঠছে কালিন্দীর ওপার থেকে।

ছবিঃ দিলীপ দাস

জানা-অজানা

মহসীন মল্লিক

সুড়ঙ্গ কথা

পৃথিবীর দীর্ঘতম জল-সরবরাহকারী সুড়ঙ্গটি রয়েছে নিউইয়র্কে। লম্বায় এটি একশো পাঁচ মাইল। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম রেলওয়ে সুড়ঙ্গটির অবস্থান জাপানে। সমুদ্রতলের ৭৮৭ ফুট গভীরে 'সেকিয়ান' রেল ট্যানেলটির দৈর্ঘ্য ৩৩.৪৬ মাইল। এটি তৈরি করা শুরু হয়েছিল ১৯৬৪ সালে এবং তা শেষ হয় ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই সুড়ঙ্গটি নির্মাণকালে ৩৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটে। বৃহত্তম এই সুড়ঙ্গটি তৈরি করতে তখন খরচ হয়েছিল তিনশো পঁচাত্তর কোটি ডলার। এখনকার বাজারদরের তুলনায় তা কতগুণ বেশি তোমরাই তা ভাবো!

বন্‌বনিয়া

অনীশ দেব

আমরা যখন খুব সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি ঠিক তখনই বন্‌বনিয়া ঢুকে পড়ল আমাদের জীবনে। আর ওইটুকু পুঁচকে দশ-বারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলের কাছে আমরা সবাই যেন নতুন করে শিখলাম: বিপদে ভয় করতে নেই।

কয়লা-খনি এলাকায় আমরা থাকি। আমরা বলতে বাপি, মা, আমার দিদি মহুয়া, আর আমি। বাপি কোল ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। বহু বছর আগে আমরা যখন কলকাতায় আলমবাজারে থাকতাম তখন মা একটা প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন। এখন চাকরি করেন না, তবে লেখালিখি করেন—সেসব লেখা কলকাতার নানান ম্যাগাজিনে বেরোয়। এ অঞ্চলের লোকেরা মায়ের লেখালিখির কথা জানে।

অফিস থেকে আমাদের কোয়ার্টার অনেকটা দূরে ছিল বলে বাপির যাতায়াতের বেশ কষ্ট হতো। তাছাড়া আমার স্কুলটাও বেশ ঘুরপথ ধরে যেতে হতো। দিদি কলেজে যেত দুটো বাস পালটে, দু'বার সাইকেল রিকশা চড়ে। এইসব অসুবিধের কথা ভেবে আমরা জামতলা এলাকা ছেড়ে সাহেবপাড়ায় চলে এসেছি। সাহেবপাড়ায় এককালে নাকি সাহেবসুবোরা থাকত। এখনও সে-আমলের কয়েকটা বাড়ি-ঘর দেখলে কথাটা যে সত্যি সেটা বোঝা যায়।

সাহেবপাড়ায় ছোট জমি কিনে বাপি সুন্দর একটা বাড়ি করেছেন। কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজন খুব একটা নেই। তাছাড়া এ-জায়গাটা মা-বাপি দুজনেরই বেশ ভালো লেগে গেছে। তাই ওঁরা চেয়েছেন বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিতে। আর আমার বা দিদির বন্ধুবান্ধবও তো এখানে কম নেই!

গণ্ডগোলটা শুরু হলো নতুন বাড়িতে আমরা চলে আসার পর।

একদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে বাপি চায়ের কাপ হাতে বাইরের উঠোনে বসে আছেন, তিনটে সাইকেল আমাদের সদরে এসে থামল।

তিনটে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল চারজন। জিন্‌সের প্যান্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কোমরে বড় বকলস লাগানো বেল্ট, দুজনের আবার এক কানে একটা করে মাকড়ি।

ওদের মধ্যে একজন সুপুরি বা জর্দা গোছের কিছু একটা চিবোচ্ছিল। শব্দ করে একদলা লাল থুতু ফেলে বাপির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'অ্যাই, আপনি রাসমোহন মিত্তির?'

বিকেল মরে এলেও সন্ধ্যের আঁধার তখনও নামেনি। আমি বাগানে ফুলগাছগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করছিলাম। সেখানে কয়েকটা ফড়িং উড়ছিল। আমি ওদের ওড়া দেখছিলাম। স্কুলের সায়েন্স টিচার প্রসাদবাবু বলেছেন, ফড়িং-এর দু'জোড়া ডানা সমান তালে নড়ে না—একজোড়া খুব ধীরে নড়ে, আর-এক জোড়া খুব তাড়াতাড়ি। একজোড়া ওড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, অন্য জোড়া ওড়ার দিক। ঠিক যেন নৌকোর দাঁড় আর হাল।

ছেলেগুলোকে প্রথমটা আমি তেমন নজর করে দেখিনি। কিন্তু ওই নোংরা ভঙ্গিতে বাপিকে প্রশ্ন করা মাত্রই আমি ফড়িং ছেড়ে ওদের দিকে তাকালাম।

বাপি কেমন যেন থতমত খেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই রাসমোহন মিত্র। কী ব্যাপার বলুন?'

লাথি মেরে সদর দরজা খুলে ফেলল ছেলেটা। ইট-পাতা পথ ধরে চার-পা এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল, 'এখানে জমি পারচেজ করে বাড়ি বানালেন, আর আমাদের পারচেজ ট্যাক্সটা দেবেন না!'

চায়ের কাপ-প্লেট বাপির হাতে ঠকঠক করে নড়ছিল। বাপি সেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন।

'কীসের পারচেজ ট্যাক্স?'

'ন্যাকা ষষ্ঠী আমার!' পেছন থেকে কানে মাকড়িওয়ালা একজন মন্তব্য করল, 'পারচেজ ট্যাক্স জানেন না!'

'বাড়ির নাম রেখেছেন "কেকা নিকেতন"! ওটা পালটি করে "ন্যাকা নিকেতন" করে দিন।' তিন নম্বর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মন্তব্য করল।

কেকা আমার ঠাকুমার নাম। গত বছর ঠাকুমা মারা গেছেন।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে মা বারান্দায় চলে এসেছিলেন। দিদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছিল—হারমোনিয়াম ফেলে চলে এসেছে জানলায়। পরদা সরিয়ে অসভ্য ছোটলোকগুলোকে দেখছে।

বাপি উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে বলতে চাইলেন, 'আপনাদের সঙ্গে কোনও কথা আমি বলতে চাই না। অসভ্যতার একটা সীমা আছে। আমি...।'

সামনের ছেলেটা, যে বোধহয় পান পরাগ জাতীয় কিছু একটা চিবোচ্ছিল, শব্দ করে থুতু ছুঁড়ে দিল বাপির পায়ের কাছে। অল্পের জন্যে বাপির গায়ে লাগল না। তারপর বিচ্ছিরিরকম হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার নাম নেকড়ে। আপনি বহুত আনপড় আদমি আছেন—কোনও খবর রাখেন না। এই সাহেবপাড়া এরিয়াটা আমার। আমার সঙ্গে যারা আছে—' বলে ঘুরে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে তাদের পরিচয় দিতে লাগল: 'এ হলো নগা। এ হীরালাল। আর ওই যে পেছনে দাঁড়িয়ে—ওর নাম টার্গেট। ও মেশিন চালালে গুলি সবসময় টার্গেটে গিয়ে লাগে।'

বাপি ফ্যালফ্যাল করে চরিত্রগুলোকে দেখতে লাগলেন। মা এর মধ্যে কখন যেন বাপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নেকড়ে, টার্গেট—কীসব অদ্ভুত নাম!

ওরা যে কারা সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু জামতলায় এ ধরনের উপদ্রব ছিল না। বোধহয় অনেক কোয়ার্টার নিয়ে ছোটখাটো টাউনশিপ ছিল বলেই।

'শুনুন, মিত্তিরবাবু—' নেকড়ে ঠাণ্ডা চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিরিশ হাজার টাকা দিলেই আপনার কেস সালটে যাবে। হীরালাল কাল সন্ধেবেলা আপনার কাছে নোট নিতে আসবে। মাল রেডি রাখবেন।'

এবারে মা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। নেকড়েকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কি মগের মুল্লুক নাকি! হঠাৎ আপনাদের টাকা দিতে যাব কেন?'

'জেন্টসের কথায় লেডিজ নাক গলালে কেস আরও ক্যাচাল হয়ে যাবে।' নেকড়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'হীরালাল কাল আসবে। নোট না দিলে...' কথা থামিয়ে টার্গেটের দিকে তাকাল নেকড়ে। চোখের ইশারা করে বলল, 'টার্গেট, একটু স্যাম্পেল শো করে দাও—'

সঙ্গে-সঙ্গে জামার নিচে হাত ঢুকিয়ে কোমরের কাছ থেকে কী একটা নিয়ে হাত বের করল টার্গেট।

একটা কালো রিভলবার। রাস্তার আলো ওটার গা থেকে ঠিকরে পড়ছে।

রিভলবারটা সামনে উঁচিয়ে বাপির খুব কাছে এগিয়ে এল টার্গেট।

বাপি ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলেন। মা একটা চিৎকার করে বাপিকে জাপটে ধরলেন, কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'ওঁকে কিছু কোরো না। ওঁকে কিছু কোরো না। তোমরা টাকা পেয়ে যাবে।'

'অব আয়া হ্যায় লাইন মে।' দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে মন্তব্য করল হীরালাল।

টার্গেট রিভলবারটা বাপির একেবারে কপালে ঠেকিয়ে ধরে বলল, 'আঙুলে একটু চাপ দিলেই আপনি কোল ইন্ডিয়া কেন, হোল ইন্ডিয়া থেকে রিটায়ার হয়ে যাবেন।'

বাপি হঠাৎই খসে পড়ে গেলেন মাটিতে। মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এল বারান্দায়। আমিও ছুটে গেলাম বাপির কাছে। আমার গলার ভেতরটা কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বাপি পড়ে যেতেই টার্গেট কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে হাসল। নেকড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস্, এ তো আমুল বাটার দেখছি। শাটার টেপার আগেই ছবি হয়ে গেল।'

ওরা চারজন সদর দরজার দিকে হাঁটা দিল।

গেট পেরিয়ে বেরোনোর সময় নগা বলল, 'কাল সাতটায় আমি আর হীরু আসব। মাল রেডি রাখবেন। থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই।'

চারটে অপচ্ছায়া তিনটে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

আমরা ততক্ষণে মাথায়-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাপির জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি। নতুন বাড়িতে আসার আনন্দ আমাদের মন থেকে সেই মুহূর্তেই মুছে গেল।

এরপর বিপদ বাড়তেই থাকল।

বাড়ি তৈরি করার সময় বাপি কীরকম খোঁজখবর নিয়েছিলেন কে জানে! তখন বোধহয় নেকড়েদের কথা জানা যায়নি। এখন টাকা যোগাড় করার চেষ্টায় বাপি পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বাপি আর মা মিলে কতজনকে যে ফোন করলেন তার কোনও হিসেব নেই। আমি আর দিদি লুকিয়ে-লুকিয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলাম।

পরদিন ওরা এল। হীরালাল আর নগা।

বাপি ওদের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দিয়ে করুণভাবে বললেন, 'এক

দিনে এর বেশি যোগাড় করতে পারিনি। আমাকে আপনারা দয়া করে ক'টা দিন সময় দিন।'

উত্তরে ওরা বাপিকে এক ধাক্কা দিয়ে যেসব ভাষা ব্যবহার করল তাতে আমার মনে হচ্ছিল দুটো শয়তানের টুঁটি টিপে ধরে বেধড়ক পেটাই। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তব তো এক নয়!

ওরা যা-তা ভাষায় ওয়ার্নিং দিয়ে চলে গেল। বলে গেল সাত দিনের মধ্যে বাকি টাকা চাই। মেয়ে-বউয়ের সোনাদানা বেচে হলেও টাকাটা বাপিকে যোগাড় করতেই হবে। নইলে ওদের 'বস্' খেপে যাবে। তখন টার্গেট...।

বাপির দিকে রিভলবারের মতো করে আঙুল দেখিয়ে মুখে দু'বার গুলি ছোঁড়ার নকল আওয়াজ করল হীরালাল। হেসে বলল, 'কেন বেফালতু খরচা হয়ে যাবেন, মশাই!'

ওরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও বাপি বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিলেন। আর মা সারাক্ষণ 'কোনও ভয় নেই! কোনও ভয় নেই!' বলে কান্না চাপতে লাগলেন।

এলাকায় সামান্য খোঁজখবর নিতেই আমরা নেকড়ে সম্পর্কে যা জানার জেনে গেছি। যখন আমি স্কুলে যাই, ওদের বাজারের মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসে।

একদিন নগা আমাকে ডেকে বলল, 'অ্যাই ছোঁড়া, শোন। তোর বাপ আর নোট যোগাড় করতে পারল?'

এর মধ্যে মায়ের গয়না বিক্রি করে বাপি ওদের আরও ছ'হাজার টাকা দিয়েছেন। তারপর কাকুতি-মিনতি করে আরও এক মাস সময় পেয়েছেন।

আমি মাথা নেড়ে কোনওরকমে 'না' বলেছি। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেছি—যত তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া যায়।

বাজারের মোড়ের কাছে ওদের দলটা সবসময় আড্ডা মারে। কাউকে ওরা ভয় পায় না, কিন্তু ওদের সবাই ভয় পায়। ওই মোড় দিয়ে যারা যাতায়াত করে তাদের সবাইকেই দেখেছি ওদের কেমন সমীহ করে।

আর একদিন টার্গেট আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল, বলল, 'তোর দিদির নাম যেন কী?'

আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। কোনওরকমে বললাম, 'মহুয়া।'

ওরা দল বেঁধে হাসল। তারপর নেকড়ে বলল, 'মহুয়া বড় মিষ্টি।'

আমি অন্ধ রাগে নেকড়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নেকড়ে সঙ্গে-সঙ্গে ক্যারাটের ভঙ্গিতে আমাকে সপাটে এক লাথি কষাল।

লাথিটা পেটে এসে লাগতেই আমি 'ওঁক' শব্দ করে ছিটকে পড়ে গেলাম রাস্তায়। মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছিল, শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। সেই অবস্থায় ঝাপসা চোখে দেখলাম, নেকড়ে দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল নেকড়ে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'মহুয়া বড় মিষ্টি।'

তারপর বুট-পরা পায়ে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি লাথি মারতে শুরু করল আমাকে।

অনেকক্ষণ পর কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাড়ির পথ ধরলাম।

রাস্তার বহু লোক ঘটনাটা দেখেও কোনও ভ্রূক্ষেপ করেনি। আমার ক্ষতবিক্ষত আহত শরীরটাকে রাস্তা থেকে তোলার ব্যাপারেও কেউ সাহায্য করেনি। পথে একজন চেনা রিকশাওয়ালা তার সাইকেল রিকশা করে আমাকে বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে দিল। একবার শুধু বিড়বিড় করে লোকটা বলল, 'তুমি ওইটুকু ছেলে, তুমি কখনও ওদের সঙ্গে পারো! জোয়ান মানুষগুলোই সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করছে...।'

আমাকে দেখার পর বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি কান্না শুরু হলো। দিদি তখন কাঁদতে-কাঁদতে জানাল, কলেজে যাওয়ার পথে গুণ্ডাগুলো প্রায়ই নাকি ওকে অপমান করে।

মা দিশেহারা হয়ে গেলেন। বাপি কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। বাড়ি করে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। ওদের টাকা তিনি কেমন করে মেটাবেন!

বাপিকে কখনও আমি এভাবে কাঁদতে দেখিনি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমরা চারটে প্রাণী ঘর অন্ধকার করে সর্বস্বান্তের মতো বসে রইলাম। আমাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে বন্‌বনিয়া আমাদের বাড়িতে এল।

একদিন সন্ধ্যের মুখে বাপির হাত ধরে ও এসে হাজির হলো।

বয়েস দশ-বারো বছর। গোলগাল শ্যামবর্ণ চেহারা। মুখটা দারুণ মিষ্টি। মাথা ন্যাড়া। ন্যাড়া মাথার পেছনদিকে মোটাসোটা একটা টিকি। ছানাবড়া চোখের কোলে কাজল। গায়ে লাল-সবুজ কাপড়ের তাপ্পি মারা একটা ঢোলা জামা—ঠিক যেন ফুটবল প্লেয়ারের জার্সি। জামার নিচে কালো হাফপ্যান্টের খুব সামান্যই উঁকি মারছে। ওটুকু উঁকি না মারলে মনে হতো ও প্যান্ট পরেনি।

বন্‌বনিয়ার কপালে কাজলের টিপ, মাথায় একটা লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। আর হাতে গোলাপী রঙের প্লাস্টিকের একটা বাঁশি।

বাপি মাকে বললেন, 'তুমি বহুদিন ধরে ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে একটা বাচ্চা ছেলের কথা বলছিলে—তাই ওকে নিয়ে এলাম। ওর নাম বন্‌বনিয়া।' তারপর বন্‌বনিয়ার দিকে ফিরে: 'এই তোর মাইজি।'

ছেলেটা এক গাল হেসে লাফিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে। ন্যাড়া মাথা হেঁট করে মায়ের পা ছুঁয়ে বলল, 'পায় লাগু, মাজি।'

মা খানিকটা অবাক হয়ে বাপিকে বললেন, 'ও বাংলা বলতে পারে না?'

'পারে—অল্প-অল্প।'

'বাপি, ওকে পেলে কোথায়?' দিদি জিগ্যেস করল।

বাপি বন্‌বনিয়াকে বললেন, 'তুই যা, এখন বাগানে গিয়ে খেলা কর।'

ছেলেটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে ছুটে গেল বাগানের দিকে। বাগানে পৌঁছে

'কোম্পানি হোশিয়ার!'

হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিল আমাকে লক্ষ্য করে, ওর দেশোয়ালি ভাষায় চেঁচিয়ে ডাকল, 'আও না, ছোটে মালিক, একসাথ খেলো...'

কেন জানি না, ওর হাতছানি আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওর সঙ্গে খেলার জন্যে ছুটে গেলাম বাগানে।

রাতে দিদির কাছে শুনলাম বন্‌বনিয়াকে খুঁজে পাওয়ার কাহিনী।

জামতলার পশ্চিমদিকে দুটো পুরনো কয়লা-খনি আছে। বহুবছর আগেই ওই খনি দুটো থেকে কয়লা তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। সেই জোড়া খনি আর তার লাগোয়া বড়সড় মাঠটা জুড়ে বছরের এ সময়টায় একটা মেলা বসে। তাতে নানান জিনিস বিক্রি হয়। লাল-নীল-কাপড়ে ম্যারাপ বেঁধে হরেকরকম খাবারের দোকান তৈরি হয়। কখনও-কখনও নাগরদোলাও বসে।

মেলার মাঠ পেরিয়ে গেলে কুলি-কামিনদের বস্তি। তারও ওপাশে বড়-বড় গাছের জঙ্গল।

বাপি নেকড়েদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টায় এক কুলি সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কথাবার্তা বলে হতাশ হয়ে মেলার মাঠ পেরিয়ে ফিরে আসছিলেন।

পড়ন্ত বিকেলে আনমনা পায়ে উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে হেঁটে আসছিলেন বাপি। মেলার কলরোল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, তবে বাপির কানে ঢুকছিল না। একটা খনির পিটের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত এক কান্নার আওয়াজ বাপির কানে আসে। বোধহয় খনির ভেতরে হাওয়া ঢুকে শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে কান পাততে গিয়ে বাপি পড়ে যান মাটিতে। তাঁর মাথাটা কেমন ঘুরে যায়। হাতের ছাতাটা ছিটকে পড়ে দূরে। গরম হাওয়ার তাপ তখনও চোখে-মুখে বেশ টের পাচ্ছিলেন তিনি। নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে বাপির প্রায় কান্না পেয়ে যায়। এই বিপদে তাঁকে বাঁচানোর কেউ নেই! ছাতাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ক্ষোভে হতাশায় সেটা পাগলের মতো মাটিতে পিটতে থাকেন বাপি।

ঠিক তখনই কোথা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস উড়ে এসে বাপিকে ঘিরে নেয়। বুকের জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গিয়ে ভেতরটা কেমন শান্ত হয়ে যায়। বাপি উঠে দাঁড়াতেই কে যেন তাঁর জামা ধরে টানে, আর হিন্দিতে বলে, 'এ বাবু, পইসা দেও না—'

ঘুরে তাকিয়েই দেখেন ন্যাড়া মাথা একটা মিষ্টি ছেলে।

'কেন পয়সা নিয়ে কী করবি?'

ছেলেটা হেসে বলে, 'মাখ্‌খন খায়গা।'

এ কী অদ্ভুত বায়না! পয়সা নিয়ে মাখন খাবে! নাকি মাখন-রুটি বলতে চাইছে?

বাপি ওকে দুটো টাকা দিতেই বাচ্চাটা সেলাম ঠুকে বাপির সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে শুরু করে। আর হাতের প্লাস্টিকের বাঁশিটা পোঁ-পোঁ করে বাজাতে থাকে।

কথায়-কথায় জানা গেল ওর নাম বন্‌বনিয়া। মা-বাবা কেউ নেই। কুলিদের বস্তিতে একজনের কাছে আশ্রয় নিয়ে আছে। সে খুব খাটায়, আর মদ খেয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে।

এইরকম নানা কথা বলতে-বলতে বন্‌বনিয়া হঠাৎ বাপির জামা খামচে ধরে বায়না করে বসে: 'এ বাবু, আমি তোহার সঙ্গে যাবে। তোহার সঙ্গে থাকবে।'

বাচ্চা ছেলেটার এই অনুরোধ বাপিকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। বাপি আর 'না' বলতে পারেননি।

বাড়িতে ওর একটা দিন কাটতে-না-কাটতেই আমরা সকলেই বুঝে গেলাম বন্‌বনিয়া দারুণ কাজের ছেলে। সব কাজই করে হাসিমুখে। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে, গুনগুন করে দেশোয়ালী ভাষায় গান করে। আমাকে ডাকে 'ছোটে মালিক', দিদিকে 'ছোটে মালকিন', বাপিকে 'বাবু' আর মাকে 'মাজি'।

নতুন জামাকাপড় ওকে পরানো গেল বটে কিন্তু মাথার ফেট্টি কিছুতেই ও খুলল না। আর কাজল লাগানোর অভ্যেস ছাড়ানো গেল না। মা কখনও-কখনও কপট রাগে ওকে বলেন, 'গেঁয়ো ভূত।'

উত্তরে বন্‌বনিয়া খিলখিল করে হাসে।

এর মধ্যে একদিন দুপুরে নেকড়ের দল টাকা চাইতে বাড়িতে এসে হাজির হলো।

দিনটা ছিল রবিবার। আমরা সবাই বাড়িতেই ছিলাম। ওদের ডাকে বাপি বাইরে বেরোতেই লোফারগুলো অশ্রাব্য

গালিগালাজ শুরু করল।

বন্‌বনিয়া আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের কাণ্ড দেখে চাপা গলায় আমাকে জিগ্যেস করল, 'এসব কী ব্যাপার, ছোটে মালিক?'

আমি এতদিন কোনও কথা ওকে জানাইনি—চাকর-বাকরকে জানানোর কোনও মানে হয় না তাই। কিন্তু ওর প্রশ্নটা শোনামাত্রই আমার মনটা কীরকম যেন হয়ে গেল। ওকে সবকিছু খুলে বলতে ইচ্ছা করল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল বন্‌বনিয়া। এবং পরমুহূর্তেই বারান্দা ছেড়ে এক ছুটে চলে গেল উঠোনে—বাপির কাছে।

টার্গেট তখন খারাপ ভাষায় বাপিকে হুমকি দিচ্ছিল। আর বাপি অসহায়ভাবে মুখ বুজে অপমানগুলো সহ্য করছিলেন।

নেকড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল। ওর কাছাকাছি অচেনা দু'জন শাগরেদ হাসছিল।

টার্গেট হঠাৎই বাপির গলার কাছটা খামচে চেপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে বন্‌বনিয়া চিৎকার করে উঠল, 'এ কোম্পানি, বাবুকো ছোড় দে! নেহি তো সব কুছু গড়বড় হয়ে যাবে।'

নেকড়ে পাশ থেকে বন্‌বনিয়াকে জোরালো এক লাথি কষাল।

আশ্চর্য! ওইটুকু পুঁচকে ছেলেটা ছিটকে পড়ে গেল না। ও সামান্য কাত হয়ে খর চোখে তাকাল নেকড়ের দিকে। ওর কাজল-টানা চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল। ছোট-ছোট দু'হাত মাথার ওপরে তুলে অদ্ভুত কয়েকটা মুদ্রা দেখাল ছেলেটা। তারপর 'কোম্পানি হোশিয়ার!' বলে চিৎকার করেই বাপিকে ঘিরে বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগল। ওর ধাক্কায় টার্গেট ছিটকে গেল, আর ছেলেটা ঘুরতেই লাগল।

ওর গতিবেগ বাড়তে-বাড়তে এমন হলো যে, শেষ পর্যন্ত একটা ঝাপসা কুয়াশার পিণ্ড বাপিকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল। ভর দুপুরের কড়া রোদ তার ওপরে ঠিকরে পড়ে রামধনু তৈরি করে ফেলল।

আমরা অবাক হয়ে এসব কাণ্ড দেখতে লাগলাম।

নেকড়ের দল কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে গেল।

ওরা সদর দরজা পেরিয়ে চলে যেতেই বন্‌বনিয়া থামল। আমাদের সবার দিকে পালা করে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, 'বদমাশ লোগ ভাগ গয়া।'

বাপি থতমত খেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এসব তুই কী কাণ্ড করলি রে, বন্‌বনিয়া!'

বন্‌বনিয়া হাত উলটে বলল, 'হম কুছু করেনি, বাবু। হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।'

এ আবার কী ধরনের কথা! ও কিছু করে না, সব হয়ে যায়!

মা আনন্দে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'তুই গেঁয়ো ভূত, না ভগবান!'

সেদিন আমরা বন্‌বনিয়াকে ধরে কষে আদর করলাম। মা ওকে দুটো রসোগোল্লা খাওয়ালেন। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ভিডিয়ো গেম খেলনাটা ওকে দিয়ে দিলাম।

বাপি দুশ্চিন্তার সুরে বললেন, 'কাজটা বোধহয় তুই ঠিক করলি না রে, বন্‌বনিয়া। ওরা আবার আসবে। ওরা খুব সাঙ্ঘাতিক লোক।'

পাকা-পাকা কথায় দিব্যি জবাব দিল ছেলেটা, 'কোই চিন্তা নাই, বাবু। খতরনাক আদমির সঙ্গে খেলা করতে হামার দারুণ লাগে। আও, ছোটে মালিক, লিখাই-পড়াইকা টাইম হো গয়া।'

শেষ কথাটা আমাকে লক্ষ্য করে। যত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি বন্‌বনিয়া আমাকে আর দিদিকে যখন-তখন জ্ঞান দিচ্ছে। এখন যে আমার পড়তে বসার সময় সেটা আমি ভালো করেই জানি।

একদিন রাতে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম।

বন্‌বনিয়া আমার ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শোয়। সেদিন রাতে ঘুমের ঘোরে আমি বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখছিলাম। হঠাৎই ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। একইসঙ্গে কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল। তাই ভরসা খুঁজতে পাশ ফিরে মেঝের দিকে তাকালাম—যেখানটায় বন্‌বনিয়া শোয়।

দেখি বিছানায় ও নেই।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম বিছানায়। আর তখনই বাঁশির সুর শুনতে পেলাম। কেউ যেন ফিসফিস করে বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই অস্পষ্ট মিহি সুর যেন কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যাচ্ছে।

বন্‌বনিয়া এত মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাতে পারে তা তো জানতাম না! কিন্তু ও গেল কোথায়!

অন্ধকারে এপাশ-ওপাশ চোখ চালিয়ে ওকে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে না পেয়ে যখন ভাবছি বিছানা ছেড়ে উঠে দেখব দরজার ছিটকিনি খোলা কি না, ঠিক তখনই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে নজর গেল আমার।

আকাশে প্রায়-পূর্ণিমার চাঁদ। তাকে ঘিরে কয়েক টুকরো মেঘ। আমাদের বাগানের একটা বড় জামগাছ চাঁদের আলো আড়াল করায় উঠোনের একটা দিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সেই গাঢ় ছায়ার পাশেই ঠিকরে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। বন্‌বনিয়াকে সেই আলো-ছায়ার মধ্যে দেখতে পেলাম।

পরনে শুধু একটা হাফপ্যান্ট। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। হাতে প্লাস্টিকের বাঁশি। ছেলেটা অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিতে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে একবার আলো থেকে ছায়ায় ঢুকছে, আর একবার ছায়া থেকে আলোয়।

কেমন এক বিচিত্র আভা ছেলেটাকে জড়িয়ে ছিল। ফলে ও গাছের ছায়ার অন্ধকারে ঢুকে পড়লেও ওকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি হতবাক হয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই দেখি ও নাচ থামিয়ে জানলার দিকে ফিরে আসছে।

আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম।

শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলাম, বন্‌বনিয়া জানলা লক্ষ্য করে আসছে কেন। আমার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে তো ওকে বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে তারপর আসতে হবে! আর সেই দরজাটা

ওরা তেড়ে এল আমাদের দিকে।

তো অন্যদিকে! বন্‌বনিয়া তো সেদিকে গেল না!

একটু পরেই নাকে সুন্দর একটা গন্ধ টের পেলাম—ধূপ-ধুনোর গাঢ় গন্ধ। এ-গন্ধে নেশা ধরে যায়।

সামান্য চোখ খুলে দেখি বন্‌বনিয়া এসে গেছে ঘরের ভেতরে। অদ্ভুত আভাটা তখনও ওর গায়ে জড়িয়ে আছে। আর সুন্দর গন্ধটাও।

আমি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। হঠাৎই ঘুম পেয়ে গেল আমার। বন্‌বনিয়ার এইসব উদ্ভট কাণ্ড দেখে আমার তো ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু কেন জানি না, একটুও ভয় করছিল না। বরং ও ঘরে ফিরে আসায় যেন বেশ ভরসা পেলাম। তারপরই কখন যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি।

এ-ঘটনার কথা আমি কাউকে বলিনি। পাছে বন্‌বনিয়া আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেই ভয়ে।

কিন্তু কয়েকদিন পর রাতে শোওয়ার সময় ওকে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম।

ও কাজল-মাখা চোখে নিষ্পাপভাবে তাকাল আমার দিকে। মিষ্টি করে হেসে বলল, 'কা জানে, ছোটে মালিক। হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।'

আমি হতবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগলাম। সেই মুহূর্তে হঠাৎই কেমন মনে হলো, বন্‌বনিয়া আমাদের বাড়িতে বেশিদিন থাকবে না।

চরম দিনটা এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

বন্‌বনিয়া সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমাকে বলল, 'ছোটে মালিক, হামার সাথ চলো। পতঙ্ লানে যায়েঙ্গে।'

অনেক চেষ্টায় জানলাম 'পতঙ্' মানে 'ঘুড়ি'। এখন ও ঘুড়ি কিনতে যাবে! ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা আমারও আছে। কিন্তু এখন ঘুড়ি কিনতে যাওয়ার কথা শুনলে বাপি নির্ঘাত বকবেন। আর মাও নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা বলবেন না।

সেই আশঙ্কার কথা বন্‌বনিয়াকে বলতেই ও ছুটে গেল পাশের ঘরে—বাপি আর মায়ের কাছে। আমিও তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লাম পড়ার টেবিল ছেড়ে।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি বন্‌বনিয়া বাপি আর মায়ের একেবারে হাতে-পায়ে ধরাধরি। ও ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুড়ি কিনতে যাওয়ার কথা বলছে, আর বারবার বলছে ওর হাতে আর সময় নেই। ওকে যাওয়ার অনুমতি দিতেই হবে। বিনা অনুমতিতে ও যেতে পারবে না।

সময় নেই মানে! কী বলতে চায় বন্‌বনিয়া!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনুমতি পাওয়া গেল। কী ভেবে দিদি সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বন্‌বনিয়া বারণ করল: 'নেহি, ছোটে মালকিন, তোহার যানা ঠিক নেহি হ্যায়।'

একটু পরেই আমরা পথে বেরোলাম। আকাশ মেঘলা। চাঁদের আলোর ছিটেফোঁটাও নেই।

রাস্তার আলোয় হঠাৎই খেয়াল করলাম, বন্‌বনিয়া কোন ফাঁকে যেন পোশাক পালটে নিয়েছে। ওর গায়ে প্রথম দিনের সেই লাল-সবুজ ঢোলা জামা, সঙ্গে কালো হাফপ্যান্ট। আর হাতে প্লাস্টিকের বাঁশি তো আছেই।

এবড়োখেবড়ো পিচখোঁড়া রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে বন্‌বনিয়া বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ও লোগ বহুত বদমাশ হ্যায়। বহুত আদমির সর্বনাশ করেছে।'

বুঝলাম, ও নেকড়েদের কথা বলছে।

বন্‌বনিয়ার সেদিনকার প্রতিবাদের পর নেকড়ের দল আরও দু'বার এসেছে আমাদের বাড়িতে। হাবভাবে বুঝেছি, ওরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়েই এসেছে। তবে আগের তুলনায় অনেক ভদ্রভাবে ওরা বাকি টাকার দাবি করেছে

বাপির কাছে। বন্‌বনিয়াকে মা তখন আগলে রেখেছিল—পাছে ও আগের দিনের মতো কিছু করে বসে।

ওরা চলে যাওয়ার পর বন্‌বনিয়া আমার কাছে বসে গজগজ করছিল : 'পাপ কা ডালা ভর গিয়া। পাপ কা ডালা ভর গিয়া।'

কাদের পাপের ডালা ভরে গেছে? ও কি নেকড়েদের কথা বলছে?

আনমনা হয়ে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে খেয়াল করিনি কখন যেন বাজারের মোড়ে পৌঁছে গেছি। অথচ ঘুড়ির দোকানে যেতে হলে এদিকে আসার কথা নয়। এদিক দিয়ে গেলে অনেকটা ঘুরপথ হয়।

চোখে পড়ল নেকড়ে তার পাঁচজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যথারীতি হাজির। কী একটা ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।

আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে বন্‌বনিয়া সোজা এগিয়ে গেল ওদের দিকে। আমি ওকে ডেকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বন্‌বনিয়া নেকড়েকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কোম্পানি, তোহার পাপ কা ডালা ভর গিয়া।'

নেকড়ের দল সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের খেয়াল করল। কানে শোনা যায় না এমন ভাষায় গালিগালাজ করতে-করতে ওরা তেড়ে এল আমাদের দিকে। ছ'জনকে ওইভাবে তেড়ে আসতে দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'বন্‌বনিয়া, পালিয়ে এসো।'

বন্‌বনিয়া আমার দিকে ফিরে হাসল, তারপর ওর প্লাস্টিকের বাঁশিতে ফুঁ দিল।

বাজারের মোড়ে লোকজন কম যাতায়াত করে না। তা ছাড়া ছোট-বড় দোকানপাটও অনেক। কিছু দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও বেশ কিছু এখনও খোলা।

গণ্ডগোলটা শুরু হতেই আমাদের ঘিরে লোকজনের ভিড় জমে গেছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে সবাই।

বন্‌বনিয়ার বাঁশিতে সুর উঠতেই একটা চেনা সুগন্ধ আমার নাকে এল। বন্‌বনিয়াকে ঘিরে একটা আবছা আভাও যেন লক্ষ্য করলাম।

নেকড়ের দল ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সংঘর্ষের বিশ্রী শব্দ আমার কানে এল। দেখি নেকড়েরা তিনজন হাত-বুক-মুখ চেপে রাস্তায় বসে পড়েছে। একজনের নাক ফেটে রক্ত পড়ছে। ওরা যেন কোনও পাথরের মূর্তির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারণ বন্‌বনিয়া নিশ্চলভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

নেকড়ে ততটা আহত হয়নি। ও এক ছুটে একটা দরমাঘেরা দোকানে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই একটা লম্বা ধারালো তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। রাস্তা আর দোকানের আলো পড়ে তরোয়ালটা ঝিকিয়ে উঠল।

তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরে ধীরে-ধীরে পা ফেলে বন্‌বনিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল নেকড়ে। নোংরা গালাগাল দিয়ে বলল, 'তোর ন্যাড়া মাথা এক কোপে দু'ফাঁক করে দেব।'

তরোয়ালটা শূন্যে ঘুরিয়ে নেকড়ে বসিয়ে দিল বন্‌বনিয়ার মাথায়।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। দর্শকদের কেউ-কেউ অজান্তে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু নেকড়ের তরোয়ালটা স্রেফ বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। ন্যাড়া মাথা বাচ্চা ছেলেটা একইভাবে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে।

হতভম্ব নেকড়ে অন্ধরাগে পাগলের মতো তরোয়াল চালাতে লাগল। কিন্তু তার ফল হলো একই।

শেষ পর্যন্ত ও তরোয়ালে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাঁফাতে লাগল।

টার্গেট আর হীরালাল বন্‌বনিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল, বন্‌বনিয়া ওদের দিকে তাকিয়ে খলখল করে হেসে উঠল। ওর চোখ হঠাৎই লাল টুনি বাতি হয়ে জ্বলে উঠল। বন্‌বনিয়া চিৎকার করে বলে উঠল, 'হম কুছু নেহি করতা। সব হো যাতা হ্যায়।'

টার্গেট বন্‌বনিয়ার বুক তাক করে গুলি চালাল।

গুলিটা বোধহয় বন্‌বনিয়ার গায়ে ঠিকরে আবার টার্গেটের দিকেই ফিরে গেছে। কারণ টার্গেট রিভলবার ফেলে দিয়ে তলপেট চেপে বসে পড়ল। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল।

আমাদের চারপাশে ততক্ষণে শোরগোল শুরু হয়ে গেছে। হীরালাল দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল। আহত নগাও ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বন্‌বনিয়া বাঁশিতে সুর তুলতেই ওরা পলকে পাথর হয়ে গেল। যেন কেউ ওদের মন্ত্রবলে অবশ করে দিয়েছে।

বন্‌বনিয়া আমার কাছে এসে মিষ্টি করে হেসে বলল, 'হম যাতা হ্যায়, ছোটে মালিক। এদেরকেও নিয়ে যাচ্ছি। এরা আর কখনও ফিরে আসবে না। আর কারও সর্বনাশ করবে না।'

আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ন্যাড়া মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা বাচ্চা ছেলেটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে রওনা হলো অন্ধকারের দিকে। আর নেকড়েরা ছ'জন কোন অলৌকিক নির্দেশে ওকে অনুসরণ করল। ঠিক যেন হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা ইঁদুরের পালকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে বন্‌বনিয়া চেঁচিয়ে বলে গেল, 'যব কিসিকা পাপ কা ডালা ভর যাতা হ্যায়, তব হম আতা হ্যায়।'

কারও পাপের ডালা পূর্ণ হলেই বন্‌বনিয়া আসে! বিপদ থেকে সবাইকে বাঁচায়!

বন্‌বনিয়াকে তারপর আমি আর কখনও দেখিনি।

যদি কখনও তোমরা ভীষণ বিপদে পড়ো, অসহায় দিশেহারা হয়ে যাও, আঁকড়ে ধরার জন্যে কোনও খড়কুটোও না থাকে—তখন যদি মাথায় ফেট্টি বাঁধা ন্যাড়া মাথা টিকিওয়ালা কোনও বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পাও, চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ, হাতে বাঁশি, তোমার কাছে এসে মাখন খাওয়ার পয়সা চাইছে—তো বুঝবে ও-ই হলো বন্‌বনিয়া। তবে ওর আসল নাম বোধহয় বিপত্তারণ।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

সিঁড়িতে কে?

অসীম চৌধুরী

রেভারেন্ড হার্ডি হাতের ফোটোটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর কেমন হতভম্বের মতো মাথা নাড়লেন। যেদিন সন্ধ্যেবেলা তিনি ওটা তুলেছিলেন সেদিনের সব কিছু তাঁর পরিষ্কার মনে আছে। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত যে ক্যামেরার শাটার টেপার সময় ঘোরানো (স্পাইর‍্যাল) সিঁড়িতে কেউ ছিল না। অথচ ফিল্ম ডেভেলাপ হয়ে আসার পর ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি।

স্ত্রীকে নিয়ে লন্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন রেভারেন্ড হার্ডি। তখনই তিনি তুলেছিলেন ফোটোটা। সেটা ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকাল। নানা দ্রষ্টব্যস্থানে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এলেন গ্রীনউইচে সেখানকার মেরিটাইম মিউজিয়াম দেখতে। এই মিউজিয়াম বহু পুরনো। সেই শেক্সপীয়রের সময়ে তৈরি। তাই গ্রীনউইচের কিছু ছবি তোলা উচিত মনে করলেন রেভারেন্ড দম্পতি। নিজেদের দেশ কানাডায় ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখানো যাবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী।

মিউজিয়াম ছাড়া ওখানে আরো একটা দেখার জিনিস ছিল কুইন্স হাউজ। নামে হাউজ হলে কি হবে আসলে এটা একটা প্রাসাদ। ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমস আর তাঁর রানী কুইন অ্যানে অফ ডেনমার্ক থাকবেন বলে প্রাসাদটা তৈরি হয়েছিল। কুইন্স হাউজের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর সব কারুকার্য, আসবাবপত্র, ছবি আর মূর্তি। তবে যাঁরা প্রাসাদটা দেখতে আসেন তাঁদের সব থেকে আকৃষ্ট করে ব্ল্যাক টিউলিপ সোপানশ্রেণী বা স্টেয়ারকেস। রেভারেন্ড হার্ডি আর তাঁর স্ত্রীও এর বৈচিত্র্য, আভিজাত্যপূর্ণ বাঁক ও দু'পাশের রেলিংয়ে

টিউলিপ ফুলের কারুকার্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। রেভারেন্ড তো ঠিকই করে ফেললেন এই অনন্যসুন্দর সিঁড়িটার ছবি তুলে তিনি বাঁধিয়ে রাখবেন। স্ত্রীকে মনের কথা জানাতে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে রাজী।

কিন্তু মিউজিয়ামে সেদিন ভীষণ ভিড়। সারাক্ষণ ট্যুরিস্টরা উঠছে-নামছে সিঁড়ি বেয়ে। এসময় ছবি তোলার কোনো মানে হয় না। তাই রেভারেন্ড দম্পতি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন সিঁড়িটা খালি হয়, কারণ শুধু তখনি তাঁরা কারুকার্যময় রেলিংয়ের নিখুঁত ছবি তুলতে পারবেন। দেখতে দেখতে মিউজিয়াম খালি হতে শুরু করল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা কমতে কমতে একসময় একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। রেভারেন্ড আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। ভিউফাইন্ডারে ফ্রেম ঠিক করে নিয়ে ক্যামেরার শাটার টিপলেন। ফাঁকা সিঁড়ির সুন্দর ছবি উঠল। রেভারেন্ডও খুশি, যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটিই উঠেছে। এরপর ট্যুর শেষ করে নেগেটিভ থেকে ফোটোগুলি প্রিন্ট করার পর যখন হাতে পেলেন তখন সিঁড়িটার ফোটো দেখতে দেখতে তাঁর মনে হলো অদ্ভুত কিছু একটা ঘটে গেছে।

রেভারেন্ড হার্ডি কালবিলম্ব না করে ফোটোটা পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনের ঘোস্ট ক্লাবে। ক্লাবটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষ যা দেখেছে, শুনেছে বা তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেসবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা। ভৌতিক কাণ্ডকারখানা বিশ্লেষণ করে তার সত্যতা নির্ণয় করার ব্যাপারে ক্লাবের প্রচুর নাম ও খ্যাতি হয়েছিল। নানান জায়গা থেকে লোকে এঁদের কাছে ভূতের ছবি পাঠাত। তবে সেগুলোর সবকটাই যে খাঁটি তা কিন্তু নয়। দেখা গেছে বেশির ভাগ ছবিই হচ্ছে ট্রিক ফোটোগ্রাফির নিকৃষ্টতম উদাহরণ। নামের মোহে ছবিগুলোর প্রেরকরা এহেন কাজ করত। কিন্তু রেভারেন্ডের পাঠানো ফোটোটা ছিল একদম আলাদা।

ঘোস্ট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফোটোটা ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্য সেটাকে আলোর সামনে তুলে ধরলেন। দেখা গেল সিঁড়িটা খালি নয়। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢেকে দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ধাপে। তবে তারা খুব স্পষ্ট নয়, কেমন আবছা আবছা যেন দুটো ছায়াশরীর। মুখও দেখা যাচ্ছে না তাদের। শুধু রেলিংটা যে তারা ধরে আছে এটা বেশ ভালভাবে বোঝা যাচ্ছে। একজনের আঙুলে খুব বড় উজ্জ্বল একটা আংটি। দু'জনের শরীরের ওপরেই সাদা মতো একটা আলোর রেখা।

প্রেসিডেন্ট অনেকরকম ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন ফোটোতে কোনো কারচুপি নেই। তার মানে কোনো ভাঁওতাবাজির প্রশ্ন নেই এখানে। থাকবেই বা কেন? রেভারেন্ড তো সস্তায় নাম কেনার মানুষ নন, কোনোরকম প্রচারও চান না তিনি। প্রেসিডেন্ট কাচের তলার আলো নিভিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের জোর আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর সমবেত সদস্যদের উদ্দেশ করে বললেন, সবদিক দেখে ফোটোটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। রেভারেন্ড হার্ডি একজন ধর্মযাজক, খাঁটি মানুষ। তাছাড়া তিনি এও লিখে জানিয়েছেন, 'ভূত-প্রেত আমি কোনোদিন বিশ্বাস করিনি, করবোও না। তাই আমার মনে হয় এটা কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালে ভাল হয়।'

ঘোস্ট ক্লাব থেকে ফোটো চলে এল এক ফোটোগ্রাফি বিশেষজ্ঞের কাছে। তাঁর চোখেও কোনো কৃত্রিমতা বা ট্রিকস ধরা পড়ল না। এবার রেভারেন্ড হার্ডিকে ডেকে পাঠানো হলো ক্লাবে। তিনি আসতে মিউজিয়াম আর কুইন্স হাউজ সম্বন্ধে সদস্যরা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করতে লাগলেন তাঁকে। ফোটো তোলার ব্যাপারেও তাঁকে সবরকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। পরীক্ষার শেষে সদস্যরা একবাক্যে রায় দিলেন যে রেভারেন্ড সত্যি কথাই বলছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো মতলব তাঁর নেই। তিনি যখন ছবি তুলেছিলেন তখন সিঁড়িটা ফাঁকা ছিল না। তবে এটাও ঠিক সেসময় ওখানে মিউজিয়ামের কোনো কর্মচারী বা কোনো ট্যুরিস্ট ছিলেন না। ছিলেন টিউলিপ স্টেয়ারকেসের দুই প্রেতাত্মা।

এবার ঘোস্ট ক্লাব মিউজিয়ামে একদল প্রতিনিধি পাঠাল খোঁজখবর নিতে। তাঁরা সিঁড়ির ওপর পদশব্দ, কথাবার্তা ও কান্নার আওয়াজ রেকর্ড করলেন। কিছু কর্মচারীর কাছে খবরও পেলেন বহুদিন ধরে মিউজিয়ামের আশেপাশে তাঁরা অলৌকিক কিছু ছায়াশরীর দেখেছেন কিন্তু অত্যাধুনিক মেশিন নিয়েও রেভারেন্ডের ফোটোটার ডুপ্লিকেট করতে পারেননি তাঁরা। সেই ফোটো এখনও যত্ন করে রাখা আছে ক্লাবের ফাইলে। ভূত-গবেষকরা আজ পর্যন্ত ফোটোর দুটি ছায়া সম্পর্কে আর কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পারেননি।

[উইল ওসবোর্ন-এর লেখা 'দ্য ঘোস্ট অফ দ্য টিউলিপ স্টেয়ারকেস' অবলম্বনে]

ছবি: সরোজ সরকার
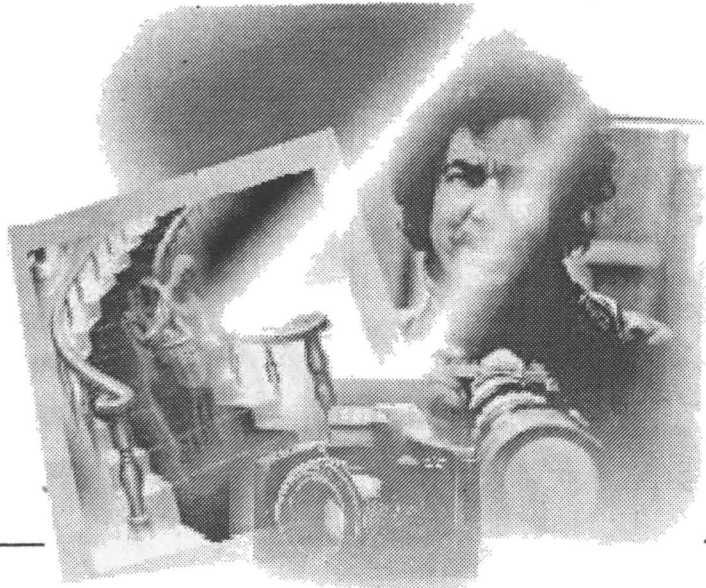
বাঘের মুখ থেকে ফেরা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

সন্তু জানতেই পারেনি তাদের বাড়ির গা বেয়ে যে রাস্তাটা গ্রামে ঢুকেছে গঙ্গা থেকে সেটাই বাঘের যাতায়াতের পথ। খবর শুনে গা-টা শিউরে উঠেছে। বন্ধু সজলই তাকে এ খবরটা দিয়েছে।

রাত গভীরে ঘুম ভেঙে গেলে শেয়ালের ডাক শুনেছে সন্তু। এমন কি বাঘের পিছনে ফেউ লেগেছে সেই খেঁকশেয়ালের চিৎকারও কানে এসেছে। ভীতসন্ত্রস্ত সে ডাকে বাঘ যখন বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরে চোখ রাঙিয়েছে তাও। কিন্তু সেই বাঘ যে তাদের শোবার ঘরের জানলার নিচে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যায় এটা ভাবতেই কেমন যেন লাগে।

একদিন ভোরবেলায় সজল এসে দেখিয়েছে, রাস্তার ধুলোর ওপর বাঘের থাবার ছাপ। সন্তর্পণে চলাফেরার জন্য একটু অস্পষ্ট। থাবার মাংসপিণ্ডের ছাপগুলো স্পষ্ট।

কিরে সন্তু, এখন বুঝলি তো?

সন্তু ঘাড় নাড়ল বন্ধুর কথায়। গতরাতে ঘোষপাড়ায় বাঘে-মানুষে লড়াইয়ের কথা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। হরেন ঘোষের গোয়ালে ঢুকে তার ধলা বাছুরটাকে বাঘে ধরেছে টের পেয়েছে হরেন গোয়ালের ভেতর গরুদের অস্বাভাবিক ছটফটানি আর গোঙানির শব্দে ছুটে বেরিয়েছে। বাছুরের পিছনের পা ধরে বাঘে-মানুষে টানাটানিও হয়েছে। কিন্তু বাঘের শক্তির কাছে হার মেনেছে হরেন। শিকার মুখে করে বাঘ লাফ দিয়ে পালিয়েছে। যেতে পারেনি বেশিদূর। হৈচৈয়ের ঠেলায় বাঘ বাছুরটার ঘাড় ও গলার কিছুটা খেয়ে শিকার ফেলেই পালিয়েছে।

হেঁসুয়াটা হাতে থাকলে বাঘের ঘাড়ে কোপ মারতাম, এমন সুযোগ কি আর আসবে! বাছুরের শোধ তুলতাম। হরেন আফসোস করে।

গ্রামের অজিতদাও সুযোগ পেয়ে কিছু করতে পারলেন না। অজিতদা পরের দিন মুক্তোকেশীতলায় ঠাকুরের পাটার সঙ্গে আধখাওয়া বাছুরটাকে বেঁধে রেখে পাঠশালার ছাদে সারা রাত বন্দুক তাক করেও বাঘকে মারতে পারেননি। বাঘ এসেছে রাত গভীরে চুপিসাড়ে আধখাওয়া শিকারের লোভে। সঙ্গী টর্চ মেরেছে বাঘের মুখে। দুটো জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটাকে জ্বলে উঠতে দেখে চমক লেগেছে কিন্তু বাঘ যখন তাকিয়েছে শিকারীদের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে। সাহসী অজিতদা তাঁর বন্দুক তুলেও নলের শেষপ্রান্তের মাছি খুঁজে পাননি। হাত কাঁপছে ঠক্‌ঠক্‌ করে ভয়ে। বাঘ তার শিকার মুখে করে পালিয়েছে যথারীতি।

দ্বিতীয় দফায়ও বাঘ শিকার হলো না সন্তুদের বাড়ির পাশেই মাস্টারমশাইয়ের আমবাগানে। গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে বসে রাত কাটালেন নারাণদা। গ্রামের জমিদারের ছেলে, খেলাধূলায় যেমন দক্ষ তেমনি শিকারেও। লক্ষ্য অব্যর্থ। ফুটবলে নারাণদার মতো অতবড় খেলোয়াড় এই

দিগরে কেউ ছিল না। অজিতদাও তাই। সন্তর পাশের গাঁয়ের ছেলেদের সর্ববিষয়ে গুরুর মতো এই অজিতদা।

নারাণদা সারারাত ছইয়ের চারপাশে গাছ দিয়ে নকল জঙ্গল সাজিয়ে বসে রইলেন বন্দুক তাক করে। কিন্তু চালাক বাঘ বেঁধে রাখা ছাগল শিকারের লোভে এলই না। সন্তদের বাড়ি থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দু'তিনবার গরম চা গেল নারাণদার জন্য। সারা রাত জেগে তিনি ফিরে গেলেন ভোরবেলায়। ছাগলটা বৃথাই সারা রাত ভ্যা ভ্যা করে ডেকে গেল আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়ে।

তৃতীয় দফায় গ্রামে ঢুকল হাতি। এটা নদীয়ার জমিদার শিবেন সিংহ আর শচীন সিংহের। গুরুপুত্র সজলদের বাড়ি হাতিতে চড়ে এলেন যুবরাজ বরুণ সিংহ। সঙ্গে রাইফেল বন্দুক। অবশ্যই শিকারের আশায় এমন খবর রটে গেল গ্রামে গ্রামে। সন্ত ছুটে গেল বন্ধুর বাড়ি। ভয়ে হাতিতে চড়ল না অথবা চড়ার সুযোগ পেল না তা ঠিক জানা গেল না। মাস্টারমশায় তাঁর সাধারণ দু'নলা বন্দুকটা বরুণের দামী রাইফেলের পাশে রেখে দিলেন কৌলিন্য বাড়াবার আশায়। এই বন্দুক নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ছাগল বা গরু বেঁধে রেখে শিকারে বসতে রাজী হলেন না জমিদার তনয় বরুণ সিং। তাঁর বাবা-কাকার বাঘ শিকারের যে কাহিনী পল্লবিত তাতে এভাবে শিকার যে তাঁদের বাড়ির ছেলের পক্ষে মর্যাদাহানিকর তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা চলমান বাঘ মারেন গুলি ছুঁড়ে। কাহিনী হলেও সত্য ঘটনাই।

সে সময় সন্তদের গ্রামের মতোই নদীয়ায় বরুণদের গ্রামেও বাঘের উপদ্রব দেখা দেয়। আসল কথা তখন গ্রামের মধ্যে বা আশেপাশে প্রচুর বনজঙ্গল ছিল। দেশভাগও তখন হয়নি আর দেশভাগের বলি উদ্বাস্তরাও তখন আসেননি ভিটেমাটি ছেড়ে এই সব গ্রামে বনজঙ্গল কেটে বসত করতে।

তাই সন্তদের গ্রামের মতো বরুণদের গ্রামেও মাঝেমধ্যে বাঘের ডাক শোনা যেতো রাতে। গরু-ছাগল চুরির ঘটনাও ছিল আতঙ্ক আর উপদ্রবের বিষয়। বেশির ভাগই গুল বাঘ। গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ হলদে রঙের ওপর ছাপা শাড়ির মতো। খুব বেশি বড় নয়, রামছাগলের মতো আকারে।

শিবেন সিং আর শচীন সিংয়ের গ্রামে যে বাঘটা ঢুকে পড়ে সেটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের জাতের বেশ বড় বাঘ। কেমন করে সে গ্রামে ঢুকেছিল তা জানা যায়নি তবে বাঘটা দিনের বেলায় গ্রামের প্রান্তে এক ভাঙা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এমন খবর পৌঁছে গেল জমিদার বাড়িতে।

'হুজুর! বাঘ।' এক প্রজা তাহের শেখ হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে নিবেদন করল জমিদারবাবু শিবেন সিংয়ের দরবারে।

'কোথায় বাঘ দেখলে হে শেখের পো!'

'হুজুর! গ্রামের মুড়োয় লাহিড়ীবাবুদের যে পোড়ো বাড়ি আছে সেই ভিটেতে।'

'ওই ভাঙা বাড়িতে!'

'আজ্ঞে হুজুর।'

'ঠিক দেখেছ তো!'

'আজ্ঞে, আপনার কাছে মিথ্যে জবান, তোবা তোবা।'

দুই ভাই শিবেন আর শচীন দুটি রাইফেল নিয়ে চললেন পোড়ো বাড়িতে বাঘ শিকারের অভিযানে। পিছনে কৌতূহলী গ্রামবাসীকে ওঁরা উপদেশ দিলেন দূরে থাকতে। 'যদি বাঘ ছুটে বেরিয়ে আসে তাহলেই সর্বনাশ, অতএব তোমরা বাপু দূরে দূরেই থাক। শুধু সঙ্গে যাক তাহের আলি!'

সঙ্গে তাহের গেল খানিকটা পর্যন্ত। তারপর লাহিড়ীবাড়ির কাছে গেলেন দুই ভাই বন্দুক হাতে খুবই সন্তর্পণে। তাঁরা জনতাকে হাত নেড়ে ও ঠোঁটের ওপর আঙুল ছুঁইয়ে চুপ থাকতে বললেও একজন বলে উঠল, 'বাঘ আছে তো, না পালিয়েছে?'

জনতা তাকে তেড়ে গেলে সে মুখ বন্ধ করল।

শিবেন আগে আগে বন্দুক বাগিয়ে ধরে। ভাঙা ঘর। ইঁট-চুন-সুরকির গাদা, কাঠের কড়িবরগা চলাচলের পথ আটকে বসে।

শিবেনবাবু বন্দুকটা ভাইয়ের হাতে দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ওপর উঠে গেলেন। তারপর দেওয়াল বেয়ে যে বটগাছটা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে তার ডাল ধরেই নেমে পড়লেন মেঝের ওপর। মানুষ দেখেই কয়েকটা চামচিকে উড়ে গেল তাঁর গায়ের উপর দিয়েই। পা টিপে টিপে পাশের ঘরের দিকে উঁকি দিতেই বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়ল মৃদু গর্জন করে। তার দুই থাবা শিবেনবাবুর দুই কাঁধে। দাঁত বার করে মুখে ঘরর ঘরর আওয়াজ।

শিবেনবাবু অনেক বাঘ শিকার করেছেন। তাই ভয় না পেয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও খাড়া থাকলেন দুই পায়ে সামনে-পিছনে ভর দিয়ে। বাঘ শিবেনবাবুর ঘাড়ের ওপর থাবা চাপালেও লক্ষ্য রেখেছে ভাই শচীন সিংয়ের দিকে।

শচীনবাবু পড়েছেন মুশকিলে। না দাঁড়াবার জায়গা, না বন্দুক তুলে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার সুযোগ।

'দাদা, মাথাটা একটু সরা, বাঘের মুখ দেখতে পাচ্ছি না।'

মাথা সরাবার চেষ্টা করতেই বাঘ গর্জন করে উঠল। এই অবস্থায় দাদা কেন কারও পক্ষেই সম্ভব নয় বেশিক্ষণ খাড়া হয়ে থাকা। বাঘের মুখের লাল ঝোল ভিজিয়ে দিচ্ছে শিবেনের জামার সামনেটা।

শচীনবাবু বটগাছের ছোট্ট ঝুরিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে দেওয়ালের ফোকরে একটা পা রেখে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় বন্দুক তুলে ট্রিগার টিপলেন রাইফেলের। গুলি শিবেনের ডান কাঁধ ঘেঁষে বাঘের মাথায় আঘাত করতেই সে শিকার ছেড়ে লাফ দিল শচীনের উদ্দেশে। কিন্তু শিবেনের মাথার ওপরে ঝুলন্ত কড়ি-কাঠের বাধায় পড়ে গেল শচীনের সামনে। শচীন সিংও বড় শিকারী। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়তে। নিমেষ-মধ্যে বাঘের পাঁজর ভেদ করে ছুটে গেল গুলি। খাড়া হতে চেষ্টা করেও বাঘ পারল না মাথা তুলতে। এলিয়ে পড়ল মুখে গোঙানি তুলে মেঝের ওপর। শিবেনবাবুও লুটিয়ে পড়লেন বাঘের পাশে। তাঁর দু' কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে। গ্রামের লোক হৈ- হৈ করে ছুটে এল। শচীন ছুটলেন হাসপাতালে দাদাকে নিয়ে।

সোনার করোটি

অদ্রীশ বর্ধন
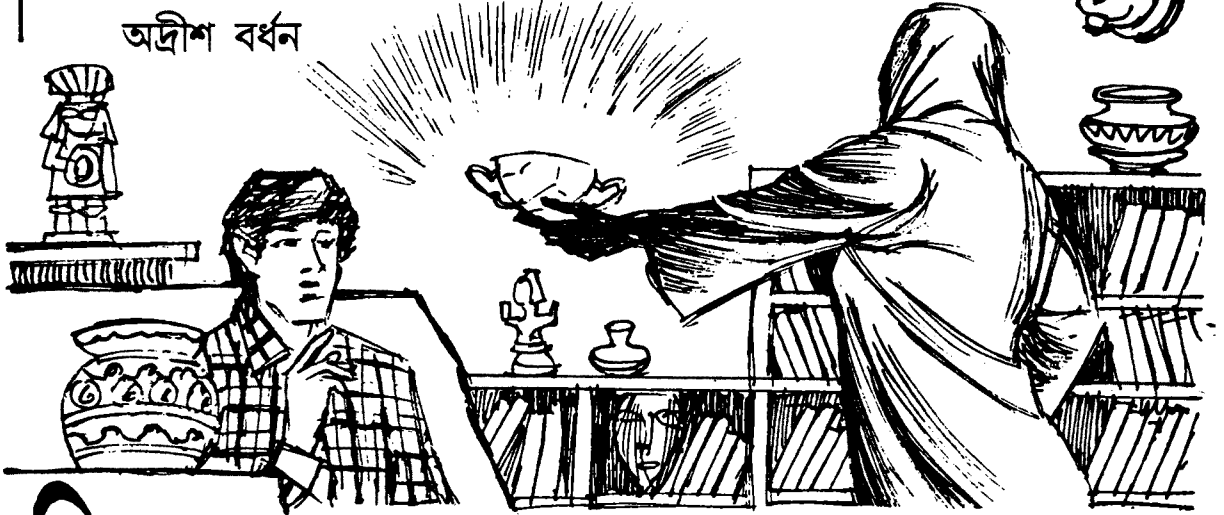
হিপনোটিস্ট সঙ্গীত সরখেল বললে, ইন্দ্রনাথবাবু, আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, আপনার গোয়েন্দা জীবনে এরকম আশ্চর্য কেস কখনও দেখেননি। এরকম অদ্ভুত মেয়েও কখনও দেখেননি।

রোববারের আড্ডা শুরু হয়েছিল এইভাবে ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটা লেকের বাড়িতে। একলা একলা থাকে, তাই আমাকেই প্রতি রোববারে যেতে হয় বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটায়।

যোগব্যায়াম সেরে সবে সোফায় বসে দুটো পা টান টান করে সামনে ছড়িয়েছে, এমন সময়ে কলিংবেল বাজিয়ে, আমাকে দিয়েই দরজা খুলিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সঙ্গীত সরখেল।

মানুষটার নামের মধ্যে যেমন সঙ্গীত আছে, চেহারা আর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও তেমনি সঙ্গীত আছে। দীর্ঘবপু, কান্তিময়, স্নিগ্ধ চক্ষু; শুধু স্নিগ্ধ নয়—স্বপ্নময়। টানা টানা চোখে দু'টুকরো আকাশ ভাসছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তেমনি তার স্বরগাম্ভীর্য এবং মাধুর্য। সুরেলা সঙ্গীত। পরনে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা—ঢিলে নয়, পায়ের গোছ কামড়ে রয়েছে। বয়স চল্লিশের নিচে।

ঘরে প্রবেশ করেই আত্মপরিচয় প্রদান করেছিল এইভাবে, পেশায় আমি হিপনোটিস্ট। শিখেছি আমেরিকায়। সমাজসেবা করি কলকাতায়।

তারপরেই বলেছিল ওই কথাগুলো—এই কাহিনী শুরু যা দিয়ে।

ইন্দ্রনাথ শুধু বলেছিল, আশ্চর্য?

সঙ্গীত বলেছিল, হিপনোটাইজড হয়ে পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারছে মেয়েটা।

সিধে হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ।

দু'জনে তখন দু'জনকে অবলোকন করছিল। দু'জনেরই চোখ স্বপ্ননীল, দু'জনেই সুন্দরদেহী, দু'জনেই গৌরকান্তি, দু'জনেই স্বরজাদুতে শক্তিমান। শুধু বয়েসে তফাৎ।

আমি লেখক মানুষ। চরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেলে তন্ময় হয়ে যাই। তাই মনে মনে ভাবছিলাম, দু'জনেই রহস্যসন্ধানী। একজন মনের, আর একজন অপরাধের।

সৌন্দর্যের পূজারী আমি। মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কণ্ঠস্বরে সুরলহরী জাগ্রত করে ইন্দ্রনাথ শুধিয়েছিল, অদ্ভুত একটা মেয়ের কথা বলছিলেন?

তাকে বাঁদরের মতো দেখতে।

ঘর নিস্তব্ধ। আমি উৎসুক। ইন্দ্রনাথের চক্ষু সূচ্যগ্র।

অবিকল বাঁদরের মতো?

হ্যাঁ। জিনের গোলযোগ।

খুবই বিরল গোলযোগ। চিকিৎসা-শাস্ত্রের নথিতে এরকম উল্লেখ আছে বলে তো আমার জানা নেই।

নেই, সঙ্গীতের জবাব, সারা শরীরে লোম, চোখের পাতা কোঁচকানো, গায়ের চামড়াও কোঁচকানো, নাক ভোঁতা-চওড়া, মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চওড়া, চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে আছে—বাঁদরের সাদৃশ্য সারা অঙ্গে।

নতুন ধরনের অসুখ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু মেয়েটির তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তার বিশ্বাস, তার একটা মানসিক রোগ আছে। মনের রোগের ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। পাগল বলে বসবে। তাই এসেছিল আমার কাছে।

রোগটা কী?

নিজের পূর্বজন্ম দেখতে পায়।

ইন্টারেস্টিং। কি ছিল আগের জন্মে?

একটা জন্ম তো নয়। মোট সতেরোটা জন্মকাহিনী আমাকে শুনিয়েছে। কখনও রাজকুমারী, কখনও সেবাদাসী, একবার ছেলে হয়েছিল—নিষ্ঠুর নির্মম যোদ্ধা-রাজা হয়ে দেশের পর দেশ লুঠ করে সোনার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিল' সেখানে আছে শুধু সোনার করোটি...

সোনার করোটি! ইন্দ্রনাথ প্রকৃতই

বিস্মিত হলো, সোনা দিয়ে তৈরি মাথার খুলি?

সোনা দিয়ে বাঁধানো। শত্রুকে মেরে ভুরুর ওপর থেকে মাথার খুলি করাত দিয়ে কেটে নেওয়া হতো। সুরাপাত্র তৈরি হতো তাই দিয়ে—সোনার পাত দিয়ে মুড়ে নেওয়ার পর।

এই মেয়েটা ছিল সেই নিষ্ঠুর রাজা?

শুধু নিষ্ঠুর নয়, পিশাচ বললেও চলে। যার খুলি, তার রক্তই প্রথমে পান করত খুলি-কাপ দিয়ে।

হরিবল। ঈষৎ বিকৃত হয় ইন্দ্রনাথের মুখচ্ছবি, এই জাত কি এখনও আছে পৃথিবীতে?

হেসে ফেলল সঙ্গীত, নিশ্চিন্ত থাকুন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এরা।

এরা কারা?

একটু থেমে সঙ্গীত বললে, নামটা...নামটা...আর একবার হিপনোটাইজ করলে ভাল হয়। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সিদিয়ান, যাদের কুরগান খুঁড়ে রাশিয়ার জার পিটার দ্য গ্রেট অদ্ভুত অদ্ভুত সোনার জিনিস পেয়েছিলেন। কুবেরের স্বর্ণভাণ্ডার বললেই চলে।

ঝুঁকে বসল ইন্দ্রনাথ, কুরগান কী?

কবর পাহাড়। মাটির ঢিপি। অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ইউক্রেনের আলেকজানদ্রোপোল-এ যেটা আছে, সেটা আঠারো মিটার উঁচু, পরিধি তিনশ মিটার, ভেতরে আছে রাজসম্পদ, ঘোড়া, চাকরবাকর, এমনকি রাজার বউও। সব মরা অবস্থায়। রাজা মারা গেলে এদেরও গলা টিপে মেরে ফেলা হতো।

হরিবল, ফের বললে ইন্দ্রনাথ, পিটার দ্য গ্রেট কোন কুরগান খুঁড়েছিলেন?

সাইবেরিয়ান কুরগান।

সিদিয়ান...সিদিয়ান...এদেরই রাজা ছিল এই মেয়েটা? এখনও রক্তপানের নেশা আছে নাকি?

হেসে ফেলল সঙ্গীত, ঠিক উল্টো। রক্ত দেখলে শিউরে ওঠে। বহু জন্ম আগের পাপের অনুশোচনায় এখন দগ্ধে দগ্ধে মরছে।

স্ট্রেঞ্জ, তারপর খুব আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ, কিন্তু আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

হাতের নখ নিরীক্ষণ করতে করতে কিছুটা সময় নিল সঙ্গীত। তারপর বললে, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। মেয়েটার মধ্যে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন আছে।

ই-এস-পি? অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ?

হ্যাঁ। ভগবান তাকে চেহারায় মেরেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ক্ষমতারও বাড়তি ঐশ্বর্য দিয়েছেন। সে টের পেয়েছে, অতীত জন্মে যে সোনার করোটি থেকে নররক্ত পান করত, সেটা চোরাপথে কলকাতায় এসেছে।

বটে! বটে! বটে! ইন্দ্রনাথ একদম সিধে, মানে, শিরদাঁড়াটা। কোথায় আছে সেই করোটি?

আমার কাছে বলতে চাইছে না। আপনার নাম সে শুনেছে। শুধু আপনাকে বলবে—আপনি যেন সেই করোটি উদ্ধার করে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। অভিশপ্ত সেই করোটি যার হাতে যাবে, রক্ততৃষ্ণা তার জাগবে।

অদ্ভুত কেস বটে। পুলিশকে বললেই তো পারে।

ব্যাপারটাকে প্রাইভেটে রাখতে চায়।

মেয়েটার নাম কী?

অর্চনা।

তাকে কোথায় পাব?

আমার চেম্বারে।

অর্চনা কিন্তু হিপনোটিস্টের চেম্বারে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেনি।

ইন্দ্রনাথ একাই গেছিল চেম্বারে। সঙ্গীত বসেছিল অর্চনার প্রতীক্ষায়।

অর্চনা আসেনি। এসেছিল তার টেলিফোন। ইন্দ্রনাথ যদি অনুগ্রহ করে তার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেয়, সে কৃতার্থ হবে। কারণ আর কিছুই নয়। এই মর্কট আকৃতি নিয়ে সমাজে চলাফেরা করা তার পক্ষে একটা বিড়ম্বনা। যদিও বোরখা পরে থাকে বাইরে বেরোনোর সময়ে, তাহলেও ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠতে হয়। লিফটম্যান তাকায় অদ্ভুত চোখে। নিচের সিকিউরিটির লোকজনও হাসি গোপন করে তাকিয়ে থাকে। ভাল লাগে না অর্চনার। একলা থাকে এই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের একদম ওপর তলায়। দূর দক্ষিণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন সমুদ্র দর্শন হচ্ছে। ইন্দ্রনাথ যদি আসে, তার ভাল লাগবে। অর্চনাও তার গোপন কথা গোপনে বলতে পারবে। সোনার করোটি দেখিয়েও দিতে পারে। কেননা, জিনিসটা এখন তার হাতে চলে এসেছে।

শুনেই চমকে উঠেছিল ইন্দ্রনাথ। যে সোনামোড়া মাথার খুলি থেকে মানুষের রক্ত পান করা হতো, ভয়ানক সেই নরকরোটি এখন অর্চনার দখলে!

অর্চনা বলেছিল, অনুগ্রহ করে এই সংবাদটা সঙ্গীতবাবুকে দেবেন না। কারণ চুক্তিটা শুধু আপনার সঙ্গেই করতে চাই। কিসের চুক্তি, তাও বলে দিচ্ছি। পূর্বজন্মে আমি যখন রক্তপিপাসু ছিলাম, মানুষের কাঁচা রক্ত পান না করলে আমার তৃষ্ণা মিটত না, তখন আমি যে স্বর্ণভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছিলাম মাটির তলায়, তার ঠিকানা আমি জেনে ফেলেছি। সেই সম্পদ আজও রয়েছে মানুষের চোখের আড়ালে—বিশাল সেই মাটির ঢিপি আরও পাতালে চলে গেছে আকাশে অ্যাটম বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটায়। সাইবেরিয়ায়...সাইবেরিয়ায়...১৯০৮ সালে মাটি থেকে তিন কিলোমিটার ওপরে যে বিস্ফোরণটা ঘটেছিল, বিস্ফোরণের ধাক্কায় চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত জমি কেঁপে উঠেছিল, তিরিশ মিলিয়ন টন টি-এন-টি বিস্ফোরকের বিস্ফোরণের সমান সেই এক্সপ্লোশন আরও পাতালে তলিয়ে দিয়েছে আমার স্বর্ণসম্পদ। ইন্দ্রনাথবাবু, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই বিপুল ভাণ্ডার...আমার...আমার...আমার ভাণ্ডার...আপনার মতো দুঃসাহসী মানুষই পারবে সেখানে যেতে। আপনার যোগাযোগও আছে সব মহলে। প্লীজ, আসুন।

কেটে গেল টেলিফোনের লাইন। হতভম্ব হয়ে বসে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে সঙ্গীত সরখেলের কাছে চেয়েছিল একটা জিনিস।

টেপ রেকর্ডার।

কলিংবেল টিপে 'ম্যাজিক আই'য়ের দিকে নজর রেখেছিল ইন্দ্রনাথ। ঘরের ভেতর থেকে অর্চনা তাকে দেখছে, তা বুঝেছিল। তারপর খুলে গেছিল দরজা।

আপাদমস্তক সাদা বোরখা। বেরিয়ে আছে শুধু দুটো পা। পায়ের চামড়া কুঁচকোনো অস্বাভাবিকভাবে।

ইন্দ্রনাথের নজর অনুসরণ করে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলেছিল বানরদেহী অর্চনা, মোজা পরে নিলে ভাল হতো। বসুন।

বসবার ঘরটা বেশ বড়। হলঘর বললেই চলে। মেঝেতে কার্পেট। দেওয়ালের তাকে সাজানো অদ্ভুত সামগ্রী। খুব প্রাচীন।

সোফায় বসে ইন্দ্রনাথ সেদিকে তাকিয়ে বলেছিল, সিদিয়ানরা শুনেছি ভাল ঘোড়সওয়ার ছিল, কুশলী যোদ্ধা ছিল, অথচ গ্রীকদেশের ফাইন আর্ট রপ্ত করেছিল।

ঠিকই শুনেছেন, বিপরীত সোফায় বসে বলেছিল প্রায়-বানরী অর্চনা। কণ্ঠস্বর কিন্তু আশ্চর্য রকমের নরম। কথা নয়, যেন গান গাইছে।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, আপনি একা থাকেন? এত বড় ফ্ল্যাটে? এখানে তো হাই-ইনকাম মানুষ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না।

অর্চনা বলেছিল, ব্যাঙ্কে আমার জন্যে যে টাকা রেখে দেওয়া হয়েছে, তা কম নয়। আমার কোনও অভাব নেই।

তবুও চান স্বর্ণভাণ্ডার?

কারণ সেটা আমার সম্পত্তি।

সোনার করোটি কোথায়?

এইখানে, বলে হেঁট হয়ে সিঙ্গল সোফার তলা থেকে সোনার করোটি বের করেছিল অর্চনা। হাতে নিয়ে দেখুন। বহু জন্ম আগে এই করোটি ভরে মানুষের রক্ত পান করতাম আমি, তখন ছিলাম পুরুষ।

শুনেছি, বলে উঠে গিয়ে সোনা দিয়ে মোড়া করোটি হাতে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ।

ভুরুর ওপর থেকে করাত দিয়ে কেটে নেওয়া খুলির ওপরের অংশ। সোনার পাত দিয়ে মোড়া। দু'পাশে সোনার হাতল—দু'হাতে ধরবার জন্যে।

ইন্দ্রনাথ করোটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলেছিল,- ধুলো-ময়লা একদম নেই। সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই এত চকচকে।

আমি পরিষ্কার করেছি। কতখানি নরপিশাচ ছিলাম, তা দেখবার জন্যে।

অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হলো তো?

অ-নে-ক। আমার জিনিস আমাকেই কিনতে হলো।

এবার বলুন, সাইবেরিয়ার কোথায় আছে আপনার স্বর্ণভাণ্ডার।

যেতে হবে টুরিস্টের ছদ্মবেশে। অভিযান চালাতে হবে গোপনে। আপনি রাজী?

রাজী না থাকলে আসতাম না। কিন্তু কি শর্তে?

এক তৃতীয়াংশ আপনার, বাকি আমার।

অভিযানের খরচ? সে যে অনেক।

তাও আমার।

আপনার তো দেখছি অনেক টাকা। এত টাকা কে দিয়েছে আপনাকে?

অর্চনা নীরব। বোরখার জালির আড়ালে চোখ স্থির।

ইন্দ্রনাথ বললে, আমি জানি কে দিয়েছে আপনাকে। আপনার দাদু।

কে বলল?

সেটা আপাতত উহ্য থাকুক। আরও জানি, আপনার অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ বলে কিসসু নেই। আপনি পূর্বজন্মও স্মরণ করতে পারেন না। হিপনোটাইজ করে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা যায় না।

টেপ রেকর্ডারে আমার কথা রেকর্ড করা আছে হিপনোটিস্টের চেম্বারে।

আছে। আমি তা শুনেছি। আরও কিছু শুনেছি।

আরও কিছু?

সঙ্গীত সরখেল এই বিদ্যে শিখেছে আমেরিকায়। ছদ্মস্মৃতিভ্রংশ কেস হ্যান্ডল করেছে অনেক।

ছদ্মস্মৃতিভ্রংশ? ঝুঁকে বসেছিল অর্চনা।

ক্রিপটোমনেসিয়া। ব্রেন অজস্র বিশদ বিবরণ জমিয়ে রাখতে পারে—যার ব্রেন, সে নিজেও তা জানতে পারে না, এত তথ্য থেকে যায় অবচেতন মনে। আপনারও আছে। আপনি তাই থেকেই ফ্যানট্যাসির দুনিয়ায় বিচরণ করেন যখন সম্মোহিত হন। তাই সতেরোটা পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারেন। কিন্তু পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতিই আপনার নেই। আপনি এ সবই পড়েছেন বইয়ের পাতায়।

বইয়ের পাতায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ইন্দ্রনাথের স্বর বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হয়ে গেছিল, আপনি দাদুর ডায়েরিও পড়েছিলেন। দাদু ছিলেন বিশ্বপর্যটক। সাইবেরিয়ার এক কিংবদন্তী কাহিনী ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। সেই কিংবদন্তী আপনার অবচেতন মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু এই সোনার করোটি?

আপনার দাদুর সিন্দুকে পেয়েছেন।

আপনি জানলেন কি করে?

সঙ্গীত সরখেলের কাছ থেকে।

সে জানে?

টেপ রেকর্ডারে তুলে রেখেছে।

সেখানে তো আছে আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি।

তাহলে শুনুন। সন্দেহটা আমারও হয়েছিল। ছদ্মস্মৃতিভ্রংশ কেসে রিগ্রেসন মেথড নিয়েছিল কিনা, জানবার জন্যে টেপ রেকর্ডার চেয়েছিলাম।

রিগ্রেসন! সেটা কী?

প্রথম পর্বের সম্মোহনে আপনাকে বলা হয়েছিল ফিরে যান এ জন্মের আগের জন্মে। দ্বিতীয় পর্বের সম্মোহনে—রিগ্রেসন সম্মোহনে বলা হয়েছিল, এসব কোনও বইতে পড়েছেন?

কি বলেছিলাম আমি?

দাদুর ডায়েরির কথা বলেছিলেন। আর একটা বইয়ের নাম করেছিলেন।

কী বই?

দ্য ওয়ার্ল্ডস লাস্ট মিসট্রিজ। আচ্ছা, উঠি। নমস্কার।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

সম্পূর্ণ উপন্যাস

পৃথিবী ধ্বংসের পাসওয়ার্ড

সঞ্জীব সিংহ

বাবা, দেখো। এই হচ্ছে সেই ওয়েবসাইট। এটার কথাই আমি তোমাকে বলেছিলাম।

কথাটা বলার সময় ছোট্ট অভির গলা একটুও কাঁপল না। যেন খুব সাধারণ কোনও ঘটনা। এমনই গলা অভিষেকের। বলার ভঙ্গিতেও রয়েছে মজার সুর।

ছেলের মাথার ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে কম্পিউটারের মনিটারে চোখ রাখলেন তারকনাথ মজুমদার।

অভি বলল, এই দেখো, এখানে এন্টার লেখা আছে। কিন্তু পাসওয়ার্ড ওদের সঙ্গে না মিললে এই সাইটের ভেতর ঢোকা যায় না। কিন্তু আমি ভিউ সোর্সে গিয়ে কায়দা করে ওদের পাসওয়ার্ড জেনেছি।

কি-বোর্ডে পাসওয়ার্ড টাইপ করল অভি। তারকনাথের চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি অচেনা জগৎ উন্মোচিত হতে লাগল কম্পিউটারের মনিটরে।

কিন্তু এ কি দেখছেন তিনি? চোখ বড় বড় হয়ে গেল তারকনাথের। গোটা সাইট জুড়ে ছড়ানো শুধু ধ্বংসের ছবি। কোথাও বোমা ফেটে একটা ট্রেন উড়ে গেছে। কোথাও ভেঙে পড়েছে আস্ত বহুতল বাড়ি। যন্ত্রণাকাতর, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের ছবি।

বিশ্বের বড় বড় খবরের কাগজগুলোর যেসব নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, সেখানে ঢুকলেও এইসব ছবি দেখা যায় বটে, কিন্তু সেখানে ছবির তলায় লেখা থাকে না— 'অভিনন্দন বন্ধুগণ। পৃথিবীজুড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে।'

তারকনাথ এত অবাক হয়ে গেছেন যে ছেলের পাশে চেয়ার টেনে বসতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। এই ওয়েবসাইট যে জঙ্গী দস্যুদের, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু ছোট্ট অভি এই সাইটের সন্ধান পেল কি করে?

তারকনাথ যথার্থই ভয় পেয়ে গেলেন। নিজের ছেলে অভিষেককে নিয়ে এমনিতে তাঁর গর্বের অন্ত নেই। বারো বছরের অভিষেককে বলা হয় কম্পিউটার কিড। এত অল্প বয়সেই অভিষেক কম্পিউটারে বিশেষ পারদর্শী। তারকনাথ নিজে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর কাছেই অভির কম্পিউটারে হাতেখড়ি মাত্র চার বছর বয়সে। তারপর থেকে অভি যেভাবে উন্নতি করেছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য! এই বয়সেই অভি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাশ করেছে মাইক্রোসফটের কঠিন কঠিন পরীক্ষা! কাগজে মাঝে-মধ্যেই অভির ছবি বেরোয়। এই তো কিছুদিন আগে টিভি থেকে সাক্ষাৎকার নিয়ে গেল। অল্প বয়সেই তাই অভি বেশ বিখ্যাতও বটে। অভির এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ইচ্ছেয় এগিয়ে এসেছে দু'একটি কম্পিউটার সংস্থা। একদল এসে বাড়িতে ইন্টারনেট বসিয়ে দিয়ে গেছে। যত খুশি ইন্টারনেট দেখুক অভি, কোনও খরচ লাগবে না।

কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতা আর এত খ্যাতির পাশাপাশি যে বিড়ম্বনাও রয়েছে, তা এই প্রথম টের পেলেন তারকনাথ।

কয়েকদিন আগেই অভি অবশ্য তাঁকে বলেছিল, জানো বাবা, একটা অদ্ভুত ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছি।

তারকনাথ অতটা গায়ে মাখেননি। অভি মাঝেমধ্যেই এমন অনেক কথা বলে। আসলে কয়েকদিন ধরেই তারকনাথ একটা দ্বিধার মধ্যে রয়েছেন। অভিকে আমেরিকায় পড়াতে পাঠানোর কথাবার্তা চলছে। স্কলারশিপও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অভিকে ছেড়ে কি তারকনাথ একা থাকতে পারবেন? খুব ছোটবেলায় অভি মাকে হারিয়েছে। তারকনাথ বিপত্নীক।

সব দ্বিধা, দ্বন্দ্বের আপাতত অবসান ঘটিয়ে দিল এই নতুন ওয়েবসাইট। এই মারাত্মক, বিপজ্জনক ওয়েবসাইটটি চালায় নিশ্চয়ই জঙ্গী দস্যুরা। গোপন খবর আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রেই নিশ্চয় এটা ব্যবহৃত হয়। অভি তার বিশেষ ক্ষমতাবলে এই গোপন নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকে পড়েছে। অভি জানে না কতবড় ভুল সে করেছে!

তারকনাথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, বন্ধ কর, শীগগির বন্ধ কর।

চমকে উঠে অভি বলল, কেন বাবা?

ছেলেকে কি বলে বোঝাবেন, তা চট করে ভেবে পেলেন না তারকনাথ। জঙ্গী দস্যুদের কার্যকলাপ বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা, কোনওটাই নেই বারো বছরের অভির। জীবনের ও কতটুকু দেখেছে?

তারকনাথ বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, এটা খারাপ লোকেদের আড্ডা বাবা। এই ওয়েবসাইটে তোমার না ঢোকাই ভাল।

বড়দের মতো মাথা নেড়ে অভি বলল, আমি জানি এরা খারাপ লোক। এরা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চাইছে। এদের থামানো দরকার।

তারকনাথ এবার চেয়ার টেনে নিয়ে ছেলের পাশে বসলেন। বললেন, শোনো, সেই ক্ষমতা আমাদের নেই। এদের থামানোর জন্য সরকার আছে। সেনাবাহিনী আছে।

অভি বলল, তাহলে তো ওদের জানাতে হয়।

কাদের?

সরকারকে, সেনাবাহিনীকে।

ওরা সব জানে। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি পড়াশুনো কর।

অভি কিছুক্ষণ চুপ করে কি একটা ভাবল। তারপর বলল, কিন্তু বাবা, এরা যে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাতে চলেছে। আমি এই ওয়েবসাইটে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তারকনাথ। ছেলেকে তিনি কিভাবে থামাবেন? বললেন, কী সাংঘাতিক ঘটনা শুনি।

অভি এবার যা বলল, তা শুনে বাস্তবিকই রোম খাড়া হয়ে উঠল তারকনাথের।

একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনার কথা জেনে গেছে অভি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জঙ্গী দস্যুরা বানাচ্ছে একটি কমন পাসওয়ার্ড। যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ভারতের যাবতীয় পারমাণবিক অস্ত্র।

অভি বলল, এটাকে বলে মাস্টার-পাসওয়ার্ড। অনেকটা মাস্টার-কি-র মতন। মাস্টার-কি দিয়ে যেমন সব ধরনের তালা খোলা যায়, ঠিক সেরকমই এই মাস্টার-পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ঢুকে পড়া যাবে সুপার কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারে।

এসব কী বলছে অভি? মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত টের পেলেন তারকনাথ। কথা বলার সময় তাঁর গলা কেঁপে গেল।

তারকনাথ বললেন, তোর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে......

অভি জোর দিয়ে বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি। তুমি তো জানো এসব ব্যাপারে আমি ভুল করি না। ওরা এই মাস্টার-পাসওয়ার্ড বানানোর কাজে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ওরা যদি এই কাজে সফল হয়, তাহলে কি হবে ভাবতে পারছো?

ভাবতে পারছেন তারকনাথ। এই শীতের রাতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যাচ্ছে।

অভি বলল, পৃথিবী ধ্বংস করার

পাসওয়ার্ড ওরা তৈরি করছে। যেমন করে হোক ওদের থামাতেই হবে।

তারকনাথ অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগলেন ছোট্ট ঘরটায়। তিনি কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব জঙ্গী দস্যুরা নির্মম, নৃশংস হয়। ওরা যদি কোনও ভাবে জেনে যায় ছোট্ট অভি ওদের গোপন খবর জেনে গেছে, তাহলে কি ওরা ছাড়বে? অভি বিশ্বের যে প্রান্তেই যাক না কেন, ওরা ঠিকই খুঁজে বের করবে। এই অবস্থায় কি করবেন তারকনাথ? কাকে জানাবেন? সরকারের উচ্চপদস্থ মহলে বা জঙ্গিদমন বিভাগের কাউকে তিনি চেনেন না। কারুর সঙ্গে পরামর্শ করলে ভাল হতো। তেমন বন্ধুই বা কে আছে? এতদিন শুধু নিজের চাকরির বাইরে ছেলেকে কম্পিউটার শেখাতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ছেলের রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁকে বুঁদ করে রেখেছিল। এমন অদ্ভুত বিপদের সম্ভাবনা তো কখনও মাথায় ছিল না।

॥ ১ ॥

জায়গাটা বৈদ্যবাটি আর ভদ্রেশ্বরের মাঝামাঝি। কলকাতা থেকে খুব দূরে নয়, অথচ এত গাছপালা যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এত গাছপালা বলেই কি জায়গার নাম সবুজপুর?

প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই শমির মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। অবশেষে জিজ্ঞেস করে ফেলল বিক্রমদাকে।

রাস্তার দিকে চোখ, জিপের স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বিক্রমদা বললেন, তাহলে তো পুরো দিল্লি রোডটার আশেপাশে যত জায়গা আছে, তার সবটাকেই এই নামে ডাকতে হয়।

পাশ থেকে রাকেশদা বললেন, কেন, গাছপালা কি কিছু কম পড়েছে কোথাও?

শমি আর বিক্রমদার মধ্যে কি কথা হচ্ছে, তা না শুনেই আচমকা কথাটা বলেছেন রাকেশদা। তাই হেসে উঠল সবাই। আসলে অনেকক্ষণ ধরেই সবাই চুপ করে ছিল। দ্বিতীয় সেতু হয়ে কোনা এক্সপ্রেস ধরে যে রাস্তাটা এসে ন্যাশনাল হাইওয়েতে মিশেছে, তার ডানদিক বরাবর বেশ খানিকটা এগিয়ে এলে পড়ে বালি। সেখান থেকে দিল্লি রোড ধরে নিয়েছে শমিরা।

মাঝেমধ্যে দোকানপাট, বাজার, বাড়িঘর পড়লেও পুরো রাস্তাটার দু'ধারে গাছপালার সত্যিই কোনও অভাব নেই। সবুজ ধানক্ষেত, গ্রামের বাড়ি, আটচালা, মন্দির। বৈদ্যবাটি ঢোকার একটু আগে একটা বড় খাল পেরিয়েছে শমিরা। ব্রিজের ওপর থেকে নিচে দেখা গেল তারকেশ্বরের দিকে লোকাল ট্রেন যাচ্ছে। গাছপালা, ঘরবাড়ির মধ্যে যতক্ষণ না ট্রেনটা মিলিয়ে যায়, ততক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শমি।

সবুজপুরের মধ্যে অবশ্য একটা অন্য বিশেষত্ব আছে। চারদিকে ছড়ানো আমবাগান। ডালপালা ছড়ানো এইসব প্রাচীন মহীরুহ দেখলে সম্ভ্রম জন্মায়। শমির কেন যেন মনে হয়, এইসব বিরাট আকারের মহাবৃক্ষরা পৃথিবীর অনেক রহস্য জানে।

কিন্তু যে রহস্য সমাধানে এখানে এসেছে শমিরা, তা কি জানে এরা?

এরকমই একটি মস্তবড় আমবাগানের ভেতর থাকতেন বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ মজুমদার। একাই থাকতেন। বৃদ্ধবয়সে নির্জনে কাটাবেন বলে এখানে একটি আমবাগান সমেত বাড়ি কিনে ফেলেছিলেন তিনি। একটি কাজের লোক তাঁর সঙ্গী ছিল সারাদিনের। সে অবশ্য সকালে আসত, সন্ধ্যেবেলায় চলে যেত।

একদিন সকালবেলায় কাজ করতে এসে সে আবিষ্কার করে শিবপ্রসাদের মৃতদেহ। একটি চেয়ারে বেঁধে কে বা কারা অত্যাচার চালিয়েছিল শিবপ্রসাদের ওপর। তার ফলেই মৃত্যু ঘটে তাঁর।

বৃদ্ধ শিবপ্রসাদকে হয়তো ধনী বলা যাবে না। কিন্তু তিনি সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন ছিলেন নিঃসন্দেহে। যদিও টাকাপয়সার জন্য যে তাঁকে খুন করা হয়নি, সে ব্যাপারে মোটামুটি পুলিশ এখন নিঃসন্দেহ। কারণ খুন হওয়ার সময় শিবপ্রসাদের বাড়িতে তিন হাজার টাকা ছিল, যা ছুঁয়েও দেখেনি অপরাধীরা। তাহলে কি কোনও গোপন ধনরত্নের সন্ধান জানতেন শিবপ্রসাদ? যা জানার জন্যই খুনী অত্যাচার চালিয়েছিল তাঁর ওপর!

এখানেও একটা খটকা আছে। খুনী কি একজনই? নাকি তার সঙ্গীসাথী ছিল?

স্থানীয় থানায় খবর দিয়েছিলেন প্রতিবেশী রামদয়াল আগরওয়াল। এই মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও এখানে বেশ কয়েকটা আমবাগান কিনে রেখেছেন। শনি-রবিবার করে মাঝেমধ্যে তিনি এখানে এসে থাকেন।

দিনটা ছিল রবিবার। শিবপ্রসাদের কাজের লোক হরি এসে প্রথমে সামনের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। খুলছে না দেখে হরি ভাবে শিবপ্রসাদ হয়তো পেছনের বাগানে কাজ করছেন। হরি পেছনে গিয়েও দেখে শিবপ্রসাদ নেই। পেছনের দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। ঠেলতেই খুলে যায়। হরি ভেতরে গিয়ে আবিষ্কার করে মৃত শিবপ্রসাদকে।

সেদিন রবিবার বলেই হয়তো রামদয়াল বাড়িতে ছিলেন। তিনিই পুলিশে খবর দেন।

স্থানীয় পুলিশ নিয়মমাফিক গ্রেপ্তার করেছিল হরিকে। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক সন্দেহ গিয়ে পড়ে কাজের লোকের ওপরেই। কিন্তু হরিকে জেরা করে এক ইঞ্চিও এগোতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের সঙ্গে কিরকম যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক বেরিয়ে যায় স্বয়ং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের। বৈদ্যবাটি পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে শিবপ্রসাদের খাটের তলা থেকে একটি চিঠি উদ্ধার করে। চিঠিটি লেখা হচ্ছিল পুলিশ কমিশনার তপন ভট্টাচার্যকে।

চিঠিটি ছিল অসমাপ্ত। বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ শুধু লিখেছিলেন, স্নেহের তপন, বড় বিপদে পড়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি...। এটুকু লেখার পরেই সাদা পাতায় কালো কালির লম্বা আঁচড়। সম্ভবত, সেই রাতেই শিবপ্রসাদ চিঠিটা যখন লিখতে শুরু করেছেন, তখনই তাঁর ওপর আক্রমণ হয়।

জেলার পুলিশ তদন্তে আটকে গেছে বলেই স্বয়ং পুলিশ কমিশনার দায়িত্ব দিয়েছেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের প্রধান রাকেশ চৌধুরীকে। আর দায়িত্ব পাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই রাকেশদা হাজির হয়েছিলেন বন্ধু বিক্রমদার কাছে। যে কোনও বড় তদন্তে আটকে গেলেই রাকেশদা ছুটে আসেন বিক্রমদার কাছে।

গেট পেরিয়ে আমবাগানের ভেতর দিয়ে কিছুটা হাঁটতে হয়। বাহুল্যহীন একতলা বাড়ি শিবপ্রসাদের। পেছনে ছোট্ট ফুলের বাগান। করেছিলেন তিনি নিজেই। অনেকটা সময় তিনি নাকি বাগানেই কাটাতেন।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বৈদ্যবাটি থানার ওসি তাপস ধর। পাশের মোটাসোটা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই রামদয়াল আগরওয়াল। শমি তেমনই আন্দাজ করে নিল।

রাকেশদার সঙ্গে তাপস ধরের আগেই পরিচয় হয়েছিল। রাকেশদা পরিচয় করিয়ে দিলেন বাকিদের সঙ্গে।

তাপস ধরের বয়স কম। লম্বা, সুন্দর চেহারা। শমিকে বললেন, তোমরা আসবে শুনে আমি সকাল সকাল চলে এসেছি। তোমার দাদার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল বহুদিনের। ভালই হলো...

রাকেশদা জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে ঘরের জিনিসপত্রে কেউ হাত-টাত দেয়নি তো?

তাপস ব্যস্ত হয়ে বললেন, না স্যার। আমি বাইরে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি যাওয়ার পর থেকেই তালা লাগানো রয়েছে।

রাকেশদা হাসলেন, ভালই করেছেন।

পাশ থেকে রামদয়াল আগরওয়াল ভাঙা বাংলায় বললেন, পাহারা বোসাতে হামিও একটু সাহস পেলাম। নইলে মার্ডার হওয়ার পর থেকে এখানে থাকতে হামারও ডর লাগে। ক্রিমিনালরা যে ফির আসবে না তার কি গেরান্টি আছে, কি বলেন মিঃ ধর?

তাপস ধর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল না তিনি হ্যাঁ বললেন, নাকি না বললেন।

সামনের দরজার তালা খোলা হলো। সেই অভিশপ্ত রাতের পর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি ঘরের ভেতর। লেখার টেবিলের সামনে সেই চেয়ারটাও রয়েছে অবিকল একইরকম। এই চেয়ারেই বেঁধে রাখা হয়েছিল বৃদ্ধ শিবপ্রসাদকে।

চেয়ারের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বিক্রমদা। রাকেশদাকে বললেন, খেয়াল করে দেখ চেয়ারে বসলে ঘরের দরজা কিন্তু একেবারে পেছনে থাকে না।

রাকেশদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। বললেন, পাশ থেকে দরজা দেখা যায়।

তার মানে..., বিক্রমদা আঙুল মটকালেন, যেন কিছু একটা জিনিস পছন্দ হচ্ছে না এই ভঙ্গিতে বললেন, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, শিবপ্রসাদকে কেউ অতর্কিতে পেছন থেকে এসে বেঁধে ফেলেনি।

রাকেশদা বললেন, তাছাড়া আচমকা কেউ ঢুকলে তো তাকে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে।

দরজা ভাঙার কোনও চিহ্ন ছিল না নিশ্চয়ই?

উঁহু।

শমি খেয়াল করেনি, কখন ওদের পেছন পেছন রামদয়াল আগরওয়াল ভেতরে ঢুকে এসেছেন। রামদয়াল আগ বাড়িয়ে বললেন, হামার কি মনে আসছে জানেন? ওই নোকরটাকে...

কঠোর দৃষ্টিতে রামদয়ালকে দেখলেন বিক্রমদা। কঠিন গলায় বললেন, আপনার যা মনে আসছে তা আপনার নিজের মনেই রাখুন মিঃ আগরওয়াল। আপনার তো এখানে ঢোকার কথা নয়। যান, বাইরে ওয়েট করুন। আপনার সঙ্গে আমরা পরে কথা বলব।

রামদয়ালের মুখটা ধীরে ধীরে বদলাতে দেখল শমি। হাসি হাসি ভাব মুছে গিয়ে ফুটে উঠল নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রামদয়াল, হামাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

কাঁধ ঝাঁকালেন বিক্রমদা, যদি আপনি তেমন ভাবেন আমার কিছু করার নেই। প্লিজ গো আউটসাইড।

ওকে। মাথা নেড়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন রামদয়াল।

কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বিক্রমদা বললেন, বুঝলি রাকেশ, এখান থেকে মনে হচ্ছে...কোনও চেনা লোকই দরজা ঠেলে ঢুকেছিল। যাকে দেখে শিবপ্রসাদ বিশেষ অবাক হননি।

মেঝেতে এখনও রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেই দাগ পরীক্ষা করতে লাগলেন বিক্রমদা।

মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিটা ঠিক কোথায় পড়েছিল?

রাকেশদা বললেন, এই তো খাটের তলায়।

খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন বিক্রমদা। যখন বেরোলেন, চুলে, কপালে ঝুল লেগে আছে।

শমি জানে এইসব তদন্তে খুঁটিনাটি তথ্য এত কাজে লাগে যা আগে থাকতে কল্পনা করা যায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বিক্রমদা চলে এলেন পেছনের বাগানে। ডালিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার পাশে থোকা থোকা হলুদ গাঁদাও রয়েছে। বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ বাগান করতে সত্যিই বেশ ভালবাসতেন দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি ফুলগাছের সামনেই একবার করে দাঁড়াচ্ছেন বিক্রমদা। শমি জানে, দাঁড়িয়ে থাকার ফাঁকেই চারদিক খুঁটিয়ে দেখা হয়ে যাচ্ছে বিক্রমদার। ডালিয়ার গোড়া থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিলেন বিক্রমদা। এগিয়ে এলেন রাকেশদার দিকে। শমি দেখল একটা রেলের টিকিট। এখন যেমন কম্পিউটারে টিকিট পাওয়া যায়।

টিকিটটা হাতে নিয়ে চমকে গেলেন রাকেশদা, মানে কী, এ তো গতকালের ডেট!

বিক্রমদা হাসলেন, যদি না রেলের কম্পিউটার ভুল করে থাকে! অবশ্যই এটা গতকালের টিকিট।

তার মানে আগের দিন কেউ এসেছিল এ বাড়িতে!

তেমনই মানে দাঁড়াচ্ছে। বিক্রমদা বলে চললেন, শুধু আসেইনি, সে এসে রীতিমতো বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কারণ, ডালিয়ার গোড়ায় মাটি যে কেউ কুপিয়েছে তার চিহ্ন এখনও একেবারে টাটকা।

মাই গুডনেস! রাকেশদা হতভম্ব গলায় ডাকলেন ওসিকে, তাপসবাবু।

হ্যাঁ, স্যার।

আপনার লোক তাহলে কি পাহারা দিচ্ছে! ঠিক করে নজর রাখতে বলুন। এটা কিন্তু সামান্য খুনের কেস নয়। স্বয়ং সি পি যখন আগ্রহ দেখিয়েছেন, বুঝতে পারছেন তো!

তাপস ধর মাথা নাড়লেন, জানি স্যার। এরকম নিরীহ, শান্ত মানুষকে যখন কেউ টর্চার করে মারে, তখন তো বোঝাই যায় যে বড়সড় কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে এর পেছনে।

বিক্রমদা বললেন, আশার কথা ওদের সেই উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ হয়নি। মনে হচ্ছে কিছু একটা জানার জন্যই অত্যাচার চলেছিল বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের ওপর।

রাকেশদা বললেন, সেটা বোধহয় জানতে পারেনি অপরাধীরা?

নাঃ। সেজন্যই ওদের এখানে আসতে হচ্ছে। আর খোঁড়াখুঁড়ি করছে যখন...বিক্রমদা কিছু যেন ভাবলেন। বললেন, এমনও হতে পারে, বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ এই বাগানে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন বলে ওদের ধারণা।

ধনরত্ন? শমি না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারল না।

সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। শমির পিঠে হাত রেখে বললেন বিক্রমদা, সেটাই আমাদের জানতে হবে। কী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন শিবপ্রসাদ? ওরাই বা কেন তা জানতে চাইছে? সেই বস্তুটি কি এতটাই দামী আর গোপনীয় যে তার জন্য প্রাণ হারাতে হলো একজন নিরীহ বৃদ্ধকে?

হাঁটতে হাঁটতে সবাই চলে এসেছে

আমবাগানে। ছায়াঘেরা জায়গাটার কোথায়ও কোনও শব্দ নেই। দূর থেকে একটানা ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে। খুব বিষণ্ণ আর নিঃসঙ্গ সেই ডাক।

শমি বলল, বৃদ্ধর ছেলে-মেয়ে কেউ ছিল না?

বিক্রমদা বললেন, ওখানেই তো আরও বড় খটকা। বৃদ্ধর একটাই ছেলে। কিন্তু সে উধাও হয়ে গেছে।

খুনের আগে না পরে?

সেটাও আমাদের ঠিকঠাক জানতে হবে। আগে না পরে? কারণ এই জানাটার ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছে।

॥ ২ ॥

শিবপ্রসাদের ছেলের নাম তারকনাথ মজুমদার। পেশায় তিনি সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার। কাজ করেন কম্পু ইনফোটেক বলে একটি সংস্থায়। তারকনাথের একটাই ছেলে। নাম অভিষেক মজুমদার। এই হচ্ছে অভিষেকের ছবি—রাকেশদা একটা পেপার কাটিং এগিয়ে দিলেন।

এক ঝলক ছবিটা দেখেই ফেরত দিলেন বিক্রমদা। বললেন, অভিষেকের সম্পর্কে তো আগেও অনেকবার লেখালেখি হয়েছে। কি যেন নামও আছে ওর একটা? শমির দিকে তাকালেন বিক্রমদা।

শমি বলল, কম্পিউটার কিড।

এগজ্যাক্টলি। হি ইজ এ ভেরি ফেমাস বয়। এত কম বয়সে কম্পিউটারে পারদর্শী হয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। প্রতিভাবান ছেলে।

শমি বলল, ওকে নাকি আমেরিকায় পড়াতে পাঠানো হবে। সেরকমই পড়েছিলাম কোথায়। মাইক্রোসফ্‌টের বিল গেটস নাকি স্বয়ং ওর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

রাকেশদা বললেন, বাবা-ছেলে আমেরিকায় চলে গেল না তো?

সে তো ভিসা অফিসে গেলেই জানা যাবে। বিক্রমদা বললেন, তাছাড়া কেউ বিদেশে পড়ার সুযোগ পেলে এভাবে লুকিয়ে যাবে কেন? পাড়ার লোক না জানুক, পাশের বাড়ির লোকটা তো জানবে।

পাশের বাড়ির লোক হচ্ছে সুবীর মিত্র। আমরা এসে গেছি। আশা করা যায় সুবীরবাবু বাড়িতেই থাকবেন।

বিডন স্ট্রিটের মুখে যেখানে রাকেশদা জিপ থামালেন, সেখান থেকে শুরু হয়েছে

শমি দেখল একটা রেলের টিকিট।

সরু গলি। এতটাই সরু সেই গলি যে গাড়ি ঢুকবে না। এমনকি হেঁটে পাশাপাশি দু'জনে যাওয়াও কঠিন!

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাকেশদা শমিকে বললেন, উত্তর কলকাতায় এমন গলিও আছে, যেখানে একজন ঢুকে পড়লে উল্টোদিকের লোককে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়!

গলি তস্য গলি! হাঁটতে হাঁটতে শমি ভাবছিল, বাপরে বাপ, ভদ্রলোক থাকেনও বটে এমন জায়গায় যে খুঁজে পেতে দম বেরিয়ে যাবে।

গলির এক এক জায়গায় দুটো বাড়ির ব্যালকনি এত কাছাকাছি যে অনায়াসে হাত বাড়িয়ে কিছু দেওয়া যায়। চেষ্টা করলে হয়তো টপকে চলেও যাওয়া যেতে পারে উল্টোদিকের ব্যালকনিতে।

বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ থাকতেন একটি নির্জন আমবাগানের ভেতর। একেবারে একা। আর তাঁর ছেলে তারকনাথ থাকেন দমবন্ধ করা ভিড়ের মধ্যে, বিডন স্ট্রিটের গা ঘেঁষাঘেঁষি করা পুরনো বাড়িতে। সম্পূর্ণ উল্টো পরিবেশ। শুধু মিল একটা জায়গাতেই। অদ্ভুত রহস্যে জড়িয়ে পড়েছেন পিতা-পুত্র। বৃদ্ধ শিবপ্রসাদকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ছেলে তারকনাথ উধাও। কোথায় গেছে, কেউ জানে না!

শিবপ্রসাদ আর তারকনাথের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল কিনা তাও এখন বোঝার উপায় নেই। তারকনাথ কোথায় গেছেন, তা হয়তো বলতে পারতেন শিবপ্রসাদ। তিনি এখন পৃথিবীতেই নেই। আর তারকনাথ উধাও না হয়ে গেলে হয়তো জানা যেত শিবপ্রসাদকে কেন ওভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো। কিছু একটা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ। সেই লুকনো জিনিসটির সন্ধান পাওয়ার জন্যই কি আততায়ীরা অত্যাচার চালিয়েছিল তাঁর ওপর?

তারকনাথ তাঁর ছেলে অভিষেককে নিয়ে থাকতেন দোতলার একটি ফ্ল্যাটে। শমিরা ওপরে উঠে এল। দরজায় তালা। তালার ওপর কড়ায় মাকড়সা জাল বুনেছে। অর্থাৎ বেশ কিছুদিন হলো ভদ্রলোক বাড়িতে নেই।

উল্টোদিকে একচিলতে বারান্দা পেরিয়ে ফ্ল্যাট সুবীর মিত্রর। দরজার ওপর নেমপ্লেটে লেখা সুবীর মিত্র, কনসালট্যান্ট।

বেল বাজানোর আগে বিক্রমদা রাকেশদাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক?

কাঁধ ঝাঁকালেন রাকেশদা, নো আইডিয়া। এই শব্দটার অনেক রকম মানে হয়।

সুবীর মিত্রকে অনায়াসেই লালবাজারে

ডেকে পাঠাতে পারতেন রাকেশদা। কিন্তু বিক্রমদা নিজেই এখানে আসতে চেয়েছেন। সুবীর মিত্রর কাছ থেকে কিছু জানতে পারার থেকেও বড় কথা হলো তারকনাথ এবং তাঁর ছেলে অভিষেক কোথায় থাকে, সেই জায়গাটাকে ভালো করে দেখে নেওয়া।

ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন শমিদের জন্য। বেল বাজাতে নিজেই দরজা খুলে দিলেন। সহাস্যে স্বাগত জানালেন, আসুন, আসুন।

সুবীর মিত্রর চেহারাটা লম্বা। রোগা, রোগা। কণ্ঠার হাড় উঁচু। চোখ দুটো কোটরের ভেতর। টেনিদা টাইপের লম্বা নাক। কথাবার্তার মধ্যে ব্যস্ততার ছাপ। হয়তো ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক সামান্য টেনশনে ভোগেন।

শমি খেয়াল করল, কোনো কথা শোনার সময় ভদ্রলোকের ঘাড় একদিকে কাত হয়ে যায়। যেন খুব মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছেন তিনি।

কোনওরকম ভণিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় ঢুকে পড়লেন বিক্রমদা। বললেন, আপনার উল্টোদিকের প্রতিবেশী তারকনাথ মজুমদার সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর করতে এসেছি, আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুবই ব্যস্ত ভঙ্গিতে সুবীর মিত্র বললেন, কোনও খোঁজ পেলেন ওর?

সুবীর মিত্রর ব্যস্ততা দেখেই সম্ভবত সামান্য থমকে গেলেন বিক্রমদা। বললেন, না, এখনও কোনও খোঁজ পাইনি। সেজন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ওঁকে কতদিন ধরে চেনেন?

তা ধরুন বছর পনেরো-ষোলো তো হবেই। ওর ছেলে অভি আর আমার ছেলে সমু একই বয়সী।

এই ক'দিনের ভেতর ভদ্রলোকের আচার-আচরণে এমন কিছু কি কখনও খেয়াল করেছেন, যা দেখে আপনার মনে সন্দেহ জন্ম নিয়েছে?

এনি ফাউল প্লে?

এগজ্যাক্টলি।

নো স্যার। তারক ছিল একেবারে নিপাট ভালোমানুষ। বলেই জিভ কাটলেন সুবীর মিত্র। বললেন, ছিল বলছি কেন? ভেরি সরি, তারক তো আর পাস্ট টেন্স হয়ে যায়নি। তারক হচ্ছে নিপাট ভালোমানুষ। কারুর সাতেপাঁচে থাকে না। অফিস আর বাড়ি। বাড়ি আর অফিস। ওই হচ্ছে ওর দৌড়। তারপর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তো আরও গুটিয়ে গেল। তবে ছেলেটা একেবারে জিনিয়াস। এই বয়সে এমন প্রতিভা সত্যিই আনবিলিভেবল।

রাকেশদা বললেন, ছেলেকে বাইরে পড়তে পাঠানোর যে কথাবার্তা চলছিল তা শেষ পর্যন্ত—

রাকেশদার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুবীর মিত্র বলে উঠলেন, দ্যাট ওয়াজ মাই সাজেশন। আমিই তারককে বলেছিলাম, এই প্রতিভা তুমি পোড়াদেশে ফেলে রেখে কি করবে? সেন্ড হিম টু আমেরিকা। ওই একটা দেশ মশাই। কি না করছে ওরা বলুন!

সুবীর মিত্রকে বাধা দিলেন বিক্রমদা। বললেন, তারকনাথের বাবা শিবপ্রসাদকে চিনতেন?

না স্যার। বলেই সুবীর মিত্র কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললেন, না বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। মানে তারকের কাছে শুনেছি উনি নাকি থাকতেন বৈদ্যবাটির কাছেই কোথাও একটা।

উনি আর বেঁচে নেই।

অ্যাঁ, সেকি! সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুবীর মিত্র। আবার বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখলেন। তারপর বললেন, ইস! কিভাবে মারা গেলেন ভদ্রলোক? বেচারা তারক তো জানতেই পারল না।

আনন্যাচারাল ডেথ! বিক্রমদা থেমে একটু সময় নিলেন। যেন দেখলেন সুবীর মিত্র কিছু বলেন কিনা! তারপর বললেন, আমাদের সন্দেহ বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের মৃত্যু এবং তারকনাথের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও যোগাযোগ রয়েছে।

চুপ করে রইলেন সুবীর মিত্র। বিক্রমদা বলে চললেন, আপনার কাছে আসার একটাই কারণ। গত এক মাসের ভেতর এমন কোনও ঘটনা কি ঘটেছে, যা দেখে আপনার মনে হয়েছে যে তারকনাথ কোনও সমস্যার মধ্যে রয়েছেন ; অথবা তারকনাথ আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন?

সুবীর মিত্র চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। যেন কিছু ভাবছেন। সময় নিয়ে বললেন, তেমন কিছু জানি না। তবে মাসখানেক আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

আবার কিছুক্ষণ থেমে রইলেন সুবীর মিত্র। মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ছেলে সমুকে কেউ কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল।

সেকি!

হ্যাঁ। স্কুল থেকে ফেরার সময় বড় রাস্তার মোড় থেকেই ওকে গাড়িতে তুলে নেয়। তুলেই নাকে ক্লোরোফর্ম। ব্যস্, সমুর কিছুই মনে নেই। কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, কারা ছিল—পুরোটাই ব্ল্যাঙ্ক। সন্ধ্যেবেলা থেকে খোঁজ খোঁজ, তারপর যখন থানা-পুলিশ করে রাতে বাড়িতে ফিরেছি তখন ফোন এল।

কী বলল?

আমি তো ভেবেছিলাম টাকা চাইবে। চায়নি। হিন্দিতে বলল, আপনার ছেলে ভালো আছে। কাল ফিরে যাবে বাড়িতে। বলে ফোন রেখে দিল।

পরদিন ছেলে ফিরে এল?

একেবারে ভোরবেলায়। হেদুয়ায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

আপনার ছেলের কিছুই মনে নেই?

নাথিং। আপনি কথা বলে দেখতে পারেন।

না, থাক। রাকেশদার দিকে ঘুরলেন বিক্রমদা। বললেন, সাউন্ডস ইন্ট্রেস্টিং। ফের সুবীর মিত্রর দিকে ঘুরলেন, তারকনাথের চলে যাওয়ার দিনটা কি মনে আছে?

মাথা নাড়লেন সুবীর মিত্র। না, মনে নেই। তবে যাওয়ার দিন ও আমাকে কিছু বলে যায়নি। জানি না কেন।

স্ট্রেঞ্জ। ভেরি স্ট্রেঞ্জ। মাথা নাড়ছেন বিক্রমদা। শমি খেয়াল করল বিক্রমদার কিছু একটা ব্যাপার পছন্দ হচ্ছে না। কপালে ফুটে উঠেছে বিখ্যাত তিনটে ভাঁজ।

সেটা কী? তারকনাথের কিছু বলে না যাওয়া, নাকি সুবীর মিত্রর মনে না পড়া? গোটা ঘটনাটার আগাগোড়া কিছু বুঝতে পারছে না শমি নিজেও। কম্পিউটার কিড অভিষেককে নিয়ে তারকনাথের উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের খুন হওয়ার নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলানো সত্যিই কঠিন কাজ। সব থেকে বড় কথা এই দুটো ঘটনার ভেতর কোনও যোগসূত্র যতক্ষণ না আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তদন্তে এগোতেও পারবেন না বিক্রমদা।

এ ব্যাপারে কি কোনও সাহায্যে আসবে সুবীর মিত্রর ছেলে সমুকে কিডন্যাপ করার ঘটনাটা? আদৌ কি এর সঙ্গে আগের ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে? নাকি এটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন

কোনও ঘটনা!

বিক্রমদা যতক্ষণ না এ ব্যাপারে মুখ খুলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত জানাও যাবে না কিছু। শমি ঠিক করল ফেরার পথে বিক্রমদাকে জিজ্ঞেস করবে।

॥ ৩ ॥

বিডন স্ট্রিটের মুখে দাঁড় করানো ছিল রাকেশদার জিপ। রাকেশদা লালবাজারে ফিরে যাবেন। বিক্রমদাকে বললেন রাকেশদা, চল তোদের নামিয়ে দিয়ে যাব।

বিক্রমদা বললেন, না, এখন আমি বাড়ি ফিরছি না। তারকনাথের অফিসটা একবার ঘুরে আসব ভাবছি।

ওর অফিসটা যেন কোথায়?

সল্টলেকে। বারো নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে। আমরা যে যাচ্ছি সেটা জানিয়ে তুই বরং একটা ফোন করে দিস।

রাকেশদা বললেন, আমিও যেতাম। কিন্তু বারোটা নাগাদ সি. পি-র সঙ্গে একটা মিটিং আছে।

নো প্রবলেম। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি।

তোর বাইকটা না থাকায় বেশ অসুবিধে হচ্ছে।

আর হবে না। কাল পেয়ে যাব। আসলে গ্যারেজে ইঞ্জিন ডাউন করলে একটু সময় লাগে।

রাকেশদা পুলিশের পোশাকে থাকায় ট্যাক্সি পেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। অন্যসময় হয়তো এই ট্যাক্সিচালকই বলত, গাড়ি খারাপ। বা কিছু না বলেই সোজা গাড়ি চালিয়ে দিত।

ট্যাক্সি চালাচ্ছে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শিখ। আগে কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালাতে বেশি দেখা যেত এদেরই। এখন আর দেখা যায় না বললেই চলে।

বিক্রমদার সঙ্গে শেষ কবে ট্যাক্সিতে চড়েছে, মনে করতে পারে না শমি। ওরা সবসময় যাতায়াত করে বিক্রমদার কাওয়াসাকি বাইকে। বাইকটা গ্যারেজে রয়েছে প্রায় দিন পাঁচেক হলো। যে কারণে বৈদ্যবাটিতে বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের বাড়িতেও যেতে হয়েছিল রাকেশদার জিপে।

প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মাথায় ঘুরছিল, ট্যাক্সিতে উঠেই করে ফেলল শমি, শিবপ্রসাদের খুন হওয়ার সঙ্গে কি তারকনাথের পালিয়ে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে?

বাইরে তাকিয়েছিলেন বিক্রমদা। মুখ ফিরিয়ে বললেন, তারকনাথ যে পালিয়ে গেছে, তা তুই জানলি কি করে? কেউ তো ওকে ধরে নিয়েও যেতে পারে!

কিডন্যাপ?

ওইরকমই হলো।

একই জায়গায় পরপর দু'বার! শমি বেশ অবাক হলো। ওর মাথায় রয়েছে সুবীর মিত্রর ছেলের ঘটনাটা।

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, এটাই তো সবচেয়ে বড় খটকা রে! একই বাড়িতে পরপর দু'বার যদি হামলা হয়, তাহলে সত্যিই চিন্তার ব্যাপার।

শমি বলল, তাও তো সুবীর মিত্রর ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ফেরত দিয়েছে।

হুঁ, হুঁ..., মাথা নাড়লেন বিক্রমদা। শিস দিয়ে একটা গানের সুর ভাঁজলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, এখানে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সুবীর মিত্র মিথ্যা কথা বলছে। এইসব কিডন্যাপ-টিডন্যাপ কিছুই হয়নি। সম্ভাবনা দুই, সত্যিই কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওর ছেলেকে। পরে সত্যিই ফেরত দিয়ে যায়।

বিক্রমদা বলে চললেন, প্রথম সম্ভাবনাটা সত্যি হলে সুবীর মিত্র থাকে সন্দেহ-ভাজনদের তালিকায় একেবারে এক নম্বরে। বাট ইটস টু আর্লি টু সাসপেক্ট হিম। কারণ সন্দেহ করার মতো তো কিছু ঘটেনি। ধরা যাক, দুই নম্বর সম্ভাবনাটাই সত্যি। অর্থাৎ ওর ছেলেকে সত্যিই কেউ কিডন্যাপ করেছিল। তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, ফেরত দিয়ে গেল কেন?

শমি বলল, হয়তো ভুল করে...

মাঝপথে শমিকে থামিয়ে দিয়ে বিক্রমদা খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন, কারেক্ট। এক যদি না কেউ ওকে ভুল করে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাছাড়া আর কোনো কারণ নেই এভাবে ফেরত দেওয়ার। এবার প্রশ্ন হলো, কার বদলে ভুলটা করেছিল ওরা?

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল শমির মাথায়। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, অভিষেক!

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, সেটা আমিও ভেবেছি রে। অভিষেক আর সমু একই বয়সী। পাশাপাশি থাকে। যারা কিডন্যাপ করছে, তারা ভুল খবর পেয়ে এই ভুলটা করতেই পারে। কিন্তু কেনই বা হঠাৎ অভিষেককে কিডন্যাপ করবে? শিবপ্রসাদ কি এ ব্যাপারে কিছু জানতেন? সেজন্যই কি তাঁকে খুন হতে হলো!

উল্টোডাঙা পেরিয়ে ট্যাক্সি ঢুকে পড়েছে সল্টলেকের রাস্তায়। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, থোড়া পহেলেসে বোলিয়ে সাব।

বিক্রমদা বললেন, ঠিক আছে, আপনি সোজা চলুন। আগে বলে দেব।

শমি বলল, এই দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও তো এখন আর তা জানার উপায় নেই।

বিক্রমদা বললেন, ওখানেই তো ঝামেলাটা আরও বেধেছে। যারা জানত, তাদের মধ্যে একজন খুন হয়েছে, বাকি দু'জন উধাও।

হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন বিক্রমদা। বললেন, দেখা যাক তারকনাথের অফিসের লোকজন..., বিক্রমদার কথা শেষ হলো না, তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষলো শিখ ড্রাইভার। ট্যাক্সিটাকে সজোরে ওভারটেক করে সামান্য দূরেই রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে থেমেছে একটা টাটা সুমো। কালো রঙের গাড়িটা থেকে দুপুরের রোদ ঠিকরে পড়ছে। সল্টলেকের এপাশটা এমনিতেই নির্জন। তার ওপর আবার দুপুরবেলায় গাড়ির সংখ্যা আরও কমে গেছে।

সুমোটা এমনভাবে আড়াআড়ি থেমে আছে যে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, ছিনতাই পার্টি লাগতা হ্যায়।

বলেই ব্যাকগিয়ারে ট্যাক্সিটা পেছনে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল ভদ্রলোক। কিন্তু ওদিকে সুমোর দরজা খুলে গেছে। দু'দিক থেকে নেমে যারা দৌড়ে আসছে, তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে তারা লোক সুবিধের নয়।

প্রথমেই যে লোকটা ছুটে এল, সে প্রায়, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। পরে আছে পাঠান স্যুট। নস্যি রঙের। মাথায় একটা পাগড়ি থাকলে অনায়াসেই একে কাবুলিওয়ালা বলা যেত।

লোকটা এসে জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরল ট্যাক্সি ড্রাইভারের গলা। কর্কশ গলায় কি একটা বলল বোঝা গেল না। কিন্তু তার আগেই পেছনের দরজা খুলে নেমে গেছেন বিক্রমদা।

পরমুহূর্তেই শমি দেখল দশাসই চেহারার আফগান স্যুট পরা আততায়ী মাটিতে ছিটকে পড়েছে। ঠিক পরের লোকটাকে যুযুৎসুর প্যাঁচে মাথার ওপর

ঘুরিয়ে ছিটকে ফেললেন বিক্রমদা। শমি ততক্ষণে বিক্রমদার পেছনটায় চলে এসেছে। একজন রড বের করেছিল, তার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শমি তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

এইসব দেখেশুনে শিখ ড্রাইভার আর বোধহয় থাকতে পারল না। সেও কোমর থেকে কৃপাণ খুলে নিয়ে নেমে এল।

বেগতিক দেখে স্টার্ট দিয়েছে টাটা সুমো। চারজন দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়তেই তা চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল সল্টলেক স্টেডিয়ামের ওপাশে।

বিক্রমদার প্যান্টের নিচের দিকে একটু মাটি লেগেছিল। শিখ ড্রাইভার নিজেই তা ঝেড়ে দিল। মুগ্ধ গলায় হিন্দিতে বলল, আপনি পুলিশে কাজ করেন?

নাঃ পুলিশে না। একসময় আর্মিতে ছিলাম। নিরুত্তাপ গলা বিক্রমদার।

শমির বুক এখনও ধড়াস ধড়াস করছে। হৃৎপিণ্ড এত জোরে লাফাচ্ছে যে ভয় হচ্ছে পাশের লোক শুনতে পাবে।

বিক্রমদা কিন্তু আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। হাজার বিপদের মাঝখানেও বিক্রমদা যে কিভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখেন, তা ভেবে পরে অবাক হয় শমি। এই যে এতবড় একটা হামলা হয়ে গেল ওদের ওপর, তারপরেও বিক্রমদা ঠিকই তারকনাথের অফিস কম্পু ইনফোটেকে যাবেন। শমি জানে গুণ্ডাদের আক্রমণে বিক্রমদার পরিকল্পনা কিছুই বদলাবে না।

ট্যাক্সি ফের চলতে শুরু করলে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন বিক্রমদা। শমিকে বললেন, বারো নম্বর ট্যাঙ্ক খেয়াল রাখিস। এলে আমাকে বলিস।

তারকনাথের অফিসে আগেই ফোন করে রেখেছিলেন রাকেশদা। সিনিয়র ম্যানেজার প্রহ্লাদ চক্রবর্তী খাতির করে শমিদের বসালেন। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে শমিদের জিজ্ঞেস করলেন, চা না কফি?

বিক্রমদা বললেন, কোনোটাই নয়।

তাহলে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খান অন্তত।

শমির খুব একটা যে আপত্তি ছিল, এমন নয়। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা এখনও সজোরে ধুকপুক করছে।

ম্যানেজারমশাই জোর করেই ঠাণ্ডা পানীয় আনালেন। হাসিমুখে বললেন, বলুন ক্যাপ্টেন মুখার্জি, আপনাদের জন্য কী করতে পারি।

বিক্রমদা সংক্ষেপে তারকনাথ মজুমদারের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা বললেন। বলার পর জিজ্ঞেস করলেন, তারকনাথ ঠিক কবে থেকে অফিসে আসছেন না? উনি কি ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন?

উঁহু, যতদূর জানি কোনো লিভ অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েনি। বলা যায় আচমকাই ডুব মেরেছেন। যদিও তারকবাবুর ছুটি পাওনা রয়েছে, তবুও এভাবে না বলে-কয়ে ছুটি নেওয়ায় আমরাও খুব অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেছি।

এরকম কি আগে কখনও ঘটেছে?

না, না, কখনও নয়। সেজন্যই আরও চিন্তা হচ্ছে। টানা তিনদিন না আসার পর বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলাম। কারণ বাড়ির ফোন বেজে যাচ্ছিল।

তারপর?

গিয়ে দেখে বাড়িতে তালা। তখন পাশের বাড়িতে নক করে।

সুবীর মিত্র?

নাম জানি না। তা সেই ভদ্রলোক রীতিমতো খারাপ ব্যবহার করেন আমাদের লোকটির সঙ্গে। বলেন, আমি কি ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি? সব খবর মুখস্থ করে রাখব!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মেজাজি লোক বোধহয়। সে যাই হোক, তারপর অনেক অপেক্ষা করার পর খোঁজখবর নিয়ে তারকবাবুর বাবার কাছে লোক পাঠানো হলো। ওই একই লোক গিয়েছিল।

বিক্রমদা নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, যে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা যাবে?

হোয়াই নট? আবার বেল বাজালেন সিনিয়র ম্যানেজার। বেয়ারা এলে বললেন, প্রশান্ত ভৌমিককে একবার আসতে বলো।

স্যার, উনি তো আসেননি।

ওহো, ভেরি সরি ক্যাপ্টেন মুখার্জি। প্রশান্ত ছুটি নিয়েছে দু'দিনের জন্য। বোধহয় বিয়েবাড়ি না ভাতবাড়ি কি একটা আছে।

ইটস অলরাইট। বিক্রমদা উঠে দাঁড়ালেন, সেক্ষেত্রে প্রশান্তবাবুর বাড়ির ঠিকানা বা ফোন নাম্বার পাওয়া গেলেও চলবে। আমি যোগাযোগ করে নেব।

ও সিওর। একটা কাগজে ঠিকানা আর ফোন নাম্বার নিজে হাতেই লিখে দিলেন ম্যানেজার প্রহ্লাদ চক্রবর্তী। দিয়ে বললেন, এই অফিসে একমাত্র প্রশান্তর সঙ্গেই তারকের একটু ভাব ছিল। প্রশান্ত নিজেই উদ্যোগ নিয়ে গিয়েছিল ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

॥ ৪ ॥

একবার চেষ্টা করতেই প্রশান্ত ভৌমিককে বাড়িতে পাওয়া গেল। শমিরা বাড়িতে এসে চান-খাওয়া সেরেছে। ঘড়িতে তখন আড়াইটে।

প্রশান্ত ভৌমিক বাড়িতেই ছিলেন। তবে ফোন ধরে জানালেন, আমি প্রায় বেরিয়েই পড়েছিলাম। ফোন বাজল বলে আবার ঘরে ঢুকলাম। বাড়ির সকলে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

বিক্রমদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ঠিক ফোন রেখে দিতেও সাহস পাচ্ছেন না। অনুরোধ করলেন, প্লিজ, আপনি যদি আজ রাতের দিকে ফোনটা করেন! অথবা কাল সকালে তো আমি অফিসেই যাচ্ছি।

বিক্রমদা বললেন, বুঝতে পারছি আপনার নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার তাড়া আছে। ওকে, আমি না হয় পরেই যোগাযোগ করে নেব। তবে একটা খবর কি জানেন?

কী?

তারকবাবুর বাবা শিবপ্রসাদ মজুমদার খুন হয়েছেন।

হোয়াট! উল্টোদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রশান্ত ভৌমিক।

হ্যাঁ। সেজন্যই আপনার সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি।

মাই গুডনেস! কী বলছেন আপনি! তারকের কিছু হয়নি তো? চিন্তিত গলায় বললেন প্রশান্ত।

এখনও হয়নি, তবে...

হি ইজ ইন ডেঞ্জার।

আপনি কিছু জানেন?

জানি না। তবে দু'একটা সন্দেহের কথা আপনাকে বলতে চাই।

ঠিক আছে। আমি কালকেই শুনব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

থ্যাঙ্ক ইউ ক্যাপ্টেন মুখার্জি।

পাশের ঘরের এক্সটেনশান থেকে প্রশান্ত ভৌমিক আর বিক্রমদার মধ্যে কথোপকথন শুনছিল শমি। তখন কি জানত সেই শেষবারের মতো শোনা গেল প্রশান্তর গলা?

আর কোনও কেসে, কখনও এভাবে বিক্রমদাকে আপসোস করতেও দেখেনি শমি।

খবরটা পাওয়া গেল সেদিনই মাঝরাতে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ফোন বেজে উঠলে মনের ভেতর অমঙ্গলের আশঙ্কাই জেগে ওঠে প্রথমে। ফোনটা ধরেছিলেন বিক্রমদা। সেটা রেখে দেবার পর যেভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাতেই শমি বুঝে গেল খবর ভালো নয়।

বিছানায় উঠে বসেছিল শমি। বড় আলোটা জ্বালিয়ে বিক্রমদা গিয়ে সোফায় বসলেন। বললেন, প্রশান্তকে ওরা মেরে দিয়েছে।

নিস্তব্ধ রাতে কোথাও কোনও শব্দ নেই। এর মধ্যে বিক্রমদার ভারী গলা যেন কেটে বসে গেল শমির মাথার ভেতর।

প্রথমে বিশ্বাস হতে চাইল না শমির। কেন জানে না ফোনটা আসার সময়েই ওর মনে হচ্ছিল প্রশান্তর কিছু হয়নি তো? কেন এরকম মনে হয় তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু মনে যে হয়েছিল তা তো সত্যিই।

শমির ঘুম কেটে গেছে। বিক্রমদা বললেন, রাকেশ ফোন করেছিল। ওকে ব্যারাকপুর থানা থেকে এইমাত্র জানিয়েছে।

শমি জানে, দুপুরবেলা প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলার পরেই বিক্রমদা রাকেশদার মারফত ব্যারাকপুর থানাকে ইনফর্ম করেছিলেন প্রশান্ত সম্পর্কে। বিশেষ করে দুপুরে সল্টলেকের ওই হামলার পর কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি বিক্রমদা। কথা হয়েছিল প্রশান্তর বাড়ির ওপর দূর থেকে নজর রাখবে পুলিশ।

জামা পরতে পরতে বিক্রমদা বললেন, পুলিশের ওপর দায়িত্ব দিয়ে কখনই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। রাকেশের মতো পুলিশ অফিসার যদি আরও বেশ কয়েকটা থাকত, তাহলে হয়তো ওয়ার্ক কালচারটা বদলে যেত ওদের। আসলে বোকামিটা আমারই হয়েছে। আপসোস করতে করতে বিক্রমদা বলে চললেন, সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল প্রশান্তকে।

শমি শুনল নিজের মনেই বলে চলেছেন বিক্রমদা, প্রশান্তকে মেরে ওরা আমাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু একটা প্রাণের দাম নেই? ইস, আমারই বোকামি। দুপুরে যখন আমাদের ওপর হামলা হলো, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল...নাঃ, নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। বুঝলি শমি...

খারাপ লাগছিল শমিরও। ইস, দুপুরেই জলজ্যান্ত লোকটার সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু ওরা জানল কি করে?

সেটাই তো প্রশ্ন। জানছে কি করে? বিক্রমদা পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের ভেতর।

জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, দুপুরে আমরা সুবীর মিত্রর বাড়ি থেকে বেরেনোর সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়েছে। ফলো করেছে। সেটা না হয় ধরা গেল, ওরা নজর রেখেছিল সুবীরের বাড়ির ওপর। কিন্তু প্রশান্তর সঙ্গে তো আমার কথা হয়েছে ফোনে।

ফোন ট্যাপ করেনি তো?

হতেই পারে। এরা শুধু বিপজ্জনকই নয়, টেকনোলজিক্যালি খুবই সাউন্ড। আপাতত কিছুদিন ফোনের কাজটা বাইরের বুথ থেকেই সারতে হবে।

তার মানে আমরা যে এখন ব্যারাকপুর যাব, সেকথাটাও ওরা জেনে গেল?

হুঁ, জানা উচিত। তবে এখন পুলিশের জিপে হামলা করার মতো বোকামি ওরা বোধহয় করবে না।

বিক্রমদা।

হ্যাঁ বল।

আমরা যাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করব, তাদেরকেই কি এরা এভাবে মেরে দেবে?

না রে, অত সোজা নয়। তবে হ্যাঁ, এদের সঙ্গে সামান্য ফাঁক দিলেও চলবে না। এরা প্রচণ্ড সংগঠিত। এদের নেটওয়ার্ক প্রচণ্ড শক্তিশালী। সবচেয়ে বড় কথা এরা নৃশংস। যে কোনও উপায়ে পথের বাধা সরিয়ে দেওয়াই এদের প্রথম লক্ষ্য।

শমিরা যখন ব্যারাকপুরে পৌঁছল, তখন পূর্বদিকে অল্পস্বল্প আলো ফুটছে। জিপ চালাচ্ছেন রাকেশদা, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন বিক্রমদা।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে রাকেশদা বললেন, প্রশান্তর ব্যাপারটা সত্যিই খুব স্যাড। বেচারা খামোকাই প্রাণ দিল।

বিক্রমদা বললেন, এদের তো এখানেই সমস্যা। এরা বুঝে উঠতে পারে না কোথায় কতটা বলা দরকার। আরও একটা অসুবিধে আছে অবশ্য। এরা বুঝতে পারে না কোথায় গিয়ে বলবে!

প্রশান্তকে গুলি করেছে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। একেবারে সামনে থেকে।

বি. টি. রোডের কাছেই প্রশান্তদের বাড়ি। নেমন্তন্ন সেরে ফিরে প্রশান্ত গিয়েছিল পাড়ার পানের দোকানে। রাস্তার ওপরেই দোকানটা। পান কিনে প্রশান্ত সবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় একটি টাটা সুমো এসে থামে প্রশান্তর গায়ের কাছে। কিছুক্ষণ কথাও হয়। পানের দোকানের ছেলেটা ভেবেছিল কেউ বোধহয় কোনও ঠিকানা খুঁজছে। বড় রাস্তায় এরকম তো হামেশাই হয়।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর দেখা যায় প্রশান্ত রাস্তায় পড়ে আছে।

কালো রঙের টাটা সুমো। রাকেশদা বললেন, প্রতিটি জেলাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে নম্বরটা যে ভুয়ো এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আবার কালো রঙের সুমো! নির্ঘাত সেই সকালের গাড়িটাই। শমির কথার রেশ টেনে বিক্রমদা বললেন, সম্ভবত কাল থেকে আর এই গাড়ি ব্যবহার করতে দেখা যাবে না এদের।

মাথা নাড়লেন রাকেশদা, আমারও তেমনই মনে হয়। এদের কাজকর্ম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা পেশাদার।

প্রশান্তর ঘর থেকে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না, শুধু একটি ডিজিটাল ডায়েরি ছাড়া। ডায়েরিতে অনেক ফোন নম্বর রয়েছে।

বিক্রমদা বললেন, এটা কিছুদিন আমার কাছে থাক। ডায়েরিটা শমি ব্যাগে রেখে দিল।

॥ ৫ ॥

ঝড়ের গতিতে তিনটে দিন কেটে গেল। শমি বুঝতে পারছে এর মধ্যে বিশেষ এগোতে পারেননি বিক্রমদা। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছে বিক্রমদার ঘরে। এর মধ্যে আরও একবার বৈদ্যবাটি যাওয়া হয়েছিল। না, কোথাও কোনও সূত্র রেখে যায়নি অপরাধীরা। প্রশান্তর শরীর থেকে যে বুলেট বেরিয়েছে, তা পাকিস্তানে নির্মিত। কিন্তু বিক্রমদা বলেছেন, এর থেকে কিছু প্রমাণিত হয় না। কারণ, অস্ত্রব্যবসা এখন যে জায়গায় চলে গেছে, তাতে এটা পাকিস্তানের বদলে রাশিয়ার বা আমেরিকারও হতে পারত।

একটা কালো রঙের টাটা সুমো গাড়িকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে পানাগড়ের কাছে। এটাই কি সেই গাড়িটা, যাতে চেপে অপরাধীরা হামলা চালিয়েছিল শমিদের ওপর? এবং পরে ওই গাড়িতে চেপেই খুনীরা আসে প্রশান্তকে মারতে?

সেই পরিত্যক্ত গাড়িতেও এমন কোনো সূত্র নেই যা কাজে লাগতে পারে। তারকনাথ আর তাঁর ছেলে অভিবেক যেন হাওয়ায় উবে গেছেন। বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ খুন

ছিটকে ফেললেন বিক্রমদা।

হওয়ার পর সব মিলিয়ে দশ দিন কেটে গেল।

শমি জানে সম্ভাব্য প্রতিটি জায়গাতেই একবার করে হানা দেওয়া হয়ে গেছে বিক্রমদার। এমনকি অভিষেকের স্কুলে, যে কম্পিউটার সংস্থা অভিষেকের জন্য বিনা খরচে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাদের কাছে, সব জায়গাতেই যাওয়া হয়ে গেছে বিক্রমদার।

দিনটা ছিল রবিবার। আরও বেশি করে দিনটার কথা মনে থাকবে শমির, কারণ, সেদিন সকালেই বিক্রমদা হতাশার কথাটা মুখ ফুটে বলে ফেললেন। সকালের দ্বিতীয় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিক্রমদা কাগজের পাতা উল্টে বললেন, চল আজ দুপুরে একটা সিনেমা দেখে আসা যাক।

মন দিয়ে কাগজে শব্দজব্দ করছিল শমি। অবাক হয়ে মুখ তুলে বলল, সিনেমা?

হ্যাঁ, সিনেমা। শব্দটা নতুন শুনলি মনে হচ্ছে! যেন বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে উঠল বিক্রমদার গলায়। বললেন, শুধুমুদু বাড়িতে বসে থেকে কি হবে? তার চেয়ে সিনেমা দেখা ভালো।

কী সিনেমা?

মেট্রোতে আর্নল্ড শোয়ারজেনেগারের র চিল এসেছে।

ইস, শোয়ারজেনেগার মানেই তো ধুমধাড়াক্কা মারপিট।

ভালোই তো। মাথা খাটাতে হবে না। তাছাড়া মাথা খাটিয়েই বা কি হবে? কিস্যু হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তারকনাথ ইচ্ছে করেই গা ঢাকা দিয়েছে। ও যদি লুকিয়ে থাকতে চায়, থাকুক। আমি কি করতে পারি!

এগুলো সবই বিক্রমদার রাগের কথা। শমি ভাল করেই জানে। বিক্রমদার এই রূপও ওর অচেনা নয়। এগুলো হচ্ছে ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। কোনও কেসে সাময়িকভাবে আটকে গেলে বিক্রমদা সবার আগে চটে ওঠেন নিজের ওপর। এইসব সময় নিজের বুদ্ধি নিয়েও তাঁকে সংশয় প্রকাশ করতে দেখেছে শমি।

বিশেষ অবাক হলো না শমি। দুপুরে সত্যি সত্যিই সিনেমায় চললেন বিক্রমদা। সিনেমার পর্দায় শোয়ারজেনেগারের বিরাট পেশীবহুল চেহারা দেখে বললেন, কে বলবে লোকটার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। পেসমেকার বসানো হয়েছে! শুধু টাকার জোরটাই নয়, মনের জোরও আছে লোকটার।

ইন্টারভ্যালের সময় উঠে দাঁড়ালেন বিক্রমদা, তুই কি পুরোটা দেখবি? দেখতে পারিস। আমি একটু বেরোচ্ছি। রাকেশকে একটা ফোন করা দরকার।

বিক্রমদাকে একা ছেড়ে দেওয়ার মানে তদন্তের দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হবে। শমি বলল, সিনেমার অর্ধেকটা অন্য একদিন দেখব।

বিক্রমদা হাসলেন, তাহলে চল।

রাকেশদার সঙ্গে কি কথা হলো, তা শুনতেই পেল শমি। বিক্রমদা চাইছেন একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে, যাতে তারকনাথের ফ্ল্যাটের বন্ধ তালা ভেঙে ঢোকা যায় ভেতরে।

বিডন স্ট্রিটের মুখে পৌঁছে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না শমিদের। পাঁচ মিনিটের ভেতর চলে এলেন রাকেশদা।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল সুবীর মিত্রর সঙ্গে। শমিদের দেখে ভূত দেখার মতন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক।

আপনারা! এই অসময়ে!

রাকেশদা হেসে বললেন, পুলিশদের যে কোনো সময়, অসময় নেই সুবীরবাবু। তা আপনি কোথায় চললেন?

এই এক মক্কেলের কাছে যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, সে পরে গেলেও চলবে। আপনারা যখন এসেছেন...আসুন, ঘরে এসে বসুন।

বিক্রমদা বললেন, নাঃ, আজকে আর আপনার ওখানে নয়।

তাহলে?

আমরা একটু তারকনাথের ফ্ল্যাটে

ঢুকব।

কিন্তু সে তো তালা দেওয়া।

তালা ভাঙব। আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।

ও। সেই যে চুপ করে গেলেন সুবীর মিত্র, আর কথাই বললেন না ভদ্রলোক। কিন্তু শমির কেন যেন মনে হলো, ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ভদ্রলোকের।

তালা ভাঙার আগে আচমকা দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়লেন বিক্রমদা। শমি বুঝল না কেন। সুবীর মিত্রকে বললেন বিক্রমদা, সার্চ করার সময় আপনি বরং আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আপনাকে পেয়ে ভালোই হয়েছে।

শমি একটু অবাকই হলো। সত্যি, বিক্রমদার মতিগতি বোঝা ভার। বৈদ্যবাটিতে শিবপ্রসাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন রামদয়াল আগরওয়ালকে। এখানে নিজেই ডেকে নিলেন সুবীর মিত্রকে।

তারকনাথের বাড়ির ভেতরটা সুবীর মিত্রর ফ্ল্যাটের মতনই। ডিজাইনটা একইরকম। দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই ডানদিকে পড়ে অভিষেকের কম্পিউটার ঘর।

ঘরে ঢুকে আগে সব জানলা খুলে দিলেন বিক্রমদা। সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা হয়ে আছে। ভোরের দিকে হাওয়ায় শিরশিরে ঠাণ্ডা ভাব ছিল।

ছেলের কম্পিউটারের জন্য আলাদা টেবিল বানিয়েছিলেন তারকনাথ। ওপরে মনিটর। পাশে ক্যাবিনেট, যার ভেতর রয়েছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সংক্ষেপে যাকে বলে সি পি ইউ। মনিটরের ঠিক নিচের র‍্যাকে রয়েছে কি-বোর্ড ও মাউস।

দেওয়াল আলমারিতে যেসব বই রয়েছে, তার সবই কম্পিউটার সংক্রান্ত। বড় বড় লেখাগুলো দেখাই যাচ্ছে। ইউনিক্স, সি, সি ডবল প্লাস, ভিসুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্ট।

চোখ বুলিয়ে বিক্রমদা বললেন, সবই কম্পিউটার ল্যাঙ্গোয়েজ নিয়ে। ছেলেটা এই বয়সেই কম্পিউটার সফটওয়্যার গুলে খেয়েছে।

কম্পিউটারের সুইচ অন করলেন বিক্রমদা। শমিকে বললেন, একে বলে বুট করা।

মনিটরে ভেসে উঠল আই এম কামিং!

রাকেশদা বললেন, এই লেখা পড়ে কে বলবে যে অভিষেককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! মনে হবে ও কোথাও একটা উঠে গেছে কাজ করতে করতে। এখনই ফিরবে।

বিক্রমদা ঘাড় নেড়ে বললেন, ফিরবে তো বটেই। না ফিরে যাবে কোথায়? কি সুবীরবাবু?

সুবীর মিত্র খুবই অন্যমনস্ক ছিলেন। তাই চমকে উঠলেন। বললেন, অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ...নিশ্চয়ই।

শমি দেখল বিক্রমদা মনিটরের স্টার্ট মেনুতে মাউস নিয়ে গিয়ে ক্লিক করতেই পরপর অনেকগুলো লেখা ভেসে উঠল। বিক্রমদা গেলেন এস-এস ডস প্রম্প্টে।

শমি বুঝতে পারল না বিক্রমদা কীসব টাইপ করছেন কি-বোর্ডে। অনেক লেখা ভেসে উঠছে মনিটরে। আবার মিলিয়েও যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর বিক্রমদা কম্পিউটার বন্ধ করে দিলেন। শমি খেয়াল করল বিক্রমদার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কপালে গাঢ় তিনটি রেখা। নিশ্চয়ই কোনো অসঙ্গতি নজরে পড়েছে বিক্রমদার? অন্যমনস্কভাবে যেই ক্যাবিনেটের মেন সুইচ অফ করতে গেলেন বিক্রমদা তখন একটা কাণ্ড ঘটল। বিক্রমদার হাতের ওপরদিকে লেগে একটা অদ্ভুত চাপা আওয়াজ হলো সি পি ইউতে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এল একটা সি ডি।

সি ডি অর্থাৎ কমপ্যাক্ট ডিস্ক আগেও দেখেছে শমি। গোল চকচকে সি ডি-টির ওপর আলো পড়ে চকচক করছে।

বিক্রমদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সি ডি-টার দিকে। নিজের মনেই বললেন, আশ্চর্য, এটা ভেতরে ছিল। এতক্ষণ তো বুঝতেই পারা যায়নি। হয়তো বোঝাও যেত না কোনোদিন, যদি না ভুল করে আঙুলটা লেগে যেত সি ডি ড্রাইভে!

শমি দেখল সুবীর মিত্র তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সি ডি-টার দিকে। চোখদুটো চকচক করছে। ভদ্রলোকের মুখের রঙ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। সুবীর মিত্রর অস্বাভাবিক দৃষ্টির মধ্যে কি রয়েছে—লোভ, নাকি ভয়? শমি ঠিক বুঝতে পারল না।

॥ ৬ ॥

শুধু পুলিশ কমিশনারই নন, ছিলেন লালবাজারের সব বড়মাপের পুলিশ কর্তাই। অভিষেকের কম্পিউটারে পাওয়া সি ডি দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল প্রায় প্রত্যেকেরই। তারকনাথ আর তাঁর ছেলে অভিষেক যে খুবই বড় কোনো গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না কারুর।

সি ডি-টার মধ্যে একটা আস্ত ইন্টারনেটের ওয়েবপেজ কপি করে রেখেছে অভিষেক। এমন সাংঘাতিক ও ভয়ঙ্কর ওয়েবসাইট আগে কখনও দেখেনি শমি।

ইন্টারনেট সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা রয়েছে শমির। কারণ, খুব বেশিদিন হয়নি বাড়িতে ইন্টারনেটের কানেকশন নিয়েছেন বিক্রমদা।

কথায় বলে এখন গোটা পৃথিবী চালাচ্ছে তিনটে ডবলু—ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। এই কারণেই যে কোনো ইন্টারনেটের সাইটের আগে লেখা থাকে ডবলু, ডবলু, ডবলু! এখানেও আছে—তিনটে ডবলুর পর ডেসট্রাকশন ডট কম।

কিছুক্ষণ দেখার পরেই পুলিশ কর্তাদের মুখ থেকে নানারকম শব্দ বেরোতে লাগল। কেউ বললেন, আনবিলিভেবল। কেউ বললেন, সাংঘাতিক। ভয়ংকর। এটা তো উগ্রপন্থীদের নিজস্ব সাইট। এর সন্ধান পেল কি করে এরা?

স্বয়ং পুলিশ কমিশনার নিজেই বললেন, ছেলেটা এর সন্ধান পেল কি করে?

রাকেশদা বললেন, তার থেকেও বড় কথা জঙ্গী দস্যুরা ছেলেটার সন্ধান পেয়ে যায়নি তো?

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, আমার ধারণা পায়নি। পেয়ে গেলে বৃদ্ধ শিবপ্রসাদকে প্রাণ হারাতে হতো না।

সি পি জিজ্ঞেস করলেন রাকেশদাকে, অন্যান্য রাজ্যেও মেসেজ পাঠানো হয়েছে তো?

হ্যাঁ, স্যার। তা পাঠিয়েছি, কিন্তু...

কিন্তু কী?

আমার ধারণা এই কলকাতাতেই কেউ একজন নিশ্চয়ই জানে তারকনাথের গতিবিধি।

বেশ তো, সেটা খুঁজে বের করো। কি ভিকি? পুলিশ কমিশনার ঘুরলেন বিক্রমদার দিকে।

বিক্রমদা বললেন, আপাতত একটা যোগাযোগ মনে হচ্ছে বের করা গেছে। তবে এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গেলে কয়েকটা দিন দেখা দরকার।

সেটা কে?

সুবীর মিত্র।

কিভাবে জানা গেল?

সামান্য পর্যবেক্ষণ শক্তি, আর কিছু নয়। বিক্রমদা হেসে বললেন, তারকনাথের ফ্ল্যাটের তালা খোলার সময় চোখে পড়ল। আগের দিন তালার ওপর মাকড়সার জাল দেখেছিলাম। আজ দেখলাম সেটা নেই। তাছাড়া বন্ধ ঘরে ঢুকেই একটা পারফিউমের গন্ধ পেয়েছিলাম।

শমি বলল, গন্ধটা খুব চেনা চেনা লাগছিল।

বিক্রমদা বললেন, হ্যাঁ, খুব চড়া গন্ধ সন্দেহ নেই। দরজা-জানলা খোলা থাকলে হয়তো গন্ধটা উবে যেত। আগের দিন সুবীর মিত্রর গা থেকেও এই গন্ধই পেয়েছিলাম।

একজন পুলিশ অফিসার বললেন, সুবীর মিত্রকে ধরে এনে চাপ দিলেই তো হতো।

বিক্রমদা বললেন, না, এটা আমি চাইছি না একটাই কারণে। সুবীরের সঙ্গে আর কাদের যোগাযোগ আছে, তা জানা দরকার। আশা করা যায়, এই সি ডি পাওয়ার পর সুবীর নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে অন্যান্যদের সঙ্গে।

রাকেশদা বললেন, এই জঙ্গী দস্যুদের লোকজন যে ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পরপর দুটো ঘটনায়। প্রথমে বিক্রমের ওপর হামলা হলো। তারপর খুন হলো প্রশান্ত ভৌমিক।

কম্পিউটারে সি ডি-টা চালিয়ে বিক্রমদা বললেন, এই হচ্ছে আসল লোক।

মনিটরে ভেসে উঠেছে দাড়িওলা হিংস্র প্রকৃতির একটি মুখ। চোখের দৃষ্টি তীব্র লোকটির। গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি।

বিক্রমদা বললেন, এর নাম আফজল। এই ওয়েবসাইট বানিয়ে সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল লোকটা। কিন্তু ছোট্ট অভিষেকের কৃতিত্বে তা শুরুতেই বন্ধ হয়েছে। অভিষেক এই জঙ্গীদের ওয়েবসাইটে ঢুকতেই ওরা টের পেয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নেভিগেশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তার আগেই অভিষেক সেটা সি ডি-তে কপি করে ফেলে। সাধারণত কোনো ওয়েবপেজ কেউ রেকর্ড করতে চাইলে তা বোঝা যায়। সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসে আপনি রেকর্ড করুন।

সি পি বললেন, অনলাইনে থাকার জন্যই কি?

এগজ্যাক্টলি। অনলাইনে থাকলে অর্থাৎ ইন্টারনেট চালু থাকলে দুটো কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে ফোনের লাইনের মাধ্যমে। তখন একজনের পক্ষে আরেকজনের উপস্থিতি টের পেতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। যে কারণে আফজলদের পক্ষে অভিষেকের কম্পিউটারকে খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। আর সেটা বুঝতে পেরেই ছেলেকে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন তারকনাথ।

এক পুলিশ অফিসার বললেন, কিন্তু সেটা কি খুব একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয়েছে? পুলিশকে শুরু থেকে জানালে ওরা প্রোটেকশান পেতে পারত।

বিক্রমদা বললেন, গা ঢাকা দেওয়ার বুদ্ধিটা খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু মাঝখানে কয়েকজন ঢুকে পড়েই গণ্ডগোলটা পাকিয়েছে।

বিক্রমদার কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বাজল। রাকেশদাকে চাইছে। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন রাকেশদা। ফোনেই কাউকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি পেছনে লেগে থাকো। আমরাও যাচ্ছি।

ফোন রেখে রাকেশদা বললেন, ভিকি কুইক। এখনই বেরোতে হবে। সুবীর মিত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা মারুতিতে উঠেছে। সাদা মারুতি। নম্বরও পেয়েছি। গাড়িটা বাইপাসের দিকে এগোচ্ছে।

সি পি বললেন, বেস্ট অফ লাক।

বিক্রমদার বাইক সারানো হয়ে গেছে। রাকেশদাও সেজন্য বাইক বের করলেন।

সন্ধে নেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের ওয়াকিটকিতে রাকেশদা খবর পেলেন সাদা মারুতি বাইপাস ধরে এগোচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

কলকাতার রাস্তায় জোরে মোটরবাইক চালানো মোটেই সহজ কাজ নয়। গর্ত, খানাখন্দ তো আছেই। তারপর আছে ট্রামলাইন। বেকায়দায় লাইনে চাকা পড়লেই বাইক উল্টে যাবে। তবুও যথাসাধ্য স্পিড তুলেছে দুজনেই।

ডবলু বি জিরো ওয়ান বি ডাবল ফোর নাইন সেভেন নম্বরের সাদা মারুতির দেখা পাওয়া গেল যুবভারতী স্টেডিয়ামের কাছে।

রাকেশদা চেঁচিয়ে বললেন, খুব কাছে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা একটু দূরেই থাকব।

স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে গাড়ি সোজা এগোচ্ছে দক্ষিণ দিকে। হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় ঘুরে ঢুকে গেল সল্টলেকের দিকে। মারুতি আর ওদের মধ্যে কোথা থেকে একটা লাল রঙের জিপসি গাড়ি ঢুকে পড়েছে।

জিপসিটাও প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। সন্ধ্যের আলো-আঁধারে দূর থেকে শমি বুঝতে পারল জিপসি গাড়িটা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে কিন্তু সাদা মারুতি সাইড দিচ্ছে না। সল্টলেকের এদিকটা বোধহয় নির্জনতম।

রাস্তার ডানদিকে উঁচু দেওয়াল। শুরু হয়ে গেছে একটা কারখানা। বাঁদিকে নলবন। লম্বা লম্বা সবুজ পাতা এখন সন্ধ্যের অন্ধকারে কালো। সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে এখন আকাশে নানা রঙের খেলা। কিন্তু আকাশ দেখার উপায় নেই। চোখ রাস্তাতেই রাখতে হচ্ছে। বাইকের গতি আচমকা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন বিক্রমদা। রাকেশদা অনেকটা পেছনে পড়ে গেছেন।

অবশ্য গতি না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। জিপসি এখন চলে গেছে সাদা মারুতির পাশে। ঠিক এই সময় পরপর অনেকবার কানফাটানো গুলির আওয়াজ পেল শমি। দেখল সাদা মারুতি টাল সামলাতে না পেরে সোজা ঢুকে গেল নলবনের ভেতর। জিপসি গাড়িটা থামেনি। প্রচণ্ড গতিতে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর।

রাস্তার ধারে বাইক থামিয়ে দৌড়ে গেলেন বিক্রমদা। নলবনের সবুজ পাতা তছনছ করে সাদা মারুতি ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। জানলার সমস্ত কাচ চুরমার হয়ে গেছে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর কাত হয়ে পড়েছে ড্রাইভার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাড়ির ভেতর।

কুইক, শমি। হাত লাগা। এখনও বেঁচে থাকতে পারে।

বিক্রমদা দরজা খুলতে না পেরে জানলা দিয়েই টেনে বের করলেন ড্রাইভারকে।

শমি পেছনে উঁকি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, আরও একজন আছে বিক্রমদা।

জানি।

বলতে বলতে রাকেশদা এসে পৌঁছে গেছেন। পেছনের দরজা টেনে খুলে ফেলেছেন বিক্রমদা।

রক্তাপ্লুত লোকটাকে টেনে বের করতেই চমকে উঠল শমি। সুবীর মিত্র।

দুপুরে এই জামাটা পরেছিলেন ভদ্রলোক। সেই অবস্থাতেই দেখা হয়েছিল। সাদা জামার রঙ অবশ্য এখন চেনার উপায় নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

সুবীর মিত্র একবার নড়ে উঠলেন। অতিকষ্টে চোখটা যেন খুললেন।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন বিক্রমদা। জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবেন?

আবার চোখ বন্ধ হয়ে গেল সুবীর মিত্রর। একবার যেন অস্ফুটে বলে উঠলেন রাম...

মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন বিক্রমদা। যদি কিছু শোনা যায়। কিন্তু না, আর কোনো কথাই বেরোল না সুবীর মিত্রর গলা থেকে।

॥ ৭ ॥

অনেক রাতে নিজের কম্পিউটার বন্ধ করলেন বিক্রমদা। এতক্ষণ পাশে জেগেছিল শমিও। অনেক, অনেক প্রশ্ন জমে গেছে। সেগুলোর উত্তর বিক্রমদা ছাড়া আর কে দিতে পারবে?

ইন্টারনেটে জঙ্গীদের সেই বিশেষ সাইট ডেসট্রাকশন ডট কমে এতক্ষণ ঢোকার চেষ্টা করছিলেন বিক্রমদা। বারবারই কম্পিউটারের মনিটরে মেসেজ ভেসে উঠছিল নেভিগেশন ক্যানসেলড। অর্থাৎ সাইটটা আপাতত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েই কম্পিউটারের সুইচ অফ করলেন বিক্রমদা। বললেন, ওয়েবপেজটাকেই সম্ভবত নষ্ট করে দিয়েছে জঙ্গীদস্যুরা। কিন্তু..., বিক্রমদা কি একটা ভেবে যেন চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, একটাই প্রশ্ন আমাকে ভাবাচ্ছে।

কোনও কথা না বলে বিক্রমদার কাছ থেকে শোনার অপেক্ষাতেই রইল শমি। অনেকগুলো প্রশ্ন যে ওকেও অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে ভেতরে কুরে খাচ্ছে। দেখা যাক বিক্রমদা কি বলেন!

বিক্রমদা বললেন, শুধু এই জঙ্গীদের সাইট খুঁজে পাওয়ার জন্য অভিষেককে গা ঢাকা দিতে হলো, এটাই আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বুঝলি! ব্যাপারটা বোধহয় এতটা সহজ নয়!

তাহলে?

সেটাই তো প্রশ্ন! তাহলে এর ভেতরে আর কী রহস্য আছে? গোড়া থেকেই আমি একটা বীভৎস বুদ্ধির ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। যা মিলে গেল সুবীর মিত্র খুন হওয়ার ফলে। কিন্তু আমাদের অনেক অসুবিধের মধ্যেও ফেলে গেলেন ভদ্রলোক।

যেমন?

মৃত্যুর আগে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন ভদ্রলোক। সেটা কি?

'রাম'-এর পর আরও কিছু আছে?

অবশ্যই। কোনও সন্দেহ নেই।

সুবীর মিত্র কি জানতেন কোথায় লুকিয়ে আছেন তারকনাথ, অভিষেক?

ডেফিনিটলি জানতেন। কিন্তু জোর করলে সুবীরের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা যেত না বলেই আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম।

তার মানে অভিষেক ভেবেই ভুল করে কিডন্যাপ করা হয়েছিল সুবীর মিত্রর ছেলে সমুকে?

একেবারেই তাই। এবং তারপর সুবীর মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল কিডন্যাপারদের। এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই নেই। আমার ধারণা দু'পক্ষকেই লেজে খেলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু..., আবার কপালে ভাঁজ পড়ল বিক্রমদার। বললেন, এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ কেউ একটা নেই তো? এবং আমার সন্দেহ ইন্টারনেটে শুধু জঙ্গীদের ওয়েবপেজ খুঁজে বের করার জন্যই গণ্ডগোল বাধেনি। গণ্ডগোল আরও গভীরে।

সন্ধ্যেবেলায় সুবীর মিত্র গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর মারুতি গাড়িটার নম্বর দেখে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেছিলেন রাকেশদা। বিশেষ লাভ হয়নি। পুলিশের সন্দেহ ওটা ছিল চোরাই গাড়ি। ড্রাইভারের পরিচয় যতটুকু জানা গেছে তাতেও পুলিশের সন্দেহ, জাল পাসপোর্ট, ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকেছিল লোকটা। সঙ্গে পাওয়া গেছে শুধু ড্রাইভারের লাইসেন্স। সেটাও এদেশের নয়! ইরানের!

শমি বলল, জঙ্গীদের ওয়েবপেজ ছাড়া আরও কিছুর সন্ধান পেলে কি অভিষেক সেটা সি ডি-তে রেকর্ড করে রাখত না?

বিক্রমদা বললেন, মনে হয় সেটা এমনই গোপনীয় বিষয় যা অভিষেক রেকর্ড করে রাখতে চায়নি। আর সেজন্যই এখন অভিষেকের নিরাপত্তার ব্যাপারটা এত জরুরি হয়ে উঠেছে। অভিষেকের বিপদ এখন দু'দিক থেকেই। ওই জঙ্গীরা বা জঙ্গীদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ওর সন্ধান পাওয়ার আগেই আমাদের পৌঁছনো দরকার ওর কাছে।

কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব?

দুটো উপায় আছে। এক, স্বয়ং অভিষেক নিজে যদি জানায়।

কিভাবে?

অভিষেকের কম্পিউটারে অ্যাড্রেস বুক থেকে ওর হটমেল অ্যাড্রেস নিয়ে সেখানে আমি একটা খবর দিয়েছি। আমার ইন্টারনেটের ঠিকানা অর্থাৎ ই-মেল অ্যাড্রেস দিয়ে জানিয়েছি যেন ও অবশ্যই যোগাযোগ করে। অভিষেক না বুঝলেও ওর বাবা নিশ্চয়ই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। যোগাযোগও করবে আশা করি।

কিন্তু অভিষেক যেখানে গা ঢাকা দিয়েছে সেখানে যদি কম্পিউটার না থাকে?

মনে হয় না তেমন হবে বলে। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই ইন্টারনেট বুথ আছে। যে ছেলেটা কম্পিউটারে সারাদিন কাটাত, সে কি এমনি কিছু না করে থাকতে পারবে ভেবেছিস? কম্পিউটারের বুথ দেখলেই ওর হাত সুড়সুড় করবে। ঠিকই একবার না একবার নিজের ই-মেল অ্যাকাউন্টস চেক করে দেখবে অভিষেক।

কিন্তু যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর না দেয়?

কাঁধ ঝাঁকালেন বিক্রমদা, কিছু করার নেই। প্রথম ভুলটা ওরা করেছিল সুবীর মিত্রকে বিশ্বাস করে, পুলিশকে কিছুই না জানিয়ে। দ্বিতীয়বারও যদি ভুল করে তাহলে তার ফল ওদেরই ভুগতে হবে।

ধরা যাক, ও উত্তর দিল না। তাহলে কিভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

বিক্রমদা রিডিং ল্যাম্প জ্বেলে বই নিয়ে বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন, সেক্ষেত্রে রাকেশের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। অভিষেক শেষ যেদিন কম্পিউটার খুলেছিল, তার রেকর্ড দেখে মোটামুটি সেইদিনের আশেপাশে সমস্ত রেল আর বিমানের বুকিং লিস্ট চেক করতে বলে দিয়েছি। আশা করা যায় কিছু একটা সন্ধান মিলবেই।

॥ ৮ ॥

চোখে আলো পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল শমি। আজ উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বিক্রমদার ঘরের দরজা খোলা। অর্থাৎ বিক্রমদা উঠে পড়েছেন। শুধু উঠেই পড়েননি, উঠে চানটান সেরে কোথাও একটা বেরিয়ে পড়েছেন।

শমি দেখল পড়ার টেবিলে বিক্রমদার হাতে লেখা চিঠি চাপা দেওয়া আছে।

বিক্রমদা লিখেছেন, কুম্ভকর্ণ, যেভাবে ঘুমোচ্ছিলি তাতে তোকে ডাকতে মায়া হলো। আশা করি তাড়াতাড়িই উঠবি। উঠে একদম দেরি করবি না। তাড়াতাড়ি তৈরি

হয়ে নিবি। আমি ফিরলেই সঙ্গে সঙ্গে বেরোতে হবে।

কোথায় গেছেন বিক্রমদা, তা লেখা নেই। কোথায় বেরোতে হবে, তারও কোনও ইঙ্গিত নেই। তাহলে কি অভিষেক কোনও উত্তর পাঠাল? অথবা রাকেশদা কিছু জানালেন?

এখনও পর্যন্ত এই রহস্যের গোলকধাঁধায় বিশেষ দাঁত ফোটাতে পারেনি শমি। তবে বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর যখনই শোনা গেল যে তারকনাথ আর অভিষেককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখনই মনে হয়েছিল যে এই ঘটনার শিকড় অনেক গভীরে। এখন দেখা যাচ্ছে, শিকড় শুধু গভীরেই নয়, অত্যন্ত জটিল তার গতিবিধি! তারকনাথের ছেলে অভিষেক অল্পবয়সেই কম্পিউটারে বিশেষ পারদর্শী। সেই অভিষেক ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখতে দেখতেই ঢুকে পড়ে জঙ্গীদস্যুদের বানানো একটি নিষিদ্ধ, গোপন সাইটে। অভিষেক নিজে কম্পিউটার সম্পর্কে এত জানে বলেই হয়তো জঙ্গীদের গোপন ওয়েবপেজে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। সেই ওয়েবপেজ একটা সি ডি-তে রেকর্ডও করে রেখেছিল অভিষেক। এদিকে অভিষেককে কিডন্যাপ করতে এসে জঙ্গীরা ভুল করে ধরে নিয়ে যায় প্রতিবেশী সুবীর মিত্রর ছেলে সমুকে।

বিক্রমদার ধারণা এর ফলে সুবীর মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে জঙ্গী দস্যুদের। তারকনাথ ও অভিষেক কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে তাও জানত সুবীর মিত্র। সম্ভবত সুবীর মিত্র বড় দাঁও মারার চেষ্টা করেছিল। অতিরিক্ত লোভের ফলেই সুবীর মিত্রকে প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন, কে বা কারা গুলি করে মারল সুবীর মিত্রকে? সেক্ষেত্রে জঙ্গী দস্যুরা ছাড়াও কি আরও কেউ রয়েছে? তৃতীয় কোনও পক্ষ? তারকনাথের বাবা বৃদ্ধ শিবপ্রসাদকেই বা খুন করেছিল কারা? সে কি অভিষেকরা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা জানার জন্য? নাকি শিবপ্রসাদ গোপন কোনও তথ্য জানতেন!

স্নান সেরে বেরোতে না বেরোতেই বাইরে বিক্রমদার মোটরবাইকের আওয়াজ পেল শমি। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে এলেন বিক্রমদা। চেঁচিয়ে বললেন, তুই রেডি? ভেরি গুড। ঝটপট ব্যাগ গুছিয়ে নে।

দুটো ব্যাগ মোটামুটি তৈরি করাই থাকে। একটা আকারে ছোট। কাছাকাছি যাওয়ার জন্য। আরেকটা বড়। দূরপাল্লার সফর, যেখানে অনেকদিনের ধাক্কা, তার জন্যই বড় ব্যাগ। প্রয়োজনীয় সবকিছু ভরাই থাকে ব্যাগ দুটোতে। শুধু জামাকাপড় ঢুকিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগে।

শমি জিজ্ঞেস করল, ছোট না বড়?

বিক্রমদা বললেন, বড়। বুঝতে পারছি না কতদিন লাগবে।

অভিষেকদের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল?

হ্যাঁ, ই-মেলের জবাব দিয়েছে অভিষেক। একইসঙ্গে রাকেশও একটা খবর এনেছে। দুটো মোটামুটি মিলছে।

অভিষেক জবাব দিয়েছে? উল্লসিত দেখাল শমিকে, তার মানে ওরা এখনও বেঁচে আছে! কোনো বিপদ হয়নি?

এখনও হয়নি। তবে হতে কতক্ষণ? চিন্তিত দেখাল বিক্রমদাকে। বললেন, একেবারেই সময় নেই আমাদের হাতে। আমার আগে অন্য কেউ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ই-মেল করেছিল অভিষেকের হটমেল অ্যাড্রেসে। যে কারণে অভিষেক লিখেছে, তোমাকে তো আগেরবারই সব জানিয়েছি। তবে এখন আর আমরা চেন্নাইতে নেই। উই আর মুভিং টুওয়ার্ডস সাউথ—রামেশ্বরম।

সুবীর মিত্র কি তাহলে রাম বলতে গিয়ে রামেশ্বরম বোঝাতে চেয়েছিল?

হতে পারে। তবে সুবীর মিত্র অত আগে থাকতেই জানবে কি করে যে অভিষেকরা রামেশ্বরম যাচ্ছে?

তাও বটে!

এটা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত আমরা সকালের ফ্লাইটে চেন্নাই অর্থাৎ ম্যাড্রাস যাচ্ছি। সেখান থেকে রাতের ট্রেনে রামেশ্বরম।

ওরা যদি রামেশ্বরম ছেড়ে অন্য কোথাও রওনা হয়ে যায়?

তামিলনাড়ুর পুলিশকে আলাদাভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। জানিস তো রামেশ্বরম থেকে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া খুবই সোজা। সমুদ্রে কয়েক ঘণ্টার পথ।

দিনটা যেন ঝড়ের গতিতে কেটে গেল। ম্যাড্রাসে পা দিয়েই বিক্রমদা ছুটলেন হোটেল সিভিউতে। সমুদ্রের কাছে এই হোটেলে এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ ছিলেন একটি অল্পবয়সী ছেলেকে নিয়ে।

হোটেলের রেজিস্টারে লেখা আছে টি মজুমদার। তারকনাথ হয়তো ইচ্ছে করেই পুরো নামটা লেখেননি।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ কুমারমঙ্গলম জানালেন, ছেলেটার মাথা ন্যাড়া। বাবা-ছেলে হোটেলের ঘর থেকে বিশেষ বেরোত না। তবে, একদিন হোটেলের ভিডিও গেমসের ঘরে কম্পিউটার খারাপ হয়েছিল, সেদিন ভদ্রলোক সেটা ঠিক করে দিয়েছিলেন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে বিক্রমদা বললেন, ওটা আসলে ঠিক করেছিল অভিষেকই। কিন্তু এখানে ওর ছেলেকে নিয়ে হই চই বাধুক, তা চায়নি তারকনাথ।

শমি বলল, মাথা ন্যাড়া হয়েছে কি ভোল বদলের জন্য?

আর কোনো কারণ তো দেখছি না। বড়দের পক্ষে চেহারা পাল্টানো অপেক্ষাকৃত সহজ। দাড়ি রাখল, কি গোঁফ কেটে ফেলল। ছোটদের পক্ষে কাজটা কঠিন। অতএব মাথা ন্যাড়া!

ইস, আর একটু আগে যদি আমরা এখানে আসতে পারতাম!

বিক্রমদাকে চিন্তিত দেখাল। বললেন, ট্রেন আর ফ্লাইটের বুকিং লিস্ট ঘেঁটে দু'জনকে খুঁজে বের করা তো সহজ কাজ নয়। সময় লাগবেই। তবু তো রাকেশ লালবাজারে ছিল বলে এখানকার পুলিশ এতটা হেল্প করল। ম্যাড্রাসে হোটেল তো কম নেই। সব হোটেলের খাতা ঘেঁটে দু'জনকে খুঁজে বের করাও কঠিন কাজ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দু'জন হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে চলে এল। শান্ত সমুদ্র। পুরীর মতো ঢেউ নেই। বালিয়াড়ি ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। অনেক লোকজন, দোকানপাট। আলো জ্বলছে। পরিষ্কার আকাশ। আকাশে ঝকঝক করছে তারা।

ট্রেন ছাড়বে সেই রাত এগারোটা নাগাদ। হাতে কিছুটা সময় আছে। বালির ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিক্রমদা। এক ঠোঙা বাদাম কিনে নিয়ে এল শমি।

অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছিল। শমি অবশেষে জিজ্ঞেস করে ফেলল, শিবপ্রসাদকে কে মারল বিক্রমদা?

বিক্রমদা হাসলেন। ঠোঙা থেকে একমুঠো বাদাম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফুঁ দিয়ে সেই খোসা উড়িয়ে বললেন, রাম জানে।

মানে?

সব উত্তর আশা করছি পাওয়া যাবে রামেশ্বরমে পৌঁছলে।

আর কোনো কথা বললেন না বিক্রমদা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ডুবে গেলেন গভীর চিন্তায়। শমি জানে, এখন বিক্রমদাকে কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে না। শমি চুপ করে বসে ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনতে লাগল।

॥ ৯ ॥

রামেশ্বরম যাওয়ার পথে সমুদ্রের ওপর সেই দীর্ঘ ব্রিজটার কথা কখনও ভুলবে না শমি। দু'দিকে ফাঁকা, নিচে নীল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। খুব আস্তে আস্তে ব্রিজটা পেরোচ্ছিল ট্রেনটা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল শমি। একটু একটু ভয় যে করছিল না এমন নয়! অনেকদিন আগে নাকি এই ব্রিজটা ভেঙে আস্ত একটা ট্রেন সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল!

রামেশ্বরম জায়গাটা যেমন ছোট, তেমনই নোংরা। যে কোনও তীর্থস্থানের মতন এখানে সবসময় লোকের ভিড়।

স্টেশন থেকে হোটেলে যাওয়ার আগে কলকাতায় রাকেশদাকে ফোন করলেন বিক্রমদা। ফোনের বুথ থেকে যখন বেরোলেন, তখন মুখ গম্ভীর।

হোটেলের রিসেপশনে পুলিশের পোশাক পরে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। শমি আর বিক্রমদাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার। আয়্যাম ফ্রম স্পেশাল ব্রাঞ্চ। কে শ্রীকান্ত। ইউ ক্যান কল মি অনলি শ্রীকান্ত।

ঝড়ের বেগে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাসলেন ভদ্রলোক। শমি অবাক হয়ে দেখছিল লোকটাকে। পুলিশের পোশাকে যেন সিনেমার নায়ক। লম্বায় বিক্রমদার থেকে দু'এক ইঞ্চি বেশিই হবে। টকটকে ফর্সা। হাতের তালু সেজন্যই বোধহয় অমন লালচে। হয়তো বিক্রমদারই বয়সী হবে, কি একটু কম।

বিক্রমদা হাত মেলালেন। শ্রীকান্ত বললেন, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। যে কোনও প্রয়োজনে আপনি স্যার আমাকে স্মরণ করবেন।

বিক্রমদা যে বিরক্ত হয়েছেন তা পরিষ্কার বুঝতে পারল শমি। তদন্তের সময় কেউ সঙ্গে থাকলে মোটেই পছন্দ করতে পারেন না বিক্রমদা। একমাত্র ব্যতিক্রম রাকেশদা। হয়তো ছোটবেলার বন্ধু বলেই রাকেশদাকে সহ্য করতে পারেন বিক্রমদা।

শান্ত, সংযত, ভদ্র গলায় বিক্রমদা বললেন, মিঃ শ্রীকান্ত। ঠিক এমুহূর্তে আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু স্যার, আপনাকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখানকার রাজ্য পুলিশের ডি জি বারবার বলে দিয়েছেন যে ক্যাপ্টেন মুখার্জি এখানে একটি গোপন তদন্তে এসেছেন। বিপজ্জনক অপরাধীরা এর সঙ্গে জড়িত। আপনার প্রাণ সংশয় হতে পারে যে কোনও সময়।

হোটেলের দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিক্রমদা হেসে বললেন, এর আগেও বহুবার আমার প্রাণ সংশয় হয়েছে মিঃ শ্রীকান্ত। তখন কিন্তু আপনি ছিলেন না।

আই নো স্যার। ইউ আর কোয়াইট স্ট্রং, হ্যাভ এনাফ কনফিডেন্স। বাট স্যার, দিস ইজ মাই জব। আপনার কিছু হলে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

বিক্রমদা কাঁধ ঝাঁকালেন, ওকে, আপনি থাকুন। আপনাকে তো আমি চলে যেতে বলতে পারি না।

দরজা বন্ধ করার আগে ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে শ্রীকান্ত বললেন, আমি স্যার আপনার পাশের রুমেই আছি। কল মি, এনি টাইম।

বিছানায় ঝপাস করে শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বিক্রমদা বললেন, উফ নাছোড়বান্দা লোক বটে!

শমি হেসে বলল, ওকে মাঝরাতে ডেকে তুলে কোনো দরকারের কথা বললে কেমন হয়!

বিক্রমদাও হেসে ফেললেন, নট ব্যাড। পরপর দু' রাত্তির এরকম করলে ও ঠিক তিনদিনের মাথায় পালিয়ে যাবে।

এমনিতে শ্রীকান্তকে দেখে কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে শমির। হাসিখুশি, গম্ভীর নয়। অনেক পুলিশ অফিসার অকারণেই গাম্ভীর্য দেখায়, তাদের মতো নয়।

শমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফোন বাজল। ফোনটা রয়েছে শমির বিছানার পাশে। শমিই ধরল। ফোনটা বাজার সময় শমির মনে হয়েছিল, রাকেশদা হতে পারেন। কারণ রামেশ্বরমে এসেই বিক্রমদা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রাকেশদাকে।

ফোনটা ধরে অবশ্য ভুল ভাঙল শমির। উল্টোদিকে খসখসে, গম্ভীর গলা। চিবিয়ে চিবিয়ে সেই গলা হিন্দিতে বলল, সবকটাকে মেরেছি। তোমরাও বাদ যাবে না। বিকেলের ট্রেনে ফিরে যাও।

শমির মুখ দেখেই আঁচ করে নিয়েছেন বিক্রমদা। বললেন, কি বলল?

সবকটাকে মেরেছি। এবার তোমাদের পালা। বিকেলের ট্রেনে ফিরে যাও।

বাঃ।

গুণ্ডাদের এইসব হুমকিকে বিক্রমদা যে গ্রাহ্য করেন না, তা তো আগেও দেখেছে শমি। তাই বিক্রমদার কথা শুনে অবাক হলো না। কিন্তু বিক্রমদার পরের কথাটায় সত্যিই চমক ছিল।

বিক্রমদা বললেন, আমরা সত্যিই বিকেলের ট্রেনে চলে যাব।

যাঃ। শমির বিশ্বাস হলো না।

হ্যাঁ, সত্যি। দেখছিস না ব্যাগ খুলিনি। শুধু স্নানটা করে লাঞ্চটা সারব। তারপর টিকিটের জন্য একবার স্টেশনে যেতে হবে।

ফিরেই যদি যাব, তাহলে এলাম কেন? শমির সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন, ফিরে তো যেতেই হতো! কয়েকদিন আগে আর পরে।

বিক্রমদা উঠে পড়লেন, তুই ঘরে থাক। আমি টুক করে স্টেশন থেকে ঘুরে আসছি। কোথাও বেরোস না। অচেনা কাউকে দরজা খুলে দিস না।

মিঃ শ্রীকান্ত যদি ডাকে?

শ্রীকান্তকে নিয়েই তো আমি স্টেশনে যাচ্ছি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুই ততক্ষণে স্নানটান সেরে ফেল।

শমিও তেমনই ভেবেছিল। কিন্তু বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে নিচে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই মাথাটা পরিষ্কার হলো না শমির। বিক্রমদার হাবভাব সত্যিই রহস্যময়। কেন যে রামেশ্বরমে এলেন, আবার কেন যে ফিরে যাচ্ছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে কি রামেশ্বরমে নেই অভিষেকরা? রামেশ্বরমে এসে রাকেশদাকে ফোন করেছিলেন বিক্রমদা। শমির মনে পড়ল বিক্রমদার মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল রাকেশদার সঙ্গে কথা বলার পর।

আবার গুণ্ডাদের হুমকি পেয়ে বিক্রমদা ফিরে যাবেন, এমন কথাও বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে আসল কারণটা কী?

কারণটা ভেঙে বললেন না বিক্রমদাও। স্টেশন থেকে ফিরে চুপচাপ স্নান সারলেন। ঘরেই লাঞ্চ নিল শমিরা।

স্টেশনে ফিরে যাওয়ার সময়েও কিছুই ঘটল না। যে ট্রেনে শমিরা এসেছে, সেটাই ফিরে যাবে। মিটার গেজের ট্রেনগুলো

এমনিতেই ছোট, ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে আরও ছোট লাগে। মনে হয় যেন খেলনার ট্রেন।

রামেশ্বরমে একটি বিরাট মন্দির আছে, শুনেছে শমি। ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মন্দিরের অলিন্দে হেঁটে বেড়ালে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে, এতটাই বড়।

সম্ভবত সেই মন্দিরেরই পাঁচ-ছ'জন সন্ন্যাসী একই ট্রেনে ম্যাড্রাস ফিরছেন। প্রত্যেকেরই মুণ্ডিত মস্তক। কপালে তিলক কাটা। শমি দেখে অবাক হয়ে গেল, বয়স্ক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পাঁচ-ছটি বাচ্চা ছেলেও আছে। তাদেরও মাথা ন্যাড়া। টিকি আছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। বাচ্চাগুলোকে দেখে আবার অভিষেকের কথা মনে পড়ে গেল শমির। শমি একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল, তারকনাথ বা অভিষেক নিশ্চয়ই এখানে নেই। থাকলে এভাবে বিক্রমদা ফিরে যেতেন না।

হয়তো সকালেই রাকেশদার কাছে খবর পেয়ে গেছেন বিক্রমদা। সেজন্যই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহলে কোথায় আছে অভিষেক? যারা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেইসব জঙ্গী দস্যুরাও কি ফিরে যাচ্ছে ওদের সন্ধান না পেয়ে?

ট্রেন যখন ছাড়ব ছাড়ব করছে, তখন দৌড়তে দৌড়তে এলেন কে শ্রীকান্ত। এখন আর পুলিশের পোশাক পরে নেই ভদ্রলোক। কালো গেঞ্জি আর নীল জিন্সে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল শমিদের সঙ্গে। বিক্রমদাকে বললেন, আমিও স্যার' চলে যাব ঠিক করলাম। ডি জি-কে ফোন করেছিলাম—তিনি বললেন, ম্যাড্রাস পর্যন্ত আপনার সঙ্গেই থাকতে।

বেশ তো। বিশেষ কথা বাড়ালেন না বিক্রমদা। শমি খেয়াল করল বিক্রমদা গম্ভীর। অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। এখন কোনও প্রশ্ন করলেও উত্তর পাওয়া যাবে না, জানে শমি। আর জানে বলেই চুপ করে রইল। যদিও শমির মনের ভেতর অসংখ্য প্রশ্ন। কেন বিক্রমদা রামেশ্বরম এলেন, কেনই বা চলে যাচ্ছেন এত তাড়াতাড়ি, শমি জানে না। তারকনাথ বা অভিষেক এখানে থাকলে নিশ্চয়ই বিক্রমদা চলে যেতেন না। দু'জনের সামনে ঘোর বিপদ জেনেও বিক্রমদা চলে যাবেন, এমন কথা বিশ্বাস করে না শমি। তাহলে কি অভিষেকেরা এখানে আসেনি? অথবা অভিষেকদের এমন কোনও বিপদ হয়েছে যা বিক্রমদা বলতে পারছেন না?

শমিদের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় রয়েছেন দু'জন সন্ন্যাসী। দু'জনেই চুপচাপ। মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছেন। শমি খেয়াল করল দু'জনের চেহারার ছাঁদ প্রায় একইরকম। শক্তপোক্ত আর পেশীবহুল। রামেশ্বরমের মন্দিরের সন্ন্যাসীদের বোধহয় নিয়মিত শরীরচর্চাও করতে হয়।

বিক্রমদা উঠেই মুখের সামনে বই খুলে ফেলেছেন। শমি একবার উঁকি মেরে বইটা দেখেছে। সফটওয়্যার পাজল। কম্পিউটার সফটওয়্যারের ওপর বিভিন্ন ধরনের ধাঁধা।

ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় টোকা পড়ল।

মে আই কাম ইন স্যার? উঁকি মারছে শ্রীকান্তর মুখ।

ইয়েস কাম ইন।

শমি খেয়াল করল বিক্রমদার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠেও মিলিয়ে গেল। এই কে শ্রীকান্তর হাবভাবও বেশ রহস্যময়! হঠাৎ শমির মনে হলো ম্যাড্রাসে পা দেওয়ার সময়ে তামিল পুলিশদের টিকি মেলেনি। অথচ শ্রীকান্ত এখানে আগে থাকতেই হাজির!

শ্রীকান্ত ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল শমি। ফার্স্ট ক্লাসের করিডোর ধরে হেঁটে বেড়াতে ওর খুব ভালো লাগে।

আমি একটু আসছি বিক্রমদা।

কাছাকাছি থাকিস। শমির চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেছেন বিক্রমদা। শমি বুঝতে পারল কাছাকাছি থাকাটা খুবই জরুরি। নইলে বিক্রমদা এভাবে বলতেন না।

দরজা দিয়ে বেরিয়েই শমি খেয়াল করল ট্রেনটা খুব দুলছে। করিডোর দিয়ে হাঁটাই মুশকিল। উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছেন এক সন্ন্যাসী। তার মানে ওদিকের কামরাতে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা উঠেছেন।

একদিকের দেওয়াল ধরে টলতে টলতে এগোচ্ছে শমি। মিটার গেজের ট্রেন বলেই করিডোর ভীষণ সরু। উল্টোদিক থেকে কেউ এলে দাঁড়িয়ে পড়ে জায়গা দিতে হয়।

শমিকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় তবুও সন্ন্যাসীর গায়ের সঙ্গে গা লেগে গেল শমির। কোমরের কাছে তীব্র খোঁচা, অতিকষ্টে ব্যথাটা হজম করল শমি। সন্ন্যাসীর কোমরে কিছু একটা গোঁজা রয়েছে। ঘুরে তাকাল শমি। জানলা দিয়ে শেষ বিকেলের রোদ আসায় সন্ন্যাসীর জামার নিচে পিস্তলের অবয়ব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল শমি। যা দেখল তা কি সত্যি? নিজের কোমরের ব্যথাটা এখনও চিনচিন করছে। নাঃ, কোনও ভুল নেই।

ফিরে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়তে হলো শমিকে। ওদের কামরার দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছেন দুই সন্ন্যাসী। সম্ভবত ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসেছেন।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল শমি। একটা খাঁড়ির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। জানলার উচ্চতায় চলে এসেছে বাইরের রাস্তা। এখানে বালি ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। রাস্তাটাও গেছে বালির ভেতর দিয়ে।

রামেশ্বরম আসার সময়েও এই অদ্ভুত জায়গাটা খেয়াল করেছিল শমি। ছোটখাটো মরুভূমির মতো জায়গাটা। শুধু বালি, কাঁটাঝোপ। কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই। হয়তো এখানে আগে সমুদ্র ছিল, পরে সরে গেছে।

দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে আসছে একটা জিপ। খুব আস্তে যাচ্ছে ট্রেনটা। জিপটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল বলে!

সন্ন্যাসী দু'জন কথা বলতে বলতে দরজার সামনে থেকে সরে যেতেই শমি এগোতে শুরু করল। সন্ন্যাসীর কোমরে যে পিস্তল দেখেছে সেই কথাটা বিক্রমদাকে জানানো প্রয়োজন। ও ঠিক দেখেছে তো?

কিন্তু কোথায় বিক্রমদা? কামরায় তো নেই! শ্রীকান্ত বেরিয়ে এসেছেন।

তোমার দাদা তো এই ছিলেন। আশেপাশেই আছেন কোথাও!

শ্রীকান্তর কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল ট্রেনটা। আর ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সন্ন্যাসী দু'জনের মধ্যে একজন আরেকজনকে দরজা খুলে ঠেলে ফেলে দিল বাইরে। যাকে ঠেলে ফেলা হলো, সে পড়ে গেল ঠিক একটা প্রাণহীন দেহের মতোই! ব্রেক কষার শব্দের মধ্যেই কি তাহলে সেই সন্ন্যাসী কোমর থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালিয়েছে?

কিছু বুঝে ওঠার আগেই শমি দেখল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীকান্তর হাতেও উঠে এসেছে রিভলবার। সম্পূর্ণ অচেনা, কঠোর গলায় শ্রীকান্ত হিন্দিতে বলল, একদম
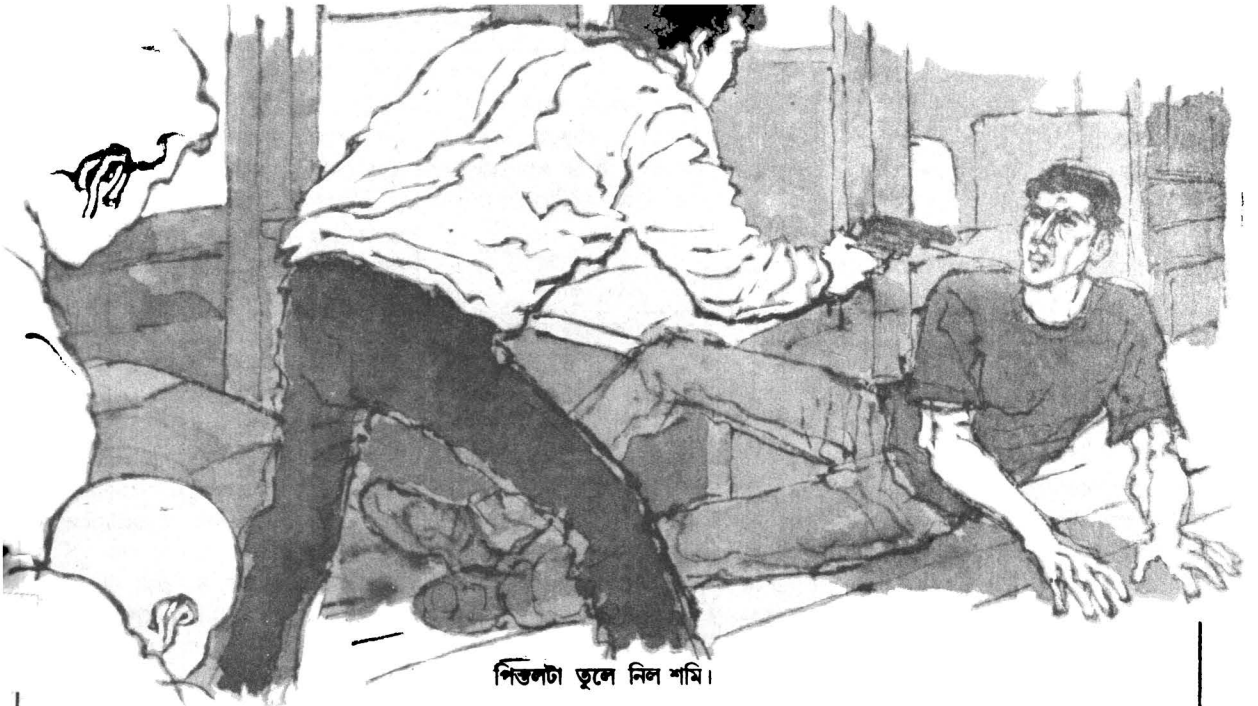
পিস্তলটা তুলে নিল শমি।

নড়বে না। ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সন্ন্যাসীটা ততক্ষণে শ্রীকান্তর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চলো, ও আদমি টয়লেটমে হ্যায়।

শমি বুঝল এরা দুজন বিক্রমদাকেই খুজছে। মুখোমুখি দুটো বাথরুমের দরজার ওপর দিয়েই নির্মম ভাবে গুলি চালাল দু'জন। বিক্রমদা ভেতরে থাকলে কী হবে, তা ভেবে আচমকা হাঁটুতে কোনো জোর পেল না শমি। মনে হলো পড়ে যাবে!

ফিরে আসছে দু'জনেই। এখন শমি বুঝতে পারছে শ্রীকান্তই দলের পাণ্ডা। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই শ্রীকান্তর দলের লোক ছড়িয়ে ছিল। তারা এখন স্বমূর্তি ধরেছে।

শমি দাঁড়িয়ে রয়েছে শরীর শক্ত করে। এদের বিশ্বাস নেই। একটু নড়লেই হয়তো গুলি চালিয়ে দেবে।

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই শমি দেখল বাইরে জিপটা এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক ওদের কামরার পাশেই। ওদিকের একটা কামরা থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে টেনে বের করেছে একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তো নয়, সন্ন্যাসীর পোশাক পরা গুণ্ডা।

ট্রেনের দরজা খুলে ছেলেটাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে গুণ্ডাটা। শমি এবার বুঝল জিপটা কেন এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই ওই জিপে তুলে নিয়ে যাবে ছেলেটাকে। কিন্তু বিক্রমদা? 'এই ছেলেটাই কি তাহলে অভিষেক? তাহলে অভিষেককে ছিনতাই করার জন্যই হানা দিয়েছে জঙ্গী দস্যুরা!

একটু আগে দেখা ট্রেনের দরজা থেকে ফেলে দেওয়া সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল শমির। তাহলে সেই সন্ন্যাসী ছিলেন পুলিশের লোক। ছদ্মবেশে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অভিষেককে। সেই খবর পেয়েই একই ট্রেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিক্রমদা।

অভিষেককে টেনে বের করা যাচ্ছে না দেখে শ্রীকান্ত এদিক থেকে হিন্দিতে চেঁচাল, তুলে নাও, ওকে কোলে তুলে নাও। আমাদের হাতে সময় নেই।

অভিষেককে কোলে তুলতে গিয়ে গুণ্ডাটা আচমকা আর্তনাদ করে উঠল। অভিষেককে ছেড়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। এই সুযোগে অভিষেক হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। লাইনের পাশ দিয়ে দৌড়তে শুরু করল।

আরে, আরে! সজোরে চিৎকার করে উঠে শমির পাশ দিয়ে ছুটে যেতে গেল শ্রীকান্ত।

শমি আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে পারল না। পা বাড়িয়ে দিতেই মুখ থুবড়ে পড়ল শ্রীকান্ত। ছিটকে গেল হাতের পিস্তল।

লাফিয়ে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল শমি। শ্রীকান্ত উঠে বসেছে। মাথার ওপর হাত। দু'চোখে বিষাক্ত দৃষ্টি।

ভেরি গুড শমি। পেছনের দরজা দিয়ে উঠে এসেছেন বিক্রমদা। সঙ্গে অভিষেক।

শমিকে পেরিয়ে শ্রীকান্তর দিকে এগিয়ে গেলেন বিক্রমদা। বললেন, পাশের কামরায় দু'জনকে ঠাণ্ডা করে এসেছি। আপাতত তুমিও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও কেমন?

প্রচণ্ড ঘুঁষিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শ্রীকান্ত। শমি বলল, তার মানে এই শ্রীকান্ত আসলে পুলিশ ছিল না?

বিক্রমদা হাসলেন, প্রথমত এর নাম শ্রীকান্ত নয়। এ হচ্ছে আফজল। দ্বিতীয়ত এ পুলিশে কাজ করবে কি, একেই তা পুলিশ খুঁজছে জঙ্গী কার্যকলাপের জন্য!

পাশে দাঁড়ানো অভিষেকের কাঁধে হাত রেখে বিক্রমদা শমিকে বললেন, এই ছেলেটার দারুণ সাহস। অভিষেকের ভূমিকায় কেমন অভিনয় করল বল তো? যদি ওরা গুলি চালাত!

এ অভিষেক নয়? আকাশ থেকে পড়ল শমি।

নারে, বিক্রমদা বললেন, এবার আমরা অভিষেকের কাছে যাব।

কোথায়?

কেন, রামেশ্বরমে! এই তো জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শমি খেয়াল করেনি, কখন আরও দুটো জিপ ভর্তি পুলিশ এসে পৌঁছে গেছে ট্রেনের পাশে। চার জঙ্গীর সংজ্ঞাহীন দেহ তুলে নেওয়া হলো জিপে। বিক্রমদাকে সাহায্য করার জন্য সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে যে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন, তাঁর পাঁজরা

ঘেঁষে গুলিটা চলে গেছে। তাঁকে নিয়ে আগেই একটা জিপ চলে গেল হাসপাতালে।

ছবিটা এখনও পরিষ্কার হয়নি শমির কাছে। তাহলে অভিষেক রয়েছে কোথায়?

শমিদের নিয়ে জিপ এসে থামল রামেশ্বরমের বিখ্যাত মন্দিরের সামনে। এই মন্দির যে কত বড় তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় বাইরে থেকেই। বাইরে জুতো খুলে ঢুকতে হলো শমিদের।

মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছিল পুলিশের জিপ। মন্দিরের ভেতর ঢুকে অলিন্দর ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শমির মনে হলো, একা ছেড়ে দিলে ও নির্ঘাৎ পথ হারিয়ে ফেলবে।

অলিন্দের কোণে শুধু আলো জ্বলছে। দু'দিকের দেওয়ালে, এমনকি মাথার ওপরের ছাদেও সুন্দর সুন্দর ফ্রেসকো। সব দেব-দেবীর ছবি।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ধরে ধরে আঁকা হয়েছে সেইসব ছবি। আলো-অন্ধকারের মধ্যে সেইসব ছবি আঁকা অলিন্দের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলেই কেমন যেন গা ছমছম করে।

দু'বার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হলো। এই মন্দিরের নিচেও তার মানে পাতাল-কুঠরী আছে। নিচের একটি ছোট্ট ঘরে আলো জ্বলছে। কম্পিউটারের সামনে বসেছিল একটি বাচ্চা ছেলে। ঘরে একটা ডাবলবেড খাটও রয়েছে, যার ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। বিক্রমদাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, আসুন আসুন ক্যাপ্টেন মুখার্জি। আপনারা আসছিলেন না, আমার চিন্তা হচ্ছিল।

সব ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই। বিক্রমদা হেসে বললেন, শমি, ইনি হচ্ছেন তারকনাথ মজুমদার আর এই হচ্ছে অভিষেক।

শমি অবাক হয়ে দেখছিল ছেলেটাকে। কত আর বয়স হবে? কিন্তু এইটুকু ছেলের কি মনোসংযোগ! কম্পিউটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে অভিষেক। এতগুলো লোক যে ঘরে ঢুকেছে, তা খেয়ালই করল না। কিন্তু বিক্রমদা যেই বললেন, পাসওয়ার্ডটা খুঁজে পেলে অভিষেক? সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গেল শমিদের দিকে। প্রথমে শমি, পরে বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে অভিষেক কচি গলায় জোর দিয়ে বলল, পেয়েছি। কিন্তু ওটাকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

বিক্রমদা পিঠ চাপড়ে দিলেন অভিষেকের। বললেন, একেবারে ঠিক কাজ করেছ। পৃথিবী ধ্বংস করার পাসওয়ার্ডকে কম্পিউটারে না রাখাই ভালো। বেশ করেছ।

॥ ১০ ॥

সুবীর মিত্র যে আসলে ডাবল এজেন্ট, তা সবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন বৃদ্ধ শিবপ্রসাদ মজুমদার। স্রেফ এটা বুঝতে পারার জন্যই তাঁকে প্রাণ হারাতে হলো। অবশ্য তার আগেই তিনি ছেলে তারকনাথকে সাবধান করে দিতে পেরেছিলেন।

দম নেওয়ার জন্য একটু থামলেন বিক্রমদা। শমিরা এসেছে বৈদ্যবাটিতে। শিবপ্রসাদের আমবাগানে। সেখানেই রহস্যর জট ছাড়াচ্ছেন বিক্রমদা।

জল খেয়ে বিক্রমদা শুরু করলেন। বললেন, শুরুর দিকের ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। অভিষেক ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট দেখতে দেখতেই আচমকা সন্ধান পেয়ে যায় ডেসট্রাকশন ডট কম-এর। এটা উগ্রপন্থীদের নিজস্ব ওয়েবপেজ। দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো এদের কার্যকলাপ। তাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই উগ্রপন্থীরা বেছে নিয়েছিল ইন্টারনেটকে। এই ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড ছাড়া ঢোকা যায় না। অভিষেক হচ্ছে কম্পিউটার-কিড। ও পেরেছিল। আর এই পারার ফলেই ও জেনে যায় এক জঘন্য চক্রান্তের কথা। উগ্রপন্থীরা বানাচ্ছে এমন এক মাস্টার-পাসওয়ার্ড, যার দ্বারা ভারতের সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর একথা কে না জানে, ভারতের যা পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাই দিয়ে গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব!

বিক্রমদা এবার থেমে তারকনাথের দিকে তাকালেন। বললেন, গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে সুবীর মিত্রর কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়েই আপনি ভুলটা করেছিলেন। সুবীর মিত্র আপনাকে গা ঢাকা দেওয়ার পরামর্শ দেয়। আপনি চলে আসেন বৈদ্যবাটিতে। জঙ্গীরা অভিষেকের বদলে ভুল করে সুবীর মিত্রর ছেলে সমুকে ধরে নিয়ে যায়। এর ফলে সুবীর মিত্রর সঙ্গে অপরাধীদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সুবীর মিত্র আগুন নিয়ে খেলতে গিয়েছিল। চেয়েছিল আপনাদের সন্ধান দিয়ে ওদের কাছ থেকে টাকা নেবে। অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে সুবীর মিত্র জানতে পারে একটা সি ডি-র কথা, যাতে জঙ্গীদের ওয়েবপেজ রেকর্ড করে রেখেছিল অভিষেক। সুবীর মিত্রর খোঁজখবর নেওয়ার ভঙ্গি দেখেই সন্দেহ হয় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ শিবপ্রসাদের। তিনি তখন ছেলে আর নাতিকে দূরে চলে যাওয়ার বুদ্ধি দেন। কিন্তু দূরে যেখানেই যাক, অভিষেক কোথাও নিরাপদ নয়। তখন শিবপ্রসাদ যোগাযোগ করেন রামেশ্বরম মন্দিরের প্রধান সন্ন্যাসীর সঙ্গে। এই মন্দিরের সঙ্গে শিবপ্রসাদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। বছরে একবার, দুবার তিনি যেতেন রামেশ্বরম। মাসে মাসে সাহায্য হিসেবে টাকাও পাঠাতেন। তারকনাথ আর অভিষেক রওনা হয়ে যাওয়ার পর শিবপ্রসাদ ঠিক করেন সব কথা পুলিশকে জানাবেন। সেইমতো চিঠিও লিখতে শুরু করেছিলেন পুলিশ কমিশনারকে। সি পি তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এই চিঠি লেখার সময়েই হানা দেয় সুবীর মিত্র। শিবপ্রসাদের চিঠি অসমাপ্ত থাকে। তার আগেই তিনি মারা যান। এদিকে জঙ্গীরা কাজ হাসিল হওয়ার পর সরিয়ে দেয় সুবীরকে। অভিষেকের হটমেল অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে বন্ধু সেজে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। তারকবাবুর ঘরের তালা ভেঙে অভিষেকের কম্পিউটার খুলেই আমি বুঝতে পারি যে কেউ একজন এর মধ্যে হাত দিয়েছিল কম্পিউটারে। অভিষেককে আমিও ই-মেল পাঠাই। সাবধান করে দিই। কিন্তু জঙ্গীরা ঠিকই সন্ধান পেয়ে যায় রামেশ্বরমের মন্দিরের। সেখানেও ওদের লোক ছিল। সেজন্যই পাল্টা চাল চালতে হয়। মন্দিরে গোপনীয়তার সঙ্গে রটিয়ে দেওয়া হয় যে অভিষেককে খুদে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে। জঙ্গীরা এই ফাঁদে পা দেয়। তার পরের ঘটনা তো সবার জানা।

রাকেশদা বললেন, শুধু একটাই ঘটনা যে অজানা থেকে গেল।

কি?

পাসওয়ার্ডটা কি ছিল?

বিক্রমদা হাসলেন, ওটা শুধু অভিষেকই জানে। আর ও জানলে তো কোনো ক্ষতি নেই। পৃথিবী তাতে ধ্বংস হবে না। সবার মঙ্গলই হবে।

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

কুষ্মাণ্ড মাহাত্ম্য

শক্তিপদ রাজগুরু

ম্যাপের বাইরে কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে দামোদরের বালিয়াড়ি পার হয়ে শালিখপোঁতা। আমরা যেতে চাইনি সেখানে। পটলা তো সাফ বলে দেয়, নট গোয়িং। ইদানীং পটলা সাধ্যমতো ইংরাজীতেই বাতচিত করে। কারণ বাংলা ভাষাটা তার জিভে এমন জড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে যে লোকে হাসে। আড়ালে বলে তোতলা। তাই এখন সে বঙ্গভাষা প্রসার আন্দোলনেও ইংরাজীর প্রচলনই রাখতে চায়।

পটলা বেঁকে বসতে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাকি সভ্য অর্থাৎ আমি আর হোঁৎকা যেতে চাই না। হোঁৎকা বলে, নিখিল বঙ্গ কুমড়ো ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক উৎসব ওই শালিখপোঁতায়, আমরা কি করুম সেখানে?

আমারও যাবার তেমন আগ্রহ ছিল না। আমরা কেউ কুমড়ো ব্যবসায়ী নই, উপরন্তু কুমড়োর ঘ্যাঁট দেখলেই আমার আতঙ্ক জাগে। কি করব? গোবর্ধনের মামা ওই কুমড়ো সমিতির প্রেসিডেন্ট, এখানের বিরাট কুমড়ো মার্চেন্ট। গোবর্ধন আবার আমাদের ক্লাবের মেম্বার। ওই সমিতির বার্ষিক সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। গোবর্ধন তার উদ্যোক্তা। ক্লাবের আরেক সভ্য আর গায়ক ফটিককে সে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। সঙ্গে হোঁৎকা যদি তার দেশজ ভাষায় কমিক স্কেচ করে—ওকেই জীবিত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলে চালিয়ে দেবে শালিখপোঁতায়।

ফটিক এমন কুমড়ো সমিতির অনুষ্ঠান মিস করতে চায় না। তাই সে বলে, এখান থেকে গাড়িতে করে যাবি। একটা রাত থেকে পরদিন ফেরা যাবে। বেশ হৈচৈ হবে, চল না। গোবর্ধন তার সঙ্গে যোগ করে, একদম ভিলেজ, মানে পাড়াগাঁ। সিনসিনারি খুব ভালো রে। আর হোঁৎকা, সমিতির সেক্রেটারির বাড়িতে যা জোর খ্যাঁটটা হবে না! পুকুরের মাছ, তাজা মুর্গি। আমাকেও বলে, ওখানে বৌদ্ধ আমলের কোন রাজার গড় আছে। সেই রাজার গড়ে এখনও অনেক কিছু দেখার আছে। প্রাচীন অনেক কিছু—

টোপ গেলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর থাকে না। শেষ অবধি পটলাকে বলি, চল, এত করে বলছে যখন ঘুরেই আসি। আমরা রাজী হতে ফটিক বলে, তোরা যাচ্ছিস তাই ভরসা করে যাচ্ছি রে।

অবশ্য ফটিকের ফাংশনে ভয় আমাদেরই। আগেও দু'একবার তো দেখেছি, ক্লাবের ফাংশনে ওর গান শুনে খুশি হয়ে লোকে টম্যাটো-পচা ডিম উপহার দিয়েছে, কেউ আবার খুশিতে ঢিল-পাটকেলও ছুঁড়েছে, সে সব সামলাতে হয়েছে আমাদেরই। কুমড়ো সমিতির ফাংশনে যদি তেমনি কেউ কুমড়ো ছোঁড়ে তাহলেই গেছি। তবু যেতে রাজী হয়ে যাই।

তারকেশ্বর অবধি চেনা পথ। তবে পথের যা অবস্থা তাতে পথ না চষা মাঠ তা বোঝার উপায় নাই। একটা ছোট ভ্যানে যাচ্ছি আমরা। ফটিক ইদানীং গানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে নাচের তালিমও দিচ্ছিল পাড়ার ছোটদের। পাড়ার সেই

কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও চলেছে। তারা ফটিকের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য করবে। হোঁৎকা বলে, একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। ফটকে নিজে কি শেখছে তাই জিগা, ও আবার নৃত্যনাট্য করবো। দর্শকগো আমাগোরই ফিনিস্ না কইরা দেয়।

সত্যি ভাবনার কথা। ওই বাচ্চাদের নিয়ে বিপদে না পড়ি।

তারকেশ্বর অবধি তবু ভাঙা ফুটো রাস্তা দিয়ে গেলাম। গাড়িই সারা পথ নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করে গেল। কখনও কথক, কখনও কথাকলি, কখনও বা তাণ্ডব নৃত্য। মুড়ির টিনে মুড়ি পুরে জোরে ঝাঁকালে মুড়িগুলোর যা অবস্থা হয়, আমাদের অবস্থাও তেমনি। কলকাতা থেকে সকালে যা খেয়ে বের হয়েছিলাম, বাবা তারকনাথের কাছাকাছি আসার আগেই সব শেষ।

হোঁৎকা বলে, ক্ষুধা পাইছে। গাড়ি থামা।

গোবর্ধন এমনিতে হিসাবী। কমিটি তার কাছে জলখাবারের খরচা কিছু দেয়নি, গাড়ি দিয়েছে মাত্র। তাই গোবরা বলে, আর বেশি দূর না। দামোদর পার হয়ে এইটুন পথ।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, রাখ তোর দামোদর। গাড়ি থামা। ফটকে, ফিইরা চল ট্রেনে। লিভার ফ্যাংশন ঠিক না হইলে, ফ্যাংশন হইব না। ক্ষুধা পাইছে।

সমূহ বিপদ। অগত্যা পথের ধারে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে সেখানে আর কিছু না পেয়ে মুড়ি, আলুর চপ আর দু'দিনের বাসি রসগোল্লার স্টকই শেষ করা গেল। দোকানদারও এমন রসালো পার্টি পেয়ে কাঁচালঙ্কা, পিঁয়াজ, শেষপাতে তিনদিনের বাসি রসগোল্লার রসটা ফ্রি দিয়ে দিল। মুড়ির সঙ্গে তাই খেয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো।

এ পথে গাড়ি বোধহয় এই প্রথম চলেছে। যা যায় তা কুমড়ো আর আলু বোঝাই ট্রাক, তারও দু'একটাকে দেখলাম মাটির সড়ক থেকে ছিটকে চার চাকা উপর হয়ে পড়ে আছে, আর মাঠময় শ্রেফ হরেক সাইজের কুমড়ো গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেখে মনে হলো কুমড়োই যেন এখানের জাতীয় ফসল। মাঠে মাঠে ছড়িয়ে আছে কুমড়ো। মড়ার মাথার সাইজ থেকে শবযাত্রায় যে খোল বাজিয়ে কেত্তন গাওয়া হয়, তেমনি খোলের সাইজের কুমড়োও আছে। কোনোটা বেশ কালচে সবুজ, কোনোটা ঘন সবুজ, কেউ আধা হলদে, কেউ পুরো।

শুধু মাঠের মাটিতে নয়, গ্রামের প্রতি ঘরের চালেও দেখি চালকুমড়ো। সেগুলোও যেন পাউডার মেখে সেজেগুজে রোদ পোয়াচ্ছে। গোবর্ধন বলে, এবার কুমড়োর ফলন বেশ ভালই রে। ওদিকে ফটিক কি বলতে যাচ্ছিল, গাড়িটা আচমকা চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গোঁৎ খেয়ে আবার ঝটকা মেরে সিধে হতে ফটিকও ছিটকে পড়ে—ওফ, বাপরে। হোঁৎকা কোনোরকমে সামলেছে। ড্রাইভারকে বলে, এভাবে গাড়ি নে যাবা? যা রাস্তা!

এবার দেখি রাস্তার হাল। দু'দিকেই ডোবা-পুকুর। সব পানায় ঢাকা। কত গভীর কে জানে। পড়লে কচুরিপানার জঙ্গলেই হারিয়ে যাবো। গোবর্ধনের সঙ্গে ছিল কুমড়ো কমিটির এক মেম্বার। শীর্ণ লগার মতো পটকা মার্কা চেহারা। সে বলে, হ্যাঁ, গাড়ি যাবে। কুমড়োর গাড়ি যায় মাল নে আসতে।

ড্রাইভার বলে, এ তো মানুষের গাড়ি। ডোবায় নামলে বিপদ হবে। আর কতটা পথ?

লোকটা আঙুল দেখায়, ওই যে হোথায় নদীর বাঁধ দেখছনি?

কোনোমতে রামনাম জপ করতে করতে নদীর বাঁধের নিচে এসে পৌঁছলাম। কয়েকটা দোকান, বসতি রয়েছে। আর খড়ের চালায় শ্রেফ কুমড়ো। ওদিকে একটা কোল্ড স্টোরেজও রয়েছে।

এখানে গাড়ি রেখে এবার নদী পার হয়ে ওদিকে আরও দু'মাইল গেলে তবে শালিখপোঁতা। গোবর্ধন বলে, এই তো নদী পার হয়ে বাঁধ ধরে গেলেই ব্যস। দু'মাইল মানে এক ক্রোশ।

আমি বলি, একা নদী ষোল ক্রোশ। এখনও সতের ক্রোশ পথ যেতে হবে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, ফটিক, তরে মার্ডার করুম। এহানে কে তর গান শুনবো, কেউবা তগোর নেত্য দেখবো? ফিইরা চল।

ফেরার তেলের পয়সা কুমড়ো পার্টির অফিসে, তাই যেমন করেই হোক টেনে হিঁচড়ে শালিখপোঁতা যেতেই হবে। তাই নদীর হাঁটুভোর বালি ভেঙে চলেছি হাঁপাতে হাঁপাতে। জল এইটুন, বাকি সব ধুধু বালি।

ভুজঙ্গ দারোগা শালিখপোঁতায় এসে বেশ আরামেই ছিল। গ্রামটার চারিদিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ। সরু চিলতে ইঁটের স্তূপ, তাতে বনজঙ্গল গজিয়েছে। এককালে ছিল কোন সামন্ত রাজার রাজধানী, প্রাসাদ। সব এখন ওই বনজঙ্গলে ভরা। দু'একটা মন্দির রয়েছে। কোনটায় দেবতা কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছেন কিঞ্চিৎ আলোচাল সেবা করে। কোনটা পতিত, সাপখোপের ডিপো। ভুজঙ্গ দারোগা এখানে এসে খাঁটি দুধ, ডিম, মাছ, মাংস সেবন করে আর ঝিমোয়। হঠাৎ তার টনক নড়েছে।

কুমড়ো সমিতির বার্ষিক উৎসব হচ্ছে এখানে, আর উদ্বোধন করতে আসছেন কোন মন্ত্রী। তাই ক'দিন ধরে ধ্বজামার্কা ক'জন সেপাইকে থানার মাঠে দাঁড় করিয়ে লেফট রাইট করাচ্ছে। দুটো রাইফেলকে সাফসুতরো করে ওদের দিয়েছে। কিন্তু ওরা বহুদিন পর রাইফেল নিয়ে চলতে হিমসিম খাচ্ছে। দারোগাবাবু তারকেশ্বর বাজার থেকে ব্রাশো আনিয়ে জং ধরা পিতলের বেল্ট-বোতাম এসব সাফ করাচ্ছে।

কুমড়ো সমিতির মেম্বাররা আসবে, নাচগান হবে, সারা এলাকার যেন ঘুম ভেঙেছে। তারা এখন থেকেই সামিয়ানা টাঙানো, স্টেজ বাঁধা দেখতে ভিড় করেছে। স্কুলবাড়ির ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কুমড়ো পার্টির অতিথিদের। সেখানে রান্নার আয়োজন হচ্ছে।

দারোগাবাবুও ব্যস্ত। এমনি দিনেই ঘটনাটা ঘটে যায়। কুমড়ো সমিতির সেক্রেটারিই এখানকার জমিদার। ওদের মন্দিরে ছিল প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো এক বিষ্ণুমূর্তি। অষ্টধাতুর তৈরি

সেই প্রাচীন মূর্তিকে এদের পূর্বপুরুষ কোন পুকুর খুঁড়তে গিয়ে উদ্ধার করেছিল। সেই মূর্তির দাম নাকি পঞ্চাশ লাখ টাকা। তবু এরা সেটা হাতছাড়া করেনি। সেই মূর্তিই হঠাৎ দু'দিন আগে চুরি হয়ে গেছে। আর তাই নিয়ে এরই মধ্যে খবরের কাগজে উঠেছে এখানের খবর। খোদ এস-পি সাহেব আসছেন তদন্তে। কারণ ঐ মন্ত্রীর মামার বাড়িতেই চুরি হয়েছে এই মহামূল্যবান মূর্তি।

ভুজঙ্গ দারোগার কাছে কড়া ভাষায় মেসেজ এসেছে। চোরদের ধরতেই হবে। তাই ভুজঙ্গ দারোগা চারিদিকে কড়া পাহারা রেখেছে, যেন মূর্তি নিয়ে কেউ চলে যেতে না পারে। বাঁধের ওপরেও রয়েছে পাহারা। আমাদের দলকে দেখে কে হুঙ্কার ছাড়ে, হল্ট!

আমরা থামলাম। ওদিক থেকে বিড়ালের ল্যাজমার্কা গোঁফওয়ালা দারোগা এসে আমাদের দেখে শুধোয়, কোথা থেকে আ-আ-আসা হচ্ছে? এখানে কি ব্যা-ব্যা-ব্যাপার? গোবর্ধনের সেই লম্বুমার্কা মেম্বারই সব কথা জানাতে দারোগা আমাদের নিরীক্ষণ করে বলে, খুব সা-সাবধান। কোনো বে-বে-বেচাল দেখলে অ্যা-অ্যারেস্ট করবো।

পটলা শুধোয়, হোয়াট ইজ ইট? কি-কি—

চোপ! গর্জে ওঠে দারোগা—আমাকে ভ-ভ-ভ্যাংচানো হচ্ছে? ফ-ফাজিল ছোকরা?

অনেক লোককেই তোতলা হতে দেখেছি, কিন্তু কখনও তোতলা দারোগা দেখিনি। বলি—ও আপনার মতোই স্যার। জিবটার ব্রেক্ ফেল করে ওরও। সরি!

আমরা এবার ছাড়া পেয়ে গ্রামে ঢুকলাম। ওদিকে কলাগাছ, ঘট, তার উপর ডাব নয়, ডাবের সাইজের কুমড়ো। হোঁৎকা বলে, পুলিশ এত ক্যান রে?

খবরটা আমরাও জানতে পারি। এখানে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দামের প্রচীন মূর্তি চুরি হয়ে গেছে।

ভুজঙ্গ দারোগা বসে নেই। বড়সাহেব এখানের জমিদারের মন্ত্রী ভাগ্নেকে তার এলেম দেখাবার জন্য এর মধ্যে

গাড়োয়ানকে সপাটে একটা চড় মারে

আশপাশের গ্রামের ডজন খানেক ছিঁচকে চোরদের ধরে এনে ফটকে পুরে গর্জাচ্ছে, তু-তুই জানিস। বল কোথায় সেই মৃ-মূর্তি!

গবা হাঁড়ি দাগী চোর। তার গায়ে রেড়ির তেল এখনও শুকোয়নি। সে বলে, আমরা গেরস্থের ঘটি-বাটি নিই হুজুর। ওসব ঠাকুর-দ্যাবতা নে কি করবো?

নন্দ বারুই বলে, নিজেরাই খেতে পাই না, ঠাকুর-দ্যাবতার সেবা জুটুবো কোত্থেকে? ওসব ফ্যাসাদে কেনে যাবো বলেন?

ওদের কারোর কাজ যে নয়, তা বোঝে দারোগা সাহেব। কিন্তু সে এবার বিপদেই পড়েছে। হন্যে হয়ে সারা গাঁয়ের ডোবা, পুকুরে জাল ফেলছে। কই, চ্যাং, ল্যাঠা মাছই ওঠে। সেই মূর্তি আর ওঠে না।

গ্রামটা ঘুরতে বের হই আমরা পঞ্চপাণ্ডব। গ্রাম নয়, যেন কুমড়োর কারখানা। সারা এলাকার কুমড়ো, চালকুমড়ো আসে এখানে। বহু জায়গায় দেখি আখের শালের মতো বড় বড় কড়াই-এ কুমড়ো সেদ্ধ হবার পর হাত পা দিয়ে সেইগুলো চটকানো হচ্ছে, তারপর আবার দলাই-মালাই করে সেগুলো ক্বাথের মতো করে টিনবন্দী করা হচ্ছে। কুমড়োর এহেন অবস্থা দেখিনি। গোবর্ধন বলে, ওর থেকে টম্যাটো সস তৈরি হবে।

কুমড়োর টম্যাটো সস?

গোবর্ধন বলে, ওতে রং মিশিয়ে টম্যাটো সস করা হবে। টম্যাটোর কত দাম জানিস?

কুমড়োর মহিমা অপার। অন্যত্র দেখি স্রেফ চালকুমড়োর পাহাড়। সেগুলোও কেটে পিস পিস করে সেদ্ধ করা হচ্ছে। ওর থেকে চালকুমড়োর মিঠাই হবে।

কুমড়ো সমিতির মিটিং-এ তখন মন্ত্রী মশায় তারস্বরে কুমড়োর মহিমা কীর্তন করে চলেছেন। আয়রন-প্রোটিন কতরকম ভিটামিন-ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে ওই কুমড়োর মধ্যে তারই বর্ণনা করে দেশবাসীকে কুমড়ো উৎপাদনের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োজিত করতে বলেন!

কুমড়ো মাহাত্ম্য বক্তৃতার পর্ব মিটল। এরপর ফটিকদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। আমরা রেডি হয়ে আছি, কখন কি হয় অবস্থা। এই বোধহয় টম্যাটো, পচা ডিম পড়ল! এটা কুমড়োর দেশ। আস্ত কুমড়ো শূন্যপথে ধেয়ে এলেও আসতে পারে। কারণ ফটিকের ফাংশন শান্তিতে শেষ হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখানে সেটা শেষ হলো। দর্শকরাও এবার হ্যারিকেনের পলতে উসকে আলো নিয়ে দল বেঁধে যে যার ঘরের দিকে গেল। ফটিক বলে, ক্যামন ফাংশন হলো বল। একেবারে পিনড্রপ সায়লেন্স।

পটলা বলে, ওরা সব ঘুমিয়ে প-পড়েছিল।

শান্তিতে অনুষ্ঠান শেষ হলো। প্রেসিডেন্ট গোবর্ধনের মামা, ওই কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারিও খুব খুশি। তারপর দিন দুপুরে ভূরিভোজনের পর এবার ফেরার পালা। পুকুরের মাছই কতরকম। ইয়া ট্যাংরা, রুই, সরেস গলদাচিংড়ি, তার ওপর পায়েস, রসগোল্লা—আয়োজন প্রচুর। ফিরছি। তার আগেই গরুর গাড়িতে করে এরা সামান্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে নদীর এপারে। ওখানেই গাড়ি থাকবে।

হেঁটে নদী পার হয়ে এসে দেখি গরুর গাড়িতে ছোট-বড় খোলের মতো সাইজের আট-দশটা কুমড়ো। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের চেহারাটা মুষকো। ইয়া গোঁফ, চোখ দুটো লাল করমচার মতো। ওদিকে আজ কমিটি আমাদের জন্য তারকেশ্বর থেকে অন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছে। সেই ভ্যানের ড্রাইভার আর গাড়োয়ান দু'জনে কি কথা বলছে আর আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে।

শীতের বেলা, তাড়াতাড়ি দিন শেষ হয়। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যার আবেশ নামে নদীর বুকে। তাড়া দিই ড্রাইভারকে, চলো। কলকাতা ফিরতে রাত হবে।

ড্রাইভার যেন কানেই শোনে না। সে বনেট খুলে কি নাড়াচাড়া করছে। ওদিকে সন্ধ্যা নামছে বালুচরে। ড্রাইভার এবার গাড়ি ছাড়ল। ভ্যানের মেঝেতে বেশ কয়েকটা কুমড়ো, গাদাগাদি করে আমরা। তবু একখানা করে কুমড়ো রোজগার করে চলেছি।

গাড়ি চলছে সেই খানা ডোবা বাঁশবনের বুক চিরে। গাড়ির সামনে ড্রাইভার, ক্লিনার আর গাড়ির সঙ্গে আসা লোকটাও রয়েছে। ও নাকি শেওড়াফুলির আড়তে থাকে, সেখানেই নেমে যাবে।

সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তাটা নির্জন। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক অন্ধকার বাঁশবন ভেদ করে এসে গাড়িটাকে ঘিরে দমাদ্দম লাঠি মারতে থাকে। সামনে ফাঁকা রাস্তা। চিৎকার করি—ডাকাত ডাকাত! পটলা বলে, গ-গাড়ি ছোটাও। কুইক। কিন্তু গাড়ি তবু স্টার্ট নেয় না। আমাদের চিৎকারে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কিছু লোকজন হৈহৈ করে ছুটে আসে। ওদের দেখেই বোধহয় সেই ডাকাতের দল বনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

আমরাও অবাক হই। ডাকাতরা কিইবা নিতো! তবু ডাকাত—ডাকাতই। তারা চলে যেতে গ্রামের মানুষজন মিলে ঠেলতে ইঞ্জিনটা চালু হয়। পটলা বলে, সো-সোজা ক্যালকাটা।

তারকেশ্বর ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে। রাত্রির অন্ধকারে গাড়িটা ছুটছে। ঝিমুনি আসে। হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে গাড়িটা আবার থেমে যায় মাঠের মধ্যে। এবার একটা গাড়ি এসে সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যায় গাড়ি থেকে চার-পাঁচজন নেমে আমাদের গাড়িতে এসে ওঠে। ওরা কি যেন খুঁজছে। একজন তো ফটিকের তানপুরাটাই আছড়ে ভেঙে ফেলে। ফটিক আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটা ধমকায়, চোপ। চেল্লালে খতম করে দোব। ওর হাতে ভোজালি। অন্য আরেকজন গাড়ির মধ্যে থেকে লাথি মেরে কুমড়োগুলোকে ফেলে দিতে চায়। একজন আমাদের ব্যাগগুলো হাঁটকাচ্ছে।

এমন সময় দূরে হাইওয়েতে পুলিশের জিপের লাল আলো আর হুটারের শব্দ শুনতেই ওরা নেমে পড়ে। রাস্তায় ছিটকে পড়া দুটো ফুলসাইজ কুমড়ো তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠে পালায়।

পুলিশের গাড়িটা আসতে দেখে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এবার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ফুলস্পিডে দৌড়তে থাকে। আমরা চিৎকার করি—গাড়ি থামাও, পুলিশকে জানাতে হবে ডাকাতির কথা। কিন্তু কে শোনে আমাদের কথা? সোজা বের হয়ে এসে শেওড়াফুলিতে ঢুকল। এখানে সঙ্গে আসা লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার চলেছি আমরা।

গাড়িতে দু'দুবার ডাকাত পড়েছে। শেষবারের দলটা ছিল অনেক হিংস্র। হোঁৎকাকে মেরেছে। পটলার নাকে একটা ঘুঁষি ঝেড়েছে। ফটিকের তানপুরার শোক তখনও যায়নি। একটা ঘুঁষির চোটে চোখের উপর আব গজিয়ে গেছে। গালে চড়ের দাগ। তবু বলে, এমন সুন্দর তানপুরাটা গেল রে! হুগলির লাউ।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, চুপ মাইরা থাক। লাউ-কুমড়োর নাম করবি না। কুমড়োর পার্টির জন্যই মার খাইছি।

ওদিকে ড্রাইভার তখন একটা ধাবায় দাঁড়িয়েছে। তাকে বলি, আর দেরি কেন ড্রাইভার সাব? কলকাতায় ছেড়ে দিয়েই খেতে। ড্রাইভার কোনো কথাই বলে না। গিয়ে খাটিয়াতে বসল। ক্লিনার বলে, ইঞ্জিনে পেট্রল দিতে হয়। ড্রাইভারের পেটেও খাবার লাগে বাবু। খেয়ে নিই। দেরি হবে না।

এরা যেন কলকাতা যেতেই চায় না। ধাবায় শুয়ে-বসে তারপর খাবার খেয়ে নেয় ওরা। আমাদের পেটে তখন খোল-কর্তাল বাজছে। কিন্তু কমিটি পথের

খরচের পয়সা দেয়নি। যেন স্রেফ হাওয়া খেয়েই যাবে। ফাংশনের পর শিল্পীদের কদর আর থাকে না।

গাড়ি ছাড়তে একঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। চারিদিক নিঝঝুম। অন্ধকার। হঠাৎ পথের ওপর কারা গাছ ফেলে রেখেছে দেখে গাড়িটা থামাতেই আবার দু'দিক থেকে কয়েকজন লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। তাদের মধ্যে দেখি সেই গাড়োয়ানও রয়েছে। ওরা আমাদের ব্যাগ, তবলার কেস, মায় কুমড়োগুলোও রাস্তায় ফেলছে। বারবারই আমরা ডাকাতের পাল্লাতেই পড়ছি। এবার আর বাধা দেবার চেষ্টাও করি না। কুমড়ো নিয়েই যদি খুশি হয় হোক।

এমন সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা পুলিশ ভ্যান এসে হাজির হয়। আমরা চিৎকার করি—ডাকাত, ডাকাত। ফটিক, গোবর্ধন মরিয়া হয়ে দু'জনকে ধরে ফেলে। আমিও হাতের কাছে একটা ইট কুড়িয়ে সেই গাড়োয়ানের ঘাড়ে জোরে একটা আঘাত করতে সে ছিটকে পড়ে।

ততক্ষণে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে গাড়িটাকে।

ওই কুমড়ো, ভাঙা তানপুরা ও অন্য মাল সমেত গাড়িটাকে থানায় আনা হলো। দারোগাবাবু আমাদের মুখে সব শুনে বলেন, কুমড়োর জন্যই ডাকাতি! কোথা থেকে আসছ তোমরা?

শালিখপোঁতা থেকে। ওরাই ক'টা কুমড়ো দিয়েছিল। ওই লোকটাই গাড়িতে করে এনে তুলে দেয়। তারপর মাঝপথে ও নেমে যায়। আর ড্রাইভার ধাবাতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি করে, যাতে ওই লোকটা দলবল এনে ডাকাতি করার সময় পায়।

দারোগাবাবু কি ভাবছেন। বলেন, শালিখপোঁতা থেকে আসছো? তারপরই কুমড়োগুলোকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। বিশাল সাইজের কুমড়ো। হঠাৎ একটা কুমড়োর গায়ে সরু দাগ দেখে সেটাকে ধরে টানতে কুমড়োর কিছুটা অংশ উঠে আসে। তার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দারোগাবাবু সাবধানে একটা ইঞ্চি ছয়েক সাইজের অষ্টধাতুর মূর্তি বের করে টেবিলে রাখেন। গোবরা এর আগে শালিখপোঁতায় এসেছে, মন্দিরে ওই মূর্তি সে দেখেছে। ওই প্রাচীন মূল্যবান মূর্তিটাই চুরি হয়েছে আর সেটা বের হলো এখানে ওই বিশাল কুমড়োর মধ্যে থেকে!

গোবর্ধন বলে, এই মূর্তিটাই চুরি হয়েছে ওখানে। পঞ্চাশ লাখ টাকা দাম।

দারোগাবাবু ওই রাতেই শালিখপোঁতা থানায় রেডিও মেসেজ দিতে ভোরেই ওখান থেকে দারোগাবাবু, সেই মন্দিরের মালিক কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারিবাবু, গোবরার মামা, গ্রামের দু'একজন লোক এসে পড়ে। তারা মূর্তি শনাক্ত করে আর ভুজঙ্গ দারোগা সেই গাড়োয়ানকে সপাটে একটা চড় মেরে বলে, ব্যাটা তখন বললি কিছুই জানি নে। ছিঁচকে চুরি করি, ঠাকুর-দেবতাকে ছুঁই না। এখন!

একা ওই গাড়োয়ানই নয়, তদন্তে বের হয় গ্রামের দু'একজন এমন কী ওই ড্রাইভারও জড়িত। তারাই বারবার চেষ্টা করেছিল কুমড়োটা নিয়ে যেতে কিন্তু অন্য কুমড়োর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় ঠিক মাল বাছতে পারেনি। তাই এবার সব কুমড়োগুলো নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে যায়।

কুমড়ো পার্টির সেক্রেটারি, পুলিশ সাহেব, দারোগাবাবু সকলেই খুব খুশি। আমরা নাকি শালিখপোঁতা গ্রামকে চরম অকল্যাণের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। গোবরার মামা বলেছে, আমাদের ক্লাবের বালক ভোজনে বরাবর ফ্রিতে কুমড়ো সাপ্লাই দেবে।

ছবি : জুরান নাথ

আসল ছেলেবেলা

তাপস মুখোপাধ্যায়

তুতুন বলে, আচ্ছা বাপী
ছোট্ট যখন ছিলে
ডাণ্ডাগুলি খেলতে নাকি
তোমরা সবাই মিলে?

এক্কা-দোক্কা রুমাল চোর ও
চু-কিৎ কিৎ খেলায়
দারুণ মজা করতে নাকি
তোমরা ছেলেবেলায়?
ক্যুইজ বই-এ এইসব নাম
পাই না খুঁজে আর
বলতে পারো সেসব খেলার
নাম কী সত্যিকার?

বাপী বলে, অচল এখন
গরীব সেসব খেলা
সত্যিকারের নাম সেগুলোর
আসল ছেলেবেলা॥

শরৎ এলো

সনৎ কুমার মিত্র

শরৎ এলো, ঘুম ভাঙালো
শিউলি ফুলের রাশি,
শরৎ এলো, কাশের বুকে
ফুটলো সাদা হাসি।

শরৎ এলো, নীল আকাশে
ভাসলো সাদা নাও,
ছুটির ঘণ্টা উঠলো বেজে
যেথায় খুশি যাও।

শরৎ এলো, টাক ডুমাডুম
বাজলো খুশির ঢাক,
শরৎ এলো, গল্প-ছড়ার
বইটা পড়া যাক।

ছবি: সুফি

ভাগ, না হলে মারব

সন্দীপ সেন

১লা জানুয়ারি সেবার চিড়িয়াখানায় হৈ হৈ কাণ্ড। বাঘ শিবার গলায় মালা পরাতে গিয়ে একজন যুবক মারা গেল। আরেকজন হলো ভীষণভাবে জখম। তোমাদের অনেকের মতো এসব ঘটনা আমিও নিজের চোখে দেখিনি। খবরের কাগজে পড়েছিলাম। খবরের কাগজ পড়ার সময় সেখানে আরো অনেকের সঙ্গে ছিলেন সরোজদা। আমার বন্ধুর দাদা, পশুপ্রেমিক এবং পেশায় পশুচিকিৎসক। কাগজের খবর পড়ে সকলেই একমত—পশুদের স্বভাবটাই হিংস্র তাই সামান্য কারণে এরা নখ-দাঁত বার করে যে কোনো জীবকে মেরে ফেলে। সরোজদা কিছুতেই তা মানতে রাজী নন। তাঁর মতে,মানুষের চেয়ে সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ বা চারপেয়ে প্রাণীরা অনেক কম হিংস্র। সবাই বলল, প্রমাণ দাও।

সরোজদা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আঁকরোর বিষ্টু মাহাতো এসে হাজির। বললো, ডাগ্‌দারবাবু, এখুনি চলুন। আমার একটা মাদী ভৈঁষ কেমন যেন করছে। সরোজদা যাবার জন্য রেডি। কি মনে হতে বললেন, দীপ, তুইও চল। একটা প্রমাণ পেয়ে যাবি। দ্বিরুক্তি না করে আমি সরোজদার দ্বিচক্রযানে সওয়ার হলাম।

বিষ্টু মাহাতোর মহিষগুলোর খ্যাতি তল্লাট জুড়ে। যেমন তারা বদরাগী তেমনি খেয়ালী। তবে দুধ দেয় নাকি বেশ ভাল। শক্ত শালবল্লা দিয়ে ঘেরা মহিষের খোঁয়াড়, যাতে তারা সহজে রাখাল ছাড়া বেরোতে না পারে। সবচেয়ে রাগীগুলি আবার খোঁয়াড়ে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে আলাদা করা।

মানবাজার থেকে কয়েক মাইল যাবার পর বিষ্টু মাহাতোর খোঁয়াড়ে পৌঁছলাম। খোঁয়াড়ের কাছাকাছি যেতেই দেখলাম এক বিশালাকার মহিষ মাথা নিচু করে শিং বাগিয়ে তেড়ে আসছে। যেভাবে আসছে তাতে মনে হলো বেড়ার শালবল্লা ও নিমেষে ভেঙে ফেলে আমাদের এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে। পিছিয়ে দৌড় লাগাব ভাবছিলাম, পারলাম না সরোজদার জন্যে। হাত টেনে ধরে তিনি বললেন, চুপচাপ দাঁড়া। মজা দ্যাখ। মজা! প্রাণ যায় বলে কথা, সেখানে মজা! ওদিকে খোঁয়াড়ের বেড়ার কাছাকাছি আসতে না আসতেই মহিষটা ঢুঁ মারার ভঙ্গিতে, দেড় ফুট লম্বা ধারাল শিংওয়ালা বিরাট মাথাটা নোয়াল। সরোজদার ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্বিকার দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমিও নট নড়নচড়ন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বেড়ার ফুট দুই দূরে এসে মহিষটি থেমে গেল। তারপর কিছুক্ষণ আমাদের দেখে শান্তভাবে ফিরে গেল। তাকে ফিরতে দেখে দূরে উঠে দাঁড়াল তার বাছুরটা। মাত্র কয়েকদিন আগে জন্মেছে সে। বাছুরটার কাছে গিয়ে মহিষটা একবার এদিক-ওদিক তাকাল। আমরা তখনো দাঁড়িয়ে আছি দেখে সে আবার মাথা নিচু করে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল কিন্তু এবারও বেড়ার দু'ফুট দূর থেকে ফিরে গেল।

তাকলামাকানের সরীসৃপ

এরকম কয়েকবার করার পরও আমাদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহিষটা হয়তো বুঝতে পারল তার বাচ্চার কোনো ক্ষতি আমরা করব না। তখন সে ভয় দেখিয়ে আর তেড়ে এল না। বাচ্চাটার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। সরোজদা বললেন, কিরে কিছু বুঝলি? আমি মাথা নাড়লাম। সরোজদা বুঝিয়ে দিলেন, মহিষটা আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল রে। শিং বাগিয়ে তেড়ে এসে বলতে চাইছিল,বাঁচতে চাস তো পালা। অন্য কেউ হলে ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করত। তাতে মহিষটা আরো বেশি ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতো। আমরা সেসব কিছুই করিনি। তাই আমাদের কাছ থেকে কোনো ভয় নেই বুঝতে পেরেই ও ভয় দেখানো ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাচ্চার কাছে গিয়ে বসেছে।

আঁকরো থেকে কাজ সেরে ফিরে এসে সরোজদা আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন। কিছু ফটোগ্রাফ দেখাতে দেখাতে বললেন, দেখ, পশুরা কত ভদ্র। সহজে তারা কাউকে মারে না। কেবল প্রথমে নানাভাবে হুমকি দিয়ে সতর্ক করে দেয়—লাগতে এসো না, সরে যাও, নাহলে খুব খারাপ হবে।

সাপের কথাই ধর না। তার চেয়ে ভীতু প্রাণী আর নেই। বিষধর গোখরো সাপ আক্রমণ করার আগে ফণা ধরে। হিস্‌হিস্ করে। এটা তার সতর্ক করার ভঙ্গী। যারা এই সাবধানবাণী শোনে না

লায়ন টেল্‌ড্‌ মাংকি

তারাই মরে। অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যাসস্নেক, যাদের একদম বিষ নেই, তারাও মুখ ফুলিয়ে বেলুনের মতো বড় করে ভয় দেখায়। কিন্তু আঘাত করে না।

Macaca Silenus বা লায়ন টেল্‌ড মাংকি, বাংলায় বলতে পারিস সিংহের মতো লেজওয়ালা বানর, দেখতে এরা প্রচণ্ড হিংস্র। নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য ভয়ঙ্কর রকম মুখভঙ্গি করে লেজ আছড়ায়। দেখলে মনে হবে যেন সিংহ গর্জন করছে, কিন্তু তাকে বা তার দলের কাউকে আক্রমণ না করলে সে কখনো তোমার গায়ে কুটোর আঁচড়টিও দেবে না। তর্জন-গর্জন করেই ফিরে যাবে।

আক্রমণ করার আগে হুমকি দিয়ে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারটা পশু-পাখিদের মধ্যে একটি প্রচলিত রেওয়াজ। সবাই ভয় দেখাতে ভালবাসে। হাঁস ভয় দেখানোর জন্য তার গলা বাড়িয়ে দেয়। রাজহাঁস তো তার দুই ডানা ছড়িয়ে, ঘাড় ফুলিয়ে পিঠের দিকে মাথা টেনে আনে। তাকলামাকান মরুভূমিতে পাওয়া যায় এক ধরনের বড় আকারের সরীসৃপ, যাকে চীনের ড্রাগন বলা হয়। এদের পা আছে কিন্তু বিষ নেই। এই সরীসৃপটি ভয় দেখানোর জন্য যখন বিরাট হাঁ করে লাল টকটকে জিভটা বার করে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে তখন মনে হয় এবার বুঝি আগুনের হল্কা ছুটবে। হয়তো এই ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে কল্পকাহিনীর সেই ড্রাগন যারা ক্রুদ্ধ হলে মুখ থেকে আগুন ঝরায়।

পোকামাকড়রাও কিন্তু ভয় দেখাতে কম ওস্তাদ নয়। বোমবার্ডিয়ার নামে একটা ছোট্ট পোকা আছে। সে বিপদের হাত থেকে বাঁচতে তীব্র গন্ধযুক্ত তরল পদার্থের গুলি ছুঁড়তে পারে। গুলি ছোঁড়ার আগে কিন্তু সে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নানা কসরত করে। যেন বলতে চায় পালা, না হলে গুলি করব। এতে কাজ হলে সে আর গুলি ছোঁড়ে না। সিপিয়া বা কাটল ফিস নামে সামুদ্রিক প্রাণীও কালির মতো কালো তরল পদার্থ ছিটোতে পারে। শংকর মাছ ও সামুদ্রিক ঈল তাদের লেজের চাবুকে বা বিদ্যুতের শকে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে। তবে এগুলো ব্যবহার করার আগে তারা সতর্ক করে দেহের নানান ভঙ্গিমায়। এতে কাজ হলে ভালো, না হলে মোক্ষম দাওয়াই। নিরীহ স্লো লরিসও বিপদ বুঝলে গোল লাল চোখ দুটি বড় করে ভয় দেখায়। যেন চোখ রাঙিয়ে বলতে চায়, আমাকে রাগালে কিন্তু বিপদ হবে।

জীবজন্তুরা তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়ও একে অপরকে মেরে ফেলতে চায় না। মুরগী লড়াইয়ের সময় মানুষই মুরগীর পায়ে তীক্ষ্ণ ফলা বেঁধে দেয় বিজিতকে শেষ করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতির কোলে বিভিন্ন পাখি দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করার আগে পালাক্রমে কামড় দেবে এবং কতক্ষণ বিশ্রাম নেবে সে নিয়মেও কড়াকড়ি। এমনকি এটাও তারা জানে যে কামড়ানোর সময় আলগাভাবে দাঁত বসাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই চামড়া ভেদ করে রক্ত বার করা চলবে না। কামড়াকামড়িতে যখন একজন হাঁপিয়ে যায় তখন যুদ্ধের সমাপ্তি। বিজয়ী সেই এলাকার দখল পায়। বিজিত চলে যায়। হরিণ, অ্যান্টিলোপ, হাতি সবাই এই নিয়ম মেনে চলে। শুধু মানুষ মানে না।

বক্তব্য শেষ করে সরোজদা বললেন, এতক্ষণ যা বললাম তা জেনে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস পশুরা উত্যক্ত না হলে

স্লো লরিসের চোখরাঙানি।

পায়ে তাল ঠুকে বা মাথার ঝুঁটি ফুলিয়ে ভয় দেখায়। এতে প্রতিপক্ষ ভয় পেলে আর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে না।

বিষধর সাপেরা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় তাদের বিষদাঁত ব্যবহার করে না। শত্রু চিৎপাত হলেই তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মধ্যযুগের মানুষেরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে ফেলতো। নাইটদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাহিনী তো জানিস—মারো, নাহলে মর। স্যান্ড লিজার্ডদের মধ্যে তো লড়াইয়ের নিয়ম আরও শর্তমাফিক। ভয় দেখানোতে যখন কাজ হয় না তখন তারা পরস্পরের ঘাড় কামড়ায়। কে কখন বা ভয় না পেলে আক্রমণ করে না বা মেরে ফেলে না। শিবাকেই দেখ না, প্রথমে তো সে মালা পরাতে আসা দুই যুবককে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। আসলে কি জানিস, পশুপাখিকে তাদের মতো থাকতে দিয়ে ভালবাসতে হবে। তবেই পৃথিবী সুন্দর হবে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

রাত যখন একটা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল টিকলুর!

প্রথমটা বুঝতেই পারছিল না কিছু। চোখের পাতা ভারী হয়ে নেমে আসছিল, কোনোরকমে টেনে খোলার চেষ্টা করছিল, সেই মুহূর্তে আর একবার শুনতে পেল আওয়াজটা। বেড়ালের ডাক।

ধড়মড় করে উঠে বসল টিকলু।

না, বেড়ালের ডাক শুনে অবাক

হয়নি, এরকম তো কথাই আছে বিলটুর সঙ্গে। বাড়ির সামনে এসে বিলটু বেড়ালের ডাক ডাকবে, আর চুপি চুপি ছাদে উঠে টিকলু রেনপাইপ ধরে নিচে নেমে আসবে। তারপর দুই মূর্তিমানে বেরিয়ে এর গাছের আম, ওর গাছের পেয়ারা, সব সাবাড় করবে। শীতের দিন হলে ব্যাপারটা হয় ভোর রাত্তিরে—খেজুর গাছের ডগায় উঠে হাঁড়িসুদ্ধু রস ফাঁক করে দেওয়া। তবে গরমের দিনে তো আর খেজুর রস খাওয়া যায় না, যা খাওয়া যায় সেও এর মধ্যে দু'তিন দিন হয়ে গেছে। অবাকটা সে জন্যে হয়নি টিকলু, অবাক হয়েছে এই ভেবে যে ঘুমটা আজ এতো গভীর হলো কী করে। এরকম অভিযান তো এর মধ্যেই কয়েকবার হয়ে গিয়েছে। মটকা মেরে পড়ে থাকে বটে, কিন্তু অভিযানের কথা থাকলে ঘুম তো চোখে আসে না টিকলুর। ঘুম তো ঘুম, একেবারে গভীর ঘুম! তাজ্জব ব্যাপার!

আর তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার বিলটুর এই বেড়ালের ডাক। রাস্তা থেকে ডাকে, আওয়াজটা যে-রকম হওয়া উচিত সেরকমই হয়। কিন্তু এ তো মনে হলো একেবারে ঘরের ভেতরে এসে ডাকছে। ঠিক সেইরকম একটা হালকা 'মিউ'।

তাহলে কি বিলটু ওদের ছাদে উঠে এসেছে নাকি! ঢুকে বসে আছে ওদের চিলেকোঠা ঘরে!

হতে পারে। সংগ্রহ অভিযান বেশি

হয়ে গেলে চিলেকোঠার ঘরেই ফিরে আসে ওরা। ঘরটা যে খোলাই থাকে সে কথা বিল্টু জানে।

যেমন সন্তর্পণে ওঠে, পা টিপে টিপে উঠল টিকলু। নিঃশব্দে ঘরের খিলটা খুলে ফেলল। দরজা খুলে, আবার সেটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল টিকলু। ঠিক ছাদের দরজার খিলে হাত দেবে, ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে কে যেন নিশ্বাস ফেললে।

না, ভয়টয় টিকলু পায় না। ভয় পেলে কি আর রাতদুপুরে এরকম মাতুনি করতে বেরোতে পারে! কিন্তু বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল, কোনো সন্দেহ নেই। আসলে চোর-ছ্যাঁচোড়ও তো হতে পারে, দিন সময় তো আর ভালো নয়। কোনো-রকম করে ঘরে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হলো, তারপর—

টিকলুর চোখ অন্ধকারে সয়ে আসছিল। তাছাড়া বারান্দায় টিম টিম করে একটা হ্যারিকেন জ্বলে। টিকলুর বুড়ি পিসিমা দু'একবার ওঠে রাত্তিরে। পাছে লোডশেডিং-টেডিং হয়, আলোটা জ্বালানোই থাকে, অনেক দিনের অভ্যেস। বেশি রাত্তিরে সে আলোটাকেও নেহাৎ কম মনে হয় না। লোক থাকলে তাকে দেখা যেতো ঠিকই। তাহলে কথা হচ্ছে নিশ্বাসটা ফেলল কে!

যাকগে, ওসব আবোল-তাবোল কথা পরে ভাবলেও চলবে। বিল্টুটা বোধহয় ক্ষেপে যাচ্ছে এতোক্ষণ অপেক্ষা করে। আর দু'চার বার ম্যাও ম্যাও শুরু করলেই চিত্তির। তবে বাবার ঘুমটা একেবারে জব্বর, এটাই যা ভরসা।

খিল খুলে সোজা পাঁচিলের ধারে এগিয়ে গেল টিকলু। নিচে এখনও বিল্টু দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার। বন্ধুরা বলে, টিকলুর চোখ নাকি অন্ধকারে জ্বলে। কিন্তু ভালো করে ঠাহর করেও তো রাস্তায় কাউকে দেখতে পেল না টিকলু। তাহলে কি উপরেই উঠে এসেছে বিল্টু? বসে আছে চিলেকোঠার ঘরে? সেটাই সম্ভব। ওর গলার আওয়াজটা শুনেও তাই মনে হয়েছিল টিকলুর।

চিলেকোঠার শেকলটা খুলে রেখে গিয়েছিল টিকলু রাতে ছাদের দরজা দেবার সময়ই, এখন সামান্য ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

পারতপক্ষে আলো-টালো জ্বালে না টিকলু। কে কখন দেখে ফেলবে আর লাগিয়ে দেবে বাবার কাছে—'ছেলেটার বেশ মতিগতি হয়েছে তো পড়াশোনায়—রাতদুপুরে চিলেকোঠা ঘরে বসে পড়ছে মনে হলো!' না বাবা, ওর মধ্যে টিকলু নেই। পড়াশোনায় ওর কেমন মন সেটা ওর বাবা খুব ভালো করেই জানে। কাজেই নেহাৎ দরকার পড়লে, ঘরে পেনসিল-টর্চ আছে, মোমবাতি আছে, ওসব দিয়েই কাজ সেরে নেয়।

দরজা ঠেলে আলতো করে ডাকল টিকলু, 'কী রে, কখন এলি!'

কোনো সাড়া নেই। টিকলুর ভুরু কুঁচকে উঠল, গলাটা সামান্য একটু তুলে বলল, 'বিল্টু!'

আওয়াজ নেই কোথাও।

ব্যাপারটা কী হচ্ছে ভালো বোঝা যাচ্ছে না। আছে নিশ্চয়ই কোথাও এই ঘরের মধ্যেই। বেড়ালের ডাক যখন শোনা গেছে তখন বিল্টু ছাড়া কেউ নয়। উঠতে দেরি হয়েছে বলেই বোধহয় একটু মজা করছে। এবার একটু অসহিষ্ণু গলাতেই ডাকল টিকলু, 'এই বিল্টু, কী হচ্ছে কী!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ের কাছে সেই নিশ্বাস!

বলতে কী, সত্যিই বুকের ভেতরটা এবার কেমন করে উঠল টিকলুর। নাঃ, ব্যাপার-ট্যাপার তো খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। জোর করেই বুকের ধুকপুকুনিটাকে সরিয়ে দিল টিকলু। সত্যিই যদি বিল্টু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে ঘরের মধ্যে, তাহলে এই নিয়ে পরে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে। আর যদি সত্যিই চোর-টোর কিছু হয়, তাহলেও তো ব্যাপারটা দেখা উচিত।

টর্চ কোথায় থাকে মুখস্থ টিকলুর। হাতটা একটু কাঁপছিল; ও টের পেল। নিজেকে আবার একটা ধমক লাগিয়ে টর্চটা হাতে নিল, সুইচ টিপল। এসব টর্চের ওই এক দোষ। তিনদিন না চারদিন ব্যাটারি ভরেছে, এর মধ্যেই একদম খতম। বড় টর্চের আলো একটু আস্তে আস্তে কমে, খুদে টর্চের আলো কমল কি শেষ। যাকগে, ওইটুকুর মধ্যেই যেটুকু চোখে পড়েছিল, ঘর ফাঁকা। কেউ নেই ঘরে। ছোট্ট ঘর, লুকিয়ে থাকার মতো জায়গাই বা কোথায়!

তাহলে! বিল্টু আসেনি এখানে! তাই বা কী করে হবে, রাস্তায় নেই, এখানেও নেই, অথচ—

সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার বাচ্চা বেড়ালের ডাক—'ম্যাও!'

গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল টিকলুর। অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরে কি সত্যি বেড়ালবাচ্চা ঢুকল নাকি! কিন্তু তাহলে তো ওই অল্প আলোতেও—

মোমবাতিটা জ্বালার কথা মনে হয়েছিল একবার। কিন্তু হাতে তেমন জোর পাচ্ছিল না টিকলু। আসলে বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিটছিল, ঘরের মধ্যে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল ওর। কোনোরকমে সে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দু'চার সেকেন্ড খোলা হাওয়া বুক ভরে নিয়ে ছমছমানিটা একটু কাটল টিকলুর।

ছি ছি, এভাবে ভয় পেয়ে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। দুম করে যদি বিল্টু বেরিয়ে এসে এখন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে আরম্ভ করে দেয়, সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে। মুখ দেখানো ভার হবে স্কুলে, গল্পটা যদি ও সকলের কাছে ফলাও করে বলতে শুরু করে।

বাইরে বেরিয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধিটাও একটু ফিরে পাচ্ছিল টিকলু। এরকম হয়নি তো যে ছাদের আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে বিল্টু—ওর সাহসের দৌড়টা একবার দেখছে!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। ঘরে একটা বেড়ালবাচ্চা থাকলে চোখে পড়তো না! এতোটা ভয় কখনই পেয়ে যায়নি টিকলু। শুনতে অবিকল বেড়ালবাচ্চার ডাক—এটা একমাত্র বিল্টুর পক্ষেই সম্ভব। পশুপাখির ডাকে একেবারে ওস্তাদ ছেলে ও। স্কুলে 'মহেশ' নাটকের সময় উইংসের পাশ থেকে গরুর ডাক ডেকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল ও।

সমস্ত ভয় গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আর একবার কার্নিশের কাছে এগিয়ে গেল টিকলু।

নাঃ, রাস্তার এদিক-ওদিক একেবারে
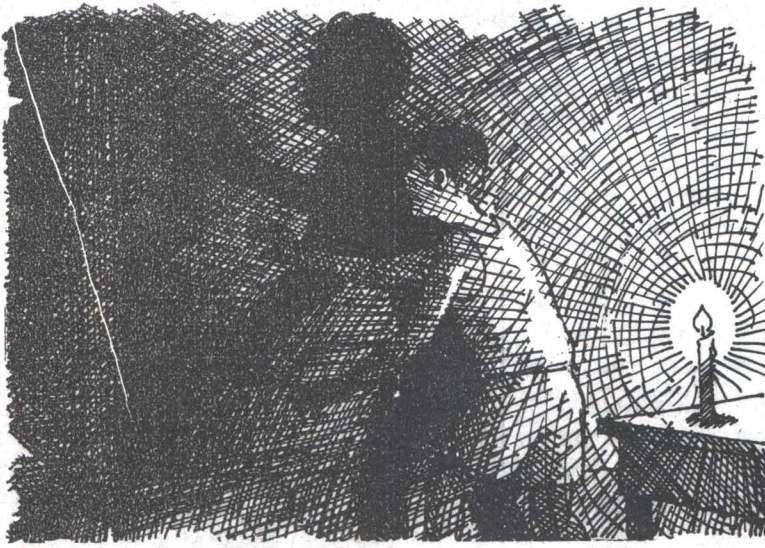
ছায়াটা টিকলুর মতো নয়

শুনশান। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই কোথাও। তার মানে ছাদেই কোথাও লুকিয়ে আছে বিলটু। মজা করছে।

এইবার টিকলুর রাগ হয়ে যাচ্ছিল। রাতদুপুরে এই কি মজা করবার সময়! কিপটে বুড়োর বাগানে বড়ো-সিঁদুরে আর মধু-গুলগুলি আম পেকেছে দেখে ও-ই তো এসে খবর দিয়েছিল বুড়োর বাড়িতে আজ কেউ থাকবে না, কোথায় যেন নেমন্তন্ন। তা কেউ থাকবে না তো বুড়ো নিজে তো থাকবে। চোখে কম দেখে এটা ঠিক, কিন্তু বাগানটা তো বুড়োর প্রাণ। সতর্ক তো একটু থাকবেই—সবে পাকতে শুরু করেছে আমগুলো। আর তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে, মাঝরাত্তির থেকেই বুড়োর কাশির দমক ওঠে। ভোর রাত্তিরটা তো বলতে গেলে জেগে কাটায়, বাবার কাছেই তো গল্প করেছে কতোদিন। হাঁপানির জন্যে ওষুধ নিয়ে গেছে। এ পাড়ায় ভালো ডাক্তার বলতে তো বাবাই।

তো, এমনি রঙ্গ-রসিকতা করে সময় কাটালে বুড়োর বাগানে যাবার সময় আর থাকবে! এই বেলা মানুষ দিব্যি মৌজ করে ঘুমোয়, যেতে গেলে এই তো হলো ঠিক সময়!

চিলেকোঠার পেছন দিকটা একটা চক্কর মেরে এল টিকলু। অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু। ফিসফিস করে ডাকল, 'বিলটু!'

সাড়া নেই, আগের মতোই।

'ইয়ার্কি না করে বেরিয়ে আয় বলছি। এরপর আর যাওয়া যাবে?'

সমস্ত চুপচাপ। কারো নিশ্বাস পড়ারও শব্দ নেই এখন।

'কী হচ্ছে কী!' গলাটা অজান্তেই একটু উঠে গেল টিকলুর, 'আমি কিন্তু নিচে চলে যাবো এবার!'

ফোঁস!

ঠিক ঘাড়ের কাছে জন্তু-জানোয়ারের নিশ্বাস ফেলার শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে ঘুঁষি চালিয়ে দিয়েছে টিকলু একটা!

কোথায় কী! ছাদ যেমন ফাঁকা তেমনি ফাঁকা। জনপ্রাণীর সন্ধান নেই কোথাও।

ভয়ের সেই অনুভূতিটা আবার ঢুকে পড়ছিল টিকলুর শরীরে। কিন্তু সেটা সরিয়ে দিতেও সময় লাগল না ওর।

কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে কেউ আছে কিনা এখানে সেটা না দেখে নিচে নামা যাবে না। চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে মোমটা জ্বেলে ভালো করে দেখতে হবে ছাদটা।

পা যে একটু কাঁপছিল না এমন নয়, কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল টিকলু। দেশলাই কোথায় থাকে জানাই আছে, মোমবাতিও বার করল টেনে। যদ্দূর মনে হয়, গণ্ডগোল একটা কিছু হয়েছে আজকে। এমন হতে পারে, টিকলুর মতোই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে বিলটু, উঠতেই পারেনি এখনও ঘুম থেকে। অথবা এমনও হতে পারে, ওর সেই ডাকসাইটে মিলিটারি মামা বেড়াতে এসেছে, তারই ভয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাই যদি হয়, মানে বিলটু যদি বেরোতেই না পেরে থাকে বাড়ি থেকে, তাহলে ঘুমটাই বা ঠিক ওই সময়ে ভাঙল কী করে টিকলুর! আর বেড়াল ডাকটাই বা ডাকল কে!

মোমবাতি জ্বালার পর যেটা হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ ভয়ের ভাবটা মন থেকে একেবারে ছিটকে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, সেটা কিন্তু হলো না। বরং এই আলোয় টিকলুর দীর্ঘ ছায়া দেওয়ালে কেঁপে কেঁপে কেমন যেন ভয়টাকেই একটু বাড়িয়ে দিলে।

ব্যাপারটা যাই হোক, বিলটু আজকে আসেনি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আলো নিবিয়ে স্বচ্ছন্দে এখন টিকলু নিচে নেমে যেতে পারে। ঝামেলা থাকল শুধু দুটো ব্যাপারে, ওরকম করে বেড়াল ডেকে ওর ঘুম ভাঙাল কে—সত্যি কথা বলতে কী ডাকটা তো এই ঘরের মধ্যেও শুনেছে ও। আর একটা ব্যাপার ওই ঘাড়ের কাছে—

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার।

এবার যেন ঘাড়ের উপর ওই নিশ্বাস সমস্ত শরীরটা হিম করে দিয়ে গেল। চমকে পেছনে তাকাতেই ছলাৎ করে এক ঝলক রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল ওর।

দেওয়ালে যে বিরাট ছায়াটা কাঁপছে তা একেবারেই টিকলুর মতো নয়, বরং সেটার সঙ্গে 'সবচেয়ে' মিল—

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে টিকলু। ওর হাত লেগেই বোধহয় তাক থেকে একটা জিনিস ছিটকে পড়েছে মেঝেয়।

গুলতি। বিলটুর অত্যন্ত প্রিয় গুলতি। এক টিপে অনেক দূরের টিয়াপাখি ঘায়েল করা যায়, ওড়ার ক্ষমতা থাকে না। প্রাণ থাকতে কাউকে দেয় না বিলটু, টিকলুকেও না—কতোবার চেয়ে চেয়ে পায়নি টিকলু। বাধ্য হয়ে কাল সেটা চুরি করেই—

নিচু হয়ে তুলতে যাচ্ছিল টিকলু, হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'ম্যাও'—দরজায় চোখ পড়তেই মনে হলো কে যেন স্যাট

করে সরে গেল সামনে থেকে।

পাগলের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল টিকলু।

কিন্তু কোথায় কে! ছাদ ফাঁকা, আগের মতোই।

হতে পারে না, হতেই পারে না। একবার এদিক, একবার ওদিক—প্রাণপণ ছুটে বেড়াতে লাগল টিকলু, এলোমেলো। ধরতে ওকে হবেই। বিলটুই এসেছে ওপরে। ওর সঙ্গে মজা করছে। কতোটা সাহস ওর পরীক্ষা করছে। নইলে এইভাবে চোরের মতো নিঃশব্দে এসে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলা, ওইরকম করে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, একেবারে নিখুঁত করে বেড়ালের ডাক ডাকা—

'বিলটু—ভালো হচ্ছে না বলছি!' গলা কতোটা চড়িয়েছে তাও খেয়াল নেই টিকলুর, 'রাতদুপুরে ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে!'

মাথার ওপর দিয়ে একটা রাতপাখি শুধু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করতে করতে উড়ে গেল।

'বিলটু, আমি চললাম'—টিকলু চিৎকার করে বলল, 'তোরই তো বেশি লোভ, মধু-গুলগুলি—বড়ো-সিঁদুরে—আর কোনোদিন যদি বলেছিস—'

হঠাৎ সজোরে একটা ইটের টুকরো মাথায় এসে লাগল টিকলুর। যন্ত্রণায় চেপে ধরেছিল মাথার ওই জায়গাটা। হাতে একটা চটচটে কী লাগল! রক্ত পড়ছে নাকি!

হাতটা সামনে নিয়ে এসে চক্ষুস্থির। পাকা আমের শাঁস লেগে আছে হাতে। গন্ধটাও নাকে এসে লাগছে। একেবারে কিপটে বুড়োর বড়ো-সিঁদুরে আম।

মাতালের মতো টলতে টলতে ছাদে খুঁজতে শুরু করল টিকলু। মাথায় কী এসে লাগল ওকে দেখতেই হবে।

অতো খুঁজবার অবশ্য দরকার ছিল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুরু হয়ে গেছে আবার সেই ছোঁড়াছুঁড়ির পালা। এবার রীতিমতো বর্ষণ। সুপক্ক বড়ো-সিঁদুরে আর মধু-গুলগুলি আম। একেবারে শিল পড়ার মতো। গোটা, আধখাওয়া, একবার দাঁত-ছোঁয়ানো, কিছু নিঃশেষিত আঁটি। আর সবই এসে পড়ছে সোজা টিকলুর গায়ে পিঠে মাথায়।

কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। কড় কড় করে ডাকছে মেঘ। ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। সমস্ত আকাশখানা যেন কালো হয়ে নেমে আসছে মাথার ওপর। জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে টিকলু শুনতে পেয়েছে টেলিফোনটা বেজে উঠেছে সশব্দে—বাজছে—বেজেই চলেছে—

চোখের সামনে অনেকগুলো মাথা। বাবা, মা, দিদি—এমনকী বুড়ি পিসিমা পর্যন্ত। বাবার স্বস্তির নিশ্বাসটাই শোনা গেল আগে। শুনতে পাচ্ছিল বাবা বলছে, 'বাঁচা গেল! যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি—'

'তার চেয়েও বড়ো কথা'—দিদি বললে, 'ওর মতো ডাকাত ছেলেও ভয় পেয়েছিল!'

'হ্যাঁরে, রাতদুপুরে হঠাৎ চুরি করে আম খাওয়ার শখ হলো কেন'—গলাটা পিসিমার।

ঘাড়টা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে টিকলু দেখল, ও ছাদেই আছে। আশেপাশে অজস্র আমের আঁটি।

'যাক গে, একটু ভালো লাগলে নিচে আসিস, আর ভয় নেই'—বাবা উঠে পড়ল, 'আমাকে আবার মর্গে যেতে হবে এক্ষুণি।'

টিকলু কথা বলতে পারছিল না, বাবার দিকে তাকাল। বাবাই বললে, 'আর বলিস না, তোর বন্ধু রে—বিলটু। মাঝরাত্তিরে বাড়ির ছাদ থেকে রেনপাইপ দিয়ে নামার শখ হয়েছিল বাবুর। গেছে হাত ফসকে। ওর বাবা ফোন করেছিল রাত্তিরে। কিছু করার ছিল না, স্পট ডেড। যাই, মর্গের ডাক্তারকে একটু বলে আসি, বেশি কাটা-ছেঁড়া না করে।'

টিকলু ঘাড় ঘুরিয়ে চিলেকোঠার দিকে তাকাল। মেঝেয় গুলতিটা আর দেখতে পেল না।
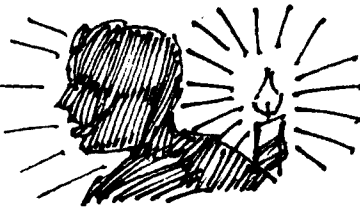
ছবিঃ মদন সরকার

কানু বলে, পাবি শেষে

জগদিন্দ্র মণ্ডল

আম গাছে আম পাতা
মঞ্জরী ডালে ডালে,
পাতা আর মঞ্জরীতে
রাজার সাজ কানুর ভালে।
হাতে গ্রীষ্মরোদ যেন তরবারি,
কানু ছুটছে টগবগিয়ে
মিষ্টি বৃষ্টির দেশে
বলে কী, 'কেমন হলো'
'নরম তো হলি শেষে'!
আবার কানু ছোটে টগবগিয়ে
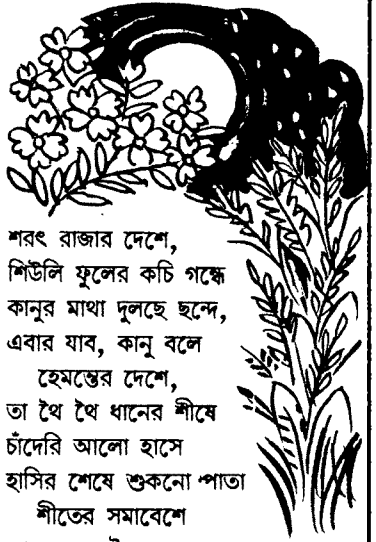
শরৎ রাজার দেশে,
শিউলি ফুলের কচি গন্ধে
কানুর মাথা দুলছে ছন্দে,
এবার যাব, কানু বলে
হেমন্তের দেশে,
তা থৈ থৈ ধানের শীষে
চাঁদেরি আলো হাসে
হাসির শেষে শুকনো পাতা
শীতের সমাবেশে
আবার ছোটে কানুর ঘোড়া
বসন্তের দেশে,
কানু বলে শীতের পাতা শুকনো বলে
মন খারাপ করবি না যে,
বসন্তের ফুলের মালা জানিস তবে
পাবি শেষে।

ছবিঃ সুফি

কথাটা আমরাও জানি

নির্মলেন্দু গৌতম
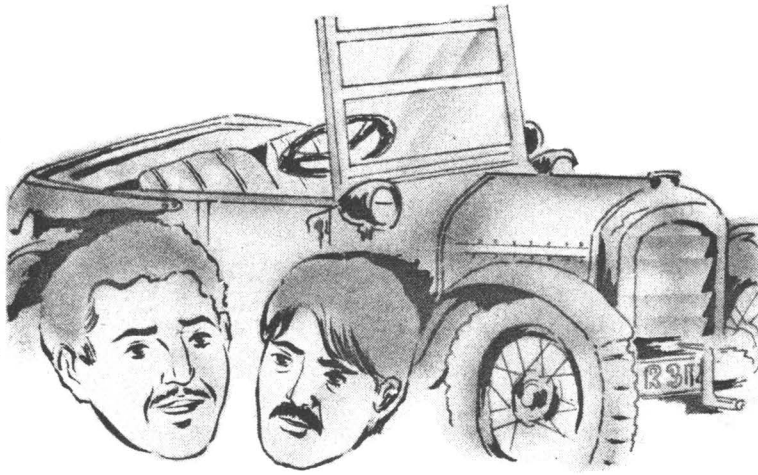
হঠাৎ ডোরবেল বাজতেই উঠে পড়লাম আমি। তারপর, দেবেশ্বরের দিকে একবার তাকিয়ে দরজার দিকে ফিরে 'দাঁড়ান, দরজা খুলছি' বলে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। দেখলাম, হোটেলের ম্যানেজার অনাদি সামন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে।

'ভেতরে আসুন।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম আমি।

অনাদি সামন্ত বললেন, 'না না, ভেতরে যাবো না। একটা জরুরি খবর দিতে এসেছি! খবরটা দিয়েই চলে যাবো।'

'জরুরি খবর মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

হাসলেন অনাদি সামন্ত। বললেন, 'ঐ মানে, একজন দেখা করতে চাচ্ছেন আপনাদের সঙ্গে। আপনাদের সঙ্গে নাকি দেখা করতেই হবে তাঁর। নিচে আমার ঘরে বসে আছেন তিনি।'

এখানে হঠাৎ কে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে? না, এখানে আমাদের চেনাজানা কেউ থাকে না। থাকলে তো আমরা তাকে খুঁজে নিতাম। দ্রুত কথাগুলো ভেবে নিয়েই তাকালাম দেবেশ্বরের দিকে।

কিন্তু দেবেশ্বর আমার দিকে না তাকিয়েই অনাদি সামন্তকে বললো, 'তাঁকে বসতে বলুন, আমরা যাচ্ছি দেখা করতে।'

'ঠিক আছে।' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন অনাদি সামন্ত।

অনাদি সামন্ত চলে যেতেই দেবেশ্বরের দিকে ফিরলাম আমি। বললাম, 'আচ্ছা, কে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

দেবেশ্বর বললো, 'সেটা জানতেই তো নিচে যাচ্ছি।' বলেই পা বাড়ালো। টেবিলের ওপর রাখা ঘরের চাবিটা নিয়ে আমিও পা বাড়ালাম দেবেশ্বরের সঙ্গে।

ঘরের বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবেশ্বরের দিকে ফিরতেই দেবেশ্বর বললো, 'শুনে নাও, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যে এসেছে, আগ বাড়িয়ে তাকে কিন্তু কিছু বলার চেষ্টা করবে না। যে এসেছে সে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য-টুদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। সেই উদ্দেশ্যটা আগে বুঝে নিতে হবে আমাদের।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আগ বাড়িয়ে কিছু বলবো না।'

পায়ে পায়ে নিচে নেমে এসে অনাদি সামন্তর ঘরে ঢুকলাম আমরা। যিনি দেখা করতে এসেছেন, আমাদের ঢুকতে দেখেই দু'হাত জোড় করে মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

অনাদি সামন্ত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এই যে, ইনিই এসেছেন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'আমার নাম বিশ্বনাথ সাঁতরা। বিশুদা বলেই সবাই আমায় চেনে। আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা নিবেদন আছে আমার।' দু'হাত জোড় করেই কথাগুলো বলে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন বিশ্বনাথ সাঁতরা, মানে বিশুদা।

সতর্ক চোখে বুঝি বিশুদার দিকে তাকালো দেবেশ্বর। বললো, 'ছোট্ট নিবেদনটা কি বলুন।'

কিছু কথা বুঝি মনে মনে গুছিয়ে নিলেন বিশুদা। তারপর বললেন, 'আসলে, অনাদিবাবুর কাছে শুনলাম আপনারা বেড়াতে এসেছেন এখানে। আরো দিন পাঁচেক থাকবেন।'

এখানে আমাদের পাঁচদিন থাকবার সঙ্গে বিশুদার ছোট্ট নিবেদনের সম্পর্ক কী হতে পারে, সেটা ভেবে ফেলার আগেই দেবেশ্বর বিশুদার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে রকমই তো ইচ্ছে আমাদের।'

খুশি হলেন বিশুদা। বললেন, 'এই পাঁচদিনের জন্য তাহলে আপনার গাড়িটাকে চাইছি। এটাই আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট নিবেদন।'

বিশুদার ছোট্ট নিবেদনটা ঠিক এরকম হবে, এটা বুঝি ভাবতে পারেনি দেবেশ্বর। আমিও ভাবতে পারিনি। আসলে, ভাবাও যায় না।

কোনওরকমে দেবেশ্বর বললো, 'হঠাৎ গাড়িটাকে আপনি পাঁচদিনের জন্য কেন চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না কিন্তু।'

হাসলেন বিশুদা, বললেন, 'আমি চাচ্ছি না। বিশ্বাস করুন, চাচ্ছে এ শহরের লোকজন।'

'হঠাৎ এ শহরের লোকজন গাড়িটাকে চাচ্ছে মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম

আমি।
ফের হাসলেন বিশুদা। বললেন, 'কি জানেন, এ শহরে আপনাদের গাড়ির মতো এত পুরোনো গাড়ি একটাও নেই। আসেওনি এর আগে। সম্ভবত আসবেও না।'
কি যেন বলতে যাচ্ছিলো দেবেশ্বর। কিন্তু তার আগেই ফের বিশুদা বললেন, 'গাড়িটার বয়স নিশ্চয়ই সত্তর-আশি হবে। কী, ঠিক বলেছি কিনা?'
'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—' গাড়িটার বয়স নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি।
'পরে আপনার কথা শুনবো।' বলেই গুছিয়ে বিশুদা এবার বললেন, 'তার আগে বলুন তো, সবাই দল বেঁধে মিউজিয়াম দেখতে যায় কেন?'
'পুরনো জিনিস দেখতে।' দ্রুত একবার দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।
বিশুদা বললেন, 'ব্যস, এবার বলুন, মিউজিয়ামে রাখবার মতো একটা পুরনো জিনিস যখন হঠাৎ এভাবে এ শহরে এসে পড়েছে, আর সেটা যখন বলতে গেলে একেবারে জ্যান্ত, তখন এ শহরের লোকজনের যদি তাতে চাপতে ইচ্ছে হয়, নিশ্চয়ই আপনি তাহলে তাদের দোষ দিতে পারেন না!'
দেবেশ্বর লাফিয়ে উঠে বললো, 'তার মানে, এখানকার লোকেরা পাঁচদিন ধরে চাপবে এই গাড়িতে?'
'ঠিক ধরেছেন, তার মানে তাই।' ভারি সহজ গলায় বললেন বিশুদা।
আমার দিকে খানিকটা অসহায়ভাবে তাকালো দেবেশ্বর।
দেবেশ্বরের অসহায় মুখটা দেখেই আমি ফিরলাম বিশুদার দিকে। বললাম, 'কিন্তু পাঁচদিন ধরে সবাই যদি গাড়িটাতে চেপে বেড়ায়, তাহলে কি আর কিছু থাকবে গাড়িটার?'
'সে সব কথা কি আর বোঝানো যাবে কাউকে! না, কখখনো বোঝানো যাবে না।' তেমনি সহজ গলাতেই বললেন বিশুদা।
অনাদি সামন্ত বললেন, 'ঠিক, সে সব কথা কাউকে বোঝানো যাবে না। আমি তো এ শহরের লোকজনকে চিনি।'
দেবেশ্বর বললো, 'ঠিক আছে, আমাদের বোঝাতে দিন তাহলে। ঠিক বুঝিয়ে দেবো।'
বিশুদা হাসলেন। বললেন, 'অসম্ভব। আপনারা বোঝাতে গেলে বরং উল্টো ফল হবে। না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারবো না। কাজেই আপনাকে রাজী হতেই হবে। না হলে শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে তা আমরা জানি না।'
'কি ঘটবে, তা জানেন না মানে?' আমি খানিকটা অসহায়ভাবেই তাকালাম বিশুদার দিকে।
তেমনি ভাবেই হাসলেন বিশুদা। বললেন, 'ঐ, মানে, আপনাদের সুদ্ধ গাড়িটাকে দিনরাত্তির ঘেরাও করে রাখবে শহরের লোকেরা।'
কথাটা শুনেই আমি দেবেশ্বরের দিকে তাকালাম। না, কিছু বললো না দেবেশ্বর। আসলে, দেবেশ্বর বোধহয় ঠিক ধরতে পারছে না, কি ঘটতে যাচ্ছে।
তীক্ষ্ণ চোখে একবার আমাদের দেখে নিলেন বিশুদা। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাকগে, কাল আমি ফের আসবো। সকালের দিকেই আসবো। আপনারা যা বলবার ভেবে-টেবে কালই বলবেন।'
অনাদি সামন্ত বললেন, 'ভাবাভাবির কিচ্ছু নেই। জনগণ যা চাইছে, তা তো করতেই হবে।'
দেবেশ্বর এবারও কিচ্ছু বললো না।
বিশুদা অনাদি সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবুও আমি আপনাদের ভেবেই বলতে বলবো। বলুন, সেটাই উচিত কিনা?'
'ঠিক, সেটাই উচিত।' অনাদি সামন্ত বললেন।
দু'হাত জোড় করে এবার আমাদের দিকে ফিরে বিশুদা বললেন, 'তাহলে আমি এখন আসছি। শুধু একটা কথাই বলে যাচ্ছি, আপনারা রাজী না হলে কোনও কিছু যদি ঘটে যায়, তার দায়িত্ব কিন্তু আমি নেবো না।'
বলে আর দাঁড়ালেন না বিশুদা। উঠে পড়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেলেন অনাদি সামন্তের ঘর থেকে।
বিশুদা চলে যেতেই আমাদের দিকে ফিরলেন অনাদি সামন্ত। বললেন, 'আমার মতে আপনাদের রাজী হয়ে যাওয়াই উচিত।'
'ঠিকই বলেছেন।' আমি বললাম সঙ্গে সঙ্গে।
'কথাটা তো মিথ্যে নয়, এরকম মিউজিয়াম মার্কা গাড়ি দেখলে যে কারো চাপতে ইচ্ছে করতেই পারে।' কথাটা দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন অনাদি সামন্ত।
আসলে, ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে কিছু একটা যে ভেবে যাচ্ছে দেবেশ্বর, সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না আমার। অবশ্য এই মুহূর্তে সেটা কিছুতেই ধরতে পারবো না। প্রশ্ন করলেও কিছু বলবে না দেবেশ্বর। কথাটা ভেবেই উঠে দাঁড়ালাম আমি। মিছিমিছি আর অনাদি সামন্তর ঘরে বসে কি হবে!
আমায় উঠতে দেখে দেবেশ্বরও উঠে দাঁড়ালো।
অনাদি সামন্ত বললেন, 'সত্যি, ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। কেউ যাতে আপনাদের কোনওভাবে বিরক্ত না করে, সেটা বলে দিচ্ছি।'

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই দেবেশ্বর বললো, 'শীগগির তৈরি হয়ে নাও, এখুনি একবার অনাদি সামন্তর কাছে যেতে হবে।'
দেবেশ্বর কিছু একটা ভেবে ফেলেছে বুঝে ফেলেই আর কোনও প্রশ্ন না করে উঠে পড়লাম। তারপর অসম্ভব দ্রুত তৈরি হয়ে দেবেশ্বরের সঙ্গে অনাদি সামন্তর ঘরে এলাম।
হঠাৎ আমাদের দু'জনকে দেখেই অনাদি সামন্ত বললেন, 'নিশ্চয়ই বিশুদার জন্য এসেছেন। কিন্তু এতো সকালে কি বিশুদা আসবেন?'
'না, আমরা এখন বিশুদার জন্য আসিনি। এসেছি অন্য কারণে।' দেবেশ্বর বললো।
অনাদি সামন্ত অবাক হয়ে বললেন, 'অন্য কারণে মানে?'
দু'মুহূর্ত ভেবে নিয়ে দেবেশ্বর বললো, 'আসলে, আমাদের সুটকেসগুলোর চাবি যে চাবির রিঙে ছিল, সেই রিঙটা হারিয়ে

চাবি হারানোর ঝামেলা সত্যিই বিচ্ছিরি

ফেলেছি। ঠিক কখন কিভাবে হারিয়ে ফেলেছি, সেটা কিছুতেই বলতে পারবো না।'

কথাটা শুনেই আমি চমকে উঠে তাকালাম দেবেশ্বরের দিকে। ঠিক কি কারণে চাবি হারাবার গল্পটা বানিয়ে ফেললো দেবেশ্বর, তা কিছুতেই ধরতে পারলাম না।

অনাদি সামন্ত দুর্বল গলায় বললেন, 'ভারি মুশকিলে পড়ে গেলেন তো আপনারা!'

'আপনাকেই এখন মুশকিল আসান করতে হবে। মানে, আমায় একজন চাবিঅলার খোঁজ দিতে হবে। মানে, তার কাছে এখুনি চাবি বানাবার জন্য সুটকেস দুটো নিয়ে যেতে হবে।' দেবেশ্বর বললো।

অনাদি সামন্ত বললেন, 'চেনা একজন চাবিঅলা আছে। হোটেলের গোটা কয়েক তালার চাবিও বানিয়েছি তাকে দিয়ে। আমি খবর পাঠাচ্ছি। সে এসে চাবি বানিয়ে দেবে। না, আপনাদের আর সুটকেস দুটো বয়ে নিয়ে যেতে হবে না তার কাছে।'

'একটা কথা বলবো?' অনাদি সামন্তর কথা শেষ হতেই দেবেশ্বর বললো।

অনাদি সামন্ত বললেন, 'বলুন।'

'কি জানেন, ওকে খবর দেবার জন্য কাউকে আপনি পাঠাবেন, সে গিয়ে তাকে খবর দেবে, তারপর সময় করে সে আসবে। তার চাইতে কিন্তু সুটকেস দুটো তার কাছে নিয়ে গিয়ে চাবি বানিয়ে আনা অনেক সহজ ব্যাপার। তাছাড়া, গাড়ি যখন আমাদের আছেই, তখন তো আর যেতে-আসতে অসুবিধের কিচ্ছু নেই। শুধু একটু কষ্ট করে বলে দিন কোথায় তাকে এখন পাবো।'

'কথাগুলো আপনি ঠিকই বলেছেন।' বলে বোধহয় একটু সময় মনে মনে ঠিকানাটা ভেবে নিলেন অনাদি সামন্ত। তারপর বললেন, 'ভালো করে শুনে নিন, কিভাবে চাবিঅলার কাছে আপনাদের যেতে হবে।'

'লিখে নেবো?' প্রশ্ন করলো দেবেশ্বর।

'না, না, লিখতে হবে না।' বলে চাবিঅলাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, গুছিয়ে সেটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন অনাদি সামন্ত।

শুনে নিয়েই দেবেশ্বর বললো, 'তাহলে আমরা আর দেরি না করে বেরিয়েই পড়ি।'

অনাদি সামন্ত বললেন, 'হ্যাঁ, বেরিয়েই পড়ুন।'

মুহূর্তে অনাদি সামন্তর ঘর থেকে বেরিয়ে দেবেশ্বর আর আমি প্রায় ছুটে চলে এলাম নিজেদের ঘরে। দেবেশ্বর দরজাটা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে বললো, 'শীগগির সব গুছিয়ে নাও।'

'নিচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ চাবি হারাবার গল্পটা বানিয়ে বললে কেন ধরতে পারছি না।' আমি খানিকটা অসহায় গলায় বললাম।

জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতেই দেবেশ্বর বললো, 'আসলে, ওরকম গল্পটা না বানালে কি করে সুটকেস দুটো নিয়ে বেরোতাম হোটেল থেকে! একটু মাথা খাটাও, ঠিক বুঝে ফেলবে।'

কেন চাবি হারানোর গল্পটা বানিয়েছে দেবেশ্বর মুহূর্তে সেটা বুঝে ফেললাম আমি। নিশ্চয়ই বিশুদা আসবার আগেই হোটেল ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছে দেবেশ্বর। চাবি হারানোর গল্পটা না বানালে সুটকেস নিয়ে বেরোনো কখখনো সম্ভব নয়। অনাদি সামন্তই হয়তো বেরোতে দেবেন না হোটেল থেকে। কারণ আমাদের না পেলে বিশুদা তো অনাদি সামন্তকেই ধরবেন।

এসব ভেবেই দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে, 'সত্যিই, প্ল্যানটা রীতিমতো গুছিয়ে তৈরি করে ফেলেছো' বলে আমিও আমার জিনিসগুলো সুটকেসে ভরে ফেলতে থাকলাম।

না, বেশি সময় লাগলো না সব গুছিয়ে নিতে।

'ভালো করে একবার ঘরটা দেখে নাও। কিছু ফেলে গেলে কিন্তু সেটা আর পাওয়া যাবে না।' দেবেশ্বর সুটকেস বন্ধ করতে করতে বললো।

'দেখছি।' বলে সুটকেসটা বন্ধ করে আমি টেবিলের ড্রয়ার থেকে শুরু করে খাটের তলা অব্দি সব জায়গা ভালো করে দেখে নিলাম। না, কিছু পড়ে নেই।

কথাটা দেবেশ্বরকে বলতেই দেবেশ্বর বললো, 'নাও, তাহলে এবার চলো।'

ঘরের চাবিটা তুলে নিয়ে বাইরে এলাম আমরা। দরজায় তালা লাগালাম। তারপর সুটকেস দুটো তুলে নিয়ে সোজা চলে এলাম নিচে, অনাদি সামন্তর ঘরে।

'সত্যিই, কী ঝামেলায় পড়ে গেলেন আপনারা!' আমাদের দু'জনের হাতে সুটকেস দুটো দেখেই বললেন অনাদি সামন্ত।

'ঝামেলাটা এখন তাড়াতাড়ি মিটলেই বাঁচি।' দেবেশ্বর বললো সঙ্গে সঙ্গে।

আমার হাতে ছিল ঘরের চাবিটা।

দেবেশ্বরের কথাটা শেষ হতেই অনাদি সামন্তর হাতে চাবিটা তুলে দিলাম আমি। বললাম, 'ঘরের চাবিটা আপনার কাছেই রেখে যাচ্ছি। না, আর বিশ্বাস নেই নিজেদের ওপর।'

কথাটা শুনে হেসে চাবিটা নিয়ে অনাদি সামন্ত বললেন, 'চাবি হারানোর ঝামেলা সত্যিই বিচ্ছিরি একটা ঝামেলা।'

'ঠিক। একদম ঠিক।' বলে দ্রুত আমার দিকে একবার তাকিয়ে অনাদি সামন্তর দিকে ফিরলো দেবেশ্বর। বললো, 'তাহলে চলি।'

বলে আর অপেক্ষা করলো না দেবেশ্বর। পা বাড়ালো বাইরে যাবার জন্য।

আমিও পা বাড়ালাম।

বাইরে এসেই সুটকেস দুটো গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি আর দেবেশ্বর গাড়িতে উঠে পড়লাম। দেবেশ্বর পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করে স্টার্ট দিলো গাড়িতে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সব ঠিকঠাক নিয়েছো তো?'

'নিয়েছি।' আমি বললাম।

না, আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না দেবেশ্বর। মুহূর্তে চালিয়ে দিলো গাড়ি।

হোটেল ছাড়িয়ে খানিকটা এসেই দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'বিশুদা আবার আমাদের দেখে না ফেলে।'

'বিশুদা আমাদের দেখলেও আমরা দেখবো না বিশুদাকে।' দেবেশ্বর বললো সঙ্গে সঙ্গে।

গুছিয়ে আরও কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু বলা হলো না। কারণ তার আগেই ডানদিকের একটা চায়ের দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ির সামনে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিশুদা।

মুহূর্তে গাড়িটা থামিয়ে দিলো দেবেশ্বর। আমাদের কিছু ভেবে উঠবার আগেই পায়ে পায়ে বিশুদা কাছে এলেন।

'কি হলো, এখন হঠাৎ—' বলতে গিয়েই থেমে গেলেন বিশুদা। কারণ পেছনের সিটের ওপর রাখা আমাদের সুটকেস দুটোর ওপর তাঁর চোখ আটকে গেছে।

'ব্যাপারটা কি জানেন, মানে—' দেবেশ্বর কিছু বলার জন্য চেষ্টা করলো।

কিন্তু না, দেবেশ্বরকে বলার জন্য চেষ্টা করতে দিলেন না বিশুদা। বললেন, 'বুঝতে পারছি এখান থেকে আপনারা চলে যেতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু না, চলে যেতে পারবেন না। কারণ এখন আর এখান থেকে যাওয়াটা আপনাদের ইচ্ছেয় হবে না। এখানকার জনগণের ইচ্ছেয় হবে।'

বিশুদার কথা শেষ হতেই হো হো করে খানিকটা হেসে নিলো দেবেশ্বর। তারপর বললো, 'বুঝতে পারছি, সুটকেস দুটো দেখেই আপনি ভেবে ফেলেছেন, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

ঠিক কিছু ধরতে না পেরে চমকে গেলেন বিশুদা। দেবেশ্বর ফের বললো, 'আসলে, সুটকেস দুটোর চাবি হারিয়ে ফেলেছি। চাবিঅলার কাছে যেতে হচ্ছে দুটো চাবি তৈরি করিয়ে নেবার জন্য। অনাদিবাবুই চাবিঅলার ঠিকানা বলে দিয়েছেন আমাদের।'

আমি বললাম, 'আসলে, সুটকেস দুটোর মধ্যেই আমাদের দরকারি সব জিনিসপত্র। এখুনি চাবি না বানিয়ে কোনো পথ নেই।'

'যাগগে, ভুল ভেবে ফেলার জন্য কিছু মনে করবেন না।' বলে বিশুদা সুটকেসগুলোকে সরিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসলেন।

দেবেশ্বরের দিকে তাকালাম আমি। গভীরভাবে কিছু একটা ভেবে যাচ্ছে দেবেশ্বর।

এমনিভাবেই হঠাৎ গাড়িতে উঠে বসবার কারণটা জিজ্ঞেস করবো নাকি বিশুদাকে? না, জিজ্ঞেস করবার দরকার হলো না। দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে নিজেই বললেন, 'আমারও চেনাজানা চাবিঅলা আছে একজন। আগে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। সে না পারলে তখন অনাদিবাবুর দেওয়া ঠিকানায় যাবো।'

আমার দিকে দ্রুত একবার তাকিয়ে খানিকটা অসহায়ভাবে দেবেশ্বর বললো, 'ঠিক আছে, তাই চলুন।' বলেই দেবেশ্বর

যুদ্ধ

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ
রামরাবণ কি কুরুক্ষেত্র
ট্রয় অথবা গ্রেট ওয়রে
ব্রহ্মাণ্ডটা ক্রুদ্ধ;
হিরোসিমা নাগাসাকি
নিউক্লিয়ারের নতুন ঝাঁকি
পরমাণুর কম্প্যুটারে
দণ্ডিত এই যুদ্ধ।
যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ
নওজওয়ানের বেঁচে থাকার
অবকাশই রুদ্ধ
স্তম্ভিত তাই গান্ধী রবি
বিবেকানন্দ বুদ্ধ।
ধ্বংস হলো আকাশ নদী
ফুলেল হাওয়া সুদ্ধ
সৌরপথে অনাসৃষ্টি
চৈতন্যটা রুদ্ধ—
যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ।
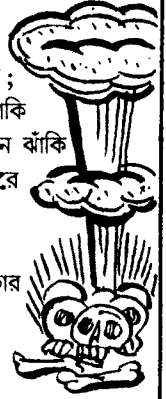
ঘড়ি

শৈবাল চক্রবর্তী

সারাদিন কথা বলে টিক, টিক, টিক,
দম যদি দাও তবে চলবে সে ঠিক।
তোমরা ঘুমোতে পারো পড়া ফাঁকি দিয়ে,
চিড়িয়াখানায় যাও বাবা-মাকে নিয়ে।
তার কোথা যাওয়া নেই সে থাকে ঘরে
সারাদিন তার কাজ মুখ বুজে করে।
মুখ বুজে? উঁহু না না, বলে টিক, টিক
যখন করার যা করো, ঠিক ঠিক।
দিদির কলেজ আছে, দাদার আপিস,
দাদু বলে কটা বাজে তা কি দেখেছিস?
হৈচৈ চিৎকার চেঁচামেচি চলে,
টিক, টিক ঘড়ি যায় এই কথা বলে।
টিক টিক নয় ঘড়ি জানো কি যে কয়,
হেলাতে হারিও না—তিলেক সময়।
সময়ের চেয়ে দামী কিছু নেই আর
ঘড়ি শুধু এই কথা বলে বারবার॥
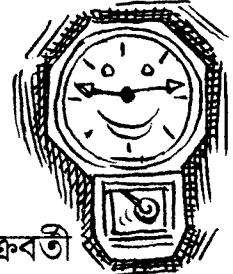
গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

এবার কি হবে? বিশুদা তো সত্যি সত্যি তার চেনা চাবিঅলার কাছে নিয়ে যাবেন আমাদের। সরে পড়বার সুযোগই পাবো না আমরা। পুরো প্ল্যানটা তাহলে গোলমাল হয়ে গেল!

দেবেশ্বর এবার এ ব্যাপারটা নিয়ে কি কিছু ভাবছে?

ভেবেও কি পথ বের করতে পারবে?

কি জানি!

অসহায়ভাবে ফিরে একবার শুধু খুশি-খুশি মুখে বসে থাকা বিশুদাকে দেখলাম।

বিশুদা পকেট থেকে হঠাৎ একটা কাগজ বের করলেন। তারপর সেই কাগজটার ওপর চোখ রেখে আমাদের বললেন, 'বুঝলেন, দুর্দান্ত একটা পোস্টার ছাপতে দিয়েছি। আজ সকালেই ছাপা হয়ে যাবে। বিকেল থেকে শহরের সব দেয়ালে শোভা পাবে সেই পোস্টারগুলো। কী লেখা হয়েছে সেই পোস্টারে এবার শুনুন।'

বলে পোস্টারে কি লেখা হয়েছে পড়তে শুরু করলেন বিশুদাঃ 'হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার। মাত্র পাঁচ টাকার টিকিট। দাদু-নাতি একসঙ্গে মজা পেতে চান তো চলে আসুন। সে যুগের গাড়িতে এ যুগের মানুষ। মাত্র পাঁচদিনের জন্য এ সুযোগ পাবেন। যোগাযোগ, বিশ্বনাথ সাঁতরা, হোটেল জয়সূর্য।'

পুরোটা পড়েই মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বিশুদা বললেন, 'বলুন, কী রকম হবে ব্যাপারটা?'

দেবেশ্বর গাড়ি চালাতে চালাতেই বললো, 'দারুণ।'

'জানতাম। তাই বলবেন।' বিশুদা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। আসলে, কিছুই আর মাথায় আসছে না আমার।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতেই বিশুদা হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যস, এখানে দাঁড় করিয়ে দিন গাড়ি।'

কোনও কথা না বলে দেবেশ্বর গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলো।

বিশুদা বললেন, 'চাবিঅলা এখনও বসেনি। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।' বলে ঘড়ি দেখলেন বিশুদা।

দেবেশ্বর কি যেন ভেবে নিলো মুহূর্তে। বললো, 'তাহলে একটা কাজ করি। আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে অনাদিবাবু যার কাছে যেতে বলেছেন, তার কাছে চলে যাই।'

'না না, অত ঘোরাঘুরির দরকার নেই। ঐ যে ডানদিকের গলিটা, ওই গলিতেই কোথায় যেন থাকে চাবিঅলা। ওকে আমি একবার তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য বলে আসছি।' বলে গাড়ি থেকে নেমে গলির দিকে পা বাড়ালেন বিশুদা।

না, আমরা কেউই ভাবতে পারিনি; এরকম একটা সুযোগ নিজেই আমাদের হাতে তুলে দেবেন বিশুদা।

দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে এই সুযোগটার কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম তাকে কিন্তু তার আগেই দেবেশ্বরের হাত চলে গেল গাড়ির চাবিতে।

গলির ভেতর বিশুদার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলো দেবেশ্বর। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, 'এটা শুধু সুযোগ নয়, শেষ সুযোগ—' বলেই চালিয়ে দিলো গাড়ি।

অনেকটা এসে একবার পেছন ফিরে কিছু একটা বুঝি দেখতে চেষ্টা করলো দেবেশ্বর। কি বুঝতে চেষ্টা করলো ঠিক ধরতে পারলাম না। সেজন্যেই আমি কিছু একটা জিজ্ঞেস করবার কথা ভেবে ফেললাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার আগেই হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দেবেশ্বর বললো, 'নাও, বলে ফ্যালো, বিশুদা এখন কি করছেন?'

'নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছেন।' মুহূর্তে বলে ফেললাম আমি।

কথাটা ধরতে না পেরে দেবেশ্বর বললো, 'কেন?'

'কারণ জনগণকে কি বলবেন আমাদের আটকে রাখতে না পারলে? বলো, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ আছে বিশুদার? বিশুদা নিশ্চয়ই জানেন, যঃ পলায়তি, স জীবতি!' দারুণ গম্ভীরভাবে বলতে চেষ্টা করলাম আমি।

বড়সড় একটা হাসিকে সামলাতে গিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করলো দেবেশ্বর। তারপর আমার দিকে ফিরে কোনওরকমে বললো, 'এবং কথাটা আমরাও জানি।'

এবার হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'ঠিক!'

——ছবিঃ রাজা চন্দ

জানা-অজানা

প্রবীর কুমার মৈত্র

অক্লান্ত যাজক-পথিক

একটানা আটাশ বছর ধরে পথে পথে হেঁটে চলেছেন এই মানুষটি। বয়স সাতান্ন বছর। কিন্তু, পেনসিলভেনিয়ার এই মানুষটির শরীরে কোনও ক্লান্তি নেই। ১৯৭২ সালে জন্মভূমি থেকে যে মহান যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শেষ হবে এই বছরে যিশুখ্রিস্টের জেরুজালেমে। এই মহান যাজক হাতে ক্রুশ আর বাইবেল নিয়ে জীর্ণ পোশাক পরে খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন বছরের পর বছর। উদ্দেশ্য দেশে দেশে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করা। হিংসা, যুদ্ধ, বিবাদে জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত এই বিশ্বকে প্রেম ও শান্তির প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করে তোলা।

একেবারে নিঃস্ব এই মহান যাজকটি হলেন ওয়াল্টার। এক জোড়া টায়ারের জুতো থাকলেও বেশির ভাগ সময়ই পথ চলেন তিনি খালি পায়ে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মেজদাদার চম্বল পর্ব

দীপঙ্কর বিশ্বাস

সূচনা

সেজদা আর ছকু হঠাৎই কোথায় হারিয়ে গেল। আমরা সকলে একসঙ্গে ছিলাম। মেজদা, সেজদা, ঢাকনাদা, গণেশ, ছকু আর আমি। একটা ফুটবল ম্যাচ জিতে ফিরছিলাম হরিগঞ্জ থেকে। সকলেরই দিল খুশ। ঠিক হলো আড়াই মাইলের মতন রাস্তা মাঠঘাটের ওপর দিয়ে হেঁটেই ফেরা হবে। বাসভাড়া যা বাঁচবে তার সঙ্গে আরো কিছু দিয়ে মেজদা আমাদের খাইয়ে দেবে। মেঠো রাস্তা ধরে আমরা এগোচ্ছিলাম ঝোপ-ঝাড়, কাদা, ঢিবি, ডোবা সব কাটাতে কাটাতে। ছকু আর সেজদা ছিল আমাদের বেশ খানিকটা আগে। ঢাকনাদা গুনগুন করে একটা গান ধরেছিল। মাধ্যমিকে বেশ কবার গাড্ডু মারলে কি হবে ঢাকনাদার গলাটা বেশ মিঠে। গানের কম্পিটিশনে একবার প্রাইজও পেয়েছে। তিলডুঙ্গির ফাঁকা মাঠ পেরোতে পেরোতে হঠাৎই আমরা খেয়াল করলাম আমাদের আগে সেজদা আর ছকু কোথাও নেই। মাঠটা বিরাট বড়ো কিন্তু সেজদা আর ছকু তো আমাদের এতো আগে ছিল না যে মাঠ পেরিয়ে যাবে।

মেজদা আশ্চর্য হলো, তাজ্জব ব্যাপার, ওরা কি দৌড়ে মাঠ পেরোল?

আমরা সকলেই অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। গণেশ বলল, সম্ভব না মেজদা, কোনও অলিম্পিক রানারও পারবে না এই মাঠ এতো তাড়াতাড়ি পেরোতে।

তবে? আমাদের চমকে দেবার জন্য কোথাও ঘাপটি মেরে বসে নেই তো?

আমরা ওদের নাম ধরে প্রাণপণ চিৎকার করতে করতে দৌড় লাগালাম সামনের দিকে। দশ মিনিট কাটল কারো কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

আচ্ছা কোনও বিপদ-আপদ মানে ডাকাত-টাকাতে ধরল না—

ডাকাতে ধরবে কি গেঞ্জি আর প্যান্টের জন্য?

কোনও বড়ো গর্তে-টর্তে পড়ে অচৈতন্য হয়ে যায়নি তো?

অচৈতন্য হলে নির্ঘাৎ চিৎকার করে জানাতো?

ঢাকনা চুপ কর, মেজদার মুখটা চিন্তিত দেখাল। ব্যাপারটা আমাদেরও কেমন গোলমেলে ঠেকতে লাগল। দু'দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ কোথায় উধাও হলো? কি করে হলো? সত্যিই কি উধাও হয়ে গেছে? হাজার প্রশ্ন আমাদের নিমেষে ছেঁকে ধরল চারদিক থেকে। প্রায় আধঘন্টা উদভ্রান্তের মতন ছোটাছুটি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা নির্মম সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে সেজদা আর ছকু প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের সামনে থেকে উবে গেছে।

মেজদা ধপ করে বসে পড়ল। অমু আর ছকুকে ছাড়া বাড়িতে মুখ দেখাবো কেমন করে?

সেজদাকে না দেখলে বাড়ির সকলে দুঃখে ভেঙে পড়বে।

ছকুর দুঃখে আমি মারাই পড়ব। বাজারহাট সব আগের মতন আবার আমার ঘাড়ে পড়বে। তাছাড়াও তিন টাকা ধার নিয়েছিল আর সেজপিসি আজ বেড়াতে এসেছে, ওর হাওয়াই চপ্পল ছকুর পায়ে।

আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ণ মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের দেখে সকলে চমকে গেল। মা কাকীমা ঠাকুমারা দৌড়ে এল। কি হলো রে? তোদের আধমরা দেখাচ্ছে কেন?

ছোটকা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বল তো? আগেও তো বহুবার ফুটবল ম্যাচে হেরেছিস। এমন মুহ্যমান তো কখনও দেখিনি তোদের? বিপদ-আপদ হয়নি তো? অমু কোথায়? হাত-পা ভাঙেনি তো?

ছকুর কথা কেউই জানতে চাইল না। ছকু ক'মাস আগেও ছিল সাইকেল চোর। হালে আমাদের বাড়ির সদস্য হয়েছে। তার প্রতি আগ্রহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। মেজদা এতক্ষণ যেন নিজের বাইরে চলে গেছল। অনেক কষ্টে নিজেকে ফিরিয়ে এনে খুব ভারী গলায় বলল, অমু আর ছকু হঠাৎ হারিয়ে গেল। আমরা বহু চেষ্টা করেও ওদের কোনও হদিস করতে পারলাম না।

কোথায় হারিয়ে গেল?

মেজদা ছোটকার প্রশ্নে হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত আর রূঢ় হয়ে উঠল। বড়োদের সঙ্গে ওকে এতো কর্কশ গলায় কথা বলতে আমরা জীবনে দেখিনি।

কোথায় হারিয়ে গেছে, কি করে হারিয়ে গেছে জানলে তো বাড়ি না ফিরে সেখানেই যেতাম। হারিয়ে গেছে ইজ হারিয়ে গেছে।

মেজদাকে সকলে চেনে। ছোটকা বুদ্ধিমান মানুষ, রাজনীতি করে, লোকাল এম. এল. এ। উত্তেজিত না হয়ে ছোটকা সব ঘটনা শুনে বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমি এক্ষুণি লোকাল থানা আর পার্টির ছেলেদের চারদিকে খোঁজ করতে বলছি।

মেজদা মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পর থেকেই গোটা এলাকায় আমাদের বাড়ির প্রেস্টিজ অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের বাড়ির যে কোনও ঝামেলাকেই লোকেরা নিজেদের ঝামেলা হিসেবে কাঁধে তুলে নেয়। ছোটকার পার্টি, পুলিশ আর এলাকার ছেলেরা খবর পেয়েই হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল সেজদা আর ছকুর খোঁজে। গোটা এলাকার গাছপালা, ঢিবি, ডোবা, জলের ট্যাঙ্ক, টিনের স্যুটকেস ছাড়াও সব সন্দেহজনক জিনিস তছনছ করে খোঁজা হলো। দু-চারজন অত্যুৎসাহী, গজপুর রেল স্টেশনে সেজদা আর ছকু ছদ্মবেশে ঘাপটি মেরে আছে কিনা দেখতে গিয়ে দু-তিনজন অপেক্ষারত রেলযাত্রীর দাড়িগোঁফ ছিঁড়ে এক কেলেঙ্কারি পাকালে, পুলিশ সেজদা আর ছকুর ছবি দেখে কুড়ি জনকে অ্যারেস্ট করল।

এত্তার নিরীহ লোক সেজদাদের খবর না জানার জন্য চড়-চাপড় খেল পুলিশের হাতে। কিন্তু সারারাত গোটা এলাকায় লাঙল চষেও সেজদা বা ছকুর টিকির হদিসও মিলল না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা আমার আর সেজদার ঘরে বসেছিলাম, কি করা উচিত সেই চিন্তা নিয়ে, হঠাৎ ঝড়ের

মতন ঘরে ঢুকল ছোড়দি। ছকু আর সেজদাকে দেখা গেছে টিভিতে। শীগগির দেখবে এসো।

কোথায় দেখা গেছে? টিভিতে?

উত্তেজিত ছোড়দি টেলিভিশনের সামনে বসে উন্মাদের মতন চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ। আমি এক্ষুণি টেলিভিশনে ওদের দেখেছি। গ্রামের একটা মেলায় সেজদা আর ছকু ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের কিছু বলতে চাইছে।

ছোড়দি তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

আমি পরিষ্কার দেখেছি। ওরা উদভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেজদার পরনে ডোরাকাটা জামা আর খয়েরী প্যান্ট। ছকুর স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট।

আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। একদম ঠিক বলেছে ছোড়দি। কিন্তু ওর তো এসব জানার কথা নয়। হাজার বার চ্যানেল ঘুরিয়ে ছোড়দি সেজদা আর ছকুকে ফিরিয়ে আনতে পারল না। আমরা ভীষণ মানসিক অস্বস্তিতে পড়লাম। বড়োরা সব শুনে একেকজন একেকটা মত দিল। ছোটকা বলল, সেজদার শোকে রমা বোধহয় ভুল বকছে।

ওটা হ্যালুসিনেশন। মানসিক শক থেকে হয়েছে।

নিশির ডাকেও কিন্তু ঠিক এমনটাই হয়।

পেট গরমের ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দাও দিকি। তখনই বলেছিলাম বেলের মোরব্বা খাওয়ানো বন্ধ কোরো না।

।। কি কাণ্ড। ।।

মানুষের মন থেকে আশা যাই যাই করেও যেতে চায় না। আমরা নানান জল্পনা-কল্পনার পর ঠিক করলাম আরেকবার তিলডুঙ্গির মাঠটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব, সেজদাদের অন্তর্ধানের বিন্দুমাত্র হদিস মেলে কিনা। তিলডুঙ্গির মাঠে পৌঁছতে আমাদের প্রায় দশটা বেজে গেল। রোদ-ঝলমলে বর্ষার দিন। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ কিন্তু আমাদের মন নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা। বিরাট মাঠ, বেশ কটা ফুটবল গ্রাউন্ড পাশাপাশি ধরে যাবে। এখানে-ওখানে ছড়ানো সবুজ ঘাসের চাপড়া আর আগের দিনের জমে থাকা বৃষ্টির জল। আমরা আতিপাতি করে সারা জায়গা খুঁজলাম বারবার। নাঃ। সেজদাদের হারিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন কোথাও নেই। তিলডুঙ্গির মাঠের শেষ প্রান্তে, যেখানে ঝাপলা গাছপালার শুরু সেখানে আমার নজর পড়ল একটা ছোট ঘরের ভেতর টিভি চলছে, দরজাটা হাট করে খোলা। মেজদা আমাকে শুধোলে, এই ঘরটা কি আমরা গতকাল দেখেছি?

গণেশ বলল, ছিল নিশ্চয়ই, আমরা খেয়াল করিনি।

মেজদা একটা ছোট জবাব দিল, তা হবে। চল ঘরের ভেতরটা একবার দেখে আসি।

আমরা ঝটাপট সেঁধিয়ে পড়লাম ঘরটার ভেতর।

ফাঁকা ঘরে গোটাকতক চেয়ার-টেবিল। ঠিক যেন কোচিং ক্লাসের ঘর। সামনে, টেবিলের ওপর একটা টেলিভিশন চলছে। কেউ যেন টেলিভিশন দেখতে দেখতে অল্পক্ষণের জন্য বাইরে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে। আমি চেয়ারে বসতে বসতে মেজদাকে বললাম, একটু জিরিয়ে নিই। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলটা সামনেই পড়েছিল। মেজদা সেটা হাতে নিয়ে বলল, দেখি অন্য চ্যানেলগুলোতে কি হচ্ছে—

মেজদা রিমোটের বোতামে চাপ দিতেই এমন ভীষণ কাণ্ড ঘটল যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। খোলা দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর ঘর আর ঘরের সবকিছু ভীষণ বেগে ছোট হয়ে যেতে লাগল। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম দেওয়ালগুলো ছোট হতে হতে কাছে এগিয়ে আসছে। মেজদা, ঢাকনাদা, গণেশ, চেয়ার-টেবিল, টিভি সব হু হু করে ছোট হচ্ছে আর পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আমাকে দেখতে না পেলেও বুঝলাম আমিও ছোট হচ্ছি। ঘরটা সবসুদ্ধু ভীষণ বেগে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সকলে হতবাক। যে যার জায়গায় স্থাণুর মতন বসে আছে। মেজদা আর চেয়ার-টেবিলগুলো যখন দু'ইঞ্চির মতন, টেলিভিশনটা একটা লুডোর ছক্কার সাইজের, তখনই আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

।। আবির্ভাব ।।

যখন জ্ঞান হলো তখন চারদিকে তাকিয়ে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। সকলে চেয়ার-টেবিলের ওপর ঝিমিয়ে রয়েছি। চারপাশে ঘরটা কোথাও নেই। ঠিক যেন জামার মতন খুলে নেওয়া হয়েছে। আমাদের ঘিরে রয়েছে একরাশ লোক। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে। লোকগুলোর পরনে আমাদেরই মতন পোশাক অনেকের ঘাড়ে বন্দুক। আমরা সকলে এতই হতভম্ব আর অবসন্ন যে কথা বলা দূরে থাক ভালো করে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। চারপাশে নজর বুলিয়ে আমার সহসা মনে হলো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি জানি স্বপ্ন কিনা বোঝার জন্য চিমটি কেটে দেখতে হয়। আমি আমার পাশে ঝিমন্ত ঢাকনাদাকে একটা মোক্ষম চিমটি লাগালাম। ঢাকনাদা বেচারা একটা 'ধেঁয়াও' করে আর্তনাদের সঙ্গে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। বুঝলাম এটা স্বপ্ন নয় একদম চিমটি কাটা সত্যি। মেজদা আর গণেশও আতঙ্কিত মুখে ঘটনাটা এতক্ষণে বিশ্বাস করল। চারপাশে পাহাড়ী এলাকা। কিছু খেজুর, তাল, ফণীমনসা গাছ ইতস্তত ছড়ানো। আকাশের দিকে তাকালাম, সূর্যটাকে মনে হলো আমাদের সেই চেনা সূর্যটাই। যাক, অন্য কোনও গ্রহটহতে এসে পড়িনি। অন্য গ্রহ আমার একেবারে অপছন্দ। কোথায় অক্সিজেন কম, হাঁফ ধরবে। কোথায় গ্র্যাভিটি কম, চলতে গিয়ে তালগাছ সমান লাফিয়ে ফেলব।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে দুটো লোক এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। লোক দুটোর

দিকে তাকিয়ে আমি এমন চমকে গেলাম যে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়লাম কিন্তু আমার প্রাণ-পাখির একটা পা অন্তত খাঁচায় ফিরে এল।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেজদা আর ছকু। উস্কোখুস্কো, ক্লান্ত অবসন্ন। রাতে ঘুমোয়নি। সেজদা আর ছকুকে দেখে আমরা লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু ভয়ও পেলাম। এ কোন যমরাজ্য! ওদের কি আধসেদ্ধ করেছে! দু'জনের চুলই যেন ভিজে। ছকু আর সেজদাও আমাদের দেখে ধড়ে প্রাণ পেল।

আমি সেজদাকে ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, এ আমরা কোথায় এসে পড়লাম সেজদা?

ছকু বলল, চম্বলের ডাকাত, জব্বর সিং-এর ডেরায়।

ছকুর কথা শুনে আমাদের পিলে চমকে চমকে উঠতে লাগল।

এদের সঙ্গে কি ভাষায় কথা বলছ?

আম্‌মাদের হি-হিন্দিতে ক্‌কাজ চলে যাচ্ছে।

গণেশ প্রমাদ গনল, আমার হিন্দি শুনে গুলি করে দেবে না তো?

আমার মনে পড়ে গেল গণেশের হিন্দি কবিতা শুনে এক ষাঁড় ক্ষেপে গিয়ে এক কবিকে গুঁতিয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। জনতা দু'ভাগ হয়ে সরে দাঁড়াল। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে যে লোকটা গটগট করে হেঁটে এগিয়ে এলো, তাকে দেখেই আমাদের আক্কেল গুড়ুম। সাড়ে ছ' ফিট লম্বা, সাড়ে তিন ফিট চওড়া, কালো, কুচকুচে দাড়িওলা ডাকাতসর্দার জব্বর সিং। মিলিটারির পোশাক, ভাঁটার মতন চোখ, ফোলা ফোলা গাল দেখলে মনে হয় যমরাজ স্বয়ং। ডেন্টিস্টের কাছ থেকে দুটো কষের দাঁত তুলে ফিরছে। দু'পাশে দুই বন্দুকধারী রক্ষী আর সঙ্গে ভিজে বেড়ালের মতন এক ঢ্যাঙা সাহেব।

মেজদাকে চিনে বার করে জব্বর সিং প্রথমেই মেজদার সঙ্গে খুব খানিকটা কোলাকুলি করে নিল। আমরা একটু ভরসা পেলাম। এক্ষুণি অন্তত আমাদের দিয়ে কাবাব বানানোর প্ল্যান নেই। অন্য কোনো মতলব আছে জব্বরের। সাহেবের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল জব্বর। সাহেব জার্মান, Herr Von Gouche. সংক্ষিপ্ত আলাপ থেকে স্থান কাল পাত্র, জব্বরের উদ্দেশ্য খানিকটা বোঝা গেল। আমাদের থাকার জায়গা বাৎলে দিয়ে জব্বর বলল, ওর দুই স্যাঙাৎ ফাইফরমাস খাটার জন্য আমাদের কাছে কাছে থাকবে।

।। স্থান কাল পাত্র ।।

বুঝলাম আমরা মধ্যপ্রদেশে চম্বলের নামজাদা ডাকাতসর্দার জব্বর সিং-এর পাহাড়ী ডেরায় এসে পৌঁছেছি। আমাদের মানে মূলত মেজদাকে দিয়ে জব্বর অদ্ভুত কাজ করাতে চায়। জব্বর সিং-এর এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে আরেক সাংঘাতিক ডাকাত, তার নাম বব্বর সিং। দু'জনেই প্রাতঃস্মরণীয় নামী ডাকাত প্রয়াত গব্বর সিং-এর ছেলে। আগে দু'জনে একসঙ্গেই ডাকাতি করত কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি হবার পর তারা যার যার নিজের দল গড়েছে। পুরো শত্রু না হলেও তাদের ভেতর ভীষণ রেষারেষি। জব্বর চারটে ডাকাতি করলে বব্বর করবে পাঁচটা। জব্বর দুটো থাপ্পড় খেলে বব্বরকে খেতে হবে চারটে। গত তিন-চার বছর যাবত এই সময়ে জব্বর আর বব্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বন্দুক চালানো, অসিযুদ্ধ, কুস্তি, দৌড়ের সঙ্গে এতোদিন ছিল নাচগানের কম্পিটিশন। কিন্তু গতবছর থেকে বব্বর শুরু করেছে কটা নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দু'তিন জন জেল-পালানো বিদ্বান স্যাঙাতদের সাহায্যে। বিষয়গুলো গোলমেলে—অঙ্ক, ইংরিজি, ধাঁধাটাঁধা গোছের। নতুন স্যাঙাতেরা সত্যিই বিদ্বান। একজন তো নাকি ক্লাস এইট অবধি উঠেছিল। প্রায় পাশও করেছিল। গতবছর এই সাংস্কৃতিক ইভেন্টগুলোতে জব্বরের প্রতিযোগীরা বিশ্রীভাবে হেরেছে। তাতে বব্বরের লোকেরা ভীষণ দুয়ো দিয়েছে জব্বরকে। দু'দিন দু'রাত ওরা জব্বরের এলাকায় নেচে গেয়ে ফুর্তি করে গেছে। জব্বর সিং এতোই অপমানিত হয়েছে যে নিজের চুল ছিঁড়ে মাথার অর্ধেক টাক বানিয়ে ফেলেছে। ডাকাতি করতে গিয়ে অকারণে এগারোজনকে খুন করেছে যাদের শুধুমাত্র কান মলেও ছেড়ে দেওয়া যেত।

ডাকু জব্বর সিং এ বছর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাংস্কৃতিক ইভেন্টগুলো সে জিতবেই জিতবে। উচিত জবাব দেবে বব্বর সিংকে। ম্যাও সামলানোর জন্যই আমাদের আবির্ভাব চম্বলে। মেজদাকে আর আমাদেরকে প্রতিযোগিতার সাংস্কৃতিক দিকটা পুরো সামলাতে হবে। অঙ্ক, ইংরিজি, ধাঁধাটাঁধা। ঠিকঠাক জিতিয়ে দিতে পারলে জব্বর আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবে অক্ষত অবস্থায়। প্রতিযোগিতার এখনও দশ দিন বাকি।

ঢাকনাদা বলল, না জেতাতে পারলে যে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।

হারার পর বেচারা জব্বরকে ডালকুত্তার খোঁজে বেরোতে হবে।

আচ্ছা মেজদা, ডালমেশিয়ানই কি ডালকুত্তা?

আঃ গণেশ, এটা জীববিদ্যা আলোচনার সময় নয়।

হঠাৎই গণেশ উত্তেজিত হলো, একবার পালানোর চেষ্টা করলে হতো না মেজদা, কাছে নিশ্চয়ই লোকালয় আছে।

হাতি আছে।

তাহলে তো হাতি চেপেই পালানো যায়।

অনেকক্ষণ বাদে সেজদা হাঁ করল, হা-হা-হা—

কি হাওদা লাগবে হাতির সঙ্গে?

আমি আর সেজদা এক ঘরে থাকি বলে আমি সেজদার কথা অনেক সহজে বুঝি, তাই বলি, আঃ। সেজদা কি হা হা করে হাসতেও পারে না?

আমাদের থাকবার আস্তানায় পৌঁছে আমরা উৎফুল্ল না হয়ে পারলাম না। পাহাড় কেটে বানানো দিব্যি সুন্দর ঘর। ঘরে ওঠার ধাপগুলো একটু বেশি উঁচু। পা স্লিপ করলে কুড়ি ফুট নিচে পাহাড়ী

লোকটা এগিয়ে এলো

ঝরনায় ঠিকরে পড়তে হবে জেনে গণেশ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। গণেশের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, সত্যি মেজদা, দারুণ জায়গা! ঢুকতে অ্যাডভেঞ্চার বেরোতে অ্যাডভেঞ্চার। একটু স্লিপ করলেই ওই গাছের ঝুরিগুলো ধরে ঝোলা যাবে টারজানের মতন। ঝরনায় কটা কুমীর থাকলে আরো জমতো—

জব্বর সিং চম্বলের ডাকাত হলে কি হবে, প্রচুর বুদ্ধি আছে। ঘরে ছটা খাটিয়া, টিউবল্যাম্পের আলো, কালার টিভি, স...ব আছে। নিজস্ব জেনারেটার আছে জব্বরের। জব্বরের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আধুনিক। এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলাম পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় স্যাটেলাইট থেকে টিভি সিগন্যাল ধরার জন্য প্রচুর ডিশ অ্যান্টেনা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

মেজদা খুব গম্ভীরভাবে নিজের মনে বলল, বাড়িতে নির্ঘাৎ খুব ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। একটা খবর দিতে পারলে হতো—

কাছাকাছি নিশ্চয়ই পাবলিক টেলিফোন আছে।

তোর মাথা আছে। এই পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর টেলিফোন বুথ!

জব্বরের কথামতন ফাইফরমাস খাটার জন্য দু'জন লোক এসে গেল। একজনের নাম বোঁচকা, অন্যজনের নাম হোঁৎকা। আমার হাসি পেয়ে গেল ওদের দেখে। গণেশকে বললাম, হোঁৎকাটা বোঁচকার মতন আর বোঁচকাটা হোঁৎকা। হোঁৎকা আর বোঁচকা চাপাস্বরে জানাল যে ওরা আমাদের কাছে কাছে থাকবে ফাইফরমাস খাটবে আর বব্বরের শিবিরের খবর এনে দেবে। আমরা বুঝলাম যে ওদের আরেকটা কাজ হবে আমাদের ওপর নজর রাখা।

ছকু মেজদাকে বলল, বাড়িতে খবর দেবার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আমাকে আর সেজদাকে তোমরা টেলিভিশনে দেখোনি? আমরা তো কতো হাত-পা নেড়ে জানালাম, আমরা চম্বলে আছি।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। ছোড়দি তাহলে ঠিকই দেখেছিল। হকচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেটা কি করে সম্ভব হলো ছকু?

গুচেকে ধরে।

থাকার জায়গাটা মন্দ না। অ্যাডভেঞ্চারও হয়তো আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে আমার কেমন দিশেহারা লাগছিল। তাই প্রশ্ন করলাম, মেজদা তোমরা কেউ কেন জানতে চাইছ না আমরা এখানে এলাম কি করে?

স... স... সাই...

আহা সাঁই করে এলাম ঠিকই কিন্তু সাঁইটা হলো কি করে?

ছকু সেজদার মুখের কথা ছিনিয়ে নিল, ঠিক বলছে সেজদা। ওই সাইন্টিস্ট ভন গুচেটাই যতো নষ্টের গোড়া। ওর কাছে কম্পিউটার আছে, টেলিস্কোপ আছে, আরো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে। ওইসব বিদকুটে যন্ত্রপাতি দিয়েই হতভাগা এই কাণ্ড করেছে।

ও এখানে জুটল কেমন করে?

জব্বলপুরে বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলন হচ্ছিল। সেই সম্মেলনে জব্বর গিয়েছিল ছদ্মবেশে ডাকাতি করতে। এই জার্মান সাইন্টিস্ট হের ভন গুচের লেকচার শুনে হলসুদ্ধ বৈজ্ঞানিকের লোম খাড়া হয়ে উঠল। সকলে পলকহীন, বাকশক্তি রহিত। জব্বর বোকা না। সে অন্য বিজ্ঞানীদের মুখের হাবভাব দেখে আর তাদের আলোচনা শুনে বুঝল যে ভন গুচে বিজ্ঞান জগতে একটা বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। টেলিভিশনে এতোদিন

শুধু মানুষের ছবিই নিমেষে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। ভন গুচে কি সব কায়দা-কানুন করে, মাত্রা কমিয়ে এনে, মানুষকেও টিভির ছবির মতন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। সব এরোপ্লেন কোম্পানির মাথায় হাত পড়বে এই আবিষ্কারের ঠেলায়। জব্বর হিসেবটা পরিষ্কার বুঝল। ভন গুচে একাই একটা সোনার খনির সঙ্গে তিনটে আলিবাবার রত্নভাণ্ডার। সম্মেলনের শেষ দিন ব্যাঙ্কোয়েট পার্টি মানে বিশাল ভোজসভা। সব বৈজ্ঞানিকরা ফুর্তি করছিল আর গুচে নিজের ঘরে বসে একমনে কম্পিউটার চালাচ্ছিল। জব্বর সিং-এর দলবল ভন গুচেকে যন্ত্রপাতিসুদ্ধ টপাৎ করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সটান এখানে।

ভ..ভ..ন..গু..গু..চে লোক ভাল।

হ্যাঁ সন্ধ্যেবেলা ডাকাতরা ডাকাতিতে বেরিয়ে যাবার পর গুচেকে ধরে একটু কাঁদুনি গাইলে, গুচে আমাদের বাড়িতে যে টিভি চ্যানেল খোলা আছে তাতে ঢুকিয়ে দেবে। অল্প সময়ের জন্য বাড়ির লোকে আমাদের টিভি স্ক্রীনে দেখতে পাবে। যেমন ছোড়দি আমাদের দেখেছিল। তখন সব খবর দিয়ে দেওয়া যাবে।

মেজদার কপালে চিন্তার ভাঁজ। মাত্রা কমিয়ে এনে মানুষকে টিভি সিগনালের মতন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়? কি করে সম্ভব?

নিশ্চয় সম্ভব। না হলে আমরা এই চম্বলের ডেরায় আসতাম না।

আমরা গুচের কাছে ঠিক রাত আটটার সময় যাবো।

ঠিক আটটা কেন?

ভন গুচেকে রাজী করাতে কিছুটা সময় যাবে। তারপর, ওর কথামতন, যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ও আমাদের বাড়ির টিভি চ্যানেলে পাঠাবে সেটা ঘুরতে ঘুরতে নটা থেকে নটা দশের ভেতর ঠিক জায়গায় আসবে।

মিনিট পাঁচেকের ভেতর খাবার এসে গেল। গরম গরম রুটি, ডাল, সবজি আর টক দই। বাইরে ঝরনার দিকে তাকিয়ে খাটিয়ায় বসে খেতে খেতে সকলেই কেমন আনমনা হয়ে পড়লাম। গণেশ একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল, বাড়ি আর না ফিরলে কেমন হয় তাই ভাবছি।

এখানে ড... ডাকাতদের সঙ্গে ঘ্-ঘ্-ঘো—

হ্যাঁ ঘড়া ঘড়া মোহর নিয়ে— মন্দ হবে না।

আঃ—ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে বলছে সেজদা।

হ্যাঁ। আর ঘো... ঘো...

আবার গোঁ ধরছিস কেন?

গোঁ না মেজদা ঘো, শুধরে দিল গণেশ।

ঘ.. ঘোড়া... ট্..টা..টা..টা— আর টানতে পারল না সেজদা।

ঠিক। ঘোড়ায় উঠলে চিরতরে টাটা করার সম্ভাবনা প্রচুর।

আমি বলতে বাধ্য হলাম, আঃ, সেজদা ঘোড়া টানার কথা বলছে।

অ্যাঁ! ঘোড়া টানবে কেন? ঘোড়াই তো সবকিছু টানে।

ঘোড়া টানে না? কি যে বলো।

প্রবাদেই আছে ঘোড়া টেনে জলের কাছে নিয়ে গেলে ঘোড়া তখন লজ্জা পায়। জল খায় না। ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য, জল টেনে ঘোড়ার কাছে নিয়ে যেতে হয়। মগে বা বালতিতে।

কি মুশকিল! সেজদা বন্দুকের ঘোড়াটানার কথা বলছে।

মেজদা আর ছকু ছাড়া আমাদের সকলেরই মনে হচ্ছিল বাড়ির চেয়ে ঢের ভালো জায়গা এটা। পড়া নেই শোনা নেই অসভ্যতা করলে বকুনি নেই। পটাপট ঘোড়া চড়ো, ফটাফট বন্দুক ছোঁড়ো আর যা প্রাণ চায় করো, ব্যস।

।। হের ভন গুচে ।।

সন্ধ্যেবেলা আমরা বাড়িতে খবর পাঠাবো বলে ভন গুচের ঘরে সেঁধিয়ে পড়লাম। গুচে তার লম্বা-চওড়া জার্মান চেহারা নিয়ে একমনে কম্পিউটার চালাচ্ছিল।

মেজদা গুচের আবিষ্কারের কথা জানতে চাইল ইংরিজিতে। গুচে ভীষণ খুশি হলো। প্রচুর যন্ত্রপাতি গুচের ঘরে। কম্পিউটার, টেলিভিশন, টিভি ক্যামেরার সঙ্গে নানা রকমের অচেনা যন্ত্র আর দুটো বড়ো টেলিস্কোপ। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে গুচে আমাদের যা বলল তা শুনতে শুনতে আমরা উত্তেজিত, মুগ্ধ আর নার্ভাস হয়ে পড়লাম।

একটা টেলিস্কোপ দেখিয়ে গুচে জানাল যে ওটা কোনও সাধারণ টেলিস্কোপ নয়। ওটা রেডিও টেলিস্কোপ, যা মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা আজকাল মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহার করে, খানিকটা সেইরকম। স্যাটেলাইট থেকে প্রতিফলিত বা রিফ্লেক্ট করে টেলিস্কোপ দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। টেলিস্কোপের এতো জোর যে ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ পর্যন্ত পরিষ্কার চিনতে পারে। এ পর্যন্ত নতুন কিছু না। এটা অ্যামেরিকার সামরিক প্রযুক্তিবিদরা Remote Sensing পরিচ্ছেদে জলভাত করে ফেলেছে। কিন্তু এই প্রযুক্তিকে টানতে টানতে ভন গুচে যে আবিষ্কার করেছে তা সারা শরীরে শিহরন জাগায়। গুচের আবিষ্কার বিশ্ব কাঁপিয়ে দেবে।

যে ঘরটাতে চড়ে আমরা এসেছি তার নাম ডেমন। তৈরি এক বিশেষ অ্যালয় দিয়ে। এই নতুন আশ্চর্য অ্যালয় আবিষ্কার করেছে গুচের বিজ্ঞানী সহকর্মীরা। ডেমনের ওপর গুচের দ্বিতীয় টেলিস্কোপটা ফোকাস করলেই টেলিস্কোপ থেকে ডেমনের ওপর গিয়ে পড়বে এক বিশেষ ধরনের এক্সরে। ডেমনের প্রতি অংশের প্রতিটি কণা এই রশ্মির তালে তালে স্পন্দিত হতে শুরু করবে। তখন কম্পিউটারে বসে কিছু প্রোগ্রাম চালাবে গুচে। ব্যস ডেমন আর তার ভেতরের সবকিছুর মাত্রা কমতে থাকবে। কমতে কমতে একটা বিন্দু বা কণায় এসে দাঁড়াবে ডেমন। এই কণাকে বিদ্যুৎকণায় পরিণত করে তাকে টেলিভিশনের সিগনালের সঙ্গে মিশিয়ে গুচে টিভি সিগনাল বা তরঙ্গটাকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে দেশ

থেকে দেশান্তরে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম অনুযায়ী ডেমন গিয়ে ল্যান্ড করবে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে। মহাবিশ্বে পাড়ির কথাও গুচে ভাবছে। ডেমনের ভেতরের সবকিছুও স্থানান্তরিত হবে ডেমনের সঙ্গে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম শেষ হলেই ডেমন আর তার ভেতরের সব, নিজের মাত্রা ও আকার ফিরে পাবে। গুচে সারাক্ষণ প্রথম টেলিস্কোপে বসে দেখবে ডেমনের আনাগোনা। ছোট হওয়া বড়ো হওয়া।

হের ভন গুচের কথা শুনে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। আমার মনে পড়ে গেল ক'ঘণ্টা আগের, তিলডুঙ্গির মাঠের, একতলা ঘরের কথা। সবকিছু সাঁ সাঁ করে ছোট হয়ে যাচ্ছে, দেওয়ালগুলো এগিয়ে আসছে আমাদের গিলতে।

সেজদা ফিসফিস করল, স-সাংঘাতিক লোক চঁ...চাঁ..

সেজদার চাঁদি গরম হয়ে গেছে। চান করতে চাইছে।

আঃ! সেজদা বলছে সাংঘাতিক লোক, আমাদের চাঁদে পাঠিয়ে দিতে পারে।

মেজদাই শুধু নার্ভাস না। চোখে বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসা জ্বলজ্বল করছে। এই মাত্রা কমানোর ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন প্রফেসর গুচে—

ব্যাপারটা বোঝা একটু শক্ত। তুমি পড়াশোনা করো, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানো, হয়তো বুঝবে কিন্তু অন্যরা বুঝবে না। আমরা সাধারণত কোনও বস্তুর তিনটে মাত্রা বুঝি। ধরো একটা বাক্স আছে, তার তিনটে মাত্রা হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। বাক্সটার তিনটে মাত্রা নিয়ে আমি যদি এমন একটা প্রোগ্রাম লিখতে পারি, যা চালালে মাত্রাগুলো কমতে থাকবে তাহলে শেষমেশ আমরা কোথায় পৌঁছব?

মেজদা একটু ভাবল, একটা মাত্রাহীন বিন্দুতে।

সেই বিন্দুটাকে বিদ্যুৎকণায় পরিবর্তন করে টিভি সিগনালের সঙ্গে মেশালে বিন্দুটাও টিভি সিগনালের মতন কাজ করবে। ব্যাপারটা আমি যতোটা পারলাম সহজ করে বললাম, আসলে খুবই কমপ্লিকেটেড।

মেজদা কি বুঝল বলতে পারবো না। আমাদের মাথা আরো গুলিয়ে গেল।

অনেক কাকুতি-মিনতিতে গুচে রাজী হলো আমাদের বাড়িতে চালু টেলিভিশনের চ্যানেলে আমাদের হাজির করতে।

টেলিস্কোপে চোখ লাগাল গুচে। তোমাদের হলো ক্যালকাটার খুব কাছে মানে ২৩° ল্যাটিচিউড আর ৮৮° লনজিচিউড-এর আশেপাশে। গুচে টেলিস্কোপে যা দেখছে সেটা আমরাও দেখছি পাশে রাখা একটা টেলিভিশন স্ক্রীনে। গুচে অনেকগুলো নব পরের পর ঘুরিয়ে চলল। আমরা ডায়মন্ডহারবার চিনতে পারলাম। তারপর আস্তে আস্তে হাওড়া ব্রিজ, মনুমেন্ট, টাটা সেন্টার দেখলাম। তারপর আমাদের পথনির্দেশ মেনে গুচে পৌঁছল আমাদের মফস্বল শহরে। আমরা দেখলাম আমাদের গুদোম পাড়ার শিবমন্দির। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম, ওই তো আমাদের বাড়ি। গুচে টেলিস্কোপের জোর বাড়াতে লাগল। ওই তো ছাতে আমাদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে। ছাতের ঘরের টেলিভিশনে ছোড়দি আর কাকীমা ডি. ডি. সেভেনে বাংলা অনুষ্ঠান দেখছে। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। উত্তেজনায় রগের কাছ দুটো দপ দপ করছে। গুচে বলল, একজন এখানে বসে টেলিস্কোপে বাড়ির লোকেদের প্রতিক্রিয়া দেখ, অন্যরা এইখানে জড়ো হও। আমরা একটা তিন ফিট বাই তিন ফিট নিচু লোহার টেবিলে জড়ো হলাম। মেজদা টেলিস্কোপে বাড়ির ছবি দেখতে লাগল। গুচে টিভি ক্যামেরাটা আমাদের দিকে ফেরাল। এটা সাধারণ টিভি ক্যামেরা না। এই ক্যামেরা ছবির সঙ্গে তোমাদের সত্তাকেও টেনে নিয়ে যাবে। হঠাৎই ভন গুচের গতি ভীষণ বেড়ে গেল। গুচে কম্পিউটারে বসে ভীষণ বেগে টাইপ করে চলল। তারপর উঠে দ্বিতীয় টেলিস্কোপটার গায়ে একটা লাল বোতাম টিপল। লোহার টেবিলটা ভীষণ জোরে কেঁপে উঠল। আমাদের মাথা ঘুরে গেল।

নিমেষে দেখি আমরা এক নাচগানের লাইভ প্রোগ্রামে ঢুকে পড়েছি। স্টেজের জোরালো আলোয় ছেলে-মেয়েরা কি একটা গানের সঙ্গে নাচছিল, আমরা ওদের তালে তাল মিলিয়ে সমস্বরে গান ধরলাম। নাচতে লাগলাম।

আমরা আছি চম্বলে
পুঁটিমাছ যেন অম্বলে
ডাকাতগুলো ফিরলে পরে
থাকবে কি প্রাণ সম্বলে?
ডাকাত গোলাগুলির মাঝে
আছি মোরা বড়োই বাজে
সুযোগ পেলে ফিরব ঘরে
নইলে বোধহয় ব্যোমভোলে।

গানটা আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে চললাম। যারা নাচছিল তাদের নাচ প্রথমটায় থেমে গেল তারপর তারাও আমাদের সঙ্গে নাচতে লাগল।

সেকেন্ড পনেরো কাটল। নাচগানের ডিরেক্টর এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল কিন্তু আর পারল না। গর্জে উঠল, এটা কী? টিভি স্টেশন না মগের মুলুক? অ্যাঁ? কটা হতভাগা কোথা থেকে জুটে নাচগানের ভেতর ঢুকে একটা আদ্যিকালের রদ্দি গান গাইছে—

ভোম্বলেরই কম্বলে
খেয়ে পুঁটির অম্বলে
লম্বা দাদু কাত মারল
রইল না প্রাণ সম্বলে।
যত্তো ননসেন্স।

আমরা কোনও জবাব দেবার আগেই ভীষণ ঝাঁকুনি লাগল। টিভি চ্যানেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ধাতস্থ হবার আগেই মেজদার উল্লাস শুনতে পেলাম টেলিস্কোপের কাছ থেকে, রমা আর কাকীমা আমাদের চিনতে পেরেছে, আমাদের কথাও বুঝেছে।

গুচের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে দেখলাম দরজার কাছে হোঁৎকা আর বোঁচকা দাঁড়িয়ে আছে, গম্ভীর মুখ। ওদের দেখতেই পায়নি এমন মুখ করে মেজদা গুচেকে জিজ্ঞেস করল, তুমি পালাচ্ছ না কেন? তোমার যন্ত্র ডেমনে চেপে?

গুচে খ্যাঁক করে উঠল, ডেমনটাকে তোমরা আসার পর জব্বর হতভাগা যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা ভগবানই

জানে। তাছাড়া আমি ডেমনের ভেতর ঢুকলে বাইরে কম্পিউটারে বসে প্রোগ্রামগুলোকে একের পর এক ঠিকঠাক চালাবে কে শুনি? শুচে ফিরল মেজদার দিকে। অজয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা জানি বলেই তো বেছে বেছে জব্বরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অজয়কে এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। পারলে ওই হয়তো প্রোগ্রামগুলো শিখে নিয়ে চালাতে পারবে। আমি তাহলে দেশে ফিরতে না পারলেও তোমাদের মতন টিভিতে অন্তত দর্শন দিতে পারবো।

কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলোরও তাহলে একটা প্রোগ্রাম আছে?

ঠিক তাই।

মেজদা তাকাল ছকু, গণেশ আর আমার দিকে। তোরা তিনজন ডেমনের খোঁজ লাগা। খুঁজে বার করতেই হবে ডেমনকে। না হলে এখানে জিয়োনো কইমাছের মতন পচতে হবে।.

জব্বর যে বলল প্রতিযোগিতায় জিতলে ও আমাদের ছেড়ে দিয়ে আসবে!

বাজে কথা। ও মনে হয় আমাদের Slave-এর মতন রেখে দেবে।

মেজদার কথামতন ডেমনকে খুঁজে বার করার আগে শুচের কাছে আমরা জানতে চাইলাম ডেমনের পুঙ্খানুপুঙ্খ। শুচে বলল, ডেমনের মাথায় একটা ফোল্ডিং অ্যান্টেনা আছে। যেটা ঠিকঠাক থাকলে ডেমন রিমোট কন্ট্রোলে কাজ করে। অ্যান্টেনাটা মনে হয় ওরা মুড়ে নামিয়ে দিয়েছে; না হলে এই কম্পিউটার টার্মিনালে বসে ডেমনকে আমি মুহূর্তে এখানে আনতে পারতাম। জানা গেল ডেমনের রং গাছের পাতার মতন। তাই ওকে লুকিয়ে রাখা খুব সহজ। ডেমন সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য আমাদের দিল শুচে। আর ডেমনকে খুঁজতে সুবিধে হবে বলে দিল একটা অতিবেগুনী লেসার টর্চ।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ খাবার নিয়ে এল হোঁৎকা আর বোঁচকা। খাবার দেখে আর খাবারের সুগন্ধে সেজদা আর ঢাকনাদার গুনগুনে গান বেরিয়ে পড়ল। রুটি, ডাল, মুরগির রোস্ট, পেঁয়াজ আর চাটনি। আমি সকলের মুখের দিকে তাকালাম। সকলেরই কি চম্বলের ডাকাতে জীবন ভালো লাগতে শুরু করেছে!

।। জব্বর শিক্ষা ।।

পরদিন সকালে আমরা হাজির হলাম জব্বর সিং-এর দরবারে। জব্বর সিং ছোট একটা পাথরের টিলার ওপর রাজার মতন বসে আছে। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সাঙ্গোপাঙ্গরা। বেশির ভাগেরই কাঁধে বন্দুক। মুখময় দাড়ি-গোঁফ। সামনে একটা বেশ বড়ো মাঠ। জব্বর সিং প্রথমেই বলল, তোমাদের জানিয়ে রাখি, এখান থেকে পালানো অসম্ভব। পালানোর চেষ্টা করে, হাত-পা ভেঙে বেকার ঝঞ্ঝাট পাকিও না তোমরা। অজয়, তোমার পড়াশোনা আর বুদ্ধির কথা জানি বলেই আমি আর শুচে তোমাকে এখানে ধরে এনেছি। প্রথমে ভুল করে তোমার ভাইকে এনেছিলাম ওকে অনেকটা তোমার মতন দেখতে। কিন্তু...এই ভন শুচে হতভাগা কম্পিউটার চালিয়ে চালিয়ে সাধারণ অঙ্ক-টঙ্ক সব ভুলে মেরে দিয়েছে। বয়স্ক কাউকে আমরা আনিনি, ওরা বেকার ভজকট পাকায়। অজয়, তোমাকে অঙ্ক, ধাঁধা, ইংরিজি-টিংরিজির প্রতিযোগিতায় বব্বরের লোকেদের একদম কান কেটে ছেড়ে দিতে হবে।

সব কথাই হিন্দিতে হলো, আমি বাংলা করে দিচ্ছি।

জব্বর বলে চলল, আমার দলে একা আমি লেখাপড়া জানি। ওদের দলে চারজন জানে, একা পারা মুশকিল। আমি ইংরিজি আর অঙ্ক বেশ জানি। আমার মনে আছে আমরা অঙ্কর ক্লাসে G.C.M খুঁজতাম।

এখনও সকলে জি.সি.এম. খোঁজে—

সেকি! শিউরে উঠল জব্বর, এতো খুঁজেও জি. সি. এম পাওয়া যায়নি?

ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়।

সে থাক। গতবার আমাদের এইসব প্রতিযোগিতায় জজিয়াতি করার জন্য এক পাক্কা জজকে আমরা চোখে কাপড় বেঁধে ধরে এনেছিলাম। সে ব্যাটা জোচ্চুরি করে আমাদের হারিয়ে দিল। আমায় ওরা জিজ্ঞেস করল, ঘোড়ার ডাক্তারকে ইংরিজিতে কি বলে? ইংরিজিটা আমার জানাশোনা সহজ সরল। আমি উত্তর দিলাম Vegetarian। জজ হো হো করে হেসে উঠে বলল, হয়নি।

মেজদা চাপা স্বরে বলল, Veterinarian-এর জায়গায় Vegetarian খুব দোষের নয়।

ওরা আমায় জিজ্ঞেস করল, তিন সতেরয় কতো হয়? আমি জবাব দিলাম, বাহান্ন। জজ বলল, ভুল হয়েছে—একান্ন। আচ্ছা একের জন্য ভুলটা কি ভুল?

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঠিক, যাঁহা একান্ন তাঁহা বাহান্ন।

ছিঃ। একটা লোককে ছটা গুলি করা আর পাঁচটা গুলি করার ফল কি আলাদা? সেটা আমি জজকে বুঝিয়ে দিলাম। বাছাধনের সেই শেষ জজিয়াতি।

জব্বরকে হোঁৎকা আর বোঁচকা নির্ঘাৎ খবর দিয়েছে। জব্বর আমাদের কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে শুচের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা ওর মোটেই পছন্দ নয়। মেজদা বলল, মরেছে রে—শুচের সঙ্গে মেলামেশা না করলে কম্পিউটার প্রোগ্রামই বা শিখব কেমন করে? পালানোর দরকারে প্রোগ্রামগুলো আরো উন্নতই বা করব কি করে! মুশকিল হলো।

জব্বর বলে চলল, একটু সাইডের কথা আছে। তোমাদের একদম ডাকাত বনে যেতে হবে। কাকপক্ষীতে যাতে বুঝতে না পারে, তোমরা ডাকাত না বাইরের লোক। তাহলে ডাকাত সমাজে জোচ্চুরির জন্য টি-টি পড়ে যাবে। আর মুখ দেখাতে পারবো না।

এতোক্ষণ দিব্যি একরকম চলছিল, এবার কিন্তু আমরা আতঙ্কিত হলাম।

তোমাদের তিন-চারটে সহজ কাজ শিখে নিলেই হবে, ব্যস। ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া, মোচ রাখা আর খৈনী খেয়ে পিক ফেলা।

মেজদা বিনীত গলায় জানাল যে ছকু ছাড়া কারুরই মোচ গজায়নি তেমন।
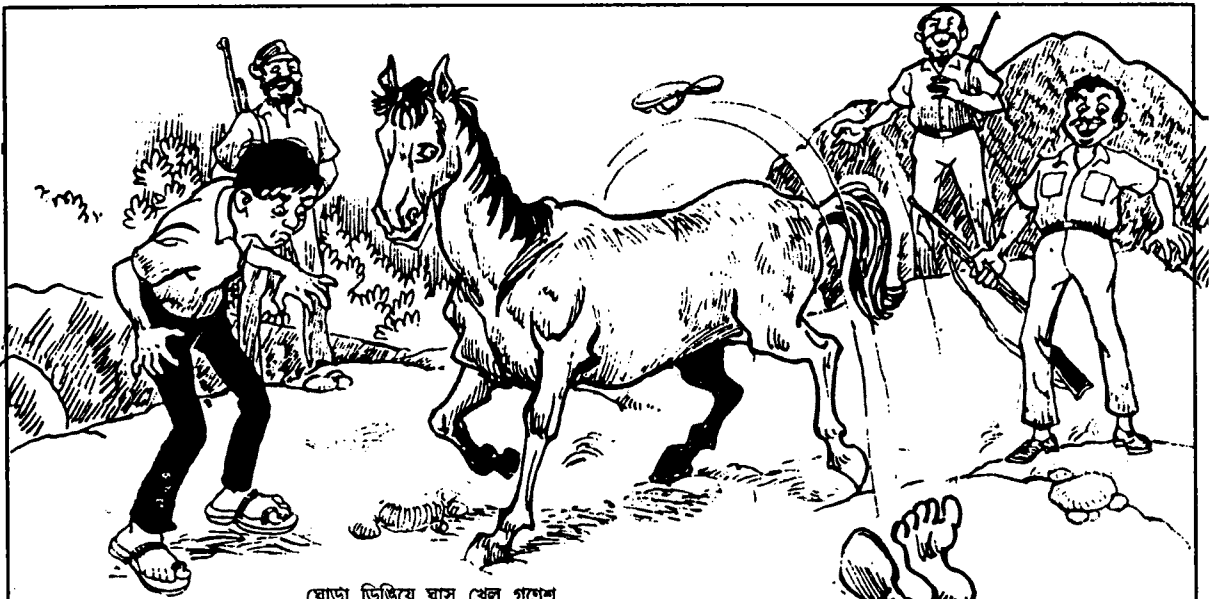
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল গণেশ

জব্বর মুখে খৈনী ঠুসে হাসল, আমার মোচ এক্সপার্ট আছে, সে সব্বার মোচ বানিয়ে দেবে। একটু সিরিশ কাগজ মারতে হতে পারে। সন্না দিয়ে একটু টানবে।

আমাদের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। একটা বিরাট সাইজের খয়েরি ঘোড়া আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বুকের ভেতর টিপ করে উঠল। করা উচিত হয়নি। সার্কাস, সিনেমায় ঘোড়ার ওপর নাচ, গান পিকনিক দেখে দেখে বাড়িতে ঘোড়া নেই বলে একটু অভিমানই ছিল। তাহলে—এখন কেন টিপ? অন্যদের মুখের দিকে তাকালাম। স্বস্তি নেই কারোরই।

জব্বর বলে দিল মেজদার ঘোড়ায় চড়া শেখার প্রয়োজন নেই। ঘোড়া থেকে পড়ে যদি মারা যায়, মাথা ফাটে বা পাগল হয়ে গান গেয়ে ওঠে বা ভুল বকে তাহলে জব্বরের প্ল্যান ভেস্তে যাবে। আমরা ঘোড়ায় চড়ার সম্ভাবনাময় দিকগুলো জেনে শঙ্কিত হলাম। সেজদা বলল, প.. প.. পরি...।

পরীরা পক্ষিরাজে চাপে সেজদা, এটা পক্ষিরাজ নয়।

হ্যাঁ সেজদা, পরিস্থিতি খুবই ঘোরাল....আমি তাকালাম গণেশের দিকে। যে কোনও রোমহর্ষক কাজে গণেশই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। ঠিক। গণেশ ঘোরাল পথে পা বাড়িয়েছে।

আমার ঘোড়াটাকে কেমন নেড়া নেড়া লাগল। মনের ভেতর ঘোড়ার রচনার সঙ্গে মেলালাম। গণেশকে নেড়া নেড়া বলাতে গণেশ রেগে উঠল। সব ঠিক আছে, ঘাড়ের কাছে চুল পর্যন্ত। ঘোড়ার কি বিনুনি থাকবে?

গণেশ ঘোড়ার কাছে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। জব্বর সিং চেঁচিয়ে গণেশকে ঘোড়াটাকে উত্তরমুখো নিয়ে যেতে বলল। হ্যাঁ, উত্তর দিকে একটা উঁচু পাথরের দেওয়ালে, ফুট-তিনেক উঁচুতে একটা বড়ো খাঁজ আছে। খাঁজে পা দিয়ে গণেশ অনায়াসে ঘোড়ায় চড়তে পারবে। ভগবান ঘোড়ার একটা হ্যান্ডেল দিলে পারতেন। গণেশ সেটা ধরে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যেত। লেজ ধরে টানলে চাট খেতে হতে পারে। তাই ঘোড়ার কানই ধরতে হলো গণেশকে। ঘোড়া বেচারা ইস্কুল-পাঠশালায় পড়েনি, কানের ওপর হামলায় সে অভ্যস্ত না। অনেকবার ছাড়িয়ে নিয়েও গণেশের কাকুতি-মিনতিতে সে রাজী হলো গণেশের সঙ্গে পাথরের দেওয়ালের কাছে যেতে। গণেশ কুংফু-ক্যারাটের দৌলতে লাফানো-ঝাঁপানোতে এক্সপার্ট। পাথরের খাঁজে পা দিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। হ্যাঁ উঠেই পড়ল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল গণেশ। মুখ থুবড়ে। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হেসে উঠল হা হা করে। ঘোড়াটা ভুরু কুঁচকে আড়চোখে তাকাল গণেশের দিকে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া তার মোটে পছন্দ নয়। গণেশ আবার পাথরের খাঁজে পা রেখে দম নিল। তারপর এক লাফে ঘোড়ার পিঠে সত্যি চেপে বসল। কষকষে করে কান
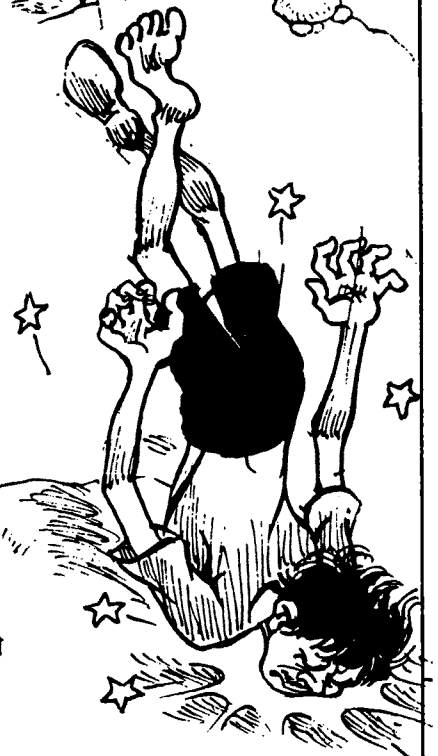
দুটো চেপে ধরল। বেটাকে কান ধরে দেখিয়ে দেবার ইচ্ছে ঘোড়া চড়া কাকে বলে। অপমানিত ঘোড়াও পরমুহূর্তে পিঠটাকে ধনুকের মতন করে একটা হেঁচকি তুলল। গণেশ শূন্যে দুটো পাক খেয়ে পড়তে পড়তে ঘোড়ার লেজ ধরে ঝুলতে লাগল। চারপাশের বন্দুকধারী দর্শকমণ্ডলী হাসিতে ফেটে পড়ল, হাততালি দিয়ে উঠল। লেজের উপর উপদ্রবে নার্ভাস হয়ে থেমে গেল ঘোড়া। গণেশ নেমে, দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। ঘোড়া ফিরে এল আমাদের কাছে। জব্বরের মুখ দেখে মনে হলো তার ভারি মজা লেগেছে।

ঢাকনাদা কবাডি খেলার এক্সপার্ট। সুন্দর লাফাতে আর ল্যাং মারতে পারে। চট করে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল ঢাকনাদা। টানটান হয়ে বেশ রাজার মতন বসল। ঘোড়াটাও দিব্যি হাঁটতে লাগল। দর্শকমণ্ডলী কিন্তু তাতেও হেসে গড়িয়ে পড়ল। বেচারা ঢাকনাদার বরাৎটাই খারাপ। শেষটায় একটু খুঁত থেকেই যায়। সেইজন্যেই মাধ্যমিকে পাশ করে না। একবার জিওমেট্রি প্রুফটুফ সব লিখে ফিগার আঁকতে ভুলে গিয়েছিল ঢাকনাদা। ঢাকনাদা শেষ মুহূর্তে নার্ভাস হয়ে উল্টোমুখো চড়ে বসেছে। ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে ভীষণ জোরে লাগাল ছুট। ঢাকনাদা ডিগবাজি মেরে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে লাগল। পাশের মতন লেজটাও ফস্কে গেল।

ছকু চাপা, কাঁপা গলায় মেজদাকে বলল, ঘোড়াটার গণ্ডগোল আছে।

মনে হয় না। ওই তো চারটে পা, দুটো কান, বুরুশের মতন লেজ। ডিম ছাড়া সব আছে।

যাই বলো, পিঠে চড়ানোর চেয়ে অসভ্যতাই তো ওর বেশি পছন্দ দেখছি। ছকু ক'মাস আগেও পাকা চোর ছিল। লাফানো, ঝাঁপানো, পাইপ ধরে ঝোলা সব কিছুতেই অভ্যস্ত। জব্বর সিং ছকুকেও বলল ঘোড়াটাকে উত্তরে নিয়ে যেতে। ঘোড়ার পিঠে ছকুর কুড়ি সেকেন্ডও কাটল না। ঘোড়া পেছু হাঁটতে লাগল, তারপর নাচতে লাগল। ছকু পড়ল ঘোড়ার গলা ধরে ঝুলে।

ঘোড়া .... কা... কা... কা..

আরে ঘোড়ার কাকাও ঘোড়া। পিঠে চড়বে বলে ঝোলাঝুলি করছে ছকু।

ঠিক বলেছ সেজদা। ছকু কাতুকুতু দিচ্ছে ঘোড়ার বগলে। আমার কথা শেষ হলো না। ঘোড়াটা ডেকে উঠল চিঁ... হিঁ... হি...হি...হি...হি করে। ভীষণ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আমরা বা সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কেউই জানতো না যে ঘোড়ার বগলে কাতুকুতু দিলে ঘোড়া হেসে গড়িয়ে যায়।

আমার বুকের ভেতর টিপ করে উঠল। নাঃ। ঘোড়া আমার বুকের ওপর লাফায়নি কিন্তু আমার পালা হাজির। আমি ফাঁসির আসামীর মতন ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জব্বর সিং যথারীতি বলল, আরে আরে, আরো উত্তর দিকে গিয়ে দেখোনা ইয়ার—

আমার প্রথমে থেকেই ঘোড়াটাকে নেড়া নেড়া লাগছিল। হঠাৎই আমার লোম খাড়া হয়ে উঠল। আমি গর্জে উঠলাম, জব্বর সিং তুমি আমাদের ভিনদেশী পেয়ে ঠকাচ্ছ। ঘোড়ার পিঠের সিট, সাইডের প্যাডেল, চোখের ঠুলি, লাগাম সব কোথায়?

আমি ছাড়া কেউই উত্তেজিত হলো না। ডাকাতরা আবার একজোটে হেসে গড়িয়ে পড়ল। জব্বর চিৎকার করে বলল, আরে সেইজন্যেই তো আমি বারবার উত্তরের দিকে যেতে বলছি। উত্তরের ওই পাথরের দেওয়ালের পরেই ঘোড়ার আস্তাবল। ওখানে জিন-টিন সব রাখা আছে। তোমাদের লোকেরা যদি গাধা হয় তো আমি কি করব? ঘোড়ায় জিন পরানোটাই তো প্রথম শিক্ষা।

আমি আর ঢাকনাদা দৌড়ে গিয়ে জিন ঠুলি লাগাম-টাগাম সব এনে জব্বরের নির্দেশ মতন লাগালাম। ওমা তারপর দেখা গেল ঘোড়ায় চড়া সাইকেল চড়ার চেয়েও সহজ।

খৈনী খেতে শেখাটা আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত। আমরা কেউই বিড়ি-সিগারেট খাই না। ছকু আগে যখন চুরি করত তখন খেত, তাও মাঝে-মধ্যে। কারুর পকেটে টাকার সঙ্গে বিড়ি থাকলে তবে।

খৈনীর সঙ্গে ঘোড়ার অনেক মিল। দুটোকেই ব্যবহারের আগে দলাই-মলাই করতে হয়। ঘোড়াকে তেল দিয়ে আর খৈনীকে চুন দিয়ে হাতের তেলোয়। দুটোর ব্যবহারেই মুখ চুন হয়ে যায়। দুটোর থেকেই মাথা ঘুরে পড়ার সম্ভাবনা খু-ব বেশি। চুন দিয়ে দলাই-মলাই করা খৈনী ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে রাখার পরেই সকলের মাথা ঘুরতে শুরু করল। আমি দেখলাম সেজদা টাল সামলাতে গিয়ে এমন হোঁচট খেল যে ঢাকনাদা সটান চিৎপাত। গণেশ দিব্যি হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু ও কি! গণেশ দুটো কেন। হঠাৎ দুটো গণেশই হাওয়া! দু'দুটো গণেশের জায়গায় চোখের ওপর উন্মুক্ত নীল আকাশ।

আমাদের বন্দুক চালনা শিক্ষা দিতে গিয়ে ডাকাত বাহিনী যে কি ভীষণ হিমশিম খেলো আর নাকাল হলো তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। রাইফেলের পেছনে ফেল কথাটা কেন আগে থেকেই লাগানো আছে তা বোঝা গেল। নামটা ট্রাইফেল হলে আরো উপযুক্ত হতো। রাইফেল যে শুধু সামনের লোককে ঘায়েল করে তা না। গুলি ছুটলেই বন্দুকের কুঁদো পেছনে যে ধাক্কা দেয় তাতে প্রায়ই পেছনের লোকও ঘায়েল হয়। ছকু একবার রাইফেলের কুঁদোর আঘাত এড়াতে, চোরের মতন চট করে রাইফেলটা কাঁধের ওপর তুলে ফায়ার করল। তারপরেই দু'দুটো 'বাবাগো' আর্তনাদ। প্রথমটা শিক্ষক ডাকাতের—সে ছিল ছকুর পেছনে। কুঁদো সপাট্টা শাসন করেছে শিক্ষকের নাককে; তারপর শিক্ষকের আচমকা গাঁট্টা শাসন করেছে ছকুকে।

আমরা ভেবেছিলাম আমার আর ঢাকনাদারই ভালো টিপ। দিব্যি তাল, নারকোল, ধুপধাপ পড়ে। ডাকাতরা খুশি হয়। বাকিরা ছোট গোল, সেজ গোল, মেজ গোল, বড়ো গোল আঁকা চাঁদমারি গোলকধাঁধায় বেকার গুলি করে। ওদের বাজে টিপ। জব্বর আমাদের ভুল ভাঙিয়ে দিল।

মোচ রাখার ব্যাপারটা সবচেয়ে ভয়ের। জব্বর সিং-এর মোচ এক্সপার্ট আর জব্বরের কথাবার্তা শুনে আমরা শিউরে উঠলাম। সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে সন্না দিয়ে মোচ টানাটানির কথা উঠতেই মেজদা বেঁকে বসল। তাহলে আমরা কোনও অঙ্ক, ইংরিজি-টিংরিজি করতে পারব না।

জব্বর বেগতিক দেখে বলল, যাত্রার ডাকাতদের মতন নকল গোঁফ লাগালেই চলবে।

।। গুচে হাওয়া ।।

পরের দিন বেশ ভোরবেলায় জব্বরের পুরো এলাকায় হঠাৎই জরুরি অবস্থা জারি হলো। একটা পাগলাঘণ্টি খুব জোরে বেজে চলেছে। ডাকাতেরা এই সাতসকালে ওঠে না। কিন্তু দেখলাম তারা সব উঠে বন্দুক হাতে ছুটোছুটি করে কিছু খুঁজছে। জানতে পারলাম, হের ভন গুচেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয় পালিয়েছে নয় চুরি হয়ে গেছে। সবাই সন্দেহ করছে এটা বব্বরের দলবলেরই কাজ। ডাকাতেরা চারদিকে বেরিয়ে পড়েছে গুচের সন্ধানে। আমরা জানি গুচের ডেমন ছাড়া আমাদের বাড়ি ফেরা হবে না। জব্বর আমাদের ছাড়বে না। ঢাকনাদা ডুকরে উঠল, আমার মাধ্যমিক পাশ করা হবে না।

ছকু বলল, আমার কপাল খারাপ। চুরি ছাড়লাম, এখন ডাকাতি করতে হবে।

আমি মেজদাকে বললাম, চলো গুচেকে আমরাও খুঁজি। জব্বরের কাছ থেকে কটা বন্দুক চেয়ে নিই।

জব্বর বেশ উদার আমাদের দুটো বন্দুক আর কার্তুজ দিল, মেজদা জব্বরকে জিজ্ঞেস করল, গুচে তোমাদের খাজানা—মানে রত্নভাণ্ডার লুঠ করে পালায়নি তো? বাবা, জার্মান বলে কথা। জব্বর সিং-এর কপালে ভাঁজ পড়ল। আমরা গুচের খোঁজে এগোচ্ছিলাম, মেজদা আমাদের থামাল। আমরা দেখলাম জব্বর সিং তড়বড় করে ছুটল দক্ষিণমুখো। একা। মেজদা বলল, যা ভেবেছি, ও নির্ঘাৎ ছুটেছে ওর রত্নভাণ্ডার ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে। চল ওর পেছনে যাই। কোষাগারের সন্ধানটা জেনে রাখা বিশেষ দরকার।

আমরা একটু দূরত্ব বজায় রেখে চললাম জব্বরের পেছন পেছন। মিনিট আষ্টেক পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটার পর জব্বর ডালপালা সরিয়ে একটা গুহায় ঢুকল। একটু অপেক্ষার পর গুহায় ঢুকে আমরা জব্বরকে দেখতে পেলাম না। ভীষণ অন্ধকার। চোখ একটু সইতে আমরা দেখলাম একটা সুড়ঙ্গ নেমে গেছে ঘুরপাক খেতে খেতে। একটু এগিয়ে দূরে দেখি জব্বর একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে। যদিও বাইরে সব জায়গায় ইলেকট্রিক আছে। চাবি বার করে তালা খোলার আওয়াজ পেলাম আমরা। তারপর মনে হলো একটা ভারী পাথর ঠেলে সরানো হচ্ছে। হঠাৎ চোখ ঝলসে গেল। ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে মশালের আলো ঠিকরে এল আমাদের অবাক করে দিতে। এতো ধনরত্ন! মেজদার কথামতন পা টিপে টিপে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম সুড়ঙ্গ থেকে।

মেজদার মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। এই ধনভাণ্ডারের সন্ধান মনে হয় জব্বরের বেশির ভাগ স্যাঙাতই জানে না। চল, এবার গুচেকে খুঁজে বার করি। আমরা যাবো পুবমুখো। ফাঁকা জায়গা দিয়ে মুণ্ডা নদীর চরে। ওদিকে গুচেকে কেউই খুঁজতে যাবে না। কারণ ওখানে কোনও লুকানোর জায়গা বা পালাবার পথ নেই।

আমরা গিয়ে কি করব?

চল না, কি করা যায় দেখি।

মুণ্ডা নদীর তীরে পৌঁছে আমরা হতভম্ব মেরে গেলাম। গুচে নদীতে চানটান সেরে প্রাকৃতিক শোভা দেখছে। আমরা মেজদার দিকে তাকালাম।

ব্যাপারটা কি? তুমি তো আগে থেকেই এটা জানতে মনে হচ্ছে।

মেজদা বলল, আরে গুচে রোজই ভোরবেলা এখানে আসে। ডাকাতরা ভোরে ওঠে না বলে কেউ জানে না। আজ আমার ওকে যোগব্যায়াম শেখানোর কথা আছে।

গণেশ শুধোল, তুমি যোগ জানো নাকি?

ছকু খ্যাঁক করে উঠল, এই এতো বড়ো বড়ো অঙ্ক কষে, যোগ জানবে না।

জব্বর জানলে কিন্তু আমাদের বিয়োগ ব্যায়ামের চান্স আছে।

ঢাকনাদা গুনগুন করল, ভাগ যাও। ভাগ যাও।

গুচেকে একটু যোগব্যায়াম শিখিয়ে, 'আজ এই অবধি', বলে আমরা ফিরে এলাম। মেজদার কথামতন আমরা রটিয়ে দিলাম যে গুচে সকলের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে মুণ্ডা নদীতে সুইসাইড করতে গেছল। আমরা ওকে অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি। বেচারা গুচে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বারবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও কেউ ওর কথায় পাত্তাই দিল না। আমি মেজদাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেজদা জেনেশুনে এইসব করার কি দরকার ছিল?

মেজদা হাসল, তুই বুঝবি ভেবেছিলাম। এক নম্বর, রত্নভাণ্ডারের হদিস জানা ভীষণ দরকার ছিল। এখানে সোনা আর বন্দুক ছাড়া কিছুই চলে না। ছকু আছে। যদি কিছু সোনা আনা যায় তো আমাদের সুবিধে হবে। দু'নম্বরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবি।

আধঘণ্টাও কাটল না একটা অছিলা করে জব্বর সিং আমাদের ঘরে এসে হাজির। মনে হলো গুচের আত্মহত্যার চেষ্টা ওকে বেশ নার্ভাস করে দিয়েছে। গুচের যন্ত্রগুলো ও ছাড়া আর কেউই চালাতে পারে না। গুচে মারা যাওয়া মানে জব্বরের শুধু কোটি টাকার দাঁও ফস্কানো না—গুচের যন্ত্রপাতি নিয়ে আরো যে সব রঙিন পরিকল্পনা আছে সেগুলো ভেস্তে যাওয়া। মেজদাকে জব্বর বুঝিয়ে বলল গুচের সঙ্গে থেকে ওর কম্পিউটার আর যন্ত্রতন্ত্রগুলো চালানো ভালো করে শিখে নিতে। যাতে গুচের অভাবে মেজদা যেন যন্ত্রগুলো জব্বরের কথামতন চালাতে পারে। আমাদের বলল, আমরা যেন গুচের সঙ্গে মিশে ওকে একটু খুশি রাখি।

জব্বর বেরিয়ে যেতেই মেজদা

মেজদার দু'হাত ধরে নাচতে লাগলো

লাফিয়ে উঠল। আমি আর গুচে এখন দিনরাত একসঙ্গে আলোচনা করব। আমাদের বাড়ি ফেরার প্রোগ্রাম তৈরি করব যা ডেমনের বাইরে কেউ কম্পিউটারে না বসলেও চালানো যাবে। সবাই একসঙ্গে ডেমনে ঢুকে যাবো তারপর ডেমন আমাদের গুদোম পাড়ায় নামিয়ে দিয়ে গুচেকে নিয়ে জার্মানি চলে যাবে। দ্বিতীয় কারণটা এবার বুঝলি তো? কিন্তু তোরা এখনও ডেমনের হদিস লাগাতে পারলি না?

গুচের অন্তর্ধানের কথাটা তুমিই রটিয়েছিলে? মেজদা জবাব দিল না শুধু হাসল।

।। কম্পিউটার প্রোগ্রাম ।।

সন্ধ্যেবেলা হোঁৎকা আর বোঁচকা চুপি চুপি এলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে গুপ্তচর গুপ্তচর ভাব করে বলল, মেজদা, বব্বরের অঙ্ক আর ইংরিজির খবর এনেছি। মেজদা গুচের কাছ থেকে নেওয়া কটা কাগজে বব্বরের শিবিরের অঙ্ক আর ইংরিজি নোট করে নিয়ে বলল, এমন খবর পেলেই দিয়ে যাবে। হোঁৎকা আর বোঁচকা অনেকক্ষণ হাত কচলাল বকশিসের আশায়। মেজদার 'সোনাগুলো কোথায় রাখলাম মনে করতে পারছি না। পেলেই তোমাদের দেব', প্রতিশ্রুতিতে ওরা বিদায় হলো।

মেজদা বলল, গুপ্তচরদের সামনে আলোচনা না করাই ভালো। ওরা আমাদের শিবিরের কথাও বব্বরের লোকেদের জানাচ্ছে। প্রথমে ইংরিজিটাই দেখা যাক। ঢাকনা ট্রান্সলেশন কর— টিকটিকিটি দেওয়ালে বসিয়া আছে। টিকটিকির ইংরিজি শক্ত। ওটা তোকে বলতে হবে না, টিকটিকি টিকটিকিই চলবে।

ঢাকনাদা একটু মাথা চুলকোল তারপর পরিষ্কার উত্তর দিল, টিকটিকি is sit down on the wall।

বোঝা গেল, তুই কেন গতবারও মাধ্যমিকে ইংরিজিতে এগারো পেয়েছিস। হো হো করে হেসে উঠল মেজদা, প্রশ্ন অনেক আছে কিন্তু একটাই জিজ্ঞেস করছি। Down-টা কেন লাগালি?

বা, সিটের পরে ডাউন আর স্ট্যান্ডের পরে আপ তো দিতেই হয়।

অঙ্কের প্রশ্নটায় আসা যাক, পাঁচটা নয় দিয়ে কি করে দশ লেখা যাবে?

সেজদা বলল, কাগজটা দাও। লিখল $\frac{৯৯}{৯৯}$ +৯=১০। আমি কাগজটা টেনে দিয়ে লিখলাম $\frac{৯৯}{৯}$ — $\frac{৯}{৯}$ =১০। মেজদা বলল, উত্তর দুটোই ঠিক আছে, অবশ্য এর আরো উত্তর হয়। একটা ধাঁধা দেখা যাক, একটা সিংহ বনের ভেতর ঢুকছে। কতোদূর ঢুকতে পারবে? আমরা সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। এটা তো বিটকেল প্রশ্ন, কতোদূর আবার ঢুকবে?

যতো দূর ইচ্ছে—

মেজদা আবার হাসল, তোদের মাথায় কি আছে! সিংহটা মাঝখান অবধি ঢুকতে পারবে তারপর তো বেরোবে। যাক একটা সুবিধে হলো, হোঁৎকা আর বোঁচকার জন্য আমরা বব্বরের প্রশ্নের মান আর ধরন বুঝতে পারলাম। চল এক্ষুণি গুচের ঘরে যেতে হবে।

আমাদের দেখে গুচে উদগ্রীব হয়ে উঠল। ডেমনের হদিস মিলল?

আমরা মাথা নিচু করে আমাদের ব্যর্থতা জানালাম। মেজদা গুচেকে বলল, তুমি বাড়ির টিভিতে দর্শন দেবে তো। চলো। প্রোগ্রামগুলো শিখে নিই। কম্পিউটার আমি চালাবো।

দারুণ ব্যাপার হবে। কিন্তু প্রোগ্রাম শিখতে তোমার সময় লাগবে।

কতো আবার সময় লাগবে! দুটো রাত জাগলেই হবে। আমাদের দিকে ফিরল মেজদা, অমু, ছকু, তোরা সবাই চলে যা, আমি রাতটা এখানেই কাটাবো। হোঁৎকাকে বলবি আমার খাবার এখানেই পৌঁছে দিতে।

পরদিন সকালে মেজদা কখন ফিরেছে আমরা জানি না। দেরি করে ঘুম থেকে উঠেই মেজদা আবার দৌড়োল গুচের ঘরে। বলে গেল, খাবার সময় দেখা হবে।

সারা দুপুর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোল মেজদা। উঠে বলল, আজকে মনে হয় রাত জাগতে হবে তবে অন্য কারণে। চল গুচেকে ওর দেশের টিভিতে ঘুরিয়ে আনি।

তুমি গুচের কম্পিউটার প্রোগ্রাম শিখে ফেলেছ?

অনেকটাই। অবশ্য ও হাতে ধরে শিখিয়েছে বলে এতো তাড়াতাড়ি শিখেছি।

গুচের ঘরে পৌঁছে মেজদা গুচেকে বলল, তুমি টিভিতে ঘুরে এস তারপর আমরা পালানোর প্রোগ্রাম নিয়ে বসব।

একদম এক কার্যপ্রণালী। আমরা যেভাবে আমাদের বাড়ির টিভিতে উদয় হয়েছিলাম। টেলিস্কোপটা জার্মানিতে নিজের বাড়ির ওপর ফোকাস করল গুচে। টিভি ক্যামেরা ফোকাস করার পর সেই লোহার টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে কম্পিউটারে বসা মেজদাকে শেষ কথাগুলোকে চেঁচিয়ে বলল গুচে। গুচের গলায় উত্তেজনা চলকে উঠেছে। ঠিক আটটা সাড়ে ছ' মিনিটে প্রোগ্রাম চালু করবে। দেড় মিনিটের বেশি কোনও মতেই চালাবে না। স্যাটেলাইট রেঞ্জ-এর বাইরে চলে যাবে। এস্কেপ কি-টা টিপে প্রোগ্রাম থেকে বেরোবে। মিনিট দুয়েক বাদে মেজদার ইঙ্গিত পেয়ে গুচে নামল টেবিলটা থেকে। নেমেই একটা ভি.সি.আর রিপ্লে করল। টেলিস্কোপের দেখা, গুচের বৌ-এর প্রতিক্রিয়া রেকর্ড হয়েছে ভি.সি.আর-এ। হ্যাঁ। গুচের বউ গুচেকে চিনতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে গুচের কথা। মেজদার হাত ধরে লাফিয়ে উঠল গুচে তারপর মেজদার দু'হাত ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল, আর চিৎকার করে একটা জার্মান গান ধরল। জার্মান গান যে অতো লম্বা হয় তা আমাদের জানা ছিল না। থামেই না কিছুতে। গানটা মনে হয় দুঃখের। গুচের চোখে জল। নাচগান থামাতে আমি, ঢাকনাদা আর সেজদা হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে গুচেকে জড়িয়ে ধরলাম। গুচে থামল। চোখ মুছে বলল, সত্যিই বড়ো দুঃখের গান, তাও তো দ্বিতীয় প্যারাটা ভুলে গেছি। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। একটা প্যারাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কম করে উনত্রিশ বার গেয়েছে। আমরা বুঝতেও পারিনি। সেজদা বলেই ফেলল, হ...হতভাগা।

What?

আমি বুঝিয়ে দিলাম, হত—very good ভাগা—very very sad.

গুচের মেজাজ শরিফ। আমরা সকলে গুচের গা ঘেঁষে বসলাম। মেজদা শুরু করল, আমার ধারণা বুঝলে প্রফেসর গুচে ডেমনকে আজ হোক কাল হোক খুঁজে পাওয়া যাবেই। আমি আর তুমি দু'জনে মিলে আরো উন্নত, আরো সুন্দর একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারব না?

কি রকম?

এখন তোমার যা প্রোগ্রাম আছে তাতে ডেমন এক সেট লোককে এক জায়গায় পৌঁছোতে পারে বা এক জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারে। নতুন প্রোগ্রামটা এমন হবে যে, আমরা সবাই ডেমনে ঢুকবো, ডেমন আমাদের দেশে নামিয়ে তোমাকে নিয়ে সটান জার্মানি চলে যাবে—

কি সুন্দর হবে, আমি যোগ না করে পারলাম না।

গুচে একটু ভাবল, খু...ব খাটতে হবে। আর আগে জার্মানিতে আমাকে নামাবে তারপর তোমাদের দেশে।

আমরা তোমার ছোট ভাইয়ের মতন, তুমি না থাকলে আমাদের ভয় করবে। তাছাড়া তুমি আমাদের সঙ্গে ক্যালকাটায় নেমে প্লেনেও চলে যেতে পারো জার্মানি।

মাথা খারাপ? সব এয়ারপোর্টে আমার ছবি আছে। এরোপ্লেন কোম্পানিগুলো ক্ষেপে আছে না! আমায় দেখলেই কিডন্যাপ করবে। সে ভাবা যাবেখন। কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে চালু করতেই হবে কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সেটা কে করবে? তাকে তো থেকে যেতে হবে—

আচ্ছা প্রফেসর গুচে, প্রোগ্রাম চালু হবার পর একটু সময়ের ব্যবস্থা করা যায় না? তাহলে আমি বা তুমি যে কেউ একজন প্রোগ্রাম চালু করে দিয়ে দৌড়ে এসে ডেমনে ঢুকতে পারি।

সম্ভব না। প্রোগ্রাম চালু হলেই কম্পিউটার প্রথমেই চারটে মাত্রা মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর সময় কাঁটায় কাঁটায় মেলাবে। এক চুল এদিক-ওদিক হলে ইন্ডিয়া না হয়ে আটলান্টিক হতেই পারে।

আমরা গুচের কথায় শিউরে উঠলাম।

।। চেষ্টার শেষে সোনা ।।

মেজদার কথামতন আমি, গণেশ, সেজদা আর ঢাকনাদা হের ভন গুচের আশ্চর্য বাহন ডেমনের খোঁজ করছিলাম দিন-রাত্রি। সমস্ত দিকে। সব গুহাগহ্বর ডালপালার ফাঁকে। নানান অছিলা

করে— কখনও ডাকাত সেজে। জেদের বসে আমি আর গণেশ একবার বব্বরের এলাকাতে পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলাম। গুচে আমাদের ডেমন সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য দিয়ে বলেছিল, ডেমনের এমনি আলোয় গাছপালার মতন রং। চেনা কঠিন। এই অতিবেগুনী লেসার টর্চটা রাখো। (একটা ছোট পেনলাইটের সাইজের লেসার টর্চ দিয়েছিল গুচে আমাদের।) এর আলোয় ডেমন অস্বাভাবিক ঝকমক করে উঠবে ফুলঝুরির মতন। দূর থেকে দেখা যাবে। কিন্তু সাবধান এই লেসার টর্চ যেন কারো চোখে সোজা না পড়ে। সে অন্ধ হয়ে যাবে মুহূর্তে। তাছাড়া ডেমনের ওপর যে ফোল্ডিং অ্যান্টেনা আছে সেটা সূর্যের আলোয় ঝকমক করে। এইরকম কাঠামো অ্যান্টেনাটার। আমরা গুচের লেসার টর্চ ব্যবহার করলাম সব সময়। দুয়েকবার ভাঙা কাচ-টাচ থেকে সূর্যের প্রতিফলনে ভুল হলো। কিন্তু চার পাঁচ দিন খুঁজেও ডেমনের কোনও হদিসই মিলল না।

সন্ধ্যেবেলা আমরা ব্যর্থ মনে আলোচনা করছিলাম ডেমনকে আর কোথায় কোথায় খোঁজা যায়, হঠাৎ ঘরে ঢুকল মেজদা। গুচের ঘর থেকে ফিরেছে। ডেমনের খোঁজ পাওয়া যায়নি শুনে মেজদা আমাদের ইডিয়ট, গাধা, মুখ্যু-টুখ্যু বলে গালাগাল দিল তারপর নিজের মনে বলল, এমনিতে হবে না, বুদ্ধি খরচ করতে হবে। হেঁৎকা আর বোঁচকা গুপ্তচর দুটো নির্ঘাৎ ডেমনের সন্ধান জানে।

ঢাকনাদা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, সত্যিই আমরা গাধা। একবার পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করলাম না। এখন তো আমরা ঘোড়া চড়তে পারি। বন্দুক ছুঁড়তে পারি। অজু প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবে কিনা, ডেমনকে পাওয়া যাবে কিনা কিছুরই ঠিক নেই। সেই আশায়....

গণেশও বলল, মেজদা, একবার চেষ্টা করা উচিত। ডাকাতেরা সন্ধ্যেবেলা ডাকাতি করতে বেরিয়ে গেলে বাকি যে ঘোড়াগুলো পড়ে থাকবে তার ভেতর থেকে ঘোড়া বেছে নিয়ে...

চ... চ... চম...

হ্যাঁ। চম্বল ছেড়ে চম্পট।

উঁহু। সেজদা বলছে ধরতে পারলে চমচম বানিয়ে দেবে জব্বর সিং।

আমরা প্ল্যান করে ফেললাম যে সন্ধ্যের পর ডাকাতেরা বেরিয়ে গেলেই আমরাও ঘোড়া বেছে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। বন্দুক এক-আধটা যোগাড় হয়ে যাবেই। ডাকাত দলের যারা রক্ষী হিসেবে ডেরায় থেকে যায়, তারা ভারি বোকা হয়। একটা রদ্দা মারলেই মুচ্ছো যাবে। বহু সিনেমায় দেখেছি। তাদের বন্দুকগুলো নিয়ে নেব। মেজদার ঠিক মনঃপূত না হলেও রাজী হলো।

সন্ধ্যে একটু গড়াতেই ডাকাতদের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে বোঝা গেল ডাকাতরা বেরিয়ে গেল। বাইরের ক্ষীণ আলোয় আমরা ঘাপটি মেরে চললাম আস্তাবলের দিকে। গণেশের পেছনে পেছনে আমরা হুড়মুড় করে আস্তাবলে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্তর একটা ল্যাংড়া ঘোড়া এক কোণে একমনে কান নাচাচ্ছে।

ঢাকনাদা সব দেখে শুনে ক্ষেপে উঠল। হতভাগা. কিপ্টের দল। কটা এক্সট্রা ঘোড়াও রাখতে পারে না। বিটকেলের ঝাঁক। আমার কিচ্ছু দরকার নেই। আমি হেঁটেই বেরিয়ে পড়ব। যা হয় হবে।

মেজদা খুব ধীর গলায় বলল, একটা ঘোড়া ছিল, তার সঙ্গে একটা গাধা জুটল।

হতাশ আমরা ফিরে এলাম। ধপ ধপা ধপ বসে পড়লাম ঘরের ভেতর এদিক-ওদিক।

কম করে পনের মিনিট ভীষণ চিন্তা করতে করতে অস্থিরভাবে পায়চারি করার পর মেজদা বলল, আজ রাতেই— থেমে গেল মেজদা।

আজ রাতেই কী?

আজ রাতেই আমি আর ছকু যে করেই হোক জব্বরের রত্নভাণ্ডারের একটা চাবি তৈরি করে বেশ কিছু সোনার গয়না সরিয়ে আনব। এখানে সোনার সবচেয়ে বেশি ধার। সবচেয়ে বেশি জোর। এই বিশ্রী অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হয়তো মানুষ কিনতে হবে, বন্দুক কিনতে হবে। সোনা কাজে লাগবে। ছকু চুরি ছাড়লেও ট্যাঁকের চাবিগাছাটা ছাড়েনি। ওর কথামতন কটা যন্ত্রও আমি গুচের টুলবক্স থেকে নিয়ে এসেছি। মনে হয়, চাবি করা যাবে।

কিন্তু সেটা তো চুরি।

আমরা সোনা নিয়ে পালাচ্ছি না। এখানকার সোনা এখানেই থাকবে। আমরা শুধু কাজে লাগাবো পালানোর জন্য। মেজদা ফিরল আমার আর গণেশের দিকে। আমরা বেরোব রাত আড়াইটের সময়। আমি আর ছকু রত্নভাণ্ডারের সুড়ঙ্গের মুখের গাছপালা সরিয়ে ভেতরে ঢুকবো। তুই আর গণেশ সুড়ঙ্গের কাছে ঝোপের ভেতর থাকবি। কড়া নজর রাখবি। লোক দেখলেই বার বার কুকুর বা শেয়াল ডাকবি। আমরা চট করে আলো নিভিয়ে দেব। মেজদা বোতলে কেরোসিন ঢেলে তৈরি করা কুপি দুটো সযত্নে গুচের কাছ থেকে ধার নেওয়া ব্যাগে ঢোকাল। তার সঙ্গে ঢোকাল গুচের পার্সোনাল অটোমেটিক রিভলভারটা।

কথামতন ঠিক সময়ে মেজদারা সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। আমি আর গণেশ একটা ঝোপেই সেঁধোলাম। দু'জনে দুটোতে থাকলে ভালো হতো কিন্তু নতুন জায়গা, নতুন ধরনের ভূতের সঙ্গে একা হয়তো পারব না। সময় কাটতে লাগল ধীর গতিতে।

আমাদের জানা ছিল না যে জব্বরের নাইট গার্ড আছে। তারা টলে টলে পাহারা দেয়। হঠাৎ বন্দুক হাতে দু'জনকে গল্প করতে করতে আসতে দেখে আমি আর গণেশ পরস্পরের হাতে হাত রাখলাম। ওরা ঝোপের সামনে দশ গজ দূর দিয়ে টলতে টলতে সুড়ঙ্গের দিকে যাচ্ছে। মুহূর্তে শরীরের সব স্নায়ুতে টান পড়ল, গলা শুকিয়ে এল, ভীষণ নার্ভাস লাগল। আমি দু'তিন বার কুকুর ডাকলাম আর গণেশ শেয়াল ডাকল। লোক দুটো থমকে ঘুরে দাঁড়াল ঝোপের দিকে।

আমাকে হেঁচকা টানে বসিয়ে দিল

কুত্তা কিঁউ ভোক রহা?

কুত্তা কা সাথ লোমড়ী ভি হ্যয়।

কভি নহি ও দোনো একসাথ নহি রহতা।

লোমড়ী জরুর হ্যয়। চল দেখে—

আমরা ঝাপসা চন্দ্রালোকে বুঝতে পারলাম দু'দুটো বন্দুক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা নিরস্ত্র। বুকের ভেতর দুরমুশটা আরো দ্রুত হলো।

প্রশ্নটা ঝোপের খুব কাছ থেকে এলো, কা ভাই অন্দর লোমড়ী হ্যায় ইয়া নহি? আমি, হঠাৎ প্রশ্নে আরো নার্ভাস হয়ে সব গুলিয়ে ফেলে শেয়ালের ডাকটাক ভুলে বলে ফেললাম, ম্যায় লোমড়ী হুঁ। বলেই বুঝলাম ভুলটা মারাত্মক।

গণেশ আঁতকে উঠে বসে পড়ে, আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে বসিয়ে দিল। আমাদের নাড়ি প্রায় থেমে গেল। অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা হবার অপেক্ষা। পাঁচ সেকেন্ড কাটল। হঠাৎ বাইরের লোকটার অট্টহাসি শুনতে পেলাম। সঙ্গীকে বলছে, কারে, শুনা তু? লোমড়ী হ্যয় ইয়া নহি—

লেকিন—কুত্তা আওর লোমড়ী এক সাথ—

চল চল, দের হো গইল।

আমাদের বুকের ধড়ফড়ানি থামতে পাক্কা দশ মিনিট লাগল। গণেশ বলল, কুত্তা ইয়া লোমড়ী নহি, গান্ধা হ্যয়।

যখন পুবের আকাশে আলো ফুটি ফুটি, পোকারা আমাদের ছেড়ে নিজেদের কাজে চলে গেছে, পাখিরা কিচিরমিচির করে করে প্রায় ক্লান্ত তখন মেজদা আর ছকু বেরোল সুড়ঙ্গ থেকে। চোখেমুখে সাফল্যের পূর্ণ উল্লাস। ছকুর হাতে একটা ছোট পুঁটলি আর মেজদার সব পকেট ফুলে রয়েছে। আমাদের ঘরে না গিয়ে আমরা গেলাম পুব দিকে বজরংবলীর মন্দিরের পেছনে। সেখানে একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখা হলো সোনা। আমরা হতবাক। এর একশো ভাগের এক ভাগ সোনাও আমরা একসঙ্গে দেখিনি। মেজদা কিছু মাঝারি ওজনের চুড়ি-টুড়ি পকেটে রেখে দিল। আমরা এসে শুয়ে পড়লাম। মেজদা বলল, ছকু যে কতো এক্সপার্ট চোর সেটা জানা গেল। ওই তালার চাবি বানানো যার তার কম্ম না।

।। বজরংবলী ও ডেমন ।।

হোঁৎকা আর বোঁচকা সেদিনও খবর এনেছিল বব্বর সিং-এর শিবিরের। আমার আর গণেশের পাশে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছিল আর খৈনী ডলছিল। মেজদা হঠাৎ এগিয়ে এসে পকেট থেকে দু'গাছা মোটা সোনার বালা বার করে হোঁৎকা আর বোঁচকার নাকের সামনে নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল, তোমরা তো সোনা চেন, দেখো তো এগুলো সত্যিই সোনার কিনা—

হোঁৎকা আর বোঁচকার চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল। দু'জনে বালাগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, খু...ব ভালো সোনা।

মেজদা আমাদের দিকে ফিরল, যাক বজরংবলী আমাদের ঠকায়নি। বলো

বজরংবলী কি জয়।

আমরাও বললাম জয় বজরংবলী কি জয়। হোঁৎকা আর বোঁচকার অবাক মুখ দেখে মেজদা ওদের বলল, তোমরা বজরংবলীর পুজো করো না?

দু'জনেই কপালে হাত ঠেকিয়ে জানাল যে ওরা বজরংবলীকে ভীষণ মানে। প্রচুর পুজো করে।

তোমরা কি জানো আমিও বজরংবলীর ভীষণ ভক্ত? যে ঘরটায় চড়ে আমরা উড়ে এলাম এখানে সেটা তো বজরংবলীর নিজের ঘর। আমি একটা মন্তর জানি। সেটা বললেই বজরংবলী দেখা দেন ওই ঘরে। যা চাইবে তখন তাই দেন। আমি শুধু প্রণাম করলাম তাতেই খুশি হয়ে এই সোনার বালা দুটো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

হোঁৎকা আর বোঁচকা আরো বড়ো হাঁ করে মেজদাকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। মন্তরটা ওদের শেখাতেই হবে।

মেজদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—যে কোনও স্টীম ইঞ্জিনের চেয়ে ঢের বেশি লম্বা। মেজদার গলা কাঁদো কাঁদো, আর মন্তর শিখে কি হবে ভাই, বজরংবলী নিজের ঘর নিয়ে অন্য দেশে চলে গেছে।

হোঁৎকা হঠাৎ কি একটা বলতে গেল। বোঁচকা চট করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে থামাল। আমরা নিমেষে নিঃসন্দেহ হলাম যে ডেমনের সন্ধান ওরা নিশ্চয়ই জানে। মেজদা আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, ঘরটাই নেই। ঘরটা থাকলে... ভারী বালা দুটো দু'জনের নাকের ওপর নাচাল মেজদা, এ দুটো তোমাদের এক্ষুণি বকশিস দিয়ে দিতাম। আমাদের কি আছে, আমরা তো চাইলেই আবার পেতাম।

মন্তরটা তুমি বলোই না— চারদিকে তাকিয়ে নিল বোঁচকা। আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি।

মানে! লাফিয়ে উঠল মেজদা, ঘরটা এখানেই আছে।

হোঁৎকা আর বোঁচকা দু'জনেই মাথা নিচু করল।

কিন্তু তোমরা মন্তর বললেও বজরংবলী তোমাদের দেখা দেবেন না।

কেন? কেন? কেন?

তোমাদের মাথায় কি কোনও বুদ্ধি নেই? আমরা এলাম চারজন, কিন্তু বালা মোটে দুটো কেন? ঢাকনা আর গণেশকে দেখাই দেননি বজরংবলী। যারা মিথ্যে বলে, ফেল করে...

বি.. বি.. বি.. বিঘ্ন ঘটাল সেজদা।

হ্যাঁ বিপথে যায়—

না বিড়ি খায়। মানে বিপথের বড়ো রাস্তা নয় ছোটগলি, বাই লেন—তাদের বজরংবলী কিচ্ছু দেয় না বলছে সেজদা।

মেজদা বালা দুটো পকেটে পুরতে পুরতে মুখটা ভীষণ করুণ করল। বজরংবলীর ঘরটার হদিস জানলে আমরা তোমাদের এতো সোনা এনে দিতাম যা তোমরা ভাবতেও পারবে না। উঠে পড়ল মেজদা।

হোঁৎকা আর বোঁচকার মুখ দেখে মায়া হলো। মুখে যেন কুইনাইন ঢেলে দিয়ে গিলতে বারণ করা হয়েছে। একদিকে সোনা পাবার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে জব্বর সিং-এর মুখ। হঠাৎ দু'জনেই ব্যোম বজরংবলী বলে লাফিয়ে উঠে মেজদার হাত চেপে ধরল। এক মিনিটের ভেতর আমরা ডেমনের অবস্থানের কথা জেনে গেলাম।

মেজদা চাপা গলায় ইংরিজিতে বলল, সোনার জোরটা দেখলি!

জব্বরের বুদ্ধি আছে। বারো ফুট বাই বারো ফুট ডেমনকে উত্তরদিকে দূরে একটা ঘন জঙ্গলের মাথায় তুলে দিয়েছে ডালপালার ভেতর। অত উঁচুতে ডেমন যে থাকতে পারে তা স্বপ্নেও কেউ ভাববে না।

মেজদা বালা দুটো হোঁৎকা আর বোঁচকাকে দিয়ে দিল। বজরংবলীর কাছ থেকে এনে অনেক সোনা, হীরে-টিরে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিল। আমরা ওদের দিব্যি গালিয়ে নিলাম। কথাগুলো যাতে জব্বরের কানে না যায় কোনও মতেই।

কিন্তু তোমরা ওখানে যাবে কি করে? জব্বরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুই প্রহরী ওটা পাহারা দেয় স্টেনগান হাতে।

মেজদা হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওই সাহেব ওর যন্ত্র দিয়ে চাইলে মানুষকে অদৃশ্য করতে পারে। তখন কে দেখতে পাবে?

আমরা দৌড়োলাম গুচেকে খবর দিতে। গুচে তো সব শুনে নাচতে লাগল কিন্তু তখনও আমরা কেউই পুরো বিশ্বাস করিনি। গুচে ভীষণ উত্তেজিত। বলল, যে জায়গায় ডেমন আছে বলেছে সে জায়গাটা তো ডানদিকের টিলাগুলোর ওপর থেকে দেখা যাবে।

সন্ধ্যে একটু ভারী হলে গুচে লেসার টর্চটা চেয়ে নিয়ে দৌড়ল টিলার দিকে। আমরাও আঁধারের ভেতর গুচের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গুচে নিশানা বরাবর লেসার টর্চটা নাড়াতে লাগল এদিক থেকে ওদিক। ওপর থেকে নিচ। লেসারের আলো ছড়িয়ে যায় না, পেন্সিলের মতন সোজা লক্ষ্যে গিয়ে পড়ে। হঠাৎই অন্ধকারের ভেতর আমরা একটা ছোট ঝিলিক দেখলাম। লেসার টর্চটা একটু নাড়াতেই, ছোট ঝিলিকটা একটা আলোর ঝরনায় পরিণত হলো। ঠিক যেন অনেকগুলো ফুলঝুরি একই সঙ্গে জ্বালানো হয়েছে। ডেমন সত্যিই ওখানে আছে। গুচে Jesus Christ বলে এমন এক লাফ লাগাল যে হুড়মুড় করে টিলার থেকে পড়ছিল আর কি।

মেজদা বলল, ছকু আর গণেশ তোদের একটা জরুরি কাজ আছে। ডেমনের মাথার অ্যান্টেনাটা তুলে দিয়ে আসতে হবে। গুচে এখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলে দেখে নেবে ডেমন ঠিক কাজ করছে কিনা।

গুচে ছকুকে অ্যান্টেনা তোলা-নামানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। কথা হলো ভোর চারটে নাগাদ ডেমনের কাছে যাবে ছকু, রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে। ছকু ক'মাস আগেও পাকা চোর ছিল। ওর মতে কাজটা পাইপ বেয়ে ওঠার চেয়ে ঢের বেশি সহজ। ডেমনের কাছে পৌঁছে ছকু ডেমনের মাথার অ্যান্টেনাটা তুলে দেবে। তারপর একটা টর্চ জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সিগনাল দেবে। গণেশ থাকবে টিলার মাথায়। ছকুর সিগনাল পেলেই

গণেশ আরেকটা টর্চ জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সিগনাল দেবে গুচে আর মেজদাকে। গুচে ওর কম্পিউটারে বসে ডেমনকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখে নেবে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

মেজদা সাবধান করল ছকুকে, স্টেনগান হাত রক্ষী আছে কিন্তু—

হাসালে মেজদা। আমি একা যাবো, ভোর রাতে। গাছের পাখিরাও টের পাবে না। রক্ষী হতভাগা তো ওই সময় ঘুমোবে। স্টেনগান আনতে হলে বলো।

ছকু আর গণেশ বেরিয়ে গেল রাত সাড়ে তিনটের সময়। আমরা অধীর অপেক্ষার রইলাম। কি হয় কি হয়।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে তন্দ্রা যেটুকু এসেছিল তা আচমকাই ছুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখি গুচে, ছকু, মেজদা, ঢাকনাদা আর গণেশ তাণ্ডব নৃত্য নেচে চলেছে।

ডেমনকে সব দিকে অল্প নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখেছে গুচে রিমোট কন্ট্রোলে। বাঁ দিকে নড়ানো ছাড়া সবই ঠিকঠাক আছে। ওতেই দিব্যি চলে যাবে। আমি গণেশকে জড়িয়ে ধরলাম ওদের সঙ্গে নাচতে নাচতে।

।। আরো প্রোগ্রাম ।।

পরের দু'দিন মেজদা একরকম গুচের ঘরেই পড়ে রইল। আমি দু'চার বার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলাম দু'জনে হয় খাতা-পেন্সিল নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন নয়তো কম্পিউটারে বসে প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। মেজদার খাবার ওই ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হলো। গুচের আর মেজদার চোখমুখ দেখে মনে হলো দু'রাত ঘুমোয়নি। মরণপণ লড়ে যাচ্ছে। নতুন প্রোগ্রাম ওরা তৈরি না করে ছাড়বে না।

হোঁৎকা আর বোঁচকা আমাদের বহুবার তাগাদা দিয়েছে সোনার জন্য। আমি মেজদার কথামতন বলেছি, সাহেবের অদৃশ্য করার যন্ত্র খারাপ। ওরা দিনরাত্তির ওটা সারানোর চেষ্টা করছে।

মেজদা আর গুচের এলেম আছে। তৃতীয় দিন বিকেলবেলা মেজদা ফিরল। প্রোগ্রাম রেডি। গুচেও রাজী। ডেমন আমাদের তিলডুঙ্গির মাঠে নামাবে তারপর গুচেকে নিয়ে জার্মানি চলে যাবে। আমরা সবাই মেজদাকে কাঁধে তুলে নাচতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেজদা আমাদের থামিয়ে দিল। প্রোগ্রামটা স্টার্ট, ডেমনের বাইরে থেকে কাউকে কম্পিউটারের যে কোনও একটা কি টিপে করে দিতেই হবে। তারপর কম্পিউটার আর কোনও কি-তেই সাড়া দেবে না। বাইরে থেকে যে স্টার্ট করবে তাকে তো এখানে থেকে যেতে হবে। কে থাকবে?

এখানকার কাউকে সোনা-টোনা দিয়ে...।

অসম্ভব। সে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জব্বরকে জানিয়ে দেবে। জব্বরকে সকলে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে।

রাত্তিরে আমার চোখে ঘুম নেই। এপাশ-ওপাশ করছি, মেজদারও দেখলাম ঘুম নেই। সমস্যাটা আমাদের দু'জনকেই জাগিয়ে রেখেছে। ভোরের দিকে হঠাৎই আমার মাথায় আইডিয়াটা এল। আমি লাফিয়ে উঠে মেজদাকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম।

বিকেলবেলা যথারীতি হোঁৎকা আর বোঁচকা হাজির। মেশিন তো ঠিক হয়ে গেছে। নইলে কি আর মেজদা ঘুমোয়? আমাদের সোনা কোথায়?

আমি খ্যাঁক করে উঠলাম, তোমাদের কোনও ভক্তি নেই। আক্কেল নেই। কোনও খবরই রাখো না। বজরংবলীর ভীষণ পেট খারাপ, নড়তে পারছে না - তা জানো? কেউ একটা উল্টোপাল্টা ভোগ দিয়েছিল তাই খেয়ে হয়েছে। মেজদা লজ্জায় কিছু চাইতে পারেনি। কিন্তু বজরংবলী তো মনের কথা বোঝেন। বলেছেন, বেটা অজয় আমি ক'দিন পরে নিজে ওই সাহেবের ঘরে যাবো তখন সাহেব, হোঁৎকা, বোঁচকা আর তোকে ডেকে অনেক সোনা দেব।

আমাদের নাম জানেন বজরংবলী!

বজরংবলী বলে কথা! স...ব জানেন।

আমরা খবর পাবো কি করে যে বজরংবলী এসেছেন?

চলো, সাহেবের ঘরে চলো। সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

আমরা সকলে গুচের ঘরে গেলাম। গুচে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিল। গুচেকে তুলে আমি শুধোলাম, আচ্ছা প্রফেসর গুচে, দূর থেকে জাহাজের ভোঁর মতন শোনা যাবে এমন আওয়াজ করা যাবে তোমার যন্ত্র দিয়ে?

গুচে ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। অবাক হলো, নিশ্চয়ই করা যাবে। এগুলো সব মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম ২০০০ ওয়াট শক্তি। এক্ষুণি মাথা ঝাঁঝা করিয়ে দেবে। স্পিকার একটা বাইরে নিয়ে গিয়ে বসালে এক মাইলের বেশি দূর থেকে শোনা যাবে। গুচে কম্পিউটারে বসে একটা ভোঁ ছাড়ল। কী? আর বাড়াবো?

না থাক। এতেই মাথা ঘুরছে। আমি তাকালাম হোঁৎকা আর বোঁচকার দিকে। আওয়াজটা চিনে নাও। এই আওয়াজ পরপর তিনবার শুনলে যেখানেই থাকো সেখান থেকে ছুটে আসবে এই ঘরে। বজরংবলীর দর্শন তো তোমরা পাবে না কিন্তু সোনাদানা হীরে মুক্তো অনেক পাবে।

হোঁৎকা আর বোঁচকা আমাদের বব্বরের কিছু খবর দিয়ে বিদায় নিল।

আমরা সকলে বহুদিন পরে খুশিমনে গুচের ঘরে প্ল্যান করতে বসলাম। স...ব কিছু রেডি। ঠিক হলো প্রতিযোগিতার দিন রাত্তিরে যখন সকলে হল্লা করবে তখন আমরা পিঠটান দেব। কার্যপ্রণালীর একটা নিখুঁৎ পরিকল্পনা ছকে ফেলা হলো। নাম দেওয়া হলো 'অপারেশন চম্পট'। কমান্ডার মেজদা।

।। অপারেশন চম্পট ।।

প্রতিযোগিতার আর মোটে দু'দিন বাকি। আমি মেজদাকে বললাম, মেজদা চলো আমরা একটু প্রতিযোগিতার জন্য রেওয়াজ করি? ইংরিজি, ধাঁধা, অঙ্ক সবাই প্রশ্ন কর। সবাই উত্তর দিক।

আচ্ছা—বল তো Forget-me-not-টা কী?

একটা ফুল।

ওর প্লুরাল কী?

সেজদা বলল, Forgets-me-not।

ঢাকনাদা বলল, Forgets-us-not।

মেজদা বলল, ধ্যুৎ Forget-me-nots।

মেজদা শূন্য থেকে নয় এই দশটা সংখ্যা ব্যবহার করে এক লেখো তো—

মেজদা কাগজে লিখল—

$\frac{১৪৮}{২৯৬} + \frac{৩৫}{৭০} = ১$। কি ঠিক আছে?

বিলকুল।

গণেশ জিজ্ঞেস করল, মেজদা, কারাগারে এক বন্দী আছে। কারাগারের দুটো দরজা। একটা মুক্তির অন্যটা মৃত্যুর। মানে একটা দিয়ে বেরোলে মৃত্যু, অন্যটা দিয়ে বেরোলে মুক্তি। দুই দরজায় দুই প্রহরী। একজন শুধুই সত্যি কথা বলে। অন্যজন শুধুই মিথ্যে কথা বলে। কোন দরজায় কোন প্রহরী জানা নেই। রাজা বন্দীকে একটা সুযোগ দিলেন মুক্তির। বন্দী যে কোনও একজন প্রহরীকে একটাই মাত্র প্রশ্ন করে যদি মুক্তির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তো যাক। বন্দী মুক্তির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রশ্নটা কি জিজ্ঞেস করেছিল বন্দী?

মেজদা বলল, আমার জানা। অন্য কেউ উত্তর...

মেজদার কথা শেষ হলো না বাইরে একটা ভীষণ জোর গু..ম করে আওয়াজ শুনলাম আমরা। তারপর আরো অনেক গু..ম তার সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেলের র‍্যাট, ট্যাট.... ট্যাট্.... ট্যাট...। আমরা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি ভীষণ ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে চারদিকে। সকলে ডেরার মুখের দিকে বন্দুক বাগিয়ে দৌড়চ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? ছুটতে ছুটতে সে জবাব দিল, একটা দল আক্রমণ করেছে।

পুলিশ না ডাকাত?

বলা শক্ত। ডাকাতের বেশে পুলিশ আর পুলিশের বেশে ডাকাত দুই-ই আক্রমণ করে চম্বলে।

আমি দৌড়ে ফিরে এলাম, মেজদা এমন সুযোগ আর পাবো না। চলো, এক্ষুণি সকলে গুচের ঘরে চলো। অপারেশন চম্পট চালু করতে হবে।

গুচের ঘরে পৌঁছে গুচেকে বলতেই গুচে দু'বার নেচে নিয়ে কম্পিউটারে বসল। একটু ভাবল গুচে, এই সময় একটা স্যাটেলাইট পেয়ে যাবো।

এক মিনিটের ভেতর, রিমোট কন্ট্রোলে, ডেমন এসে নামল গুচের ঘরের পেছনে। যেখানে চট করে কারো নজরে পড়বে না। সে...ই চেনা ঘর, ডেমনের দরজা খুলে গেল।

আমি আর গণেশ ছুটলাম বজরংবলীর মন্দিরের পেছন থেকে সোনা আনতে। পুঁটলিতে সোনা বেঁধে নিয়ে ফিরলাম মাত্র দু'মিনিটের ভেতর। গুচের ঘরের সামনে রাস্তা থেকে শুরু করে সিঁড়িতে সিঁড়িতে ভারী সোনার অলঙ্কার ছড়াতে ছড়াতে উঠে আমরা পৌঁছলাম কম্পিউটারের কাছে। কম্পিউটারের কাছে পৌঁছনোর একটা সোনা ছড়ানো রাস্তা তৈরি হলো।

মেজদা কমান্ডার। হুকুম দিল, অমু, ঢাকনা, গণেশ, ছকু ডেমনে ঢুকে বস। আমরা আসছি। কম্পিউটারে বসা গুচের দিকে ফিরল মেজদা, তোমার সাইরেনটা যতো জোরে পারো তিনবার বাজাও। আমি স্পিকার ঘরের বাইরে বসিয়ে দিচ্ছি।

মুহূর্তে গুলি গোলার আওয়াজ ছাপিয়ে দু'হাজার ওয়াটের সাইরেন বেজে উঠল একবার। দু'বার। তিনবার। আমি নিজের মনেই বললাম, হোঁৎকা বোঁচকার কানে এ আওয়াজ পৌঁছবেই। মেজদা গুচেকে সরিয়ে নিজে বসল কম্পিউটারে। 'মেন প্রোগ্রাম অপারেশন চম্পট টেনে আনছি প্রফেসর গুচে।' 'ও. কে.'। মাত্র দশ সেকেণ্ড পরে উঠে পড়ল, স্বল্প উত্তেজিত মেজদা। তারপর খুব আলতো করে, ধরে ধরে কম্পিউটারের কি-বোর্ডের ওপর ছড়াল কটা হীরের অলঙ্কার। আলো ঠিকরে উঠল কি-বোর্ড থেকে। নিজের মনে বলে উঠল মেজদা, এরপরে যে কোনও কি-তে হাত ছোঁয়ালেই প্রোগ্রাম চালু হয়ে যাবে। ডেমন চারটে মাত্রা মিলিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করবে।

আমরা দৌড়ে নামলাম গুচের ঘরের সামনে। মেজদা গুচেকে বলল, যাও ডেমনে গিয়ে বস, আমরা আসছি।

ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলোয় জব্বরের ডেরার বাইরের ম্লান আলো আরো ধূসর। আমি আর মেজদা উত্তেজিত, চোখ পেতে বসে রইলাম। আশায় আশায়। তিন মিনিটও কাটল না—দূরে দেখলাম হোঁৎকা আর বোঁচকা দৌড়ে আসছে। হ্যাঁ কোনও ভুল নেই। একটা বোঁচকার মতন অন্যটা হোঁৎকা। আমি আর মেজদা এক দৌড়ে ডেমনে চেপে বসলাম।

আমি মানসচক্ষে দেখতে পেলাম যা ঘটছে। গয়না কুড়োতে কুড়োতে হোঁৎকা আর বোঁচকা উঠছে গুচের ঘরে। তারপর কম্পিউটারের সামনে। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে কম্পিউটার কি-বোর্ডে রাখা হীরের ছটায়।

ডেমনের দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ডেমন ছোট হচ্ছে ভীষণ বেগে।

তিলডুঙ্গির মাঠ। আমরা নামলাম ডেমন থেকে। তিলডুঙ্গির মাঠকে এতো সুন্দর আগে কখনও লাগেনি। প্রোগ্রাম অনুযায়ী মাত্র দশ সেকেন্ড থামবে ডেমন। গুচে একা দাঁড়িয়ে আছে ডেমনের ভেতর। আমরা হাত নাড়লাম। ডেমনের দরজা বন্ধ হলো, মিলিয়ে গেল ডেমন।

আমরা তিলডুঙ্গির মাঠে আনন্দে নাচছি, কাঁদছি, গড়াগড়ি দিচ্ছি মাটিতে।

পরনে ডাকাতদের দেওয়া পোশাক-আশাক।

সেজদা বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোচ্চার হলো, চ্..চ..চম..

হ্যাঁ সেজদা, চম্পট সাকসেসফুল।

সত্যিই চমৎকার।

আরে চমচম তো খাবোই।

আমি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হলাম, না গো সেজদা বলছে চম্বল পর্ব শেষ।

ছবি : দিলীপ দাস

কৈলাসে হুলুস্থুলু

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কৈলাসে সেদিন একেবারে হুলুস্থুলু। শিব-পার্বতী হাজার চেষ্টা করেও সামলাতে পারছেন না। কার্তিক-গণেশ দু'জনেই চেঁচাচ্ছে, ওটা আমার চাই।

দু'জনেরই একই কথা, ওটা দিতে হবে আমাকেই। শিব-পার্বতী পড়েন ফ্যাসাদে। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন তাঁরা! দু'জনেই যে তাঁদের ছেলে। সমান আদরের। একজনকে কাঁদিয়ে অন্যজনকে তো দিতে পারেন না। তাই ভোলাবার চেষ্টা করেন তাঁরা।

ভোলাবার চেষ্টা করলে কি হবে, অত সহজে ভোলার ছেলে নাকি কার্তিক-গণেশ! নিজের ইচ্ছেয় তারা একজনকে দিয়ে দিতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা। কিন্তু দাবি যখন করবে, তখন সামান্য একটা সুতো নিয়েও হৈচৈ তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে দু'জনে। আর ঠিক ওই জন্যই বাবা-মা রীতিমতো শশব্যস্ত। না জানি কখন কি করে বসে দু'জনে।

কার্তিক-গণেশ দুই ভাই। কে বড়, আর কে ছোট বোঝার উপায় নেই। মাথায় একবারে সমান সমান। তার ওপর দু'ভাইয়ের একেবারে গলায় গলায় ভাব। একদণ্ড একজন থাকতে পারে না অন্যজনকে ছেড়ে। তাই দেখে বাবা-মা শিব আর পার্বতীর আহ্লাদের সীমা নেই।

আসলে, দু'জনেরই মনে ছিল ভয়। দুই ভাইয়ে বোধহয় মিল হবে না একদম। একজন পেটটি নাদা, হাতির মাথা, ইঁদুরে চড়ে ঘুরে বেড়ায় ধীরে-ধীরে। অন্য ভাই চটপটে, মাথা তার ছ'ছটি। একসঙ্গেই দেখে চারদিক। তার ওপর বাহনটিও আবার ময়ূর—তাই ঘোরেফেরেও ঝড়ের বেগে।

চেহারা বা স্বভাবে গরমিল হলে কি হবে, এমনিতে দুই ভাই যেন হরিহর আত্মা। সংসারের অন্য কাজকর্ম ভুলে শিব আর পার্বতী দেখেন দু'ভাইয়ের কাণ্ড-কারখানা। দেখে হেসে বাঁচেন না তাঁরা।

তবে মাঝে মাঝেই ঘটে এক একটা ঘটনা। সেদিন শিব বসে আছেন বোমভোলা হয়ে। কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে গণেশ এসে ওঠে কোলে। এমনিতে পেট নাদা, একটু থলথলে হলে কি হবে, একমুহূর্ত স্থির হয়ে বসা লেখা নেই গণেশের কুষ্ঠিতে। সবসময় এটা নেবে—ওটায় টান দেবে। তাই শিব তাকে জাপটে বসে থাকেন।

একটু বসেই শিবের কোল বেয়ে গণেশ ওঠে ওপরে। হাত বাড়ায় শিবের জটায় বাঁধা চাঁদের দিকে। শিবের ওই বটের ঝুরির মতো জটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে যে এক ফালি কুমড়োর মতো চাঁদ, তাকে দেখে গণেশের মনে হয় যেন পদ্মের নাল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি তার চাই। জটা ধরেই টান লাগায় তাই।

এখন কপালের ওপর দিয়ে হাত বাড়ায় যেই, অমনি শিবের তৃতীয় নয়নের আগুনে ঝলসে যায় গণেশের হাত। ককিয়ে ওঠে গণেশ। জ্বালা ভুলতে শিবের জটায় লুকনো গঙ্গার জল খেতে যায়। কিন্তু বিপদ যেন সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। জটায় হাত দিতেই ফোঁস করে ওঠে সাপ। ভয় পেয়ে হাত গুটোয় গণেশ। কেঁদে ফেলে।

কান্না শুনে ছুটে আসেন পার্বতী। দেখেন শিবের গলার সাপ ফণা তুলে করছে ফোঁস ফোঁস। বুঝি ছোবল বসাবে গণেশকে। ব্যাপার দেখে ভয় হয় পার্বতীর। তাড়াতাড়ি শিবের কোল থেকে একরকম ছিনিয়েই নেন গণেশকে।

একদিন নয়, এরকম হয় প্রায়ই। তবে এটি বেশি হয় গণেশকে নিয়েই। কার্তিক আবার বাবার কাছে তেমন বেশি একটা ঘেঁষে না। ও ময়ূরে চড়ে এদিক-ওদিক ঘুরতেই ভালবাসে বেশি। তবে গণেশ কি করছে, আর কি পাচ্ছে সেদিকে থাকে কড়া নজর। তাকে বাদ দিয়ে গণেশকে কিছু দিলেই হুলুস্থুলু। সেদিনও হয়েছিল তাই।

হয়েছে কি, কার্তিক তখন একটু দূরে খেলা করছিল। গণেশ ছিল বাবার কোলে। এমন সময় এলেন সেখানে দেবতারা। মাঝে মাঝেই আসেন তাঁরা। শিব-পার্বতীকে প্রণাম করে কিছু নিবেদন করে চলে যান। সেদিনও তাই। প্রণাম করে তাঁরা পার্বতীর হাতে দেন সুধাসিঞ্চিত একটি মোয়া। অপূর্ব দেখতে। আর গন্ধ! চারদিক যেন ম-ম করছে। সেই গন্ধ নাকে যেতেই ছুটে আসে কার্তিক।

কার্তিক জানে, গণেশ মোয়া বড় ভালবাসে। পেট ভর্তি থাকলেও মোয়ার লোভ সামলাতে পারে না গণেশ। আর এ মোয়া তো যেমন-তেমন মোয়া নয়, অমৃত মাখানো দেবতাদের তৈরি মোয়া। কাজেই এ মোয়া তো ও নেবেই। এই কথা ভেবেই ছুটে আসে কার্তিক। বাবা-মাকে যা দেওয়া হবে তাতে তো তারও সমান অধিকার। তাই দূর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে আসে কার্তিক, মোয়া-মোয়া—

গণেশও ততক্ষণে হাত বাড়িয়েছে, মা,

মোয়াটা দাও।
না, কখখনো নয়, আমি আগে চেয়েছি, আমাকে দিতে হবে।
গণেশ বলে, না, আমাকে দাও।
না, আমাকে।
আমাকে।
আমাকে।
আমাকে।
দু'জনের ঝগড়া লাগে আর কি! পার্বতী এবার দাঁড়ান দু'জনের মাঝখানে। হাতে তাঁর মোয়া। দু'জনের দিকেই তাকিয়ে বলেন, চুপ, একেবারে চুপ করে দাঁড়াও।
মোয়াটা আমার চাই।
আমাকেই দিতে হবে ওটা। আমি যে মোয়া বড় ভালবাসি।
আমিও।
আবার? ধমকে ওঠেন পার্বতী। বলেন, মোয়া পাবে তোমাদের মধ্যে যে কোনও একজন। কিন্তু তার আগে করতে হবে একটা কাজ। কাজ মানে একটা পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের।
পরীক্ষা! একটু হতাশ গলাতেই বলে দু'জনে। পরীক্ষায় তো রসগোল্লা পায় সবাই। তা মোয়ার জন্যও পরীক্ষা?
হ্যাঁ, পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের। যে পরীক্ষায় প্রথম হবে, সেই পাবে মোয়াটি।
বল, বল কি পরীক্ষা?
পার্বতী তাকান শিবের দিকে। চোখে চোখেই দু'জনের কি যেন কথা হয়। তারপরই পার্বতী বলেন, তোমাদের বাবাও রাজী হয়েছেন এ পরীক্ষায়। তিনি বলেছেন, যে প্রথম হবে সেই পাবে মোয়াটি।
অত কথা না বলে কি করতে হবে তাই বলো না। একটু অধৈর্য হয়ে কার্তিক বলে ওঠে। সায় দেয় গণেশও। গম্ভীর মুখে বলে, কথা কম, কাজ বেশি। করতে হবে কি?
ধর্মাচরণ।
কী?
ধর্মাচরণ করে প্রমাণ করতে হবে নিজের শ্রেষ্ঠতা। যে জিতবে মিলবে মোয়া, হারলে লবডঙ্কা।
তা তো বুঝলাম। কিন্তু ঠিক কী করতে হবে?
একেবারে সোজা। তীর্থে যাওয়া, পুজোপাঠ, দান-ধ্যান এসব করা—এই আর কি। অল্প সময়ে যে যত বেশি ধর্মাচরণ করবে সেই পাবে মোয়া।
ও, এই কথা! বলেই কার্তিক ওঠে ময়ূরে। বলে, চল রে ময়ূর, যাই তীর্থভ্রমণে। তাড়াতাড়ি তীর্থে তীর্থে স্নান, পুজোপাঠ, দান-ধ্যান করে ফিরে আসব এখানে। দেখি কে কত সময়ে কত জায়গায় যায়!
ময়ূরে চেপে কার্তিককে ছুটতে দেখে গণেশ প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খায়। ভাবে একটু—কি করবে সে এবার!
একটু ভাবতেই বুদ্ধি খুলে যায় গণেশের। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা বাঘছাল এনে সে পেতে দেয় মাটিতে। তারপর তাড়া লাগায় বাবা-মাকে। এবার এখানে বোসো তো চুপটি করে।
কেন?
আঃ কথা নয়, বোসো তো!
শিব-পার্বতী আর কি করেন, ছেলের কথা মতন বসেন বাঘছালের ওপর পাশাপাশি। আর গণেশ তার পুঁচকে বাহন ইঁদুরের ওপর চেপে ঠিক গুনে গুনে তিনবার পাক খায় বাবা-মাকে। তারপর ইঁদুর থেকে নেমেই বলে, দাও মোয়াটা আমাকে!
কার্তিকও ফিরেছে ততক্ষণে। ময়ূরটা তার হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে। ময়ূর থেকে নামতে নামতেই কার্তিক বলে, দাও বললেই মিলবে? মোয়া কি একেবারে কি বলে ছেলের হাতের মোয়া?
তাই তো!
তাই তো? এর মধ্যেই ভুলে গেলি মা কি বলেছে!
ভুলব কেন?
তবে? জানিস আমি এর মধ্যে সমস্ত তীর্থে গিয়ে স্নান করে, পুজো দিয়ে, দান-ধ্যান করে তবে আসছি। আর তুই, তুই তো এখানে বসেই মাকে বলছিস মোয়াটা দাও। ওতে কি মোয়া পাওয়া যায়?
গণেশ বলে, মা যা বলেছে, আমি তাই করেছি। তোমার চেয়ে বেশি করেছি। তাই তো মোয়াটা চাইছি।
গণেশের কথায় এবার অবাক হন শিব-পার্বতী। ভাবেন, বলছে কি ছেলেটা! সত্যিই তো, কার্তিক সব তীর্থে গিয়ে স্নান করে পুজোপাঠ দান-ধ্যান করে আসছে। এর চেয়ে বড় পুণ্যের কাজ আর কি হতে পারে? ধর্মাচরণ তো একেই বলে। আর গণেশ তো এখানেই বসে কাটাল সময়। তা ও ধর্মাচরণ করল কোথায়?
শিব-পার্বতী যখন এসব ভাবছেন তখন গণেশ বলে, কই দাও, দাও মোয়াটা?
পার্বতী বলেন, কিন্তু আমি তো বলেছি...
জানি গো জানি। আর আমি শ্রেষ্ঠ বলেই তো চাইছি।
মানে?
আচ্ছা, কার্তিক কতবার সব তীর্থে গেছে?
কেন, একবার!
আর আমি গেছি, তিন তিনবার।
কেমন করে?
মা, তুমি শাস্ত্রের কথা সব ভুলে গেছ দেখছি। শাস্ত্রে বলে, বাবা-মাই হচ্ছেন সব। তাঁরাই সব তীর্থ। তাঁরাই ধর্ম। তাঁদের দর্শন করলে, পরিক্রমা করলে হয় সব তীর্থ দর্শনের ফল। তাই তো তিন তিনবার তোমাদের প্রদক্ষিণ করেছি। এখন বল কে শ্রেষ্ঠ।
মা পার্বতী বলেন, না, গণেশই বড় ধার্মিক। সেই এত অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্মাচরণ করেছে। তাই কার্তিক, এবার মোয়াটা দিতে হবে গণেশকেই। পরে যদি আবার পাই তবে দেব তোমাকে।
শিবও হাসতে হাসতে বলেন, না বুদ্ধি দেখছি তোমার পেটমোটা এই হাতি মাথারই বেশি। ওর শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে সত্যি ভাল লেগেছে আমার। আজ থেকে সব দেবতার আগে হবে ওর পুজো।
মাতা পার্বতী এতক্ষণ শুনছিলেন সব। এবার মোয়াটা গণেশকে দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, মোয়াটা এবার গণেশই পাবে। আর শোনো, এখন থেকে গণেশ হবে সমস্ত গণ-এর প্রধান। এখন থেকে সেই হবে গণদেবতা।
শক্তিতে অনেক বেশি হয়েও কার্তিক কিন্তু বারবারই বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছে গণেশের কাছে। হেরেছে, আর ভেবেছে

পরের বার বদলা নেবে সে। কিন্তু এমনই কপাল, তারপরও হারতে হয় তাকেই।

সেবারও এমনিভাবেই বাবার কাছে অপদস্থ হয়েছিল কার্তিক। বাবার ইচ্ছে, একটি যজ্ঞ করার। সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকে আমন্ত্রণ জানাতে চান তিনি। কিন্তু সময় অনেক কম। তাই শরণ নিয়েছেন ছেলেদের।

কার্তিক যে খুব চটপটে, এটা জানেন শিব। তাই তিনি তাকেই ডেকে ভার দেন কাজটার। সব শুনেটুনে কার্তিক বলে, অসম্ভব।

কি অসম্ভব?

এত অল্প সময়ে অতজন দেবতাকে বলা যায় নাকি? এ আমার দ্বারা হবে না।

হতাশ শিব বলেন, কিন্তু আমার যজ্ঞে যে সমস্ত দেবতাকে চাই। আমন্ত্রণ না জানালে তাঁরা আসবেন কেন?

কার্তিক বলে, তা কি করা যাবে! যা অসম্ভব তা তো আমি করতে পারি না।

শিব এবার তাকান গণেশের দিকে। গণেশ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তাই নিজের থেকেই বলে, আমি কিন্তু বলে আসতে পারি সবাইকে।

এ কথায় শিব যেন হাতে স্বর্গ পান। বলেন, বলে আয় না বাবা।

তাহলে তুমি একটু এই আসনে বোসো।

কেন রে?

বোসো না।

বেচারা শিব কাজ হাসিলের জন্য বসেন আসনে। গণেশ তাঁকে বার তিনেক ঘুরপাক খেয়ে বলে, হয়ে গেছে।

কি?

সবাইকে বলেছি। সব দেবতা গ্রহণ করেছেন আমন্ত্রণ।

কি বলছিস? কখন গেলি, কখন বললি সবাইকে?

কেন, এইমাত্র।

কি রকম?

বাবা, তোমার পবিত্র অঙ্গেই সমস্ত দেবতাদের বাস। তাই জায়গায় জায়গায় না গিয়ে তোমাকে প্রদক্ষিণ করে তাঁদের জানালাম তোমার নিমন্ত্রণের কথা। দেখ, ঠিক সময়ে সবাই আসবেন। কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।

ছেলের ওপর ভরসা থাকলেও শিব কিন্তু ভাবতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আসবেন তো সবাই!

শিবের সেই ভাবনার শেষ হলো যজ্ঞের দিন। তিনি দেখলেন, সমস্ত দেবতা এসেছেন তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। সমস্ত দেবতাকে দেখে আনন্দে শিব একেবারে ডগমগ। এটা যে তাঁর ছেলে গণেশের অসম্ভব বুদ্ধির জন্য হয়েছে, তা তিনি স্বীকার করলেন সবার সামনেই।

বুদ্ধির খেলায় এইরকম বারবারই হেরেছে কার্তিক। এই হারার জন্য বিয়ে পর্যন্ত তার করা হয়নি ঠিক সময়ে। সে কাহিনী সবাই জানে—তাই এখানে তা আর বলছি না। তারচেয়ে বরং গণেশের মোয়া খাওয়ার আরেকটা গল্প শোনা যাক।

গণেশের জন্মতিথি ছিল সেই দিনটাতে। অন্যবারের মতো জন্মদিনের সকাল থেকেই গণেশ তার প্রিয় বাহন ইঁদুরের পিঠে চেপে লোকের বাড়ি বাড়ি মোয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে।

এমনিতেই তো গণেশের পেটটি নাদা। তারপর মোয়া খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে একেবারে জয়ঢাক। তবুও খাওয়ার বিরাম নেই। এদিকে পেটের ওই মোয়ার ভারে বেচারি ইঁদুরের অবস্থা কাহিল। প্রায় চিঁড়েচ্যাপটা হওয়ার যোগাড়। তবুও কি আর করে, গণেশের হুকুমমতো এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

বিপত্তি বাধল পথে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় ফণা গুটিয়ে বসে ছিল একটা সাপ। তাকে দেখেই তো ইঁদুরের আক্কেল গুড়ুম। ভাবে, সাপ তাকে গিলে ফেলবে এখখুনি একবারে গপাৎ করে। ভাবামাত্রই কাঁপুনি ওঠে তার। কাঁপতে থাকে সে থরথর করে। তার ওই কাঁপুনিতে তাল রাখতে পারে না গণেশ। ধপ করে পড়ে যায় ইঁদুরের পিঠ থেকে।

অতবড় শরীর নিয়ে ধপাস করে পড়ে যাওয়ার ফলে গণেশের মোয়া খাওয়া নাদা পেটটি ফট ফটাস করে যায় ফেটে। পেট ফাটতেই ফাটা জায়গা দিয়ে গড়গড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে মোয়াগুলো। সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে তা।

গণেশ তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে এক এক করে মোয়াগুলো কুড়িয়ে সেগুলো চালান করে দেয় ফাটা পেটের মধ্যে। তারপর ফাটা পেট জোড়া দেওয়ার জন্য একটা বাঁধন খোঁজে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনো দড়ি না পেয়ে তুলে নেয় সেই সাপটাকেই। ভাবে এর জন্যই যখন এত বিপত্তি, তখন একে দিয়েই বেঁধে ফেলি পেটটি। এই না ভেবে গণেশ বেশ শক্ত করে পেটটি বেঁধে ফেলে সাপটাকে দিয়ে।

গণেশের পেট ফাটা, মোয়া কুড়োনো আর সাপ দিয়ে পেট বাঁধা দেখে চাঁদ হাসতে থাকে ফিক ফিক করে। চাঁদকে অমন ফিচেলের মতো হাসতে দেখে গণেশ যায় চটে। রেগেমেগে অভিশাপ দেয়, চাঁদ, এখন থেকে তুমি সকলের দেখার অযোগ্য হলে। কেউ যদি তোমাকে দেখে ফেলে তাহলে সে হবে তোমার পাপের ভাগী।

গণেশের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হাসি পেয়েছিল বলে কিছু না ভেবেই হেসেছিল চাঁদ। তার জন্য যে এতবড় অভিশাপ দেবে গণেশ তা ভাবতে পারেনি সে। এখন গণেশের অভিশাপে তার প্রভা যায় নষ্ট হয়ে। ক্ষয় হয় চাঁদের। জগৎ অন্ধকারে ভরে যায়। চাঁদের দশা দেখে ভাবনায় পড়েন দেবতারা। শেষে ইন্দ্র আর অগ্নি গিয়ে গণেশকে প্রণাম করে বলেন, চন্দ্র না থাকলে রাত যে অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। কষ্ট হবে জগৎবাসীদের। আপনি চন্দ্রকে ক্ষমা করে দিন।

দেবতাদের কথায় গণেশ বলে, আমার কথা তো মিথ্যে হতে পারে না। তাহলে চাঁদ এক বছর, নয় ছ'মাস, কি তিন মাস অদৃশ্য থাকুক।

দেবতারা মাথা নেড়ে বলেন, তাতেও কষ্ট পাবে জগৎবাসী।

গণেশ বলে, তাহলে আর কি করা যায়, এই আজকের দিনটা, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্থীতে চাঁদকে দেখা চলবে না। কেউ এদিন চাঁদ দেখলে সে মিথ্যে কলঙ্কের ভাগী হবে।

দেবতারা একথায় রাজী হয়ে গণেশকে প্রণাম করে চলে যান। আর ওই সময় থেকে এই দিনটি নষ্টচন্দ্র বলে পরিচিত।

ছবি : জুরান নাথ

কুহেলী রাতের পুলিশী কাণ্ড

সুভাষ ধর

ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন কোথায় বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করবো তা না রাত দশটায় থানায় আসতে হলো রাতের ডিউটিতে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি। কলকাতা এত জনাকীর্ণ নয় তখনো। ডিসেম্বরের শেষ দিন, শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। গ্রেটকোট, পুলওভার পোশাকের উপর চাপিয়েও শীতকে সামাল দিতে পারছি না। সার্জেন্ট মণ্ডল আর আমি একসঙ্গে কলেজে পড়েছি আবার আমরা একই থানায় কাজ করছি। রাত এগারোটা নাগাদ বেশ মোটা একখানা বেতের লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে সেও এসে হাজির হলো।

তালতলা লেন, ধর্মতলা স্ট্রীট, হরকুমার টেগোর স্কোয়ার এসব অঞ্চলে অনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আর ক্রিশ্চান বসবাস করতো। বছরের শেষ দিনে ওদের মাতামাতি অনেক সময় লাগামছাড়া হয়ে পড়লে সময়মতো সামাল দিতে হিমশিম খেতে হতো।

লাল জীপটা নিয়ে অতএব আমি, মণ্ডল, বৈজনাথ সিং পালোয়ান আর ড্রাইভার ভটচাজ এলাকা প্রদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। এস. এন. ব্যানার্জি রোডের মুখে এসে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো। এমন সাদা কুয়াশা আগে কখনো দেখিনি। মোটা সাদা চাদরের মতো কুয়াশা হঠাৎ চারদিক ঢেকে ফেলল। গাড়ি নিয়ে এগুই সাধ্য কী, দু'ফুট দূরের জিনিস নজরে পড়ে না। ভটচাজ ড্রাইভার হিসেবে খারাপ না, তবে কুঁড়ের বাদশা। থানা থেকে বেরোতেই চাইছিল না, নেহাৎ আমার প্রতি একটু ভয়ভক্তি আছে তাই বেরিয়েছে জীপ নিয়ে।

মিনিট পনেরো জীপ নিয়ে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু কুয়াশা

যে হালকা হবে সে লক্ষণই নেই। বরং মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে আরো গাঢ় সাদা কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে চারদিক ছেয়ে ফেলছিল। চারদিকের বাড়িঘর, গাছপালা এসবের অস্তিত্বই নজরে আসছিল না। দু'ফুট দূরের রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত সাদা চাদরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে রইল। দু'একটা গাড়ি যে চলছে না তেমন নয়, কিন্তু খুব সাবধানে একটু একটু করে হেডলাইট মেরে ইঞ্চি ইঞ্চি এগুচ্ছে। ভটচাজকে বললাম, ভটচাজ, স্বয়ং প্রভু যীশু তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দিয়েছেন। যাও,থানায় ফিরে জীপ গ্যারেজ করে ঘুমিয়ে পড়। আমরা আজ পায়ে হেঁটে রাউন্ড দেবো।

ভটচাজ হৃষ্টমনে থানার পথ ধরল আর আমরা তিনজন তালতলা অ্যাভেনিউর দিকে রওনা দিলাম। প্রায় হাতড়ে হাতড়েই এগুচ্ছি, কিছুই নজরে পড়ছে না, আন্দাজের উপরেই শীতলা মন্দির পার হলাম। যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছাকাছি পৌঁছেছি এমন সময় একটা উৎকট আর্তনাদ, বেশ শোরগোল এবং চিৎকার ভেসে এল তালতলা বাজার স্ট্রীটের দিক থেকে। আচমকা কুয়াশা গলিয়ে আরেকটা সাদা শরীর আমার একেবারে গায়ে লাফিয়ে পড়ল। আমি অনেকটা রিফ্লেকসের বশেই হাতের চারসেলের টর্চের বাঁট আগন্তুকের কাঁধে আছড়ে দিলাম, আর বৈজনাথ কালবিলম্ব না করে লোকটাকে দু'হাতে মাটি থেকে দু'হাত উপরে ঝুলিয়ে দিল। লোকটা এবার শূন্য থেকেই বলল,স্যার আমি হ্যারি, আমাকে মারবেন না, আমি আপনার হেলপ চাই। ইউজিন মনে হয় মার্ডার হয়ে গেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, এক্ষুণি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। প্লীজ স্যার,কিছু একটা করুন।

দু'হাত দূরে আরেকটা শরীর মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছিল। টর্চের শক্তিশালী আলোয় কোনোমতে নজরে এলো ইউজিন পড়ে আছে, মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। হ্যারিকে বৈজনাথ ছেড়ে দিতেই হ্যারি ফড়ফড় করে ইউজিনের গায়ের শার্টটা ছিঁড়ে ফেলে ফালি করে মাথায় পট্টি বাঁধতে বসে গেল। এহেন সময় স্বয়ং ঈশ্বরের দূতের মতো দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডের বুড়ো আর ডাক্তার লেনের ঠাকুর উদয় হলো সেখানে। দু'জনেই নিশাচর এবং করিৎকর্মা। ঝটপট কোথা থেকে একটা রিকশা নিয়ে এসে ইউজিনকে চাপিয়ে দিল, হ্যারিও বসল পাশে আর বুড়ো রিকশা ঠুন ঠুন করে চলল নীলরতন সরকার হাসপাতালের দিকে। ঠাকুর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে জেনে নিলাম। হ্যারিকে সবাই জানে ব্ল্যাক হ্যারি নামে। গায়ের রং কুচকুচে কালো কিন্তু পোশাক সব সাদা—সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট এবং সাদা জুতো। শক্তসমর্থ চেহারা। দুয়েকটা রড চালানো, ছুরি চমকানো, ছিনতাই জাতীয় কেস আছে ওর নামে। পুলিশের নজর বেশি পড়লে জাহাজের খালাসীর চাকরি নিয়ে ভেসে পড়ে কয়েক মাসের জন্য। আমার হাতে কয়েকবার ধরা পড়েছে, নাকে খৎ দিয়েছে, ক'দিন চুপচাপ থেকে আবার যেইকে সেই। হ্যারি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চোস্ত ইংরেজি বলে। ইউজিন বাঙালী ক্রিশ্চান, খাস ঢাকার বাঙাল। ইউজিনের রেকর্ডও বাঁধিয়ে রাখার মতো। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ব্যবহারও আপাতমধুর। ছিনতাই, রাহাজানি এসবে থাকে না। ওর কাজ হলো 'কড' জাতীয় প্রতারণা। এরা রাজা-বাদশা সেজে বড়লোকদের ফাঁদে ফেলে তাসের জুয়ায় ফতুর করে ছেড়ে দেয়। হ্যারি আর ইউজিন একই পাড়ার ছেলে, খুব যে এদের দোস্তি তাও নয়। কিন্তু বছরের শেষ পরবের দিনে দু'জনে একসঙ্গে অনেক ঢালাঢালি করে রাস্তায় বেরিয়েছিল। জানতো না ইউজিনের উপর শোধ নেবার জন্য জনাচারেক লোক অনেকক্ষণ থেকে গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে! কাছাকাছি হতেই মাথায় মোক্ষম রডের বাড়ি মেরে কুয়াশার সাদা চাদরে গা ঢেকে আততায়ীর দল অদৃশ্য।

ইউজিন রোগা-পটকা দেখতে হলেও জানে অনেক দম, রিকশায় বসে এই রক্তস্নান করা শরীর নিয়েও আমাকে ধন্যবাদ দিতে ভুল করল না, স্যার, আপনি আমার জন্য যা করলেন তা জীবনেও ভুলুম না আর যারা আমার এই দুর্দশার কারণ তাদেরও ছাড়ুম না।

সার্জেন্ট মদন মণ্ডল সংক্ষেপে বলল,

সময়মতো আমরা এসে পড়েছিলাম, ইউজিনের একটা ফাঁড়া কাটল।

আমি বললাম, হাসপাতালে এবারে দিন দশেক গড়াগড়ি খাবে মনে হচ্ছে।

মদন বলল, ক্ষেপেছিস, একদিন বড়জোর দু'দিন হাসপাতালে থাকলেই ইউজিন একদম ফিট হয়ে ফিরে আসবে।

বৈজনাথ বলল, হুজুর, ইউজিন বড়া বদমাশ, উসকো এইসাই হোনা থা। জরুর কিসি বুড়বাককো ফাঁসাকে পয়সা চোট কর দিয়া ঔর আজ বদলা লে লিয়া। লেকিন ঔ চার গুণ্ডাকো হাম ছোড়েঙ্গে নেহি, সবকো লকাপমে ডালেঙ্গে।

তালতলা অ্যাভিনিউ হয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। কুয়াশা হালকা হবার কোনো লক্ষণ নেই। ধর্মতলা স্ট্রীটের রডরিক ভাইগুলোর সুনাম(!) সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি মার্ডার কেসের আসামী, কুড়ি গোটা কয়েক রাহাজানি কেসে ঝুলছে। এদিকে শীতলা মন্দির থেকে তালতলা অ্যাভিনিউ শম্ভু পণ্ডিত আর মণ্টু পণ্ডিত ছড়ি ঘুরাচ্ছে! এমনিতেই রাতের দিকে এসব অঞ্চলে চক্কর কাটতে হয় আর আজ বর্ষশেষের পালা। সেইসঙ্গে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সাদা কুয়াশার চাদরে সবকিছু ঢাকা পড়েছে!

ধর্মতলা স্ট্রীট খুব ব্যস্ত রাজপথ, রাস্তাটা পুরো তালতলা এলাকায়। রাস্তা পার হলেই মুচিপাড়া। মুচিপাড়া সাধুসন্তদের আস্তানা কোনোদিনই ছিল না। মাঝে মাঝেই মুচিপাড়ার উঠতি চ্যাংড়ার দল ধর্মতলার ছোট ছোট দোকানগুলোতে হুজ্জত করতো।

সার্জেন্ট মণ্ডল বেশ বলশালী লোক আর বৈজনাথ পালোয়ানের ছাতির ঘের প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখলে বেলাইনের ভদ্রলোকদের ত্রাস হবার কথা। কিন্তু আজকের কুয়াশা আমাদের আড়াল করে রেখেছে। মুশকিল এই, আমরাও কিছু নজরে আনতে পারছি না।

মুশকিলের গোলকধাঁধার মধ্যে যখন পাক খাচ্ছি এবং কায়ক্লেশে তালতলা অ্যাভিনিউ আর ধর্মতলার মোড়ে চলে এসেছি অকস্মাৎ কুয়াশা গলে চারমূর্তির আবির্ভাব! প্রায় গলাগলি আর জড়াজড়ি করে চারমূর্তি হাঁটি হাঁটি করে এগুচ্ছিল, লক্ষ্য ছিল এস. এন. ব্যানার্জি রোড। প্রায় নিঃশব্দেই আমার হাতের টর্চ, মণ্ডলের হাতের বেতের লাঠি আর বৈজনাথের গদাসদৃশ মুষ্ঠি কয়েকবার উঠানামা করল। চারমূর্তির কারো তেমন সচল অবস্থা ছিল না, প্রায় তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ শেষ, চারজনেই মাটি নিল।

মণ্ডল বলল, খুব সহজেই পুলিশী কাজটা হয়ে গেল, সমস্যা হলো এদের এখন থানার গারদ পর্যন্ত চালান করা যায় কোন রাস্তায়!

বৈজনাথ মন্তব্য করল, ড্রাইভার ভটচাজ কামচোর। ইস টাইম জীপ হোনা বহুৎ জরুরি থা। অব ক্যা করে? ড্রাইভার খুদ ভাগ গিয়া!

এমন সময় এস. এন. ব্যানার্জি রোড থেকে বাজখাঁই গলার পুলিশী হাঁক, এ হুজুর, এ ধর সাব, এ সার্জেন্ট সাহেব, বৈজনাথ হো, কাঁহা গইলবা সব!

আমি বললাম, এ যে ডি. এন. সিং হাবিলদারের গলা। বুড়োর চাকরির আর ক'দিন বাকি রে সার্জেন্ট সাহেব?

মদন বলল, হিসেব মতো আর দিন দশেক বাকি। ১০ জানুয়ারি ওর চাকরির শেষ দিন। এমনিতে ওদের বয়সের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ভর্তি হবার সময় যে বয়স লিখিয়েছে সেটাই চলে আসছে রেকর্ডে। দেখলে তো মনে হয় সত্তর ছুঁই ছুঁই!

আমি বললাম, বয়স যাই হোক, আর চাকরিও হয়তো হয়ে গেছে নয় নয় করে বছর চল্লিশ কিন্তু লোকটার দায়িত্বজ্ঞান, সেন্স অব ডিউটি কেমন চিন্তা কর। দশ দিন বাদে রিটায়ারমেন্ট, কোথায় সিক রিপোর্ট করে খাটিয়ায় শুয়ে থাকবে, তা না নাইট পেট্রল ডিউটিতে লাঠি হাতে এই ঠাণ্ডায় চক্কর কাটছে!

মদন বলল, এইসব লোক আর বেশিদিন চোখে পড়বে না। যা সব নতুন প্রজন্মের নমুনা দেখছি, ক'দিন বাদে হয়তো শুনতে হবে রাতের ডিউটিতে বাইরে যাবো না স্যার, চোর-ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবে কে!

ইতিমধ্যে পালোয়ান বৈজনাথ পালোয়ানী হাঁক ছাড়ল একটি, এ ওস্তাদ, তানি ইঁহা আওহো।

অতঃপর মিনিট পাঁচেক আওয়াজ চালাচালি হলো বৈজনাথ, ডি. এন. সিং আর তার সাথী কনেস্টবল অপেশ্বর ঠাকুরের মধ্যে। কুয়াশার সাদা পর্দা ভেদ করে কিছুই চোখে আসছে না, আওয়াজের সংকেত আর লাঠির ঠুক ঠুক পথ পার করায়। ডি. এন. সিং-এর চোখে পুরু কাচের চশমা। আজ আর সেটা চোখে নেই। চোখে রেখেই বা কি হবে, এই কুয়াশার মাঝে দেখার ব্যাপারটা প্রায় কিছুই নেই।

আমি বললাম, ডি. এন. সিং, চারটে পেতি মাস্তানকে কলাগাছের মতো শুইয়ে রেখেছি, থানায় চালান করি কি করে?

ডি. এন. সিং বলল, হুজুর, ও কালা বামনা ঔর জীপ কাঁহা ছোড় দিয়া। জীপমে টপাক টপাককে চারকো শুলা দেকে, ফির চলেন যাই থানা!

ডি. এন. সিং আর ড্রাইভার ভটাচাজের মধ্যে একটা অঘোষিত যুদ্ধ অনেককালের। এদের দু'জনের কি নিয়ে এতো মন কষাকষি এক উপরওয়ালাই বলতে পারেন। কিছুদিন আগে 'চিড়িয়াখানা' সিনেমার একটু শুটিং পর্ব ছিল, স্বয়ং উত্তমকুমার শুটিং করতে এলেন। হলের সামনেই কয়েকবার 'টেক' নেওয়া হচ্ছিল। উত্তমকুমার নামের জাদু অন্যরকম, খবরটা চাউর হতেই পিল পিল করে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-ছোঁড়া 'লোটাস' সিনেমা আর সুরেন ব্যানার্জি রোড প্রায় দখল নিয়ে নিল। উত্তমকুমারকে একটু রক্তমাংসে সশরীরে দেখবে সেটা কি কম ভাগ্যের ব্যাপার! লোকাল থানা থেকে অতএব ভিড় কন্ট্রোল করবার জন্যে আমাদের আসতে হলো। আমি, মদন মণ্ডল, ডি. এন. সিং হেড কনেস্টবল, বৈজনাথ পালোয়ান আর বৈজনাথের জনা তিন-চার যমদূতের মতো স্পেশ্যাল সেপাই। ডি. এন. সিং এমনিতে শক্তসমর্থ লোক, চোখে বেশ পাওয়ারের চশমা ছাড়া বেমানান কিছু নেই। শুধু মুশকিল হলো ওর হাতের লাঠি। প্রায় ছয় ইঞ্চি ঘেরের বেতের লাঠি, যার পিঠে পড়বে ছ'মাস

লাগবে সে ব্যথা ভুলতে! সেই লাঠির ব্যবহার যত্রতত্র, অনেক ক্ষেত্রে লঘুপাপে গুরুদণ্ড ঘটে যায়। অভিযোগ এলে ডি. এন. সিং অম্লান বদনে বলে, ক্যা হুজুর। দুনিয়া জানতা হ্যায় হামারা আঁখ বহুৎ কমজোর, রাস্তামে ভইস দেখকে হাম তানি লাঠি ঘুমায়া ঔর লাগা ইনকা পিঠপর! তো এ ভেইয়া, আপকা ক্যায়া কাম থা হামারা ইতনা করীব আকে পিঠ দেখানা!

সেদিন ডি. এন. সিংয়ের লাঠি পড়বি তো পড় ভটচাজ ড্রাইভারের পৃষ্ঠদেশে! ঐ ভিড় আর শোরগোলের মাঝে ভটচাজ কখন সাদা পোশাকে উত্তমকুমার দর্শনের জন্য ভিড় বাড়িয়েছিল আমার কিংবা মদন মণ্ডলের কারো চোখে সেটা পড়েনি। ভটচাজ লাঠি হজম করে থানায় এসে ডুকরে পড়ল, এই লজ্জার চাকরি আর করবো না স্যার। ডি. এন. সিং বুড়ো আমাকে আজ চোর-গুণ্ডার মতো পিটিয়ে দিল এলাকার হাজার পাবলিকের সামনে। গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই আমার!

আমি, মদন মণ্ডল, জেসিও দুবে সবাই মিলে ভটচাজের ফোঁপানি থামাতে হিমশিম। শেষকালে বড়বাবু মৃণাল দাসবর্মন ডি. এন. সিংকে ডেকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। বড়বাবুর আবার ডি. এন. সিংয়ের উপর একটু দুর্বলতা ছিল। দুষ্টজনে বলে বড়বাবুর হুলো নিতাই কনেস্টবল ডি. এন. সিংকে আগেই ভুজুং ভাজুং করে শিখিয়ে পড়িয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সিং সর্বসমক্ষে ভটচাজকে জড়িয়ে ধরে বলল, সিয়ারাম কহো, কেয়া তাজ্জবকা বাত, ভিড়ভাড়মে একঠো কালা ভইস য্যাইসা আদমী হামারা আগে ধাকল ধাকলকর পৌঁছ গিয়া। হুজুর, আপকো মালুম হ্যায় নু, হামারা আঁখমে তানি কমজোরি হ্যায়, ম্যায় সোঁচা ক্যা শীতলা মন্দিরকা বদমাশ মন্টুয়া পৌঁছ গিয়া, উত্তুমবাবুকো না লোকশান পৌঁছে, তো দিয়া দনাদন এক ডাণ্ডা। ই মন্টুয়া নেহি, ভট্টা ডেরাইভার বাদমে না পতা চলা!

ভটচাজ বাধা দিয়ে বলল, সিংজি, আপনাকে আমি বললাম আমাকে মারবেন না, আমি পুলিশ, তা আপনি কানেই নিলেন না কথাটা।

সিং জবাব দিল, ইয়ে হুয়া না দুসরা মুসিবত। আজতক জিতনা লাফাঙ্গাকো পিটাই কিয়া সবহি বোলতা, হামকো মত মারো, হাম পুলিশ হ্যায় জী। ইসি লিয়ে তুমারা বাত পর হাম খেয়ানই নেহি দিয়া।

অতঃপর সিং তার ঝোলা কামিজের পকেট থেকে একটা শিশি, তার ভেতরে কালচে রঙের কিছু তরল বস্তু, সেটা বার করে পরম স্নেহে ভটচাজকে দিয়ে বলল, ভট্টা ভেইয়া ইয়ে লে তেরে লিয়ে মালিশ লে আয়া, করুয়া তেল, লৌসুন ঔর জড়িবুটিসে বানায়া ইয়ে চীজ। তানি গরম করকে পিঠপর লাগাও, দো দিনমে দরদ খালাস।

শিশিতে যাই থাক, উৎকট গন্ধে সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রক্ষা।

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। কিছুদিন বাদে থানার গেটের কাছেই ডি. এন. সিংকে প্রায় জীপে চাপা দেবার উপক্রম ভটচাজের। ভটচাজ বলল, বুড়ো হয়েছো, চোখে দেখো না, এবারে মানে মানে দেশে ফিরে গেলেই তো পারো।

সিং বললো, এ ভট্টা, তু জানবুঝকর এইসা কিয়া, ঠিক হ্যায়, পিঠ সামালকর রাখনা, ঔর একরোজ লাঠি পড়েগা!

যা হোক এইসব পুরনো প্রসঙ্গ ছেড়ে বর্তমানে আসি। চারটে কলাগাছ মাটিতে শুয়ে আছে, কারো নড়নচড়ন নেই। কুয়াশা মনে হলো আরো ঘন হয়ে আসছে। টর্চের আলোতেও কারো মুখ ভালো করে চেনার উপায় নেই। যা ঠাণ্ডা, বেশিক্ষণ মাটিতে পড়ে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যাবার থেকে অক্কা পাবার সম্ভাবনাই বেশি।

বৈজনাথ, মদন মণ্ডল, ডি. এন. সিং এদের এসব নিয়ে চিন্তা নেই। চিন্তাটা আমারই। পুলিশী নিয়মে ডিউটি অফিসারকেই সব ঝঞ্ঝাট সামলাতে হয়। তাছাড়া এমন বেঘোরে কারো প্রাণ গেলে থানার ডিউটি অফিসার নিরীহ নিষ্পাপ যুবকের হত্যাকারী বলে সে সব দিনেও হৈচৈ হতো।

সিংকে বললাম, সিং, আপ হোতে হুয়ে ইনলোগকো থানামে কেইসে ভেজনা ইয়ে সব হামকো শোচনে পড়েগা?

সিং বলল, একদম সহি বাত। আপ বিলকুল চিন্তা নেহি করনা হুজুর। হাম হ্যায় নু।

এরপরই সিং বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়ল—বলিষ্ঠ সিং, আরে হো বলিষ্ঠুয়া।

তানি ইঁহা আওহো।

তিন মিনিটের মধ্যেই কুয়াশার সাদা পর্দা প্রায় ফাঁক করে তিন ভাই বলিষ্ঠ, বশিষ্ঠ আর বলরাম সিং হাতে লাঠি নিয়ে হাজির। এরা ধর্মতলা স্ট্রীটেই থাকে, চায়ের দোকান চালায়, দারোয়ানী করে, কয়েকখানা ঠেলাও ভাড়া খাটায়। ছাপরা জেলার লোক, ডি. এন. সিংয়ের দেশও ওদিকেই, এমনকি বৈজনাথের দেশও বালিয়া জেলায় ছাপরার খুব কাছাকাছি। তিন ভাই বলিষ্ঠ, বশিষ্ঠ আর বলরামকে আমিও চিনতাম। এদের দোকানে ত্রিক রোর ঘণ্টা, হেবো, ভোলার দল মাঝে মাঝেই হুজ্জত-হামলা করছিল। এসব নিয়ে থানায় এসেছিল পুলিশী মদত নিতে। পরবর্তী সময়ে ঘটনা খুনোখুনি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং আমাকে অনেক ধকল, অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

ডি. এন. সিংয়ের খবরদারিতে মুহূর্তে বলিষ্ঠ একটা ঠেলা এনে ফেলল। এরপর তিনভাই ধুপধাপ করে চারটে অচল ধরাশায়ী মূর্তিকে ঠেলার উপর কাটা কলাগাছের মতো শুইয়ে দিল। মদন একবার সবকটার নাড়ি আর ছাতি পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিল, নাঃ ভয় নেই, সবকটাই বেশ ভালভাবে বেঁচেবর্তে আছে। কাল সকালে চোখ খুললেই বুঝবে বাছাধনরা কোন বিছানায় শুয়ে আছে।

আমি একবার খুঁতখুঁতে মন নিয়ে বললাম, এমন সৃষ্টিছাড়া কুয়াশায় নজর চলছে না, এদের পরিচয় জানাটা খুব জরুরি ছিল।

আমার কথায় বৈজনাথ একবার টর্চের আলো ফেলে ফেলে চারমূর্তির মুখ চেনার প্রয়াস নিল। বৈজনাথ স্পেশালদের সর্দার, এলাকার সব গুণ্ডা বদমাশ ওর নখদর্পণে।

বৈজনাথ ফেল করার পর ডি. এন. সিং প্রয়াস নিল। বৈজনাথ সসম্মানে বলল, হেই ওস্তাদ, কুছ দিখাই নেহি পরতা, উপরসে আপকা ডাবল বেটারি পকেটমে ছিপা হুয়া। কোনসা খেল দেখানা আজ?

ডি. এন. সিং কোনো উত্তর না দিয়ে সব কটার হাত-মুখ-ছাতি হাতড়ে নিল ভাল করে। তারপর বলল, হুজুর ধরসাব, ইয়ে সব নাদান ছোকরা লেকে কাঁহেকো টহল দেতে আপ? কোই চীজ জানতা নেহি, হামেশা পক পক। লিজিয়ে থানেমে যাকে মিলা লিজিয়ে ইয়ে চারোমে একঠো হ্যায় রুডলফিয়া, দুশরাকা নাম পাগলা অ্যান্টুনী। বাকি তো নয়া লাগতা হ্যায়, মালুম নেহি পরা।

আমি আর মদন দু'জনেই তাজ্জব। বুড়ো ম্যাজিক জানে নাকি! চোখ প্রায় অন্ধ, এর উপরে খাপছাড়া কুয়াশার বেড়াজালে আমাদের জোয়ান চোখেও কিছু নজর আসছে না, ডি. এন. সিং কোন ইন্দ্রজালে এই চারজনের মধ্যে দু'জন পুরনো গুণ্ডাকে শনাক্ত করতে পারল! সিং দয়া করেই খানিকটা খোলসা করল, হুজুর, বাত ইতনা মুশকিল নেহি হ্যায়। ইয়ে জো রুডলফিয়া ঔর পাগলা অ্যান্টুনী হায়নু দুনোই পুরানা হ্যায়। পুরানা রাফ তালতল্লাকা। ইয়ে দুনোকো হাম রগ রগসে জানতা হুঁ। রুডিকা দুনো হাতমে গ্যারাঠো অঙ্গুলি, ঔর পাগলা অ্যান্টুনীকা শির ফাট গিয়া থা কোই শাল পহেলে, ওসকা শিরকা একতরফ বাল নেহি হ্যায় ঔর বাঁয়া তরফ আধাইঞ্চিকা গহেরা চোট। এককো হাতমে হাত মিলায়া ঔর দুসরাকো শিরপর হাত ফিরায়া তো যো সমঝনাথা সমঝ লিয়া। বাকি যাদা কুছ নেহি হ্যায়। দুনো মস্তাণ্ডা আশপাশমে রহেতে হ্যায়। ব্যস, ওহি দুনোই হোনা চাহিয়ে ইতনা তকলিফকা রাতমে!

মদন আস্তে করে বলল, এ যে দেখছি শার্লক হোমসের ঠাকুর্দা!

রুডি ওরফে রুডলফ রডরিক আর পাগলা অ্যান্টুনী ওরফে অ্যান্টনী রোজারিও তালতলার পার্ট 'এ' রাফ, মানে দাগী পোক্ত মস্তান। রুডির পরিবারের ইতিহাস একটু আগে বলেছি, পাগলা অ্যান্টুনীর কথা একটু শোনাই। অ্যান্টুনীর কালো ছিপছিপে চেহারা, ওর শরীরের সবচেয়ে কঠিন অঙ্গ হলো ওর মাথাটা। লোকে বলে বাজি ধরে ডাব মাথায় মেরে মেরে ফাটাতো, একদিন পাথরের দেয়ালে পরখ করতে গিয়ে মাথার বাঁদিকটা থেঁতলে যায়। সেই থেকে মাথার একদিকটা একদম পালিশ, একটাও চুল নেই আর বাঁদিকটায় বেশ গভীর ক্ষত হয়ে গেছে। পাগলা মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যায় আর ষাঁড়ের মতো লোককে নিজের মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে দেয়। রুডি আর অ্যান্টুনীর দৈনিক এক-আধটা ছিনতাই আর মারপিট প্রায় জলভাতের পর্যায়ে।

মদন আবার বলল, আমি তোর বছর দুই আগে পুলিশে ঢুকেছি। একেবারে গোড়ার দিকেই রুডির দাদা ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি দু'জনে মিলে দিনদুপুরে আরেক অ্যাংলো সাহেবকে খুন করে বসল। কুকর্মটা ভিভিয়ানই করেছিল। স্ট্যানলি শুধু ভাইকে কুকর্মে মদত দিয়েছিল। কাজটা করে দু'ভাইই বেপাত্তা। খুন করে পার পাওয়া কঠিন ব্যাপার, কলকাতা পুলিশ হন্যে হয়ে আসামী খোঁজে। একদিন তো ভিভিয়ান আর স্ট্যানলি জালে আটক পড়ল। তালতলাতেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ, বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে, স্ট্যানলি আনাড়ির মতো ছুট দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। ভিভিয়ান কোনো উপায় না দেখে পাশেই ছিল একটা কালো পাঁকে ভর্তি নর্দমা তাতে একবার গড়াগড়ি খেয়ে একটা কালো ভল্লুকের মতো বেরিয়ে এসে সব পুলিশের বেড়া ডিঙিয়ে দে ছুট। ডি. এন. সিং বুড়ো ছিল একটু দূরে, পুলিশের কর্ডনের পেছনে। এমন নোংরা কিম্ভুত জীব দেখে প্রায় সবাই ভ্যাবাচেকা খেয়ে কি করবো কি করবো ভাবছে। ডি. এন. সিং তৎক্ষণে সহুঙ্কারে জাপটে ধরেছে ভিভিয়ানকে। নোংরা, পাঁক, দুর্গন্ধ থাকে থাক আসামী ছেড়ে দেব নাকি!

আমি বললাম, ভিভিয়ানের পরের খবর আমি জানি। পুলিশ ট্রেনিং কলেজের পরে লালবাজারের ডি.ডি.-তে ট্রেনিং করতে এসে এ কেসটা বেশ মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছিলাম। ভিভিয়ান জেলে বসে এন্তার ক্রিমিন্যাল ল'র বই পড়ে পড়ে পুরোদস্তুর ব্যারিস্টার বনে গেল। নিজের কেসে নিজেই ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ারের মতো সওয়াল-জবাব শুরু করল কোর্টে। উকিল, পুলিশ, পাবলিক সব দেখেশুনে তাজ্জব। কাগজে কাগজে রিপোর্ট বেরোতে লাগল। কিন্তু কেসটা এমন সাংঘাতিকভাবে ভিভিয়ানের বিরুদ্ধে গেল যে হাইকোর্টের জজ ভিভিয়ানের

ফাঁসি আর স্ট্যানলির দশ বছর জেলের হুকুম শুনিয়ে বসলেন। ফাঁসির হুকুম হবার পরদিন থেকেই ভিভিয়ান বদ্ধ উন্মাদ। স্ট্যানলির জেলখাটা এখনো চলছে। উন্মাদ আসামীর তো ফাঁসি হতে পারে না, কাজেই ভিভিয়ান আজো জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ডি. এন. সিং আর কনেস্টবল ঠাকুর ঠেলাসমেত চারমূর্তিকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত। বলিষ্ঠ সিং আর তার এক ভাই ঠেলা ঠেলে নিয়ে যাবে। সিংকে বললাম, চারকো থানা লকআপমে ডাল দো। হুঁশ আয়েতো নাম-পতা নোট কর লেনা, নেহিতো এইসাই ছোড়দো। হাম যব থানেমে লৌটকে আয়েঙ্গে সবি ব্যবস্থা করা লেঙ্গে।

মুহূর্তে ঠেলার খচর মচর, ডি. এন. সিংয়ের লাঠির ঠুক ঠুক শোনা গেল। দেখা তো যায় না কিছুই, শুধু বুঝলাম ঠেলা সচল হয়ে থানার পথে চলল।

মদন বলল, চারটেকে কোনো কেসে আটকাবি নাকি?

আমি বললাম, রুডি আর পাগলা পল্টুনীর নামে কোনো অভিযোগ থাকলে কেস টেনে ঢুকিয়ে দেবো। সঙ্গের আর দুটোকে থানার আলোয় পরখ করে নিতে হবে। অন্যথা সবকটাকে ক্যালকাটা পুলিশ অ্যাক্টের আটষট্টি ধারায় উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য হাজতবাস করিয়ে দিতে হবে।

কুহেলী রাতের বিরামহীন ঘনীভূত শুভ্রতা আমাদের ঘিরে রেখেছে। হালকা হবার কোনো লক্ষণ নেই। অনুমানে বুঝতে পারি ঘড়ির কাঁটা রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে।

এমন সময় বেশ দূর থেকে বেসুরো গলায় কারো কীর্তনগান শোনা গেল। গানের সুর খুব আস্তে আস্তে আমাদের দিকেই এগিয়ে এলো। মনে হলো কেউ ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে তালতলা অ্যাভেনিউর দিকে আসছে। এমন দৃষ্টিহীন পদযাত্রায় শম্বুকগতি ছাড়া কিইবা ঘটতে পারে!

মদন বলল, নির্ঘাৎ কোনো মাতালের কাণ্ড!

আমি বললাম, মাতাল তো বটেই তবে ইনি আমাদের স্বনামধন্য হরিদা। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের 'ইসায়াস' বার থেকে বেরিয়ে আজ আর ট্যাক্সি পাননি, তাই হাঁটি হাঁটি ভরসা। তুইও এনাকে দেখেছিস, বেশি নয়, এক-আধবার মাত্র। তোরা থানার সার্জেন্ট সাহেব, নাইট ডিউটি কচিৎ অনুগ্রহ করে দিস, হয়তো সকাল-বিকেল থানায় হাজিরা দিয়ে আর কটা হুকার ধরেই ডিউটি শেষ। রাত নটায় বাড়ি ফিরে গিয়ে গরম গরম ভাত-রুটি-মাছের ঝোল খেয়ে শুয়ে পড়তে পারিস। হরিদা প্রখ্যাত নিশাচর মাতাল, তালতলা থানায় যাদের ঘন ঘন নাইট ডিউটি করতে হয় তারা সবাই এঁকে চেনে। হরিদা এন্টালি এলাকার বনেদী বড়লোক, বাড়িতে আধ ডজন গাড়ি রয়েছে, কিন্তু বাড়ির গাড়ি নিয়ে কখনো বার-রেস্টুরেন্ট করেন না। রাত বারোটার পর একটি প্রমাণ সাইজের মাটির হাঁড়িতে কষা মাংস ঠেসে বার বন্ধ হলেই ট্যাক্সি ধরে থানায়। প্রথমে বড়বাবুর খোঁজ করবেন, তাঁকে না পেলে অফিসারদের ঘরে ঢুকবেন, তারপর বলবেন, তোরা পুলিশরা বড় কষ্ট করিস। তোদের দুঃখের কথা আমি আকাশ-বাতাসকে বলে দেব, নে মাংস খা, মাংস খেয়ে তাগদ আর মাসল ঠিক ঠিক রাখ, নইলে গুণ্ডারা তোদের পিটিয়ে যাবে যে রে। আজ কুয়াশার খেঁচাকলে আটকে গেছেন, কোনো ট্যাক্সি জোটেনি, তাই হন্টন ভরসা!

এইসব কথাবার্তার মাঝে হরিদা বিটকেল সুরে শ্যামাসঙ্গীত করতে করতে প্রায় আমাদের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়েই তাঁর পদযাত্রার সাময়িক ইতি ঘটালেন।

মাতালরা নাকি কুকুর আর পুলিশের সামনে পড়লে হুঁশ ফিরে পায়। হরিদাও তার ব্যতিক্রম নন। আমাদের ধড়াচূড়া, বেল্ট, গ্রেটকোট, টুপি, লাঠি ইত্যাদির একটা আলাদা মাত্রা আছে। ধাক্কা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিদা বললেন, কে বাবা, পুলিশ নাকি! তা বাবারা আপনারা কোন থানা থেকে উদয় হলেন, মুচিপাড়া, তালতলা না খোদ লালবাজারের লোক?

আমিই এবারে আওয়াজ দিই, হরিদা, আমরা তালতলার পুলিশ। এই কুয়াশায় গাড়িঘোড়া চলছে না, তাই পায়ে হেঁটেই আপনাদের মতো লোকদের সামলে-সুমলে রাখছি।

হরিদা খুব খুশি হয়ে বললেন, গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে থানার ছোট-বাবু। আর বলিস না ভাই, রাত বারোটায় 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলে খানিকটা চেল্লা-মেল্লি হলো, কটা পটকা ফাটল, তারপর 'ইসায়াস' বারের মালিক গিদওয়ানি আমার হাতে মাংসের হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলল, হরিদা বাড়ি যাও। বাইরে ঘন কুয়াশা, পথ দেখা যাচ্ছে না, ট্যাক্সি রাস্তায় একটাও নেই, হেঁটে হেঁটে এন্টালি ফিরো এখন। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেছে, নিজের ডান হাত বাঁ হাত দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই অনুমান আর মায়ের গান দুটোই আমাকে এদ্দূর টেনে নিয়ে এলো। শুধু তাই না, আজ থানায় না গিয়েও তোদের দেখা পেয়ে গেলাম এমন অদ্ভুত পরিবেশে। আহারে বাছারা, তোদের কতো কষ্টের চাকরি। ভাবিস না, তোদের দুঃখের কথা আমি আকাশ-বাতাসকে জানিয়ে দেবো। এই নে, মাংস খা, খেয়ে তাগদ বাড়িয়ে যা।

এইসব বলে হরিদা হাতের মাংসের হাঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে মদনের হাতে সঁপে দিলেন। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মাংসের সুঘ্রাণ নাকে পৌঁছে যাচ্ছিল। অদ্ভুত কাণ্ড আরেক, কথা নেই বার্তা নেই আচমকা ভীষণ খিধে পেয়ে বসল। অতএব প্রায় দু'কিলো হাঁড়িভর্তি কষা মাংস পাঁচ মিনিটেই খতম। বৈজনাথও বাদ পড়েনি, বালিয়ার লোক মাছ-মাংস দুটোই খায়।

ভোজনপর্বের শেষে একটু পরিতৃপ্ত হয়ে মদন বলল, এমন সৃষ্টিছাড়া কুয়াশা আগে তো কখনো দেখিনি। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে নাকি?

হরিদা বললেন, তোরা পুলিশের লোক ডাণ্ডাবাজি আর চোর-ডাকাত ধরা ছাড়া আর কিছু জানিস না। বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনিক সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হলে বৃষ্টি অথবা কুয়াশার সৃষ্টি হতে পারে। ঘূর্ণাবর্ত যদি ঘড়ির কাঁটার মতো ক্লকওয়াইজ ঘোরে তবেই জমে এমন ঘন কুয়াশা আর উল্টোটা ঘটলেই বৃষ্টি নামে। আজকের কুয়াশার ঘনত্ব অনেক, মনে

হচ্ছে মাটি থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার ঘন সাদা চাদর চারপাশে ঝুলছে।

এসব বলার পর হঠাৎ হরিদা চটিতং হয়ে বললেন, ধুস, অতো জ্ঞানের কথা বলে গোলাপী আমেজটা কেটে গেল। তোরা এবারে তোদের কাজ কর, আমি আস্তে আস্তে মৌলালি পার হয়ে কনভেন্ট রোডের নিজের ডেরায় ফিরে যাই।

শ্যামাসঙ্গীতের বেসুরো একটা গৎ ভাঁজতে ভাঁজতে হরিদা ঘন কুয়াশা গলে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ধর্মতলা স্ট্রীট আর ক্রিক রোর ক্রসিং তালতলা অ্যাভেনিউ থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। এমন বিদকুটে প্রাকৃতিক খেয়ালে যেখানে এক ইঞ্চি নজর চলছে না সেখানে ইঞ্চি ইঞ্চি করেই এগুচ্ছি আমরা। তবে পুলিশী চলন-বলন একটু অন্য ধাঁচের। আমাদের ভারী পোশাকের খচর মচর, হাতের লাঠির মাঝে মধ্যেই খটাস করে আওয়াজ (এসব আওয়াজ ইচ্ছে করেই মাটিতে ঠুকে করা হয়), জুতোর নাল থেকে অবিরাম ঠকাস ঠকাস শব্দ, তার উপর হেঁড়ে গলায় নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ, সব মিলিয়ে দুষ্টদের মনে একটা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল নিশ্চয়।

এমন সময় ক্রিক রো থেকে ভেসে এলো ভীমনাদের মতো হুঙ্কার, কৌন হ্যায় রে? বদমাস হো তো হাড্ডি তোড় দেঙ্গে।

বৈজনাথ উৎফুল্ল হয়ে বলল, হুজুর লাগতা হ্যায় কৌই জুড়িদার হোগা। মুচিপাড়া থানেসে টহল লাগানে আয়া।

মদন সার্জেন্টসুলভ চেতাবনী দিল, কৌন কিসকা হাড্ডি তোড়নেওয়ালা আগে বাড়কে দেখাও। হামলোগ তালতলা থানাকা পুলিশ। তুমলোগ কৌন হো?

এবারে মুচিপাড়া থানার অফিসার সুকুমার রায়চৌধুরীর পরিশীলিত গলা শোনা গেল, আপনারা কে কে আছেন নাম শোনান, আমি মুচিপাড়ার অফিসার, সঙ্গে আমার থানার ফোর্স রয়েছে। কুয়াশার জন্য আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না, কোনোরকম ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নেবেন না।

সুকুমার আমার ব্যাচমেট, আমাদের চাইতে কিছুটা বয়োজ্যেষ্ঠ, কিছুদিন এয়ারফোর্স করে এসেছে। অতি ভদ্র, অতি সহিষ্ণু এবং কিঞ্চিৎ পরিপক্ক।

আমি আওয়াজ দিলাম, একি অঘটন, সুকুমার, তুমি এই রাতের সাদা কুয়াশায় সাঁতার কাটছো কেন ব্রাদার!

সুকুমারের দলটা ততক্ষণে আমাদের প্রায় কাছাকাছি। সুকুমার কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ সুরে বলল, কে সুভাষ, শখ করে কি আর কলুর বলদ সেজেছি ভাই! রাস্তায় একটা কুকুরও নেই, এই ঠাণ্ডায় সবাই যে যার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। যারা নিউ ইয়ারে মাতামাতি করতে বেরিয়েছিল তারাও যে যার ঘরে ফিরে গেছে। রাস্তায় আজ আছে শুধু তোমার আমার মতো পুলিশ।

আমি বললাম, মন খারাপ করো না, ডিউটি ইজ ডিউটি।

সুকুমার স্বাভাবিক গলায় বলল, তা যা বলেছো। এলাকায় মোটামুটি চক্কর কেটে ফিরে যাবো থানায়। উল্লেখ করার মতো কিছু ঘটেনি। এই কুয়াশা আজ পুলিশের অনেক কাজ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলে আমরা আবার পা বাড়িয়েছি আমাদের পথে। উদ্দেশ্য ওয়েলেসলি স্ট্রীটে এসে মোড় নেবো। সুকুমার পেছন থেকে বলল, সুভাষ, একটা খবর শুনে যাও। আজ রাতে কালী ঘোষ ধরা পড়েছে থানায়, যার আরেকটা পরিচয় 'কড কালী' নামে। কড কালী আমার কাছে বয়ান দিয়েছে যে তোমাদের এলাকার ইউজিন আর মুসলিম কালীর সঙ্গে সে একটা বড় কাজ করেছিল কিন্তু ওকে এক পয়সাও ওরা ছোঁয়ায়নি। জান তো কালী খুব রগচটা লোক। গোলতালাওয়ের (ওয়েলেসলি ট্যাঙ্ক) জামির হলো ওর পোষা গুণ্ডা। জামিরকে কালী বলেছিল ইউজিন আর মুসলিমের পা খোঁড়া করে দিতে। কাজেই পা খোঁড়া হবার আগে ইউজিন আর মুসলিমকে থানায় আটকে দাও। আমার কাছে কেস টানা আছে।

আমি সংক্ষেপে বললাম, মুসলিমের খবর এখনো পাইনি, তবে ইউজিনের পা নয়, মাথা ফেটে চৌচির, হাফ-মার্ডার কেস। কাল সকালে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখে কেসটা হাফ না ফুল মার্ডার সে বিচার করবো। খবরটা দিয়ে খুব ভালো কাজ করলে। মুসলিম আর জামিরের ঠেকগুলো আজকেই দেখে নিতে হবে। এই রাত, এই শীত আর এই কুয়াশা খাঁটি ব্রাহ্মস্পর্শ, খুব সম্ভব পেয়ে যাবো সব কটাকে।

ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট আর ওয়েলেসলির মোড় পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে পার হয়ে এলাম। মনের ভুল কিনা জানি না, মনে হলো কুয়াশা একটু হাল্কা লাগছে, নিজেদের হাত-পাগুলো অন্তত নজরে আসছে। শীতের কামড় একটু কম কম লাগছিল। মদন বলল, মনে হচ্ছে কুয়াশা এবারে ছুটি নেবো নেবো করছে।

আমি বললাম, প্রায় চার ঘণ্টা কুয়াশায় আটকে আছি। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির সামনে কখনো পড়িনি এর আগে। দার্জিলিং আর ভুটানের পাহাড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুয়াশা নামে দেখেছি, মুহূর্তে সবকিছু ঢাকা পড়ে আবার মুহূর্তেই সবকিছুর প্রকাশ। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা একদম অন্যরকম। তবে একটা সমস্যা রয়েছে। আলোর রোশনি কুয়াশা কাটিয়ে দিলে অন্ধকারের জীবগুলোকে কব্জায় পাওয়া মুশকিল। আমাদের স্পীড একটু বাড়াতে হবে, নইলে মুসলিম বা জামির ফুরুৎ করতেই পারে।

গোলতালাওয়ের উল্টোদিকে গলির মধ্যে মুসলিমের আস্তানা। কালীর যেমন আরেকটা নাম 'কড কালী', মুসলিমেরও অন্য নাম 'কড মুসলিম'। ছোটখাটো জোচ্চুরি এরা নিজেরা নিজেরাই করে। কিন্তু যেখানে বেশ বড়সড় দাঁও, সেখানে কালী, মুসলিম বা নিমু গোস্বামী লেনের 'কড গোঁসাই' এরা মিলেমিশে কাজ সমাধা করে, লাভের কড়ি ভাগ করে নেয়। আমার বিচারে এমনি কোনো মোটাসোটা জোচ্চুরি কালী; মুসলিম আর ইউজিন মিলে সম্প্রতি করেছে এবং কালীকে ঠকিয়েছে।

কড শ্রেণীর চিটিংবাজগুলো দেখতে বেশ সরেস। ইউজিনের ঝকমকে ফর্সা ছিপছিপে লম্বা চেহারা। মুসলিম ফর্সা, মাঝারি লম্বা, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে। এমনকি গোঁসাইও দেখতে

সাধুসন্তের মতো, রীতিমতো ভক্তি জাগানো চেহারা। একটা পুরনো দোতলা বাড়ির উপরতলায় টংয়ের ঘরে মুসলিম থাকে। বাড়ির ছাদ এত নিচু, মোটামুটি স্বাস্থ্যের যে কোনো লোক লাফ মেরে পুলিশকে কলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তিনজন মিলে বাড়িটা কি করে ঘিরে ফেলবো সেটা ভাবতে ভাবতে এগুচ্ছি হঠাৎ চারজন লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। এদের মধ্যে একজন হিস হিস করে বলল, চুপচাপ হাত উপরে তোল বাছাধনরা, নাহলে গুলিতে খুলি উড়িয়ে দেবো।

চারপাশ এখনো নজরে আসছে না, কিন্তু গলার আওয়াজটা এতো পরিচিত, হাত তোলার কোনো ব্যাপারই নেই। শ্রীমান শোভেন ঘোষ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসার আর আমার ব্যাচমেট। হুমকিটা তারই। আমিও ফিসফিস করে বললাম, নে, সেমসাইড কেস করে লাভ নেই। শোভেন ভাল হয়েছে তোরাও এসেছিস, মুসলিমকে ধরবি তো? তোরা চার আর আমরা তিন। চারজন বাড়িটা ঘিরে থাকুক, আমি, মদন মণ্ডল আর তুই উপরে উঠে ব্যাটাকে বিছানা থেকে তুলি।

শোভেন খুব খুশি হয়ে কানের পাশে এসে বলল, আরে তুই এখানে! আমি তো ভাবছিলাম মুসলিমের স্যাঙ্গাতরা জড়ো হয়েছে। বছরের শেষরাতে বিছানা থেকে উঠে এসেছি, এই সৃষ্টিছাড়া কুয়াশা ঠেলে আসতে আসতে বছরের প্রথম দিনের সকাল প্রায়! আমার কাছে রিভলবার, পিস্তল কিচ্ছুই নেই, বুঝলি তো, ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছিলাম। মুসলিমকে ধরবার জন্য গুলি-বন্দুকের দরকার আছে নাকি!

যাহোক পাঁচ মিনিটেই প্রায় নিঃশব্দে কার্যসিদ্ধি। মুসলিম ল্যাজেগোবরে হয়ে ধরা পড়ল। শোভেন বলল, এই মুসলিম, কালীদের দল এক বাঙালী ভদ্রলোককে তাসের জুয়ার চিটিংয়ে অনেক টাকা চোট করে দিয়েছে। ভদ্রলোক সিলেটের বাঙাল। লন্ডনে হোটেল করে বেশ দু'পয়সা পকেটে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই এদের খপ্পরে। মুসলিম সেজেছিল কোনো এক ভুয়ো এস্টেটের নবাব আর কালী তার ম্যানেজার। জনা দুই সাঙ্গোপাঙ্গও প্রতারণা পর্বে অংশ নিয়েছে। চোটটা এতো বিপুল অঙ্কের যে ভদ্রলোক দু'দিন চুপচাপ থেকে তিনদিনের দিন গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছেন এমন সময় ভাগ্যক্রমে বাড়ির লোকের নজরে পড়ে গেলেন। তারপর এর-ওর হাত ঘুরে স্বয়ং দেবী রায়ের মুখোমুখি। দেবীবাবুকে তো জানিস, দু'মিনিটে ছবির মতো বুঝিয়ে দিলেন কাজের কাজ, কোথায় গেলে কাকে পাওয়া যাবে। কালী ধরা পড়েছে, এবারে মুসলিম ধরা পড়ল। আমার কাজ হলো মুসলিম আর কালীকে নিয়ে দেবীবাবুর সামনে ফেলে দেওয়া। বাকিটা উনি দেখবেন।

আমি বললাম, তোরা মুসলিমকে নিয়ে এগো। থানায় গিয়ে অ্যারেস্টশীটে নামটা লিখিয়ে চলে যাস। অ্যারেস্টিং অফিসারের কলামে আমার আর মদন মণ্ডলের নাম দুটো ঢুকিয়ে দিতে ভুলবি না। আমাদের আরেকটু কাজ আছে, থানায় ফিরতে কিছু দেরি হবে।

গোলতালাওয়ের পূবপাড়ে রুটিওয়ালা নুরুর কারখানা। নুরুর রুটির ভাল নাম, তার চাইতেও বেশি নাম তার ছেলে জামিরের। জামির মাথায় পাঁচ ফুট, মাঝারি চেহারা, ফর্সা কিন্তু স্বভাবটা ভীষণ হিংস্র। গোলতালাওয়ের আশেপাশে যতো ছিনতাই, চাকু মারা, রড চালানো, জামির তার প্রায় সবকটাতেই পুরোভাগে। কতবার ধরে এনেছি, জেলের ভাত খাইয়েছি, নিজেই ভুলে গেছি। বেশির ভাগ অপরাধ থানায় রিপোর্ট হয় না, হলেও সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যায় না। কাজেই জামির ধরা পড়ে আর জেলের মেয়াদ কাটিয়ে ফিরে আসে। তবে ধরা পড়ার পরে কিঞ্চিৎ লাঠ্যৌষধির ব্যথা ভুলতে যে ক'দিন সময় লাগে ততদিন ভালই থাকে। দেখা হলে হাতজোড় করে বলে, 'সাব, একদম শুধার গিয়া। ঔর কভি নাজায়েস কাম হামসে নেহি হোগা।'

যা বলছিলাম। আজ আমাদের কপাল ভালোই, জামির আর চিনা দুটোকে পেলাম। আরো দুটো ছিল কৌসর আর লাডলা, দুটোই দেখতে ছিপছিপে বেতের মতো, মুহূর্তে হালকা হয়ে আসা কুয়াশা গলে উধাও।

জামির ধরা পড়লেই সুবোধ বালক। তারপর বৈজনাথ ওকে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল। শূন্য থেকেই হাতজোড় করে বলল, হুজুর, ধরসাব, কসুর মাফ কর দিজিয়ে। কালীবাবুনে দুশো রুপেয়া হাতমে ধরা দিয়া ঔর বোলা মুসলিম ঔর ইউজিনকা টাঙ্গ তোড় দো। ইউজিনকা উপর একহিবার রড চালায়া। মুসলিমকো কুছ কিয়াহি নেহি। এইসা মৌসম, কুছ নজর নেহি আতা তো ডেরাপর যাকে শো গিয়া।

থানায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই হঠাৎ সব কুয়াশা উধাও। ভোর হতে একটু বাকি, আলোর রোশনাই নেই, কিন্তু কুয়াশার পর্দাটা বেমালুম অদৃশ্য। গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তার আলো সব দেখতে পাচ্ছি। কুকুরগুলো রাস্তায় আবার ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে, এক-দু'জনের সাড়াশব্দও কানে আসছে।

জামির আর চিনাকে এ. এস. আই চন্দের জিম্মায় গছিয়ে দিলাম। ডি. এন. সিং রুডলফ, পাগলা অ্যান্টনী আর দুটো নতুন উঠতি ছোকরাকে আগেই লকাপে পুরে দিয়েছে। চারজনেই সুখশয্যায় শুয়ে আছে! আমি আর মদন থানার উপরে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলাম। দু'চার ঘণ্টা চোখ বুঁজতে পারলেই খুশি।

সকাল দশটায় থানায় নেমে এলাম। চারদিকে ঝলমলে রোদ, কে বলবে রাতভর এমন কুয়াশা ছিল! একগাল হেসে সার্জেন্ট মদন মণ্ডলের প্রবেশ। বললো, দেখ, কে আমার পিছনে!

শ্রীমান ইউজিন! পরিষ্কার ধোপদুরস্ত শার্টপ্যান্ট, গলায় টাই, মাথায় যদিও বিশাল ব্যান্ডেজ! হাতে ছোট্ট ধামায় সাজানো কমলালেবু, আপেল আর কেক। বলল, হাসপাতালে ব্যান্ডেজ বাইন্ধা দিল, ডাক্তার কইল এইযাত্রায় বাঁইচ্চা গেলা। স্যার, বছরের পয়লা দিন, পরবের মাস, তাই রিস্কবন্ডে সইসাবুত কইরা চইলা আসছি। আপনাদের দয়ায় জানটা বাঁচল, আপনারা ভালো থাকেন, মা মেরীর কাছে এই আমার প্রার্থনা।

ছবি ঃ সরোজ সরকার

আসল বনাম নকল

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যত রকমের মণিপাথর (gemstone) পাওয়া যায় তার মধ্যে সবার সেরা হলো হীরে। শুধু এ যুগেই নয়, রামায়ণ-মহাভারতের কাল থেকেই হীরে ও অন্যান্য মণিরত্ন হয়ে উঠেছে অর্থ, প্রতিপত্তি ও পরাক্রমের প্রতীক। সেযুগের হিন্দু শাস্ত্রকাররা উৎকর্ষের বিচারে চার রকমের হীরের কথা বলেছেন। অনেকটা নিজেদের বর্ণাশ্রমের মতোই। নির্মল স্বচ্ছ হীরেকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে, স্বচ্ছ মধু রঙের হীরেকে ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে, হালকা হলুদ রঙের হীরেকে বৈশ্য শ্রেণীতে আর ধূসর রঙের হীরেকে শূদ্র শ্রেণীতে ফেলা হতো তখন। তবে তৃতীয় শতকে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে ছ'রকমের হীরের কথা। আর আধুনিক যুগের মাপকাঠিতে যাবতীয় মণিপাথরকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীতে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে হীরে (diamond), চুনি (ruby), নীলা (blue sapphire), পান্না (emerald), পারিভদ্র (aquamarine), বৈদুর্যমণি (cat's eye) ইত্যাদি দামী মণিরত্ন।

এখানে বলে রাখি, হীরের রাসায়নিক উপাদান বিশুদ্ধ কার্বন (carbon) বা অঙ্গারক। জেনে রাখা দরকার, কয়লা ও হীরে তৈরি হয়েছে একই রাসায়নিক পদার্থ থেকে। অথচ স্বচ্ছ ঝকঝকে হীরের সঙ্গে কালো কয়লার চেহারায় কতই না অমিল। পৃথিবীর তাবৎ খনিজ পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হলো হীরে। মোহজ্ সাহেবের কাঠিন্যের স্কেল (Mohs' Scale of Hardness) অনুযায়ী হীরের কাঠিন্য সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১০।

কৃত্রিম হীরে।

এবার আসি চেহারার কথায়। সাধারণভাবে হীরের রঙ জলের মতো স্বচ্ছ হলেও কাটা হীরের ধার থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে অপরূপ দ্যুতি। নীল, সবুজ, হলুদ, লাল, ধূসর ইত্যাদি নানা রঙ মিলেমিশে তৈরি হয় অপূর্ব মনোরম এক বিভ্রম। নানা বিচিত্র নকশায় কেটে হীরের শরীরে আনা হয় চোখ-ঠিকরানো দ্যুতি, ঔজ্জ্বল্য আর চমক। হীরের প্রতিসরাংক (refractive index) ২.৪১৭ আর আলো বিচ্ছুরণের মান ০.০৬৩। অন্যান্য মণিরত্নের চেয়ে হীরের মান এ দুটি ব্যাপারেই বেশি। আর তাই তো হীরের দীপ্তি এত চোখ-ধাঁধানো, যা দেখে মুগ্ধ হন রাজারাজড়া থেকে সাধারণ মানুষ সবাই।

ব্রিলিয়ান্ট কাট নকশায় কাটা হীরে।

এক সময় ভারত ছিল হীরের প্রধান আড়ৎ। জগৎবিখ্যাত বড় আকারের হীরে, যেমন গ্রেট মুঘল, কোহিনূর, পিট বা রিজেন্ট, হোপ ব্লু, ওরলভ, নিজাম, ফ্লোরেন্টাইন, ড্রেসডেন, স্যানসি, ডারিয়ান নূর, পীগট, ট্যাভারনিয়ার, নাসাক ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল এই ভারতের মাটিতেই।

শুধু রাজারাজড়া নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও যাতে কম দামে হীরে পৌঁছে
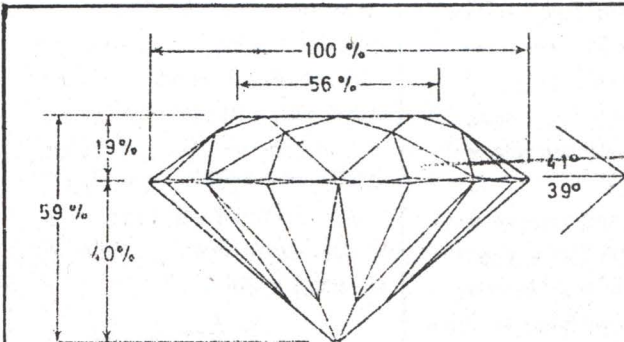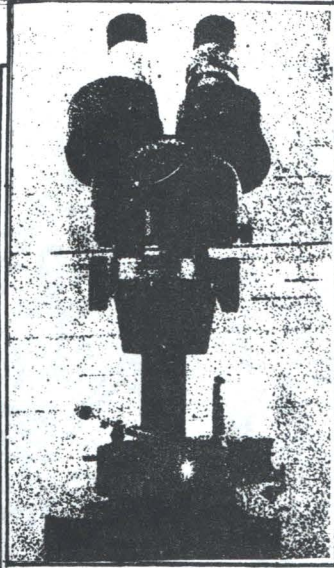
হীরে পরীক্ষা করার মাইক্রোস্কোপ।

দেওয়া যায়, সেই ইচ্ছে থেকেই নকল বা কৃত্রিম হীরে তৈরির প্রচেষ্টা শুরু। কেউ কেউ হয়তো এর সঙ্গে নকল টাকার তুলনা টানতে পারেন। তবে নকল টাকা বানানো হয় ধোঁকা বা ধাপ্পা দেওয়ার জন্য। ব্যাপারটা বেআইনিও বটে। কিন্তু কৃত্রিম হীরে বানানো বেআইনি নয় মোটেই। দোকান থেকে রসিদ কেটেই বিক্রি হয় কৃত্রিম হীরে। বাজারে নকল টাকার দাম কানাকড়িও নয়। কিন্তু বাজারে ভালো ডিজাইনের নকল হীরের দাম নেহাৎ কম নয়।

কৃত্রিম হীরে তৈরি করতে খরচ বেশি পড়ে কেন? আসলে প্রকৃতিতে যে আবহ-পরিবেশের মধ্যে হীরের জন্ম, অবিকল সেই পরিবেশ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে অনেক খরচ পড়ে যায়। এখানে জেনে রাখা ভালো, প্রকৃতিতে ঘন কালো বা সবুজ আলট্রাবেসিক পাথরের ভেতরে অত্যন্ত উঁচু তাপমাত্রায় হীরের সৃষ্টি হয়। এমন পরিবেশ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা সহজ ব্যাপার নয় মোটেই।

ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম হীরে তৈরির চেষ্টা প্রথম করেন ব্রিটিশ রসায়নবিদ জে বি হান্নে। সেটা ১৮৮০ সালের কথা। কয়েকটি ধাতুর উপস্থিতিতে খুব উঁচু চাপ ও তাপমাত্রায় তিনি কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান। এই বিক্রিয়ার ফলে তিন-চারটি ছোট ছোট হীরে কেলাসিত হয়। গবেষণার দিক থেকে সাফল্য পেলেও কৃত্রিম হীরে তৈরির এই পরীক্ষা বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি।

এরপর ১৮৯৬ সালে কৃত্রিম হীরে তৈরির কাজে হাত লাগান ফরাসী রসায়নবিদ হেনরি মোইসাঁ। গলন্ত লোহার মধ্যে উনি গুঁড়ো কার্বন ফেলে দিয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রায় ৪০০০° ফা. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করেন। তারপর সেই গলন্ত পদার্থ দুটিকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিতেই জন্ম নেয় কয়েক টুকরো কৃত্রিম হীরে। হেনরি মোইসাঁর পদ্ধতিটি তখনকার হীরে বিশেষজ্ঞদের কাছে খুবই প্রশংসা পায়।

এরপর প্রায় ৭০-৮০ বছর ধরে আরো অনেকেই নানাভাবে কৃত্রিম হীরে বানানোর চেষ্টা করলেও বাণিজ্যিক সাফল্য কারো ভাগ্যেই জোটেনি। তাছাড়া এঁরা যেসব কৃত্রিম হীরে তৈরি করেছিলেন, সেগুলি সবই ছিল শিল্প-বাণিজ্যিক কাজে লাগানোর হীরে।

মণিপাথর হিসেবে হীরে তৈরির স্বপ্ন অবশেষে সফল হলো। সে এক বিরাট দিন। ১৯৭০ সালের ২৮ মে। সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রথম মণিপাথর হীরে তৈরির কাজে সাফল্য অর্জন করে। তবে দেখা গেল, ল্যাবরেটরিতে জন্ম-নেওয়া সেই কৃত্রিম হীরের দাম পড়ল প্রাকৃতিক হীরের চেয়ে বেশি। সেই শুরু। তারপর লাল নীল হলুদ সবুজ নানা রঙের বহু কৃত্রিম হীরে জন্ম নিয়েছে ল্যাবরেটরিতে, কারখানায়। এই অপ্রাকৃতিক হীরে তৈরির জন্য কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল বোরন নাইট্রাইড-এর গুঁড়ো, যার আরেক নাম 'সাদা গ্রাফাইট'।

শোনা যায় ১৯৬৭ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি হয়েছিল কৃত্রিম মণিপাথর হীরে। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি।

বিগত ৩০ বছরে প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়েছে। কৃত্রিম হীরের দামও যথেষ্ট কমে এসেছে। তবু প্রযুক্তিতে আরো উন্নতি হলে আশা করা যায়, সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে হীরের অলঙ্কারের চল শুরু হবে। হোক না কৃত্রিম হীরে, তবু হীরে তো বটে।

মাটি আমার

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

নদী আমায় ভাসতে ডাকে,
পাহাড় ডাকে আয়—
আকাশ বলে, আয় ছুটে আয়
তোকেই তো মন চায়।
মাটি বলে, লক্ষ্মীসোনা
যাসনে অতদূরে—
যা চাস তা, সবই পাবি
মাটির সমুদ্দুরে।

আকাশ নদী পাহাড়চুড়ো
সত্যি সবই জানি
তবু আমায় হাতছানি দেয়
মাটির আসনখানি।
মাটি আমার পুণ্যিপুকুর,
মাটি আমার মা—
মাটি আমায় হাসায় কাঁদায়
পরম কামনা।

কোথায় গেল

রূপক চট্টরাজ

কোথায় গেল সেই সেদিনের
বনসবুজের সারি,
কোথায় গেল রাজার প্রাসাদ
বাগানওলা বাড়ি।
কোথায় গেল পুকুর ও খাল
মস্ত বড় ঝিল,
কত কিছুই হারিয়ে গেল
পাই না খুঁজে মিল।

মাঠ বোজানোর হাট বোজানোর
চক্র গড়ে ওঠে,
চোখের জলে কত মানুষ
তাই তো মাথা কোটে।

ছবি : সুফি

আমরা সবাই বন্ধু

গৌরী সেন

নেই, নেই, কিচ্ছু নেই, বুলবুলি বৌয়ের কান্না আর থামে না। কেঁদেই চলেছে ও। মস্ত বড় ফলের বাগান, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, পাখিরা তাদের বাসায় ফিরছে। শালিক বৌ বুলবুলি বৌয়ের কান্না শুনে বলল, কি হয়েছে রে সই, এত কাঁদছিস কেন?

বুলবুলি বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলল, সকাল থেকে ঘরেই ছিলাম, বাসাতে চারটে ডিমের উপর বসে বসে দুপুর গড়িয়ে গেল, দুপুরে এত খিদে পেয়েছে যে একটু বের হতেই হলো। খেয়েদেয়ে ফিরে এসে দেখি চারটে ডিমের একটাও নেই।

শালিক বৌ দেখল বুলবুলিটা একটু দূরে চুপ করে বসে আছে একটা ডালে। খুব মন খারাপ বোঝাই যাচ্ছে।

কালো রাক্ষুসীটার কাণ্ড নিশ্চয়, শালিক বৌ বলল।

টুনটুনি আর টুনটুনি বৌ কাছেই বসেছিল, বলল, এই তো কয়েকদিন আগে আমার চার-চারটে ছোট্ট-ছোট্ট ছানা খেয়ে গেছে রাক্ষুসীটা আমাদের সামনেই। আমরা দু'জনে কিচ্ছু করতে পারলাম না। ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষুসীটার সঙ্গে কি আমরা পারি!

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই কাছাকাছি এসে বসল আরোও অনেক অনেক পাখি—ছাতারে, বৌ কথা কও, মৌটুসি। সবারই এক কথা, ঘরে আর ডিম, ছানা কিচ্ছু রাখা যাচ্ছে না। কালো রাক্ষুসীটা রোজ কারু না কারুর ঘরে হানা দিয়ে হয় ডিম নয় ছানা খেয়ে চলে যাচ্ছে।

এমন সময় বকমামা উঁচু ডাল থেকে নিচে নেমে অন্য সব পাখিদের সঙ্গে বসল। বসেই বলল, কালো রাক্ষুসীর কথা বলছ তো? আরে রাক্ষুসীটা তো আমার ছানা দুটোকেও খেয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু মাছ এনে রেখেছিলাম বাসায়, সেগুলোও খেয়ে গেছে। রাক্ষুসীটা ডিম, ছানা তো খাচ্ছেই, সেই সঙ্গে ঘরে কিছু জমানো খাবার-দাবার থাকলে সেগুলোও লুঠতরাজ করছে। বকমামার পাশেই বসেছিল মাছরাঙা পাখি। সেও বলে উঠল, বকমামা ঠিক কথাই বলেছেন, বকমামার মতো একই কাণ্ড করেছে আমার বাসাতেও।

বুলবুলি চোখের জল মুছে বলল, এক কাজ করলে হয় না, চল আমরা সবাই রাজা ময়ূরের কাছে যাই। তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বলি। আমরা পাখিরা তো ওঁর প্রজা। আমাদের দুঃখের কথা রাজা নিশ্চয়ই শুনবেন আর একটা কিছু ব্যবস্থাও করবেন। তাছাড়া কালো রাক্ষুসীটা রাজা ময়ূরকে ভয় পায়। উনি তো ইচ্ছে করলেই নিজের ঠোঁটের তরোয়াল দিয়ে রাক্ষুসীটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন।

সব্বাই একসঙ্গে বলে উঠল, ঠিক ঠিক, আমাদের দুঃখের কথা রাজা ময়ূরকে জানানো দরকার। চল, আমরা সবাই মিলে রাজার কাছে যাই।

পরদিন সকালে ছোট-ছোট সব পাখি—বুলবুলি, ছাতারে, মৌটুসি, শালিক, মাছরাঙা আরোও অনেকে মিলে ময়ূরের বাসার কাছে এল। ওমা! দেখে কি, একটা প্রকাণ্ড বড় গাছের তলায় অনেকটা খোলা জায়গা, সেই খোলা জায়গায় রাজা ময়ূর মনের আনন্দে

নাচছে। সে কি নাচ! পুরো পেখম খোলা, নাচের তালে তালে ময়ূরের পা পড়ছে আর খোলা পেখমটা তিরতির করে কাঁপছে। একটু দূরে ময়ূরী নাচ দেখতে দেখতে ঘুরছে ফিরছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বাহবা দিচ্ছে।

ছোট-ছোট পাখিদের দেখে ময়ূরের নাচ থেমে গেল। ময়ূরী গম্ভীর হয়ে ময়ূরের পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজা ময়ূর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার, তোমরা সকালবেলাতেই আমার কাছে এসেছ? কি চাই তোমাদের? আমি এখন কিন্তু খুব ব্যস্ত।

পাখিদের মধ্যে শালিক খুব কথা বলতে পারে, সে এগিয়ে এসে বলল, রাজামশাই,আমরা সবাই খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

কি বিপদ? ময়ূর জিজ্ঞাসা করল।

আপনি তো কালো রাক্ষুসীকে চেনেন, সে প্রত্যেক দিন আমাদের কারু না কারুর বাসাতে গিয়ে ডিম খেয়ে নিচ্ছে, ছোট ছোট ছানাদের খেয়ে নিচ্ছে, এমন কী বকমামা, মাছরাঙার ঘরে যত মাছ জমা করে রাখা ছিল তাও লুটেপুটে খেয়ে নিয়েছে। আমাদের কেউ নিজেদের বাচ্চা, ডিম বাসাতে রাখতে পারছি না। রাক্ষুসীর অত্যাচারে খুব কষ্ট পাচ্ছি আমরা। ওর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমাদের রাজা, আপনি আমাদের এ বিপদ থেকে বাঁচান।

আমি কি করব? ময়ূর বিরক্ত হয়ে বলল।

আপনাকে একমাত্র ভয় পায় কালো রাক্ষুসী। আপনি ইচ্ছা করলেই ঐ রাক্ষুসীটাকে মেরে ফেলতে পারেন। আপনার অনেক শক্তি, অনেক বুদ্ধি। আপনি আমাদের রাজা, আপনি ছাড়া আমাদের কে বাঁচাবে। বক তার ডানা দুটো জোড় করে খুব করুণভাবে বলল।

আমার এখন এসব আজে-বাজে কাজের জন্য একদম সময় নেই। তোমরা তো সব ছোট-ছোট, এলেবেলে নিচুজাতের পাখি। তোমাদের কথা ভাবার আমার ফুরসৎ কোথায়। তাও যদি চিল, শঙ্খচিল বা এই ধরনের বড়-বড় পাখিরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলত, তাহলেও না হয় কিছু শুনতাম, কিছু করতাম। তোমরা এখন এখান থেকে যাও দিকিনি, আমার সময় নষ্ট কর না।

মহারাজা, বুলবুলি কাতর গলায় বলল, আমরা ছোট-ছোট পাখি হলেও তো আপনারই প্রজা। আপনার কাছে ছাড়া আমরা আর কার কাছে আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলব!

আমি তোমাদের কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমরা কি জান, সারা পৃথিবীর পাখিদের মধ্যে একটা নাচের প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেখানে নেচে আমি সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা আনতে চাই। পৃথিবীর সবাই বলবে ময়ূর দেখতেও যেমন সবচেয়ে সেরা, নাচেও তেমনি সবচেয়ে ভাল। কত যশ, কত সম্মান পাব আমি। আমি হব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাখি। তোমরা কেউ পারবে একাজ করতে? তাই তোমরা এখন যাও।

ময়ূরী তো রেগে খুব জোরে বকে উঠল, যাও তো এখান থেকে। যত রাজ্যের এলেবেলের দল। রাজাকে নাচটা অভ্যাস করতে দাও। এই নাচ ভাল করতে রাজার আরোও অনেক অভ্যাস দরকার। তোমাদের কথা শোনার সময় নেই এখন রাজার। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই কর গিয়ে। বলেই তেড়ে গেল পাখিদের দিকে।

পাখিরা কি আর করে, কাঁদতে কাঁদতে মুখ নিচু করে ফিরে এল বাগানে।

সবাই যখন গাছের ডালে চুপ করে বসে আছে তখন মাছরাঙা বলল, আচ্ছা, একবার আমাদের দাঁড়কাক দাদাকে বললে হয় না, ওরও কিন্তু খুব বুদ্ধি।

সব্বাই বলল, ঠিক, ঠিক, দাঁড়কাক দাদাকেই বলতে হবে। ঐ তো দাঁড়কাক দাদা এসে গেছে।

দাঁড়কাক বলল, কি হয়েছে তোমাদের? খুব চিন্তায় পড়েছ মনে হচ্ছে।

বুলবুলি বলল, খুব বিপদে পড়েছি আমরা। কালো রাক্ষুসী আমাদের কারু বাসায় ডিম আর বাচ্চা থাকতে দিচ্ছে না। খেয়ে ফেলছে। রাজা ময়ূরকে কথাটা বলতে গিয়েছিলাম, আমরা ছোট-ছোট পাখি বলে রাজা আমাদের কোনো কথাই শুনলেন না, তাড়িয়ে দিলেন। রাজা এখন খুব ব্যস্ত।

কিসের জন্য ব্যস্ত? দাঁড়কাক জিজ্ঞাসা করল।

সারা পৃথিবীর পাখিদের একটা নাচের প্রতিযোগিতা হবে, তাতে রাজা নাচতে যাবেন, তাই নাচ অভ্যাস করছেন। শালিক বলল।

দাঁড়কাক একটু মুচকি হেসে বলল, থাক রাজা নিজের নাচ নিয়ে। দেখি আমরা সবাই মিলে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কি না। সাধারণত ঠিক দুপুরবেলা কালো রাক্ষুসীটা রোজ আসে, তাই না? আজ যেই ও আসবে তোমরা সবাই মিলে চিৎকার জুড়ে দেবে। আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু কাছাকাছি থাকব। তারপর দেখই না কি করি কালো রাক্ষুসীর অবস্থা। তোমাদের চিৎকার শুনে বুঝব কালো রাক্ষুসী এসে গেছে। তোমরাও তৈরি থেকো। যা করতে বলব তাই করবে।

এদিকে হয়েছে কি রাজা ময়ূর নাচে ব্যস্ত, ময়ূরী রাজার নাচ কেমন হচ্ছে ঘুরে ঘুরে দেখছে। এই সুযোগে কালো রাক্ষুসী ময়ূরের বাসাতে চুপি-চুপি গিয়ে দুটো ডিম খেয়ে আবার চুপচাপ গাছ থেকে নেমে চলে গেছে। ময়ূরীর মাত্র দুটো ডিমই ছিল। রাজা ময়ূর আর ময়ূরী কিচ্ছু বুঝতেই পারেনি।

কালো রাক্ষুসীর কিন্তু মাত্র দুটো ডিম খেয়ে তার রাক্ষুসে পেট ভরেনি। তাই মনে মনে ঠিক করল আজ শালিকের বাসায় যাবে, ওখানে নিশ্চয়ই ডিম কিংবা বাচ্চা কিছু থাকবেই, অনেকদিন ওখানে যাওয়া হয়নি।

যেই না কালো রাক্ষুসী গাছটা জড়িয়ে উপরে উঠছে, অমনি কে কোথায় আছ তাড়াতাড়ি এস, রাক্ষুসী এসেছে, কালো দুষ্টু রাক্ষুসী এসেছে, বলে শালিক চিৎকার জুড়ে দিল। তার চেঁচামেচি শুনে সব পাখিরা ছুটে এসেছে। দাঁড়কাক দাদাও তার বন্ধুদের নিয়ে চলে এসেছে।

দাঁড়কাক দাদা তার ছোরার মতো ধারালো ঠোঁট দিয়ে মারল কালো রাক্ষুসীর মাথায় খুব জোরে এক ঠোক্কর। ফোঁস করে মাথা উঁচু করল কালো রাক্ষুসী। আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়কাক দাদার এক বন্ধু তার

রাক্ষুসীর গায়ে এখানে সেখানে ঠোক্কর মারতে লাগল।

বিশাল ঠোঁট দিয়ে কালো রাক্ষসীর লেজে ঠোক্কর মেরে লেজ ধরে জোরে এক টান দিল। কালো রাক্ষুসী যেই মাথা নিচু করে লেজ সামলাতে গেছে অমনি দাঁড়কাক দাদা আবার মারল রাক্ষুসীর মাথায় ঠোক্কর। দাঁড়কাক দাদার অন্য সব বন্ধুরা রাক্ষুসীর গায়ে এখানে সেখানে ঠোক্কর মারতে লাগল। অন্য সব পাখিরা চিৎকার করছে, পাখার ঝাপট মারার চেষ্টা করছে। বকমামা তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে কালো রাক্ষুসীর গায়ে আচ্ছাসে মারল কয়েক ঠোক্কর। বকমামার তীক্ষ্ণ ঠোঁটের ঠোক্করে রাক্ষুসীর গায়ে কয়েক জায়গা ফুটো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঝপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল সাপটা।

এদিকে রাজা ময়ূরের নাচতে নাচতে খিদে পেয়ে গেছে। রানী ময়ূরী গেছে তার ডিম দুটোকে দেখতে। বাসাতে এসেই ময়ূরী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। রাজা তার খাওয়া-দাওয়া ফেলে ছুটে এল, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

ময়ূরী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার মাত্র দুটো ডিম ছিল তাও নেই। এটা নিশ্চয় কালো রাক্ষুসীটার কাজ।

রাজা বললে, হায়, হায়, আমি ছোট-ছোট পাখিদের কথায় কান দিইনি। ওদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেও কোনো ব্যবস্থা নিলাম না; শুধু শুধু কত না ওদের হেনস্থা করেছি। এখন আমাকেও ওদের মতো একই দুঃখ পেতে হচ্ছে।

ময়ূরী চিৎকার করে কাঁদছে, রাজা ময়ূরের চোখ থেকে জল পড়ছে। ওরা দু'জনেই তখন অন্যান্য পাখিদের বাগানটাতে চলে আসে। এসে দেখে রাক্ষুসী সাপটা যদিও ফোঁস ফোঁস করছে কিন্তু দাঁড়কাকদের শক্ত ঠোঁটের ঠোক্কর খেয়ে-খেয়ে ভাল করে চলতে পারছে না। তখনও দাঁড়কাকেরা একবার মাথায় মারে, তো একবার লেজে। কেউ আবার লেজ ধরে মারছে এক টান। ময়ূর রাজা বাগানে এসেই ছুটে গিয়ে কালো রাক্ষুসী সাপটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

অন্য সব পাখিরা তো অবাক, কি ব্যাপার, রাজা ময়ূর, রানী ময়ূরী এখানে ছোট-ছোট পাখিদের মাঝখানে কেন? ওদের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ময়ূরী বলল, রাজা নাচের অভ্যাস করছিলেন, আমি এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে রাজার নাচ দেখছিলাম। এই সুযোগে রাক্ষুসীটা বাসায় গিয়ে আমার মাত্র দুটো ডিম ছিল, খেয়ে পালিয়ে গেছে। রাজা ময়ূরও কাঁদতে লাগল। এই প্রথম ময়ূরী ডিম পেড়েছে। তাও খেয়ে ফেলল রাক্ষুসীটা।

দাঁড়কাক দাদা বলল, রাজামশাই, আপনি নাচের প্রতিযোগিতায় যাবেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পাখি হবেন বলে আমাদের ছোট-ছোট পাখিদের কোনো কথাই শুনলেন না, কোনোরকম সাহায্যও করলেন না। আজ আপনি এখানে না এলেও কালো রাক্ষুসীকে আমরা সবাই মিলে মেরে ফেলতে পারতাম। প্রায় আধ-মরা করেই ফেলেছিলাম।

রাজার চোখে জল, তবু বলল, তোমরা সবাই একসঙ্গে নিশ্চয়ই এ কাজ করতে পারতে। দেখ ভাই ছোট-ছোট পাখিরা, আমার খুব ভুল হয়েছে। তোমাদের মতো আমারও তো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে। দুটো মাত্র ডিম ছিল তাও রাক্ষুসীটা খেয়ে নিয়েছে। আমার যা কষ্ট তোমাদেরও তো সেই একই কষ্ট, দুঃখ, কোনো তফাৎ নেই। আমার উপর আর রাগ করে থেকো না। আমি নাচের প্রতিযোগিতায় যাচ্ছি না, মনের এই কষ্ট নিয়ে কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে? আমি তোমাদের কাছেই থাকব। আমি আজ থেকে তোমাদের রাজা নই, তোমাদের বন্ধু।

সব পাখিরা রাজা ময়ূরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল, আমরা সবাই বন্ধু।

ছবি : বিজন কর্মকার

তেল বাঁচান

নিরঞ্জন সিংহ

ডঃ ত্রিভুবন হঠাৎ কেন অমরকণ্টকে গিয়েছিলেন তা অবশ্য জানতে পারিনি, তবে ফিরে এসে উনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। ডাক পাওয়ামাত্র আমি আর আমার বাড়িওয়ালা ন্যাটা মিত্তির হাজির হয়েছিলাম ডঃ ত্রিভুবনের গবেষণাগারে। মিত্তিরমশায় মানুষটি বড় ভাল আর সেইজন্যই ডঃ ত্রিভুবন ওঁকে ভালবাসেন। ডঃ ত্রিভুবন অবশ্য আমাকেও যথেষ্ট স্নেহ করেন। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হয়েও ওঁর গবেষণার অনেক কথাই উনি আমাদের বুঝিয়ে দেন। অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযানে আমাদের সঙ্গে নেন, সেজন্য আমরা যথেষ্ট গর্ব অনুভব করি।

মিত্তিরমশায় ওঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে বসতে বসতে বললেন, 'আচ্ছা ডঃ ত্রিভুবন, বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি আপনার বাড়িতে কিছু লোক কি সব কচুঘেঁচু নিয়ে আসছে আর আপনিও ওগুলো অম্লানবদনে কিনে নিচ্ছেন। ব্যাপার কি মশায়?'

ডঃ ত্রিভুবন অবশ্য কোনো জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কচুঘেঁচু না হলেও ওগুলোকে দামী কোনো গাছগাছড়া মোটেও বলা যায় না, যেমন আকন্দ, পেঁপে, বাঘ-ভেরেণ্ডা, মাঝে-মধ্যে বট, অশ্বত্থের ডালও থাকে। আমার মনে হচ্ছে ডঃ ত্রিভুবন আবার কোনো নতুন গবেষণায় হাত দিয়েছেন। আবার কী কৃত্রিম খাবারদাবার তৈরিতে মন দিয়েছেন? নাকি কোনো আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র তৈরিতে হাত লাগিয়েছেন? মিত্তিরমশায়ের প্রশ্নের কী উত্তর দেন ডঃ ত্রিভুবন তা শোনার জন্য আমিও আগ্রহী ছিলাম।

'মিত্তিরমশায় তার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন তো।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'বলুন কী জানতে চান?' জবাব দিলেন মিত্তিরমশায়।

'আপনার গাড়িটা কি আর গ্যারাজ থেকে বের করছেন না?'

মাথা ঝাঁকালেন মিত্তিরমশায়, 'ন্না মশায়, কী করে বের করব বলুন তো? তেলের দাম যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা এখন আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষদের নাগালের বাইরে। তাছাড়া আপনারা মানে বিজ্ঞানীরাও তো বলছেন যে পৃথিবীর সঞ্চিত তেল নাকি বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। তেল সংরক্ষণের জন্য পদযাত্রা হচ্ছে। টিভিতে বার বার দেখানো হচ্ছে 'তেল বাঁচান'।'
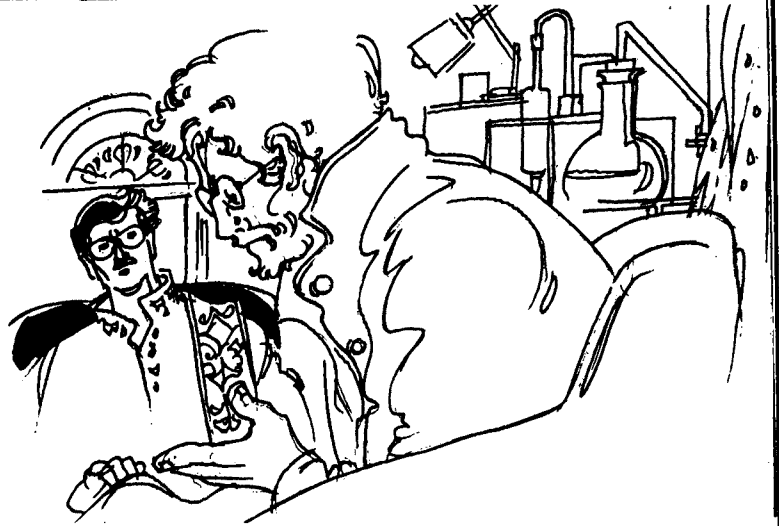
'অথচ দেখুন শহরের গাড়িও কিন্তু দিন-দিন বেড়েই চলেছে', বললাম আমি।

ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'ঠিকই বলেছো সোমেশ্বর। আর সেইজন্যই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিকল্প শক্তির জন্য জোর গবেষণা চলছে।'

'ইলেকট্রিক দিয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা চলছে', বললাম আমি।

'সৌরশক্তির সাহায্যেও তো গাড়ি চালানো হচ্ছে বলে কাগজে দেখছিলাম', বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'আপনারা ঠিকই বলেছেন। এইসব বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য এ বছরের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভিয়েনায় বসছে এক আন্তর্জাতিক বিকল্প-শক্তি সম্মেলন।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'আপনি যাচ্ছেন নিশ্চয়', জানতে চাইলেন মিত্তিরমশায়।

'ঠিকই ধরেছেন। আমাকেও ওঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমার পেপার পড়বার জন্য।'

'হুররে!' জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম আমি।

'ও তাই আপনি ওইসব কচুঘেঁচু নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন।' বলে উঠলেন মিত্তিরমশায়।

'ঠিক তাই!'

'কিন্তু ওসব আগাছা থেকে কী ধরনের শক্তি তৈরি করবেন?' এবার প্রশ্নটা করলাম আমি।

'তরল সোনা!' বললেন ডঃ ত্রিভুবন, 'মানে বিকল্প 'তরল সোনা' বা পেট্রল।'

'বলেন কী ডঃ ত্রিভুবন, গাছগাছড়া থেকে পেট্রল?' রীতিমতো অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ন্যাটা মিত্তির। আমিও হকচকিয়ে ডঃ ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকালাম। উনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো?

কিন্তু না, উনি রীতিমতো সিরিয়াস। বললেন, 'হ্যাঁ, গাছ থেকে পেট্রলের বিকল্প তৈরির পথ খুঁজে পেয়েছি।'

'কি গাছ?' ন্যাটা মিত্তির প্রশ্ন করলেন।

সোমেশ্বরের প্রস্তাবটা সত্যি লোভনীয়...

'বাঘ-ভেরেণ্ডা যার ল্যাটিন নাম 'জেট্রোফা কারকাস, এল'।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'ল্যাটিন নামফাম জানি না তবে বাঘ-ভেরেণ্ডা খুব ভালভাবে চিনি মশায়। ও গাছ তো গ্রামেগঞ্জের জঙ্গলে হয়। গ্রামের অনেকে আবার জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজেও এ গাছ ব্যবহার করেন,' বললেন মিত্তিরমশায়।

'আপনি ঠিকই বলেছেন', বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'বাঘ-ভেরেণ্ডা গাছ থেকে কিভাবে তেল পাওয়া যাবে?' এবার জানতে চাইলাম আমি।

'রাবার গাছ থেকে সাদা দুধের মতো যে রস বেরোয় ওকে 'ল্যাটেক্স' বলে। এই ল্যাটেক্সে থাকে হাইড্রোকারবন। পেট্রলও হলো প্রধানত হাইড্রোকারবন। ল্যাটেক্স পরিশোধিত করে তাই পেট্রল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে রাবার গাছ চাষ করা বেশ মুশকিলের ব্যাপার তাই আমি অন্য কোনো গাছ খুঁজছিলাম যা আমাদের দেশে খুব সহজে জন্মায় এবং যা থেকে এই ল্যাটেক্স পাওয়া যায়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বাঘ-ভেরেণ্ডা গাছে আমার প্রয়োজনীয় ল্যাটেক্সের সন্ধান পেলাম।' থামলেন ডঃ ত্রিভুবন।

'কিন্তু বাঘ-ভেরেণ্ডা থেকে আর কতটুকু রস পাবেন?' বললেন ন্যাটা মিত্তির।

'মিত্তিরমশায় আপনি আসল সমস্যাটাই ধরতে পেরেছেন। কিন্তু এ সমস্যারও আংশিক সমাধান আমি করে ফেলতে পেরেছি।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন করলেন মিত্তিরমশায়।

'বাঘ-ভেরেণ্ডা গাছে এক ধরনের কেমিক্যাল স্প্রে করে রস নিঃসরণ ক্ষমতা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে ওটা হয়তো আরো বাড়ানো সম্ভব হবে।'

'বাঘ-ভেরেণ্ডার রস থেকে আপনি কি তেল বের করতে পেরেছেন?' জানতে চাইলেন মিত্তিরমশায়।

'তা পেরেছি; কিন্তু হাতে-কলমে পরীক্ষা করে উঠতে পারিনি।'

'কেন?'

'আপনি তো জানেন মিত্তিরমশায় যে আমার নিজের কোনো গাড়ি নেই।'

'আরে আপনার গাড়ি নাই থাকল আমার গাড়ি তো রয়েছে। ধরুন ও গাড়ি আপনারই। আপনি ওই গাড়িতে এক্সপেরিমেন্ট করুন।'

'কিন্তু...'

কথা শেষ করার আগেই মিত্তিরমশায় বলে উঠলেন, 'আবার কিন্তু কীসের মশায়!'

'যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে?'

'ঘটে ঘটবে। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে ডঃ ত্রিভুবন।'

'তাহলে আগামী রবিবার মিত্তিরমশায়ের গাড়ি আর ডঃ ত্রিভুবনের বাঘ-ভেরেণ্ডার তেল নিয়ে ডায়মন্ডহারবার যাওয়া যাক', এবার আমি প্রস্তাব দিলাম। শীতের সময়। সাগরমেলা হয়ে গেছে। এসময়টা ডায়মন্ডহারবার বেশ ভালই লাগবে। আমার প্রস্তাবে দু'জনেই রাজী হয়ে গেলেন।

'আপনি হঠাৎ অমরকণ্টকে গিয়েছিলেন কেন ডঃ ত্রিভুবন? গবেষণার কাজে?' আমিই জানতে চাইলাম।

'তা বলতে পারো। কয়েকদিন আগে আমার বন্ধু নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ মেলভিন কেলভিন আমাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন উনি ব্রাজিলে এক ধরনের গাছের সন্ধান পেয়েছেন যার রস দিয়ে সরাসরি গাড়ি চালানো যায়। এই রস পরিশোধনের প্রয়োজন হয় না। এই গাছের স্থানীয় নাম 'কোপি ইবা'। উনি এ কথাও জানিয়েছিলেন যে এই গাছের মতো গাছ ভারতবর্ষে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেই গাছ খুঁজতেই আমি অমরকণ্টকে গিয়েছিলাম।'

'কোনো খোঁজ পেলেন?' মিত্তিরমশায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, তবে মনে হচ্ছে খুঁজে পাওয়া যাবে।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারি না সোমেশ্বর, আমরা মানে এই তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীরা কোনো নতুন ধরনের গবেষণা শুরু করলেই কিছু লোক তা ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে কেন?'

'সেরকম কিছু আপনার নজরে পড়েছে নাকি?' জানতে চাইলাম আমি।

'একটা উড়ো চিঠি এসে গেছে—এখুনি গবেষণা বন্ধ করতে হবে, না হলে ফল ভাল হবে না।'

'দেখি চিঠিখানা', বললাম আমি।

'লালবাজারে তড়িৎকে দিয়ে এসেছি। গোয়েন্দা বিভাগে আছে, যা করার ওই করবে।'

সেদিনের মতো আসর ভাঙল।

রবিবার মিত্তিরমশায়ের গাড়ির ট্যাঙ্কে যেটুকু পেট্রল ছিল তা বের করে ফেলা হলো। ডঃ ত্রিভুবনের বাঘ-ভেরেণ্ডার রস থেকে তৈরি পেট্রলের বিকল্প দিয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি করা হলো। ন্যাটা মিত্তির ড্রাইভারের সিটে বসলেন। আমি সামনে ওঁর পাশে বসলাম। ডঃ ত্রিভুবন বসলেন পিছনের সিটে। বুকটা যে একটু দুরু দুরু করছিল না এ কথা জোর করে বলতে পারব না; কিন্তু মিত্তিরমশায়কে নির্বিকার বলে মনে হলো। এতটুকু ভয়-ভাবনার চিহ্ন ওঁর আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পৈল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই উনি গাড়ি স্টার্ট দিলেন। গাড়ি স্টার্ট নিতেই খুব খুশি হলেন মিত্তিরমশায়, 'এই তো দিব্যি চলছে', অ্যাকসিলেটরে চাপ দিতে দিতে বললেন উনি।

'খুশি তো', একটু হেসে বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'নিশ্চয়!'

ডায়মন্ডহারবার পৌঁছে গেলাম আমরা সাড়ে নটার মধ্যে। গঙ্গা এখানে বিশাল। যদিও ডায়মন্ডহারবার অনেকবার এসেছি তবু এখানে এলে ভালই লাগে। আসলে উন্মুক্ত প্রকৃতি সব সময় মানুষের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ফেলে।

ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'কাজকর্ম ছেড়ে মাঝে মাঝে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত, কী বলেন মিত্তিরমশায়!'

'তা যা বলেছেন।' সায় দিলেন মিত্তিরমশায়।

সাগরিকার সামনে গাড়ি লক করে রেখে কথা বলতে বলতে আমরা বড় রাস্তা থেকে নেমে গঙ্গার ধারে চলে এসেছিলাম। প্রচুর পিকনিক পার্টি এসেছে। মাঠটা জমজমাট।

'মিত্তিরমশায় এখানকার পাইস হোটেলের বাটা মাছের রসা খুবই বিখ্যাত। দুপুরের লাঞ্চ আমরা পাইস হোটেলেই সারব।' বললাম আমি।

'সে তো খুব ভাল কথা। ডঃ ত্রিভুবনের কোনো আপত্তি নেই তো?'

'মোটেও না। সোমেশ্বরের প্রস্তাবটা সত্যি লোভনীয়', বলে হেসে উঠলেন ডঃ ত্রিভুবন।

সূর্য প্রায় মাথার উপর। গঙ্গার বুকে ভেসে যাচ্ছে কয়েকখানা মালবোঝাই পালতোলা নৌকো। কিছুক্ষণ আগে একটা বড় জাহাজ মোহনার দিকে চলে গেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে লাইটহাউসের দিকে এগুচ্ছিলাম। এদিকে ভিড় অনেকটা ফাঁকা। কিন্তু এখানেই এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলাম। হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠে দেখলাম ডঃ ত্রিভুবন ডান হাতটা চেপে ধরে বসে পড়েছেন। কণ্ঠে আর্ত চিৎকার। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পিছন ফিরে দেখলাম একটা সিড়িঙ্গে মতো লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ভিড়ের দিকে ছুটছে। মিত্তিরমশায় কিন্তু ততক্ষণে ওই লোকটার উদ্দেশে ছুট লাগিয়েছেন। আমার মনে হলো লোকটার পিছনে না ছুটে ডঃ ত্রিভুবনের কী হলো তা দেখা দরকার। বুঝলাম উড়ো চিঠিটা মোটেই উড়ো নয়। আমি ডঃ ত্রিভুবনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। উনি ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছেন। গুলিটা যে ওঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাগ্য ভাল ডান হাতের চামড়া ঘেঁষে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক হলে কী যে ঘটত তা ভাবতেও আমার হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। 'আমি ঠিক আছি সোমেশ্বর', বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ ত্রিভুবন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ওঁর কোটের হাতাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মিত্তিরমশায় হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে বললেন, 'না, ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেল।'

এরপর ডঃ ত্রিভুবনকে নিয়ে প্রথমে আমরা গেলাম ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে। ড্রেসিং করে থানায় রিপোর্ট লিখিয়ে তক্ষুণি আমরা কলকাতা রওনা হলাম। ডায়মন্ডহারবার থেকে ফেরার পথে পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল নিতে হলো, কারণ বাঘ-ভেরেণ্ডার তেল ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে আর এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলাম। ডঃ ত্রিভুবনের গবেষণাগারের দরজা ভেঙে দুষ্কৃতকারীরা ভিতরে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। সম্ভবত কিছু কাগজপত্রও নিয়ে গেছে। সব দেখেশুনে ডঃ ত্রিভুবন বললেন, 'আমার উপর হামলা হওয়ার পর এরকমই কিছু একটা আশা করছিলাম।'

'মনে হচ্ছে আপনার গবেষণার কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়ে গেছে। আপনার জেনিভা সম্মেলনে যাওয়ার কী হবে ডঃ ত্রিভুবন?' বললেন মিত্তিরমশায়।

'সেজন্য অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। এই গবেষণার সব তথ্য একটা কমপিউটার ফ্লপিতে কপি করে তড়িতের কাছে জমা রেখেছি। তড়িৎকে সব ব্যাপার জানাতে হবে। মিত্তিরমশায় আপনার একটা সার্টিফিকেট পেলেই আমার কাজ চলে যাবে।' বলে ডঃ ত্রিভুবন মিত্তিরমশায়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'আমি আপনাকে কী সার্টিফিকেট দেব?' মিত্তিরমশায় বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠলেন।

'বাঘ-ভেরেণ্ডার তেলে আপনার গাড়ি কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিনা ঝামেলায় গেছে এই সার্টিফিকেটটা আমার চাই।' মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'ওঃ তাই বলুন। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এ সার্টিফিকেট তো আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেব ডঃ ত্রিভুবন।'

'ব্যস তাহলেই আমার ভিয়েনাযাত্রায় আর কোনো বাধা রইল না।' বললেন ডঃ ত্রিভুবন।

'আপনি কিন্তু সব সময় সাবধানে থাকবেন ডঃ ত্রিভুবন', বললাম আমি।

'কোনো চিন্তা কোরো না। এসব ছিঁচকে লোকের উৎপাত। আমার কিচ্ছু হবে না। শুধু একটা দুঃখ রইল।'

'কীসের দুঃখ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'হতভাগা শয়তানটার জন্য বাটা মাছের রসা দিয়ে লাঞ্চ করাটা হলো না।'

মিত্তিরমশায় ও আমি দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

ছবিঃ সরোজ সরকার

ফিরে দেখা

মঞ্জিল সেন

সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। আমি তখন এক মফঃস্বল শহরের ইস্কুলে ক্লাশ এইটে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন ওখানকার মুন্সেফ। ওটা ছিল মহকুমা শহর, তাই মুন্সেফ আর এস. ডি. ও-ই ছিলেন প্রধান শাসনকর্তা। ফলে ওখানে তাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল একথা বলা বাহুল্য।

আমার বাবা অল্প কিছুদিন হলো ওখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার আগে আমরা ছিলাম অন্য এক মহকুমা শহরে। সেখান থেকে এখানে এসে আমি ক্লাশ এইটে ভর্তি হয়েছিলাম।

প্রথম দিনই একটি ছেলে আমার নজর কেড়েছিল। টানা টানা চোখ, সারা মুখে কেমন যেন একটা শান্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ছাপ।

ছেলেটি প্রায়ই আধময়লা পোশাক পরে ইস্কুলে আসত, পায়ে তালিমারা জুতো। লেখাপড়ায় কিন্তু ছেলেটি ভাল ছিল, ক্লাশের ফার্স্ট বয়। ইস্কুলের মাস্টার-মশাইরা ওকে খুব স্নেহ করতেন। আমার বয়স তখন তেরো। ছেলেটিকে কেন জানি আমার ভাল লেগেছিল। ওর সঙ্গে আমি যেচে আলাপ করলাম। ওর নাম অরুণ রায়চৌধুরী। কথায় কথায় জানলাম ওর বাবা দু'বছর আগে কঠিন অসুখে মারা গেছেন। পরে জেনেছিলাম ওর মা অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করে ওকে পড়াচ্ছেন। সংসার চালাবার জন্য তাঁকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হতো। ছোট ছেলে-মেয়েদের জামা সেলাই করে বিক্রি করতেন, ডালের বড়ি বানাতেন, আরও কি সব করতেন। ওর বাবা নাকি ভাল চাকরি করতেন, কিন্তু টাকা-পয়সা তেমন কিছু রেখে যেতে পারেননি, তাঁর চিকিৎসাতেই নাকি জলের মতো টাকা খরচ হয়েছিল।

অরুণের মামাবাড়ির অবস্থা সচ্ছল, কিন্তু যে কারণেই হোক ওর মা বাপের বাড়ির সাহায্য নেননি। এসব কথা কিন্তু আমি পরে জেনেছিলাম, তাও অন্যের মুখে। অরুণ কখনও নিজের সম্বন্ধে মন খুলে আমাকে কিছু বলেনি। ও ছিল একটু চাপা প্রকৃতির।

ওর সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওই অল্প বয়সেও ওর কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা পরিণত ভাব ছিল। দারিদ্র্য বোধহয় মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে, কঠিন বাস্তব তাকে অল্প বয়স থেকেই সংগ্রামী হতে সাহায্য করে।

টিফিনের সময় আমি বাড়ি থেকে আনা টিফিন খেতাম, কিন্তু অরুণকে কখনও কিছু খেতে দেখিনি। টিফিনের সময় ও একটা গাছের তলায় বই নিয়ে বসত। একদিন ওকে জিগ্যেস করলাম, তুমি খাবার আন না কেন?

ও মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল, আমার খিদে হয় না।

আমার তখন বালক বয়স হলেও মনে হয়েছিল, কথাটা জিগ্যেস করা আমার উচিত হয়নি।

আমি আমার টিফিনের বাক্স খুলে ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলেছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে খাবে? আমার মা আমাকে এত খাবার দেয় যে আমি সব খেতে পারি না।

অরুণ বলেছিল, না ভাই, আমি কারও দান গ্রহণ করি না, আমার মা বলে দান নেওয়া মানে ভিক্ষে নেওয়া, তাতে অসম্মান হয়।

কথাটা শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি বলেছিলাম, তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেলে তোমার অসম্মান হবে এমন কথা আমার মনে হয়নি।

তোমার যে সম্মান হারাবার কিছু নেই

ভাই, অরুণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তাই তোমার মনে এ প্রশ্ন আসেনি।

বলতে বাধা নেই ওর জবাব শুনে আমি খুশি হইনি।

পরের দিন টিফিনের সময় ও গাছের তলায় বই খুলে বসতেই আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও বই বন্ধ করে একটু হেসে বলল, তুমি টিফিন খেলে না?

আমার খিদে নেই, আমি জবাব দিলাম।

ও, আজ বুঝি ইস্কুলে আসার আগে বেশি খেয়েছিলে? অরুণ হাসিমুখেই বলল।

না, রোজ যা খাই তাই, আমি জবাব দিলাম।

তবে! অরুণ একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকাল।

তোমার মতো আমারও খিদে না হতে পারে, আমি গম্ভীর মুখে বলেছিলাম।

অরুণ কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়েছিল, তারপর বলেছিল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ দেখছি।

মোটেই না, আমি বলেছিলাম, ভেবে দেখলাম টিফিন না খেলেও চলে, কত লোক তো দু'বেলাই পেট ভরে খেতে পায় না।

ও! অরুণ বলল, তার মানে আজ তুমি টিফিন আনোইনি।

তা আনব না কেন! আমাকে সত্যি কথাই বলতে হলো, আমার মা তো সে কথা শুনবে না। আমি একজন ভিখিরিকে আমার টিফিনের খাবার দিয়ে দিয়েছি।

এটা তো তুমি অন্যায় করেছ, অরুণ বলল, তোমার মা'র কাছে সত্যি কথা বলছ না, এটা ঠিক নয়।

আমি ওর কথার জবাব দিইনি।

অরুণ চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, আমার জন্য তুমি টিফিন খাবে না এটা ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমি যাকে বন্ধু বলে মনে করি সে আমার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতে অসম্মান বোধ করে, এটা ভাবতে আমারও খুব খারাপ লেগেছিল, আমি পাল্টা জবাব দিলাম।

অরুণ এবার হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, তুমি আমাকে বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি। ঠিক আছে, আমি আমার মাকে জিগ্যেস করে দেখি।

পরদিন ও আমাকে বলেছিল, মাকে আমি সব বলেছি। মা বলেছে ভালবাসার দান কখনও অসম্মানের হয় না। তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে মা, তোমাকে খুব দেখার ইচ্ছে হয়েছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন ও আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। পুরনো একতলা বাড়ি। দুটো মাত্র ঘর, অনেক জায়গায় চুন-বালি খসে পড়েছে।

ওর মাকে দেখে আমার লক্ষ্মী প্রতিমার কথা মনে হয়েছিল। ফর্সা গায়ের রং, টানা টানা চোখ, মমতায় মাখানো মুখ। আমি হেঁট হয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। তিনি আমার থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। অরুর মুখে তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তোমার মন অনেক বড়।

ওঁর কথা শুনে আমার খুব লজ্জা হয়েছিল।

তিনি সেদিন আমাদের দু'জনকে সামনে বসিয়ে পেট ভরে পিঠে খাইয়েছিলেন।

আমি বাড়ি থেকে একটু বেশি করেই টিফিন আনছিলাম। আমার মা ভাবছিলেন আমার খিদে বেড়েছে তাই খুশি হয়েই টিফিনের বাক্স ভরে খাবার দিচ্ছিলেন।

আমি কিন্তু মাকে অরুণের সম্বন্ধে কিছু বলিনি। আমার বাবা ওখানকার মুন্সেফ, সবাই খাতির করে, মহিলা মহলে মা'র একটা মর্যাদা আছে। এক গরীব মায়ের ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, তার সঙ্গে ভাগ করে টিফিন খাওয়া, মা কি চোখে দেখবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আজ এতদিন পরে এই কাহিনী লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, হয়তো আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না।

অরুণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল। আগেই বলেছি, ও ছিল ক্লাশের ফার্স্ট বয়। আমি পড়াশুনায় খারাপ ছিলাম না, তবে ওর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি। তার জন্য আমার কোনো হিংসা ছিল না, বরং গর্বই হতো ও আমার বন্ধু বলে।

দু'বছর কেটে গেল। ক্লাশ টেন-এ উঠলাম আর ঠিক তখুনি আমার বাবা বদলি হলেন। এবার অনেক দূরে, পুব বাংলার এক মহকুমা শহরে। তখন ভারতবর্ষ একটা দেশই ছিল।

ওখান থেকে চলে যাবার আগে আমরা দু'জন নীরবে চোখের জল ফেলেছিলাম। ভবিষ্যতে যে আমাদের আবার দেখা হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আমি টায় টায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম, তবে প্রথম দশজনের মধ্যে অরুণ রায়চৌধুরীর নাম ছিল।

আমি কলকাতায় কলেজে ভর্তি হলাম। অরুণের কথা আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দেশ ভাগ হয়েছে। ভিটেমাটি হারিয়ে বন্যার স্রোতের মতো সর্বস্বান্ত মানুষ ওপার বাংলা থেকে আশ্রয়ের খোঁজে চলে এসেছে এপার বাংলায়। সে এক অসহনীয় অবস্থা।

আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগে কাজ করি। আমার পদের একটা গালভরা নাম ছিল। সেবার আমাকে একটা আলোচনার জন্য দিল্লি যেতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন পার্কে আমার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল জায়গাটা। ঠিক যেন এক ছোটখাটো কলকাতা। সব বাঙালির বাড়ি। এমনকি মিষ্টির দোকান, মুদির দোকান, মনোহারি দোকানও বাঙালির।

আমি সেদিন গিয়েছিলাম ওখানকার দু'নম্বর বাজারে। বিকেলে মাছ আসে, তাই মাছ কিনতে হলে বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় ওখানকার বাসিন্দারা বাজারে যান। একটা মাছের দোকানের সামনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা আকর্ষণে আমি পাশ ফিরে তাকালাম। আমারই বয়সী এক ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করছেন, তাঁর কপালে ভাঁজ, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন। আমারও

মনে হলো যেন খুব চেনা মুখ। তারপরই নজরে পড়ল বাঁ চোখের পাশে একটা আঁচিলের ওপর।

অরুণ না! আমি বলে উঠলাম।

সুবোধ! ভদ্রলোকের চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল, তারপরই আমাকে জড়িয়ে ধরল অরুণ।

দু'জনেরই মাছ কেনা মাথায় উঠল। অরুণ আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। আমি কবে দিল্লি এসেছি, কোথায় উঠেছি, এসব প্রশ্নের জবাব দেবার পর ওর কথা জিগ্যেস করলাম। ও এখানে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে। ও না বললেও ওর বেশভূষা দেখে আমার বুঝতে কষ্ট হলো না ও বেশ উঁচু পদেই আছে। পড়াশুনায় ও বরাবরই ভাল ছিল।

অরুণ আমাকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। বাজারের খুব কাছেই ওর ফ্ল্যাট। পুব বাংলার মানুষদের জন্য দিল্লির উপকণ্ঠে এই আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন দিল্লিতে প্রচুর বাঙালিকে তিনি চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের নিয়েই পত্তন হয়েছিল এই আবাসন প্রকল্প। অরুণ যে ফ্ল্যাটে থাকে সেই বাড়ির মালিক সরবরাহ বিভাগে চাকরি করতেন, আদি নিবাস ছিল পুব বাংলায়। সেই সুবাদে তিনি এক খণ্ড জমি খুব সস্তায় সরকার থেকে পেয়েছিলেন, তার ওপরেই তুলেছিলেন দোতলা বাড়ি। পরে দোতলার ফ্ল্যাটটা অরুণের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

তিন কামরার ঘর, তার মধ্যে একটা বেশ বড়, সেটাই বড় বড় পর্দা দিয়ে ঘিরে বসবার আর খাবার ঘর করা হয়েছে। বেশ সাজানো-গোছানো, ছিমছাম ফ্ল্যাট। অরুণদের সেই ভাঙাচোরা ছোট্ট বাড়িটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেক কষ্ট করে এখন সুখের মুখ দেখেছে আমার বাল্যবন্ধু। আমার মন আনন্দে ভরে উঠল।

অরুণ আমাকে বসিয়ে ভেতরে চলে গিয়েছিল। তারপরই এক বৃদ্ধাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল ঘরে। এতদিন পরেও কিন্তু আমার চিনতে কষ্ট হলো না। সেই গৌরবর্ণ এখনও অম্লান, লক্ষ্মী

প্রতিমার মতো মুখ, শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে, মুখেও ফুটে উঠেছে বলিরেখা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে প্রণাম করলাম। ওদের পেছন পেছন এক মহিলা আর এগারো-বারো বছরের এক ফুটফুটে ছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চয়ই অরুণের বউ আর ছেলে।

মা একে চিনতে পারছ? অরুণ কৌতুক করে জিগ্যেস করল।

ওর মা'র চোখে মোটা কাচের চশমা। তিনি ভুরু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করলেন, তারপর দু'পাশে ঘাড় নাড়লেন।

সুবোধ! অরুণ হাসতে হাসতে বলল, মনে নেই, সেই যখন ইস্কুলে পড়তাম, আমাকে টিফিন খাওয়াবার জন্য ও নিজে টিফিন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল!

ও! অরুণের মা'র মুখ উদ্ভাসিত হলো, মনে পড়েছে। তারপরই তিনি বললেন, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেছিলাম মরবার আগে একবার যেন তোমার সঙ্গে দেখা হয়। ভগবান আজ আমার সেই প্রার্থনা রাখলেন। তিনি যুক্তকর কপালে ঠেকালেন।

অরুণ এবার তার বউ আর ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ছেলের নাম তাপস। ওখানে এক ইস্কুলে ক্লাশ সেভেন-এ পড়ে।

বউকে লক্ষ্য করে অরুণ বলল, বুঝলে সুমিতা, এ হলো আমার বাল্যবন্ধু। এমন বন্ধু হয় না। আমি টিফিন নিয়ে যেতে পারতাম না। তাই ও নিজের খাবারের ভাগ আমাকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমি রাজী হইনি বলে ও নিজেই টিফিন খাওয়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। এমন বন্ধু অনেক ভাগ্য করলে মেলে।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। অতীতের এক সামান্য ঘটনাকে অরুণ বড় ফাঁপিয়ে তুলেছে।

তাপস এতক্ষণ চুপ করে ওর বাবার কথা শুনছিল, হঠাৎ ও বলে উঠল, বাপি, ঠাম্মা তোমাকে টিফিন দিত না কেন?

অরুণ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, আমরা যে তখন খুব গরীব ছিলাম তাপু, তোমার ঠাম্মা কত কষ্ট করে আমাকে পড়িয়েছেন তা তো জান না।

তাই বুঝি! তাপসের মুখে যেন একটা ছায়া পড়ল, তারপরই ও বলল, আমাদের ক্লাশেও দু'জন পড়ে, ওরা যমজ ভাই। ওরা টিফিন আনে না। টিফিনের সময় আমরা যখন খাই ওরা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। আমিও ওদের সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খাব।

সে তো খুব ভাল কথা, অরুণ বলল, কিন্তু তুমি ওদের দয়া করছ এমন ভাব যদি দেখাও তবে ওদের খারাপ লাগতে পারে। কারও সম্মানে কখনও আঘাত দিতে নেই, সে ছোটই হোক কি বড়ই হোক।

তা কেন! তাপস চটপট জবাব দিল, আমিও এই নতুন কাকুর মতো ওদের বলব আমার সঙ্গে টিফিন ভাগ করে না খেলে আমিও টিফিন খাওয়া ছেড়ে দেব।

ওর কথায় ওরা সবাই হেসে উঠল।

আমার মন চলে গেল কৈশোরের সেই দিনটিতে। সেদিন বালকোচিত আবেগে যা আমি করেছিলাম তা আজ সঞ্চারিত হয়েছে আরেক বালকের মধ্যে। এর চাইতে আনন্দের আর কি হতে পারে!

আমি অরুণের মুখের দিকে তাকালাম। ও বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারল, ওর মুখের হাসিই তা বলে দিচ্ছিল।

ছবিঃ সমীর সরকার
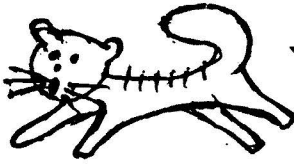
শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

পুজো যে এসে গেল। শুকতারার পুজো সংখ্যা হাতে পাওয়া মানেই তো শুধু আনন্দ-হাসি আর মজা। ওদিকে পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। তার মাঝে চলছে সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া। বিশ্বকর্মা পুজো আসছে যে। ঘুড়ি উড়োতে হবে না? কিন্তু আকাশে যে এখনো মেঘের ঘনঘটা। মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা চলছে তো চলছেই। সেই আকাশেই ঘুড়ির পশরা সাজিয়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা জগৎ-সংসারকে জানিয়ে দেন মায়ের আগমনবার্তা। প্রকৃতিও সেজে ওঠে অপরূপ সাজে। শিউলির সুবাসে চারদিক ম-ম করে। বাগান আলো করে থাকে দোপাটি, টগর, অপরাজিতা, জবা আর নানা রঙের জিনিয়া। সন্ধ্যে হতেই মিষ্টি গন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় হাসনুহানা। বদলে যায় গোটা পরিবেশ। সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে সাজিয়ে, নিজের যা কিছু আছে সব উজাড় করে দিয়ে অপেক্ষা করে মায়ের আগমনের।

তোমরাও তো এখন রেডি। নতুন জামা-প্যান্ট- জুতো কেনা হয়ে গেছে। পুজো সংখ্যা পড়াও প্রায় শেষ। তা কেমন লাগলো শুকতারার পুজো সংখ্যা? জানিও কিন্তু! কার কার লেখা ভালো লেগেছে তা জানাতেও ভুলো না যেন। পুজোর সময় কে কী করলে, ক'টা ঠাকুর দেখলে সব জানাবে। তাহলে তোমাদের আনন্দ, তোমাদের খুশির ভাগ যে দাদুমণিও পেয়ে যাবে। তাই না?

এবার এসো একটা গল্প বলি। আর দু'দিন পরেই তো মা দুর্গা ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে এসে পড়বেন। তারপর আরম্ভ হবে মায়ের পূজা। তাই গল্পটা মা দুর্গা আর তাঁর আদরের ছেলে গণেশকে নিয়ে। গণেশের নাম শুনে তোমরাও নিশ্চয় খুশি। গণেশদাদাকে আমরা যে সবাই বড় ভালোবাসি। তা গণেশদাদা কিন্তু কম দুষ্টু নন! মনের আনন্দে তিনি তাঁর বাহন ইঁদুরের পিঠে চড়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান। তবে মাকে তিনি বড় ভালোবাসেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। যেখানেই যান না কেন ছুটে ছুটে এসে মাকে দেখে যান। একদিন ইঁদুরের পিঠে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো একটা বেড়ালের ওপর। গণেশ ছুটে গিয়ে বেড়ালটাকে ধরে ফেললেন। বেড়াল যত পালাতে চায় গণেশ ততই তাকে মারেন। মার খেতে খেতে বেড়ালটা আধমরা হয়ে পড়লে গণেশ তাকে ছেড়ে দিলেন। আধমরা বেড়ালটা কোনোরকমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে গণেশদাদার মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। সত্যি তো, অনেকক্ষণ মায়ের কাছে যাওয়া হয়নি। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে গণেশ এসে দাঁড়ালেন মায়ের কাছে। তিনি দেখলেন, মা মুখ ভার করে বসে আছেন। তাঁর সারা শরীরে আঘাতের দাগ। একে মায়ের মুখ ভার তার ওপর গায় অতো আঘাতের চিহ্ন। গণেশ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা তোমার মন খারাপ কেন? গায় অত আঘাতের দাগই বা কিসের? কেউ কি তোমায় আঘাত করেছে?

হ্যাঁ!

ক্রোধে জ্বলে উঠলো গণেশের দু'চোখ। বললেন, কে তোমায় আঘাত করেছে? আমি এখনই গিয়ে তাকে শাস্তি দেবো।

তাহলে বাবা, শাস্তিটা যে তোমাকেই দিতে হবে!

সে কী! আমি তো বাইরে ছিলাম। তোমায় আঘাত করলাম আবার কখন? তা ছাড়া আমি তোমায় আঘাত করতে কি পারি?

পার্বতী তখন ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা, তুমি তো জানো না, পুরুষ দেহধারী সব প্রাণীই যেমন শিবের অংশ তেমনি মেয়েজাতের সবার মধ্যেই আছি আমি। তুমি যে ঐ মা-বেড়ালটাকে মেরেছো সেই আঘাত এসে লেগেছে আমার গায়। তাই আমার শরীরে এত আঘাতের চিহ্ন।

মার কথা শুনে দুঃখে মন ভরে গেল গণেশের। মায়ের সামনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে আর কখনো কোনো প্রাণীকে আঘাত করবেন না। অকারণে তো একেবারেই না। মন বদলে গেল গণেশের। হাসি ফুটলো পার্বতী বা মা দুর্গার মুখে।

কেমন লাগলো গল্পটা? তোমরাও গণেশদাদার মতো হতে চেষ্টা করো। প্রতিজ্ঞা করো আর কখনো অকারণে নিরীহ প্রাণীকে—তা সে কুকুর-বেড়াল কিংবা অন্য কিছু হোক—আঘাত করবে না। তাদের অহেতুক মারবে না।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

卐 卐 卐 卐 卐

তোমাদের পাতা

দুর্গাপূজা

নীল আকাশে মেঘের খেলা,
শিউলি ফুলের মেলা,
ঠাকুর দেখে, হেসে খেলে
কাটবে সারা বেলা।
রাত্রিবেলা তারাবাতি জ্বালিয়ে
দেব, দেবই,
সোনার মতো আলোর খেলা
দেখতে যাব, যাবই।
দুর্গাপূজা সবার প্রিয়
আমিও ভালোবাসি
সবচাইতে ভালো লাগে
দুর্গামায়ের হাসি।

মধুবন্তী গুপ্ত,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
পাঠভবন,
শান্তিনিকেতন

সন্দীপ সরকার,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, হাওড়া

পুজোর বাহার

ঢাক ঢোল বাদ্যি বাজে
ঘুরছে সবাই খোশমেজাজে
কিনছে নতুন জামা-জুতো,
নানা মজার নানান ছুতো।

কেউ বা কিনছে হার-চুড়ি-দুল
কিনছে কেউ শুধুই পুতুল
কেউ খাচ্ছে ফুচকা, আইসক্রিম
কেউ বা রোল-চাউমিন।

সাজছে সবাই নতুন সাজে
নতুন পোশাক ভিড়ের মাঝে
চারদিকে সব রঙের বাহার
আকুল করা হৃদয় সবার।

অঙ্কিতা বিশ্বাস,
বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী,
হোলি চাইল্ড গার্লস হাই স্কুল,
কলিকাতা
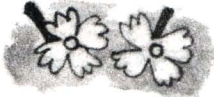
অপরাধ

গাছ কেটো না, গাছ কেটো না,
গাছ কাটা যে পাপ,
গাছ কাটলে আল্লা তোমায়
দেবেন অভিশাপ।
গাছ কাটলে কোথায় পাব
বিশুদ্ধ বাতাস,
কোথায় পাব এমন করে
বুকটি ভরা শ্বাস?
কোথায় যাব কুড়িয়ে নিতে
আঁচল ভরে ফুল
জানি না তো গাইবে কোথায়
ময়না, বুলবুল?
লুকোচুরি খেলব কোথায়
ভরবে কিসে মন
এমন করে শেষ করলে
বিধির দেওয়া ধন?

বাপ্পা দেওঘরিয়া,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
জনার্দন্তী হাই স্কুল,
বৃন্দাবনপুর

প্রিয়া মিত্র, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
শ্রীশ্রী সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়, দঃ বারাসাত, ২৪ পরগনা

আগমনী

দূর হতে ভেসে আসে ঢাকের ধ্বনি
একতারা হাতে নিয়ে কে গায় আগমনী।
অনেক প্রতীক্ষার পর আসে দিনগুলি
দুঃখ কষ্ট বেদনা সব দেয় ভুলি।
পথের ধারে কাশফুল তার মাথাটি দোলায়,
শিউলির গন্ধ নাকে এসে মনকে ভোলায়।
ছোট ছোট ছেলের দল নতুন জামা পরে
ঠাকুর দেখতে সবে পূজামণ্ডপে ঘোরে।
নতুন বসন পরে মা আসবে আবার,
দশভুজা দুর্গা বলে চিনবো আবার।
পূজার গন্ধ ভাসে আকাশে বাতাসে,
শরতের শিশিরকণা পড়ে এসে ঘাসে।

মহারুদ্র চক্রবর্তী,
বয়স তেরো, নবম শ্রেণী,
আড়িয়াদহ কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়,
কলিকাতা

সায়ন দাস, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল, কলকাতা
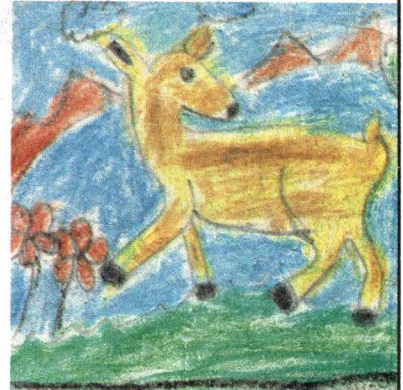
কুমারজিৎ ব্যানার্জী, বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী, উত্তরণ শিশু শিক্ষা নিকেতন, কোলাঘাট, মেদিনীপুর

শরৎ এলো

শরৎ এলো, পুজো এলো
ঝরলো শিশির ঘাসের পরে
উড়িয়ে দিল মনের কালো
চারিদিকে শিউলি ঝরে।

মহালয়া, দুর্গাপুজো
ঢাকে কাঠি পড়লো তাই
কী আনন্দ! কী আনন্দ!
মজায় মাতি ভাই।

সায়ন্তনী সেন,
বয়স নয়, পঞ্চম শ্রেণী,
লেকটাউন গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড
গার্লস হাই স্কুল, কলিকাতা

নীলাদ্রি অধিকারী, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল

বাইরের আলো দেখছে হায়েনা-শাবক সঙ্গে মা।

সেরেঙ্গাটির কমান্ডোরা

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ওদের খুব কাছে না যাওয়াই ভালো সায়েব। ওরা হলো সাক্ষাৎ শয়তানের দোসর। মাঝে মধ্যেই ওরা চলে আসে গ্রামের কবরখানায়। যেখানে সারি সারি শান্তিতে শুয়ে আছে আমাদেরই আত্মীয়-পরিজন, পাড়াপড়শি এবং বন্ধুবান্ধবেরা। ওরা সবাই একদিন ছিল। আজ নেই। চিরঘুমে শুয়ে থাকা ঐসব মানুষদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় গভীর রাতে। বিশেষ করে যারা সদ্য পাড়ি দিয়েছে পরলোকে।

খুব মন দিয়ে গ্রামবাসীটির কথা শুনছিলেন ডাঃ হানস ক্রুক। সুদূর হল্যান্ড থেকে এসে ক'দিন হলো হানস তাঁবু খাটিয়েছেন সেরেঙ্গাটির প্রত্যন্ত জঙ্গলের ভেতর এই গ্রামে। পেশায় পশুচিকিৎসক এই ভদ্রলোকটি শহুরে জীবনের সব আরাম আর বিলাসকে ছেঁড়া পোশাকের মতোই ছুঁড়ে ফেলে এসেছেন শুধু সত্য সন্ধানে। হায়েনা প্রাণীটি কি সত্যই শয়তানের অনুচর? পচাগলা মাংস ছাড়া তারা কি কোনও কিছু ছুঁয়ে দেখে না? হায়েনাকে মানুষ কেনই বা এতো বিষনজরে দেখে?

ডাঃ ক্রুক পেশায় একজন পশু-চিকিৎসক। সরকারী পশু হাসপাতালে চাকরি তাঁর। গৃহপালিত পশু ছাড়া রোগী হিসেবে অন্য কোনও প্রাণীকে তিনি কখনও পাননি। তবে হায়েনা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মাল কেমন করে? ডাঃ ক্রুক নিজেই উত্তর দিয়েছেন সে কথার। শহরে বসে একটি ফিল্ম দেখেছিলেন তিনি। ফিল্মটির নাম ছিল HYNEA, THE ETERNAL ENEMY OF LION। পুরো ছবিটি তোলা হয়েছিল এই সেরেঙ্গাটিতেই। সে ছবির বিষয়বস্তু ছিল পশুরাজ সিংহ বনাম স্পটেড হায়েনার দল। একটি দৃশ্য ছিল যেখানে মহাবলশালী পশুরাজকে একদল স্পটেড হায়েনা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে কি নির্মম ভাবেই না হত্যা করল। অতবড়

সিংহটির অসহায় মৃত্যুর কথা মনে হলে ওঁর শরীর এখনও শিউরে ওঠে। এই ছবিটি দেখার পরই ডাঃ ক্রুকের মনে হয়েছিল, স্পটেড হায়েনার ওপর তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন। প্রাণীটি সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি তাঁকে জানতে হবে। আর সে কারণেই একদিন কাটা হলো প্লেনের টিকিট। যোগাড় হলো ভিসাও। অফিস থেকে স্টাডি লিভ মঞ্জুর হতেই ডাঃ ক্রুকের অস্থায়ী ঠিকানা হলো সেরেঙ্গাটির গহীন অরণ্য। কেননা দুঃসাহসী স্পটেড হায়েনার দেখা পাওয়া যায় শুধুমাত্র এখানেই। পৃথিবীর আর কোনও দেশে নয়।

হায়েনারা দু'ধরনের হয়। স্ট্রাইপড এবং স্পটেড। স্ট্রাইপড হায়েনা দেখা যায় বহু দেশেই। ভারতবর্ষের বহু জঙ্গলে এই প্রাণীটিকে দেখা যাবে। এরা স্বভাবভীতু এবং মানুষজন এড়িয়ে চলে। ছিঁচকে চোরের মতো এদের গতিবিধি এবং হাবভাব। কিন্তু স্পটেড হায়েনারা জাতভাইদের ঠিক উল্টো। এদের ভয়ঙ্কর স্বভাবের প্রমাণ বলতে ঐ ফিল্মটি।

জঙ্গলের তাঁবুতে বসে ক্রুক তাঁর ডায়েরি বারে বারে উল্টেপাল্টে দেখেন। হায়েনা সম্পর্কিত নানা তথ্যে ঠাসা এটি। এতে লেখা হয়েছে, সারা পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বাঘ এবং সিংহকে। অমিত বিক্রম এবং শিকার কৌশলের জন্যই তাদের এই জনপ্রিয়তা। অন্যদিকে অপছন্দের তালিকায় এক নম্বরেই রয়েছে হায়েনার নাম। কেন মানুষের এত বিরাগ এই প্রাণীটির প্রতি? হ্যাঁ, সে তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে ঐ মূল্যবান ডায়েরিতে। প্রাণীটির কুৎসিত চেহারা মানুষের মোটেই পছন্দ নয়। চেহারা, গায়ের রঙ, স্বভাব এমন কী চলাফেরা—সবকিছুই এই প্রাণীটির একটু কিম্ভূত। তার ওপর যোগ হয়েছে হায়েনাকে নিয়ে অরণ্যবাসীদের নানা ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার। যা কিনা ছাপা হয়েছে বহু বইপত্রে এবং তা ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে।

বেশ কয়েকদিন হায়েনাদের (বারে বারে স্পটেড হায়েনা না বলে এখন থেকে আমরা শুধু হায়েনা বলব) পেছু নিয়ে ওদের চেহারা সম্পর্কে একটি চমৎকার তথ্য দিলেন তিনি। সায়েব বললেন, প্রকৃতির কোনও কাজেই অযত্ন কিংবা হেলাফেলার চিহ্ন নেই। বরং প্রতিটি কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে অতি চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ। কেন হায়েনার লোম এত ঘন এবং চামড়া এত অমসৃণ? ক্রুক বললেন উচ্ছিষ্ট বা সদ্য শিকার করা কোনও প্রাণীকে খেতে গিয়ে হায়েনা শরীরের অর্ধেকটি ঢুকিয়ে দেয় মৃত পশুটির অভ্যন্তরে। ফলে হায়েনার শরীরে প্রায়ই লাগে রক্ত, মাংস এবং পচা গলা নানা বর্জ্য পদার্থ। শরীর মসৃণ হলে এগুলি তার শরীরে দীর্ঘসময় লেগে থেকে চামড়ায় সংক্রমণ ঘটাতো। কিন্তু অমসৃণ হওয়ার দরুন একবার গা ঝাড়া দিলেই হায়েনার শরীর পরিষ্কার।

এদের মাথা ও মুখ কেন এমন অদ্ভুত? হায়েনার মতো চোয়ালের জোর আর কোনও প্রাণীর নেই। এই জোরের উৎস হলো প্রাণীটির মুখ ও মাথার কয়েকটি শক্তিশালী পেশী। চোয়ালের গড়নও প্রকৃতি এমনভাবে করেছে যাতে মোটা মোটা হাড়ও পাউডারের মতো মিহি হয়ে যায় ওদের দাঁতের পেষণে। আর এসব কারণেই ওদের মুখ ও মাথার আকৃতি এমনটি দেখায়।

হায়েনার হাঁটা এবং দৌড়নোর ভঙ্গিটি দেখলে মনে হয় যেন তার অস্বস্তি হচ্ছে হাঁটতে কিংবা দৌড়তে। কোমরের গড়নটিও পিঠের পর হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে নিচের দিকে। ডাঃ ক্রুক এমন শারীরিক গড়নেরও একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখিয়েছেন। উনি বলেছেন, হায়েনার সামনের পা দুটি পিছনের পা দুটির চেয়ে বেশি শক্তিশালী। পিছনের পা দুটির দৈর্ঘ্যও কিছু কম হওয়ায় ওদের পিঠ থেকে কোমর হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে। আর এর ফলে হায়েনা প্রচণ্ড ভারী কোনও মৃত পশুকে দিব্যি সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। ডাঃ ক্রুক বলছেন চেহারা কিম্ভূতাকার করে প্রকৃতি হায়েনাকে অনেকখানি বাড়তি শক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

কথায় বলে না, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। হায়েনা মানুষের কাছে অপ্রিয় বলেই বোধহয় বেচারীর কপালে জুটেছে নানা মিথ্যা অভিযোগ। যেমন

বাসি মাংসেও আপত্তি নেই।

এদের সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ধারণা এরা শুধুমাত্র সিংহ কিংবা চিতার উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে থাকে। এই ধারণাটির পেছনে রয়েছে অতীতের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ফোটোগ্রাফারের ছবি। জঙ্গলের ছবি তোলার সময় ওঁদের বরাবরের টার্গেট ছিল সিংহ কিংবা চিতার মধ্যাহ্নভোজের দৃশ্য। মস্ত একটি জেব্রা কিংবা ন্যু-এর চারদিকে থাকতো সিংহ কিংবা চিতার দল। আর কিছু দূরেই ধৈর্যভরে অপেক্ষমাণ থাকতো হায়েনারা। এইসব ছবির ক্যাপশানে অবধারিত ভাবেই হায়েনাকে উচ্ছিষ্টভোজী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এইসব ছবি দেখে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা হয়েছিল যে সিংহ কিংবা চিতা শিকার করলে তবেই হায়েনার খাবার জোটে নচেৎ নয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এবং ডিসকভারি চ্যানেলের কল্যাণে অবশ্য এইসব ধারণা এখন অনেকটাই পাল্টেছে।

ডাঃ ক্রুক এই বিষয়টিরও হাতেনাতে প্রমাণ পেতে চেয়েছিলেন। দিনের বেলায় গর্ত ছেড়ে বেরোনোতে হায়েনাদের ঘোর অনীহা। কদাচিৎ বেরোলে তখন অবশ্য তাদের উচ্ছিষ্ট কিংবা পচাগলা মাংস খেতেই দেখা যায়। কিন্তু তা পরিমাণে এতই কম যে তাতে ওদের পেট ভরার কথা নয়। ক্রুক ভাবলেন এবার থেকে তাহলে রাতের অন্ধকারেই ওদের অনুসরণ করবেন তিনি।

এক রাতে সায়েব লুকিয়ে রইলেন গ্রামের কবরখানার ভেতর। কারণ অবশ্য ছিল একটি। তিনি দেখে গিয়েছিলেন ঐ দিনই বিকেলে এক গ্রামবাসীকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে। নতুন কবরটির দিকে চোখ রেখে ডাঃ ক্রুক বসেছিলেন একটি গাছের ডালে।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যে ভালো করে হতে না হতেই মস্ত থালার মতো চাঁদটা উঠে পড়ল পুব আকাশে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার ভোল্টেজ যেমন বাড়ছিল তেমনই বাড়ছিল ঝিঁঝির ডাক। ভেসে আসছিল আরও অজস্র শব্দ। কোনওটা শুকনো পাতা খসার, কোনওটা পাতা মাড়িয়ে চলে যাওয়া কোনও শ্বাপদের। ডাকছিল কাছে-দূরে সিংহের দল, মাথার ওপরে রাতচরা পাখিরাও। ক্রুক সবই শুনছিলেন কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নতুন গোর দেওয়া জায়গাটির ওপর। তবে কি গ্রামবাসীদের ধারণা ভুল? হায়েনারা কবরখানায় এসে মৃতদেহ কবর থেকে তুলে আনে না? তাদের প্রতি গ্রামবাসীদের ঐ অভিযোগ কি পুরোটাই মনগড়া?

শেষরাতে চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখনই ক্রুক সচকিত হয়ে উঠলেন। ওরা অবশেষে আসছে। আবছা আলোয় ওদের সংখ্যাটি গুনে নেওয়া গেল। আটটি হায়না নিঃশব্দে দৌড়ে আসছে একেবারে কম্যান্ডো স্টাইলে।

শিকারের খোঁজে নয় জল খেতে।

ওদের যেন জানাই ছিল সদ্যমৃত ব্যক্তিটি কোথায় শুয়ে আছে। কুকুরের মতো শুঁকতে শুঁকতে ওরা ঠিক পৌঁছে গেল জায়গা মতো। তারপর অতি দ্রুত খুঁড়তে লাগল নরম মাটি, সকলে মিলে। অচিরে বেরিয়ে এলো হতভাগ্য মানুষটি। মহা আনন্দে ভোজ শুরু হলো তখনই। ক্রুকের কানে আসছিল অবিরল মটমট হাড় ভাঙার শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতে মন তাঁর ব্যথায় ভরে উঠছিল। গ্রামবাসীদের কথাই তাহলে সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। তবে কি এইভাবে মানুষের মৃতদেহ খেয়েই ওদের জীবনধারণ? কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়? মানুষ তো আর রোজ মরছে না জঙ্গলে।

অবশেষে হায়েনাদের বিষ্ঠা পরীক্ষা করা হলো। ক্রুক ভেবেছিলেন, ওদের ভোজ্য তালিকার সঠিক হদিস পাওয়ার ঐ একমাত্র উপায়। যেহেতু পশুর লোম হজম হয় না, সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় বেরিয়ে আসবে এবং সেগুলি পরীক্ষা করলেই জানা যাবে লোকচক্ষুর অগোচরে ওরা কি খেয়ে জীবনধারণ করে।

সেরেঙ্গাটির বেশ কয়েকটি অঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ হলো। ১৮৮টি নমুনার মধ্যে শতকরা ছিয়াশি ভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া গেল থমসন গ্যাজেলের লোম। বাকি অংশটুকুতে ছিল জেব্রা এবং ন্যু বা ওয়াইল্ড বীস্ট। বোঝা গেল রাতের অন্ধকারেই ওরা দিব্যি পেট ভরানো খাবার যোগাড় করে নেয়। পরীক্ষার ফল মনোমতো হওয়াতে সায়েব পৌঁছে গেলেন গবেষণার পরবর্তী ধাপে। এবার তাঁর সঙ্গী হলো একটি নাইট ভিশন বায়নাকুলার। রাতের পর রাত জেগে উনি প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন হায়েনাদের রুদ্ধশ্বাস শিকার পদ্ধতি। সেই সঙ্গে ভরে উঠতে থাকল ওঁর গবেষণার ডায়েরিটি।

রাতের অন্ধকারে হায়েনাদের দৃষ্টিশক্তি আরও জোরদার হয়ে ওঠে। ওদিকে তৃণভোজী প্রাণীরা আবার গভীর অন্ধকারে ততটা ভালো দেখে না। এর ফলে শিকার ধরতে খুব সুবিধে হয় হায়েনার। এগারোটি শিকার দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন ক্রুক। তার মধ্যে আটটিতেই হায়েনারা বিজয়ী হয়েছে। খুব সহজেই নাগালে চলে

এসেছে শিকার। দিনের আলোয় কিন্তু এতটা সুবিধে হায়েনারা কখনওই পেতো না। এর মূল কারণ গতিবেগ। অন্ধকারে হায়েনারা দৌড়তে পারে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ মাইল বেগে। কিন্তু তাদের শিকারের গতিবেগ মেরেকেটে ঘণ্টায় ২০ মাইলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বড় নৃশংস হায়েনাদের হত্যাপদ্ধতি। বাঘ যেমন তার প্রবল শক্তির সাহায্যে শিকারকে চিৎপাত করে তার কণ্ঠনালি ছিন্ন করে দেয় ধারালো দাঁতের সাহায্যে তেমন শক্তি বা দাঁত হায়েনার নেই। ফলে এরা একান্তভাবে চোয়ালের শক্তির ওপর নির্ভর করে। এক এক কামড়ে ওরা ছিঁড়ে নিতে থাকে শিকারের মাংস। অজস্র ধারায় রক্তপাত হতে হতে প্রাণীটি এক সময় দুর্বল হয়ে ভূমিশয্যা নিতেই হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবটিকে হত্যা করে। ডাঃ ক্রুক লিখছেন, শিকারটি আকারে যত বড় হবে ততই দেরিতে আসবে তার মৃত্যু। এবং সহ্য করতে হবে অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা।

গভীর জঙ্গলে হায়েনা নিয়ে গবেষণা করার সময় ডাক্তার ভদ্রলোকটির চোখে পড়েছিল একটি দুর্লভ দৃশ্য। অবশ্যই নাইট ভিশন বায়নাকুলারের সাহায্যে। এক রাতে জঙ্গলের কমান্ডো বাহিনী চোখের নিমেষে ঘিরে ফেলল একটি জেব্রাকে। বড় বৃত্তটিকে ক্রমশ ছোট করতে করতে হঠাৎই একটি হায়েনা পেছন থেকে খুবলে নিলো জেব্রাটির এক দলা মাংস। এরপর চারদিক থেকে শুরু হলো আক্রমণ। এক একটি হায়েনা হতভাগ্য জেব্রাটির শরীর থেকে খুবলে নিতে থাকল কেজি কেজি মাংসের দলা। বেশ খানিকক্ষণ পর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জেব্রাটি উল্টে পড়ল।

হায়েনার দল সবে আয়েশ করে খাওয়া শুরু করতে যাবে এমন সময় হুঙ্কার করতে করতে সেখানে হাজির হলো একটি অতিকায় সিংহ। পশুরাজ দু'চারবার গর্জন করে বুঝিয়ে দিলেন ঐ জেব্রাটিকে নজরানা হিসেবে তাঁর চাই। অন্যসময় হলে হায়েনার দল লড়ে যেতো। কিন্তু সেদিন কি হলো কে জানে তারা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল পশুরাজের
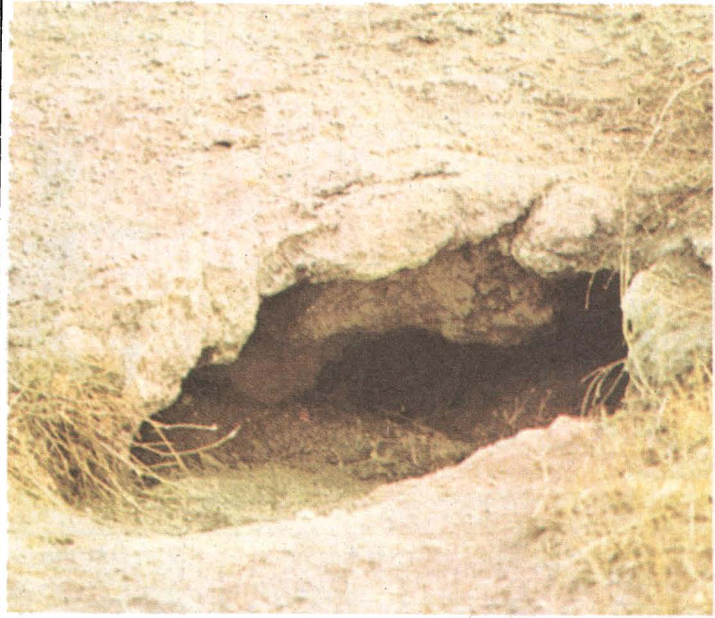
হায়েনার ঘর-বাড়ি।

প্রসাদ পাওয়ার আশায়। দু'চার মিনিটের মধ্যেই তারা মত বদলাল অবশ্য। ক্ষিপ্ত হয়ে পশুরাজকে ঘিরে ফেলার উদ্যোগ নিচ্ছিল তারা। ততক্ষণে সেখানে হাজির হয়েছে একটি সিংহী। হায়েনাদের যূথপতি তাকে আক্রমণ করতেই মুষ্টিযোদ্ধার স্টাইলে থাবা চালাল সিংহী। এক ঘায়েতেই প্রাণ গেল যূথপতির। এরপর হায়েনার দল আরও তীব্র করল আক্রমণ। তখন আর জেব্রার দখল নয়, তাদের টার্গেট তখন সিংহ দম্পতি। লড়াইটা যখন বেশ জোরদার হতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় ভীমবেগে দৌড়ে এলো আরও একটি সিংহ। শক্তির তারতম্য বুঝে নিয়ে হায়েনার দল অনিচ্ছাসত্ত্বেও রণে ভঙ্গ দিল তাদের সাধের নৈশভোজ ফেলে রেখে।

সিংহ তিনটি যখন মনের আনন্দে খাওয়া শুরু করেছে, ডাঃ ক্রুক ভাবলেন, তাহলে কী পরিশ্রম লাঘব করতে সিংহরাও এমন উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে? আবার শুরু হলো পর্যবেক্ষণ। উনি লক্ষ্য করেছিলেন, শিকার শেষ করেই হায়েনারা একটি বিশেষ ডাক দেয়। ক্রুক ঐ শব্দটিকে টেপ করে রাখলেন। পরে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে গিয়ে ঐ টেপ বাজাতেই একটু পরে বেরিয়ে এলো সেই সিংহটি। এবং প্রবল বিস্ময়ে সে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল হায়েনা কিংবা তাদের করা শিকারটিকে।

হায়েনাদের সংসার-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে দিয়েছেন হায়েনা-প্রেমী মানুষটি। যেমন হায়েনারা থাকে দল বেঁধে। এক একটি দলে দশ থেকে চল্লিশটি করে হায়েনা থাকতে পারে। অন্য কোনও প্রাণীর পরিত্যক্ত গর্তে ওরা বাসা বানায়। বাসা না বলে কমান্ডো বাহিনীর হেড কোয়ার্টার বললেই বোধহয় ভালো শোনায়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে হায়েনাই সংখ্যায় বেশি। উচ্চতায় এরা আড়াই থেকে তিন ফুট। ওজন পঞ্চান্ন থেকে পঁচাশি কেজির মধ্যে হয়ে থাকে। মা হায়েনা এক থেকে তিনটি পর্যন্ত শাবকের জন্ম দেয়। জঙ্গলে ওদের আয়ু হলো পঁচিশ বছর।

আফ্রিকার স্পটেড হায়েনারা অত্যন্ত বুদ্ধিধর। যে কোনও সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত নিতে এরা খুবই পটু। নিজেদের সীমানা চিহ্নিত করে রাখে মূত্রের সাহায্যে। অরণ্যের যে কোনও পরিবেশে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও আছে এদের। ডাঃ ক্রুক জানিয়েছেন আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য। নিজেদের রাজত্বে নিজেদের তৈরি আইন কখনওই ভাঙে না সেরেঙ্গাটির কমান্ডোরা। আর সে কারণেই ওরা অকুতোভয়। ভয়ঙ্কর সিংহের সামনে দাঁড়াতেও এদের বুক কাঁপে না।

বাহাদুর বেড়াল

এটা শুধু লক্ষ্য করো।

এই শটগুলো কেমন মনে হচ্ছে? প্রতিবারেই একটা করে গোল!

হ্যাঁ, মোহনবেঙ্গল আমাকে ওদের সেন্টার ফরওয়ার্ড করতে চায়!

এই যে, বাহাদুর! এইটা কেমন—

—শট হয়েছে বলোতো?

পায়ের নয় আমার হাতের বরফের বলের শট কেমন ঝট করে তোমার মুখে গিয়ে লাগলো!
ওঃ, তাই বুঝি?

ওয়াঁফ্স্!

হাঃ হাঃ! আমার হাতের নয়, চামড়ার বলে পায়ের শট কেমন ফট করে তোর মতো দামড়ার মুখে, কেমন লাগছে বলতো ?
গররর!

ভালোই হলো। পাজীটা মোহনবেঙ্গলের ক্যাপটেন জানতে পেরে আমিও ওদিক ছেড়ে সোজা ইস্টবাগানে সই করে এলাম, হেঃ হেঃ!

নাগদেবতার আবাসস্থল

তপন কুমার দাস

বুড়োকেদারের মন্দির।
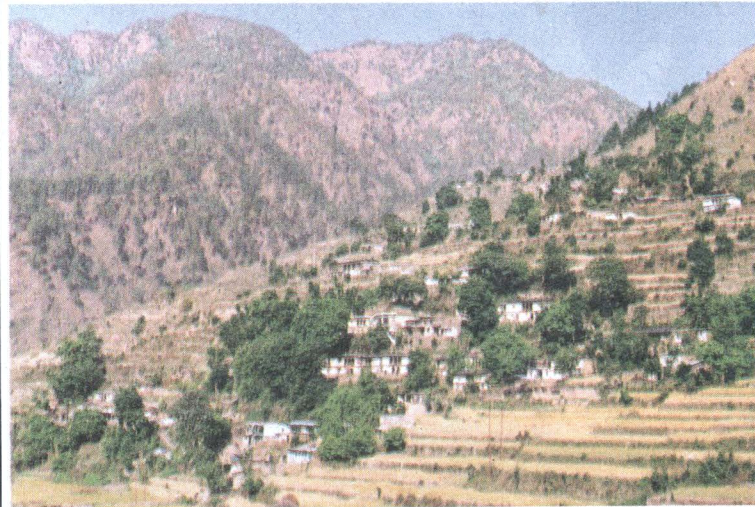
বুঁঢাকেদারের গ্রাম।

২৬-৪-২০০০

রাত ৮টা ১৫। ছুটে চলেছে দুন এক্সপ্রেস। গন্তব্যস্থল হৃষিকেশ। সঙ্গী আমরা পাঁচজন। এর মধ্যে নতুন সঙ্গী শ্রীমান পিকু। আমার ছোট পুত্র। দিনকয়েক আগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সেও বায়না ধরে আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে যাবে। বাকি তিনজনের সঙ্গে বহুবার ঘুরে বেরিয়েছি হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে। সেই দীপকদা, কেশবদা ও সোনা।

ট্রেন লেট থাকায় ২৮ তারিখে বেলা ১১টা ৩০-এ পৌঁছলাম হরিদ্বারে। এখান থেকে আবার গাড়ি বদল করে বেলা ৩টে ৪৫-এ হৃষিকেশ। উঠলাম কালী কমলী ধরমশালায়। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ-এর দূরত্ব ২২ কি.মি.। তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা। নিচে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। গঙ্গার ওপর দিয়ে ঝুলন্ত সেতু, লছমনঝুলা। কিছুদূরে তৈরি হয়েছে আরেকটি সেতু—রামঝুলা।

সামান্য বিশ্রামের পর পিকু ও সোনাকে নিয়ে অটোতে চেপে পৌঁছলাম লছমনঝুলা। ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে এলাম অপর পারে। দু'খানি মন্দির। ৭টা বেজে যাওয়ায় মন্দিরের প্রবেশদ্বার বন্ধ। অগত্যা হাঁটতে হাঁটতে চললাম রামঝুলার দিকে। আজ থেকে প্রায় ২৭ বছর আগে সস্ত্রীক প্রথম হৃষিকেশ এসেছি। সেই সময়ে এপারে ছিল না কোনও গাড়ি বা

দোকানপাট। লছমনঝুলা থেকে এখনকার রামঝুলার দিকে সাধুসন্তদের ছিল ছোট ছোট আখড়া। কেউ থাকতেন কাঁটার ওপর শুয়ে আবার কাউকে দেখেছি কয়েক ফুট গর্ত করে তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ধ্যান করছেন। গাছে গাছে বাঁদরের উৎপাত। এখন গড়ে উঠেছে বহু দোকানপাট। লছমনঝুলা থেকে রামঝুলা পর্যন্ত চলছে জিপগাড়ি। ভাড়া জনা প্রতি চার টাকা। সেই সময় তৈরি হয়নি রামঝুলা। হৃষিকেশ ফিরে চললাম ত্রিবেণী ঘাট দর্শনে। আগের থেকে আরো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ঘাটটিকে।

২৯-৪-২০০০

সকাল ৯টায় বাসস্ট্যান্ড থেকে বুড়াকেদার (বৃদ্ধকেদার)-এর বাসে চড়ে শুরু হলো যাত্রা। বেলা ১২টা ৩০-এ বাস দাঁড়াল টেহ্‌রীতে। দুপুরের আহার সেরে আবার যাত্রা। ঘনশালী হয়ে বৃদ্ধকেদার পৌঁছলাম বেলা ৫টা ২০ মিনিটে। চারিদিকে বিরাট বিরাট উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল। পাহাড়ের ধাপে ধাপে গমের চাষ। বাঁদিকে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে বালগঙ্গা নদী। লোহার পুল পার হয়ে এলাম নদীর অপর পারে। পাহাড়ের আরেকটি ঢাল থেকে বয়ে আসছে ধরমগঙ্গা। কিছু দূরেই দুই গঙ্গার সঙ্গম। সুন্দর পরিবেশ। থাকবার জন্য রয়েছে দু'খানা লজ। আমরা রাজেশ্বরী লজে এসে উঠলাম। বিছানা নিলে ঘর ভাড়া একশ টাকা, নচেৎ পঞ্চাশ। খাবার জন্য দু'খানা হোটেল আছে। নেগী ভোজনালয় ও হোটেল কৈলাস গেট। নেগী ভোজনালয়ে নিরামিষ খাবার। তবে চাইলে ডিমের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। বৃদ্ধকেদারের উচ্চতা ১৫২৪ মিটার। এখান থেকে হৃষিকেশ যাওয়ার একমাত্র বাসটি ছাড়ে সকাল ৭টায়।

৩০-৪-২০০০

সকালে চললাম বৃদ্ধকেদারের মন্দির দর্শনে। এই মন্দিরকে কেদারনাথের সমসাময়িক বলা হয়ে থাকে। মন্দিরে রয়েছে ভগবতী মূর্তি ও কেদারনাথের গ্র্যানাইট শিলাখণ্ড। আমাদের দেখে এক সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন। উনি আমাদের মন্দিরের ইতিবৃত্তান্ত শোনালেন। বললেন, কেউ বলে এই মন্দির শিবের আবার কেউ বা বলে পাণ্ডবদের কীর্তি। বদ্রীনাথের পথে এখানে এসে পাণ্ডবেরা বৃদ্ধ কৈলাসপতির এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ডিসেম্বর মাসে গুরু কৈলাপীড়-এর বড় মেলা হয়। জুন-জুলাই মাসে গ্রামের শক্ত-সমর্থ লোকজনেরা দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গল পথে ১৯ কি.মি. অতিক্রম করে যায় মাসারতালে। তাল অর্থাৎ সরোবর। এই অঞ্চলের সকলের কাছে মাসারতাল একটি পবিত্র স্থান।

আমাদেরও গন্তব্যস্থল ঐ মাসারতাল। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে মালবাহক নিয়ে। স্থানীয় কোনও লোকজনই মাল নিয়ে যেতে রাজী হয় না। বরং পরামর্শ দেয় খচ্চর নিয়ে যাওয়ার। এদিকে আবার দীপকদা খচ্চরের পিঠে মাল চাপাতে নারাজ। শেষে পোর্টার না পাওয়াতে সেই খচ্চর নেওয়াই সাব্যস্ত হলো। স্থানীয় এক মিষ্টিওয়ালার মাধ্যমে মহিন্দর সিং নামের এক খচ্চরওয়ালাকে ঠিক করা হলো। ওপরের জঙ্গলের পথের সবই ওর নখদর্পণে। মোট তিনদিনের জন্য ঠিক হলো এগারোশ' টাকা।

১-৫-২০০০

সকাল ৮টা ৪৫। দু'টি খচ্চরের পিঠে তাঁবু, প্রয়োজনীয় রেশন ও অন্যান্য জিনিসপত্র. চাপিয়ে শুরু হলো যাত্রা। আজকের গন্তব্যস্থল ফুরাতাল। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি পাহাড়ী পথ ধরে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলাম, আমাদের খচ্চরওয়ালাটির এই পথে পূর্বে যাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। পড়লাম বিপদে। কয়েকজন বয়স্ক লোক চলেছেন বৃদ্ধকেদার। তাঁরা ফুরা যাওয়ার দুটি পথের হদিস জানালেন। একটি তিত্রোনা গ্রামের মধ্যে দিয়ে, অপরটি জঙ্গল পথ। গ্রামের ভিতর দিয়ে খাড়া চড়াই পথে খচ্চর চলা অসম্ভব। সুতরাং ভগবানের নাম স্মরণ করে জঙ্গলের পথ ধরলাম। চড়াই পথ, চারপাশে বড় বড় পাইন ও ওক গাছ। জঙ্গল আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে। একটি জায়গায় এসে সকলেই থমকে দাঁড়ালাম। ডানদিকে ছোট আলপথ নেমে গিয়েছে নিচে। সকলেই বসে পড়েছে। মহিন্দর ধারে কাছে নেই। পথের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে চলেছে। আস্তে আস্তে সকলেই মহিন্দরের উপর হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। কিছুটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম—যদি কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। দূরে নজরে এল এক মহিলা গাছের ডালে বসে পাতা কাটছে। ফুরাতালের পথ কোনদিকে জানতে চাইলাম। ও যা বলল তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে আমার পিছু পিছু মহিন্দরও হাজির। দেখা গেল আরো দুই মহিলা বড় বড় দুটি পাতার বোঝা নিয়ে হাজির। মহিন্দর মারফৎ এদের থেকে ফুরা যাওয়ার কোনও রাস্তার বিবরণ জানতে পারলাম না। তারা পাতার বোঝা মাথায় চাপিয়ে উৎরাই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দু'জন এগিয়ে গেলাম আরো বেশ কিছুটা। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ নজরে এল ছোট্ট একটা ঝুপড়ি। অবাক বিস্ময়ে এগিয়ে গেলাম ঝুপড়ির দিকে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। হিন্দি বোঝে। আমাদের দুর্দশার কথা শুনে পথ দেখাতে সঙ্গ নিল। জঙ্গলে মহিষ চরাতে এসে ঐ ঝুপড়িতে থাকে। সমানে চড়াই। প্রায় আধঘণ্টা ওঠার পর এক জায়গায় এসে থামলাম সকলে। বৃদ্ধা সামনে ফুরার পথ দেখিয়ে ফিরে গেল নিজের ডেরায়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সকলেরই জলের বোতল খালি। আস্তে আস্তে হেঁটে বেলা তিনটেয় পৌঁছলাম ফুরা গ্রামে।

আজ এখানেই রাত্রিবাস। তাঁবু ফেলার জায়গা বাছতে সকলেই ব্যস্ত। অথচ খাবার জলের খোঁজ নেই। এক গ্রামবুড়ো গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি বড় চৌবাচ্চা দেখাল তাতে জলের স্তর খুব নিচে। এর কাছেই তাঁবু ফেলা হলো। পাশে জঙ্গল। নিচে রডোডেনড্রনের গাছ। সকলেই ক্ষুধার্ত। এদিকে স্টোভ বিকল। অগত্যা গাছের ডাল এনে জড়ো করল মহিন্দর। পাথর দিয়ে তৈরি হলো উনুন। রাত ১১টায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবুতে ঢুকলাম।

শারদীয়া—শু-১৬

২-৫-২০০০

সকাল ৮টা ৩০। মালপত্র গুছিয়ে সকলেই তৈরি। যাত্রার আগে এক যুবক বলে দেয় মাসারতালের সঠিক নিশানা। আমরাও এগোই। জঙ্গল ক্রমশ গভীর হতে থাকে। উচ্চতাও বাড়ে। সম্পূর্ণ চড়াই পথ। খুব সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছি। রডোডেনড্রনের শুকনো পাতা বিছিয়ে আছে পথে। পাতায় মচ মচ আওয়াজ তুলে চলেছি। মাঝে-মধ্যে শুকনো পাতায় পা স্লিপ করছে। আকাশ মেঘলা। কানে ভেসে আসছে নানারকম পাখির মিষ্টি শিস। পিকু ঐ সুর নকল করে আওয়াজ তোলে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার ভেসে আসে শিস। মনে হতে লাগল ওরা সকলেই যেন আমাদের সঙ্গী হয়ে চলেছে। একটা ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত যে জোঁকের উপদ্রব নেই। তবে শুনেছি জুন-জুলাই মাসে বর্ষা নামলে এই পথে প্রচুর জোঁক থাকে।

একসময় পিকু চেঁচিয়ে ওঠে, বাবা, ঐ দেখ বরফ—বরফ। দূরে মেঘ সরে গিয়ে দেখা দিয়েছে বরফাবৃত একটি পর্বতশৃঙ্গ। তাই দেখে পিকুর সেকি আনন্দ উচ্ছ্বাস! যত উপরে উঠছি নজরে আসছে গাছে গাছে ফুলে ভরা রডোডেনড্রন। লাল, গোলাপি।

চড়াই ভেঙে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে উঠে এলাম এক রীজ থেকে আরেক রীজে। বেশ কিছুটা নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসে ভরা উঁচু-নিচু একটি খেলার মাঠ। নেমে এলাম। ছোট্ট বুগিয়াল। জায়গাটি সত্যিই সুন্দর। কেশবদা বলেন, এখানেই লাঞ্চ ব্রেক করা হোক। কিন্তু জল কোথায়? জলের বোতল সকলেরই খালি। মহিন্দরেরও দেখা নেই, তবে খচ্চর দুটি মাঠে ঘাস খেতে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখা গেল তারা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেশবদা চেঁচিয়ে ওঠেন, গেল-গেল। খচ্চর দুটি মাটিতে পড়ে শরীরটাকে এদিক-ওদিক সমানে মোচড় দিয়ে চলেছে। এক সময়ে সব মাল ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত হলো তারা। দীপকদা রেগে চেঁচিয়ে ওঠেন, গেল, সব কেরোসিন তেল পড়ে গেল।

কেরোসিন তেলের জার সামলাতে ছুটল সোনা। ইতিমধ্যে মূর্তিমান

মহিন্দর-এর দেখা মিলল বেশ উপরে। আরেকজনের সঙ্গে নেমে আসছে নিচে। ওকে দেখেই দীপকদা রেগে আগুন। মহিন্দরের সঙ্গের লোকটি মেষচালক। দীপকদা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাই, এখানে জল মিলেগা? লোকটি ঘাড় কাত করে মহিন্দরকে দূরে একটি ঢালের দিকে ইশারায় দেখায়। জ্যারিকেন হাতে মহিন্দর ছুটল জলের সন্ধানে। প্রায় মিনিট পঁচিশেক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে অর্ধেক জ্যারিকেন জল এনে বলে, আউর নেহি।

আহার-পর্ব সেরে আবার জঙ্গল ধরে ওঠা-নামা করে চলেছি। আমি ও দীপকদা চলেছি ধীরে ধীরে। একসময় সোনার চিৎকার শুনতে পেলাম, তপনদা পৌঁছে গেছি। বেলা ২টো ৩০-এ পৌঁছলাম মাসারতালে। সামনে একটি বিরাট তাল। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জল। এই সরোবরটি একটি সবুজ বুগিয়ালের (পাহাড়ের ওপর চারণক্ষেত্র) মাঝে। বুগিয়ালটির চারিদিকে ঘন জঙ্গল। সবুজ পাহাড়ের ছায়া জলে তিরতির করে কাঁপছে। দূরের কোনো পর্বতশৃঙ্গ নজরে আসছে না। মেঘে ঢাকা। দেখা যাচ্ছে শুধু বেশ কিছু ডোয়ার্ফ রডোডেনড্রন গাছ। দীপকদা বলেন, এই জায়গাটি এগারো থেকে বারো হাজার ফুটের মধ্যেই হবে।

লেকের অপর পারে একটি ছোট মন্দির। পাশেই টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। কিছুটা তফাতে আরেকখানি।

এরই মধ্যে শুকনো নারকেল ভেঙে মন্দিরে পুজো সেরে ফেলেছে মহিন্দর। তাঁবু ফেলা হলো তালের ধারে। চারিদিক নিস্তব্ধ। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। বুগিয়ালটির আরেক ঢালে বড় বড় কয়েকটি গাছের ডালপালা কেটে তৈরি করা কতগুলো ছাউনি। কোনও লোকজন নেই, মনে হয় মহিষ ও ভেড়-বখরীওয়ালাদের অস্থায়ী ছাউনি। মন্দিরের পিছন দিয়ে একটি ছ-ফুটিয়া রাস্তা চলে গিয়েছে সহসত্রতাল। দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার। বর্তমানে ঐ পথ সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। জুলাই মাস ছাড়া ঐ পথে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমাদের দিকে। মেষচালক। তার মুখে শুনলাম এই মন্দিরের পাশেই থাকেন এক সাধুবাবা। তবে তিনি আসেন জুন মাসে। বরফ পড়া শুরু হলেই নিচে নেমে যান। এই সরোবরটি দূর-দূরান্তের মানুষের কাছে অতি পবিত্র স্থান। এদের ধারণা, এখানে নাকি নাগদেবতার বাস। এই দেবতা প্রতি পাঁচ বছরে কোনও এক পূর্ণিমার রাতে নানা রূপে তালের জল থেকে দেখা দেন। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে শিব ও নাগদেবতার মূর্তি। জুন মাসে গঙ্গা-দশহরায় গ্রামের মানুষজন পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে এসে জড়ো হন এই মাসারতালে।

বুগিয়ালের আরেক প্রান্ত থেকে পিকু তারস্বরে আমাকে ডেকে চলেছে। বলি, কি ব্যাপার? ও বলে, দেখবে এসো আরেকটি সুন্দর তাল। দু'খানি অপূর্ব তালের সহাবস্থান এই মাসারতালে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ইতিমধ্যে সকলে জঙ্গল থেকে রান্নার জন্য কাঠ এনে জড়ো করলাম। বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে জোরে বাতাস বইছে। তাঁবু সামলাতে পিকু ও সোনা বড় বড় পাথর এনে তাঁবুর কোণগুলো চেপে দিচ্ছে।

চা-পর্ব শেষ করে রান্নার প্রস্তুতিতে সকলেই ব্যস্ত। হঠাৎ পিকু উঠে দরজার সামনে কান খাড়া করে কোনও কিছু শোনবার চেষ্টা করে। চোখাচোখি হতেই

জানতে চাইল, কিসের ডাক। বলি, হরিণের।

দীপকদা জল আনার জন্য মহিন্দরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে জলের জ্যারিকেন। ও কিন্তু নড়ে না। বলি, যা জলটা নিয়ে আয়। ও ভয়ে কুঁকড়ে আছে। একলা তালের ধারে যাবে না। শের ধরবে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। জন্তুজানোয়ারের আগমন ঘটে রাত্রেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে-মধ্যে হরিণের ডাক ভেসে আসছে। অগত্যা টর্চ হাতে সোনা ও কেশবদাকে সঙ্গে নিয়ে মহিন্দর গেল জল আনতে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাত ১০টা। আকাশ জুড়ে তারা উঠেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই তাঁবুতে ঢুকলাম।

৩-৫-২০০০

তাঁবু গুটিয়ে খচ্চরের পিঠে চাপানো হলো। আজ শুধুই নামার পালা। দু'দিনের পথ যেতে হবে একদিনে। ১৯ কি.মি. রাস্তা। আমি ও সোনা ছাড়া দলের সকলেই এগিয়ে গিয়েছে। কুড়ি-পঁচিশ হাত যাওয়ার পরেই একটি খচ্চর লাফালাফি করে মাল ফেলে দিল। সোনা ও মহিন্দর ধরে বেঁধে ঐ মাল আবার চড়িয়ে দেয় তার পিঠে। কিছুদূর যাওয়ার পরই দু'পা তুলে লাফালাফি করে আবার মাল ফেলে দিল। মহিন্দর বলে, সাব ইসকা গোড়মে চোট আয়া। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাই কিছু মাল কমিয়ে চাপানো হলো অন্য খচ্চরটির পিঠে। খচ্চরটির দড়ি শক্ত করে ধরে হাঁটতে লাগল মহিন্দর। দেখে মনে হচ্ছে মহিন্দরকেই ও টেনে নিয়ে চলেছে। চলা নয় তো, যেন দৌড়চ্ছে। অনেক আগেই ওরা চলে গেছে নজরের বাইরে।

উৎরাই পথে হাঁটু ধরে আসছে। পায়ে টালমাটাল অবস্থা। ফেরার পথে ফুরা এসে ধরলাম তিত্রোনা গ্রামের পথ। একেবারে খাড়া নামা। মনে হচ্ছে কেউ যেন ঠেলে নামিয়ে নিয়ে চলেছে। এই বুঝি পড়ে যাবো। অবসন্ন দেহে ধুঁকতে ধুঁকতে বিকেল ৫টা ৩০-এ পৌঁছলাম বৃদ্ধকেদার।

ছবিঃ লেখক

ছোটবেলার কথা

বীথি চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে যায় সেই পুকুরের ধার, চারধারে তার
আম, জাম, আতা গাছ। পুকুরের জল খুব একটা
বেশি নয়, দেখা যায় কিছু চুনো সরপুঁটি মাছ।
ওপাশে একটা লম্বা ফলসা গাছে গুঁড়ি গুঁড়ি ফল,
অদ্ভুত তার স্বাদ। কোল ঘেঁষে তার বাতাবীলেবুর
সারি, ঠিক তার পাশে আমাদের বাড়ি ছিল।
বাতাস-গন্ধে ভেসে আসে লেবুফুল, চাঁদের আলোয়
ঘুম আড়ি বলে যায়।
বন্ধুরা সব সকাল থেকেই পুকুরের পাড়ে থাকে
সারাদিন ধরে খুনসুটি কাড়াকাড়ি। অথচ রাত্রে
পুকুরের ধার ছমছমে মনে হয়।

আমার দু'চোখ শুধুই এখন অন্য পৃথিবী দেখে,
চোখ বুজে এলে স্বপ্নের মতো সেই পুকুরটা ডাকে।
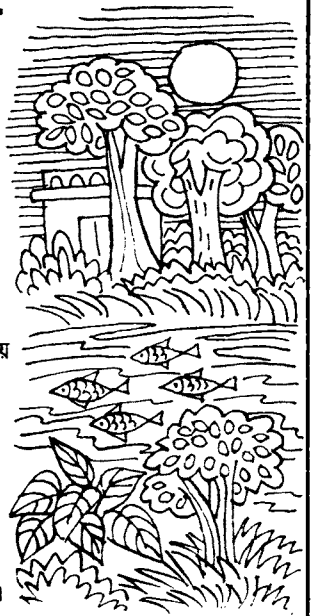
চতুরঙ্গ

শৈলেন্দ্র হালদার

১.
চাই চাই কর খালি
আনো দেখি নজরেঃ
দুই জোড়া জুতো পরে
হাঁটে কেউ সজোরে!

২.
আগুন লেগেছে পাহাড়ের গায়
আগুন লেগেছে তুষারে,
সৃষ্টির বেগে নদীগুলি তাই
প্রণাম করিল ঊষারে!

৩.
সু-এ সু-এ ভালো হয় জানি
কিন্তু যাবে কি শুয়ে থাকা?
Shoe-এর তলাতে একটি পেরেক
বিবেকের মতো ঢাকা!

৪.
সবুজের মুখে যত মাখো কালি
মানব না ভাই মানব না,
মাথা থেকে মাছ পচা শুরু হয়
তর্কে কেন এ আনব না?

ছড়াটায় কি যে মজা!

সলিল মিত্র

শুয়ে বসে হেসে খেলে
ছড়া লিখে নিত্য
গড়াগড়ি খায় দেখি—
বোসেদের চিত্ত!

অন্তে-র মিল খুঁজে
ভিমরুল-এ 'হুল' দেয়
ছড়াতে তো মজা চাই,
তাতে কিছু গুল দেয়!

গড়াগড়ি খাচ্ছে কে
ছড়া পড়ে? ভজা না?
ছড়াটায় কি যে আছে
এখনো তা অজানা!

ভিমরুলে হুল বুঝি
পুট্ করে বসালো?
নাকি, সেই ছড়াখানা
ছিল বড়ো রসালো?

ছবিঃ সুফি

মানিক

অশোক সিংহ

ভিকি আর রোহনের জন্য ঘরে থাকা কঠিন হয়ে গেছে। ভিকি ফাইভে পড়ে আর রোহন ফোরে। সেজদার ছেলে ভিকি ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। দু'জনের আঠারো ঘণ্টা দৌড়ঝাঁপ, কুস্তি, ক্যাচ ক্যাচ খেলা, ছোট বোন রোশনির মিনিটে মিনিটে কান্নার রোল, ওদিকে নেহা-গুড্ডির সতর্ক মেয়েলি খেলা —বেশ বোঝা যাচ্ছিল ছুটির দিন চলছে। বকাঝকাও করা যাচ্ছিল না। বাইরে জায়গা কোথায় যে ওরা খেলবে!

বুদ্ধের নিজের কথা মনে পড়ে। সে বেড়েছে গ্রামে, ছোট শহরে, অফুরন্ত খোলা আকাশের নিচে। গুলতি হাতে মাইলের পর মাইল হেঁটেছে, বিশাল খোলা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছে। গাছের ডালে বসে কাঁচা আম আর পেয়ারা সাবড়েছে। রোহনরা এই আনন্দ পায়নি। খেলুক, সহ্য করতেই হবে।

সহ্য করা গেল না যখন বুদ্ধ দেখল তার নতুন কেনা কম্পিউটারের মাউসটা ভাঙা। দুই শ্রীমানকে ডাকা হলো। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে রোহন বললে, আমি না। ভিকিও সাফ জানিয়ে দিল, কাকু, আমি তো ওটা ছুঁইনি। বাকিদের মধ্যে রোশনি কম্পিউটার রুমে ঢুকতেই ভয় পায় আর নেহা-গুড্ডি এতো শান্ত যে বিশ্বাসই করা যায় না ওদের দ্বারা অপকীর্তিটি ঘটেছে। তবে কে?

তদন্তে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে বুদ্ধ। খেতে বসে ঘোষণা করল, মিথ্যে কথা কিন্তু বলতে নেই।

ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে কথাটাকে আটকে রোহন বললে, মাউস ভাঙলে কাজ করা যাবে না?

বুদ্ধ ফেরে ভিকির দিকে। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভিকি, তুই কম্পিউটার মিউজিক প্লে করতে পারিস?

বাউন্সারটা অনায়াসে কানের পাশ দিয়ে বের করে দিয়ে ভিকি বলল, শেখালেই পারব। কাকু তোমার কম্পিউটারটা একটু ধরতে দেবে? আমরা দু'জনে গেমস খেলব?

আম্পায়ার নো বল ডাকলেন। দুই ব্যাটসম্যানের পাতে আরো দু'টুকরো মাছ পড়ল। তদন্ত আটকে গেল মাঝ রাস্তায়। বুদ্ধের কম্পিউটারের সঙ্গে সবার শত্রুতা। ভিকির কাকীমণি গদগদ গলায় বললেন, বেশ হয়েছে ভেঙেছে, দুপুরে একা এক টকর টকর না করে একটু শুয়ে নিও তো, কাজ দেবে। নাও মাছ খাও আর একটা। তিনি জানেন, ভাল করেই জানেন বুদ্ধ ইলিশ ছাড়া অন্য মাছ পছন্দ করে না। কে ভাঙল তার কম্পিউটার?

কম্পিউটার ভাঙলেও রাতের রুটিন পাল্টায়নি। সবাইকে নিয়ে বসতে হলো, গল্প শোনাবে। ঠাকুরমার ঝুলি শোনায় প্রায় দিনই। ওরা তো সব ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র-ছাত্রী। বাংলা পড়তে জানে না। রোহন প্রথমবার ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনে, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ঠাকুরমার আলমিরাতে দুপুরে চুপি চুপি ঝুলি খুঁজে দেখেছিল, গল্পগুলো কোথা থেকে আসে। বানিয়ে বললে পছন্দ হয় না। গল্পের পাগল সব। লালকমল আর নীলকমলের গল্পে গায়ে কাঁটা দেয়। বুদ্ধু-ভুতুমের গল্পে রোহনের চোখে জল টলটল। গল্প বলতে বলতে বুদ্ধও হারিয়ে যায় চার দশক আগেকার বাবার কোয়ার্টারের পোর্টিকোয়, হ্যারিকেনের আলোতে, আধো ঘুমে আধো জেগে বিনির মুখে গল্প শোনার স্বপ্নে। গল্প শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়াত ওরা দু'ভাই। রাক্ষসের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে অজান্তে তারাও রাক্ষস হয়ে যেতো। লালকমল-নীলকমল তখনও ছিল, বুদ্ধু-ভুতুমও। অফিসের বুড়ো পিওন বিনি, এই গল্প শোনানোর জন্যেই বাড়িতে চলে আসতো অফিসের শেষে। বাবা বলতেন অন্যরকম গল্প, স্পার্টার সৈনিক, দারায়ুস, ট্রয়—বাবার দুনিয়া আলাদা। হারিয়ে যাবার জন্যে আজ বুদ্ধ অন্য গল্প বলবে, নিজের ছোটবেলার গল্প।

আমি তখন সিক্সে পড়ি, সেজদা

এইটে। ধর্মনগরে বাবা তখন মহকুমা শাসক। এস ডি ও বোঝো তো।

জানি, রোহন বলে, কতবার শুনিয়েছ। তোমাদের কোয়ার্টারে এক মাস বাঘের ছানা ছিল, একটা হরিণ ছানাও ছিল। পেছনে পুকুর ছিল।

পাপাও ঐরকম। একশবার শুনিয়েছে, পুকুরে মাছ ধরত আরো কত কি! খালি একই গল্প, ভিকি রোহনকে সাহায্য করে।

শোনো না, আজকে অন্য গল্প বলব। আমরা দু'ভাই এস ডি ওর ছেলে, দাদারা বাইরে থাকে। এস ডি ওর বিরাট দাপট, স্কুলে সবাই চেনে। পাড়ার ক্রিকেট টিমে আমরা সবসময় ক্যাপ্টেন, খেলতে না পারলেও। শহরে সিনেমা হল ছিল ছোট্ট একখানা। আমাদের দু'ভাইয়ের টিকিট লাগত না। ম্যানেজারকে বললেই নিয়ে গিয়ে ব্যালকনিতে বসিয়ে দিত। মনে মনে এ নিয়ে গর্ব ছিল বেশ। বুক ফুলিয়ে হাঁটতাম—এস ডি ওর নন্দন।

রোহন চোখ উল্টিয়ে বলে, আবার আমাকে শেখায়, ডোন্ট বি প্রাউড।

আমার বাবাও তাই বলতেন । পাব্লিক লাইব্রেরিতে নিয়ে গেছলেন নিজে। লাইব্রেরিয়ানকে বলেছিলেন, এদের বই পড়তে শিখিয়ে দিন, যা লাগে দিন। খুব বই পড়তাম। আমাদের ক্লাসে অলক নামে একটি ছেলে ছিল, বনেদী বাড়ির ছেলে। থাকে না, গ্রামে-গঞ্জে, দুর্গামণ্ডপওয়ালা বাড়ি, ওরকম। ওদের বাড়িতে প্রচুর আম গাছ, লিচু আর পেয়ারা গাছ ছিল। যখন খুশি যত খুশি খাওয়ার পরোয়ানা ছিল আমাদের। কেউ আটকাত না। অলক দেখতে সুন্দর, ফর্সা, পড়াশোনায় ভালো। কখনো সে ফার্স্ট হতো, কখনো আমি। মা এই নিয়ে হাসাহাসি করতেন, তোরা কি ইচ্ছে করে পাল্টাপাল্টি করে ফার্স্ট বয় হচ্ছিস নাকি? আমার কখনো খারাপ লাগত না অলক ফার্স্ট হলে। বন্ধু তো।

ঐ সময়ে যুদ্ধ লাগল পাকিস্তানের সঙ্গে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ হয়নি, একটু দাঙ্গা দাঙ্গা ভাব। লালবাহাদুর আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কী উন্মাদনা, কী উত্তেজনা! কিছু না বুঝেই রাস্তায় রাস্তায় চেঁচাতাম জয় জওয়ান, জয় কিষাণ। স্কুলের মাঠে সব্জি বাগান হলো। রাস্তার পাশের ড্রেনে কচুগাছ লাগানো হলো। জয় কিষাণ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হঠাৎ করে রিফিউজি আসতে শুরু করল।

রিফুজি কি? ভিকিটা একটু সরল।

বাড়ি-ঘর থেকে পালিয়ে এসে যারা আশ্রয় নেয় অন্য জায়গায়।

পাকিস্তান তো অনেক দূরে দিল্লীর কাছে। তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল?

রোহন শুনে অবাক হয়, বাড়ির পাশে দাদুদের বাংলাদেশ, আগে পাকিস্তান ছিল?

যুদ্ধের পর গণ্ডগোলে অনেক লোক পালিয়ে এসেছিল, সরকারী ক্যাম্পে থাকতো। আমরা রিফিউজি দেখতে যেতাম, নরককুণ্ডে থাকত তারা। মা যেতেন রান্না করা খিচুড়ি নিয়ে, মহিলা সমিতির তরফ থেকে। পেছনে পেছনে গিয়ে দেখতাম এক বাটি খিচুড়ির জন্যে কি হাউমাউ বাচ্চাদের। জীবনের সবকিছু তখন কাগজের নৌকোর মতো উপরে উপরে ভাসা। দেখেছি সব, মনে দাগ কাটেনি তেমন কিছু। মা একদিন সঙ্গে করে এক মহিলাকে নিয়ে এলেন। কালো দুঃখী দুঃখী চেহারা। খেতে না পাওয়া শরীর। মা বললেন, মাসি ডাকবি। আজ থেকে ও ঘর সামলাবে। আর তুই, কি নাম যেন?

মানিক, মাসি বললে।

হ্যাঁ মানিক, সামনে আয়।

মাসির পেছন থেকে ম্যাজিকের মতো বেরোল আমার বয়েসী ছেলে একটা। সে আরো কালো। উঁচু উঁচু দাঁত, বড় বড় চোখ, অযত্নে কাটা ছোট চুল, গেঞ্জিটা ময়লা, কালো প্যান্ট, খালি পা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কারো চোখে পড়বে না।

মা বললেন, ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। তোর ক্লাসেই। যতদিন বই না কেনা হয়, তোর বই পড়বে। স্কুলড্রেস, তোর একটা সেট ওকে দিয়ে দিবি।

আমার মনে আছে, আমি খুশিই হয়েছিলাম। মাসি, ক্যাম্পের কোণে, পলিথিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে, অন্ধ স্বামীর সঙ্গে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে থাকত। মানিক সকালে তার মার সঙ্গে চলে আসত আমাদের কোয়ার্টারে। আমি পড়তাম, সেও পড়ত আমার সঙ্গে। আমার পুরনো স্কুলড্রেস মানিকের কপালে জুটেছিল। গেটের বাইরে বেরিয়েই আমি আমার সব বই তুলে দিতাম মানিকের হাতে। মানিক সব সময় লাজুক লাজুক হাসি হাসত, ধমক খেলেও। দু'জনের বই নিয়ে হাসিমুখে ক্লাসে যেত। ভয়ে ভয়ে বসত লাস্ট বেঞ্চে। সারাটা দিন কোনো কথা বলত না, কারও সঙ্গে মিশত না। অন্য ছেলেরাও কোনো উৎসাহ পায়নি মানিকের সঙ্গে মেশার।

স্কুলের শেষে খেলার মাঠ। খেলা মানে একটা বল নিয়ে দু'দল ছেলের দাপাদাপি। আইন-কানুন ছাড়া, বল নিয়ে কাড়াকাড়ি, চেঁচামেচি, হুল্লোড়। মাঠের পাশেই নর্দমা। সেখানে বল পড়লেই মুশকিল। নোংরা তো, তাই কেউ নামতে চাইত না। বল নর্দমায় পড়লে আমাদের ঝগড়া শুরু হতো। একজন আরেকজনকে বলত, কাল আমি করেছি, আজ তোর পালা। মানিক আসার পর সেই প্রব্লেম আর থাকল না। মানিক, বলটা নিয়ে আয় তো রে বললেই হাসিমুখে সে নেমে যেত নর্দমায়। বল তুলে এনে, ধুয়ে মাঠে ছুঁড়ে দিত। অলকদের বাগানে পেয়ারা গাছে আর আমাদের চড়তে হতো না। মানিক বেছে বেছে পেয়ারা পেড়ে দিত। এখন বুঝি, মানিককে আমি মনে মনে কাজের ছেলে ভেবে নিয়েছিলাম।

রোহন আস্কারা পায়, তাহলে আমাকে বলো কেন, নিজের কাজ নিজে করতে হবে।

আমি আমার অন্যায়ের গল্প বলছি রোহন, এই গল্পে আমি হিরো নই, ভিলেন। বৃদ্ধ বলে।

খলনায়ক, হা হাঃ! ভিকি মজা পায়।

তারপর শোন। মানিককে কোনো কিছু দিতে খারাপ লাগেনি। শার্ট-প্যান্ট, চপ্পল, বই খাতা কলম সব দিয়েছি। মাঝে মাঝে বিস্কুটের শেয়ারও দিয়েছি। মানিক কাছাকাছি থাকলে নিজেকে খুব বড় মনে হতো। আমি যে এস ডি ওর ছেলে, মানিকের উপস্থিতি আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিত।

বছর গড়ায়, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা আসে, পড়ার চাপ বাড়ে, খেলাধূলা কমে যায়। আমি পড়ি, মানিকও আমার কাছে

বসে পড়ে। ফাইফরমাস খাটে, পেনসিল কেটে দেয়, কলমে কালি ভরে দেয়। মানিক বইয়ের যত্ন করত খুব। আগে আমার বইয়ের মলাট ঠিক থাকত না। মানিক খুব যত্ন করে বই ঠিকঠাক করে রাখত, আমারটাও। বলতে হতো না। আমি সমস্তটা আমার পাওনা হিসেবে নিয়ে নিয়েছিলাম। মানিক তো করবেই আমার জন্যে, সবই তো আমি দিচ্ছি ওকে।

যথাসময়ে পরীক্ষা হলো। আমার যেরকম হয়, ভালই হলো পরীক্ষা। মানিকও মনে হলো ভালই লিখেছে। মা মানিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হলো রে মানিক তোর পরীক্ষা?

মানিক তার চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে বলে, ভাল মাসিমা, তারপর প্রণাম। মাকে দেখলেই, মার সঙ্গে কথা বললেই সে প্রণাম করত।

এবার কে ফার্স্ট হবি রে, তুই না অলক? মার প্রশ্ন এবার আমাকে।

এবার আমার পালা। আমি হেসে বলি।

রেজাল্ট বেরোয়। মানিক ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড, অলক থার্ড। হঠাৎ করে মাথার ভেতরটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। কানে, নাকে, চোখে আগুনের হল্কা লাগে যেন। রাগে চোখ ফেটে জল আসে। বসব, দাঁড়াব, কাঁদব—কি করব বুঝতে পারছিলাম না। অলকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাথা নিচু করে বসে আছে, কাঁদছে বোধহয়। টেবিল-চেয়ার কামড়াতে ইচ্ছে করল। কিচ্ছু না করে হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। মানিকের দিকে তাকিয়ে দেখি ক্লাসের পেছনের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়েছে মনে হলো, মুখে হাসি নেই। ফার্স্ট হলে সবাই গিয়ে চারদিকে ভিড় করে। বলে, চকোলেট খাওয়াতে হবে। মানিকের কাছে কেউ যায়নি। ক্লাস টীচার সবার রিপোর্ট দেওয়া শেষ করে, মানিককে কাছে ডাকলেন। কিসব জিজ্ঞেস করলেন, আমার কানে কিছু গেল, কিছু গেল না। শুধু বুঝলাম, স্কুলের টীচাররা চাঁদা করে মানিকের খরচ চালাবেন। স্যার মানিককে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় চুমু খেলেন। সমস্ত শরীরে
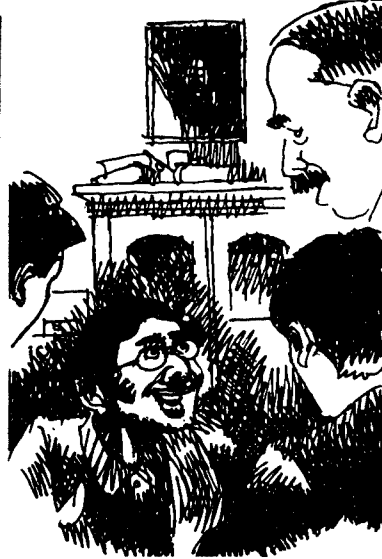
ফের আগুন লেগে গেল। আমার পাওনা ওটা। আমার বই নিয়ে, আমার শার্ট-প্যান্ট পরে, আমার কলম নিয়ে...মানিক ভয়ে ভয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুহূর্তে বাঘনখ বেরোল আমার। হাসি নেই মানিকের মুখে।

আমার ব্যাগটা ওঠা, আমি বিচ্ছিরি করে বলি। গলার স্বর হঠাৎই হিসহিস সাপের মতো। বাসায় গিয়ে খবরদার মাকে সব দাঁত বের করে বলবি না ফার্স্ট হয়েছিস। বললে আমার বই পড়তে দেব না কোনোদিন।

মানিকের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। শুকনো মুখে হাসার চেষ্টা করে, পারে না। কিছু বলেও না। ব্যাগ হাতে মাথা নুইয়ে আমার পেছনে পেছনে আসে। খুব অপমান করতে ইচ্ছে করে আমার। আমার কাজের ছেলে তো।

বাড়িতে ঢোকার আগে আগুনঝরা চোখে তাকাই। মানিক বলে, বলব না।

সেকেন্ড হয়েছি শুনে মা হেসে বললেন, আবার নিয়ে গেল ছেলেটা। তোর রেজাল্ট কেমন রে মানিক?

আমার বুকটা ধ্বক করে ওঠে। মানিক হাসিমুখে বলে, মোটামুটি মাসিমা। প্রণাম করে আবার।

মা আশীর্বাদ করেন, তুই অনেক বড় হবি মানিক।

রোহন বলে, তুমি খুব খারাপ ছিলে পাপা।

ভিকি রেগে যায়, সে বলে দিল না কেন?

গুড্ডি লুকিয়ে চোখ মুছল। নেহা অবাক হয়ে চুপ।

বলে দিলেই আমি শান্তি পেতাম, ধরা পড়ে যেতাম, শাস্তি পেতাম। মানিক বলেনি, তার মাও বলেনি।

ঠাকুমা জানতে পারেনি কোনোদিন?

না, কেউ না। মানিকদের অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মাসিমা আর আসেনি। সাহায্যের দরকার পড়েনি হয়তো, স্কুলের স্যাররাই দেখতেন মানিককে।

মানিককাকু কোথায় এখন, ভিকি জানতে চায়।

এ শহরেই আছে, অফিসার হয়েছে। ভালই আছে মা-বাবাকে নিয়ে। আমার মতো অনেক ডাক্তার তার বন্ধু। সে বাড়ি না থাকলেও ডাক্তাররা তার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মার দেখাশোনা করে। আমার সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে। সেই হাসি, সরল চোখ আগের মতো। আমি শুধু সে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারি না এখনও। নিজেকে এত ছোট লাগে।

ঠাকুমা বলেনি, মানিককাকু বড় হবে। রোহন নিষ্ঠুর হয় আমার ওপর।

সময় থাকতে যদি দোষ স্বীকার করে নিতে পারতাম তবে বেঁচে যেতাম। এখন দোষ স্বীকার করলেও আর হবে না। যখনই মনে পড়ে ঘটনাটা, বুকে একটা কাঁটা খচখচ করে লাগে। সময় থাকতে করিনি—বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে থাকে বালিশে মাথা দিয়ে।

সময় থাকতে, সময় থাকতে কী? রোহন উৎসুক হয়।

সবকিছুর একটা সময় আছে। সময় পার হয়ে গেলে কাজ হয় না। কাজ করলেও হয় না।

রোহন কিছুক্ষণ থমকে থাকে, তারপর আচমকাই বলে বসে, আমিই ভেঙেছি মাউসটা, আমার দোষ।

ভিকি কবুল করে, আমারও দোষ আছে, আমার ধাক্কা লেগেই তো—

বৃদ্ধ চুপ করে থাকে। সে এখনও দোষ কবুল করেনি। দেরি করে ফেলেছে খুব।

ছবি: সমীর সরকার

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বান্‌জারা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

চারিদিকে হই হই পড়ে গেল। তার সঙ্গে মিশে গেল ফোঁপানো কান্নার একটা আওয়াজ। আন্নামালাই জঙ্গলের সবুজ টিলাগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছিল সেই শব্দগুলো।

কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু থেকে বহু তীর্থযাত্রী বনের পথ ধরে শ্রীশৈলম মন্দিরে প্রভু মল্লিকার্জুনকে দর্শনের জন্য আসে। চৈত্র শুদ্ধ পূর্ণিমাতে শ্রীশৈলম মন্দিরে কুম্ভোৎসভম্ চলছিল। প্রতিদিন ঢেউয়ের মতো মন্দির-প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ছিল তীর্থযাত্রীরা। অরণ্যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল আদিবাসী চেঞ্চুরা। তারা ডুলিতে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। এ উৎসব প্রধানত চেঞ্চু সম্প্রদায়ের উৎসব।

কয়েক শতাব্দী আগে ওই অঞ্চলের রাজারা বনের ভেতর পাথর বাঁধানো কয়েকটা পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

এলাহাবাদ থেকে প্রবাসী দুটি বাঙালি পরিবার দু'খানা জিপে করে এসেছিল শ্রীশৈলমের উৎসব দেখার জন্য। ফেরার পথে তারা নাল্লামালাই জঙ্গলের ভেতর থেকে বয়ে আসা একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারে পিকনিকে মেতে উঠেছিল। বড়রা গল্পগুজব আর রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর ছোটর দল মত্ত ছিল খেলায়। পিকনিকের ভেতর চলেছিল তাদেরও পিকনিক। অবশ্য মাটি, ঢেলা, বুনো ফল-পাতা দিয়ে।

কোনও কোনও বাচ্চা পাতা-পত্র সংগ্রহের জন্যে বনের ভেতর ঢুকেছিল। তাদেরই সঙ্গে ছিল চার বছরের ছোট্ট মেয়ে ঝুম্‌কি।

একটা পাখির ডাক শুনে সে তার বড় বড় দুটি চোখ মেলে তাকাল।

হলুদবরণ পাখিটা পাখায় ঝিলিক তুলে এ-গাছ ও-গাছ করছিল। মাঝে মাঝে সেই সুরেলা ডাক।

ঝুম্‌কি তখন সব ভুলে গেছে। সে এগিয়ে চলেছে পাখির সঙ্গে সঙ্গে বনের গভীরে। এদিকে বন্ধুরা যে কখন তাকে একা ফেলে চলে গেছে, সে খেয়ালই তার নেই।

রান্না শেষ হলে বাচ্চাদের ডাক পড়ল খাওয়ার।

খাওয়ার নামে ছোটরা সব দল বেঁধে ছুটে এল। শালপাতায় খাবার দেওয়া হয়েছে, তারা সব সারি বেঁধে বসে গেল।

কিন্তু ঝুম্‌কি ! ঝুম্‌কি কই ?

শর্মিলা দেবী মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিকে তাকাতে লাগলেন।

ঝুম্‌কি কোথা গেল রে ?

বাচ্চারা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু সঠিক কোনও উত্তর দিতে পারল না।

এবার ঝুম্‌কি ঝুম্‌কি বলে চিৎকার করে ডাক দিতে লাগলেন তার মা। চঞ্চল হয়ে উঠল সকলে। মুহূর্তে বড়রা এদিক-ওদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলে। বনের ধার, নদীর তীর, সবদিকেই ঘুরতে লাগল এক ঝাঁক চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু দৃষ্টির সীমানায় ঝুম্‌কির চিহ্নমাত্র নেই। ততক্ষণে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছেন শর্মিলা দেবী।

একমাত্র সন্তান তাঁর। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মহা উৎসাহে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শেষমুহূর্তে জরুরি কাজে আটকে পড়ে তাঁর স্বামী সঙ্গে আসতে পারেননি।

প্রথমে শর্মিলা দেবী দোটানার মধ্যে ছিলেন কিন্তু একরকম জোর করেই তাঁর স্বামী তাঁর বন্ধুদের দলের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

ভয়ে, দুর্ভাবনায় কাঁপতে শুরু করলেন শর্মিলা দেবী। নদীর তীর ধরে অনেকেই ছুটে গেলেন, মেয়েটা যদি স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে থাকে।

পাথরে, নুড়িতে শুধু খল্‌খল্ আওয়াজ। অনেক দূর থেকে ওরা বিষণ্ণ মুখ নিয়ে আবার ফিরে এল পিকনিক স্পটে।

বাইরে থেকে জঙ্গলের ভেতরে যতদূর চোখ যায় ততদূর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঝুম্‌কিকে পাওয়া গেল না।

সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত তারা খোঁজার কাজ চালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর পর আর অপেক্ষা করা যায় না।

অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে।

কারো মুখে সান্ত্বনার কোনও ভাষা ছিল না। তারা প্রায় মূর্ছাহত শর্মিলা দেবীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এগোতে লাগল। স্থানীয় কোনও পুলিশ স্টেশনে যত দ্রুত সম্ভব ইনফর্ম করতে হবে।

প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ওরা একটা পুলিশ চৌকিতে পৌঁছেছিল। সেখানে ইনফর্ম করে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে আস্তানা গেড়েছিল একটা পথের ধারের ধাবায়।

সাতদিন বহু কষ্ট সহ্য করে, বহু তদ্বির-তদারক করেও ঝুম্‌কির কোনও রকম হদিস পাওয়া গেল না।

পুলিশ বলল, চিতা গভীর জঙ্গলে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে গেছে।

অগত্যা পাষাণ-ভার বুকে চাপিয়ে নিয়ে সমস্ত দলটা ফিরে চলল বাড়ির পথে। মধ্যপ্রদেশের কতকগুলো দর্শনীয় স্থান দেখার কথা ছিল, বাতিল হলো সে সব পরিকল্পনা।

সারাপথ শর্মিলা দেবীর চোখে জল ছিল না, মুখে কথা ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘশ্বাস। তিনি এলিয়ে পড়েছিলেন মূর্ছাহতের মতো।

এদিকে বনের ভেতর পাখি খুঁজতে খুঁজতে ঝুম্‌কি এসে পড়ল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে গাছপালায় ঢাকা সবুজ একটা টিলা। তাকে বেড় দিয়ে বয়ে আসছে জলধারা। সম্ভবত এই জলস্রোতই বনের বাইরে ছোট্ট নদীর আকার নিয়ে বয়ে গেছে।

টুংটুং টুংটুং শব্দ শুনে ডানদিকে ফিরে তাকাল ঝুম্‌কি।

ওদিকের বন চিরে একটা পথ ফাঁকা জায়গাটাতে এসে মিশেছে।

সেই পথে প্রথম দেখা গেল একটা

সাদা বলদকে। তার পাশে পাগড়ি-পরা একটি লোক। তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ঝুম্‌কি।

বলদটার পিঠে নানা রঙের রেশমী সুতোর তৈরি আস্তরণ। গলায় ঐ সুতোরই তৈরি দড়িতে গাঁথা একসার বাজনদার ঘণ্টা। তার থেকেই বেরিয়ে আসছিল টুংটুং আওয়াজ।

লোকটা পরেছে ডবল পাক দেওয়া দুহারি ধোতি। গায়ে চাপিয়েছে লম্বা ফুলহাতা জামা, বারকাসি। বুকের দিকটা ঢেকেছে বোতামের বদলে বারটা ফিতের বাঁধন দিয়ে। কাঁধের ওপর পড়ে আছে হলুদ রঙের সেলা বা দোপাট্টা। মাথায় পেটমোটা হাঁড়ির আকারে লাল পাগড়ি। তার গায়ে রুপোলি সুতোর টান।

কানে পরেছে রুপোর রিং, বালি। কোমরে ঝক্‌ঝক্ করছে রুপোর কোমর-বন্ধনী।

লোকটি প্রৌঢ়। লম্বা দোহারা চেহারা। চোখা নাক-মুখ। রঙ ফর্সা না হলেও বেশ উজ্জ্বল। কাঁচা-পাকা একজোড়া চোমরানো গোঁফ। ডান হাতে ধরা একটা বর্শা কাঁধে ঠেকিয়ে চলেছে সাজানো 'নন্দী বইল'টির পাশে পাশে।

ঝুম্‌কি ভয়-ডর জানে না। সে ভারি মিশুকে। তার আপন-পর বাদবিচার নেই। যে ডাকে তার কাছেই চলে যায়। একটুতেই কোমরের দু'দিকে হাত ঠেকিয়ে আধবসার ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঠাকুরমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, মরে যাই।

এ হেন ঝুম্‌কি ঐ চোমরানো গোঁফওয়ালা মানুষটাকে দেখে পাশেই একটা মোটা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল বনের পথে একপাল বলদ। পিঠের দু'দিকে ঝুলছে বস্তাবন্দী বোঝা। তাদের পাশে পাশে চলেছে আগের মতো সাজপোশাক পরা লোকজন প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বর্শা।

এরপর বেরিয়ে এল পঁচিশ তিরিশটা গাইগরু। দু'পাশে ছেলের পাল সিধে রাখছে লাইন।

সবার পেছনে বাচ্চাকাচ্চা সমেত একদল মেয়ে। যেন সেজেগুজে মেলায় চলেছে। পরনে উজ্জ্বল, নানা রঙের ঘাগরা। ছোট ছোট গোল আয়না আর রঙিন সুতোয় নকশার কাজ পোশাকে। দোপাট্টার একপ্রান্ত ঘাগরার সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত পিঠের দিকে ঘুরে মাথার ওপর ঘোমটা তৈরি করেছে। অবশ্য ওটা আধখানা ঘোমটার আকার নিয়েছে।

কানে ঝুমকো। নাকে সোনার নথ। টাকার তৈরি হাঁসুলি পরেছে গলায়। কনুইতে বাজুর মতো বাঁধা রয়েছে কোপ্‌রা। কারু হাতে রুপোর কোপ্‌রা বা চুড়ি। কারু হাতে বা হাতির দাঁতের। আঙুলে পরেছে ছাল্লা বা আংটি। পায়ে রুপোর তোড়িয়া। চলার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে ঝম্‌ঝম্ শব্দে।

অবাক হয়ে ওদের গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগল ঝুম্‌কি।

এবার পুরো দলটা পার হতে লাগল নুড়ি ছড়ানো ঝরনার ওপর দিয়ে।

কৌতূহলী ঝুম্‌কি এখন বেরিয়ে এসেছে গাছের আড়াল থেকে। সে এত বড় একটা জেল্লাদার দলের জল ঠেলে পার হওয়া দেখবে।

ঠিক চোখে পড়ে গেল পান্নাবাঈয়ের। পঁয়ত্রিশ বছরের পান্নাবাঈ দলের নায়েক বা প্রধানের বউ। যে মানুষটা প্রথম 'নন্দী বইল'-এর সঙ্গে বন চিরে বেরিয়ে এসেছিল, সে-ই দলপতি হরদয়াল। পান্নাবাঈ আর হরদয়ালের কোনও ছেলেপুলে ছিল না।

ঝুম্‌কির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল পান্নাবাঈ। চোখে তার বিস্ময়, মুখে খুশির ঝিলিক।

খোকি, বনের ভেতর কি করছ একা একা ?

মেয়েটির রঙিন ঘাগরা, সাজপোশাক আর মুখের হাসি দেখে ঝুম্‌কির মনে হলো, একে ভয় পাবার কিছু নেই। পান্নাবাঈয়ের মুখের হাসি দেখে সেও চোখে-মুখে খুশির ঢেউ তুলল।

বান্‌জারার দলটি ঝুম্‌কিকে পেয়ে মহাখুশি। পান্নাবাঈ তো তাকে বুক থেকে নামাতেই চায় না। মেয়েটিকে যত দেখে তত তার চোখে জল আসে। তার বঞ্চিত বুকটা যেন জুড়িয়ে যায়।

অনেক খুঁজল ওরা। বন চিরে বেশ কয়েকজন এদিক-ওদিকে তাকাল কিন্তু কারু হদিস পাওয়া গেল না। তবে মেয়েটা এই বনের ভেতর এল কি করে ?

শেষে একে জঙ্গলের দেবী বন্‌জারীর দান বলে ওরা বুকে তুলে নিয়ে পুরো দল বা টাণ্ডা চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ওরা বান্‌জারী বা বনবাসী। আসলে বনের পথ দিয়ে গেলেও ওরা চেঞ্চুদের মতো বনে ঘর বেঁধে থাকে না। বান্‌জারা যাযাবর গোষ্ঠীর লোক। পোড়ো জায়গা, গাছতলা কিংবা বনের ভেতর ওরা সাময়িক আস্তানা গেড়ে থাকে। আধা শহরের প্রান্তে, নদীর ধারেও ওদের ডেরা ফেলে থাকতে দেখা যায়।

বান্‌জারারা সাধারণত পুকুর, নদী কিংবা অগভীর কুয়োর জল পান করতে চায় না। নদীর ধারে বালিতে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত খোঁড়ে। ওখানে যে জল চুইয়ে জমা হয় সেই জলই ওরা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। কখনও বা গভীর কুয়ো থেকে জল তুলে সেটা কাজে লাগায়।

কত দল, উপদলে ভাগ হয়ে আছে এই বান্‌জারা সম্প্রদায়।

মথুরিয়া বান্‌জারার দল ওদের ভেতর সবচেয়ে উঁচু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তারা নিরামিষ খায়। ওদেরও আবার চারটি শ্রেণী আছে। এমনকি পথচারী হয়েও ওরা যথাসময়ে ব্রাহ্মণের মতো গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে।

গোর বান্‌জারারা রাজপুত, ক্ষত্রিয়। ওদেরকে চারণ বান্‌জারাও বলে। তুনওয়ার, বাদতিয়া, ভুকিয়া এরা সব এই দলের লোক।

বোধহয় এই দুনিয়ায় অপরিচিত বলে কেউ নেই ঝুম্‌কির কাছে। যেখানে ভালোবাসা সেখানেই ঝুম্‌কির খুশি ঝলকে

ওঠে।

সে এখন হরদয়ালের বউ পান্নাবাঈয়ের বুকে চেপে চলেছে।

বনের ভেতর টিলার ধারে চেঞ্চুদের একটা গ্রামে এসে ওরা পৌঁছাল। ছোট ছোট বাঁশ আর পাতা দিয়ে তৈরি ঘর এদিক-ওদিকে ছড়ান।

সন্ধ্যা নামে। গাছের ডালে সন্ধ্যার পাখিরা কলরবে মেতে উঠেছে। বান্‌জারার দল একটু ফাঁকা জায়গা দেখে রাতের আস্তানা গাড়ল।

কাঠকুটো জ্বেলে ওরা রান্নার আয়োজন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু চেঞ্চুদের কয়েকজন মুরুব্বি ছুটে এসে বলল, তোমরা আমাদের গ্রামে এসেছ, আমাদের একটু সুযোগ দাও, তোমাদের সেবা করবার।

অনেক ক্ষেত্রে এটাই রীতি, বান্‌জারারা চেঞ্চুদের কাছে সমাদর পায়।

পাখির মাংস বানিয়ে, রুটি, সব্‌জি ইত্যাদি তৈরি করে ওরা খাইয়ে দিল বান্‌জারাদের।

দলের ছেলেমেয়েরা মহাখুশি। নতুন একটা বাচ্চা তাদের দলে এসেছে। ইতিমধ্যেই তাকে ঘিরে নাচ গান শুরু করে দিয়েছে সবাই।

খাবার পরে বিশ্রামের আগে বান্‌জারাদের নায়েক তার তিনজন শাগরেদ —কারবারী, নভি আর ভাটকে সঙ্গে নিয়ে দু-চারটে যুবক ছেলের কাঁধে ঘিয়ের কলসি, ছানার তাল চাপিয়ে দিয়ে চেঞ্চুদের মুখিয়ার ডেরায় গেল।

চেঞ্চুরা সাধারণত গরু পোষে না। তারা এই সব উপহার পেয়ে মহাখুশি।

ফিরে আসার সময় চেঞ্চুরা নায়েকের হাতে মধুভর্তি একটা বড় ভাঁড় ধরিয়ে দিল। বন-পাহাড়ে যত বড় বড় মৌচাক হয়, তার থেকে মধু সংগ্রহ করে চেঞ্চু সম্প্রদায়। মধু পেয়ে বান্‌জারাদের নায়েক কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়তে লাগল।

রাতে ঘুমে ঢলে পড়ার আগে বান্‌জারাদের ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু নায়েকের মুখ থেকে পুরনোদিনের যে কোনও একটা কাহিনী শুনবেই শুনবে।

নায়েক হরদয়ালও গল্প জমিয়ে বলতে ওস্তাদ।

সবুজ ঘাসে ভরা আস্তানার চারদিকে জঙ্গলের বড় বড় গাছ শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বান ডেকেছে চাঁদের আলোর। গরুর পাল শুয়ে আছে একদিকে। দু-একটা কাপড়ের তাঁবুর ভেতর বিশ্রামের জন্য ঢুকে পড়েছে মেয়েরা।

গল্প-পাগল ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসেছে হরদয়ালকে।

ভাটুরি বলল, নায়েক, চেঞ্চুরা আমাদের অত খাতির করল কেন ?

হরদয়াল বলল, তার কারণ আছে বইকি।

ঘুঙুরি বলল, চাচাজী, আমরা তো আরও বহুত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এমন করে কেউ আমাদের আগে খাতির করেনি।

হরদয়াল আবার বলল, এর কারণ আছে।

কি কারণ ?

তা হলে আসল কাহিনীটা শোন ঃ

চেঞ্চুরা মনে করে, বান্‌জারাদের সঙ্গে তাদের এককালে রক্তের যোগ ছিল।

দুমকা বলল, কি রকম ?

হরদয়াল বলল, আজ ভোজের আসরে গিয়ে দেখেছিস, দূরে সারি দিয়ে কত কুকুর বসে আছে।

লম্বু বলল, হ্যাঁ, ওরা কিন্তু ডাকহাঁক কিছু করছিল না।

না, চেঞ্চুদের প্রত্যেকের ঘরে অনেক আদরে কুকুর পোষে। কেন জানো ?

গল্প শোনার আগ্রহে হরদয়ালের দিকে মুখিয়ে বসে রইল ছেলেমেয়েরা।

বহুকাল আগে আমাদেরই মতো এক বান্‌জারা স্বামী-স্ত্রী ঘুরে বেড়াত। তাদের দিনরাত্রি কাটত বনে বনে। কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না তাদের। সঙ্গে থাকত একটা কুক্কুরী। তারও কোনও বাচ্চা হয়নি।

মনমরা হয়ে ঘুরত এই বান্‌জারা দম্পতি।

একদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে একটা নতুন বনে ঢুকে পড়ল। সেখানে একটা টিলার তলায় ওদের চোখে পড়ল একটা গুহা। এই গুহার সামনে সন্ধ্যায় ধুনি জ্বলতে দেখে ওরা পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

সে সময় দারুণ শীত পড়েছিল। অল্প দূর থেকে ওরা ধুনির আলোয় দেখতে পেল, এক সন্ন্যাসী ঠাকুর বসে রয়েছেন।

বান্‌জারা স্বামী-স্ত্রী তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম জানাল ভক্তিভরে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। মেয়েটিকে দেখে তাঁর বিশেষ ভক্তিমতী বলে মনে হলো।

ইতিমধ্যে বান্‌জারার বউ তার ঝুড়ি থেকে কয়েকটা ফল বের করে সাধুবাবার কাছে রেখে দিয়ে হাত জোড় করে বলল, বাবা আমরা বড় গরিব, এই সামান্য ফল আপনি সেবা করুন।

আরও মুগ্ধ হলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর।

একসময় ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা ভবঘুরে, বন-পাহাড় আকাশ-বাতাস তোদের সঙ্গী। তোদের বুক-ভরা আনন্দ কিন্তু তোদের চোখেমুখে একটা দুঃখের ছায়া দেখছি কেন ?

জল গড়িয়ে পড়ল বান্‌জারা বউয়ের চোখ দিয়ে।

সে কাতর গলায় বলল, বাবা, অনেকদিন বিয়ে হয়েছে আমাদের, কিন্তু এখনও আমরা কোনও ছেলেমেয়ের মুখ দেখতে পাইনি। তাই আমাদের দুজনের কারু মনেই কোনও শান্তি বা আনন্দ নেই।

বড় কষ্টে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মেয়েটি।

সাধু কতক্ষণ চুপ করে ধ্যানে বসে রইলেন। একসময় চোখে মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো বেশ আছিস, আবার দুঃখকে ডেকে আনা কেন।

ওরা কিছু না বুঝতে পেরে সাধুবাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সাধু আবার বললেন, আমার কথাটা

গল্প-পাগল ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসেছে হরদয়ালকে।

বুঝতে পারলি না ? তবে মন দিয়ে শোন। তোরা তো দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ছেলেমেয়ে হলো একটা বন্ধন। সংসারে যত জড়াবি, সুখ-আনন্দ তোদের কাছ থেকে ততদূরে সরে সরে যাবে।

বান্‌জারা-পুরুষটি বলল, আমাদের সম্বলের মধ্যে এই কুকুরী আর একটা গাই গরু আছে। আমরা চোখ বুজলে এদের দেখবে কে বাবা! প্রাণ থাকতে কারু হাতে তো এদের তুলে দিয়ে যেতে পারব না।

সাধু এবার সোজাসুজি বললেন, তোমাদের ছেলেমেয়ে হতে পারে, কিন্তু তাদের জন্মের পর তোমাদের দুজনের ভয়ংকর বিপদ ঘটবে।

কি বিপদ বাবা ?

ছেলেমেয়েদের মুখ দেখার পর অল্পদিনের ভেতরেই তোমাদের এই দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে। আজ রাতে বিশ্রাম করো, কাল ভোরে এসে জানিয়ে যেও তোমরা কী চাও।

গল্প বলতে বলতে চুপ করে গেল নায়েক।

ভাটুরি অমনি বলল, রাতে ওরা কি ঠিক করল বুয়াজী ?

নায়েক হেসে বলল, তোরাই বল।

রেতি বলল, ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মরার কথা শুনলে কেউ আর ছেলেমেয়ে চায় ! এ তো আর যার তার কথা নয়, সন্ন্যাসিবাবার কথা।

হরদয়াল বলল, ঠিক এর উল্টোটি চাইল ওরা দুজন। সারারাত ওদের ঘুম হয়নি। বসে বসে ভেবেছে আর দুজনে আলোচনা করেছে। শেষে ওরা ঠিক করে ফেলল, মরে যাই যাব কিন্তু এ দুনিয়ায় আমাদের একটা চিহ্ন রেখে যাব। একদিন তো আমাদের মরতেই হবে। হয় আগে, নয় পরে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে সেই কথাটি বলার পর, তিনি ধুনির আগুন থেকে তুলে আনলেন পোড়া দু-টুকরো নারকেল। সেই নারকেল মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, টিলার ওপাশে জলের কুণ্ড আছে, সেখান থেকে জল তুলে নিয়ে শুদ্ধ মনে এই দু-টুকরো নারকেল না চিবিয়ে গিলে খেয়ে নাও।

মোরী বলে মেয়েটার ধৈর্য ধরছিল না সে বলল, তারপর!

তারপর আর কী। গিলে খেয়ে ফেলল।

এবার ছেলেমেয়েরা সকলেই উত্তেজিত। বলল, তারপর ?

ওই বান্‌জারা-বউটির যমজ মেয়ে জন্মাল। মেয়ে দুটির মুখ দেখে তার বাবা-মা ভারী খুশি। তারা নিজেদের পরিণতির কথা একবারে ভুলে গেল। কিন্তু সাধুবাবার কথা মিথ্যে হওয়ার নয়। মেয়েদের জন্মের পর ছ-মাসও কাটল না। এক দুর্যোগের রাতে বান্‌জারা স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের বাইরের কাজ শেষ করে নিজেদের ডেরায় ফিরছিল তখন অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর গর্জন করে একটা বাজ পড়ল গাছের ওপর। হতভাগ্য স্বামী-স্ত্রী সে-সময় ওই গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা দুজনেই বিদ্যুতের ছোবলে ঝলসে গেল।

ঘুঙুরি মন্তব্য করল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের

কথা ফলে গেল আশ্চর্যভাবে।

রেতি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল, বাচ্চা দুটোর তাহলে কি হলো মাউসাজী ?

ওরা তখন একটা গুহার ভেতর ঘুমোচ্ছিল। বাজ পড়তে হঠাৎ কেঁদে উঠে আবার দুজন দুজনকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাই-গরুটা ডেকে উঠেছিল। কুকুরটা কিন্তু ডাকেনি। তার সজাগ দৃষ্টি ছিল ঘুমিয়ে থাকা দুটো মেয়ের ওপর।

কয়েকদিনের ভেতরেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। গাই গরুটার একটা বাছুর হলো। কুক্কুরীটাও দুটো বাচ্চার জন্ম দিল।

কুক্কুরী মায়ের যত্নে, আর গাই গরুটার দুধ খেয়ে বেড়ে উঠতে লাগল সেই যমজ দুটি বোন।

কয়েক বছর পরে অপূর্ব সুন্দরী দুটি কন্যা ঘুরে বেড়াতে লাগল বন আলো করে। তারা কুক্কুরীটিকে মায়ের মতো ভক্তি করত আর তাদের মা বলেই জানত।

একদিন জঙ্গলের একটি জামগাছের তলা থেকে জাম কুড়োচ্ছিল যমজ বনের ছোটটি। বড়টি একটু দূরে একটা ছোট নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আপন মনে গান করছিল।

হঠাৎ নদীর ওপার থেকে একটা শিকারী যুবক তাকে দেখতে পেয়ে নদী পেরিয়ে এপারে চলে এল।

সে সরাসরি মেয়েটির কাছে এসে বলল, তুমি একা এই নির্জন বনে কি করছ ? এত সুন্দর গানই বা তুমি শিখলে কোত্থেকে ? কোন ভাগ্যবান বাবা-মায়ের কন্যা তুমি ?

যমজের বড় বোনটি বলল, আমরা দু'বোন এই বনে থাকি। আমাদের কুক্কুরী মা অনেক যত্নে আমাদের প্রতিপালন করেছে।

শিকারী যুবকটি হো হো করে হেসে উঠে বলল, কুক্কুরী আবার মা হয় নাকি ?

ছেলেটি যত হাসে মেয়েটি তত জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, কুক্কুরী আমার মা।

যুবক তখন সোজাসুজি তার কাছে বিয়ের কথা পাড়ল।

মেয়েটি বলল, আমি তোমার কথা আমার বোনের কাছে বলব।

শিকারি যুবক, তার মেজাজই অন্যরকম। সে মেয়েটির হাত ধরে বলল, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। চলো, আমি তোমাকে নদী পার করে নিয়ে যাই।

মেয়েটি কিন্তু অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যেতে চাইছিল না। সে চেঁচিয়ে তার বোনকে ডাকতে লাগল।

শিকারীর গায়ের শক্তি দারুণ। সে মেয়েটিকে দু-হাতে তুলে নিয়ে নদী পার হয়ে চলে গেল।

সারা পথ মেয়েটি কাঁদল, হাত-পা ছুঁড়ল। তার গয়নাগাঁটির সব কটাই একে একে পথে ছড়িয়ে দিল।

একসময় ছোট বোনটি দিদির নাম ধরে ডাক দিতে দিতে নদীর তীর ধরে এগোতে লাগল। সে এক জায়গায় এসে দেখল, নদীর ওপারে তার দিদির হলুদ রঙের দোপাট্টাটা পড়ে আছে। সে তক্ষুণি নদী পেরিয়ে ওপারে উঠল। তারপর দোপাট্টা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল।

পথে দেখতে পেল দিদির খসে পড়া গয়নাগাঁটির নানা চিহ্ন।

সেই চিহ্ন ধরে অনেক পথ পেরিয়ে একসময় সে পৌঁছে গেল লোকালয়ে, দিদির বাড়ির সামনে। সেখানে দেখা হয়ে গেল তার দিদির সঙ্গে।

বোনকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে দিদির আনন্দ আর ধরে না। ইতিমধ্যে সে শিকারীকে সাদি করবে বলে কথা দিয়ে ফেলেছে।

দু'বোনে বেশ কয়েক দিন কাটাল শিকারী যুবকের বাড়িতে।

শিকারী তার পাশের গ্রামে এক যুবকের সঙ্গে ছোট বোনটার বিয়ে দিয়ে দিল।

হরদয়াল অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর এবার একটু থামল।

মোরী তাকে থামতে দিল না। সে উদগ্রীব হয়ে বলল, ওদের কুক্কুরী মায়ের কি হলো বুয়াজী ?

সেই কুক্কুরী তো চতুর্দিকে তার দুটো মেয়েকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে মাটিতে পায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কুক্কুরী নদী পার হয়ে একদিন এসে পৌঁছাল বড় মেয়ের বাড়িতে।

মাকে দেখে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না মেয়ের। কুক্কুরীর দু'চোখ বেয়েও জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দু-চারদিন বড় মেয়ের আদর-যত্নে রইল কুক্কুরী-মা।

সে শুনল, তার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাশের গাঁয়ে।

এক সকালে কাউকে কিছু না বলে সে চলে গেল ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

সে পথ চিনে একসময় ঠিক পৌঁছে গেল ছোট মেয়ের বাড়ির দোরগোড়ায়।

মেয়ে কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। একটা পথের কুকুর ভেবে দূর দূর করে তাকে তাড়াতে গেল। সে কিন্তু কেঁউ কেঁউ করে তার মেয়েকে কত আদরের কথা বলতে লাগল। দোর থেকে একদম সরল না।

শেষে রেগে গিয়ে একটা চেলাকাঠ তুলে তাকে বেধড়ক মারতে লাগল মেয়ে।

কুক্কুরী মা কাঁদে আর মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। শেষে কোনওরকমে ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টানতে টানতে বড় মেয়ের বাড়ির কাছে এসে পড়ে গেল। সেখানেই বেরিয়ে গেল হতভাগ্য কুক্কুরী মায়ের প্রাণটা।

বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার মায়ের এই অবস্থা দেখে কেঁদে আছড়ে পড়ল তার ওপর। সে বহুদূর থেকে তার মায়ের কাতর একটা ডাক শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু হায়! কাছে এসে দেখল, সব শেষ।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, এ তার ছোট বোনেরই কীর্তি।

ছোট বোন যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন তার আক্ষেপের শেষ রইল

না। সে কপালে হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল, হায় ! হায় ! আমি আমার মাকে চিনতে পারলাম না !

বড় মেয়ে তার মাকে বাড়ির ছাদের ওপর একটা বাক্সবন্দী করে রেখেছিল। ছোট বোনের আকৃতিতে মাকে দেখবার জন্য দু'বোন ছাদে উঠল।

আশ্চর্য ! ক'দিনের পচা মরা দেহটা থেকে কোনওরকম গন্ধ বেরিয়ে আসছিল না।

বড় মেয়ে কাঠের বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলল। দুজনে অবাক হয়ে দেখল, কুক্কুরী মায়ের দেহটা সেখানে নেই, তার বদলে রয়েছে একতাল সোনা।

মরে গিয়েও তার মা জানিয়ে দিল, তার ভালোবাসা ছিল খাঁটি সোনার মতো।

দুম্‌কা বলল, সেজন্যেই কী চেঞ্চুরা কুকুরের এমন ভক্ত ?

হরদয়াল বলল, চেঞ্চুরা মনে করে, তারা ওই বান্‌জারা মেয়ে-পুরুষের বংশধর আর ওই কুক্কুরী তাদের আদি মাতাপিতার বংশকে রক্ষা করেছিল।

রেতি মন্তব্য করল, তাই বুঝি চেঞ্চুরা আমাদের এত খাতির করে। কুকুরদের এত ভালোবাসে।

ঠিক তাই ।

॥ দুই ॥

পরের দিন ডেরা তুলে নিয়ে আবার যাত্রা।

গত রাতে স্বপ্ন দেখেছে পান্নাবাঈ। ঝুম্‌কি তার হাত ধরে টানতে টানতে বনের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেছে। সেখানে ঘাসের জমিনের ওপর লুটিয়ে পড়ছিল চাঁদের আলো। কখন এক পশলা বর্ষা হয়ে গেছে, মুক্তোর দানার মতো বর্ষার বিন্দুগুলো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল।

হঠাৎ পরীর মতো ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল ঝুম্‌কি। গলায় মিহি মিঠে একটা আওয়াজ বাজছে। একসময় সে সাদা ডানা মেলে শূন্যে উড়তে লাগল। চাঁদের দিকে যেতে যেতে হাত নেড়ে সে বিদায় জানাল পান্নাবাঈকে।

স্বপ্নের ভেতর কান্নায় তখন ভেঙে পড়েছে পান্নাবাঈ। সে উঠে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। এই তো তার বুকের সোনা, হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাঁবুর একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে চাঁদের একটুকরো আলো এসে ঘুমন্ত ঝুম্‌কির কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে।

আজ ঝুম্‌কিকে বুকে চেপে ধরেই পথ চলছিল পান্নাবাঈ।

ওরা কখনও বন চিরে, কখনও বা লোকালয়ের ভেতর দিয়ে, আবার কখনও বা নদীতীর ধরে উত্তরমুখো চলছিল।

এবার তাদের যাত্রা মধ্যপ্রদেশের দিকে। নর্মদা নদীতে স্নান করে খাজুরাহোতে যাবে মহাদেবের চরণে বেলপাতা নিবেদন করতে।

রায়পুর ছুঁয়ে ওরা চলে গেল জব্বলপুরের দিকে। ঘি আর ছানার ব্যবসা বেশ জমল।

শহরের একটু দূরে মেলা বসেছিল। সেই মেলায় ওরা ঘুরে বেড়াল।

সুখলাল ভারী করিতকর্মা লোক। সে নায়েককে এসে খবর দিল, মেলার কর্তাকে ধরে একটা নাচগানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিনের বেলা মেলার কর্তৃপক্ষ ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছে রাতে বান্‌জারাদের নাচগান হবে।

বান্‌জারাদের কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা হোলির গান গাইতে গাইতে কি দারুণ নাচ নাচল। ঘাগরা দুলিয়ে, দোপাট্টা উড়িয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সে কী নাচ ! কখনও দু'দলে আলাদা হয়ে, কখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগুপিছু নাচছে।

কিশোররা কিশোরীদের কাছে আসার জন্য নাচের ভঙ্গিতে ডাকছে।

কিশোরীরা আধখানা মুখ ফিরিয়ে নাচতে নাচতে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গানের মিঠে সুরে উতল হয়ে উঠেছে হোলির আকাশ।

কেউ যেন সবাইকে ডাকছে বাতাসে হোলির রঙিন আবির ওড়াবার জন্য।

'আওরে দেসানি, হোলির খেলা
বার মিনাম আইর হোলি হোলি
খেলোর জোকেতি।'

আবার গান আবার নাচ। দোপাট্টা উড়িয়ে নতুন ভঙ্গিতে নাচছে ছেলেমেয়েরা। মাঝে মাঝে বাতাসে উড়িয়ে চলেছে গাঢ় গোলাপী রঙের ফাগ। দর্শকরা একেবারে মাতোয়ারা।

গান হচ্ছে ঃ

'মহুর পাদেপ বল রিচ হোলি,
অনসূয়া করমেলি ক্ষীর পোলি,
দত্তারো বল রামরো হোলি,
পন্ধারপুরম বল রিচ হোলি।'

মহুরেতে চলেছে হোলি খেলা। দেবী অনসূয়া বানিয়েছেন ক্ষীর আর পুলি। প্রভু দত্তাত্রয় খেলছেন হোলি। পন্ধারপুরমে হোলির মাতন লেগেছে।

নাচে-গানে, সারেঙ্গি, করতাল, ঢোলক আর বাঁশির সম্মিলিত তানে রাতের মেলা সরগরম।

অনেক বকশিশ পেল বান্‌জারার দল। পরের বছর মেলায় এমনি নাচগানের আসর জমাবার জন্যে আগাম বায়নার টাকা নিয়ে এলো মেলা কর্তৃপক্ষ।

নায়েক হরদয়াল হাতজোড় করে বলল, মহাশয়গণ, আমরা বান্‌জারা। একঠাঁই বেশিদিন থাকার নিয়ম নেই আমাদের। যদি চলতি পথে কখনো এখানে এসে পড়ি তাহলে আমার ছেলেমেয়েরা আবার আপনাদের এমনি পেয়ার আর শুভকামনা কুড়িয়ে নেবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই 'নন্দী বইল'কে সামনে রেখে, ডান কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে, বাঁ হাতের দুই আঙুলে গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে এগিয়ে চলল নায়েক হরদয়াল। পেছনে লম্বা লাইন,—স্ত্রী-পুরুষ, কাচ্চাবাচ্চা আর গরুর পাল।

পাগড়ি-পরা পুরুষগুলো যখন কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাজার

সেপাইরা হেঁটে চলেছে। ঝকঝকে বর্শার ফলাগুলো ঝলকাচ্ছে আলো পড়ে।

তীর-ধনুকগুলো বাণ্ডিল করে বাঁধা আছে ভারবাহী বলদের পিঠে।

বনের পথে চলার সময় বনবরা, খরগোশ আর হরিণ শিকার করতে গেলে দরকার হয় তীরধনু আর বর্শার।

ছেলেমেয়েরা ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে ওস্তাদ। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই নাচেগানে তারা তালিম নেয়, মা-মাসি, বাপ-জ্যেঠা, মেসো-পিসেদের কাছ থেকে।

তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় আত্মরক্ষার জন্য ছোরা আর লাঠি খেলা।

বাজিকররাও বান্‌জারাদের মতো ভবঘুরে, কিন্তু ওরা গৃহস্থদের উঠোনে গিয়ে নানারকম বাজি দেখায়। হাটের পাশেও দুদিকে বাঁশের ওপর টান টান করে দড়ি বেঁধে তার ওপর দিয়ে নির্ভয়ে চলাচল করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়। দড়ির খেলায় কড়িও জোটে অনেক।

বানর আর ভালুকের খেলা দেখাতেও ওরা ওস্তাদ।

বান্‌জারাদের নামের সঙ্গে বনের যোগটা নিবিড়। ওরা বনচরা। বনের ভেতরের পথ দিয়েই ওদের যাতায়াতটা বেশি।

ওরা বনের পর বন ভেঙে চলে, তাই গাছগাছালির পাতাপত্র, শেকড়বাকড়ের সন্ধান রাখে ওরা। কেবল খোঁজ নয়, গুণাগুণও জানে।

লোকালয়ে যাবার সময় ছানা আর ঘি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে ওরা শেকড়বাকড়ও বিক্রি করে। কোন রোগটির কোন দাওয়াই, তাও জানিয়ে দেয়।

পথের ধারে কিংবা পড়ো টিবিতেও ওরা সঙ্গে বয়ে আনা গাছের চারা লাগিয়ে দেয়। সেই চারা বড় গাছে পরিণত হয়ে যখন ফুল দেয়, ছায়া দেয়, তখন কিন্তু বান্‌জারারা আর সেখানে থাকে না। পৃথিবীকে যেন সবুজ করা, শ্যামল করা তাদের ধর্ম।

খোলা আকাশের নিচে, বনের শ্যামলিমায়, বহতা নদীর তীরে ঘুরতে ঘুরতে উদার হয়ে গেছে ওদের দিল্।

দিনে দিনে ঝুম্‌কি হয়ে উঠেছে বান্‌জারাদের নয়নের মণি। সে এখন কেবল পান্নাবাঈয়ের বুক জুড়ে থাকে না, ছেলে-মেয়ে সকলের কোলে-পিঠে-কাঁধে চড়ে বেড়ায়।

ব্রিজলাল ওকে ছুঁড়ে দেয় শূন্যে, একটুও ভয়ডর নেই ওর। শূন্য থেকে নেমে আসার সময় খিলখিল করে হাসতে থাকে।

মেয়ে নয় তো, আকাশ থেকে ঝরে পড়া একটা জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। যত দিন যায় ঝুম্‌কির রূপের বাহার চাঁপাফুলের মতো ছড়াতে থাকে।

ঝুম্‌কি এখন শুধু ঝুম্‌কি নয়, ঝুম্‌কি তুনওয়ার। এখন ও হরদয়াল আর পান্নাবাঈয়ের মেয়ে, তাই ওদের পদবীটাই ওর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই দলে পাওয়ার, বাদ্‌তিয়া, ভুকিয়া, চবন, আরও কত পদবীর লোকজন একসঙ্গে রয়েছে। ওরা একে অপরের আত্মীয়। কেউ কারু বহনাই, কেউ বা কারু বহু, বহেন।

কোনও মেয়ের দেবর চলেছে, সঙ্গে তার বউ দেবরানীও সঙ্গিনী। জেঠ, জেঠানি; মাউসি, মাউসাজী; ননন্দাই, ননন্দ; এরা সকলেই এক দলভুক্ত বান্‌জারা।

আশ্চর্য এদের ভালোবাসা ! ভুলিয়ে দিয়েছে ঝুমকির আগের জীবনটাকে। সে তখন বান্‌জারাদেরই একজন। তার বয়সী কেউ নেই ওই দলে। দু-চার বছরের বড় অনেককটিই রয়েছে ওখানে। তারা সারাদিন ওকে নিয়ে খেলা করে, ওকে নিয়েই মেতে থাকে।

রাতে হরদয়ালকে পান্নাবাঈ বলল, দেবী জগদম্বার দয়ায় আজ আমার বন্ধ্যা দশা ঘুচেছে।

হ্যাঁ গা, মেয়েটাকে পেলাম, একটু পুজোটুজো দেবে না ?

হরদয়াল বলল, বল্ কোথায় পুজো দিতে চাস ?

কেন, অমরকণ্টকে। সামনে তো সংক্রান্তি, ওখানেই গিয়ে দেবতার চরণে প্রণাম জানাব।

বেশ তো, তোর যা ইচ্ছে তাই হবে।

পান্নাবাঈ বলল, তার আগে চলো চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে। ওখানে পুজো দিয়ে ভেরাঘাটে যাওয়া যাবে। ভেরাঘাটের কাছেই তো নর্মদা নদী পড়েছে একটা গভীর খাদে। ওটাই তো ধোঁয়াধার জলপ্রপাত। তারপর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদী এঁকেবেঁকে কতদূর চলে গেছে।

হরদয়াল বিস্মিত, তুই এত সব জানলি কি করে ?

সব আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি। বিয়ের পর মা-বাবা দুজনেই এদিকে এসেছিল।

হয়দয়াল তার দলবল নিয়ে একদিন তিনি তিনটে নৌকো ভাড়া করে নর্মদার স্রোতে জলবিহার করল। শ্বেতপাথরের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ওরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু তীরে ওঠার সময় ঘাটের কাছে ঘটল একটা অঘটন।

ঘাটের পাটে নামবার সময় টলে গেল পান্নাবাঈদের নৌকোটা। অমনি ঘাটের কাছে পান্নাবাঈয়ের বুক থেকে ছিটকে পড়ল ঝুম্‌কি। সঙ্গে সঙ্গে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পান্নাবাঈও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

এখানে নদীর স্রোত প্রবল। একটু দূরেই সে স্রোত নিচের দিকে জলপ্রপাতের মতো নেমে গেছে।

বান্‌জারার দলের মানুষগুলো কি করবে ভেবে পেল না। তারা পাহাড়ী ছোট ছোট নদী পেরিয়ে যায় ঠিক, কিন্তু এমন ডুবজলের খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কাটার অভ্যেস নেই। আতঙ্কে তাদের চোখগুলোই শুধু বিস্ফারিত হয়ে গেল। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল বাচ্চার দল।

হঠাৎ মা জগদম্বা যেন পাঠালেন লোকটিকে। সে লাফ দিয়ে ওই স্রোত কেটে কুমিরের মতো সোঁ সোঁ করে

এগোতে লাগল। অবশেষে নাগাল পেল দুজনের। ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে একটু দূরে কূলে গিয়ে উঠল।

ততক্ষণে তীর ধরে দৌড়চ্ছে বান্‌জারা মেয়ে-পুরুষের দল।

পান্নাবাঈ জল খেয়ে বেশ জখম হয়েছিল কিন্তু ঝুম্‌কির বিশেষ কিছুই হয়নি। লোকটা ততক্ষণে ওদের পরিচর্যায় লেগে গিয়েছিল। তার নিজের যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব।

সুখলাল বলে উঠল, ওই লোকটিই তো নর্মদা যেখানে পহাড়ের খাদে পড়ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়েছিল খালি গায়ে।

ব্রিজলাল বলল, ওই সেই লোক, যে সেদিন ধোঁয়াধার জলপ্রপাতের অত গভীর খাদে বার দুয়েক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মরে যাবার কথা কিন্তু দু'দুবার খাদ থেকে উঠে এসেছিল অবলীলায়।

দুজনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল যে তাকে ওরা এক ভাঁড় ঘি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা নিল না। শুধু মৃদু হেসে ঝুম্‌কির গালটা নেড়ে দিয়ে চলে গেল।

মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় বান্‌জারাদের পুরো দলটা মহাখুশি। তারা রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ওই নর্মদার তীরেই নাচগান জুড়ে দিল। হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দে তখন তারা মাতোয়ারা।

পাহাড়, অরণ্য, নদীর স্রোত, চাঁদের আলো যেন এক মায়াময় জগতের সৃষ্টি করছিল।

বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল পান্নাবাঈকে, সে কিন্তু দু-হাতের বাঁধন থেকে ঝুম্‌কিকে একবারও ছাড়েনি।

সংক্রান্তির মেলা বসবে অমরকণ্টকের মন্দির-প্রাঙ্গণে। যাত্রীরা স্নান করবে কুণ্ডে।

অমরকণ্টকে কখনও আসেনি এই দলটি। হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল।

জায়গাটা সবুজ তৃণে ছাওয়া একটা মালভূমি। আশেপাশে গভীর বন। স্বচ্ছ জলে ভরা ছোট ছোট কয়েকটি স্রোতধারা রুপোলি সুতোর মতো ছড়িয়ে আছে মালভূমির চারদিকে।

বর্ষার সময় কিন্তু এর অন্য রূপ। এই স্রোতধারাগুলি তখন থই-থই নাচতে নাচতে ছুটে চলে। উত্তরের স্রোত গিয়ে পড়ে শোণ নদীতে। গোদাবরীতে যায় দক্ষিণের স্রোত। পূর্বের স্রোত পুষ্ট করে মহানদীকে। আর পশ্চিমের স্রোত প্রবাহিত হয় নর্মদায়।

অসাধারণ পুণ্যক্ষেত্র এই অমরকণ্টক।

সামনে একটি বাঁধানো জলাধার। তার থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়েছে একটি ঝরনা। ওই ঝরনাই নদী নর্মদার উৎস।

জলাধার ঘিরে মন্দির। ভক্তদের স্তোত্রপাঠ, ভজন-আরতির ঘণ্টাধ্বনি, সব মিলে মেলা-প্রাঙ্গণ প্রাণচঞ্চল।

ধুনি জ্বলছে সারা প্রান্তর জুড়ে। পাঠ আর ভজনগানে শব্দিত আকাশ-বাতাস।

বান্‌জারার দল মন্দিরের পুরোহিত্কে নিবেদন করেছে কয়েক ঘড়া ঘৃত, দুধ আর সদ্য কাটানো টাটকা ছানা।

এই সব উপহার পেয়ে দারুণ খুশি প্রধান পুরোহিত।

নায়েক হরদয়াল ঝুম্‌কির নামে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করেছে। সারারাত ধরে চলেছে পুজো। জেগে আছে পান্নাবাঈ ঝুম্‌কিকে কোলে নিয়ে। তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে জল টপটপ করে ঝরে পড়ছে ঘুমন্ত ঝুম্‌কির মাথায়।

শেষ রাতে সমাপ্তি পুজো। সারারাত জাগরণে, দেবার্চনায় কেটেছে যাত্রীদের। এখন সবাই বসেছে সমাপ্তি পূজা দর্শনে মূল মন্দিরচত্বরে।

পুজো দেখে সমস্ত মন ভরে উঠেছে বান্‌জারাদের।

পরদিন তাঁবু উঠল। মালবাহী বলদের পিঠে চাপানো হলো সেগুলো। আগের মতো ঠিক তেমনি সারি দিয়ে চলতে লাগল বান্‌জারাদের টাণ্ডা।

মেলায় উপস্থিত ভক্তরা দেখতে লাগল এই অপূর্ব রঙিন সমারোহপূর্ণ চলচ্ছবি।

রায়পুর থেকে জব্বলপুর গিয়েছিল ওরা। জব্বলপুর থেকে ভোপাল, ইন্দোর করে প্রায় সারাটা মধ্যপ্রদেশ ঘুরতে লাগল ওরা।

এই মধ্যপ্রদেশেই ঘুরতে ঘুরতে ওরা কাটিয়ে দিলে পাঁচ-সাতটা বছর।

এখন ঝুম্‌কি পা দিয়েছে এগারো বছরে। এই বয়সেই যেমন বাড়বাড়ন্ত শরীর তেমনি তার নয়নভোলানো রূপ।

ঝুম্‌কির চেয়ে কিছু বড় যেসব ছেলেমেয়ে, তারা আজকাল ওর কথা মেনে চলে। ভালোবাসা দিয়ে সবার মন কেড়ে নিয়েছে ঝুম্‌কি।

ও নাচ শিখেছে রূপমতীর কাছ থেকে। সে এখন নাচে-গানে সবার সেরা। গলায় তার পাপিয়ার তান।

জ্যোৎস্না রাতে সে যখন সাদা পোশাক পরে নাচে তখন তাকে আকাশপরী বলে মনে হয়।

তার কিশোরী দেহে বনফুলের সুবাস। আজকাল তার চুল চূড়া করে বেঁধে দেয় রূপমতী। দুটি গুচ্ছ গালের দু'দিক দিয়ে সামনে এসে পড়ে। পেছনের বিনুনিতে রুপোর একসারি ছোট্ট ঘুন্‌টি।

নাচের সময় ওর রুপোর তোড়িয়া থেকে ভারী চমৎকার রুমঝুম আওয়াজ ওঠে।

কখনও কখনও তাকে কিশোর কৃষ্ণ সাজিয়ে আর সব ছেলেমেয়েরা মণ্ডলী রচনা করে নাচে।

ওরা হোলির নাচ নাচে সার্বজনিক পা ফেলে, সবার কোমর জড়িয়ে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচে।

দুর্গা উৎসবেও ওরা নাচে তিপ্‌রি নাচ। হাতে থাকে ছোট ছোট কাঠি। পরস্পর সেই কাঠি বাজিয়ে বাজিয়ে নাচে।

তেজ উৎসবে ওরা নাচে লঙ্‌দি পায়ে। তখন পা পড়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে।

দাফ্‌দি, থোলি, ঝাঁঝ, নাগরা, দোদ্‌পাই এই সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ওরা— নাচের আসর জমায়।

কেবল মেয়েদের নাচের সময় টাণ্ডা বাজাতে শোনা যায়।

কখনও বা মাথায় দইয়ের ভাঁড় নিয়ে
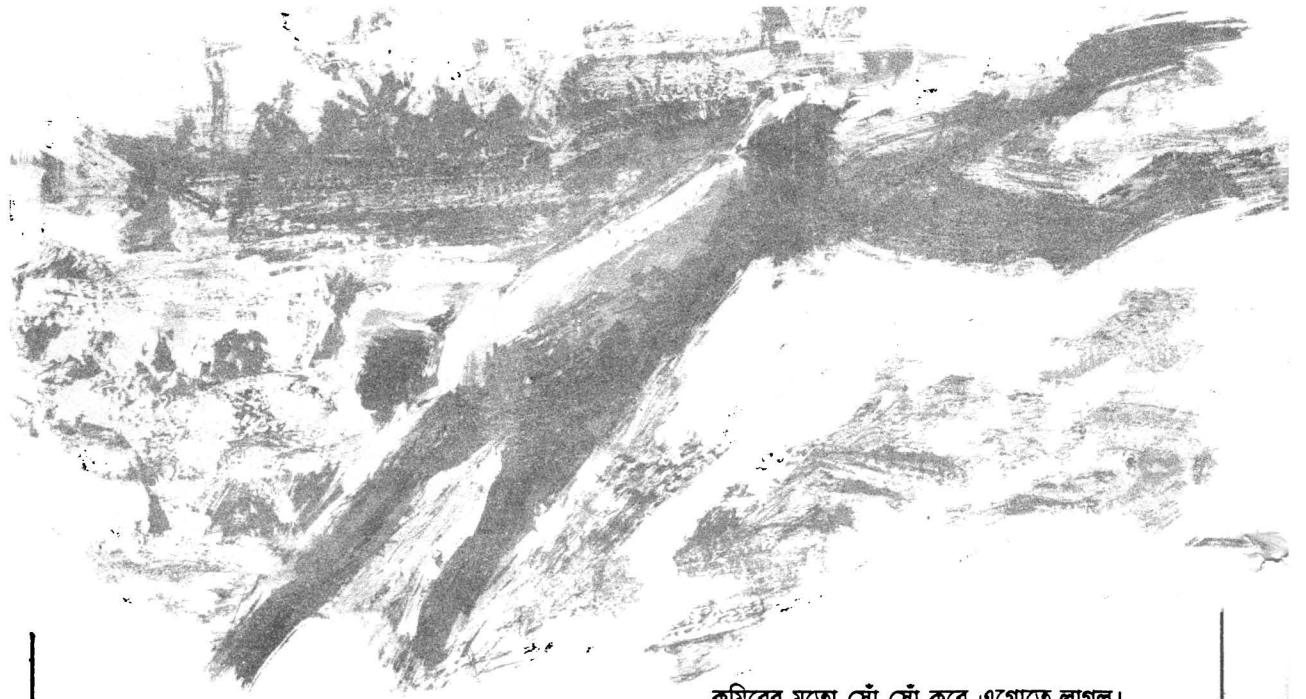
কুমিরের মতো সোঁ সোঁ করে এগোতে লাগল।

ঝুমকি মথুরার দিকে যাত্রা করে। সুরেলা গলায় তার মথুরা যাত্রার গান ঃ

'রুমঝুম রুমঝুম চলি মথুরান,
শির পর দহির মাঠ, ভাই-ভাইরে
শির পর দহির মাঠ,
ছোদর কৃষ্ণ ছোদর মুরারি
যায়দ মথুরাউ।'

সে চলেছে মথুরায়। রুমঝুম আওয়াজ তুলে বাজছে তার ঘুঙুরো। তার মাথায় দইয়ের ভাঁড়। সে মিনতি করে বলছে, ওহে মুরারি, আমাকে মথুরায় যেতে দাও, আমার পথ আগলে থেকো না।

কাজল-তেজ উৎসব শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। এ অনুষ্ঠান কেবল কিশোরীদের। আটদিন ধরে চলে এ উৎসব। উৎসবের আগে মেয়েরা যায় নায়েকের কাছে। তার অনুমতি নিয়ে তারা তেজ উৎসবের সূচনা করে।

অবিবাহিত মেয়েরা একটা গাছের তলায় গিয়ে সাতবার পাক দেয়। ছেলেরা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে। পরে মেয়েরা কিছু মাটি সংগ্রহ করে ছোট ছোট বাঁশের তৈরি বাক্সে ভরে দেয়। তারপর তার ওপর গমের বীজ ছড়ায়।

বীজ বোন্যার পর সপ্তম দিনে একটা উৎসব হয়, যাকে বলে, থামোলি। সেই উৎসবের পর সবাইকে প্রসাদ বিলি করা হয়।

নবম দিনে 'গাঙ্গুর' আর 'সামন্ত' নামে দুটি ছোট্ট মূর্তি তৈরি হয় এবং কিশোরীরা সারারাত ধরে তার পুজো করে। ভোরবেলা তেজকে ভেঙে দেওয়া হয়। গম থেকে যে অঙ্কুর বেরোয় সেগুলিই সবাইকে বিতরণ করে কুমারী কন্যারা।

বান্‌জারাদের উৎসবের শেষ নেই। তেজ, দশেরা, হোলি, আরও কত উৎসব। দেবতাদের ভেতর কান্‌হোবা (কৃষ্ণ), বালাজী, জগদম্বা দেবী, মহাদেব, খাণ্ডোবা, সামকি মাতা, হনুমান, সতী আয়ি, সেবা ভায়া, মিঠু ভুখিয়া, এমনি আরও কত দেব-দেবী। তা ছাড়া বনচারীদের বনজারী দেবী তো আছেনই।

এমনি গানে-নাচে, পূজা-পার্বণে বান্‌জারাদের আনন্দ বনপুষ্পের মতো ফুটে ওঠে।

পথ চলতে.চলতে কিন্তু সন্ধ্যার আসরে পুরনো দিনের গল্প বলা থামে না হরদয়ালের। তার গল্পের শ্রোতা কেবল তরুণ-কিশোররাই নয়, টাণ্ডার মেয়ে-পুরুষ, সব কজন সদস্যই।

প্রথমবার জব্বলপুরের মেলায় নাচ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে নাম কিনেছিল নায়েক হরদয়ালের টাণ্ডার ছেলেমেয়েরা। পরের বছর আসার জন্য আগাম আমন্ত্রণও পেয়েছিল তারা। কিন্তু ভবঘুরে মানুষদের জীবন সংসারী মানুষদের মতো ছকে বাঁধা নয় বলে তারা ভবিষ্যতের জন্য কাউকে কোনও কথা দিতে পারে না। হরদয়ালও দেয়নি। কিন্তু বছর সাতেক পরে সে ঘুরতে ঘুরতে আবার এসেছে সেই জব্বলপুরে তার দলবল নিয়ে।

এ সময় অবশ্য মেলার নামগন্ধ নেই। তবু তারা এসে ডেরা ফেলেছে নর্মদার কূলে, পাহাড় আর জঙ্গলের কোলে।

শহরে ঘি আর ছানা বিক্রি করতে গিয়ে একদিন চোখে পড়ে গেল মেলা কমিটির কর্তার। ছেলেগুলো বড় হয়ে গেলে কি হবে, ঠিক তাদের চিনে নিয়েছেন ঐ হুঁশিয়ার মানুষটি।

কি খবর ! এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা ?

উঠতি বয়সের ছেলেগুলো কিন্তু চিনতে পারল না মানুষটিকে।

ওদের একজন বলল, ঘি নেবেন বাবু সাহেব, ঘি ? শুঁকে দেখুন হাতে ঘষে। ছানাও আছে, দেখুন মুখে ফেলে সোয়াদ

কি রকম।

মানুষটি বললেন, নেব নেব, সব নেব, কিন্তু তোমরা এতদিন কেমন ছিলে বল ? সেই যখন তোমরা আট দশ বছরের ছিলে তখন তোমাদের দেখেছি। মেলায় কি নাচই না তোমরা নেচেছিলে ! সঙ্গে সেই মনমাতানো গান ! তোমাদের নায়েক হরদয়াল কোথায় ?

এতক্ষণে ছেলেরা বুঝল, তাদের নাড়ি-নক্ষত্র সবই ভদ্রলোকটির নখদর্পণে।

ওদের সর্দার ভাটুরি বলল, নায়েক এসে দেখা করে যাবেন আপনার সঙ্গে। কিন্তু দেখাটা হবে কোথায় ?

মিলিটারি ব্যারাক পেরিয়ে ডানদিকের প্রথম বাড়িটা আমার।

ফিরে গিয়ে নায়েককে বলে দেব।

আমার নামটা এখনও বলা হয়নি তোমাদের।

ওরা এবার জিজ্ঞাসু চোখ মেলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মোহনলাল মুন্দ্রা। হরদয়ালকে আমার নামটা বললেই আশা করি চিনতে পারবে।

বান্জারা যুবকরা নত হয়ে নমস্কার করে চলে যাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক বললেন, কই ঘি দিয়ে যাও ?

কানাইয়া বলল, আপনি কৃপা করে আমাদের নায়েকের হাত থেকেই ঘি-টা নেবেন।

ওরা ডেরার দিকে চলে গেল।

হরদয়াল ছেলেদের মুখে সব ঘটনা শুনে বলল, বাবুসাহেব কেবল পয়সাওলা আদমী নয়, বহুৎ বড়া দিলবালা আদমী। আজ সাঁঝবেলা ওনার সাথে দেখা করে আসব।

সাঁঝ নামল। দিক ভাসল চাঁদের আলোয়। ছেলেমেয়েরা রোজকার মতো আসর জমিয়ে বসল।

কাঁধে বর্শাখানা ঠেকিয়ে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলল হরদয়াল। মুন্দ্রাসাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ করার জন্যে সে এখন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

ব্যারাক পেরিয়ে সামান্য এগিয়েই হরদয়াল থমকে দাঁড়াল।

ঐ তো ডানদিকে প্রথম বাড়ি।

আরেব্বাস ! বাড়ি নয় তো, প্রাসাদ। তিনতলা পেল্লাই চকমেলানো বাড়ি। ভেতরে আলো জ্বলছিল। সিং-দরজার ঠিক ভেতরে বিরাট উঠোনের দুদিকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট দুটো ম্যাগনোলিয়া গাছ। চাঁদের দুধসাদা আলোয় তাদের গাঢ় সবুজ পাতা আর শ্বেত পদ্মের মতো ফুল দেখা যাচ্ছিল।

লোহার গেটের ভেতর একটা টুলের ওপর বসেছিল দরোয়ান। হাতে বন্দুক।

হরদয়াল এগিয়ে গেল। পাথুরে রাস্তায় মোটা সুকতলাওয়ালা নাগ্‌রার ঠোক্করে যে আওয়াজ উঠছিল তাতেই সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল দরোয়ান।

গেটের বাইরে চোমরানো গোঁফওয়ালা আধবয়সী একটা লোককে অদ্ভুত পোশাক পরা অবস্থায় কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দরোয়ান গম্ভীর গলায় বলল, কৌন হ্যায় ?

উত্তর এলো, মোহনলালজীকো সেলাম ভেজো, হরদয়াল আ গিয়া।

গেট না খুলেই দরোয়ান ভেতরে ঢুকে গেল। কিছু পরে ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল, আইয়ে।

হরদয়াল দরোয়ানের পেছনে পেছনে মূল বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

বাইরের দেওয়ালে বর্শাটা ঠেকিয়ে রেখে সে ভেতরে ঢুকে সেলাম জানাবার আগেই তার দিকে এগিয়ে এলেন মুন্দ্রাসাহেব।

দুটো হাত ধরে তাকে একটা সোফায় বসাতে গেলেন কিন্তু কিছুতেই সে সোফায় বসল না। শেষে মেঝের ওপর পাতা কার্পেটের এক কোণে বসে পড়ল। মোহনলালবাবুও একটু দূরে কার্পেটের ওপর বসলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর মোহনলালবাবু বললেন, এখন মেলার সময় নয়, কিন্তু আমি তোমার ছেলেমেয়েদের নাচগান দেখতে চাই। আমার এ বাড়ির পেছনে একটা বড় বাগান আছে। বাগানের চারদিকে সবুজ গাছপালা, মাঝখানে অনেক বড় ঘাসে ছাওয়া জমিন। তার ভেতর ফোয়ারা আছে। ফোয়ারার জলে আলো পড়লে ভারী সুন্দর রঙ খেলে। খুব ভালো লাগবে তোমাদের। ওখানেই আমি তোমাদের নাচগানের আসর বসাব।

হরদয়াল বলল, সে তো বহুত খুশির খবর বাবুসাহেব।

হঠাৎ হরদয়ালের চোখ আটকে গেল পাশের ঘরে একটা মূর্তির ওপর।

খোলা জানলার গরাদের ভেতর দিয়ে দেখা গেল ঘরের ভেতর হালকা সবুজের আভা লাগা একটা আলো জ্বলছে। সেখানে হরিণের চামড়ায় পদ্মাসনে বসে রয়েছেন একটি মানুষ। পরনে ছোট একটা ধুতি। ঊর্ধ্ব অঙ্গে কোনও বাস নেই। অতি সুঠাম ফর্সা সুন্দর চেহারা।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল হরদয়ালের !

এ তো সেই দেওতা, যিনি তার ঝুম্‌কি আর পান্নাবাঈকে সাত বছর আগে নর্মদার স্রোত থেকে তুলে এনেছিলেন।

কিন্তু তিনি এখানে এলেন কি করে !

হরদয়ালকে পাশের ঘরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখে মোহনলালজী নিজের থেকেই বললেন, ও আমার চাচাতো ভাই। নিজের সাগা ভাইয়ের চেয়েও অনেক বড়। ওর কথা বলে শেষ করা যাবে না।

হরদয়াল বলল, উনি দেওতা।

মোহনলালজী বললেন, তুমি কি ওকে জানো !

ওঁকে আমি দুবার দু'জায়গায় দেখেছি।

কি রকম ?

ধোঁয়াধার জলপ্রপাতে ওঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি দু'দুবার। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছি জলের ওই গভীর কুণ্ড থেকে উঠে আসতে দেখে !

মৃদু মৃদু হাসছিলেন মোহনলালজী। পরে বললেন, তোমরা কেবল দু'বারই দেখেছ কিন্তু পুরো দশটা বছর ধরে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব কটা ঋতুতেই ও প্রতিদিন অন্তত চার-পাঁচবার মা নর্মদার কুণ্ডে ঝাঁপ

দিচ্ছে।

কিন্তু কেন বাবুসাহেব ? প্রাণ নিয়ে এমন খেলা উনি খেলছেন কেন ?

একটু থেমে হরদয়াল আবার বলল, সাত বছর আগে আমি যখন এসেছিলাম তখন নৌকো চেপে ঘুরেছিলাম নর্মদা নদীতে। হঠাৎ নৌকো টলে উঠতে আমার চার বছরের মেয়ে ঝুম্‌কি জলে পড়ে যায়। তারপর মাও মেয়েকে ধরতে জলে ঝাঁপ দেয়।

মোহনলালজী সবিস্ময়ে বললেন, সেখানে তো প্রবল স্রোত, বাঁচল কি করে !

হরদয়াল পাশের জানালার দিকে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, সেদিন ওই সাহেবই আমার বউ আর বাচ্চাকে জল থেকে তুলে এনেছিলেন।

মোহনলাল বললেন, ও বড় চাপা। পরের উপকার করলেও সেকথা কোনওদিন কাউকে মুখ ফুটে বলে না। আমি জানতামই না।

আমার গোস্তাকি মাপ করবেন। ওঁকে দেখে মনে হয় উনি একজন সাধু মানুষ। উনি কি সংসারধর্ম করেননি ?

মোহনলালজীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, না, তাঁর ভাইটি সংসারধর্ম করেনি।

হরদয়াল বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু এত অর্থ, এত রূপ !

মোহনলালজী বললেন, তোমার এখন কি সময় আছে, না তুমি এখুনি দলে ফিরে যাবে ?

হরদয়াল সসঙ্কোচে বলল, একথা কেন বাবুসাহেব, আপনার দামী সময় নিয়ে নিচ্ছি না তো ?

না, না, একেবারেই না। তোমার সময় থাকলে ওই বাবুজীর কথা তোমাকে শোনাতাম।

সে তো খুব খুশির বাত বাবুসাহেব।

মোহনলালজী বললেন, তবে চলো, বাড়ির ছাদের ওপর যাই। সেখানে সতরঞ্চ পাতা আছে। চাঁদের আলোয় বসে তোমা[illegible] বহুত পুরানা এক কাহিনী শোনাব।

মোহনলালজীর সঙ্গে সঙ্গে হরদয়াল উঠে দাঁড়াল।

আলোকিত চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওরা দুজনে ওপরে উঠে গেল।

এবার সতরঞ্চে মুখোমুখি বসল দুজনে।

নীলাকাশে চতুর্দশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার ঢেউ তুলেছে।

মোহনলালজী শুরু করলেন কাহিনীঃ

।। তিন ।।

তুমি ঠগীদের নাম শুনেছ হরদয়াল ?

শুনব না বাবুসাহেব! খুনখারাপি নিয়েই তো ছিল ওদের কারবার।

ঠিক বলেছ। একসময় সারা ভারত জুড়ে ছিল ওদের কারবার। প্রতিবছর কত সহস্র মানুষ যে ওই ঠগীদের হাতে প্রাণ দিয়েছে তা লেখাজোখা নেই।

মোহনলালজী একটু থেমে বললেন, মানুষ যেমন সংসার প্রতিপালনের জন্য দোকানপাট, কাজকারবার করে, এদেরও ছিল তেমনি ঠগী-ব্যবসা।

ওরা ওই ব্যবসাটাকে কোনওরকম ঘৃণার কাজ বলে মনে করত না। ওটা ছিল ওদের কাছে আর পাঁচটা কাজের মতো একটা কাজ।

হরদয়াল বিস্মিত হয়ে বলল, ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে গিয়ে ওদের মনে কি কোনওরকম আঁচড় লাগত না ?

আমি যতটুকু জেনেছি ওরা ও কাজকে সাধারণভাবে মাটি কোপানো কাজের মতোই মনে করত। এমনকি বাড়ির ছেলেদেরও ছোটবেলা থেকেই এসব কাজে পাকা করে তুলত। ঠগীরা যখন বাড়িতে থাকত তখন কেউ আঁচও করতে পারত না সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের এতটা তফাৎ। তারা ঘর ছাইত, মাছ ধরত, লাঙ্গল দিত মাঠে। একেবারে শান্ত, নিরীহ গাঁয়ের মানুষটি।

হরদয়াল বলল, বড় তাজ্জব !

মোহনলালজী বললেন, বর্ষাকালে সাধারণত ওরা বেরোত না।

শীতকালে যখন ফসল তোলা হয়ে যেত, শুকনো ঠকঠকে হয়ে যেত মাঠঘাট তখন ওরা মা ভবানীর পুজো দিয়ে বেরিয়ে যেত কাজে।

হরদয়াল বলল, খুনের কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেবীর পুজো করত কেন ?

ওদের ধারণা, মা ওদের এই রোজগারের কাজে আশীর্বাদ করবেন।

এ ব্যাপারটা আমার মগজে ঢুকছে না বাবুসাহেব।

দেখ, যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। আমার ধারণা, ঠাকুর-দেবতার এখানে করণীয় কিছু নেই। মানুষই ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে।

বাবুজী, এখন আপনার ভাইয়ের কথা শুনতে দিল চাইছে। তাঁর কথাই বলুন।

অনেককাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণগোপাল মুন্দ্রা এই অঞ্চলের নামকরা এক জমিদার ছিলেন। মানুষটি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তীর্থমুখী ছিল তাঁর মন।

জমিদার কৃষ্ণগোপালের দুটি বিয়ে। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি করে পুত্রসন্তান। প্রথম স্ত্রী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘোরতর সংসারী।

প্রথম স্ত্রীকে নিয়েই কৃষ্ণগোপাল তীর্থভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী দেওয়ানজীর সঙ্গে পরামর্শ করে জমিদারির কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

একদিন দেওয়ান ছোট রানীমার সঙ্গে গোপন পরামর্শে বসলেন। পরামর্শটা কি তা শুনলে তুমি অবাক হবে।

হরদয়াল বলল, তা কি এমন পরামর্শ বাবুসাহেব?

মোহনলালজী বললেন, সেসময় বহু রাজা, জমিদার আর ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ছিল ঠগীদের সঙ্গে। তাঁরা ওই-সব খুনীদের নানাভাবে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতেন।

বিস্মিত হয়ে হরদয়াল জিজ্ঞেস করল, কিন্তু খুনীদের এভাবে আড়াল করার কারণ ?

বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে জমিদার

ব্যবসায়ীরা তাদের এলাকার ঠগীদেব আড়াল করে রাখত বলে তাদের রোজগারের ওপর একটা বখরা পেত। সে অর্থের পরিমাণটা কিন্তু খুব কম নয়।

বাবুসাহেব, ঠগীরা সাধারণত কাদের শিকার করত ?

তীর্থযাত্রীদের ওপর তাদের সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য ছিল। তারপর বিত্তবান মানুষজন, সরকারী খাজনাবাহক ইত্যাদি।

তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করতে ওদের একটু ডর লাগত না ?

কিসের ডর ?

তীর্থদেওতার। তাঁর অভিশাপের ভয় করত না ওরা ?

ওরা মনে করত, দেবী ভবানীই সব দেবদেবীর ওপরে। একবার তাঁর পূজা করে অনুমতি নিয়ে নিলে আর কোনওদিকে তাকাবার দরকার নেই।

মোহনলাল বলে চললেন, সেকালে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা দেবদর্শনে বেরিয়ে পড়ত। গ্রামের মানুষেরা জানত তিন-চার মাসের আগে এরা ফিরবে না। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও অধিকাংশ যাত্রীকে আর ফিরে আসতে দেখা যেত না।

কেন বাবুসাহেব ?

ঠগীরা পথে ওদের টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি এমনকি প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নিত।

একটু থেমে বললেন, ঠগীদের কারবার ছিল চতুর্বুদ্ধি দিয়ে সাজানো। তাদের ফেলা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

এখন তোমাকে তাদের কাজকর্মের একটা নকশা এঁকে দিচ্ছি।

হরদয়াল শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে মোহনলালজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রথমেই ওদের চরের কথা বলি। তাদের বলে, তিলহাই। তারা চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে, এমনকি বড় বড় গাছের ওপর চড়ে যাত্রীদের সন্ধান করে বেড়ায়।

শাঁসালো যাত্রী চিনতে তাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

একজন চলে যায় মূল আখড়ায় খবরটা পৌঁছে দিতে। অন্য দু-চারজন সাধারণ পথিক সেজে ওই যাত্রী দলের সঙ্গে মিশে যায়। আলাপ জমানোতে ওরা খুবই ওস্তাদ।

ওরা কখনও বা কোনও নিষেধ না শুনে তীর্থযাত্রীদের বোঝা বয়ে দেয়। বাধা দিলে বলে, এ বড় পুণ্যকর্ম, দয়া করে প্রভুর কৃপা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

এমনিভাবে পথ চলতে ওদের বিশ্বাস অর্জন করে তিলহাইরা।

ওরা জানে, এ পথে কোন জায়গায় সন্ধ্যা ঘনাবে এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতে হবে যাত্রীদের।

দলে আগাম খবর দিয়েছে যে সব তিলহাই তারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে ওই তীর্থযাত্রীদের দলটিকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য।

হয়তো একটা বড় গাছের তলায় তাঁবু ফেলে বসে গেছে সবাই। তাঁবুর বাইরে আসর পাতা, ভজনগানে মেতে উঠেছে ঠগীর দল।

সর্দারের আগেই জানা হয়ে গেছে যাত্রীদলে কতজন মানুষ আছে। সেইমতো তারা তাঁবুও টাঙিয়ে রেখেছে।

দলে সাতজন তীর্থযাত্রী থাকলে আগেভাগেই একটু দূরে ওরা সাতখানা কবর খুঁড়ে রাখে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এতখানি পথ হেঁটে আসার ফলে ক্লান্ত হয়েছে তীর্থযাত্রীদের শরীরগুলো। এখন তারা একটুখানি বিশ্রামের জন্য উন্মুখ।

গাছতলা থেকে সান্ধ্য ভজনের সুর কানে এসে বড় তৃপ্তি দিচ্ছে তীর্থযাত্রীদের।

পথে যে সব তিলহাই ওদের সঙ্গে যাত্রী সেজে এসেছিল তারা ওদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে গাছতলার মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা-বলার অভিনয় করে ওরা আবার ফিরে এল ওই তীর্থযাত্রীদের কাছে।

এবার তাদের সঙ্গে গাছতলার দু-একটি মানুষ। পরম বৈষ্ণবের মতো মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আগত তিলহাইরা যাত্রীদের বুঝিয়ে বলল, এনারা আজ রাতে আপনাদের সেবা করতে চান।

অমনি গাছতলা থেকে আসা দুটি মানুষ আরও অনেকখানি মাথা নত করে বিনীত গলায় বলল, আমরাও আপনাদের মতো 'কাওারিয়া মহাদেও' দর্শনে চলেছি। আসুন, আজ রাতটা আমরা একসঙ্গে কাটাই। রাতে আমাদের সেবাটুকু গ্রহণ করলে আমরা কেতাত্থ হব। পরের দিন সকালে একই পথে যাত্রা শুরু হবে আমাদের। সেদিন অপরাহ্ণে আমরা আবার আপনাদের অতিথি হব।

ওদের ভেতর আর একজন বললে, পথে-ঘাটে যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, ঠগীর উপদ্রব তাতে দলে ভারী হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

তীর্থযাত্রীরা একবাক্যে বলে উঠল, সত্যি, মহাদেবই আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা সকলেই এখন থেকে বন্ধু আর সহযাত্রী। চলুন, আপনাদের ডেরায় যাই।

এমন আমন্ত্রণ বড় ভাগ্যে জোটে। ক্লান্ত শরীরে রান্নাবান্নার বালাই নেই। ভজন-গান শোনা আর রাতের ভোজন তারপর রাতের মতো নিদ্রার কোলে ঢলে পড়া।

দলটি তাঁবুর কাছে যেতেই গান থেমে গেল। হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল সবাই। অতিথি নয়তো, নারায়ণ। তাদের সভক্তি আবাহন করতে হয়।

অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল, সন্ধ্যা নামতে না নামতেই বড় ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। চলুন, তাঁবুর ভেতরে আসর জমাই।

বিরাট তাঁবু। তার ভেতর পুরোটাই খড় বিছিয়ে সতরঞ্চ পাতা।-একেবারে মাঝখানে বসেছে গানের দল। শ্রোতারা

চারদিকে ঘিরে অতিথিদের সারি দিয়ে একঠাঁই বসানো হয়েছে।

ভজনে যখন মাতন লেগেছে তখন তীর্থযাত্রীরা গভীর আবেগ নিয়ে শুনছে সেই গান। পরিবেশে বইছে একটা ধর্মের হাওয়া।

হঠাৎ 'ঝিরণী' উঠল।

হরদয়াল জিজ্ঞেস করল, 'ঝিরণী' ব্যাপারটা কি বাবুসাহেব ?

ঠগীদের ধর্মে আছে, কোনও মানুষকে অসতর্ক মুহূর্তে ফাঁস পরাতে নেই। ঘুমন্ত মানুষকে 'সিক্কা' বা ফাঁস পরাতে গেলে হঠাৎ সাপ, সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠতে হয়। ঘুমজড়ানো চোখে তারা জেগে উঠতে না উঠতেই গলায় আটকে যায় ফাঁস।

এখন যারা মগ্ন হয়ে ভজন শুনছিল তারা বিছে, বিছে শব্দ শুনে চমকে উঠল। তাদের সাতজনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সাতটি 'ভুকোত'। ওদের প্রত্যেকের হাতে এক টুকরো করে হলুদ কাপড়। কাপড়ের এক কোণে একটা আস্ত টাকা বাঁধা । 'ভুকোত'রা ওইটা তীর্থযাত্রীদের গলার কাছে এনে মুহূর্তে এমন প্যাঁচ দিয়ে দেয় যে দমটা বন্ধ হয়ে আসে। ধস্তাধস্তির আগেই পায়ের ধাক্কায় পথিককে মাটিতে ফেলে দেয় 'চুমিয়া'রা আর হাতগুলো চেপে ধরে 'সামসিরিয়া'রা।

কয়েক পলকের ভেতর হাসিল হয়ে যায় কাজ। তখন 'ভোজা' আর 'পুথাওয়া' মিলে শবগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় কবরের জায়গায়।

ভালোভাবে কবর দিয়ে মাটি চাপা দেয় ঘাসের চাবড়া বসিয়ে।

তুমি অবাক হয়ে যাবে হরদয়াল ! ওই কবরের ওপর সতরঞ্চ বিছিয়ে গুড়ের শরবত খাবে ঠগীরা। এতে নাকি দেহে শক্তি সঞ্চার হয়।

এর পর হতভাগ্যদের জিনিসপত্র, অর্থ সবই ভাগাভাগি হয়ে যায় নিজেদের ভেতর। অর্থের একটা অংশ পায় জমিনদার বা ব্যবসাদাররা। তারাই আবার কোতোয়ালিতে কিছু টাকা দিয়ে কোতোয়ালের মুখ বন্ধ করে দেয়।

হরদয়াল পাশের ঘরের ওই দেবোপম লোকটির কথা ভোলেনি। সে বলল, এবার বলুন সাহেব, আপনার ভায়ের কথা।

মোহনলাল এবার আসল কাহিনীতে এলেন।

আমাদের পূর্বপুরুষ সেই পিতামহ, পিতামহী তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণগোপাল জানতেনই না তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী দেওয়ানের পরামর্শে ঠগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন আর সেই গোপন পথে বিপুল অর্থসমাগম হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর।

আশ্চর্য স্ত্রীর নামটিও ছিল কৈকেয়ী দেবী। দেওয়ান তাকে পুরোপুরি জমিদারির তক্তে বসাবার জন্যে নায়েবের সঙ্গে যোগসাজশ করে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

এবার নায়েব সরাসরি যোগাযোগ করল ঠগীদের সঙ্গে।

জমিদার কৃষ্ণগোপাল এই তীর্থযাত্রায় তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্রটিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

বিষধর সাপের মতো বনজঙ্গল পর্বত চিরে ঠগীরা কৃষ্ণগোপাল আর তাঁর স্ত্রী পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল।

কৃষ্ণগোপালদের সঙ্গে ছিল তিনটি বলশালী লোক। তারা বাক্সপ্যাটরা মাথায় নিয়ে চলেছিল। গয়নাগাঁটি না থাকলেও কতকগুলো হীরে সঙ্গে নিয়েছিলেন কৃষ্ণগোপাল, দেবস্থানে নিবেদন করবার জন্যে। তা ছাড়া পথের খরচের জন্য বেশকিছু মোহরও সঙ্গে ছিল।

ধর্মপ্রাণ মানুষটি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি তাঁরই ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে একটা বিষধর সাপ।

অনেক দূর পর্যন্ত তাঁদের ছোট্ট দলটাকে সাপের বিষাক্ত দৃষ্টি অনুসরণ করছিল।

অবশেষে এ দুনিয়ার নৃশংস খুনীরা দুজন ধর্মপ্রাণ স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের বালক পুত্রটিকে ধরে ফেলল।

সেই আপ্যায়ন, সেই অভ্যর্থনার ঘটা। ওই বলশালী তল্পিবাহকগুলিও ছিল মারাত্মক ঠগী দলটির তিলহাই। ওদেরকে জব্বলপুর থেকেই যোগাড় করে দিয়েছিল নায়েব।

এদের সঙ্গে ছিল এক একটা মোটা বাঁশের সড়কি।

হরদয়াল জানতে চাইল, ওই মোটবাহক 'তিলহাই'রা তো সড়কির ঘায়ে ওদের মেরে ফেলতে পারত। অতদূর নিয়ে যাওয়ার দরকার কি ছিল।

মোহনলাল বললেন, হয়তো খুন করা সম্ভব হতো, কিন্তু মৃতদেহগুলোকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। তা ছাড়া ঠগীদের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—যার যে কাজ, কেবল সেই কাজটুকুই তাকে করতে হবে। 'তিলহাই'রা খবর সংগ্রহ করবে এবং যাত্রীদের পৌঁছে দেবে যথাস্থানে অর্থাৎ বধ্যভূমিতে।

তারপর ?

শেষ রাতে তেমনি 'ঝিরণী' উঠেছিল। শয্যার পাশে কেউ যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল সাপ, সাপ বলে।

ধড়ফড় করে ঘুমজড়ানো চোখে ওরা উঠে বসেছিল বিছানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে এগিয়ে এসেছিল তিনটি নরঘাতক 'ভুকোত'।

ঝলসে উঠেছিল হলুদ কাপড়গুলো। হাতের কসরতিতে প্যাঁচ লেগে গিয়েছিল টাকায়। তিনটে দেহকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল চুমিয়ারা। নিয়মমতো হাতগুলো চেপে ধরেছিল তিনজন সামসিরিয়া।

ভোর হওয়ার আগেই আলোর পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তারা কবরের তলায়। আর কোনওদিন তাদের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কৃষ্ণগোপালের দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকেয়ীর। তার পুত্রই পেয়েছিল জব্বলপুরের এই জমিদারীর পূর্ণ অধিকার।

এর সঙ্গে আপনার দেবপ্রতিম ভাইটির সম্পর্ক কি বাবুসাহেব ?

আমরা জমিদার কৃষ্ণগোপালের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশধর।

বাবুসাহেব কিছু যদি মনে না করেন, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে।

বল না, মন খুলে বলো। কোনও সংকোচের কারণ নেই।

কৃষ্ণগোপালজীর পরিবারের এই সব কথা বা তাদের খুনের ঘটনা আপনারা জানলেন কি করে ?

মোহনলালজী বললেন, ঠিক ওইসময় ইংরাজদের একজন দক্ষ শাসকের ওপর ভার পড়ে ঠগী দমনের। তাঁর নাম ছিল শ্লিম্যান।

তিনি সারা ভারতে জাল ফেলে ছেঁকে তোলেন ঠগীদের। তাদের ভেতর বহু ঠগীকে এই জব্বলপুরের জেলে আটক করা হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলো ইংরাজ সরকার নথিভুক্ত করে রেখেছিল।

আমার ওই ভাইটি তার প্রথম জীবনে ওইখানে কাজ করত। সে নথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওই পুরোনো দিনের কাহিনীগুলো জানতে পারে।

কৃষ্ণগোপালের মালবাহক ওই 'তিলহাইয়া'দের জবানবন্দী থেকে মায়ের আর কৈকেয়ী দেবীর ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায়।

এই সব তথ্য জানার পর আমার ভাইয়ের মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। তার ধারণা হয়, তার দেহে পাপের রক্ত আছে। তাই সে তার পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য বারে বারে ওই খরস্রোতা নর্মদার জলে ঝাঁপ দেয়। তার মনে হয়েছে, এতে যদি তার মৃত্যুও হয় তা হলেও সে এ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

সেদিন অনেক রাতে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে টাঙায় ফিরে এসেছিল হরদয়াল।

দু-চারদিনের ভেতরেই হরদয়ালের কাছে লোক পাঠালেন মোহনলালজী।

একটা নির্দিষ্ট দিনে তার নাচ-গানের দলটিকে নিয়ে আসতে হবে মোহনলালজীর বাড়িতে।

যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজির হলো হরদয়াল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আলোর মালায় সেজে উঠল মোহনলালজীর বাগান। গাছগুলোর ভেতর ঝলমল করতে লাগল নানারঙের টুনীবালব্।

বড় বড় ফ্লাড লাইটের আলো চারদিক থেকে এসে পড়ছিল সবুজ ঘাসে ভরা জমিতে। ফোয়ারায় সৃষ্টি হচ্ছিল ইন্দ্রধনুর খেলা। এই মায়াময় পরিবেশে শুরু হয়ে গেল নাচগান।

যেন নন্দনকানন জুড়ে নাচছে দেবকন্যা, দেববালকেরা।

যন্ত্রসঙ্গীত আর গানের সুরের মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস ঝঙ্কৃত।

এবার শুধু গান-নাচ নয়, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালার কিছু কিছু অংশ নাটকের ভেতর দিয়ে দেখানো হলো।

দ্রৌপদীর অভিনয়, সীতার অভিনয় এমনকি অষ্টসখীর নাচে রাধার অভিনয় যে মেয়েটি করল সে একেবারে চমকে দিল শহরের বিশিষ্ট দর্শকদের। যেমন তার বাচনভঙ্গি, তেমনি তার মুখচোখের অভিব্যক্তি।

বান্‌জারাদের মেয়েপুরুষ সুদর্শন কিন্তু এ মেয়েটি যেন অনন্যসাধারণ রূপ নিয়ে এসেছে।

কি করে এত অল্প বয়সে এমন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো অভিনয় করে গেল মেয়েটি, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির হয়ে সামনের দর্শক আসনে বসেছিলেন মোহনলালবাবুর ভাই অরুণলালজী। সেই দেবকান্তি মানুষ যিনি নর্মদার জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন ঝুম্‌কিকে।

সেই একাদশবর্ষীয়া ঝুম্‌কিকে আর চেনাই যাচ্ছিল না।

নাচ, গান, অভিনয়ের শেষে দর্শকদের উচ্ছ্বাস যেন আর থামতেই চায় না। এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রার ডানার শব্দের মতো শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

মোহনলালজী বিদায়ের সময় হরদয়ালকে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি একদিন একা ঝুম্‌কিকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসো। এমনি সন্ধ্যায় যে কোনওদিন এলেই আমাদের দেখা পেয়ে যাবে।

নমস্কার করে হরদয়াল সেদিন চলে এসেছিল কিন্তু দু'দিন পরেই কথা রেখেছিল সে। কেবল ঝুম্‌কিকে নিয়ে হাজির হয়েছিল মোহনলালজীর সেই বাগানওয়ালা বাড়িতে।

সে রাতে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যা কেউ আগে থেকে ভাবতে পারেনি।

মোহনলালজীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে তাঁরই নির্দেশে ঝুম্‌কি গেল অরুণলালজীর ঘরে।

সেই সবুজ আলোর মায়াময় ঘরে অপূর্ব সোনালি কাজ করা শ্বেতবসন পরে হাজির হলো একাদশী দেবকন্যা ঝুম্‌কি।

সবে ধ্যান ভেঙে উন্মীলিত চোখে বসেছিলেন অরুণলালজী।

মেয়েটিকে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক ! কোথায় যেন একে দেখেছেন তিনি। সঠিক স্মরণে আসছে না।

তিনি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন এই দেবকন্যাটির দিকে।

একঝলক হাসি ছড়িয়ে মেয়েটি বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি ঝুম্‌কি।

ভারী মিষ্টি গলা, তবু যেন স্মৃতিতে আনতে পারছেন না।

তুমিই তো আমাকে নর্মদার জল থেকে তুলে এনেছিলে। মনে নেই ?

মুহূর্তে যেন সব মনে পড়ে গেল অরুণলালের, তুমি এত বড়টি হয়ে গেছ !

কেন, দু'দিন আগে তুমি আমাকে দেখনি ? আমি তোমাকে যে নাচ দেখিয়ে গেলাম।

সবই একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে অরুণলালের।

তুমি বোস মা বোস, আমি তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখি।

অসঙ্কোচে তাঁর একবারে কাছে এগিয়ে

জমিনদার তাঁর এক তরুণ ঘোড়সওয়ারকে ডাকলেন।

এল ঝুম্‌কি। দুটো হাত ধরে বলল, তুমি এমন দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে থাক কেন? তোমার কি কেউ নেই?

মাথা নেড়ে জানাল অরুণলাল, সত্যিই তাঁর কেউ নেই।

কেন, আমি তো রয়েছি।

চোখে-মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল অরুণলালের। তিনি বললেন, তুমি আমার কে?

আগে বলো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

রাখব।

সত্যিই রাখবে?

ঝুম্‌কির দুটো হাত ধরে মাথা নেড়ে অরুণলাল বললেন, রাখব, রাখব।

তুমি আর কোনওদিন নর্মদার কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারবে না। কথা দাও।

কি এক আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি আছে মেয়েটির ভেতর!

অরুণলাল স্তব্ধ হয়ে ঝুম্‌কির দিকে চেয়ে রইলেন।

একসময় বলে উঠলেন, তাই হবে মা, কথা দিচ্ছি।

ঝুম্‌কি তার কোমল হাত দিয়ে অরুণলালের খোলা বুকটা ছুঁয়ে দিল।

অরুণলালের মনে হলো, জননী নর্মদা বালিকামূর্তিতে তাঁকে স্পর্শ করে আছেন।

॥ চার ॥

হর হর মহাদেও ধ্বনি দিতে দিতে হরদয়াল তার টাণ্ডা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। এবার তারা যাবে খাজুরাহোর মন্দিরে কাণ্ডারিয়া মহাদেও দর্শনে। সেখান থেকে একেবারে চলে যাবে উত্তরপ্রদেশে। হরদয়াল ঠিকই খোঁজ রেখেছে, এবার কুম্ভমেলার স্নান, এলাহাবাদের ত্রিবেণী-সংগমে। সে তার দলবল নিয়ে যোগ দেবে সেই মেলায়। স্নান করবে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীতে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিয়েছে তাদের পবিত্র ধারা।

এখন তারা চলেছে খাজুরাহোর পথে।

কয়েকদিন দিনের বেলা প্রায় একটানা পথ চলে ওরা এসে পৌঁছাল সাতনায়।

রাতে এসব অঞ্চলে দস্যু, তস্করের উপদ্রব। শ্লিম্যান সাহেবের কৃতিত্বে নিষ্ঠুরতম খুনীর দল, ঠগীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও দস্যুরা এক একটা ঘাঁটি গেড়ে সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের লুণ্ঠন। তাই রাতে সজাগ থাকত হরদয়ালের টাণ্ডার পাহারাদাররা।

বান্‌জারাদের সঙ্গে গরুর পাল ছিল ঠিক কিন্তু লুটে নেবার মতো অর্থের সঞ্চয় ছিল না। এসব খবর ছিল দস্যু-তস্করের নখদর্পণে। তাই লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় ছিল না তাদের।

কিন্তু একটা ভয় ছিল হরদয়ালের মনে। সে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সংগ্রহ করেছিল অনেক তথ্য।

সমুদ্রের ধারে গোয়া বলে একটা নগর আছে, সেখানে সাদা চামড়ার বিদেশী মানুষরা শাসনের কাজ চালায়। তাদের নাকি বলে পর্তুগীজ।

ওরা বাংলাদেশের দক্ষিণ সমুদ্রতীরগুলো পালতোলা জাহাজে চড়ে চষে বেড়ায়। তলোয়ার উঁচিয়ে ওরা সমুদ্র অথবা নদীতীরের হাটবাজারগুলোতে ঢুকে

পড়ে। তাদের দেখলেই মানুষজন যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাতে থাকে।

ওরা বেশ শক্তসমর্থ ছেলেমেয়েদের বেছে বেছে ধরে ফেলে। অনেক সময় ঘোড়ায় চড়ে আসে ওরা, ঘিরে ফেলে চারদিক। তখন আর পালাবার পথ থাকে না।

এরপর মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে তোলে জাহাজের খোলে। সুযোগ পেলে ওরা যদি লড়াই চালায় তাই বড় নিষ্ঠুরের মতো তাদের হাতের চেটোতে বেতের ছিলা ঢুকিয়ে চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে বন্দী করে রাখে। ছোট্ট ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো শুকনো ভাত।

বেশ কয়েকটা দিন এমনি কষ্টে ওদের কাটাতে হয়। তারপর গোয়ায় পৌঁছে ওদের বিক্রি করে দেওয়া হয় দাসদাসীর হাটে।

কেবল সমুদ্র বা নদীতীরের বাজারহাট থেকেই নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ওদের আড়কাঠিরা।

তারা নানা কৌশলে ফাঁদ পেতে ভালো ভালো সব ছেলেমেয়েদের যোগাড় করে ঐ দাসদাসীর হাটে চালান করে দেয়।

কোনও মেয়ে বা ঘর সাজানোর কাজেও নিপুণ, আবার কেউ আচার তৈরি কিংবা ছুঁচ সুতোর কাজে দক্ষ। কেউ বা নাচে গানে ওস্তাদ।

আর ঠিক এইখানেই ভয় হরদয়ালের। তারা রাজপুত অর্থাৎ চারণ-বান্‌জারা। তাদের দলের ছেলেমেয়েরা মাতিয়ে দিতে পারে একটা মস্ত বড় আসর।

তাই বিশেষ করে মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখতে হয় রাতের বেলা। আচমকা কোনও লুঠেরা এসে যেন লুঠ করে না নিয়ে যেতে পারে মেয়েদের।

ওরা একদিন পথ চলতে চলতে এসে পৌঁছাল খাজুরাহোতে। কোনওরকম অঘটন ঘটল না পথে।

একেবারে মন্দিরের কাছেপিঠে লোকালয় খুব কম। বিশেষ কোনও একটি উৎসব বলে দূর দূর থেকে মানুষজন আসছে কাণ্ডারিয়া মহাদেও দর্শনে। দুধ ঢেলে স্নান করাবে শিবকে। তারপর পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরবে।

হরদয়ালের টাণ্ডা মন্দির থেকে সামান্য দূরে চার-পাঁচ দিনের জন্য তাদের আস্তানা গাড়ল।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর ক্ষীণ চন্দ্র কাণ্ডারিয়া মহাদেও-এর মন্দির-চূড়ায় দেখা গেল শিবের ললাটে শশাঙ্ক-লেখার মতো।

ঝুম্‌কির বিস্ময় যেন আর ধরে না। সে তার সঙ্গী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সারা মন্দির।

নাচের মূর্তিগুলোর কাছে গিয়ে সে তেমনি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার হাতের মুদ্রা, পায়ের কাজ আর শরীরের ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যায় তার সঙ্গীসাথীরা।

ঝুম্‌কির মনে হয়, মন্দির থেকে তুলে নেওয়া এইসব ভঙ্গিগুলোকে সে তাদের নাচের ভেতর যোগ করে দিতে পারবে।

তার নাচের গুরু রূপমতীকে সে তার মনের কথা জানায়।

রূপমতী তাকে নিরাশ করে না, বরং তার এই নতুন প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়। সে তালি দিয়ে গান গায়, ঝুম্‌কি ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে নতুন পাওয়া মুদ্রাগুলি যোগ করে। তালের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে নেয় সঠিকভাবে।

শেষবেলা নাচে ওরা, করতালি দেয় দর্শকেরা।

উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মন্দির সুসজ্জিত হয়েছে সহস্র সহস্র দীপালোকে।

সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে জ্বলছে বিরাট আকৃতিবিশিষ্ট মশাল। আলোয় ভরে গেছে প্রাঙ্গণ।

আজ বান্‌জারাদের শেষ নৃত্যানুষ্ঠানে হর-পার্বতীর বিবাহ-উৎসব এবং সমাপ্তিতে শঙ্কর-পার্বতীর যুগল নৃত্যানুষ্ঠান হবে।

অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে বসে আছে দর্শকেরা।

গতকাল হোলি-নৃত্যে ঝুম্‌কি রাধা সেজে এমন অপূর্ব নাচ নেচেছিল যে, এ অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিনদার প্রত্যেক নর্তকীকে দিয়েছিলেন একটি করে সোনার মোহর। আর রাধার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় ও নৃত্যকুশলতা দেখানোর জন্যে ঝুম্‌কিকে দিয়েছিলেন সোনার ফুলের ওপর হীরে গাঁথা হার।

হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল কেবল বান্‌জারাদের ভেতরেই নয়, উপস্থিত দর্শকেরা একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

জমিনদার বাহাদুর তাঁর চেলাদের মুখে খবরটা পেয়েছেন মাত্র তিনদিন আগে। এই তিনদিনই তিনি দলবলসহ এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে।

অনুষ্ঠানের সময় একবারও তাঁকে এদিক-ওদিকে চোখ ফেরাতে দেখা যায়নি। তাঁর দৃষ্টি যেন আঠার মতো আটকে ছিল নর্তকীদের লীলার মধ্যে।

আজও তিনি এসেছেন, কিন্তু আসন নিয়েছেন শেষের সারিতে।

হরদয়াল হাত জোড় করে তাঁর কাছে গিয়ে সামনের আসনে বসার অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হাসিমুখে হাত ওপরে তুলে।

হঠাৎ অনুষ্ঠানের মাঝেই একটা কোলাহল শোনা গেল। প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম থেকে ভেসে আসছিল সে শব্দ।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা সে আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

দূর দূর অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল তারা কিসেব যেন গন্ধ পেয়ে পালাতে লাগল।

মেয়েরা সচকিত। তাদের নাচ থেমে গেছে। ভয়মেশা একটা বিস্ময় খেলা করছে তাদের চোখে-মুখে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন জমিনদার বাহাদুর। হাতের ইঙ্গিত করতেই বান্‌জারাদের ঘিরে দাঁড়াল দু-চারজন লেঠেল আর বন্দুকধারী। বাকিরা সব শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

তখন মন্দিরপ্রাঙ্গণে শুই বান্‌জারার দল ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

জমিনদার অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা কোথাও নড়বে না, আমার লোক চলে গেছে ডাকাতদের শায়েস্তা করার জন্যে।

তিনি আরও বললেন, কাল যে মেয়েটি রাধা সেজেছিল, আজ সে সেজেছে পার্বতী। ইতিমধ্যে তাকে হীরের হার উপহার দেওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সে ওই হার পরেই হর-পার্বতীর মিলন বাসরে উপস্থিত হয়েছে।

আজ মন্দিরপ্রাঙ্গণে শেষ অনুষ্ঠান—এ খবর এ অঞ্চলের সব ডাকাত-সর্দারই জানে। তাদেরই কোনও দল এই হারটা লুঠে নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

কথা শুনে ব্রিজলাল, সুখলাল, তোপ সিং, হরদয়াল—সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের অল্প দূরেই ওদের টাণ্ডা। সেখানে গরুগুলোই কেবল শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে।

শুধু দুটো কুকুর পাহারা দিচ্ছে পুরো টাণ্ডা।

আজ সবাই চলে এসেছে শেষ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্যে।

মন্দিরে কিন্তু বান্‌জারারা তাদের বর্শা আনেনি। তারা জানে, এখানে কাণ্ডারিয়া মহাদেওই তাদের রক্ষক।

এই অবস্থায় তারা বিচলিত হয়ে উঠল।

কিছু দূরে ঠকাঠক লাঠির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ বন্দুকের থেকে দু-চারটে গুলির আওয়াজও বেরিয়ে এল।

জমিনদার তাঁর এক তরুণ ঘোড়সওয়ারকে হাঁক দিয়ে কাছে ডাকলেন। সে ঘোড়া থেকে নেমে সেলাম করে দাঁড়াল।

বছর কুড়ি বয়সের এক তরুণ যুবা পুরুষ।

জমিনদার বাহাদুর বেশ চড়া গলায় আদেশ করলেন প্রীতম, তুমি এই মুহূর্তে ওই হীরের হার পরা মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে খোয়াইয়ের পথ ধরে আমার কোঠিতে চলে যাও। আমি বাকি সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছি।

তখন কারু কোনও কথা বলার বা বিবেচনা করার অবস্থা ছিল না। সমস্ত দলটা জমিনদার বাহাদুরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

ঠিক সেই অবস্থায় আবার কতকগুলো গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে জমিনদার বাহাদুরের ঘোড়াটা এনে দিল। তিনি ঘোড়াতে উঠে বললেন, তোমরা সকলে আমার পেছনে পেছনে চলে এসো।

ঘোড়ার সহিস প্রাঙ্গণের তিনটে বড় বড় মশাল নিভিয়ে দিয়ে চতুর্থটি নিয়ে আগে আগে চলল। ইতিমধ্যে জমিনদার বাহাদুরের নির্দেশে সে একটা বন্দুক তাঁর হাতে তুলে দিল।

আগে আগে মশাল চলেছে। পেছনে ঘোড়ার ওপর জমিনদার বাহাদুর। তার পেছনে সারি দিয়ে চলেছে হতবুদ্ধি, নির্বাক বান্‌জারার দল। তারা বুঝে গেছে এই মুহূর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

তারা মশালের আলোয় অনেকখানি পথ হেঁটে চলে এল।

এসে পড়ল সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক পরিবেশে।

ইতিমধ্যে গোলমালের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

জমিনদার বাহাদুর বললেন, এই গাছতলায় তোমরা বিশ্রাম করো, আমার লেঠেল আর বন্দুকধারীরা মনে হয় ডাকাতদের হটিয়ে দিয়েছে। আমি অবস্থাটা বুঝে নেবার জন্যে লড়াইয়ের জায়গায় যাচ্ছি, পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

পান্নাবাঈ কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, আমার মেয়েটা ?

ওর জন্যে ভাবনা কী! নিরাপদ জায়গায় ওকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে মুখ বুজে চুপ করে বসে রইল বান্‌জারার দল। তাদের এই পরিস্থিতিতে করার কিছু ছিল না।

রাত তখন কত বোঝা যাচ্ছিল না। নিদ্রাহীন চোখে কেউ বা তাকিয়েছিল অন্ধকার চরাচরের দিকে, কেউ বা লক্ষ্য করছিল জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে থাকা আকাশের অগণিত নক্ষত্রগুলোকে।

হঠাৎ দ্রুত পায়ের সাড়া পেয়ে হরদয়াল চেঁচিয়ে উঠল, কে ?

উদ্বেগ-আকুল গলার স্বর ভেসে এল, আমি ঝুম্‌কি বাবুজী।

ততক্ষণে সকলে অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কেঁদে উঠল পান্নাবাঈ। অন্ধকারে দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, তুই কোথায় ?

ঝুম্‌কি অনুমান করে মায়ের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরে মায়ের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুম্‌কি চেঁচিয়ে বলল, যে আমাকে মন্দির থেকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ঘোড়সওয়ার প্রীতম আমাকে এখানে সঙ্গে করে এনেছে। এখুনি আমাদের সবাইকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে।

হরদয়াল বলে উঠল, এ অন্ধকারে কোথায় যাব ?

প্রীতমই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বাবুজী।

সুখলাল বলল, কিন্তু আমাদের টাণ্ডায় যে খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্র, গরুবাছুর রয়েছে, সেগুলো ফেলে যাব কি করে ? আর কেনই বা যাব ? জমিনদার বাহাদুর তো আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

ঝুম্‌কি চেঁচিয়ে উঠল, ও জমিনদার নয়, আস্ত একটা রাক্ষস। ওর নিজের দলের লোকেরাই মিছিমিছি লড়াইয়ের অভিনয় করেছে তোমাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে। তার নাচঘরে আমাকে নাচওয়ালি করে রাখবার মতলব ছিল।

হরদয়াল আকুল হয়ে বলল, তুই এসব কথা জানলি কি করে বেটি ?

এই প্রীতমই আমাকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছে।

আমাদের নাচ আর অভিনয় দেখে প্রীতম ভাইয়ার বড় ভালো লেগে গিয়েছিল, তাই আমার কোনও ক্ষতি হোক সে তা চায়নি। জমিনদারের সব পরিকল্পনার কথা সে জানত। এই রাতেই হয়তো সেই পাষণ্ড আমাদের আক্রমণ করার জন্য এসে পৌঁছাবে। প্রীতম ভাই

আমাকে অনেক কৌশলে উদ্ধার করে এনেছে। এখন সব উঠে পড়ো, পথ চলতে চলতে সব কথা হবে।

ব্রিজলাল বলল, গরু আর খাবারগুলো ?

প্রাণটা আগে চাচাজী, গরুগুলো চরে খেতে পারবে। আর প্রাণে বাঁচলে আমরা ঠিক খাবার যোগাড় করে নিতে পারব।

শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রীতম, সেই শব্দ অনুসরণ করে পুরো দলটা এগিয়ে চলল।

সারারাত চলে তারা পৌঁছে গেল একটা নিরাপদ দূরত্বে। এবার একটা খোয়াইয়ের মধ্যে তারা আত্মগোপন করে রইল।

অল্প পরেই ফুটে উঠল ভোরের আলো। দূরে দেখা গেল একটা উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর।

প্রীতম বলল, তোমার ওই পুকুরের পাড়ে গাছের তলায় নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে পার। আমি তোমাদের সকলের খাবার ব্যবস্থা করছি।

অদূরেই ডানদিকে জনপথ দেখা যাচ্ছিল। প্রীতম আরও তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে আহারের সন্ধানে সেদিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে।

পুকুরের পাড়ে বিশাল বটগাছের তলায় মেয়েরা রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

সেখানেই ঝুম্‌কির মুখ থেকে ওরা শুনল প্রীতমের পরিকল্পনার কথা।

জমিনদারের নির্দেশ ছিল, প্রীতম ঝুমকিকে নিয়ে তার খড়ের চালওয়ালা একটা কোঠিবাড়িতে বন্ধ করে রাখবে, যাতে কোতোয়াল খবর পেলেও তার সন্ধান না পায়।

সেই খড়ের চালওয়ালা, মাচানে শুকনো কাঠভর্তি ঘরটাতে আগুন লাগিয়ে ও একেবারে ছাই করে দিয়েছে। আমি ওই হীরের হারটাকে ওখানেই ফেলে দিয়ে এসেছি যাতে জমিনদার বুঝতে পারে আমরা দুজনেই হঠাৎ লাগা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি।

আশ্চর্য ! যে সব বান্‌জারা নর্তকীদের ওই জমিনদার এক একটা করে মোহর দিয়েছিল তারা ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুষ্করিণীর জলে।

বানজারার দল খুশিই হলো, ওই মোহরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায়।

॥ পাঁচ ॥

সব পথই এখন চলেছে ত্রিবেণী-সঙ্গমে। কাতারে কাতারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসছে মানুষজন কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নান করতে।

বিশাল জায়গা জুড়ে কুরুক্ষেত্রের রণভূমির মতো পড়ে গেছে সারি সারি তাঁবু। এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক এক একটি তাঁবুতে তাঁদের ধর্মীয় আসর জমিয়েছে।

ওরা একটা বিশেষ জায়গা নির্বাচন করে ওদের থাকার ব্যবস্থা করল।

অনেকটা অর্থই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল প্রীতম। তা ছাড়া হরদয়ালের কাছেও ছানা আর ঘি বিক্রির বেশ কিছু টাকা ছিল।

এই টাকা দিয়ে প্রথমেই তারা একটা সাধারণ রকমের তাঁবু কিনে নিল। বাকি টাকায় মজুত করল কয়েক দিনের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য।

তাছাড়া বহু সংস্থা সেবাব্রতের ঢালাও ব্যবস্থা রেখেছে। সেখানে গিয়েও তারা আহার সংগ্রহ করতে লাগল মাঝে মাঝে।

এবার তারা সুযোগ-সুবিধেমতো ধর্মীয় পালাগানের আসর বসাল। তাদের চমৎকার গান আর অভিনয়ে জমে উঠল আসর। পেলা দিতে লাগল কুম্ভমেলার যাত্রীরা।

কয়েকটা দিন বেশ উন্মাদনায় কাটল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তারাও পুণ্যস্নান করল ত্রিবেণীতে। একদিন সমাপ্তি ঘটল মেলার। কিন্তু শেষ হলো না বান্‌জারাদের নাচগান আর অভিনয়। কারণ তাদের এখন প্রচুর টাকার দরকার নতুন করে টাণ্ডা গড়ার জন্য।

শহরের প্রতিটা বাড়িতে তারা নাচ-গানের দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বড় বড় বাড়িতে নাচগানের আসর বসিয়ে তাদের রোজগারও হতে লাগল আশাতীত।

তিন-চার মাসের ভেতরেই ওরা কিনল একটি 'নন্দী বইল'। সঙ্গে দুগ্ধবতী একটি গাইগরু। নায়েক হরদয়ালের একটা বর্শা নইলে বান্‌জারাদের সর্দার বলে মানায় না। তাই টাণ্ডার সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু তার জন্যেই কেনা হয়েছে ঐ বর্শাটি।

এখন সুসজ্জিত ও চিত্রিত 'নন্দী বইল'টির সঙ্গে চলে চোমরানো গোঁফওয়ালা হরদয়াল তার লাল পাগড়ি আর বিচিত্র পোশাক পরে। কাঁধে ঠেকানো থাকে তার লম্বা বর্শাখানা।

ধীরে ধীরে ভাঙা টাণ্ডা গড়ে উঠেছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই কারো, কারণ বান্‌জারারা ভবঘুরের জাত। এক জায়গায় ঠাঁই গেড়ে থাকা তাদের স্বভাবই নয়। কেবল অর্থাগম হচ্ছে, তাই এখানে এতদিন থেকে যাওয়া।

একটা বাড়িতে এখনও ওরা ঢুকতে পারেনি। বাড়িটা পেল্লাই। সবাই খুব নাম করে। জব্বলপুরের বাড়ির চেয়েও এ বাড়ি অনেকটাই বড়। লোকে বলে, 'মিত্র মহল'।

অনেকদিন ও বাড়ির সামনে দিয়ে ওরা গেছে, কিন্তু একটি ছাড়া দ্বিতীয় মুখ দেখা যায়নি। সে মুখ, বাড়ির দরোয়ানের। সামনের লনের কোণায় দরোয়ানের ঘর। সে একাই থাকে।

ঐ নেপালী দরোয়ানটির মুখ থেকেই ওরা শুনেছে, বাবুরা সব ছেলেপুলেদের নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেছেন। কুম্ভমেলায় পরে গঙ্গোত্রীতে স্নান করার জন্যে চলে গেছেন তাঁরা।

ওরা জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, বাবুরা কবে ফিরবেন ?

দরোয়ান বলেছিল, পুজোর আগে ওনাদের ফিরতেই হবে। শহরে এত বড় পুজো নাকি আর দেখা যায় না।

ওরা সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছে। পুজোর সময় কটা দিন যদি এই বাড়িতে আসর জমাতে পারে। আশা বেশ কিছু রোজগারের। তার পরই ওরা এলাহাবাদের এই আস্তানা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে।

দেখতে দেখতে আকাশ নীল হয়ে গেল। থমকে আছে গগনের গায় সাদা তুলোর মতো দু'খণ্ড মেঘ। শহরের একটু

বাইরে গেলে কখনও বা বাতাসে ভেসে আসে নীলকণ্ঠ পাখির ডাক। নীল ডানা ছড়িয়ে পাখিটা অনেক ওপরে উঠে যায়। মনে হয় কাকে যেন আসার জন্যে আকুল হয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

একদিন মিত্র মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল, সিংদরজাটা হাট করে খোলা। পাশে দোতলা বাড়ির সবকটা জানালাই খোলা হয়ে গেছে।

নতুন পোশাক পরে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরোয়ান। তাকে জিজ্ঞেস করে বান্‌জারারা জানল, তীর্থ করে মিত্রবাবুরা সবাই ক'দিন হলো ফিরে এসেছেন। এবার নাকি পুজোর বাজনা বাজবে। ইতিমধ্যে শহরের এদিক ওদিক থেকে ঢাকের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে। মিত্রবাড়িতেও শুরু হবে বাজনা।

ইতিমধ্যেই দরোয়ানজীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ওরা। সেই সূত্র ধরে একদিন বড়কর্তার বৈঠকখানায় ঢোকার অনুমতি পেল।

বেশ রাশভারী লোক মিত্রমহাশয়।

কি চাই তোমাদের ?

হুজুর, আমরা বান্‌জারা। উৎসব বাড়িতে আমরা নাচগান করে বেড়াই। যাঁরা চান তাঁদের আমরা পালাগান অভিনয় করে দেখাই। হুজুরের অনুমতি মিললে...।

মিত্রমশায় বললেন, ষষ্ঠীর সন্ধ্যেবেলা, সপ্তমীতে রাত দশটার পর আর একাদশীর দিন সন্ধ্যায় তোমরা অনুষ্ঠান করতে পারো। তা তোমাদের নাচগান কত সময় ধরে চলবে ?

আপনারা যতটুকু সময় দেবেন হুজুর। আমাদের ছেলেমেয়েরাই নাচবে, গাইবে, অভিনয় করে দেখাবে।

বেশ, ষষ্ঠীর দিন এসো তোমরা সকলে।

চলে আসার সময় আবার বললেন, পুজোর কটা দিন এখানেই তোমাদের পাত পড়বে।

হরদয়াল সেলাম জানিয়ে বলল, হুজুরের যেমন মর্জি।

ষষ্ঠীর দিন আসর জমিয়ে দিল বান্‌জারার দল। আত্মীয়স্বজনে আর শহরের বন্ধুবান্ধবে মিত্র মহল একবারে সরগরম।

প্রথম দিন ওরা শুধু নাচগান করে দেখাল। দেবীবরণের গান গাইল ওরা। ঘুরেফিরে নাচল ছেলেমেয়েরা। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নাচের ভারি উপযোগী। ঘুঙুর বাজিয়ে, ঘাগরায় ঘূর্ণি তুলে, ওড়না উড়িয়ে সে কি রঙবাহারি নাচ আর গান!

দর্শকদের হাততালি পেল ঘন ঘন, কারণ বান্‌জারাদের নাচ এখানকার দর্শকরা আগে বড় একটা দেখেনি। অবশ্য দু'চারজন বাঙালি ইতিমধ্যে কোনও কোনও বাড়িতে গিয়ে দু'একবার ওদের নাচ দেখেছে। কিন্তু এখানে যেন আলাদা মাত্রা পেয়েছে ওদের নাচ। আলোর খেলায় নাচের আসরে যেন ইন্দ্রপুরীর ছোঁয়া।

দুর্গা-উৎসবে বান্‌জারাদের নাচের দল পরিবেশন করে 'টিপ্‌রি নৃত্য'। কাঠিতে কাঠি বাজিয়ে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচে আর গান গায়। মাঝে মাঝে জয় হো, জয় হো বলে ধ্বনি দেয় মা দুর্গার।

প্রথমেই আসরে গণপতি-বন্দনা করে ওরা।

'জয় গণপতি, স্বামী গণপতি, তু ঘন নীলা...'

হে গণপতি, তোমার বর্ণ নীল। তুমি শুণ্ডধারী। তোমার জয় হোক্। আমরা পূজার পবিত্র দীপ জ্বেলে তোমার আরতি করছি।

আবার দশেরার দিনে বান্‌জারার দল গায় জননী জগদম্বার স্তুতি গান।

'জে জে জগদম্বাদেবী ইয়েদি বাঘেপর সভার বেগি...'

হে দেবী মাতা জগদম্বা, তুমি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছ। তোমার হাতে রয়েছে চাবুক।

কৃপা করে মা সবাইকে আনন্দ বিলিয়ে দাও। আমাদের ধেনুগুলির বৃদ্ধি সাধন কর। সম্পন্ন কর মা আমাদের। জীবনে জয় এনে দাও। আমাদের খাদ্যবস্তুর যেন অভাব না হয় কোনওদিন। পূর্ণ কর মা আমাদের সকল আশা। তোমার নাম, যশ আর পূজা প্রচারিত হোক দিকে দিকে।

ষষ্ঠীর দিন সামিয়ানার তলায় সাজানো আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে বসে গৃহস্বামী রাধাবল্লভ মিত্র বান্‌জারাদের নাচগান উপভোগ করলেন। ঘনঘন বাহবা দিলেন সবার সঙ্গে।

মণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে যে কিশোরী মেয়েটি নাচছিল, সে যেন সবার থেকে আলাদা। সত্যি, চোখে পড়ার মতো রূপ তার। নাচে আর গানে তার দক্ষতা, সবার থেকে আলাদা করে চেনায় তাকে।

মেয়েটি মণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে রাজপুতানি নর্তকীদের মতো ঈষৎ বেঁকে ঘাগরা ঘোরাতে ঘোরাতে যখন নাচছিল তখন উল্লাস আর করতালির ধ্বনিতে মেতে উঠেছিল আসর।

নাচের শেষে রাধাবল্লভ সেদিনের জন্য হরদয়ালকে এক হাজার টাকা দিলেন। আলাদা করে ঝুমকির হাতে দিলেন আরও পাঁচশো টাকা। বললেন, তোমরা সবাই কিছু কিনে খেও।

তারপর আবার বললেন, পুজোর কদিন তোমরা কিন্তু এখানেই খাবে। হরদয়ালকে আমি বলে রেখেছি।

বার মাসে তের পার্বণে মিত্রভবন যখন আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সমাগমে কলরবে মুখরিত হয় তখন বুকের ভেতর এক ধরনের শূন্যতা বোধ করেন রাধাবল্লভ মিত্র।

এলাহাবাদের অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট হিসেবে তিনি সমস্ত মহলেই পরিচিত। ইদানিং সবকিছু দায়িত্ব একমাত্র পুত্র অর্ণবের ওপর সঁপে দিয়ে নিজেকে বেশ খানিকটা ভারমুক্ত করে নিয়েছেন।

কিন্তু তবুও এড়াতে পারছেন না মনের গুরুভার। পুত্র অর্ণবের পর কি হবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের! তৃতীয় কোনও উত্তরাধিকারীর সন্ধান মিত্রভবনে এখনও পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যৎ পরিণতির শোক পাষাণভারের মতো চেপে আছে তাঁর বুকে।

তবু মিত্র বংশের ঐতিহ্যরক্ষায় এতটুকু ভাঁটা পড়ে তা তিনি চান না।

রাত সাড়ে এগারোটার পর সামান্য অবসর মিলেছে এ বাড়ির বধূর।

ষষ্ঠীর দিনে হাঙ্গামা কম তাই আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্ন শেষ হয়ে গেছে এগারোটার ভেতর।

যেন দুজনে দেখছে দুজনের প্রতিবিম্ব।

এখন একটু ফুরসুত পেয়ে খাস পরিচারিকা সরমাকে নিয়ে বউরানী উঠে এসেছেন ছাদ সংলগ্ন চিলেকোঠায়। কেশ পরিচর্যার অবকাশ জুটেছে প্রায় এই মাঝরাতে।

চুলে চিরুনির টান দিতে দিতে সরমা বলল, আজ ভারী সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখলাম বউরানী।

কোথায় রে ?

বান্‌জারাদের নাচ হচ্ছিল যেখানে।

তাই!

ছোটমুখে একটা বড় কথা বলব বউরানী।

কি বলতে চাস্ বল না।

ঠিক তোমার মতন সুন্দর দেখতে।

হেসে উঠলেন অর্ণব মিত্রের স্ত্রী। বললেন, হ্যাঁরে, যেখানে যত সুন্দরী দেখিস, অমনি আমার কথা মনে পড়ে যায় ?

সে কথা নয় বউরানী, এ মেয়েটাকে দেখতে অবিকল তোমার মতো। এমনি টানা টানা চোখ, টিকোলো নাক, থুতনির কাছে চাপা। গায়ের রঙ গয়নার রঙের মতো।

তুই এত মিল খুঁজে খুঁজে বলতে পারিস বটে সরমা।

একবার হেসেছিল, গালে ঠিক তোমার মতো টোল পড়ল। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, কাল একবার নিজের চোখে দেখই না।

বউরানী হেসে বললেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন।

পরের দিন নাচের সময় সামান্য ফাঁক খুঁজে বউরানী নাচের আসরে মেয়েটিকে দেখলেন।

একঝলক দেখে নিয়ে মনে হলো, সরমা খুব একটা ভুল বলেনি। বেশ খানিকটা মিল আছে তাঁর সঙ্গে। হয়তো তাঁর দশ-বারো বছর বয়সে তোলা ফোটোর সঙ্গে মেলালে মিলটা আরও বেশি করে চোখে পড়বে।

সরমা পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, দেখলে বউরানী ?

কাল সকালে জল খাওয়ার পর তুই ওকে একবার নিয়ে আসিস তো আমার ঘরে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু ওকে বলবি, বউরানী ডাকছে।

পরের দিন ঠিক ন'টা নাগাদ সরমা ওকে বউরানীর ঘরে এনে হাজির করল।

বারমহল থেকে অন্দরমহলে ঢোকার পর যে বারান্দা, সেখানে সারি সারি ঝুলছে অজস্র খাঁচা, তাতে নানা রঙের, নানা জাতের পাখি।

বউরানীর ঘরে ঢোকার মুখে খাঁচায় বন্দী কাকাতুয়াটা বলে উঠল, এসো, এসো।

বউরানী ঘরের ভেতর থেকে বুঝলেন, যাকে চেয়েছিলেন, তাকে নিয়েই হয়তো সরমা আসছে।

সত্যিই সরমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল মেয়েটি।

মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল দুজনে। যেন দুজনে দেখছে দুজনের প্রতিবিম্ব।

চমকে ওঠারই কথা, এত মিলও হতে পারে! যদিও দুজনের পোশাকে অনেক গরমিল।

কি নাম তোমার ?

ঝুম্‌কি তুনওয়ার।

একটু থমকে গেলেন বউরানী।

তোমার বাবার নাম ?

হরদয়াল তুনওয়ার।

বউরানী আবার জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে তোমার মা এসেছে ?

হ্যাঁ মেমসাব। জলখাবার খেয়ে টাণ্ডায় ফিরে গেছে।

আবার প্রশ্ন, তোমরা ক'ভাই বোন ?

আমি একাই।

এবার মেয়েটি ভারী মিষ্টি হেসে

বলল, দলে আমরা অনেকগুলো ভাই বোন আছি।

বউরানী বললেন, তুমি এখানে বোসো মা, আমি আসছি। সরমাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বউরানী অদ্ভুত চোখে তাকালেন সরমার দিকে।

বললেন, আমার সঙ্গে শুধু মুখের মিল নয় রে, নামটা শুনেছিস ?

হ্যাঁ বউরানী, ঝুম্‌কি।

আনমনে বউরানী বললেন, সবদিকে থেকেই কি অদ্ভুত মিল !

সরমা শেষ কথাটার তাৎপর্য বুঝল না। হঠাৎ বউরানী বললেন, সরমা তুই দেখে আয় তো, ওর বাঁ কানের নিচে একটা কালো জড়ুল আছে কিনা ?

সরমা ঘরে ঢুকে গেল।

মেয়েটি তখন নিবিষ্ট হয়ে ঘরের দেওয়ালে চিপানডেলের ভেতর বোতলে রাখা একটা পুতুলের দিকে তাকিয়েছিল।

সেই সুযোগে সরমা তার কানের তলায় কালো জড়ুলটি দেখে নিল।

ঘরের বাইরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, অবাক ব্যাপার ! ঠিক ধরেছ তুমি !

এবার বউরানী স্বয়ং ঢুকে এলেন ঘরে।

পায়ের সাড়া পেয়ে মেয়েটি ফিরে তাকাল। তার মুখ চোখ কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো মনে হচ্ছিল।

সে হঠাৎ বলে উঠল, এই বোতলের ভেতর রাখা সাহেব-মেম নাচে না ?

বউরানী এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, নাচে বই কি।

বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে স্প্রিং-এ দম দিয়ে দিলেন।

অমনি ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিল সাহেব-মেম।

মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল।

একসময় মুখ ফিরিয়ে বলল, বাজনা বাজছে না কেন ?

ওটা খারাপ হয়ে গেছে।

তারপর আবার বললেন, তুমি এ পুতুল আগে দেখেছ ?

মেয়েটা কেমন যেন ঘোরের ভেতর থেকে বলল, দেখেছি।

কোথায় ?

এখানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা শুনতে পেল, সারা ঘর ভরে উঠেছে পিয়ানোর মিষ্টি বাজনায়।

অদ্ভুত এক আবেগে বউরানী জড়িয়ে ধরলেন মেয়েটিকে। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

নিজের আবেগকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে সরমাকে বললেন, তুই এর সঙ্গে কথা বল, আমি এখুনি আসছি।

অর্ণবকে খোঁজ করে বউরানী টেনে আনলেন নিভৃতে, খুলে বললেন সব কথা।

আড়াল থেকে অর্ণব মেয়েটিকে দেখে গেলেন। তার ছায়া পড়েছিল পাশের টেবিল-মিররে। একেবারে বধূ শর্মিলার যেন কিশোরী মূর্তিটি।

অর্ণব সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন বাবার কাছে। নিভৃতে রাধাবল্লভের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা হলো।

উত্তেজিত রাধাবল্লভ বললেন, পুলিশে খবর দাও।

অর্ণব বললেন, বাবা, উত্তেজিত হবেন না, হরদয়ালকে আগে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

লোক পাঠিয়ে হরদয়ালকে ডেকে আনা হলো একটা নিভৃত ঘরে।

কথার ভেতর বোঝা গেল হরদয়াল বেশ সহজ সরল মানুষ। সে কিন্তু কোনও কথা গোপন করল না।

বনের মধ্যে ঝুম্‌কিকে পাওয়ার পর থেকে সব ঘটনাই সে একে একে বলে গেল।

কথাগুলো বলছিল সে হাতজোড় করে। গাল বেয়ে দরদর করে বয়ে যাচ্ছিল চোখের জল। শেষে কান্নাভেজা গলায় বলল, পান্নাবাঈ ওকে বুকে করে মানুষ করেছে। সে এ আঘাত সইতে পারবে না। আমি চুরি করিনি হুজুর, ভগবানই আমাকে ওর ভার বইতে দিয়েছিলেন। আজ ভগবানই আমাদের বুক থেকে ওকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাধাবল্লভ বললেন, তোমরা যে আমাদের মেয়েকে প্রতিপালন করেছ, তার জন্য যত অর্থ চাই আমি দেব।

হরদয়াল বলল, টাঙায় আমাকে খবরটা দিতে দিন হুজুর। আপনাদের মেয়েকে আপনারা রেখে দিন।

হরদয়াল চলে গেল।

সন্ধ্যার মুখে ফিরে এসে বলল, খবরটা শুনে পান্নাবাঈ মূর্ছা গিয়েছিল। মূর্ছা ভেঙে এখন বোবার মতো বসে আছে। এই অবস্থায় আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাঙা নিয়ে এলাহাবাদ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

রাধাবল্লভ বললেন, এ আনন্দ-মুহূর্তে আমরা যে তোমাদের বেশি করে চাই হরদয়াল।

হাতজোড় করে হরদয়াল বলল, টাঙার সকলেই এ খবর শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছে হুজুর। ওদের এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ঝুম্‌কি ওদের প্রাণ।

রাধাবল্লভের ইঙ্গিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে এলেন অর্ণব মিত্র।

হরদয়ালের দিকে সেই বাণ্ডিলটা এগিয়ে দিয়ে রাধাবল্লভ বললেন, তোমরা যে ভালোবাসা দিয়ে আমার নাতনিকে প্রতিপালন করেছ তার মূল্য আমি কোনওদিন দিতে পারব না। এটুকু শুধু গ্রহণ কর আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে।

হাতজোড় করে জিভ কেটে হরদয়াল বলল, কোনও দামেই আমি আমার মেয়েকে বেচতে পারব না হুজুর, এটা আপনার কাছেই রেখে দিন।

মিত্র মহল ছেড়ে চলে গেল হরদয়াল, একবারও আর পেছন ফিরে তাকাল না।

সব ঘটনা শুনল ঝুম্‌কি। তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস আর আবেগের বন্যা বয়ে গেল। সে কিন্তু নীরব। একটি কথাও বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

ভোর রাতে উঠে দেখা গেল, বিছানায় নেই ঝুম্‌কি।

খোঁজ খোঁজ।

এ কী ! খাঁচার সব কটা দরজাই খোলা !

পাখিদের নীলাকাশে মুক্তি দিয়ে ঝুম্‌কি নিজেও উড়ে চলে গেছে।

ছবি : বিজন কর্মকার

শব্দ-জব্দ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

খুন? অসম্ভব! মেঘনাদকাকু, আমি শপথ করে বলতে পারি আমার দাদার দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়...

দাঁড়াও। অনিন্দ্য সেন আরও কিছু বলার আগেই মেঘনাদ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, কিন্তু আমি যদি বলি তোমার দাদা আনন্দ সেনই তার বন্ধু এবং ব্যবসার অংশীদার অজিত মাইতিকে খুন করেছে আর তার মোক্ষম প্রমাণ পুলিশের হাতে আছে?

ওসব মিথ্যে। আমার দাদাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার চক্রান্ত করেছে আসল অপরাধী। বলতে বলতে ক্ষোভে আর বেদনায় দু'হাতে মুখ ঢাকল কিশোর অনিন্দ্য।

অনিন্দ্য সেন আর আনন্দ সেন দুই ভাই। ওরা আমার আর মেঘনাদের অপরিচিত নয়। মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটের কয়েকটা বাড়ি পরেই ওরা থাকে। আজ রীতিমতো বিপদে পড়ে অনিন্দ্য ছুটে এসেছে মেঘনাদের কাছে। ওর দাদা আনন্দ সেনকে গতকাল খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সত্যি বলতে কি সব ব্যাপারটা এখনও ঠিকমতো জানি না। তবে দাদার বিপদে সরল কিশোরটির আর্তি মনকে ছুঁয়ে যায়।

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও কি যেন ভাবছে। অগত্যা আমিই বললাম, অনিন্দ্য, সব ব্যাপারটা আর একবার খুলে বলতে পার?

আমার কথা শুনে একবার জলভরা চোখে তাকাল অনিন্দ্য। তারপর ও যা শোনাল, ব্যাপারটা মোটামুটি এইরকমঃ

'ইউনিক রেকর্ডিং কোম্পানির' তিন অংশীদার আনন্দ সেন, লোকেশ চৌধুরী আর অজিত মাইতি। ব্যক্তিগত জীবনে ওরা পরস্পরের বন্ধু। কয়েক বছরের অদম্য চেষ্টায় ওদের কোম্পানি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লাভের মুখ দেখেছে। দেশের বেশ কয়েকজন নামকরা শিল্পীর গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক ক্যাসেট করে বাজারে ছেড়েছে 'ইউনিক রেকর্ডিং কোম্পানি'।

দিনগুলো ওদের ভালই কাটছিল। তারপর হঠাৎ অঘটনটা ঘটে গেল দিন তিনেক আগে রাতের বেলা।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে লোকেশ চৌধুরীর গড়িয়ার বাড়িতে তিন অংশীদার তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছে তারপর রাত দশটা নাগাদ আনন্দ সেন আর অজিত মাইতি নাকি একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরদিন সকালে অজিত মাইতির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায় লোকেশ চৌধুরীর বাড়িসংলগ্ন জঙ্গলভর্তি বাগানের একটা ডোবার ধারে।

পুলিশ অজিত মাইতির হত্যাকারী হিসেবে গ্রেফতার করেছে আনন্দ সেনকে। কারণ বন্ধু হত্যার অপরাধে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ এনেছে অন্য কেউ নয়—তৃতীয় বন্ধু লোকেশ চৌধুরী।

অভিযোগের স্বপক্ষে লোকেশ চৌধুরী পেশ করেছে একটা অডিও ক্যাসেট। তাতে সে রাতে ডোবার ধারে আনন্দ সেন আর অজিত মাইতির সব কথাবার্তা টেপ করা এমনকি আনন্দ সেনের ছোঁড়া গুলির আওয়াজ পর্যন্ত।

একেবারে মোক্ষম প্রমাণ!

এখানে প্রশ্ন আসে সেই টেপরেকর্ড করা ক্যাসেটটা লোকেশ চৌধুরীর হাতে এল কি করে?

এ ব্যাপারে লোকেশ চৌধুরী যে বিবৃতি দিয়েছে তা এইরকম—

আনন্দ আর অজিত তার বাড়ি থেকে বেরোবার একটু পরে সে তার টেপরেকর্ডারটা নিয়ে ডোবাটার কাছে চলে যায়। উদ্দেশ্য ছিল বর্ষার রাতে প্রকৃতির কিছু শব্দ টেপ করা যা আগামী কোনো শ্রুতিনাটকে আবহ বা এফেক্টস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। ডোবার আশেপাশে শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক। রহস্য নাটকে আবহ রচনার পক্ষে দারুণ পরিবেশ। ডোবার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে টেপরেকর্ডারটা চালু করে দিয়ে সে ফিরে যায়। পরদিন ভোরবেলা যখন সেটা আনতে যায় তখনই অজিতের গুলিবিদ্ধ দেহটা ডোবার ধারে আবিষ্কার করে।

আর তারপর লোকেশ চৌধুরী ঘরে এসে সেই টেপরেকর্ডার চালাতেই শোনা গেল হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর আর গুলির আওয়াজ, তাই তো? অনিন্দ্য সেনের জবানবন্দির মধ্যে আমি প্রশ্নটা করলাম।

হ্যাঁ, অর্ণবকাকু।

টেপ করা সেই কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই তোমার দাদা আনন্দ সেনের? এবার প্রশ্নটা মেঘনাদের।

হ্যাঁ, কিন্তু বিশ্বাস করুন মেঘনাদকাকু, খুন আমার দাদা করেনি। অনিন্দ্য কাঁদ কাঁদ মুখে বলল।

জিগ্যেস করলাম, তা তোমার দাদা এ ব্যাপারে কি বলছেন?

দাদা বলছে, ও কিছুই জানে না। লোকেশ চৌধুরীর বাড়িতে আলোচনা সেরে ও সোজা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে এসেছিল। বাড়িতে সবাই তার সাক্ষী।

আচ্ছা, হত্যাকারী বলে টেপ করা যে কণ্ঠস্বর পুলিশ তোমার দাদাকে শুনিয়েছে তা কি সে নিজের নয় বলে অস্বীকার করেছে? মেঘনাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্নটা করে।

না মেঘনাদকাকু, অনিন্দ্য মাথা নিচু করে বলে, কণ্ঠস্বর যে তারই তা দাদা অস্বীকার করেনি, কিন্তু...

বুঝেছি, মেঘনাদ এবার সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অনিন্দ্য, এখন তুমি যাও। তোমার কেসটা আমি নিলাম। মনে হচ্ছে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে।

দুই

ইনসপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্র মেঘনাদের কথাটা প্রায় এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে দুর মশাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতে মজুদ। আনন্দ সেনই তার বিজনেস পার্টনার অজিত মাইতিকে খুন করেছে। তার সে সময়ের সংলাপ তার অজান্তেই রেকর্ড হয়ে গেছে। একেই বলে কপালের ফের, বুঝলেন মেঘনাদবাবু, বলতে বলতে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নাক থেকে বার কয়েক ফোঁড়ৎ আওয়াজ ছাড়লেন ইনসপেক্টর তলাপাত্র।

আমি কি ক্যাসেটটা নিজে একবার শুনতে পারি?

যতবার খুশি শুনুন না। বলেই টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা ক্যাসেট বার করে মেঘনাদের দিকে এগিয়ে দিলেন ইনসপেক্টর।

মেঘনাদ ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা পকেটে ভরে বলল, আর একটা অনুরোধ আছে।

কি অনুরোধ?

আমি একবার লোকেশ চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বেশ তো, ইনসপেক্টর তলাপাত্র ফোঁড়ৎ করে আর একবার নিশ্বাস ফেলে বললেন, যদি চান, আমরা এখনই সেখানে হানা দিতে পারি। যদি অবশ্য লোকেশ চৌধুরী এসময়ে তাঁর বাড়িতে থাকেন।

বলতে বলতে ইনসপেক্টর তলাপাত্র পাশের ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

তিন

গড়িয়ার মহামায়াতলা থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে লোকেশ চৌধুরীর পুরনো আমলের একতলা বাড়ি। সম্প্রতি দোতলা বানানো হচ্ছে। বাড়ির পাশে জঙ্গলভর্তি বাগান। তার মধ্যে একটা ডোবা।

ইনসপেক্টর তলাপাত্রের জিপে আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে।

আগে থেকেই ফোনে আমাদের যাওয়ার খবর জানানো ছিল। লোকেশ চৌধুরী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোকের বছর চল্লিশ বয়স। ধূর্ত চাউনি। উনি আমাদের সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরটা বেশ বড়। সিলিং-এ পুরনো আমলের কড়িবরগা। বড় বড় জানলা-দরজা। মাথার ওপরে আদ্যিকালের একটা পাখা এক নাগাড়ে শব্দ করে ঘুরে চলেছে। ঘরে খানকয়েক চেয়ার, একটা টেবল। দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা আলমারি। তাতে বোঝাই বই।

মেঘনাদ একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, সে রাতে আপনারা তিন বন্ধু কি এই ঘরেই বসেছিলেন?

হ্যাঁ, আসলে আগামী পুজোয় আমাদের কোম্পানি থেকে একটা শ্রুতিনাটকের ক্যাসেট বেরুবার কথা। সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যেই...

শ্রুতিনাটক! কথাটা মেঘনাদ যেন আপনমনেই একবার উচ্চারণ করল। তারপর বলল, নাম কি নাটকটার?

অপরাধী সূত্র রেখে যায়...

লোকেশবাবুর কথা শেষ হবার আগেই মেঘনাদ সামনের দেয়াল আলমারির সেল্‌ফ থেকে একটা বই নামিয়ে ফেলেছে—'শ্রুতিনাটক সংকলন'। সংকলনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থমকে মেঘনাদ বলল, এই নাটকটা?

লোকেশ চৌধুরী সেদিকে একবার উঁকি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ...কিন্তু...।

মেঘনাদ বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সহজভাবেই জিগ্যেস করল, নাটকটার বিষয়বস্তু কি?

ওই মানে দুই বন্ধুর মধ্যে সংঘাত। এক বন্ধুর পূর্ব অপরাধের প্রতিশোধ নিতে...মানে...

লোকেশবাবু, মেঘনাদ লোকেশ চৌধুরীর কথা শেষ হবার আগেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন নাটকটার মাঝের একটা পৃষ্ঠা নেই?

পৃষ্ঠা নেই! সেকি! লোকেশ চৌধুরী বেশ অবাক হয়েই হাত বাড়িয়ে বললেন, কই, দেখি?

মেঘনাদের হাত থেকে বইটা নিয়ে লোকেশবাবু সেটা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, হ্যাঁ, তাই তো। বোধহয় বাইন্ডিংয়ের দোষেই...

ইনসপেক্টর তলাপাত্র পাশ থেকে বলে উঠলেন, আর মশাই, বলবেন না। আজকাল বইয়ের বাইন্ডিংয়ের যা দশা হয়েছে! এই তো সেদিন মেয়ের ইতিহাসের টেক্সট বই কিনে বাড়ি ফিরে দেখি পুরো ষোল পৃষ্ঠা গায়েব।

মেঘনাদ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বলল, আচ্ছা লোকেশবাবু, সে রাতে আপনারা এ ঘরে কি কোনো নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছিলেন?

না, তা ঠিক নয়, লোকেশ চৌধুরী আমতা আমতা করে বললেন, আসলে আমরা আগামী নাটকটির প্রযোজনা এবং অভিনয়ের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

ও, আচ্ছা...মেঘনাদ আপনমনে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, আচ্ছা, বলতে পারেন আনন্দ সেন আর অজিত মাইতির মধ্যে কোনো পুরনো শত্রুতা ছিল কিনা?

হ্যাঁ, মানে...লোকেশ চৌধুরী আবার কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, সে প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। একটা বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপারে অজিত আর আনন্দের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল। অজিত আনন্দকে অপমান করেছিল। সেবারে আমি ওদের মধ্যে ঝগড়াটা মিটিয়ে দিলেও আনন্দ ব্যাপারটা ভুলতে পারেনি। আমায় আড়ালে সুযোগ পেলেই বলতো অজিতকে ও একদিন উপযুক্ত জবাব দেবে।

হুঁ! শুনতে শুনতে মেঘনাদ উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল, আচ্ছা, লোকেশবাবু, আপনার কাছে যা জানার তা জানা হলো। এবার আপনার বাগানে যে জায়গায় খুনটা হয়েছিল সেটা একবার দেখতে চাই।

লোকেশ চৌধুরী হাতে টর্চ নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে বাগানে নিয়ে গেলেন। মেঘনাদ ওই অন্ধকারের মধ্যেই টর্চের আলোয় ঘুরে ঘুরে পুরো বাগানটা দেখল, বিশেষ করে ডোবার ধারে যেখানে অজিত মাইতির মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই জায়গাটা। টেপরেকর্ডারটা যেখানে রাখা ছিল সেখানটাও লক্ষ্য করল।

এরপর ফেরার পথে লোকেশ চৌধুরী আমাদের পুলিশ জিপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, মেঘনাদবাবু, আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি। বন্ধুত্বের থেকেও আইনের মর্যাদা বেশি বলে আমি মনে করি, আর তাই...

আপনি ভাববেন না, মেঘনাদ জিপে উঠে ইনসপেক্টর তলাপাত্রের পাশে বসে বলল, সে মর্যাদা আমি পুরোপুরি বজায় রাখবো কথা দিলাম।

চার

পরের দিনটা মেঘনাদকে ফোনে ধরতেই পারলাম না। যখনই রিং করেছি, শুনেছি ও বাড়ি নেই। অবশেষে সন্ধ্যে নাগাদ ওকে ধরতে পারলাম।

মেঘনাদ ফোন ধরেই বলল, অর্ণব, এক্ষুণি চলে আয়। কথা আছে।

মনে কৌতূহল নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেঘনাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলাম। মেঘনাদ একা ওর ড্রইংরুমে বসে টেপরেকর্ডারে একটা ক্যাসেট ভরে একমনে শুনছিল। আমায় দেখে বলল, বোস। এই ক্যাসেটটা আবার গোড়া থেকে শুরু করছি, শোন।

আমি কিছু বলার আগেই ও ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করে আবার শুরু করল।

ক্যাসেট চলছে। প্রথমে কয়েক মিনিট ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। ব্যাঙের ডাক। বোঝাই যাচ্ছে রাতের পরিবেশ। দূরে কোথাও কুকুর কেঁদে উঠল। সেই সঙ্গে বিচিত্র একটা ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ। এরই মধ্যে হঠাৎ দুই ব্যক্তির সংলাপ শুরু হলোঃ

১ম ব্যক্তি॥ কি ব্যাপার! তুমি হঠাৎ এখানে আমায় ডেকে আনলে কেন?

২য় ব্যক্তি॥ একটা পুরনো হিসেব আজ মেটাতে হবে।

১ম ব্যক্তি॥ হিসেব? কিসের হিসেব?

২য় ব্যক্তি॥ মনে পড়ছে না বন্ধু? বছর কয়েক আগে তুমি আমার যে সর্বনাশটা করেছিলে...যে অপমান...

১ম ব্যক্তি॥ এসব কি বলছ তুমি! এ কি, রিভলবার বার করছ কেন? তুমি, তুমি কি...?

২য় ব্যক্তি॥ (নির্মম হেসে) হ্যাঁ। আজই তোমার জীবনের শেষ দিন। আজকের এই সুযোগটার জন্যেই আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি।

১ম ব্যক্তি॥ (ভীত) শোন...আমার কথা শোন...আমায় মের না।

২য় ব্যক্তি॥ আজ আর কেউ তোমায় আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না (গুলির শব্দ। আর্ত চিৎকার) আঃ...আঃ...আঃ...।

ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। ব্যাঙের ডাক।

মেঘনাদ টেপরেকর্ডার বন্ধ করল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি বুঝলি অর্ণব?

আমি বললাম, এই সংলাপই কি সে রাতে ডোবার ধারে সাউন্ড রেকর্ড করার সময়ে লোকেশ চৌধুরীর টেপরেকর্ডারে ধরা পড়েছে?

হ্যাঁ। মেঘনাদ বলল, আর কণ্ঠস্বর দুটি কাদের অনুমান করতে পারছিস?

এ তো বোঝাই যাচ্ছে। আক্রমণকারী আনন্দ সেনের কণ্ঠস্বর। আক্রান্ত মানুষটি অজিত মাইতি। তার ডেডবডিই তো পরদিন ভোরবেলায় ডোবার ধারে পাওয়া গিয়েছিল?

ঠিক তাই। মেঘনাদ এবার সোফায় হেলান দিয়ে বলল, তা এই রেকর্ড করা সংলাপ শুনে তোর কি মনে হচ্ছে অর্ণব?

আনন্দ সেনই যে খুনটা করেছে এ তো তার মোক্ষম প্রমাণ। তবে যাই বলিস, ব্যাপারটা বড় নাটকীয়।

আমরা এখনই সেখানে হানা দিতে পারি।

এগজ্যাক্‌ট্‌লি। ঠিক এই কথাটাই আমি ভেবে চলেছি। হঠাৎ মেঘনাদের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর সে কারণেই তো আজ সকালে ইউনিক রেকর্ডিং কোম্পানির আগামী নাটক 'অপরাধী সূত্র রেখে যায়'-এর নাট্যকারের কাছে গিয়েছিলাম সেদিন লোকেশ চৌধুরীর ঘরে সে নাটকের খোয়া যাওয়া পৃষ্ঠাটি উদ্ধার করে আনতে। বলতে বলতে মেঘনাদ মূল নাটকটা থেকে একটা জেরক্স করা পৃষ্ঠা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে, এটা পড়ে দেখ।

মেঘনাদের কথা শুনে হাত বাড়িয়ে পৃষ্ঠাটি নিলাম, তারপর তাতে চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম, এ কি! এও কি সম্ভব!

ঠিক তখনই মেঘনাদের ফোনটা বেজে উঠল।

মেঘনাদ রিসিভার তুলে কানে দিয়ে শুধু 'গুড' বলে সেটা নামিয়ে রাখল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ইনসপেক্টর তলাপাত্র জানালেন, আমার কথামতো আসল অপরাধীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আশা করা যায় একটু কড়াধাতের দাওয়াই পড়লেই সে তার অপরাধ স্বীকার করবে।

আমি জিগ্যেস করলাম, আসল অপরাধী কে?

আর কে! লোকেশ চৌধুরী নিজেই।

পাঁচ

দিন দুয়েক পরের কথা। ইনসপেক্টর তলাপাত্রের কড়া দাওয়াই এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে লোকেশ চৌধুরী তার অপরাধ স্বীকার না করে পারেনি। এমনকি তার ঘর সার্চ করে কোনো এক গোপন স্থান থেকে সে রাতে যে রিভলবারটার সাহায্যে খুন করা হয়েছিল সেটাও পাওয়া গেছে। তাতে মিলেছে লোকেশ চৌধুরীর আঙুলের ছাপ।

সব কাজ শেষ হবার পর মেঘনাদের ড্রইংরুমে বসে সেদিন সকালে মেঘনাদকে জিগ্যেস করলাম, খুনটা যে লোকেশ চৌধুরী নিজেই করেছে তা তুই বুঝলি কি করে?

মেঘনাদ বেশ আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল, লোকেশ চৌধুরী টেপরেকর্ডারের অ্যালিবাইটা বেশ জব্বর ফেঁদেছিল, কিন্তু আমার প্রথম সন্দেহ হলো যখন নিশীথ রাতে ডোবার ধারে টেপকরা সংলাপের মধ্যে বিচিত্র ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দটা শুনলাম। তারপর লোকেশ চৌধুরীর ঘরে ঢুকে দেখলাম এ শব্দ তার ঘরের একটা পুরনো পাখা থেকে হচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় বল তো অর্ণব?

কি?

প্রমাণ হয়, ওই সংলাপ আসলে ওই ঘরের মধ্যেই কোনো নাটকের রিহার্সালের অছিলায় গোপনে টেপ করা হয়েছে। তারপর সেটা অন্য একটা ক্যাসেটে ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর সেটাই খুনের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মানে যেমনভাবে বেতার নাটকে আলাদা ভাবে সংলাপ রেকর্ড করে তারপর অন্য ক্যাসেটে মিউজিক এফেক্টসের সঙ্গে মেশানো হয়, তাই তো?

ঠিক তাই। কিন্তু বন্ধু, চালাকিটা মাঠে মারা গেল ওই পুরনো পাখার ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দে। ওই শব্দ কখনও ডোবার ধারে হতে পারে না। আমার ধারণা আরও দৃঢ় হলো যখন লোকেশ চৌধুরীর ঘরে শ্রুতিনাটক সংকলনের একটা পৃষ্ঠা পেলাম না। আসলে লোকেশ চৌধুরীর অপরাধী মন পৃষ্ঠাটি কেটে রেখেছিল। সেটা পেলাম নাট্যকারের বাড়িতে। সে পৃষ্ঠায় লেখা সংলাপ টেপরেকর্ড করা সংলাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

সব শুনে বললাম, কিন্তু এ খুনের মোটিভ কি মেঘনাদ?

সেটাও আমি খোঁজ নিয়েছি। ইউনিক রেকর্ডিং কোম্পানির অংশীদারী শর্ত ছিল একজন অংশীদারের মৃত্যু হলে তার অংশ যাবে অন্যদের কাছে এবং দু'জনের মৃত্যু হলে তা বর্তাবে তৃতীয় জনের ওপর। অতএব বুঝতেই পারছিস অর্ণব...।

আর বোঝার কিছু ছিল না। তবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মেঘনাদের ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা বেজে উঠল।

একটু বাদেই মেঘনাদের কাজের লোক দীননাথের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল অনিন্দ্য সেন। ওর মুখভর্তি হাসি আর হাতভর্তি বিরাট সাইজের এক হাঁড়ি রসগোল্লা।

অনিন্দ্যর দাদা আনন্দ সেনকে পুলিশ তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

ছবিঃ দেবকী

রাপ্তার বন্যায়

সুকুমার ভট্টাচার্য

বুনো হাতির দল দ্রুতগতিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সভয়ে পেছন ফিরে একবার তাকাল। দেখল জঙ্গলটা তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। হলে হবে কী, এক বিপদ এড়িয়ে এসে দেখল, সামনে আর এক বিপদ! তাদের ইচ্ছে ছিল, সামনের নদীটা পেরিয়ে অন্য পারে গিয়ে নিজেদের বাঁচাবে কোনোরকমে। কিন্তু সামনের নদীতে হঠাৎ বন্যার ঢল নেমেছে। দারুণ স্রোত কুলকুলিয়ে ছুটে চলেছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতির দলটা তীর বরাবর এসে। নদীর অমন উগ্র রূপ দেখে তারা খুব ভাবনায় পড়ে গেল। এমন উত্তাল অবস্থা যে পার হওয়া অসম্ভব। এখন উপায়? পেছনে আগুন-লাগা জঙ্গল দাউ দাউ জ্বলছে। আকাশ কালো করে ধোঁয়া উঠছে ক্রমাগত। আর সামনে পাহাড়ী নদী রাপ্তা। ফুলে ফেঁপে কূল ছাপিয়ে ছুটছে প্রচণ্ড গর্জনে।

হাতির দলটা এমন কিছু ছোট নয়। দলে আছে বিরাট দাঁতওয়ালা বয়স্ক হাতি। আছে কম বয়সের কিছু হাতিও। আর আছে এক মা আর তার বাচ্চা। মায়ের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে এসেছে বাচ্চাটা। মাত্র দু'মাস তার বয়েস। পাছে দলছুট হয়ে যায়, সেই ভয়ে সে দম বন্ধ করে মার পিছু পিছু ছুটে এসেছে। একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। এটাই সব থেকে নিরাপদ জায়গা।

যখন সে জন্মায়, তখন তার গায়ের চামড়া ছিল কোঁকড়ানো। সারা গায়ে ছিল লম্বা ঘন কালো চুল। এখন সে সব আর নেই। তার জায়গায় সারা দেহে ধুলো-কাদা আর লতাপাতার নোংরা। অন্যান্য হাতিরা শুঁড় দিয়ে যা করে, সে-ও তাই করে। সব সময়েই অন্যদের মতো শুঁড় দোলায়। খুব বড় হলে শরীরটা তার উচ্চতায় তিরিশ ইঞ্চি।

সে নেহাতই নাবালক তাই জগৎ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। নির্ভয়ে সে তাকিয়ে থাকে রাপ্তার দিকে। রাপ্তা তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। সাদা ফেনার পাহাড় তার বুকের ওপর। মরা-গাছের গুঁড়ি, ভেঙে পড়া গাছের ডাল, মরা জন্তু-জানোয়ার সেই স্রোতে পাক খেতে খেতে ভেসে চলেছে। সময়টা বলতে গেলে একেবারে গ্রীষ্মের শেষ আর বর্ষা আসব আসব করছে। যখন আকাশের বিদ্যুতের প্রভা থেকে জঙ্গলে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে, গরম বাতাসে তেতে থাকা ঘাস জ্বলে ওঠে। ইতিমধ্যেই বর্ষা এসে হাজির হয়েছিল অনেক ওপরকার পাহাড়-চূড়ায়। বৃষ্টির জল সেখান থেকে ঝরে পড়েছে জলপ্রপাতের মতো। যেন ফুটন্ত জল। ধুলো-বালি-নোংরা সমেত ঝরে পড়ছে রাপ্তাতে। পরে সমতলে এসে সেই জলরাশি প্রায় আধমাইল ব্যাপ্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

উত্তেজনা প্রবল হলো হাতিদের মধ্যে। জঙ্গলের মধ্যে তারা কোনো বিপদকেই তেমন ডরায় না। কিন্তু সামনে-পেছনে এই বিশ্রী পরিস্থিতি মোটেই তৃপ্তিকর নয়। দলের সবচেয়ে প্রবীণ হাতিটা যে নাকি দলপতি, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রাপ্তার তীর বরাবর। আবার প্রায় তখনি পিছিয়ে এল। রাগে-ক্ষোভে তার হাবভাব এমন হয়ে

উঠল, যেন সে প্রতিশোধ নেবে রাপ্তার ওপর। কিন্তু সেটাও তো সম্ভব নয়। বেচারা দলপতি অসহায়ভাবে তার বিরাট মাথাটা নাড়তে লাগল এদিক-ওদিক। দেখলে মনে হবে, যেন মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক অল্পবয়েসী মেয়ে হাতি চঞ্চল হয়ে উঠল। জঙ্গলে আগুনের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। কিন্তু জানে না বন্যার ব্যাপারটা ঠিক কেমন? মনে মনে নিজেকে শক্ত করে, দৃঢ় পায়ে গিয়ে দাঁড়াল উদ্দাম রাপ্তার সামনে। সাঁতার কেটেই তার পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে নদীটা। প্রথমে শুঁড় ডুবিয়ে জলের পরশ নিয়েই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল অকূলে। আর সঙ্গে সঙ্গে রাপ্তা তাকে টেনে নিল। উদ্দাম বেগে নিচের দিকে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

ওর দেখাদেখি, পেছনের হাতিগুলোও বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। একের পর এক। দেখা গেল, একটা পুরো হাতির দল ভেসে চলেছে উদ্দাম জলস্রোতে। শুধুমাত্র সেই ছোট্ট হাতি আর তার মা ছাড়া। শেষে ছেলেকে নিয়ে এপারে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেল না মা-হাতি। বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে সে-ও গা ভাসাল জলে।

দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে মায়ে-ব্যাটায় সাঁতার কাটতে লাগল। এদিক-ওদিক হাত-পা ছুঁড়ে কোনোরকমে গিয়ে মিলতে চায় আগে ভেসে যাওয়া দলটার সঙ্গে। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না মা-হাতির সামনে। আগুনের কথা বাদ দিলেও, এতটুকু বাচ্চাকে জঙ্গলে একা ফেলে আসাটা ঠিক না! এখনো সে নিতান্তই শিশু, বাঘ হয়তো তাকে শত্রু হিসেবে নেবে না, হয়তো তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারে। কিন্তু ওকে যদি ওদের স্বজাতির মধ্যে রেখে বড় করা যায়, তাহলে এককালে সে সত্যিকারের শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে। এইসব ভেবেই মা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে নেমে পড়েছিল।

নদীর দিকে তাকিয়ে কিন্তু বাচ্চাটা রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। কিছুতেই জলে নামতে চায় না। আদৌ পছন্দ করে না জলে পা দিতে। কিন্তু তার মা প্রচণ্ড ঠেলা দিয়ে তাকে জলে নামিয়ে দিল। জলকে সে জানে। সে ভালবাসে জল। ইতিপূর্বে জলে নামার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। কিন্তু সে সব হলো ছোট জলাশয়। যে জলে স্রোত নেই, জলে নামলে পায়ের নিচে নরম মাটির পরশ লাগে। রোদের তাপে কেমন যেন একটু গরম গরম ভাব। আর এখন এই যে উত্তাল তরঙ্গ, কনকনে হিমেল, এ একেবারে অসহ্য। সে চায় এই নিগ্রহ থেকে রেহাই পেতে।

তার মা কিন্তু তাকে বারবার তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পাছে বেচারার বেশি কষ্ট হয়, পাছে ভেসে যায়, তাই তার মা তাকে রেখেছে ঠিক পেটের নিচে। চার পায়ের ঘেরাটোপের মধ্যে। আর সেই ভাবেই ভেসে চলল উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

এই সময় রাপ্তা দারুণ খরস্রোতা। তার খরগতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ কথা নয়। আগুন-লাগা বনের মধ্যে থেকে ছেলেটার শরীর গরম হয়েছিল। তাই জলে নামার পর প্রথম প্রথম বেশ আরামই লেগেছিল। কিন্তু যখনি তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল, তখনি ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা। চিৎকার করে উঠল সে। পরিত্রাহি পাগুলো ছুঁড়তে আরম্ভ করল জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার চেষ্টায়। প্রাণী মাত্রই আপনা থেকে সাঁতার দিতে পারে, সে-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়লেও, তার মা-ও একটু একটু করে স্রোতের উদ্দামতা কাটিয়ে উঠতে পারল। স্রোত যত খরই হোক সামাল দিয়ে উঠল। কিন্তু বাচ্চাটার এ অবস্থা পছন্দ নয়। চারদিকের অথৈ জলের ভয়াবহতা সে কি সহ্য করতে পারে! প্রতি মুহূর্তেই দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় নিচের দিকে। বাঁচবার জন্যে যে সে আরো জোরে হাত-পা ছুঁড়বে, সে উপায়ও নেই। তার মায়ের চারটে পায়ের মাঝে থেকে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টই থাকতে হয়। ভেসে থাকতে হয়। এই ভাবে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ স্রোত আরো বেড়ে গেল। প্রচণ্ড একটা আওয়াজ কানে এল। সভয়ে পেছনদিকে তাকাতেই দেখল, জলস্তম্ভের মতো বিশাল জলরাশি হুড় হুড় দুড়দাড় আওয়াজ করে ছুটে আসছে। সেই জলরাশির সঙ্গে মিশে আছে ধুলো-বালি খড়-কুটোর জঞ্জাল। তার এগিয়ে আসার বেগ এত বেশি যে, রাপ্তার আসল গতিবেগও তার কাছে কিছু নয়।

মুহূর্তের মধ্যেই সে জলরাশি ভেঙে পড়ল তাদের মাথার ওপর। সূর্যের আলোয় তার ফেনাপুঞ্জ যেন দাঁত বার করে খিলখিল করে হেসে উঠল কুটিল আনন্দে। মা আর ছেলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল অকূলে।

বাচ্চা হাতি তার মাকে আর দেখতে পায় না। মা অদৃশ্য। সে স্রোতের মুখে। স্রোতের ঠেলায় একবার আকাশে ওঠে তো পরে পরেই তলিয়ে যায় অতলে। অবিরত পাক খায় জলের ভেতর। আঁকু-পাঁকু অবস্থায় একসময় ভেসে ওঠে জলের ওপরে। সাঁতার কাটতে কাটতে চেষ্টা করে নিজেকে টিকিয়ে রাখার।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখতে পায় ডাঙা, আর তার পরে পরেই পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পায়।

নাকানি-চোবানি খাওয়া বাচ্চা হাতি হাঁচোড়-পাঁচড় করে দু-তিন পা এগিয়ে স্থির হয় সেই জায়গাটায়। আসলে রাপ্তার ওই জায়গাটা একটু উঁচু, আর রাশি রাশি শিলাখণ্ড অর্থাৎ বোল্ডারে ভরা। জলস্রোতে কতকটা আধডোবা কুমিরের পিঠের মতো দেখতে।

এটা একটা চড়া বলা যায়। রাপ্তার মাঝে বোল্ডার জমে জমে দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। ওখানে না আছে মাটি, না আছে কোনো গাছগাছালি। আর প্রতি বর্ষাতেই একটু একটু করে বড় হয়েছে। বসন্তকালে শঙ্খচিলরা এখানে এসে ডিম পাড়ে। সাদার ওপর অসংখ্য কালো কালো ফুটকি দাগে ভর্তি সে সব ডিম। বালির ওপর সেগুলো নুড়ির মতো পড়ে থাকে।

বাচ্চাটা কোনোরকমে উঠে দাঁড়ায় সে জায়গাটায়। রাশি রাশি খালি ডিমের খোলা তার পায়ের চাপে মড়মড় আওয়াজে ভেঙে যায়। ছোট ছোট নুড়ি

পাথর আরো চেপে বসে যায় বালির ভেতর। ব্যাপার দেখে সে ভয়ে কাঁপে থরথর করে। একবার পা ফেলার পর আর দ্বিতীয়বার পা ফেলতে ভরসা পায় না। সে যেটুকু পারে, তাই করল। শুধু অনড় হয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চারদিককার জল তখন কলকল আওয়াজ করে কৌতুকে বয়ে যেতে লাগল। আর সূর্য সরাসরি তার গায়ে রোদের চাদর জড়িয়ে দিয়ে দেহটা গরম ঝরঝরে করার চেষ্টা করে চলল। এখন তার নাক দিয়ে শুধু ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস পড়ে। অনিমেষে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে চারদিক। যদি মাকে দেখতে পায়!

কিন্তু কোথায় মা? কোথাও তাকে দেখা যায় না।

সে তার ছোট্ট শুঁড়টা ঘোরায় এদিক-ওদিক। যদি তাদের দলটাকে দেখতে পায়। বন্যার জলে সে মাটি আর পাতার গন্ধ পায়। একটা ডুবে মরা মোষ ভেসে এসে আটকে আছে চড়ায়। দুর্গন্ধে চারদিক ভারী করে রেখেছে। সাদা সাদা পোকা দেহটার কোথাও কোথাও জমে আছে। খর বাতাস তার ওপর গর্ত তৈরি করছে ঘন ঘন। নদীর অপর তীরে চোখ পড়ল। সে জায়গাটা তখনো জ্বলছে। ঝলসে যাওয়া ঘাস, পোড়া-আধপোড়া বীজশীষ দুলছে হাওয়ায়। দু-একটা গাছ তখনো জ্বলছে। কিন্তু কোথাও কোনো হাতির দল তার চোখে পড়ল না। এই সময় হঠাৎ একটা সুন্দর অনুকূল বাতাস বয়ে এল দূর থেকে। যার মধ্যে সজীব গাছপালা, বাঁশবন আর ফলের মিলিত মনোহর গন্ধ মেশানো।

বাচ্চা হাতিটা কিছুটা সুস্থ বোধ করে নিজেকে। গা ঝেড়ে বালি ঝরিয়ে দেয় দেহ থেকে। শুঁড় দিয়ে পেটের নিচটা চুলকে নেয় বার কয়েক। লেজ, কান আর শুঁড় দোলাতে দোলাতে বহমান নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ কি খেয়াল হয়, বালি তুলে তুলে নোংরা করে তোলে নিজের শরীর। কখনো বা সামনের একটা পা তুলে বিশ্রাম নেয় বড় হাতিদের মতো। শুঁড় দিয়ে জোরে জোরে বাতাস টানে আর ভাবে।

একটু পরেই কিন্তু সে অনুভব করল, পায়ের নিচের বালি ক্রমশ নরম হচ্ছে। জল আর বালি তরল জেলির মতো হয়ে পায়ের পাতা ছাপিয়ে উঠছে। বুদবুদ উঠছে। নদীর ধার থেকে আরো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে শক্ত জায়গায় দাঁড়াল। দেখল, জলের কাছাকাছি পড়ে থাকা নুড়ি পাথরগুলো জলে ডুবে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ভয় পেয়ে বাচ্চা হাতিটা পিছিয়ে একেবারে চরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কান খাড়া করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখল, জল বাড়ছে। পরে পরেই সে জল প্রচণ্ড বেগে বয়ে যেতে লাগল পায়ের ওপর দিয়ে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে নিজেকে খাড়া রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। স্রোতের বেগ শেষ পর্যন্ত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এখন আর সাঁতার দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

অনেক চেষ্টায় সে নিজেকে ভাসিয়ে রাখল কোনোমতে। কিন্তু যাবে কোন দিকে? কোন দিক নিরাপদ সে বুঝতে পারে না। জলের স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলল ক্রমাগত। কিছুদূর গিয়ে রাপ্তা একটা বাঁক নিয়েছে। জলের বেগ তাকে সজোরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দিল সামনের আর একটা ডাঙার ওপর।

সে-ও কোনোরকমে মাটি কামড়ে উঠে দাঁড়াল জমিতে। এখন আর সে তেমন ভয় পেল না। এমন কি অবাকও হলো না। শান্তভাবে দেখল আশপাশটা। ভাবনা তখন তার একটাই। না জানি আবার কি ঘটবে!

এখন সূর্যাস্তের সময়। নজর করতে বুঝল, রাপ্তা যেন আর আগের মতো অশান্ত নয়। চারদিককার গাছগাছালির মাথায় সন্ধ্যা নেমে আসছে একটু একটু করে। ময়ূর আর হনুমান রাত কাটাবার জায়গা খুঁজছে, কোথায় গিয়ে ঘুমোবে। গাছের থোকা থোকা ফুলের ওপর থেকে মৌমাছিরা উড়ে পড়ছে। নিঃশব্দে উড়ে চলেছে মৌচাকের দিকে। একটা প্যাঁচা উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। এবার উঠল মশার ভনভনানি আর শিয়ালের ডাক।

বাচ্চা হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য

ইচ্ছে লতায়

অশোক কুমার মিত্র

ছবির মতো মাঠ ছিল এক
ঢেউ ছলছল পুকুর,
নাচ দেখাতো রুপুলি মাছ
ইচ্ছে হলে খুকুর।
খেলত খোকা খেলার মাঠে
ক্রিকেট-হকি আর—
ফুটবল ও দারিয়াবান্ধা
লাগতো চমৎকার।
গাছ ছিল বট, বেজায় বুড়ো
হরেক পাখির বাসা,
পাখ্পাখালির উড়ুৎ-ফুড়ুৎ
জমত খেলা খাসা।
আকাশ ছিল সুনীলবরণ
মেঘ ভাসত তাতে,
থালার মতো চাঁদ উঠত
পৌর্ণমাসির রাতে।
পুকুর এখন মাঠ হয়েছে
গাছ গিয়েছে কাটা,
মাঠ গিলছে রাঘব-বোয়াল
হাইরাইজের হাঁ-টা।
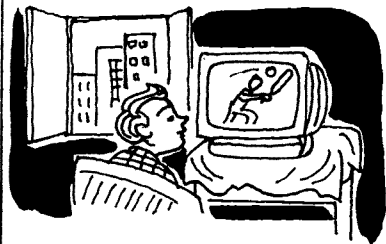
এদিকে চাই ওদিকে চাই
শুধুই বাড়ির সারি,
আকাশ ছুঁতে এখন তাদের
পাল্লা চলে ভারি।
ইচ্ছে লতায় ফুল ফোটে না
খুকুর এমন দিনে,
খোকার খেলা সন্ধ্যে-সকাল
চলছে টি.ভি-র স্ক্রিনে

ছবিঃ সুফি

করে।

অনেক দূর থেকে একটা বাঘের ডাক শোনা গেল। একটু পরেই পেছনের একটা পাহাড় থেকে আর একটা বাঘ ডেকে উঠল। যেন প্রথম বাঘের উত্তর দিল দ্বিতীয় বাঘটা।

ঠিক তাই। কেননা একটু পরেই সামনে এবং পেছনের ডাকাডাকিটা বেড়ে গেল। মনে হলো, বাঘ দুটো যেন দু'দিক থেকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাচ্চাটা। তারপরেই ভাল-মন্দ বিচারবোধ হারিয়ে, শুঁড় উঁচিয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল মায়ের উদ্দেশে।

অনেক দূর থেকে মায়ের উত্তর শুনতে পেল সে।

মা তাহলে ধারে কাছেই আছে! তাড়াতাড়ি কাছে পাবার আশায় আরো ঘন ঘন ডাক দিতে লাগল সে।

ঢালু নদীর তীরের অনেক নিচের দিকে তার মা-ও তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে এবার মায়ের গতি আরো দ্রুত হলো। বলতে গেলে প্রায় পাগলের মতো ছুটে ছেলের কাছাকাছি হবার চেষ্টা করল।

এই সময় বাঘ দুটোর ডাকাডাকি বন্ধ ছিল। তার মানে, তারা মনে মনে কিছু মতলব ভাঁজছে।

বাচ্চাটা তার মায়ের অবস্থান টের পায়, বুঝতে পারে মা এগিয়ে আসছে গাছের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে। কিন্তু সে নিজে আর হাঁক পাড়ে না। মাকে জানান দেয় না যে, সে ঠিক কোথায়! কারণ সে তার সহজাত বোধ থেকে বুঝতে পেরেছে, তার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া। বাঘ দুটোর অস্তিত্ব তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। তাদের কোনোটা বা খুব উজ্জ্বল, কোনোটা বা নিস্প্রভ। সেই শান্ত নিস্প্রভ আলোতেও জানোয়াররা বেশ ভালই দেখতে পায়। বাচ্চা হাতিটারও চারদিকে নজর করতে কিছু অসুবিধে হয় না। কিন্তু জানে না কি দেখবে, বা কাকে দেখবে? তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক তখনি বাঘ দুটো নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল পা টিপে টিপে।

ওদিকে তার মা-ও ঘাস-পাতা মাড়িয়ে, জঙ্গলের গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। ফলে প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে। বাচ্চাটা তাকায় সেদিকে। দেখতে পায়, একটা গর্জায়মান অন্ধকারের স্তূপ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বিপরীত দিকে আর একটা ছায়া—এক নিঃশব্দ শ্বাপদের। আর পরে পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপদটা।

ডোরাকাটা বাঘটা প্রথম ধাক্কাতেই তার থুতনিতে গর্ত করে দিল। চেপে ধরল তার গলা। তার সঙ্গে তাল রেখে বাঘিনীটা বাচ্চাটার পেছনের পাটাকে চেপে ধরল। ধারালো দাঁতে কিছুটা মাংস খুবলে নিল তার পা থেকে। দু'দিক থেকে আক্রমণের চাপে তার মরবার দাখিল হলো।

ঠিক সেই সময় মা-হাতিটা এসে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘ দুটোর ওপর।

সাধারণত কি হয়, জঙ্গলের মধ্যে বাঘ আর হাতি যদি কোনো কারণে মুখোমুখি হয়, তাহলে একে অন্যকে সমীহ করে এড়িয়ে যায়। এখানে দুটো বাঘ, দু'জনের মিলিত ক্ষমতা একটা হাতিকে পেড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মা-হাতিটার যা রুক্ষ মূর্তি! নিজের সন্তানকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্যে, যাকে বলে এককথায় ভয়ংকরী!

ঝাঁপিয়ে পড়তেই বাঘ দুটো প্রায় কুপোকাত। তার শুঁড় বাঁকা হয়ে বনবন করে ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক। তার ঝাঁপিয়ে পড়াটা ছিল কতকটা ভূমিকম্পের মতো। বিদ্যুতের মতো বাঘ দুটো দু'দিকে সরে পড়ল যতটা দ্রুত সম্ভব। একটু পরে তাদের ডাক শোনা গেল দূর থেকে। রাগ আর আক্ষেপে ভরা।

মা আবার তার বাচ্চাকে নিজের পেটের নিচে টেনে নিল। গায়ে-মাথায় শুঁড় বুলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল আঘাতের পরিমাণ কতটা। সেটা টের পেতেই, আবার মুখে একটা সমবেদনার আওয়াজ শোনা গেল। বাচ্চাটার গলায় একটা গভীর ক্ষত হয়েছে, তেমনি হয়েছে পায়ে। যদিও সে দুটো এমন নয়, যাতে করে সে মারা পড়তে পারে। তবে রক্ত ঝরছে দরদর করে।

ভাবনার কিছু নেই। প্রকৃতি প্রাণীকুলের ব্যাধির নিরাময়ের জন্যে, নানা ভেষজ ছড়িয়ে রেখেছে চারদিকে—মাটি-জল-গাছের পাতায়। সর্বোপরি আছে এখানকার শুকনো হাওয়ার টান। আছে বৃষ্টি। দিনে দিনে ওই ক্ষত শুকিয়ে আসবে। যন্ত্রণার অবসান হবে একদিন। তবে যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ষাট-একশো বছর যাই হোক, এই অঘটনের একটা চিরস্থায়ী দাগ রয়ে যাবে তার দেহে।

এখন তার মা পাশে আছে। পাহাড়ের মতো বড়ো, শক্ত-সমর্থ—এর থেকে বড় ভরসা আর কি আছে? মার মনে একটা বিরাট সন্তুষ্টি—সে তার সন্তানকে বাঁচাতে পেরেছে বিপদের হাত থেকে। দুর্ভাবনা গেছে। আনন্দের একটা গদগদ স্বর বার হয়ে আসছে মার মুখ থেকে।

এখন ছেলেটা সুস্থ হলে, ভালভাবে হাঁটতে পারলে, তার মা তাকে নিয়ে যাবে বড় হাতিদের দলে। ছেলেকে নিয়ে মা-হাতি সেখানেই রয়ে গেল। রাত কাটল, ভোর হলো। বাচ্চাকে নিয়ে মা এবার রওনা হলো। নতুন প্রভাতের আলো তখন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মাথার ওপর খোলা উন্মুক্ত আকাশ। পাশে আদিমকালের বড় বড় মহীরুহ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার নিচ দিয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। কিছু পরে আর তাদের দেখা গেল না। জঙ্গল তাদের টেনে নিল নিজের মধ্যে।

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে।)

ছবিঃ দিলীপ দাস

ভূতেরা এখন

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মধ্যেই তাদের বাস। একই জনপদে। দেশ আর কাল এক, কেবল ভিন্ন স্তর আর মাত্রার বিন্যাসে তাদের সমাজ আলাদা। কত গল্প তাদের নিয়ে, কত উপকথা, ছড়া আর প্রবচন। বেশ ভাল আছে দুই সমাজ, পাশাপাশি, আজ বহুদিন ধরে। যতদিন মানবসমাজ, প্রায় ততদিনই ভূতসমাজও। প্রতিবেশী হলেও উভয় সমাজের সদস্যদের যোগাযোগ হয় কম। আগে তবু হতো, এখন বড্ড বেশি আলো আর সভ্যতার ধুমধাড়াক্কার চোটে কেউ কারো দেখা পায় না। এ ভাল কথা নয়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা জেগে ওঠার পর থেকে ক্রমাগত মাকে বিরক্ত করে যাচ্ছিল নোংরা। নোংরার মা অতিষ্ঠ হয়ে শেষে বলে ফেলল, বাঁচ, বাঁচ, তুই বাঁচলে আমি মরি—

বকা খেয়ে নোংরা একগাল হেসে বাতাসে ভর করে চলে গেল নদীর ধারের ঝুপসি জিলিপি ফলের গাছটায়। সেখানে জড়ো হয়েছে শুঁটকি, পোকা, নিমকি, গোবর—এককথায় মশানপাড়ার সব ছেলেপুলে। এখন থেকে দুপুর রাত্তিরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত চলবে খেলাধুলো। গোটাকতক আলেয়া ধরে রাখা আছে, সেগুলোকে তাড়া করে খেলা হবে।

শেওড়া গাছের নিচু ডালে বসে গতমাসের ভয় দেখানোর হিসেব দেখছিল মশানপাড়ার কমিশনার কলেরা পাঁচু। সেখান থেকেই পা দোলাতে দোলাতে সে বলল, নোংরার মা, যতই রাগ হোক, ছেলেপুলেকে বাঁচার গাল দিতে নেই। দিন দিন কী হচ্ছ?

নোংরার মায়ের নাম পোড়ানি। সে হেসে বলল, ভয় নেই কলেরা ঠাকুরপো, মায়ের গালে ছেলে বাঁচে না। তোমার হিসেব কদ্দূর হলো?

হিসেব তো হলো, কিন্তু মন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে বৌদি—

কেন, কেন?

মশানপাড়া ওয়ার্ডে যুবক ভূত আছে অন্তত বাহান্নজন। গেল সভায় তাদের মাথাপিছু পাঁচজন করে মানুষকে ভয় দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাহলে মোট কত হয়? দুশো ষাট জন। আজ পর্যন্ত কত হয়েছে জানো? মাত্র ছিয়ানব্বই জন। তাও প্রকৃত ভয় পেয়েছে কুড়ি জন, বাকিরা চোখের ভুল কিংবা ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

পোড়ানি সময়োচিত বিষণ্ণ মুখ করে বসে রইল। সমাজের পরিবর্তন, সভাসমিতি—এসব জটিল কথাবার্তা তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু পোড়ানি লক্ষ্য করেছে এসব কথা বলা আজকালকার ফ্যাশান। আলোচনা করতে গেলে বেফাঁস হয়ে পড়বার সম্ভাবনা, কাজেই বুঝদারের মতো চুপ থাকাই ভাল।

কলেরা পাঁচুর মাঝে মাঝে সত্যিই মন কেমন করে। সে আজকের ভূত নয়। সিপাহি বিদ্রোহের পরে পরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কলেরা মড়কে সে ভূতজন্ম পায়। দুশো বছরে কত লোককে সে ভয় দেখিয়েছে, ঝুপ ঝুপ বর্ষার দিনে জোলো বাতাসে ভর দিয়ে মেঘলা আকাশের নিচে ভেসে বেড়িয়েছে। আর এখন সব গেল। কোথায় সেই সবুজ ধানক্ষেত, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা পোড়ো বাড়ি, সন্ধ্যের পরে জ্বলে ওঠা জোনাকি। একটু একটু করে শহর এগিয়ে এসে গ্রাম খেয়ে ফেলেছে। তারপর আছে তীব্র ইলেকট্রিক আলোর বন্যা। পাঁচজন ভূতেই বলুক, অত আলোয় স্বচ্ছন্দে বাস করা অসুবিধে না? এই তো খন্তাই সুখে থাকত পুবপাড়ার বটগাছে। আজ দেড়শো বছরের পারিবারিক ভিটে তাদের। হঠাৎ গতবছর থেকে সেই বটগাছের পাশে বিরাট বাড়ি উঠছে। এক ধরনের লোক হয়েছে আজকাল, তাদের বলে প্রোমোটার, তারাই বাড়ি তুলছে। দুমদাম ঝনঝন খটাংখট আওয়াজ, লরি আর পে-লোডারের আনাগোনা, শতেক মানুষের দিনরাত চিৎকারে খন্তাই উদ্বাস্তু হয়ে বটগাছ ছেড়ে পালিয়েছে। নতুন বাসস্থান না পেয়ে এখন সে রেললাইনের
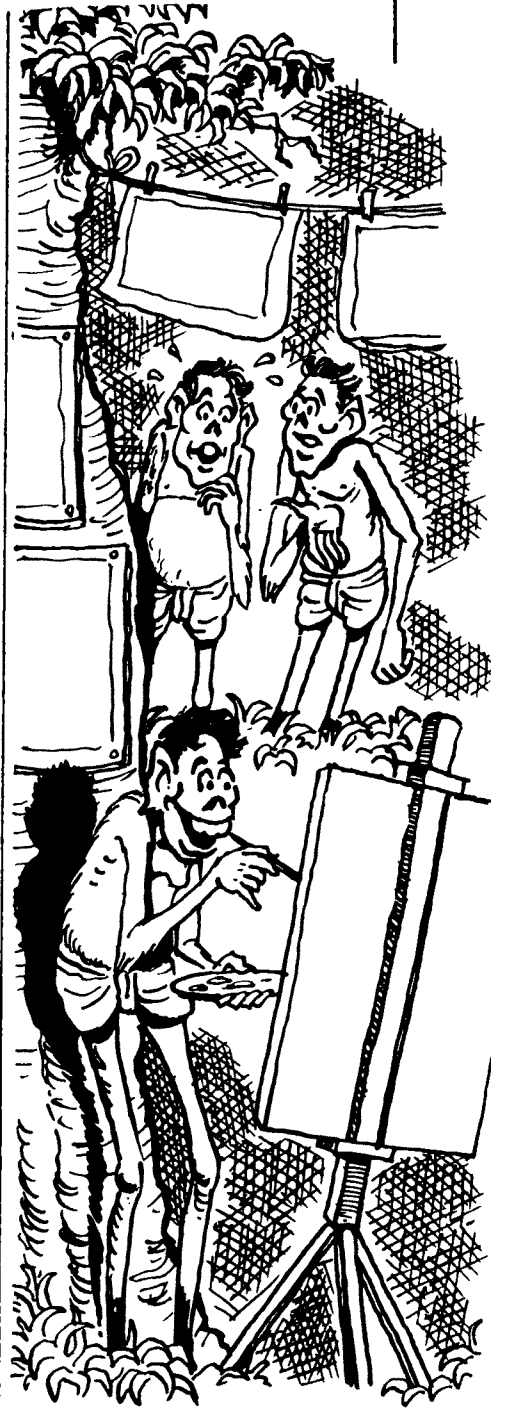
ধারে কনডেম্‌ড কেবিনঘরে কোনোমতে মাথা গুঁজে আছে। ভূতসমাজের দিক থেকে অবশ্য এই অত্যাচার এবং অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। শহরের লোকাল মস্তান দাদাকে প্রভাবিত করে তাকে দিয়ে হাঙ্গামা বাধানো হয়েছে। প্রণামীর টাকা না পেলে তারা বাড়ির কাজ করতে দেবে না। বাধ্য হয়ে প্রোমোটার টাকা দিয়েছে, এবং সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কম ভাগে সিমেন্ট, গঙ্গামাটি আর দু'নম্বর মালমশলা দিয়ে গাঁথুনির কাজ চালাচ্ছে। ভূতসমাজ গভীর আশা পোষণ করে এ বাড়ি অচিরে ভেঙে পড়বে।

আজ একটু বেশি রাত্তিরে পাঁচুর পাড়ার খেঁদি ভূতিনীর বিয়ে। পাত্র হলো বীরভূম তেলিপাড়া মহাশ্মশানের এক নব্য ভূত। গত হপ্তায় সে দলবল নিয়ে পাত্রী দেখতে এসে খেঁদির দুধে-আলকাতরা রঙ, ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা শ্ব-দন্ত আর মাথাভরা উলুকুটি-ধুলুকুটি চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তাছাড়া মেয়ে কত কাজের দেখাবার জন্য বাড়ির লোকেরা পাত্র খেতে বসলে খেঁদিকে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছিল। পরিবেশনের সময়ে খেঁদির মাথা থেকে বরের পাতে আট-দশটি উকুন পড়ে। তা দেখে আত্মহারা পাত্র বাড়ি গিয়ে নাকি বলেছে—এ মেয়ে ছাড়া সে বিয়ে করবে না। তাহলে একরকম পছন্দের বিয়েই বলা যেতে পারে। খুব জাঁকজমক হবে। গায়ে পাঁক মেখে, চুলে ধুলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে যতরকম সম্ভব ভাল সাজগোজ করে পাঁচু নেমন্তন্ন খেতে যাবে। শোনা গেল আনন্দিত খেঁদির মা সকাল থেকে মেয়েকে বারবার আশীর্বাদ করছে—এত ভাল পাত্রও তোর কপালে ছিল মা! এখন প্রার্থনা করি, সারামরণ তোদের অশান্তিতে কাটুক, শীগগির ডাইভোর্স হোক—

পুলকিত খেঁদি মাকে প্রণাম করে বলেছে—তোমার আশীর্বাদ যেন সত্য হয় মা—

শেওড়া গাছের নিচে বসে নোংরার ছোট ভাই নোনতা সেই কখন থেকে একঘেয়ে সুরে বায়না করে যাচ্ছে—আমি পঁচা মাঁছ খাঁবো। অঁ ম্যাঁ গঁ, পঁচা মাঁছ খাঁবো—

অতিষ্ঠ হয়ে পোড়ানি বলল, আর পারিনে রে বাপু! সন্ধ্যে থেকে বায়না চলেছে! আমরা কি বেম্মদত্যি না মামদো, যে কথায় কথায় দামী খাবার খাওয়াবো? আমরা সাধারণ ঘরের পাঁচমিশেলি ঘাঁটা ভূত, রোজদিন কি ঘরে পচা মাছ থাকে? এখন দুটো টাটকা মাছ যাহোক করে খেয়ে নে, তারপর দুপুর রাত্তিরে খেঁদির বিয়েতে পেটভরে পচা মাছ খাবি—

গাছের ডাল থেকে কলেরা পাঁচু বলল, শুধু কি তাই? আরো কী কী খাওয়াচ্ছে শুনবে নোংরার মা? শকুনের ডিমের ওমলেট, বাসি চাটনি—

মেয়েদের নোলা দেখাতে নেই। খুব লোভ হলেও পোড়ানি অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল।

হিসেব শেষ করে গাছের ডাল ছেড়ে বাতাসে ভাসল পাঁচু। পাড়ার একেবারে শেষে একটা তুঁতঝোপে থাকে তার বন্ধু দন্তাই, কিছুদিন ধরে তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। একবার দেখতে যাওয়া দরকার।

বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে পাঁচু দেখল ব্যাপার খুবই গুরুতর। চালতে গাছের গা বেয়ে ওঠা তেলাকুচো লতার দোলনায় দুলতে দুলতে দন্তাই আধুনিক বাংলা কবিতা আবৃত্তি করছে, আর ঝোপের পাশে বসে কান্নাকাটি করছে বাড়ির লোকজন। পাঁচুকে দেখে দন্তাইয়ের ভাই খন্তাই এগিয়ে এসে বলল, পাঁচুদা, সর্বনাশ হয়েছে! দাদাকে বোধহয় মানুষে পেয়েছে। ইদানিং বড্ড মানুষের পাড়ায় ঘোরাঘুরি করত, সবাই কত বারণ করতাম—সে কথা শুনতো না। ও পাড়ার বাতাস তো ভাল নয়, ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে—

পাঁচু জিজ্ঞেস করল, কী দন্তাই, এসব কী হচ্ছে?

দুলতে দুলতেই দন্তাই প্রথমে হিঃ হিঃ করে হাসল, তারপর বলল, বাতাসে লোহার ঘ্রাণ, পরবশ প্রার্থনায় কাটে দিন, কাটে ঘন হিম রাত। কার ছবি অন্ধকারে? মৃগয়ায় বেরিয়েছে কোন সে কিরাত?

তারপরেই আবার হিঃ হিঃ হিঃ।

ধাক্কা খাওয়ার মতো করে পিছিয়ে এল পাঁচু। তার মুখে ভয় ও বিস্ময়।

খন্তাই বলল, শুনলেন পাঁচুদা? এইরকম চলছে আজ তিনদিন।

কিন্তু এসব কী বলছে দন্তাই? এর মানে কী?

মানে তো জানি না। তবে একে বলে আধুনিক কবিতা। বাজারে খুব কদর। শুধু কি কবিতা? এদিকে আসুন, দাদার কাণ্ড দেখাই—

তুঁতঝোপের পেছনে সামান্য একটু খোলা জায়গা ঘিরে কয়েকটা কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছ। গাছেদের গায়ে কাঁটায় ফুটিয়ে কয়েকটা কাগজ টাঙানো। তাতে রঙিন হিজিবিজি কীসব আঁকা। খন্তাই বলল, দেখেছেন? ছবির একজিবিশন।

বিস্মিত পাঁচু জিজ্ঞেস করল, এ কার আঁকা?

সব দাদার। দু'দিন ধরে ছবি এঁকে গাছে টাঙিয়েছে। আমরা খুলে ফেলতে চেষ্টা করলে কামড়াতে আসছে। খুব বিপদ পাঁচুদা।

পাঁচু কাছে গিয়ে প্রথম ছবিটা দেখল। সবুজ রঙের একটা গোলমতো, তার নিচে কয়েকটা ঢেউ খেলানো খয়েরি দাগ, ডানদিকে আর বাঁদিকে চারটে বাঁশগাছ ঠেলে আকাশের দিকে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ওপারে সূর্যাস্তের ছবি। কিন্তু নিচে লেখা আছে—জ্যোৎস্নায় তাজমহল। পরের ছবিতে একটা নীল লম্বা দাগ, সেই দাগের ওপর একটা হলুদ ত্রিভুজ, পাশে পাখির খাঁচার মতো কী যেন। তলায় লেখা—স্নানরতা নারী। বাকি ছবিগুলোর দিকে হতভম্ব পাঁচু ভয়ে এগুলো না।

খন্তাই বলল, কী বুঝছেন পাঁচুদা?

বুঝবো আর কী? মানুষেই পেয়েছে। তুই একবার কানকুলো বুড়োকে খবর দে, সে এসে স্বস্ত্যয়ন করুক, ভূতপত্রীর পুঁথিটা একবার পড়ুক, দোষ কেটে যাবে এখন। সামনের শনিবার রাত্তিরে করতে পারিস। রাত্তিরটা ভাল, ত্র্যহস্পর্শ। পাঠ শেষ হলে পাড়ার ভূতসকলকে প্রসাদ খাইয়ে দিস। দশ কিলো ব্যাঙ আর পাঁচ কিলো গিরগিটিতেই কুলিয়ে যাবে। খরচ বাড়াস না—

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল,

আজ আমার বহুদিনের একটা ধাঁধা কেটে গেল।

কী পাঁচুদা ?

ভয় দেখানোর ডিউটিতে ঘুরতে ঘুরতে শহরের অনেক জায়গাতে এরকম ছবি টাঙানো দেখেছি। ভাবতাম এগুলো কারা করে। আজ বুঝতে পারছি আমরাই উৎস। ভূত পাগল হলে এসব আঁকে।

খন্তাই বিষণ্নমুখে চুপ করে রইল।

খেঁদির বিয়ের উৎসবে রাত্তিরে মশানপাড়ায় বেশ বড়রকমের একটা হট্টগোল বাধল। বরযাত্রী এসেছিল প্রায় পঞ্চাশজন ভূত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গিয়ে বিবাহবাসরের আশেপাশে শেওড়া আর বেলগাছের ডালগুলো দখল করে চড়ে বসল। বাকিরা দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় ব্যস্ত হয়ে খেঁদির কাকা ছারমুই এসে বলল, আসুন, আসুন! দাঁড়িয়ে কেন সব ? এই এখেনে এসে বসুন—

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন বলল, ওই ওখেনে ? মাটিতে বসব ? কেন বলুন তো ? বাকিরা তো সব সুন্দর গাছের ডালে জাঁকিয়ে বসেছে। আমরা কী অপরাধ করলাম ?

আজ্ঞে, ওঁরা নিজেরাই ওখেনে গিয়ে বসেছেন। আমরা তো বসাইনি। আমরা সবার জায়গা উঠোনেই করেছিলাম। দেখুন না, কেমন শ্মশান থেকে আনা মড়ার গদি পেতে দিয়েছি—

একজন রগচটা লোক বলল, আপনি বসুন গিয়ে মড়ার বিছানায়, আমরা নিচু আসনে বসব না। তেলিপাড়া গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের নাম শুনেছেন ? আমরা সেই ইউনিয়নের মেম্বার। আমাদের যা তা ভূত ভাববেন না—

ঘাবড়ে গিয়ে ছারমুই বলল, না, না! তা কেন ? আপনারা সকলেই মাননীয় ভূত।

সে মান দিচ্ছেন কোথায় ? যারা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে তারা কারা জানেন ? তারা হচ্ছে গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। ওদের গুরুত্ব কি আমাদের চাইতে বেশি ?

না, না, সে কী কথা! আপনারা সবাই সমান—

গাছের ডাল থেকে একজন মাতব্বর ভূত বলল—ও আবার কী ? সমান কেন হব ? আমরা সম্মানে ও প্রতিষ্ঠায় বড়। জানেন, আমাদের অদৃশ্য প্ররোচনায় গত এক বছরে দেড়শো গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ? বাষট্টিজন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ? আমাদেরই গোপন উৎসাহে সারা দেশে সতেরোটা নাশকতামূলক অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ? গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের অবদানকে বাদ দিয়ে ভূতসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লেখা যায় না।

গঙ্গাযাত্রা ইউনিয়নের একজন বলল, খালি বড় বড় কথা! পাড়ার বাইরে কে চেনে ওদের ?

খেঁদির বাবা আরমুই এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে তখনকার মতো বিরোধ মিটিয়ে দিল।

পরিবেশনের সময় আর একটা ঝামেলা বেধেছিল! চাটনির স্বাদ ভাল হওয়ায় সবাই দু'তিনবার করে চেয়ে নিচ্ছিল। গাত্রদাহ অ্যাসোসিয়েশনের ভূতেরা চেঁচামেচি শুরু করে—এ কী মশাই! আমাদের পাতে যা দিলেন, এ তো তিনদিনের বেশি বাসি নয়। ওদের তো গতহপ্তার চাটনি দিচ্ছেন—

আরমুই বিনীতভাবে বলল, মাননীয়গণ, আপনারা সবাই বরযাত্রী। একই দলে এক জায়গা থেকেই এসেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন কেন ?

ইউনিয়নের লোকেরা বলল, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিই তো বেঁচে থাকার সার্থকতা।

অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা বলল—ভ্রাতৃবিরোধের আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

দুই দলের লোক একসঙ্গে বলল, জয় হাঙ্গামা! লাগাও কাজিয়া!

নিমন্ত্রিতদের খাবার সাপ্লাই করেছিল মড়কানন্দ ময়রা। খবর পেয়ে সে এসে বলল, দাদারা, আমি পচা কুকুর ছাড়া, পচা খাবার ছাড়া দোকানে রাখি না। আপনাদের মতো মানুষকে কি টাটকা খাবার দিয়ে ঠকাতে পারি ? খবর নিয়ে দেখবেন মানুষজন্মে দোকান থেকে বিয়েবাড়িতে পচা দই সাপ্লাই করে মানুষ মারবার কারণে গণধোলাইতে আমি ভূতজন্ম পাই। টাটকা খাবার কাকে বলে আমি জানিই না। মনে সন্দেহ না রেখে প্রাণভরে খান দাদারা, আমি জামিন—

পাঁচু ইউনিয়ন করা ভূত। স্বজাতির অধঃপতন দেখে সে পরের সপ্তাহে ব্রহ্মডাঙার মাঠে এক বিরাট মিটিং ডাকল অঞ্চলের সব ভূতেদের নিয়ে। পাঁচু তাদের বলল, ভাইসব, মানুষ আমাদের বড্ডই ক্ষতি করেছে। আমরা তাদের কাজকর্মে কখনো নাক গলাইনি। পোড়ো বাড়ি, অন্ধকার রাত্তির, শ্মশান-মশান নিয়ে বেশ ছিলাম। পাজি মানুষেরা আমাদের সব সুখ কেড়েছে। পোড়ো বাড়ি ভেঙে পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠছে, শ্মশানে আলোর বন্যা, সেখানে ইলেকট্রিক চুল্লি বসেছে, যুক্তিবাদী সমিতির লোকেরা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বক্তৃতা করে সবাইকে বোঝাচ্ছে আমরা নাকি নেই। দশরথের ছেলেও আমাদের এত ক্ষতি করতে পারেনি। বেশ, আমরাও মজা বোঝাচ্ছি মানুষদের। আসুন ভাইসব, আমরা দলে দলে ভাগ হয়ে মানুষের বুদ্ধি দখল করি। তারা যা করতে চাইছে, তার উল্টোটা করাই। কেউ প্রশাসকদের কাছে যান, কেউ যান জনপ্রতিনিধিদের কাছে। খবরের কাগজের ভার নিক একদল, আর একদল যাক ডাক্তারদের কাছে। শিক্ষক, অধ্যাপক আর পড়াশুনোর সিলেবাস যারা তৈরি করে তাদের তো আমরা এর আগেই দখল করেছি। এভাবেই ভুতুড়ে বুদ্ধি ছড়িয়ে দিই মানবসমাজের সর্বস্তরে। সবাই বলুন—ভূতের জয়!

নিজেদের কাজ বুঝে নিয়ে বাতাসে মিশে গেল তারা। ছড়িয়ে পড়ল নতুন কর্মক্ষেত্রে।

এ হলো আজ থেকে এক কি দেড় দশক আগেকার কথা। ভূতেরা খুব বিবেকবান কর্মী। তারা কাজে ফাঁকি দেয় না। নতুন কর্মসূচিতে তারা কতখানি সফল সেটা এই যুগে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বুঝতেই পারছেন। ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া এর থেকে রেহাই পাওয়ার তো কোনো পথ দেখছি না।

ছবি : অনুরান নাথ

হ্যালো, বুবুন ?

কার্তিক ঘোষ

চড়াইকেই প্রথম খবরটা দিল চড়ুইনি।

তিনতলার ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দায় কী সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলে! এইমাত্তর বোধহয় হাসপাতাল থেকে এসে রোদের দিকে পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে।

চারতলার হাওয়া-ঘুলঘুলির বাসা থেকে বেরিয়ে চড়াই একবার নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে এলো। সত্যিই বটে, কী মিষ্টি একটা ছেলে। দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়! আহারে!

চড়ুইনি কথাটা চাপতে পারলে না। কিচিমিচি করে শালিখদেরও সবাইকে জানিয়ে এলো।

তারা বললে, তাই না কী? তাই না কী? চলো তো একবার দেখে আসি।

কিন্তু দেখবে কী, পাখিদের কিচির-মিচির শুনে ফুটফুটেটা জেগে গেল। তারপর ওঁয়া-ওঁয়া করে এমন কেঁদে উঠল যে বলার নয়।

মা অমনি ছুটে এলেন তাড়াতাড়ি।

বললেন, ও বুবুন, কী হয়েছে তোমার? কী হয়েছে? কাঁদছো কেন?

মা-কে দেখেও কান্না থামে না বুবুনের।

মা বলেন, ও মা! ওই দেখো কত্তো পাখি! দেখো—দেখো—

বাসরে! অমনি কী মজা! কী মজা!

কান্না থামিয়ে বুবুন অমনি পুটপুট করে পাখিদের দিকে চেয়ে থাকে। মা আবার রান্নাঘরে ছুটে যান। একলা বুবুন বারান্দায় তখন শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে থাকে।

চড়ুইনি বলে, ওর বাবা আপিস গেছে কি না! তাই—

চড়াই বলে, মা-টাও একলা।

শালিখরা শুনে ক্যাচরম্যাচর করে উঠল সবাই।

একলা তো কী হয়েছে? আমরা আছি না? আমরাই দেখব বুবুনকে।

পাশের বাড়ির নিমগাছ থেকে কথাটা শুনেই নেমে এলো একটা কাঠবেড়ালি।

সে-ও বললে, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি।

যেমন কথা, তেমন কাজ।

সকাল-দুপুর-বিকেল সবাই মিলে পাহারা দিতে লাগল বুবুনকে।

সকালে শালিখরা থাকলে, দুপুরে আসে কাঠবেড়ালি। বিকেলে পড়ে চড়ুইদের পালা।

বুবুনও আর ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদেই না।

পাখিদের দেখে হাসে। কাঠবেড়ালিকে দেখে হাত-পা ছোঁড়ে। বলে, ক্যাও? ক্যাও?

ছেলে কাঁদে না দেখে বুবুনের মা একা হাতেই কাজকম্ম সারেন ঘরের। দুধ খাওয়াতেই ভুলে যান মাঝে মাঝে।

বেপাড়ার একটা বেড়াল এ খবরটা পেয়ে একদিন পাঁচিলে এসে ওঠে। ইচ্ছে করে একটা আড়মোড়া ভেঙে এদিক-উদিক দেখে। তারপর চোখ বুজে শোয়। যেন ঘুমুচ্ছে।

চড়ুইনি কতকের চালাক।

চড়াইকে ডেকে বলে দিলে যা বলার।

চড়াই বললে, বটে! দেখাচ্ছি মজা!

কিন্তু বেড়ালের সঙ্গে ওরা পারবে কেন? বাঘের মাসি বলে কথা। তক্কে তক্কে থেকে একদিন ঠিক এক বাটি দুধ সাবাড় করে দিয়ে গেল বুবুনের।

চড়ুইনির ঘাড়েও আর একটু হলে লাফ দিচ্ছিল একদিন। ভাগ্যিস শালিখরা চেঁচিয়ে উঠেছিল, তাই রক্ষে। না হলে—পালক-টালক সুদ্ধু চড়ুইনিকেও অ্যাদ্দিন হজম করে ফেলত বেড়ালটা।

তাই চড়াই একদিন সক্কাল হতেই ফুড়ুক করে উড়ে পড়ল আসছি বলে।

আসছি তো—আসছি।

সেই যে গেল আসার আর নাম-গন্ধটি

নেই।

একদিন গেল। দু'দিন গেল।

তারপর—

তিনদিনের দিন চড়ুইনি তো হাপুস-হুপুস করে কেঁদেই ফেললে খানিকটা।

শালিখরা বললে, কেঁদো না। আমরা যাচ্ছি খুঁজতে। ভাবনার কী ?

না। ভাবতেও হলো না তেমন!

পাঁচদিনের দিন ফিঙেমশাইকে নিয়ে দিব্যি বাসায় ফিরে এলো চড়াই।

চড়ুইনি বললে, মশাই, আপনি আমাদের বাঁচান।

ফিঙেমশাই মুচকি একটু হেসে বললে, বাব্বা! তোমাদের এই শহরের যা দশা হচ্ছে দিন দিন! একটা গাছ নেই, পালা নেই—গিজগিজ করছে শুধু মানুষ আর বাড়ি। আমারই তো দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা!

বলতে বলতেই অবশ্য ফিঙেমশাই তাড়া করলে সেই বেড়ালটাকে।

বেড়ালটাও দেখলে বিপদ।

ছুটবে কোথায় ? ফিঙের এক ঠোক্করেই আক্কেল গুড়ুম। তারপরেও একটা কান ধরে খামচে দিলে ফিঙেমশাই।

শালিখরা বললে, ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে।

বলতে কী—সেই থেকেই বেড়ালটা সেই যে কোথায় সটকে পড়ল সে খবর আর কেউ রাখেই না।

হ্যাঁ।

শুধু বুবুনকে নিয়েই ওরা ব্যস্ত থাকে এখন।

বুবুনও দেখতে দেখতে দুষ্টু হয়েছে একটু।

এখন সে হামা দেয়। খিলখিল করে হাসে। কথা বলে। কাঠবেড়ালি আর শালিখ-চড়াইদের দেখলে ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়। যেন একটু আদর করে দেবে তখখুনি।

আর সেই ফিঙেমশাই ? দূর গাঁয়ের রেললাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারে বসে বসে সে এখনও মিছিমিছি ফোন করে।

হ্যালো, বুবুন ? আমি মশাই বলছি।

ছবিঃ রাজা চন্দ

শেষ নেই

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কোথায় তাকে ধরে রাখি, এই যে বছর ফুরিয়ে যায়।
দাদা বলে, 'জায়গা আছে, ইতিহাসে, বইয়ের পাতায়।'
দিদি বলে, 'ঐখানে না, রাখব তাকে খাঁচায় পুরে,
পাখির মতো সুখের স্মৃতি হঠাৎ যেন না যায় উড়ে।'

দাদু বলে, 'যায় না কেউই, যাওয়ার শুধু ভান করে যে,
সে তো কেবল ফেরার কথাই সারাজীবন ভাবছে নিজে।
ফিরে আসে খেলনা, বেলুন, নাগরদোলা, চড়কমেলা,
দীঘির জলে সাঁতার কাটা, হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা।'
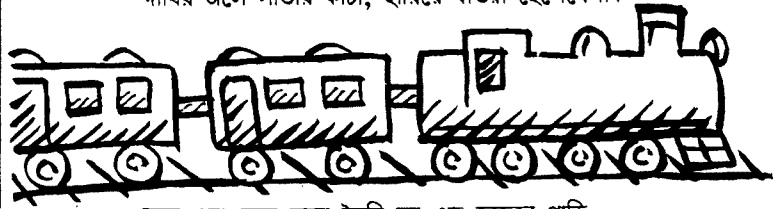
বছর এবং বছর জুড়ে তৈরি সে এক রেলের গাড়ি
কু-ঝিকঝিক যাচ্ছে দূরে, কোন অচিনে দিচ্ছে পাড়ি!
বাতিল বছর বাতিল হয় না, এগিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে,
চাঁদ ডুবলে জ্যোৎস্না যেমন জড়িয়ে থাকে সারা অঙ্গে।

কাশি

ধূর্জটি চন্দ

আচ্ছা রামু, তুই আর শামু সেদিন নাকি ইস্কুলে
খুব কেশেছিস পড়ার সময়, কারণ নাকি ফ্রিজ খুলে
ঠাণ্ডা জলের বোতল তোরা যখন-তখন করিস বার,
এই কথাটা জেনেই স্কুলের ভীষ্মলোচন সমাদ্দার
ছুটির পরে বাড়ি এসে মায়ের কাছে নালিশ দ্যান;
তোরা তখন পাশের ঘরে, টেপরেকর্ডে 'ক্যান ক্যান'
এমন জোরে বাজিয়েছিলি শুনেই নাকি এক লাফ—
'ধন্যি বটে ওরা আপনার, কি দুরন্ত, আই বাপ্'
তারপর আর হুঁশ নেই তাঁর, চৌকাঠেতে হোঁচট খান
সাধ্য কি তাঁর বিশাল বপু একা একাই সামলান!
জলের ছিটে পাখার বাতাস চলতে থাকে অতঃপর
এসব কাণ্ডের মূল যে তোরা, তোরাই ছিলি মাতব্বর
বুঝতে পেরে মা নাকি খুব রেগেমেগে ধমক দ্যান
সেই ধমকে ভীষ্মলোচন কাশতে থাকেন খ্যান খ্যান।

জানিস না ?

মুস্তাফা নাশাদ

জোনাক, জোনাক, জোনাকি,
বনবাদাড়ে খুঁজে বেড়ায়—
কলা, পেঁপে, নোনা কী!
বলতে পারিস সোনালি ?

বললো হেসে সোনালি,
আঁধার রাতে দেখায় রে পথ—
গাঁ-গেরামে জোনাকি!
জানিস না তাও ডোনা কি ?

ছবিঃ সুফি
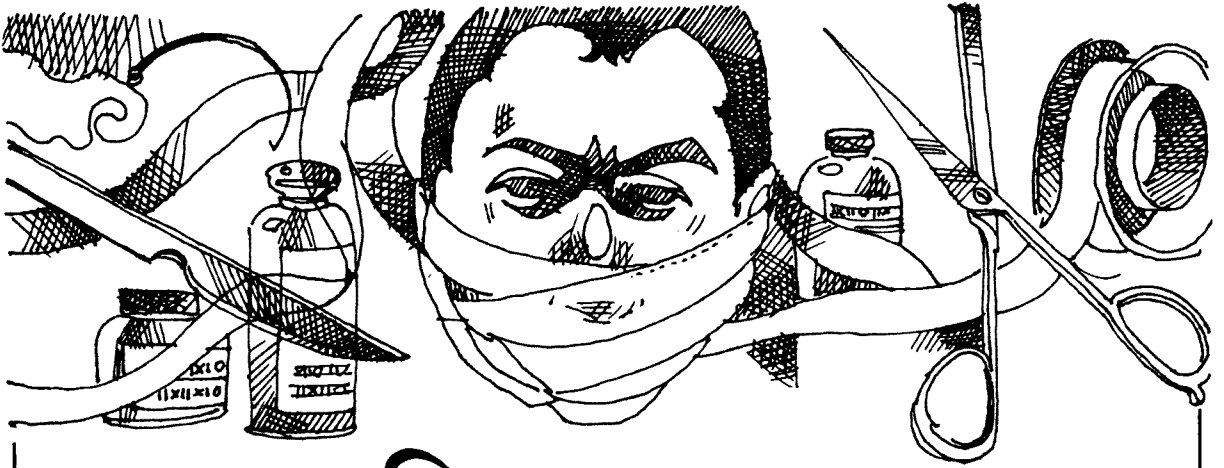
শল্যশিল্পের রূপকথা

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত

কেউ কি চায় তাকে খারাপ দেখতে হোক! চায় না তো? কিন্তু ভাগ্যের ফেরে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অঙ্গহানি হয়, আগুনে মুখ ও শরীর ঝলসে যায় কিংবা জন্ম থেকেই কেউ যদি অঙ্গ-বৈকল্য নিয়ে জন্মায় তাহলে তাদের আর পাঁচজনের মতো হয়ে ওঠার কি কোনো আশা নেই? বিজ্ঞান বলে আছে। সেই মুশকিল আসানটির নাম প্লাস্টিক সার্জারি। শব্দটা নিশ্চয় তোমাদের পরিচিত কারণ এখন এটা প্রায়ই শোনা যায়। প্লাস্টিক সার্জারিতে কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয় না। এর অর্থ কোনো জিনিসকে ছাঁচে ফেলে নরম করা।

মানুষ কোনোদিন অলস মস্তিষ্কে বসে থাকেনি। তার স্বভাবই হচ্ছে চেষ্টা করা। চেষ্টা করতে করতে নতুন কিছু বার করা। তাই তো সেই কবে থেকে মানুষের জন্মগত দৈহিক ত্রুটি, অঙ্গহানি বা ক্ষত সারিয়ে তোলার উপায় খুঁজতে বেরিয়েছে। উন্নত চিকিৎসা-প্রযুক্তির সাহায্যে কুৎসিতকে করে তুলতে চেয়েছে সুন্দর। তার এই প্রচেষ্টার ফলেই শল্যশিল্প বা প্লাস্টিক সার্জারির আবির্ভাব।

শুনলে অবাক লাগে, ভাবলে রোমাঞ্চিত হতে হয় এই প্লাস্টিক সার্জারির জন্ম কিন্তু ভারতে। অবশ্য তখন এর নাম প্লাস্টিক সার্জারি ছিল না। সুশ্রুত সংহিতায় এর উল্লেখ আছে। খৃস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর আগে সুশ্রুত এই শল্যশিল্পের উদ্ভাবন করেন। সেসময় চুরি-ডাকাতি জাতীয় অপরাধে বন্দীদের আঙুল, নাক বা কান কেটে নেওয়া হতো। সুশ্রুত তাঁর উদ্ভাবিত শল্যশিল্পের মাধ্যমে ছাত্রদের শেখাতেন, কিভাবে এই কর্তিত অংশগুলোকে সাফল্যের সঙ্গে পুনর্সংযোজন করা যায়।

এই গোপন বিদ্যা কিন্তু ভারতে বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি। পারস্য হয়ে, রোম ঘুরে এই শল্যশিল্প-বিদ্যা ইওরোপে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ধীরে ধীরে একসময় তা আবার হারিয়েও যায়।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতের পুনার কাছে কুমাম নামে এক শ্রেণীর লোক বসবাস করত। এদের কাজ ছিল, ইঁট তৈরি করে বিক্রি করা। ইঁট তৈরি করার সময় প্রায়ই দুর্ঘটনায় তাদের নাক কাটা যেত। কাটা নাক ঠিক করার জন্যে তাদের মধ্যে এই শল্যশিল্পের চল ছিল। তারা কপাল থেকে চামড়া কেটে নাকের আকৃতির মতো করে নাকের জায়গায় বসিয়ে দিত।

আধুনিক কালে প্রথম সফল প্লাস্টিক সার্জারি হয় ইংলন্ডে ১৮১৪ সালে। এই শল্যায়নের পেছনে এক মজার ঘটনা আছে। 'জেন্টলম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায়, কাওয়ামজি নামে এক ভারতীয় বৃটিশ সেনাদলে কাজ করত। কোনো অপরাধে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার নাক কাটা যায়। কপাল থেকে চামড়া কেটে সেই পুরনো ভারতীয় পদ্ধতিতে তার নাক শল্যায়ন করে পুনর্গঠিত করা হয়।

ইয়র্ক হাসপাতালে এক বৃটিশ সৈন্যও ভর্তি হয়েছিলেন ওই এক অঙ্গবিকৃতি নিয়ে। পারার বিষক্রিয়ায় তাঁর নাক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত শল্যবিদ ডাঃ যোশেফ কারপিউন, একদিন লাইব্রেরিতে খুঁজতে খুঁজতে 'জেন্টলম্যান' পত্রিকায় প্লাস্টিক শল্যায়নের বিবরণটি পান। তখনই তাঁর মাথায় চিন্তাটি এল। তিনি ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে, কপাল থেকে চামড়া কেটে সেই বৃটিশ আর্মি অফিসারের নাক আবার নতুন করে তৈরি করেন। সেদিনই আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির জন্ম হলো।

১৮১৪ সালে যে শল্যশিল্প বা প্লাস্টিক সার্জারির জন্ম হলো তা কিন্তু শুধু কর্তিত অঙ্গ পুনর্সংযোজন নিয়েই পড়ে রইল না। উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক বিবর্তন ঘটে গেল এই শিল্পে। সেইসব রূপান্তর রূপকথাকেও হার মানায়। আর এটা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানেরই অগ্রগতির ফলে। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবী এখন অনেক ছোট হয়ে

গেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বজায় থাকার ফলে এক দেশের উদ্ভাবন অন্য দেশে সহজেই চালু হয়ে যাচ্ছে।

শল্যশিল্পের নবতম রূপায়ণের নাম হচ্ছে কসমেটিক সার্জারি বা সৌন্দর্য শল্যশিল্প। এর সাহায্যে মানুষকে আরও সুন্দর করে তোলা হচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এখন শল্যশিল্পের প্রয়োগ চলেছে। অনেকের জন্মগত ত্রুটি ও বৈকল্য সার্জারির সাহায্যে স্বাভাবিক করা যাচ্ছে। যেমন কাটা ঠোঁট ও ছিন্নতালুর শিশুদের এই শল্যায়নের সাহায্যে স্বাভাবিক করা সম্ভব হচ্ছে। তবে অভিভাবকদের সচেতন আর দায়িত্বশীল হয়ে শল্যবিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ শৈশবে শল্যায়ন করতে না পারলে পরে এই শিশুদের স্বাভাবিক করে তোলা দুরূহ হয়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনে তারা দৈহিক অসুবিধা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

কসমেটিক সার্জারির আর একটি দিক হচ্ছে অঙ্গ-সংস্থাপন শিল্প। আগুনে পুড়ে যাওয়া মুখশ্রী যেমন লাবণ্যময় করা যায় তেমনি দুর্ঘটনায় হাত-পা কাটা পড়লে কসমেটিক সার্জারির সাহায্যে সেই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। দু'পা সংযোজিত করে সুধা চন্দ্রন কিভাবে তাঁর নাচের ছন্দ ফিরে পেয়েছিলেন, তা সবারই জানা।

টাক মাথায় চুল সংযোজিত করে, মুখের হাঁ ছোট-বড় করে, স্ফীতোদরার মেদ ছাঁটাই করে, সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে। জরার আক্রমণে মুখ ও চোখের শিথিল চামড়াকে টানটান করে দিয়ে, পিঠের তিল গালে বসিয়ে চাহিদামতো মানুষকে আরও অনেক সুন্দর করা এখন সম্ভব হচ্ছে।

ছবি: অরূপ ব্যানার্জী

স্টক কোশ্চেন

তমাল চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষাটা এসেই গেল কান পেতে শোন নকিং অ্যাট দ্য ডোর
পড়বি সবই, তার ভেতরে বাছাই কিছু প্রশ্নে দিবি জোর।
ইংরাজী আর অঙ্কটাকে মিথ্যে তোরা পাস না যেন ভয়
বিজ্ঞানটাও বুঝে নিলে, জানবি কোনও বাঘ-ভাল্লুক নয়।
আর হ্যাঁ বলি, ইতিহাসটায় ভুলেও তোরা দিসনে যেন ফাঁকি
পেপার আমিই সেট করেছি, মুখ দেখে তাও, পাশ করাবো নাকি?

যান্মাসিকে প্রশ্ন ছিলো প্রাচীন যুগের গুরুত্বকে রেখে
বার্ষিকেতে এবার পাবি, স্টক কোশ্চেন, মধ্যযুগের থেকে।

খ্রিস্টজন্মের অনেক পরে পাঁচ শতকের গোড়ায় শুরু করে
পনেরো শতকের শেষাশেষি চললো সে যুগ অন্ধ সময় ধরে।
এই যুগটাই বেশ খুঁটিয়ে পড়িস কিন্তু, বলছি হাজার বার—
জানিয়ে টিচার চশমা খুলে, মুছতে থাকেন লেন্স দু'টোকে তাঁর।
ডার্ক এজ-টা স্টক কোশ্চেন জানিস কেন মধ্যযুগকে বলে?
'প্রশ্নটা স্যার জলের মতো' বলেই লাটাই ব্যাখ্যা করে চলে—

"পর পর সব নাইট্স্ এলে দিনের আলো আসবে কোথা থেকে?
একটানা প্রায় হাজার বছর অন্ধকারেই যুগটা ছিলো ঢেকে।
তাই তো সে যুগ 'ডার্ক এজ' স্যার, ব্রাইট হবার উপায় ছিল নাকি?'
শুনেই টিচার ভাবেন, আমার অবসরকাল আসতে ক'দিন বাকি॥

আকাশ

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

একটা আকাশ দিতেই পারে
ছড়িয়ে দিতে হাসি,
সবুজ মাঠে উদাস হাওয়া
রাখাল হাতে বাঁশি।

একটা আকাশ মেলল ডানা
অচিনপুরে পাখি,
ভোরের আলোয় স্বপন দেখা
সবার হাতে রাখী।

একটা আকাশ আপন মনে
নদীর সাথে চলা,
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর পায়ে
কোন সে কথা বলা!

ছেলেবেলা

ভাগ্যধর হাজারী

আজ যদি কেউ কাটে আমার
মনের রঙিন ঘুড়ি—
দেখতে যেতাম চাঁদের দেশে
চরকা কাটে বুড়ি।

বইপত্তর থাকতো পড়ে
সকল বাঁধন খুলে,
ছড়িয়ে দিতাম খুশির মজা
মনের বিভেদ ভুলে।

ভালই জানি স্বপ্ন এসব
কেবল মায়ার খেলা,
বুকের মাঝে কাঁদবে শুধু
আমার ছেলেবেলা।

ছবি: সুফি

ফুকেট

নটরাজন

আমাদের বনাদাকে তোমরা কেউই চেনো না। না চিনে ভালই করেছ। চিনলে হয়তো আমাদের মতো তোমাদেরও দুর্গতির অন্ত থাকত না। বনাদার পোশাকী নাম বনবিহারী বিশ্বাস। আমরা ডাকতাম 'বনাদা', আর স্কুলের স্যারেরা ডাকতেন 'হনুমান'।

না, বনাদার হনুমানের মতো ল্যাজও যেমনি ছিল না, তেমনি লম্ফঝম্পও করতো না। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো— সর্বদাই উদ্ভট উদ্ভট চিন্তায় মশগুল। আসলে বনাদা ছিল এক সাচ্চা বিজ্ঞানী। না, হাসির কথা নয়। পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ইতিহাস খুঁজলেই দেখতে পাবে তাঁদের অনেকেই প্রথমাবস্থায় উদ্ভট চিন্তাভাবনার জন্যে অন্যের কাছে খ্যাপা, পাগলাটে ইত্যাদি বিশেষণ লাভ করেছিলেন, যেমন গ্যালেলিও, নিউটন ইত্যাদি।

অবশ্য স্কুলের স্যারেরা বনাদাকে যে হনুমান বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন তার প্রধান কারণ ছিল বনাদার লেখাপড়ার প্রতি একান্তই আগ্রহের অভাব। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় তাকে ঠেলেঠুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তোলা গেলেও এই ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেই যে এসে একবার ঢুকল, আর এখান থেকে কোনোমতেই তাকে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠানো গেল না। আর আমরাও সেই সূত্রে সহজেই এখানে এসে তাকে ধরে ফেললাম। সহপাঠী হলেও বয়সে বড় বলে আমরা বনাদা বলে ডাকতাম তাকে।

বনাদার মাথায় সর্বদাই এমন সব নতুন নতুন আইডিয়া গজিয়ে উঠত যার ধাক্কায় আমরা অনেকেই মাঝে মাঝে নাজেহাল হয়ে যেতাম। অবশ্য সে সবই ছিল নতুন কিছু আবিষ্কার সম্পর্কিত। জানি না, এই নতুন সৃষ্টির আইডিয়া সে সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ, হাঁসজারু ইত্যাদি কিম্ভূত জীবজন্তুদের থেকে পেয়েছিল কিনা।

বনাদার পাশের বাড়িটা ছিল টুকিদের। টুকি একটা ছোট্ট বছর আটেকের মেয়ে, ক্লাশ থ্রিতে পড়ে। বনাদার বাড়ির সঙ্গেই ছিল একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছ। প্রচুর বকুল ফুল ফুটত তাতে। টুকি রোজই সন্ধ্যেবেলা তার ফ্রকের ঘের ভর্তি করে সেই বকুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেত।

সেদিন বকুল ফুল কুড়োতে এসে টুকির চোখে পড়ে গাছের বাঁধানো গোড়ায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বিরস মুখে বনাদা বসে আছে। মুখ থেকে কুলের বিচিটা ফেলে দিয়ে টুকি জিজ্ঞেস করে, ওকি বনাদা, এভাবে এখানে বসে আছ কেন?

প্রথমে কোনো জবাবই দেয় না বনাদা, যেন শুনতেই পায়নি। টুকি আবার জিজ্ঞেস করতে সেভাবেই চোখ বন্ধ করে হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা টুকি, বলতে পারিস হিমালয় এখান থেকে কত দূরে?

হিমালয়? সেটা আবার কি? বলে ওঠে টুকি।

এবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বনাদা। তারপর বিজ্ঞের সুরে বললে, এই জন্যেই তোর কিছু হবে না। ক্লাশ থ্রিতে পড়িস, আর হিমালয় কি জানিস না?

ও-হো, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে টুকি, হিমালয় তো একটা পাহাড়।

বনাদা চুপ করে থাকে। টুকি আবার জিজ্ঞেস করে, তা বনাদা, হিমালয়ের কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

ততক্ষণে বনাদা আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। টুকির প্রশ্নে বন্ধ চোখ পিটপিট করতে করতে বললে, ভাবছি, সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী হবো।

কেন, বনাদা? টুকির চোখে কৌতূহল।

জবাব দেয় বনাদা, স্কুলের মাসিক পরীক্ষার রেজাল্ট না হয় খারাপই হয়েছে, তাই বলে বাড়িতে বাবার এত বকাঝকা? তাই ভাবছি—।

বনাদার মনের দুঃখ খানিকটা লাঘব করতে গিয়ে টুকি তার ইজেরের পকেট থেকে গোটাকয়েক বড় বড় কুল বের করে বললে, কুল খাবে, বনাদা?

কুল! তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকিয়ে হাত বাড়ায় বনাদা। তারপর কুল চিবোতে চিবোতে মুখে প্রশংসাসূচক একটা শব্দ করে বলে ওঠে, দারুণ—খাসা! এমন কুল কোথায় পেলি রে, টুকি?

টুকি জবাব দেয়, ছোটমামা কুলগাছি থেকে এসেছে।

সেটা আবার কোথায়?

তা কে জানে? ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়ে টুকি আবার বলতে থাকে, শুধু কি

কুল? ছোটমামা এই কুলের একটা গাছও নিয়ে এসেছে। মা সেটা আমাদের বাগানে লাগিয়েছে। ছোটমামা বলছে, এক বছরের মধ্যেই নাকি এতে কুল হবে। কী মজা হবে বলো তো বনাদা!

হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় খেলে যায় বনাদার। আবিষ্কারকদের মাথায় বোধহয় এমনি ভাবেই হঠাৎ হঠাৎ আইডিয়া আসে। বনাদা টুকিকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা টুকি, বকুল ফুলের গন্ধ তোর কেমন লাগে?

দারুণ! তাই তো রোজ বকুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যাই।

আচ্ছা বল তো, কুলের মধ্যে যদি বকুল ফুলের গন্ধ থাকত তাহলে কেমন হতো?

খুব ভাল।

বকুল গাছের ফল দেখেছিস কখনও?

টুকি জবাব দেবার আগেই বনাদা তর-তর করে গাছে চড়ে গোটা কয়েক বকুল ফল পেড়ে নিয়ে এসে বললে, এই দ্যাখ বকুল ফল। ঠিক কুলের মতো দেখতে না?

মাথা নেড়ে সায় দেয় টুকি। বনাদা উদ্ভিদ বিজ্ঞান বোঝাতে থাকে তাকে। বললে, বকুল আর কুল তো একই জাতীয় গাছ। কেবল একটা 'ব' বেশি। তা, তুই যদি বলিস তাহলে তোর ছোটমামার ঐ গাছে এমন কুল ফলিয়ে দেব যা থেকে বকুল ফুলের গন্ধ আসবে।

তাই নাকি? টুকির চোখে-মুখে দারুণ কৌতূহল। বলে ওঠে সে, তাই করে দাও না, বনাদা।

গম্ভীর চালে মাথা নেড়ে বনাদা বললে, বেশ দেব। তবে এখন কাউকে কিছু বলতে পারবি না।

বেশ, বলব না।

বনাদা আবার বললে, আচ্ছা টুকি, এমন একটা নতুন জাতের কুলের কী নাম দেব, বল তো?

টুকি কিছু জবাব দেবার আগেই বনাদা নতুন ফলের নামকরণ করে বললে, কুল আর বকুল মিলিয়ে 'কুলবকুল'। কেমন নাম, বল দেখি?

খুব ভাল বনাদা। মাথা দুলিয়ে জবাব দেয় টুকি।

এরপরে একদিন সন্ধ্যায় কাউকে না জানিয়ে বনাদা ও টুকি নতুন গাছ সৃষ্টিতে লেগে পড়ে। একখানা কাটারি নিয়ে তারা এসে হাজির হয় টুকিদের বাগানে। সঙ্গে নিয়ে আসে বকুল গাছের একখানা ডাল। টুকির ছোটমামার সাধের সেই কুল গাছের অর্ধেকটা কেটে ফেলে তার সঙ্গে জুড়ে দেয় সেই বকুলের ডালখানা। তারপর সেই জোড়া জায়গায় মাটি ও দুব্বো ঘাসের পট্টি লাগিয়ে বনাদা টুকিকে বললে, রোজ সকালে এতে জল দিবি, বুঝলি? দেখবি, দু'দিনেই চড়চড় করে গাছ বেড়ে উঠবে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় টুকি। এদিকে ওর মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুকিকে কুল গাছে জল দিতে দেখে মনে মনে খুশিই হয়।

দিন কয়েকের মধ্যেই যা ঘটবার তাই ঘটল। আধখানা সেই কুল গাছের পাতা ঝরে গিয়ে গাছটা গেল মরে। বকুলের ডালখানা অবশ্য তার আগেই শুকনো কাঠিতে পরিণত হয়েছে।

অচিরেই টুকি ধরা পড়ে গেল তার মায়ের কাছে। কপালে জুটল বকাঝকা। মনে মনে ঠিক করল বনাদাকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু শোনাবে কাকে? সে আর পারতপক্ষে টুকির কাছাকাছি আসেই না। অবশেষে একদিন হঠাৎ দেখা হতেই ভারিক্কি চালে বনাদা বললে, ঘাবড়াস না, বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়লে জানতে পারবি, তাঁদের জীবনেও এমন কত ঘটেছে। সেই যে, আমাদের ক্লাশের স্যার কি যেন—কি যেন বলেছিলেন ইংরেজিতে—

একটু থেমে বনাদা আবার বললে, হ্যাঁ মনে পড়েছে—ফেলিওর ইজ সাকসেস অফ পিলার।

কুলবকুল ফস্কে গেলেও বনাদার এরপরের আবিষ্কারের নাম 'কলসিল'। খাঁটি আবিষ্কারকের মতো এই আবিষ্কারের কথা কিন্তু সে কাউকে বলেনি। এমনকি ক্লাশে বনাদার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ আমাকেও নয়। হঠাৎই একদিন ব্যাপারটা ধরে ফেললাম আমি।

সেকালে ফাউন্টেন পেনের দর ও কদর দুইই বেশি ছিল। স্কুলের ছাত্ররা তো ছাড়, কলেজের ছাত্ররাও সেকালে খুব বেশি ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতে পারত না। কোনো ছাত্রের পকেটে ফাউন্টেন পেন থাকা ছিল একটা গর্বের বস্তু। বনাদার কিন্তু একটা ফাউন্টেন পেন ছিল। আর কাউকে ছুঁতে না দিলেও সে আমাকে মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু লিখতে দিত, আর তাতেই অন্য ছেলেরা হিংসে করত আমাকে।

ক্লাশে বনাদা ও আমি পাশাপাশি বসতাম। একদিন লক্ষ্য করলাম বনাদা তার ফাউন্টেন পেন দিয়ে স্কুলের টাস্ক লিখছে, কিন্তু লেখা বেরোচ্ছে কালির বদলে উড পেনসিলের লেখার মতো। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি বনাদা, ফাউন্টেন পেনটাকে উড পেনসিল বানিয়ে ফেলেছ নাকি?

দূর বোকা! বলে ওঠে বনাদা, এটা হচ্ছে উড পেনসিল ও ফাউন্টেন পেনের সংমিশ্রণ। এর নাম দিয়েছি 'কলসিল'। কলমের 'কল' ও পেনসিলের 'সিল'।

ক্লাশটিচার তখনও ক্লাশে আসেননি। বনাদার ঐ নতুন আবিষ্কার দেখতে ছেলেরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে বনাদার সামনে। বনাদা কিন্তু স্বার্থপর আবিষ্কারক নয়। নিজের আবিষ্কারের খুঁটিনাটি অন্যকে বলতে তার কোনো বাধা নেই। কলমটা যেমনি ছিল তেমনিই আছে। দিব্যি কালির লেখা পড়ছে তাতে। উল্টোদিকের খানিকটা কেটে ফেলে তার সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছে উড পেনসিলের একটা টুকরো। ব্যস, হয়ে গেল কলসিল। একই কলমে পেনসিল ও কালির লেখা।

একজন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বনাদা, উড পেনসিল দিয়ে লেখার সময় তো উল্টোদিকের কলমের কালি পেনসিলের গা বেয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

দেখ তো, আমার কলসিলে কালি বেরিয়ে আসছে? জিজ্ঞেস করে বনাদা।

ছেলেটি কলমটা বেশ করে বারকয়েক ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললে, কৈ না তো। এবার ছেলেটির কণ্ঠে অনুরোধের সুর, বলো না বনাদা, কেমন করে এটা করলে?

খুব সহজ রে, বলতে থাকে বনাদা, কলমের পেছনটা কাটার পরে খানিকটা ভেতরে গালা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। গালার এক পাশে কলমের কালি, আর অন্য পাশে পেনসিল।

বাঃ, এ তো খুব সোজা। বলে ওঠে অন্য একটি ছেলে। বনাদা কয়েক মুহূর্ত সেই ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বললে, অত সোজা নয় রে, চাঁদু। গরম গালা দিয়ে বন্ধ করার কায়দা জানা চাই, বুঝলি?

সেদিন কিন্তু আমরা ক্লাশের ছেলেরা বনাদার বুদ্ধি ও তার কলসিলের তারিফ করেছিলাম, আর তারই ফলে ক্লাশের ফার্স্ট বয় সুমন পড়ে গিয়েছিল বনাদার খপ্পরে।

সুমনের বাবা ছিলেন স্কুল-কমিটির সভাপতি। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। মেধাবী ছেলে সুমনের জন্মদিনে তিনি একটা দামী কলম দিয়েছিলেন তাকে—সেকালের বিখ্যাত কলম, পার্কার ফিফটি ওয়ান।

সুমন ওটা দু'একবার স্কুলে নিয়ে এসে আমাদের দেখালেও কখনও ছুঁতে দেয়নি। ওটার ভেতরের নিব ও বাইরের ক্লিপ সবই নাকি খাঁটি সোনার। বনাদার আবিষ্কার সেই কলসিল সুমনের এতই ভাল লেগেছিল যে, সে লুকিয়ে একদিন কলমটা বনাদাকে দিয়েছিল সেটাকে কলসিল বানিয়ে দিতে। এমন একটা কাজের বরাত পেয়ে বনাদাও দারুণ খুশি।

এমন দামী কলমে এর আগে কখনও হাত দেয়নি বনাদা। তাই এর কলাকৌশলও তার জানা ছিল না। কলমের খোলের বদলে খোলের মধ্যে একটা আলাদা রবারের টিউবে যে এর কালি থাকে তা জানতো না সে। কাজেই কলমের পেছন দিকটা কাটতে গিয়ে কলমের টিউবের শেষের অংশটা সে উড়িয়ে দিলে। আর তাতে ঐ দামী কলমটাই হয়ে গেল বরবাদ।

ধরা পড়ে গিয়ে বাবার কাছে সত্যি কথাটা বলে ফেললে সুমন। তার বাবা কিন্তু ছেলেকে গোটাকয়েক চড়-চাপড় দিয়েই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করেননি, স্কুলের হেডমাস্টারকেও জানিয়ে দিলেন।

খোদ স্কুল কমিটির সভাপতির তরফে নালিশ। ভয় পেয়ে দু'দিন স্কুলেই এল না বনাদা। তৃতীয় দিন স্কুলে ঢুকতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন তাকে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে ওঠে বনাদার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে আমাকে, হেডস্যার মারবে নাকি রে বল্টু?

আমি জবাব দিই, কি জানি, বনাদা? মারতেও পারে। তা তুমি সুমনের কলমটাকে কলসিল বানাতে গেলে কেন?

আমি কি যেচে গিয়েছি নাকি? ও-ই তো বললে।

এবার ঠ্যালা বোঝ!

তাহলে এখন কী করি রে?

কী আর করবে? চলে যাও হেডস্যারের ঘরে।

একটু সময় চিন্তা করে বনাদা আবার বললে, তার চাইতে পালিয়ে গেলে কেমন হয় রে?

জবাবে আমি বললাম, ক'দিন পালিয়ে থাকবে? তার চাইতে যখন ডেকেছে তখন চলেই যাও।

বলছিস?

আমি চুপ করে থাকি। বনাদা এমন মুখ করে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যায় যেন অগস্ত্যযাত্রা করছে। যাবার আগে আমাকে বলে যায়, হেডস্যারের বেত খেয়ে যদি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ি তাহলে বাড়িতে একটা খবর দিস, বল্টু।

আমার নাম বিল্টু। কিন্তু বনাদা বরাবর আদর করে বল্টু বলে ডাকে আমাকে। যখন আমার ওপর কোনো কারণে একটু বেশি খুশি হয়ে ওঠে তখন ডাকে 'নাট-বল্টু'।

হেডস্যার কিন্তু মারধর করলেন না বনাদাকে। কেবল স্কুলের প্রধান ফটকের সামনে তাকে কান ধরে নিল-ডাউন করিয়ে রাখলেন। পাহারায় রইল স্কুলের একজন পিওন।

লজ্জায় বনাদার মাথা হেঁট। সেদিন থেকে সে মনে মনে ঠিক করলে, আর কোনোদিন কেউ মাথা কুটলেও সে কলসিল বানিয়ে দেবে না।

এই ঘটনার পরে বেশ কিছুদিন নতুন কোনো আবিষ্কার নিয়ে মাথা ঘামায়নি বনাদা। কুলবকুল, কলসিলের পরে কিছুদিন একেবারেই চুপচাপ। কিন্তু ভগবান যার মাথায় একবার আবিষ্কারের পোকা ঢুকিয়ে দেন তার পক্ষে কি বেশিদিন চুপ করে বসে থাকা চলে? মাথার পোকাটাই তাকে দিনরাত উত্ত্যক্ত করে মারে।

তবে বনাদা এবার দারুণ সতর্ক। সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়ে সে কাউকে কিছু বলবে না। এমনকি আমাকেও নয়। মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করি, টিফিন বা অন্য কোনো সময় বনাদা একটা খাতায় কি যেন লেখে। কেউ কাছে গেলেই বন্ধ করে খাতাটা। আমার শত অনুরোধও টলাতে পারে না বনাদাকে। অবশেষে একদিন কেবল বললে, আগে লেখাটা শেষ করি, তারপর একমাত্র তোকেই বলব।

নতুন কোনো আবিষ্কার নাকি, বনাদা? জিজ্ঞেস করি আমি।

ফেলুদার মতো রহস্যময় মুখ করে বনাদা মাথা নাড়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, তা তোমার সেই আবিষ্কারের সঙ্গে এত লেখালেখির সম্পর্ক কী, বনাদা?

আছে আছে, গভীর সম্পর্ক আছে। দৃঢ় কণ্ঠস্বর বনাদার । তারপর আবার বললে, লেখাটা প্রায় শেষ করে এনেছি। আর কয়েকটা পাতা মাত্র বাকি। তারপরে তোকেই প্রথম আমার এই নতুন আবিষ্কারের কথা বলব। একটু ধৈর্য ধর।

অবশেষে একদিন সত্যিই বনাদা তার নবতম আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে আমাকে বললে, জানিস বল্টু, খেলাধুলোর কথা উঠলেই আমার বড় দুঃখ হয়।

কেন?

ভেবে দেখ, বলতে থাকে বনাদা, আমরা যে সব খেলা খেলি, তার প্রায় সবগুলোই আবিষ্কার করেছে ওদেশের সাহেবরা। আমরা কিন্তু কিছুই করিনি।

বনাদার কথায় আঁচ পেয়ে জিজ্ঞেস করি আমি, তুমি কি নতুন কোনো খেলা আবিষ্কার করেছ, বনাদা?

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বনাদা একটু ভারিক্কি হাসি হেসে আবার বলতে থাকে, ঐ ফুটবলের কথাই ধর। এই খেলাটা তো আবিষ্কার করেছিল বিলেতি সাহেবরা। তারপর ক্রিকেটও তো তাদের আবিষ্কার। আমরা তো কিছুই তৈরি করিনি।

আমি তখন নিঃসন্দেহ, বনাদা একটা নতুন খেলা আবিষ্কার করেছে। তাই

জিজ্ঞেস করি, তোমার ঐ নতুন খেলার কী নাম রেখেছ, বনাদা?

বনাদা এবার ধমকে ওঠে আমাকে। বললে, নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না রে, বল্টু। আমার সঙ্গে থেকেও চিরকাল গবেটই থেকে গেলি। আরে মূর্খ, খেলাটা কি, তাই-ই জানলি না। আগেই নামের কথা!

ঠিক। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললাম, বলো তো, খেলাটা কিরকম?

খুব সহজ। জবাব দেয় বনাদা, আমি ভাবছি, এত সহজ এই খেলাটা এতদিন কেউ আবিষ্কার করেনি কেন।

মুচকি হেসে জবাব দিই আমি, তুমি আবিষ্কার করবে বলেই বোধহয় এতদিন এটা অন্য কেউ আবিষ্কার করেনি।

আমার হাসিটুকু বনাদার নজরে পড়তেই সে চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস, বল্টু?

তাড়াতাড়ি নাকের ডগা ও কানের লতি ছুঁয়ে আমি বলে উঠলাম, তোমার সঙ্গে একটু-আধটু ইয়ার্কি করলেও কখনও ঠাট্টা করতে পারি?

ইয়ার্কি ও ঠাট্টার মধ্যের তফাৎটুকু বোধহয় ধরতে পারেনি বনাদা। তাই আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। আমি আবার তাড়া দিই, বলো না বনাদা, খেলাটা কিরকম।

গুছিয়ে বলতে গিয়ে একটু সময় নেয় বনাদা। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ফুটবল কি দিয়ে খেলে রে বল্টু?

কেন, ফুটবল দিয়ে।

না না, হাত দিয়ে খেলে, কি পা দিয়ে খেলে?

পা দিয়ে খেলে বলেই তো ওর নাম ফুটবল।

গুড, এবার বল, ক্রিকেট কি দিয়ে খেলে?

একটু ভেবে আমি জবাব দিই, হাত-পা দিয়ে।

ক্রিকেট খেলতে পা লাগে নাকি রে, গর্দভ! বল করা, ব্যাট চালানো সবই তো হাত দিয়ে করতে হয়।

কেন, রান নিতে হলে পা দিয়ে দৌড়তে হয় না?

আমতা আমতা করে বনাদা, তা অবশ্য বলতে পারিস। তবে এবার শোন, ফুটবল ও ক্রিকেট মিশিয়ে আমি এক নতুন খেলা বের করেছি। আর, এর নাম দিয়েছি 'ফুকেট'। ফুটবলের 'ফু' আর ক্রিকেটের 'কেট'। বল তো বল্টু, কেমন নাম?

ফুকেট—ফুকেট। বার দুয়েক নামটা উচ্চারণ করে আমি বললাম, নামটা তো মন্দ নয়, কিন্তু তুমি ফুটবলের সঙ্গে ক্রিকেটকে মেশাবে কেমন করে?

বিজ্ঞের সুরে জবাব দেয় বনাদা, বুঝলি বল্টু, অনেক ভাবনা-চিন্তা করে আমাকে খেলার নিয়ম-কানুন বানাতে হয়েছে। কথার সঙ্গে সঙ্গে বনাদা এতদিন ধরে গোপনে লেখা তার সেই কাগজগুলো আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

অতিকষ্টে বনাদার সেই কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং হাতের লেখার মধ্য থেকে যতটুকু বুঝতে পারলাম তা কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগল না। ক্রিকেটের ব্যাট থাকবে, স্ট্যাম্প থাকবে, বোলার, উইকেট-কিপার সবই থাকবে, কেবল ক্রিকেট বলের বদলে একটা ছোট সাইজের ফুটবল। আর হাত দিয়ে বল করার বদলে পা দিয়ে কিক করতে হবে। নিয়ম-কানুন সবই ক্রিকেটের মতো। কেবল ব্যাটের আঘাতে বল যখন বাউন্ডারির দিকে ছুটবে তখন ফিল্ডারকে দৌড়ে গিয়ে পা দিয়ে বল থামিয়ে কিক করে উইকেটের দিকে পাঠাতে হবে। ব্যস, এটুকুই যা তফাৎ। বাকি নিয়ম-কানুন একেবারেই ক্রিকেটের মতো। এমনকি এল-বি-ডবলিউও। তবে ক্রিকেট বলের বদলে ফুটবল বলে স্ট্যাম্প তিনটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশি। আর এগারোজনের বদলে ছ'জন করে প্লেয়ার।

বনাদার এমন মজাদার আবিষ্কারের কথা কিন্তু বেশিদিন চাপা রইল না। একজন-দু'জন করে আমাদের ক্লাশে তো বটেই, গোটা স্কুলেই ছড়িয়ে পড়ল। কম-বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠল অনেকেই। এমনকি আমাদের গেমস স্যার পর্যন্ত। সব শুনে তিনি কেবল হেসে মন্তব্য করেছিলেন—উদ্ভট!

বনাদা এখন হিরো। যে নাকি আস্ত একখানা খেলা আবিষ্কার করেছে সে তো হিরো হবেই। সেই সূত্রে আমরা বনাদার সহপাঠীরাও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ফুকেট খেলা কেবল কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। আসল খেলা হয়নি একদিনও। এদিকে এতদিনে উঁচু ক্লাশের ছাত্ররা বনাদাকে 'ফুকেটবাবু' বলে ঠাট্টা করতে শুরু করেছে যা নাকি বনাদার সহপাঠী আমরা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না।

অবশেষে আমরা একদিন গেমস স্যারকে ধরে পড়লাম। বললাম, স্যার আমরা একদিন ফুকেট খেলব। স্কুলের ক্রিকেটের সরঞ্জাম ও বলটা একটু দিতে হবে।

প্রথমে আপত্তি করেছিলেন গেমস স্যার। বলেছিলেন, এইসব বিদকুটে খেলা খেলতে গিয়ে যদি তোরা ক্রিকেটের সরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলিস, তখন কী হবে?

সমস্বরে বলে উঠলাম, না স্যার, কিচ্ছু নষ্ট হবে না। শনিবার বেলা একটায় ছুটির পরে আমরা স্কুলের মাঠেই খেলব।

গেমস স্যারকে ইতস্তত করতে দেখে এবার বনাদাই বলে ওঠে, আপনি নিজেই না হয় মাঠে থেকে লক্ষ্য রাখবেন আমরা কিছু নষ্ট করছি কিনা।

আমি? কথাটা বলেই হেসে ওঠেন গেমস স্যার। তারপর একটু থেমে কি যেন ভেবে আবার বললেন, ঠিক আছে। আমি নিজেই থাকব।

হৈ-হৈ করে টিচারস রুম থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। শনিবার ফুকেট খেলার কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা স্কুলে। শুরু হলো দল বাছাই। ফুটবল ও ক্রিকেটে যাদের কিছুটা দখল আছে তেমন বারোজন প্লেয়ার বাছাই হলো যার মধ্যে আমিও পড়লাম। আর বনাদা নিজে তো খেলবেই। এক দলের ক্যাপ্টেন স্বয়ং বনাদা, অন্য দলের দলপতি ক্লাশ সেভেনের ফুটবল প্লেয়ার ঘটকা। না, ঘটকা কোনো নাম নয়। আসল নাম তারাপদ ঘটক। সবাই তাকে 'ঘটকা' বলে ডাকে। আম্পায়ার করা হলো ক্লাশ টেনের একটা ছেলেকে।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল বনাদার দলে থাকি। কিন্তু লটারি করে যখন দল তৈরি

হলো তখন আমি পড়লাম ঘটকার দলে। ইচ্ছেপূরণ না হলেও তাই মেনে নিতে হলো।

শুরু হলো ফুকেট খেলা। প্রথমে যথারীতি 'টস'। তাতে জিতে বনাদা প্রথমে ব্যাটিং নিলে। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের ছায়ায় চেয়ারে বসে গেমস স্যার। তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে-বসে বইখাতা হাতে স্কুলের কিছু কৌতূহলী ছাত্র।

আমাদের দলের প্রথম বোলার দলপতি ঘটকা। ওর পায়ের কিকের খুব জোর। উইকেট-কিপার একজন। আর বাকি আমরা চারজন চারিদিকে ছড়িয়ে ফিল্ডিং করছি।

ঘটকার পায়ের কিক যতই জোরালো হোক, তার প্রথম ওভারেই বনাদারা কুড়ি রান নিয়ে নিলে যার মধ্যে দু'টো বাউন্ডারি, দু'বলে চার রান, আর এক্সট্রা আট রান। এই এক্সট্রা আট রানের জন্যে ঘটকাকে বিশেষ দায়ী করা চলে না। প্রথম দিকে সে পায়ের কিকের জোর বুঝতে পারেনি বলে বলটা উইকেটের সামনে লাফিয়ে উঠে ব্যাটসম্যান, উইকেট-কিপারের মাথার ওপর দিয়ে একেবারে বাউন্ডারি। তারপর থেকে অবশ্য নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছিল ঘটকা। এর মধ্যে আমি নিজেও একটা ভুল করতে করতে বেঁচে গিয়েছিলাম। খেয়াল ছিল না, এটা ক্রিকেট নয়, ফুকেট। বলটা ছুটছে বাউন্ডারির দিকে। পিছে পিছে ছুটছি আমিও। বলের কাছাকাছি এসে নিচু হয়ে বলটা ধরতে যেতেই দর্শকরা চেঁচিয়ে ওঠে, এই বল্টু, হাত দিয়ে ধরবি না। নিজের ভুল সংশোধন করে পা দিয়ে বল আটকে কিক দিয়ে সেটাকে উইকেটের দিকে পাঠাতে পাঠাতে চার রান।

খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য আমরা সবাই ডুবে গেলাম খেলার মধ্যে। এমনকি দর্শকেরাও। জোর চলছে ফুকেট খেলা। বনাদা সেই বলটাকে দমাদম পেটাচ্ছে, আর রান তুলছে। একশো পঁয়ষট্টি রান হয়েছে বনাদাদের যার মধ্যে বনাদার একাই ছিয়ানব্বই। ওপেনিং ব্যাটসম্যান বনাদা এখনও ক্রিজে। এটাই ওদের শেষ উইকেট। ওদের চারজনের মধ্যে একজন সরাসরি বোল্ড আউট, দু'জন কট-বিহাইন্ড, আর একজনের ক্যাচ।

শতরানের পথে বনাদা। দর্শকরা সেঞ্চুরি-সেঞ্চুরি বলে উৎসাহ দিচ্ছে বনাদাকে। ঘামে নেয়ে উঠেছে সে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখে আবিষ্কারের তৃপ্তি ও সেঞ্চুরির স্বপ্ন।

একটা বল সামনে এসে পড়তেই বনাদা সেটাকে গড়িয়ে বাউন্ডারির দিকে পাঠালে। সেঞ্চুরি হয় হয় বনাদার। দর্শকদের চিৎকার। আমিও তীরবেগে ছুটছি বল আটকাতে। বাউন্ডারির কাছাকাছি বলটাকে আটকালাম আমি। ততক্ষণে বনাদার তিন রান হয়ে গেছে। চতুর্থ রানের জন্যে দৌড়চ্ছে তারা।

ফুটবলের নিশানা আমার কোনোকালেই ভাল নয়। কিন্তু সেদিন কি যেন হলো। বনাদা উইকেটে এসে পৌঁছবার আগেই সেখান থেকে জোরে শট নিয়ে উইকেট ভেঙে দিলাম আমি। একটুর জন্যে সেঞ্চুরি হারাবার দুঃখে হাতের ব্যাট ছুঁড়ে দিয়ে বনাদা সেখানেই বসে পড়ল।

খেলা—খেলা। তা নিয়ে বেশিক্ষণ মন খারাপ করে থাকা চলে না। বিশেষ করে বনাদা নিজে যেখানে এই ফুকেটের আবিষ্কর্তা। এবার আরম্ভ হলো আমাদের ব্যাটিং।

ওপেন করলাম ঘটকা ও আমি। একজন একজন করে আমাদের দলের ছেলেরা আউট হচ্ছে, আর রানও উঠছে উপরে। আমি কিন্তু তখনও নট-আউট। দলের রান তখন একশো আটান্ন। আর মাত্র কয়েকটি রান হলেই আমরা ডিঙিয়ে যাবো বনাদাদের। এদিকে আমার জুটি কেবল ঠুকঠুক করে উইকেট বাঁচিয়ে চলেছে। রান করে চলেছি আমি। কোনোমতেই আউট করা যাচ্ছে না আমাকে।

এবার বল করতে এল বনাদা। তারপর প্রথম শটের বলে দু'রান করলাম। ওভারের দ্বিতীয় বল। শক্ত মুঠোয় ব্যাট চেপে ধরে আছি আমি। মনে সঙ্কল্প—বাগে পেলে এবার ওভার বাউন্ডারি হাঁকাবো।

বনাদা দৌড়ে এসে জোরালো শট নিলে। আমিও পেটাবার জন্যে ব্যাট তুলেছি। হঠাৎ বলটা ছুটে এসে ধাঁ করে লাগল আমার মুখে। চোখে অন্ধকার দেখলাম আমি। ব্যাটসুদ্ধ চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম উইকেটের ওপর। নাকে-মুখে দারুণ যন্ত্রণা। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন চোখ মেললাম তখন আমি হাসপাতালে। নাকের ভাঙা হাড় সারাতে আমাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম, কিন্তু আমার বাঁকা নাক আর সোজা হলো না।

বনাদা একদিন আমার বাঁকা নাকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে দরদভরা কণ্ঠে বললে, দুঃখ করিস না বল্টু। গেমস স্যার তো স্কুলে ফুকেট খেলা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার ফুকেটের চিহ্ন তোর এই বাঁকা নাকের মধ্যেই থেকে গেল রে চিরকাল।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বনাদা, তুমি সেদিন বলটা ইচ্ছে করে আমার মুখের ওপর ফেলেছিলে কেন?

নারে না, তাড়াতাড়ি জবাব দেয় বনাদা, ওটা ছিল ওভার-পিচ বল। ভাবছি, নিয়মের খাতায় লিখে দেব, ফুকেটে ওভার-পিচ বল নিষিদ্ধ।

ছবিঃ সরোজ সরকার

লালুর নবমী পুজো

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লালুর বাড়ি সাতবেড়িয়া গ্রামে। সে জাতিতে জেলে। জেলে হলে কি হবে, সে বাউল গান গাইতে ওস্তাদ। গ্রামের বারোয়ারী পুজো-পার্বণে নানা জায়গায় গান গাইতে যায় সে।

একবার কতুলপুরের ভদ্র-বাড়িতে লালু গেছে গান গাইতে। পুজোর পাঁচ দিনই সে গাইবে। দু'দিন নির্বিঘ্নে কাটল। তিনদিনের দিন, তার বাড়ি থেকে লোক এল তাকে নিয়ে যেতে। লোকটি জানাল লালুর ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর বসন্ত হয়েছে। লালুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে কত আশা করে আছে নবমীর দিন গান গাইবে। লালুর বাড়ির সংবাদ কর্তাবাবুর কাছে পৌঁছালে তিনি লালুকে ডেকে বললেন, বাবা,এসময় তোমার ঘরে ফেরাই উচিত। সামনের বছর আবার এসে গান কোরো।

লালু ঘরে ফিরে দেখল সকলেই শয্যাশায়ী, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে। শ্রীশ্রীমাকে সে পিসিমা বলে। মাও লালুকে খুব স্নেহ করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে লালু বিফল হলো। জানতে পারল তার পিসিমা জয়রামবাটীতে নেই, তিনি তখন কলকাতায়। লালুর ভীষণ অভিমান হলো। অস্ফুটে সে বলল, এমন বিপদের সময় পিসিমা তুমিও দূরে রইলে!

আগেকার দিনে গ্রামে কারো বসন্ত হলে ওষুধ দেওয়ার রীতি ছিল না। শীতলামার পুজো দেওয়া ও স্নান-জল খাওয়ানোর প্রথা ছিল। লালুর আবার সে সবে বিশ্বাস নেই। সে জানে তার পিসিমাই সব। পিসিমা তাকে হাতে তুলে যা দেবেন তাই-ই সে জানে মহাপ্রসাদ।

নবমীর রাতে লালু স্বপ্নে দেখল, তার পিসিমা তাকে বলছেন, কি রে লালু! তুই যে বলছিলি তোর বিপদের সময় আমি দূরে সরে আছি। এই তো আমি তোর

কাছেই রয়েছি। লালুর ঘুম ভেঙে গেল। সারা দেহে যেন বিদ্যুতের চমক। সে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের চারিদিক তন্নতন্ন করে খুঁজল। কাউকে দেখতে না পেয়ে সে আবার বিছানায় মাথা ঠেকাল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে গেল। আবার সে শুনতে পেল সেই মমতাভরা কণ্ঠস্বর, কি রে লালু! তুই যে বলছিলি তোর বিপদের সময় আমি দূরে সরে আছি। এই তো আমি! তুই ভাবিসনে বাবা, ঠাকুরের পা-ছোঁয়া পুষ্প তোর ছেলে-বৌ-এর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়েছি। আনন্দে বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠল লালু —পিসিমা!

ঘুম ভেঙে গেল লালুর স্ত্রীর। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে বলল, কি হয়েছে? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন? লালু তার স্ত্রীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাল। উত্তরে তার স্ত্রী বলল, আমিও ঐরকম স্বপ্ন দেখেছি। পিসিমা আমার ও ছেলে-মেয়ের মাথায় কী যেন বুলিয়ে দিল। তারপর বলল, বৌ মুখটা হাঁ কর তো। আমি মুখটা খুলতে কী যেন মুখে দিল। সে জিনিস জন্মে খাইনি। কিন্তু কী অপূর্ব তার স্বাদ!

দেখতে দেখতে এক বছর গড়িয়ে গেল। আবার দুর্গাপুজো এসে গেল। লালু তার স্ত্রীকে বলল, গেল পুজোয় পিসিমা আমাদের ঘরে এসে দর্শন দিয়ে গেছে, এ বছর ঐদিন মায়ের পুজো করব।

লালুর সঙ্গতি কী যে সে পুজো করে! পাড়ার বয়স্করা যুক্তি দিল, তুমি বরং ঘটেই পুজো করো। নবমীর দিন মাকে আহ্বান করলে নবমী পুজোই হয়ে যায়!

লালু সেইমতো পুজোর আয়োজন করল। মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছিল নবমীর রাতে মাকে অনেক নতুন গান শোনাবে।

পুজো শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। অন্য বছর নবমী পুজো দেখতে সাতবেড়িয়ার সব লোক ছুটত দ্বেরেপুরের বাবুদের ঠাকুরদালানে। এ বছর লালুর পুজো দেখতে আসায় কেউই আর অন্য গ্রামে গেল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। খুব ধুমধামে মায়ের আরতি হলো। এবার গানের পালা। লালু বাউলের পোশাক পরে ডুগডুগি নিয়ে আসরে গান শুরু করল। উদাত্ত স্বরে লালু মাকে গান শুনিয়ে চলেছে হঠাৎ তার গান বন্ধ হলো। লালু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বেদী ও ঘটের দিকে। সে দেখছে, তার পিসিমা পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আর তাঁরই সামনে বসানো আছে সেই মঙ্গলঘট! লালু ভাল করে নিরীক্ষণ করল। হ্যাঁ, পিসিমাই তো! লালু চিৎকার করে উঠল, পিসিমা, তুমি সত্যি সত্যি এসেছো!

আর গান গাওয়া হলো না লালুর। যেখানে তার পিসিমা বসে ছিলেন সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে সে বলতে লাগল, পিসিমা, তোমার এত দয়া! আমাকেও কৃপা করলে! লালুর দু'চোখ বেয়ে বয়ে চলল জলের ধারা।

তথ্যসূত্র: লালমোহন দাসের পুত্র পঞ্চানন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

শারদীয়া—৩-১১

সব থেকে মিষ্টি ফলের উৎস প্রোটিন

অমিয় কুমার হাটি

পৃথিবীর কোন ফল সব থেকে মিষ্টি? প্রতিযোগিতা হয়েছে তার। এই সময়টাই তো প্রতিযোগিতার। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। জাম, তাল, পেঁপে, খেজুর, কাঁঠাল, আঙুর, আপেল, আম—না না, কেউ ধারে কাছেও দাঁড়াতে পারল না। এশিয়া, ইউরোপ, দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কারুর ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল না। জিতে গেল আদিম অরণ্যের দেশ আফ্রিকা। পশ্চিম আফ্রিকায় একটি গাছ আছে, তার ফল 'কাটেমফে'—পৃথিবীর সব থেকে মিষ্টি ফল। নাম উঠল তাই তার সব থেকে মিষ্টি ফল হিসাবে 'গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ।

সব থেকে মিষ্টি মানে কত মিষ্টি? তার একটা মাপ থাকা চাই তো! এই ফলে মিষ্টি যোগায় থাউমাটিন নামে একটি রাসায়নিক। চিনির সঙ্গে তুলনা করা যাক তাহলে থাউমাটিনের। এক চামচ থাউমাটিন ক' চামচ চিনির সমান—১০ চামচ? ১০০ চামচ? ৫০০ চামচ? তার থেকেও অনেক অনেক বেশি, তিন হাজার চামচ! তার মানে এক চামচ চিনির থেকে থাউমাটিন-এর মিষ্টতা ৩০০০ গুণ বেশি!

ফলের মিষ্টতা কী থেকে আসে? এক ধরনের শর্করা বা চিনি—ফ্রুকটোজ থেকে। কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল বড় আশ্চর্য। এই যে সেরা মিষ্টি ফল কাটেমফে, তার মিষ্টি স্বাদ কিন্তু কোনো চিনি থেকে আসে না, আসে প্রোটিন থেকে, যার নাম থাউমাটিন, যা পাওয়া যায় ঐ ফলে।

যে গাছ থেকে কাটেমফে ফল পাওয়া যায় তার পোশাকী নাম থাউমাটোক্কাস ড্যানিয়েলি (*Thaumatoccus danielli*)। ফলগুলো আকারে খুব বড়ও নয়, ছোটও নয়। পাকা একটি ফলের প্রতি এক গ্রামে মিশে আছে ৫০ মিলিগ্রাম থাউমাটিন—একটি অত্যাশ্চর্য প্রোটিন, একটি নতুন ধরনের প্রোটিন, একটি অতি মিষ্টি প্রোটিন। বলতে পারা যায় একেবারে বিজাতীয় প্রোটিন যদিও প্রোটিনের সব গুণ এতে বর্তমান, গড়ে উঠেছে প্রোটিন যেমন ভাবে তৈরি হয় তাই দিয়ে অর্থাৎ কতকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে। যার ক্যালোরি মূল্যও যে কোনো প্রোটিনের সমান—প্রতি গ্রামে ৪ কিলো ক্যালোরি।

প্রকৃতির এই অদ্ভুত প্রোটিনটার উপর বিজ্ঞানীদের যে খরদৃষ্টি পড়বে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

নানারকম ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে মিষ্টি প্রোটিনটাকে। সে সব চেষ্টাও চলছে। স্যাকারিন, সাইক্লামেট, গ্লাইকারিজিন প্রভৃতি কতকগুলো রাসায়নিকের নাম আমরা জানি, এরা খুব মিষ্টি অথচ চিনি জাতীয় নয়, ডায়াবেটিস রোগীরা চা খেতে পারেন স্যাকারিন বা সাইক্লামেট দিয়ে। মিষ্টির অভাব এইভাবে দূর হয়। স্যাকারিনের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে থাউমাটিন। কারণ বলা হচ্ছে, যেহেতু প্রকৃতিতে ফলের মধ্যে আছে, এটা সব থেকে নিরাপদ। খেলে ক্যানসার-ট্যানসার হবার আশঙ্কা থাকে না। একে সেই সার্টিফিকেট দেওয়াও হয়েছে, ইংরাজীতে যাকে বলে GRAS (Generally Recognized As Safe) মানে সাধারণভাবে চিহ্নিত হয়েছে নিরাপদ বস্তু হিসাবে।

দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্য ও ওজন সম্পর্কে সচেতন যাঁরা, তাঁরা চিনি জাতীয় খাবার পছন্দ করেন না। কারণ মিষ্টি খেলেই

ওজন বাড়ে, আরও অনেক আনুষঙ্গিক শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। তাঁদের খাবারে মিষ্টির অভাব দূর করতে যোগ করা যাবে থাউমাটিন।

তৃতীয়ত, তৈরি অনেক খাবার মিষ্টি করবার জন্য এর ব্যবহার হতে পারে। যেমন চিউইংগামের উপর থাউমাটিন-এর একটা প্রলেপ থাকলে মুখে রাখলে মিষ্টিভাব বজায় থাকবে। সেইরকম যোগ করা যেতে পারে চা বা কফিতে, দইয়ে, দুগ্ধজাত দ্রব্যে, ফলের রসে, জ্যাম, আচার প্রভৃতিতে। খেতে মিষ্টি লাগবে, অথচ ক্যালোরি বাড়বে না।

চতুর্থত, টেবিলে চিনি হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। চিনির গুণ পুরোপুরি বা বেশিই রইল, অগুণটা রইল না, ক্যালোরিটা বাড়বে না।

পঞ্চম, থাউমাটিন অনেকখানি তাপ সহ্য করতে পারে, তাপ ১২০° সেলসিয়াস ওঠালেও এর মিষ্টতা নষ্ট হয় না। টিনজাত খাবারে সহজে যোগ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ, এমন কতকগুলো ওষুধ আছে, খেতে তেতো বা অন্যরকম বিশ্রী ধাতুর স্বাদ লাগে। ওষুধে যদি থাউমাটিন মেশানো যায়, তাহলে ঐ ধরনের বদ স্বাদ থাকবে না, ওষুধ খেতে লোকের অনীহা হবে না।

সপ্তম, থাউমাটিন জিন গবাদি পশুর খাদ্যশস্যে যদি জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো যখন জন্মাবে, খেতে মিষ্টি লাগবে, গবাদি পশু খাবে ভালভাবে, তাদের স্বাস্থ্যও ভাল হবে।

অষ্টম, থাউমাটিন দিয়ে যদি চকোলেট প্রভৃতি তৈরি করা যায়, তাহলে যেহেতু এটি শর্করা জাতীয় খাদ্য নয়, সেইহেতু দাঁতের ক্ষতি করতে পারবে না। শিশুদের সুবিধা হবে। চকোলেট খেলেও দাঁতের ক্ষয় রোগ বা 'কেরিস'-এ ভুগবে না। দাঁত ভাল থাকবে।

থাউমাটিনের সুবিধা আরও আছে। মানুষ বা গবাদি পশু বা যে কোনও জীবজন্তু এটি খেলে পুরো হজম করে ফেলতে পারে, এদিক দিয়েও কোনো অসুবিধা নেই। তাছাড়া জলে গুলে যায় পুরোপুরি, তাই ব্যবহার করাও সুবিধা সব দিক দিয়ে। তেতো বা পছন্দ নয় এমন স্বাদকে ঢেকে দিতেও থাউমাটিন ওস্তাদ।

থাউমাটিন ভাল বলে এর সবটাই কী ভাল? এই যে এর মিষ্টি স্বাদ, এটা মুখে লেগে থাকে তা প্রায় এক ঘণ্টা। অনেকে এটা চায় না। আবার অনেকে বিশেষত ছোটরা চায় থাউমাটিন মেশানো খাবার খেয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখটা মিষ্টি হয়ে থাকবে। বাড়তি লাভ এই আর কি!

ফল থেকে যে থাউমাটিন প্রোটিনটি পাওয়া যায় সেটা তিন ধরনের। যেমন, থাউমাটিন-১, থাউমাটিন-২ ও থাউমাটিন-৩। দেখা গেছে, মিষ্টতায় থাউমাটিন ১ বা ২ বা ৩ মূল থাউমাটিনের থেকে অনেক কম। অর্থাৎ ফলে যে থাউমাটিন পাওয়া যায়, সেটাকে ভেঙে আলাদা আলাদা করলে মিষ্টতার পরিমাণ কমবে। তবে, ভাঙা যদি না যায়, থাউমাটিন ১, ২ ও ৩ যখন মেশানো থাকে—যেমন থাকে প্রকৃতিতে ফলের মধ্যে, মিষ্টতার পরিমাণ হয় অনেক বেশি।

এখন জৈব প্রযুক্তির যুগ। থাউমাটিন প্রোটিনের আকৃতিও জানা। থাউমাটিনের জিনকে এসকেরিসিয়া কোলাই, ব্যাসিলাস সাটিলিস, সেপটোমাইসেস লিভিড্যান্স বা স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি এইসব বীজাণুর ভিতর ঢুকিয়ে দিলে জৈব পদ্ধতিতে তারা থাউমাটিন উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ নয়। বাণিজ্যিকভাবে কাজে দেবে না, খরচে পোষাবে না। তাহলেও বিজ্ঞানীরা বসে থাকেননি। তাঁরা এই প্রোটিনের জিনটাকে অ্যাসপারজিলাস ওরিজি নামে এক ছত্রাকের ভিতর ঢুকিয়ে প্রচুর পরিমাণে থাউমাটিন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

জৈব পদ্ধতিতে দু'রকমভাবে প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব। একরকম উপরে যেমন বলা হয়েছে, বীজাণু বা ছত্রাক ব্যবহার করে। আর একটা পদ্ধতি টিসু কালচার বা গবেষণাগারে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে। এই পদ্ধতিতেও থাউমাটিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে।

অনেক বহুজাতিক কোম্পানি এরমধ্যেই এটা বাজারে এনেছে। আশ্চর্যজনক এই প্রোটিন যে কোনো শর্করার থেকে বহুগুণ বেশি মিষ্টি। প্রকৃতির বিস্ময়! বিস্ময় বিজ্ঞানের চোখেও।

ছবি: প্রণবকুমার হাজরা

এবার পুজোয়

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নেই এখানে হ্যাজাকবাতি,
যাত্রাপালায় কে আর মাতি?
ড্যাং-কুড়া-কুড় কোথায় ঢাকী?
এই শহরে একলা থাকি!

সব কিছুতে প্রাণের ছোঁয়া,
শিউলিতলা বিষ্টিধোয়া,
দুলছে আহা কাশের সারি,
ঐ গ্রামেতে আমার বাড়ি!

দুগ্গাঠাকুর চক্ষু-টানা,
মাথার ওপর সামিয়ানা,
নেই সেখানে কারিকুরি,
শহর কি হয় গ্রামের জুড়ি?

শহর মানে মিথ্যে মেকি,
নাচন চলে দেখাদেখি।
লক্ষ টাকা যাচ্ছে জলে,
কী আর হবে সে সব বলে?
কার পুজোতে খরচ বেশি,
চলছে হাজার রেষারেষি!

তাই তো পুজোয় এলাম গাঁয়ে,
অশথতলা ঐ তো বাঁয়ে,
খানিক দূরে মেরাপ বাঁধা,
'সগ্গে এলাম, বুঝলে দাদা!'
ধূপধুনো আর কাঁসর-ঢাকে
সিঁদুর-টিপে আমার মাকে
দুগ্গাঠাকুর ভাবতে থাকি,
মধুর সুরে ডাকলো পাখি!

ছবি: সুফি

কাক ঠোকরা

অংশুমান বসু

অনেকক্ষণ ধরে কাকটা কা-কা করছিল। একঘেয়ে কর্কশ স্বরে কাকের ডাকাডাকি নিয়ে গাবলুর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বাঁদরের ওঠা-নামা নিয়ে সে ভয়ানক ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও বাঁদরটা ঠিক কত সময় পরে বাঁশের ডগায় উঠবে তাই যখন হিসাব করা গেল না, তখন গাবলুর বেশ বিরক্তি লাগল। অঙ্কটা না মেলার পুরো দায়টা সে কাকটার ওপরেই অনায়াসে চাপিয়ে দেয়। হতচ্ছাড়া, বেল্লিক! তখন থেকে বারান্দার রেলিঙে বসে একটানা ডেকে যাচ্ছিস। আর ডাকছিস তো ডাকছিস, একেবারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে! কী আছে রে আমার মুখে? আমি কি তোর মতো হাড়হাভাতে-কেলে-কুচ্ছিৎ?

কাকটা আবার ডেকে ওঠে কা-কা। এবার আরও জোরে। হাতের পেন্সিলটাকে ওর দিকে ছুঁড়ছে এমন ভাব দেখায় গাবলু। চলে যা বদমাশ এখান থেকে। হতভাগাটা নড়ল না। আবারও একই ভাবে হাত ঘোরাল গাবলু। এবারও কাকটা উড়ল না, এমনকি খানিকটা সরে যাবারও নাম করল না। একই ভঙ্গিতে গাবলুর দিকে চোখ রেখে সে তার সা-রে-গা-মা সেধে যায়।

তবে রে বজ্জাত, শয়তানের চূড়ামণি! গাবলু বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কাকটাকে ভ্যাঙায় এমন ভাবে যেন এক্ষুণি সে তাকে ধরে প্রচণ্ড পিটুনি দেবে। আশ্চর্য! কাকটার কোনও হেলদোল নেই। গাবলুকে বারান্দায় দেখে সে সামান্য একটু সরে বসে মাত্র। এবার সত্যি সত্যিই গাবলু ভীষণ রেগে যায়। হতচ্ছাড়া! উজবুক! বেয়াদপ! হাতের ডট পেনটা সে ওর দিকে ছুঁড়ে মারে। সাঁ করে পেনটা ছুরির খোলা ফলার মতো বাইরের দিকে উড়ে যায়। এতে একটু ফল হয়। কাকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উড়ে পাশের বাড়ির আলসেতে বসে।

যা ব্যাটা, খুব বেঁচে গেলি। ফের যদি বিরক্ত করতে আসিস, তখন অন্য ব্যবস্থা হবে তোর। কাকটার দিকে চোখ রেখে গাবলু নিজের মনেই বলে যায়।

কিন্তু ডট পেনটা গেল কোথায়! পার্কার কোম্পানির ডট পেন। এবার যখন ছোটমামা বিলেত থেকে এসেছিল, তখন গাবলুকে প্রেজেন্ট করেছিল। খুব দামী আর ভাল কলম। ওতে লিখে যা আরাম, আর কোনও ডট পেনে গাবলু তা পায়নি। শয়তান, তোর জন্য যদি আমার ডট পেনটা হারায় তবে তোর একদিন কী আমার একদিন, দেখে নিস। কাকটাকে লক্ষ্য করে গাবলু বিড়বিড় করে। এবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখতে থাকে সে। বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে ডটটাকে খুঁজতে থাকে গাবলু। ডান দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে আশেপাশে চোখ ঘোরাবার আগেই মাথার পেছন দিকে পরপর দুটো ঠোক্কর। ঠক ঠক। চকিতে ঘুরে যায় গাবলু। হতচ্ছাড়া কাকটা তীব্র রসিকতার ঢঙে ওর মাথায় ঠোক্কর মেরেই সরে গেছে। সরে গিয়ে সে গাবলুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আয়েশ করে পাশের বাড়ির আলসেতে গুছিয়ে বসে। ঠোক্কর খেয়ে গাবলু বেজায় চটে। একটা নয়, পরপর দুটো ঠোক্কর। ওর মাথাটা কি তবলার বাঁয়া যে অসভ্য শয়তান কাকটা বেমক্কা চাঁটি মেরে যাবে? উঃ বেশ জ্বালা করছে মাথার পিছনটাতে। রোসো হতভাগা, তোমার এবার বারোটা বাজাচ্ছি। বিনা কারণে ইয়ার্কি মারার শাস্তি এবার পাবে। গাবলু ঘরে আসে তার গুলতিটা নিতে।

খুঁজে-টুঁজে গাবলু যখন গুলতি নিয়ে বারান্দায় ফিরে এল তখন কাকটা আর

পাশের বাড়ির আলসেতে বসে নেই। জায়গাটা বেবাক ফাঁকা। গাবলু এদিক-ওদিক চায়। পাজী কাকটা গেল কোথায়! সামনের বাড়ির কার্নিশে তিনটে কাক বসে কী সব আলোচনায় ব্যস্ত। ওদের মধ্যে গা ঢাকা দেয়নি তো! বেশ বোঝা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার কায়দাটা ভালই রপ্ত করে নিয়েছে হতভাগাটা। ওই তো, ওটাই সেই কাকটা নিশ্চয়। গাবলু নিরীক্ষণ করে। একটা কাক যেন ঘাড় বাঁকিয়ে বারবার ওর দিকেই তাকাচ্ছে। ওর ঠোঁটে যেন শেয়ালমির একটু হাসি লেগে আছে। হ্যাঁ, ওটাই। ওটাই সেই বদমাশটা যে তার মাথায় ঠোক্কর মেরেছে। তাও একবার নয়, পরপর দু'বার। গাবলু গুলতিটা তাক করে। তারপরই গুলি চালায়।

গাবলুর লক্ষ্য অব্যর্থ বলা যায়। কা-কা করে সব কটা কাক একসঙ্গে উড়ে যায়। মনে হলো ওদের মধ্যে একটা কাক যেন একটু লেংচে লেংচে উড়ছে। গাবলু নিশ্চিত, এটা সেই বজ্জাত কাকটা। ওর ডানায় বা পায়ে নির্ঘাৎ লেগেছে। লাগাই উচিত। তবে পাজীটা এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল। আশা করা যায় আর কখনও বজ্জাতি করতে আসবে না। গুলতি গুটিয়ে গাবলু ঘরে ফিরে আসে। এতক্ষণ পরে মাথায় হাত দিয়ে দেখে কাকের ঠোক্করে কেটেকুটে গেছে কিনা।

তেল-মাখা বাঁশ আর বাঁদরের ওঠা-নামা নিয়ে গাবলু আবার গবেষণা শুরু করে। দু'বার অঙ্কটা করল। উত্তরে মিলল না। বিরক্ত হয়ে বাঁদরের অঙ্ক ছেড়ে অন্য আর একটা অঙ্ক ধরে। না, এটারও উত্তর ঠিক হলো না। কী হলো রে বাবা! কাকটার ঠোক্কর খেয়ে বুদ্ধির লেভেলে কোনও গণ্ডগোল হয়ে গেল নাকি! হতে পারে। এমন হওয়াটা আদৌ অসম্ভব নয়। বিশেষ এ কাকটা যখন অন্য কাকগুলোর মতো সাধারণ কাক নয়। ওর চেহারায় কেমন মাস্তান মাস্তান ভাব। ঠিক আছে, কাকটা যত বড় মাস্তানই হোক, গাবলু ওর মাস্তানী বন্ধ করে ছাড়বে। পাড়ার সব কটা উঠতি মাস্তান ওকে ভয় পায়, আর এ তো সামান্য একটা কাক। একটু ছ্যাঁচড়া টাইপের এই যা।

বইপত্র বন্ধ করে গাবলু উঠে পড়ে। ভিকটরের বাড়ি যাবে সে এখন। ওর কাছ থেকে সাজেশন পাবার কথা আছে। ভিকটরের প্রিয় বন্ধু টোটাকে নাকি অঙ্কের স্যার সাজেশন দিয়েছে। টোটা স্যারের কাছে প্রাইভেটে পড়ে। এবার অ্যানুয়ালে ওই সাজেশন থেকেই নাকি সব কটা প্রশ্ন আসবে। ভিকটর টোটার কাছ থেকে ওগুলো পেয়ে গেছে।

রাস্তায় নেমে আসার পরও কিন্তু গাবলুর মন থেকে কাকচিন্তা গেল না। হাঁটতে হাঁটতে ও চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আশেপাশে কোনও কাক-টাক ওকে লক্ষ্য করছে না তো! বলা যায় না, ল্যাংড়া কাকটা প্রতিশোধ নিতে পারে। নির্ঘাৎ ওর ডানায় বা পায়ে লেগেছে। পালাবার আগে, এখন মনে হচ্ছে ওটা কাৎ হয়ে পড়েছিল। গাবলুর হঠাৎ ভীষণ হাসি পায়। দূর, কাক আবার প্রতিশোধ নেয় নাকি! কখনও এমন কথা সে শোনেনি। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনও প্রাণী কখনও-সখনও প্রতিশোধ নেয়। এই কাকটা সে দলের কিনা কে জানে!

ভিকটর বাড়িতেই ছিল। সহজেই ওর কাছ থেকে অঙ্কের পুরো সাজেশনই পাওয়া গেল। গাবলুর মনটা হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায়। যাক, তেল-মাখা বাঁশ আর বাঁদরের ওঠা-নামা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ও অঙ্কটা সাজেশনের মধ্যে নেই। সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র পকেটস্থ করে গাবলু ভিকটরের সঙ্গে গল্পগাছা করে। তবে গল্পের মধ্যেই অন্যমনস্কভাবে বারবার নিজের মাথায় হাত দিচ্ছিল। ভিকটর সেটা লক্ষ্য করে বলে, কিরে, তখন থেকে অনবরত মাথায় হাত দিচ্ছিস কেন? তোর চুল তো আঁচড়ানোই আছে।

চুলের জন্য নয় রে, ভিকটর। আজ সকালে একটা পাজী কাক মাথায় ঠোক্কর মেরেছে। তাও একবার নয়, পরপর দু'বার। মাথার পেছন দিকটা ফুলে আছে মনে হচ্ছে।

গাবলুর কথা শুনে হাসতে হাসতে ভিকটর গড়িয়ে পড়ে। হাসি কমলে সে বলে, কাকটা তোকে খামোকা ঠোক্কর মারল? কী করেছিলি তুই?

গাবলু সবিস্তারে সকালের ঘটনাটা বলে—অঙ্ক কষা থেকে ঠোক্কর খাওয়া পর্যন্ত।

কাকটাকে তুই ছেড়ে দিলি! কিছু করতে পারলি না? তোর কাছে গুলতি থাকা সত্ত্বেও পারলি না?

গাবলু এবার জামার কলার ওল্টায়। মুখে শ্লাঘার হাসি ফুটে ওঠে ওর। আরে, আমি কি ছেড়ে দেওয়ার পাত্র? গুলতি মেরে হতচ্ছাড়াটার একটা ডানা ভেঙে দিয়েছি। বাছাধনকে এখন আর ক'দিন ভালভাবে উড়তে হবে না।

মরে গেছে কি?

না, মরেনি। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কোনদিকে উড়ে গেল। তবে খুব বেশিদূর যেতে পারবে না।

তবে তো মুশকিল! ভিকটর মুখটা গম্ভীর করে।

কিসের মুশকিল?

জানিস না, আহত কাক আহত বাঘের মতো ডেঞ্জারাস? এখন ওই কাকটা যদি তার দলবল নিয়ে তোকে আক্রমণ করে? সবাই মিলে তোকে একসঙ্গে ঠোকরাতে থাকে? কী করবি তুই তখন? ওই কাকটা তোদের ফ্ল্যাটটা ভালমতোই চেনে। তা ছাড়া বাড়ির বাইরে, মানে রাস্তাঘাটে তোকে কখনও না কখনও একা পাবেই।

ভিকটরের কথা শুনে গাবলু চিন্তায় পড়ে। মনে মনে বেশ ভয়ও পায়। মুখে অবশ্য সে ভাব প্রকাশ করে না। বরং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভিকটরের কথা উড়িয়ে দেয়। দূর, এরকম হয় না। তুই কী উল্টোপাল্টা বলছিস? কাক এত যদি মনে রাখত তবে ওরা মানুষ হয়ে যেত। অসভ্যের মতো ঠোক্কর মারত না।

মানুষরাও সুযোগ পেলে ঠোক্কর মারে রে। কাকেরা তো মারবেই। শোন গাবলু, কাক কখনও কখনও সবকিছুই মনে রাখে। একটা কোনও বইতে এরকমই পড়েছিলাম। নাকি টিভিতেই দেখেছিলাম। কাকেরা দল বেঁধে বদলা নিচ্ছে।

গাবলুর মুখ শুকিয়ে যায়। সে সাহস খোঁজে। কেন, আমার তো গুলতি আছে। গুলতি দেখলে কোনও কাক ধারে কাছে আসতে সাহস করবে না।

দূর, তোর ওই গুলতি দিয়ে তুই কটা কাককে মারবি? ভিকটর বলে যায়। ওরা

তো সংখ্যায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। বলতে গেলে এই কলকাতা শহরে যত মানুষ আছে, তার চাইতে ঢের বেশি কাক আছে। এছাড়া ওদের মধ্যে আবার ইউনিটি খুব। মানুষের মতো এত খেয়োখেয়ি নেই। দেখিসনি তুই, একটা কাক কোথাও মরলে চারদিক থেকে ঝেঁটিয়ে সব কাকেরা চলে আসে। কা-কা চিৎকারে তখন তিষ্ঠোনো কঠিন।

গাবলু মাথা নাড়ে। ওর তেষ্টা পায় খুব। তুই ঠিকই তো বলছিস, ভিকটর।

শোন গাবলু, কাকেরা আবার বাইরে থেকেও লোক, থুড়ি কাক নিয়ে আসে। বীরবলের সেই গল্পটা মনে পড়ছে তো? কাকেরা শহরের বাইরে যায় ওদের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে। আবার আত্মীয়-বন্ধুরাও দল বেঁধে শহরে বেড়াতে আসে। এমনিতেই যারা এত বেড়াতে আসে, বিপদের দিনে তারা তো আসবেই।

এই ভিকটর, তাহলে কী হবে রে? গাবলু হঠাৎ অসহায় বোধ করে। কাকটাকে আমার মারাটা বোধহয় উচিত হয়নি। কিন্তু কী করব! ওটাই তো আগ বাড়িয়ে এসে আমায় ঠোক্কর মারল। তাও একবার নয়, পরপর দু'বার।

কিন্তু তুই বা ওটাকে তাড়াতে গেলি কেন? ও তোর কোনও ক্ষতি করেনি। বিনা প্ররোচনায় তুই ওর দিকে ডট পেন ছুঁড়লি। আসলে এই সব করেই তো তুই ওর মেজাজটাকে খাট্টা করে দিলি।

আমি বিনা প্ররোচনায় ওর দিকে ডট পেনও ছুঁড়িনি, ওকে তাড়াতেও যাইনি। ওই তো আমার পড়বার সময় সামনের রেলিঙে বসে সমানে কা-কা করছিল। একেই তখন অঙ্ক মিলছিল না। তার ওপর এই কা-কা ডাক। তুই বল ভিকটর, অঙ্ক না মিললে কারও মাথার ঠিক থাকে? অসহায় ভঙ্গিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় গাবলু।

তুই ঠিকই বলছিস রে, গাবলু। অঙ্ক না মিললে নিজের মাথার চুলগুলো পটাপট ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। ভিকটর গাবলুর কথা মেনে নেয়। সেই সঙ্গে ওকে ভরসা যোগাতে বলে, তুই অত ভাবিস না, গাবলু। কাকটার যদি
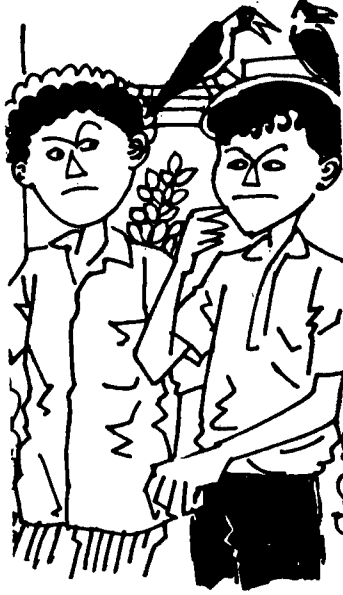
সামান্য বিবেক বা বিবেচনা থাকে তবে নিশ্চয় ওর দোষ বুঝতে পারবে। মনে হয় ও আর তোর পেছনে লাগতে আসবে না। এমনও হতে পারে, ও আর তোর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

কিন্তু ভিকটর, কাকটার যদি বিবেক-বিবেচনা না থাকে, তবে তো ও আমায় ছাড়বে না। ওর বাবা-মা-আত্মীয়-বন্ধুদের ইতিমধ্যে ও যদি আমার বিরুদ্ধে উল্টো-পাল্টা বুঝিয়ে থাকে, তাহলেও ওরা আমাকে ছাড়বে না—সবাই মিলে বদলা নেবে। আমার কথা ওরা কেউ শুনবেই না।

থাম তো গাবলু। বদলা নিলেই হলো? তা ছাড়া ওই কাকটারই শুধু বন্ধুবান্ধব আছে বুঝি? তোর নেই? ওরা বেশি বেগড়বাঁই করলে বাবার আলমারি থেকে ছর্‌রা-বন্দুকটা বার করে নেব। দুমদাম চালাবো বন্দুকটা। দেখবি মরা কাকের পাহাড় হয়ে যাবে।

মানুষ আর কাকের যুদ্ধ! অভিনব ব্যাপার হবে বটে। ইতিহাস বইতে এ যুদ্ধ জায়গা পেতে পারে। আর ইতিহাসে জায়গা না পেলেও গিনেস বইতে নির্ঘাৎ কাক-মানুষের যুদ্ধের কথা রেকর্ড হবে। ছর্‌রার কথাতে গাবলু অনেকটা বল-ভরসা পেয়ে যায়।

ভিকটর গাবলুকে বাধা দেয়। তুই তখন থেকে যুদ্ধ-যুদ্ধ কী বলছিস? একে মহাযুদ্ধ বলা উচিত। কাক আর মানুষের লড়াই। এ হলো ইতিহাসের মহারণ। তবে আপাতত যুদ্ধে-ফুদ্ধে গিয়ে কাজ নেই। ছর্‌রা বন্দুক এখন পাওয়া যাবে না। ওটা আলমারিতে তালাবন্ধ থাকে। চাবি থাকে আবার বাবার কাছে। তাই চল, মোড়ের দোকানটা থেকে গোপনে ক'টা পটকা কিনে রাখি। কাক-টাক কাছাকাছি এলেই পটকা ফাটাব। আওয়াজ শুনলেই বাছাধনরা পাড়াছাড়া হবে।

তাই চল, ভাই। তবে বেরবার সময় একটা ছাতা নিয়ে নিস।

গাবলুর কথায় ভিকটর আকাশ থেকে পড়ে। এমন রোদ-ঝলমল সকালবেলায় সঙ্গে ছাতা নেব কেন রে? লোকে আমাদের পাগল ভাববে না?

তা ভাবুকগে। কিন্তু বলছিলাম কী, গাবলু দু'বার ঢোঁক গেলে, রাস্তায় কাকটা যদি আমায় দেখতে পেয়ে আবার ঠোক্কর মারতে আসে! একা না হয়ে যদি আবার দলবল সঙ্গে ডেকে আনে! ছাতাটা তখন ঢালের মতো ওদের রুখে দিতে পারবে। তাছাড়া ছাতার আড়ালে থাকলে হতভাগাটা আশেপাশে থাকলেও আমায় দেখতে পাবে না।

হুঁ, তোর কথাটা অবশ্য উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ভিকটর বন্ধুর যুক্তি মেনে নেয়।

এরপর ছাতার সন্ধানে ভিকটর বাড়ির ভিতর যায়। কিন্তু একটু পরেই ব্যাজার মুখে ফিরে আসে।

কী রে, কী হলো? ছাতা আনলি না?

ছাতা আনব কী রে! দেখি বাবা-মায়ে কী সব কথা হচ্ছে।

কী নিয়ে?

আড়াল থেকে যেটুকু শুনতে পেয়েছি তাতে বুঝেছি আমার পড়াশোনার ব্যাপারেই কথা বলছেন ওঁরা। আমার নাকি লেখাপড়ায় মন নেই একদম। একটু শুনেই পালিয়ে এলাম। ওঁদের সামনে পড়ে গেলে এখনই ইংরাজি গ্রামার নিয়ে বসতে হতো। তারপর আবার আঁক কষা,

বুঝলি? তাই ছাতা থাক, এমনিই যাই চল। এই র‍্যাকেটটা বরং সঙ্গে নিই। দেখাই যাক না কাকেরা কী করে! তেমন তেমন বুঝলে বাড়িতে ফিরে আসব, কী বল?

ভিকটরের কথায় গাবলুর সায় পুরোটাই। ওর মনে পড়ে ভিকটরের বাড়িতে আসার পথে কোনও কাক কিন্তু ওকে ঠোকরায়নি। ঠোকরানো দূরে থাক, কেউ ওকে ভয় দেখাতেও আসেনি। পথে কটা কাককে ও দেখেছিল বটে, কিন্তু তারা ডাস্টবিনের পচাগলা খাবার খেতে এমনই ব্যস্ত ছিল যে ওর দিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি।

গাবলু আর ভিকটর রাস্তায় বার হয়ে পড়ে। সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখতে দেখতে যায় ওরা। কয়েকটা কাকের দেখা ওরা পেল, কিন্তু তাদের কেউ আক্রমণ করতে পারে এমন মনে হলো না। মোড়ের কাছে একটা গাছে অনেক কাকের বাসা। ডালে বসে গোটাকতক কাক খা-খা করে চ্যাঁচাচ্ছিল। তারাও কেউ গাবলুদের কিছু বলল না।

কীরে পটকা কিনবি কিনা ভেবে দেখ। শত্রু বলে অবশ্য কাউকে দেখছি না। ভিকটর হাসিমুখে বলে।

একটা কাকের দিকে নিতান্ত নিরাসক্ত ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গাবলু উত্তর দেয়, কিনব না। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট। আসবার পথে একটা দোকানে দেখছিলাম জিলিপি ভাজছে। হাতে গরম পাওয়া যাবে। তাই খেলে হয় না?

ঠিক বলেছিস, গাবলু। পটকা কিনে পয়সা নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে ওই পয়সায় জিলিপি খাই চ। গরম জিলিপির জবাব নেই।

পটকার দোকানের দিকে নয়, দু'বন্ধুতে গলা জড়াজড়ি করে জিলিপির দোকানের দিকে এগিয়ে যায়।

ছবি : সমীর সরকার
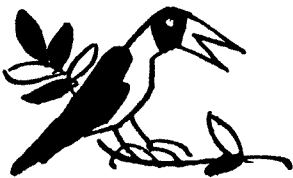
যেথায় মাকে পাই

দিলীপ রায়

পুজোয় এবার বললো ভুলু, 'মামা,
যতই বল কোলকাতা,
আমার শুধু একটি কথা,
গাঁয়ের পুজোর মজা জানো না।
এখানে হরেক রকম আলোর খেলায়
পাই না খুঁজে মাকে
গাঁয়ে আমার নাটমন্দিরে
মা সারা বছর থাকে।
পুজোয় শুধু তাঁকে ঘিরে সবার উৎসব
রাতে-দিনে মানুষজনের খুশির কলরব।
এই ক'দিন ঠাকুরবাড়ি সবার নিমন্ত্রণ
ঘরে কারো আঁচ পড়ে না, গাঁয়ে অরন্ধন।
দশমীতেও সেথায় কেউ মোছে না চোখের জল
বারো মাসই মা আছেন সেটাই মনের বল।

মিথ্যে নালিশ

অভীক বসু

হঠাৎ সেদিন ঢুকল পাড়ায় কুকুর-ধরা গাড়ি,
সাঁড়াশি দিয়ে আঁকড়ে ধরে বাচ্চা থেকে ধাড়ি,
কুকুরবিহীন যেই হয়েছে সেদিন থেকে পাড়ায়
চোর বাবাজী হলেন হাজির ভয় নেই আর তাড়ায়।
বাসন চুরি, শাড়ি চুরি, চুরি আছে লেগেই
চোর ধরতে পাড়ার লোকে পাহারা দেয় জেগেই।
এইতো সেদিন পানু চোরে আঁকশি নিয়ে রাতে
যেই দেখেছে ওমনি হাবু ধরল হাতেনাতে।
চোর বেচারা ধোলাই খেয়ে হয় যে নতজানু,
সত্যি কথা বলল শেষে ভড়কে গিয়ে পানু।
'অনাহারে ছিলাম বাবু বন্ধ ছিল চুরি
কুকুর ছাড়া থাকলে পথে কেমন করে ঘুরি?
চুরি করে পেটটি চলে তাও কি হবে মাটি
বিদ্যেটা যে যাবই ভুলে, মতলব তাই আঁটি,
পৌরসভায় নালিশ জানাই পাঠান মশাই গাড়ি,
পাগলা কুকুর খুব বেড়েছে, ধরুন তাড়াতাড়ি।'
রহস্যটি ফাঁস হয়ে যায় ঘুষি এবং চড়ে
হাতকড়াটি লাগিয়ে পানু চলল যে শ্রীঘরে।

ছবি : সুফি

ভিক্টর ট্রাম্পার

বিষ্ণু বসু

ভিক্টর ট্রাম্পার
মেরেছেন বাম্পার
সপাটে,
উড়ে গিয়ে বল তাঁর
লাগে এক জানলার
কপাটে।
বল গিয়ে লাগতেই
ভাঙে জানলার সেই
সার্সি,
'কেমন চমৎকার
বাউন্ডারি এ ওভার
মারছি—'
বললেন ট্রাম্পার।
একথার দাম তাঁর
সকলে
দিতে গিয়ে জেরবার
করে ফেলে জিভ বার
ধকলে।
কাটিয়ে কঠিন 'শক'
পড়ে সব দর্শক
হামলে—
বলে, 'ভাঙা জানলার
কাচ রাখা দরকার
সামলে।
তাজ্জব যেটা দেখে
ইতিহাসে লিখে রেখে
দেব তা,
ট্রাম্পার ভিক্টর
হবেন অতঃপর
দেবতা।'

বীভৎস মূর্তি

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিকালের সব মূর্তি সংগ্রহের ব্যাপারে আমার বন্ধু প্রশান্ত হালদারের ভীষণ আগ্রহ ছিল। অগাধ টাকার মালিক প্রশান্ত। থাকতো বিহারের জামসেদপুরের কন্ট্রাকটারস এরিয়াতে। সাজানো-গোছানো বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বড় হলঘর তৈরি করেছিল শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্য মূর্তিগুলো রাখার জন্যে। মূর্তি সংগ্রহের জন্যে সে প্রচুর টাকা খরচ তো করতোই প্রয়োজন হলে যে কোনো মূল্যে কিনতে দ্বিধা করতো না। অবশ্যই মূর্তি যদি তার পছন্দ হতো। এই মূর্তি কেনার জন্য সে ভারতবর্ষ ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশেই যাওয়া-আসা করতো। প্রশান্তর স্ত্রী রুমা আর তার দুই ছেলের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল কিন্তু প্রশান্ত চিরকালই জেদী তাই কারুর কথায় বা আপত্তিতে সে কান দিত না।

নভেম্বরের শেষ মানেই বিহারে তখন বেশ ঠাণ্ডা। এই সময় আমাকে অফিসের কনফারেন্সে যোগ দিতে রাঁচিতে যেতে হয়েছিল। কলকাতায় ফেরার আগে ঠিক করলাম জামসেদপুরে প্রশান্তর কাছে একদিন থেকে কলকাতায় ফিরবো। রাঁচি থেকে সোজা শেয়ার ট্যাক্সি করে সেদিন ঠিক সন্ধ্যেবেলায় জামসেদপুরের বিষ্ণুপুরে পৌঁছে নামী মাদ্রাজী হোটেল থেকে কিছু মিষ্টি ও নোনতা খাবার কিনে, পায়ে হেঁটে কন্ট্রাকটারস এরিয়াতে যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকারটা বেশ ঘন হয়ে এসেছে। প্রশান্তর বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অত বড় বাড়িটা কেমন যেন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। শুধুমাত্র একতলার একটা ঘরের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে সামনের বাগানে। কলিং বেলটা বাজাতেই বাড়ির পুরনো কাজের লোক বিপিন দরজাটা খুলে আমায় দেখে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, বাবু আর বউদি কোথায়, তাদের বলো আমি এসেছি।

দাদাবাবুরা বসার ঘরে আছেন, আপনি যান আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসছি।

নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দেখি, প্রশান্তর দুই ছেলের গায়েই অশৌচের বেশ। ওদের গা ঘেঁষে বসে আছেন প্রশান্তর এক দাদা ও অন্যান্য কয়েকজন অচেনা লোক। প্রশান্ত আমার বহুদিনের বন্ধু তাই ওর দাদা আমায় চেনে আর দুই ছেলে বসন্ত ও হেমন্ত তো আমাকে ওদের বাবার মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আমাকে দেখেই দুই ভাই চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠল, আংকল, মা-বাবা দু'জনেই আর নেই।

বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেলাম।

প্রশান্তর দাদা বললেন, মনে হচ্ছে আপনি ভীষণ শকড। একটু বিশ্রাম করুন, চা খান তারপর সব শুনবেন।

দুপুরের খাওয়ার পর বসার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম আমি। প্রশান্তর দাদা, বসন্ত, হেমন্ত, সেই সঙ্গে বিপিনও তখন সেখানে উপস্থিত। বড় ছেলে বসন্তই শুরু করল—

মাস তিনেক আগে বাবার কাছে মূর্তি কেনাবেচার এক পুরনো দালাল এসে হাজির। তার নাম রহিম। এসেছিল ভুটানের এক জায়গায় প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য একটি মূর্তির ব্যাপারে। খুবই সস্তায় মূর্তিটা পাওয়া যাবে বলে, রহিমের সঙ্গেই বাবা চলে গেলেন ভুটানে। ঠিক ওই সময় স্কুলের ছুটি কাটাতে আমরা দুই ভাই পাটনার হোস্টেল থেকে জামসেদপুরে চলে এসেছি। প্রায় দিন কুড়ি পর বাবা ফিরে এলেন মূর্তিটা নিয়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম, মূর্তিটা কিনতে অনেকেই বাবাকে বারণ করেছিল কিন্তু বাবা ভেবেছিলেন হয়তো তারা কেউ মূর্তিটা

কিনবে বলে তাঁকে কিনতে বারণ করছে। মূর্তিটা হলঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট পাথরের টেবিলের ওপর বাবা রেখেছিলেন। মূর্তি বিষয়ে আমাদের দু'ভাইয়ের কোনো উৎসাহই ছিল না। এ ব্যাপারে কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি। মা কিন্তু এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এই নিয়ে বাবা ও মায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়া হতো। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই আবার সব স্বাভাবিক। কিন্তু এই মূর্তিটা আসার পর থেকে মা যেন রাগে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কিছুতেই ওই মূর্তি বাড়িতে রাখবেন না। বাবাও জেদ ধরলেন ওটা থাকবেই। ইতিমধ্যে আমাদের ছুটি শেষ হয়ে গেলে আমরা পাটনায় চলে আসি। তারপর যা ঘটেছিল, সেটা বিপিনদা ভালো করে বলতে পারবে।

বিপিন এতক্ষণ দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবারে সে মাটিতে বসে বেশ ভয়ে ভয়ে বলতে শুরু করল, দাদাবাবুরা চলে যাবার পর ওই মূর্তি নিয়ে বাবু আর মায়ের মধ্যে এমন তুমুল ঝগড়া হলো যে, দু'জনে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমি কত বোঝালাম কিন্তু আমার মতো একজন গরীব লোকের কথা কে-ই বা শোনে বলুন। এরই মধ্যে একদিন সকালে বাবু আমায় বললেন, তিনি দু'দিনের জন্যে বিশেষ কাজে ঘাটশিলায় যাবেন, আমি যেন সবকিছু সামলাই। মূর্তি রাখার ঘরের চাবিটা হাতে দিয়ে সাবধান করে দিলেন ওই ঘরটা যেন খোলা না হয়। এরপর বাবু চলে গেলেন, বাড়িতে রইলাম শুধু আমি আর মা।

সেদিনই দুপুরে মা আমায় বললেন, আমি তোমাকে একশো টাকা দেবো, ওই হতচ্ছাড়া মূর্তিটাকে একটা ব্যাগে পুরে দূরে কোনো পুকুরে বা নদীতে ফেলে দিয়ে এসো, নইলে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলো।

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। বাবুর হুকুম ঘর খুলবে না, মায়ের হুকুম মূর্তিটাকে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। খুব ভয়ে ভয়ে মাকে বললাম, বাবু ওই ঘর খুলতে বারণ করে গেছেন।

মা একটুও রাগ করলেন না। খুব করুণভাবে বললেন, ওই মূর্তি আসার পর থেকে সংসারে যেন আগুন লেগেছে। ওটাকে ফেলে না দিলে ওই আগুনে সবাই জ্বলে পুড়ে মরবে। আমার আর দাদাবাবুদের কথা মনে ভেবে কাজটা কি তুমি করবে না বিপিন?

মূর্তিটা আসার পর থেকে যে অশান্তি শুরু হয়েছিল তাতে আমারও রাগ ধরে গিয়েছিল ওটার ওপর। তাই বললাম, ঠিক আছে মা, বাবু যদি আমায় মারধোর করে তাড়িয়েও দেয় তবুও সংসারের মঙ্গলের জন্যে আপনার কথামতো আমি আজই ওটাকে বিদায় করে দেবো।

হলঘরের দরজা খুললাম মা আর আমি। ঘরে ঢুকে আমি এগিয়ে গেলাম মূর্তিটার দিকে। ওটাকে তুলে ব্যাগে ভরবো। মূর্তিটার ওপর দিকে কোনো ঠাকুরের মুখ আর নিচের দিকটা ছোট ছোট পাথর বসানো অনেকটা সাপের ল্যাজের মতো দেখতে। আমি তাড়াতাড়ি ওটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তোলবার চেষ্টা করে দেখলাম মূর্তিটাকে কিছুতেই নাড়াতে পারছি না। মাকে বললাম, মা কি হবে, আমি তো মূর্তিটাকে তুলতেই পারছি না। ভীষণ ভারী বলে মনে হচ্ছে। শুনে মাও এসে আমার সঙ্গে হাত লাগালেন। কিন্তু দু'জনে মিলে অনেক চেষ্টা করেও মূর্তিটাকে একচুলও নড়াতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, মূর্তিটা কি খুব বড় আর ভারী ছিল?

বিপিন উত্তর দিল, একেবারেই নয় বাবু। ছোট্ট পুতুলের মতো সাইজ।

ওইটুকু মূর্তিকে তুমি আর মা দু'জনে মিলেও তুলতে পারলে না?

না বাবু, কিছুতেই পারলাম না। আমরা দু'জনেই দেখলাম মূর্তিটার দুটো চোখ দিয়ে আগুনের মতো আলো বেরোচ্ছে আর পেছনের ল্যাজটাও কেমন যেন নড়েচড়ে উঠছে। ল্যাজের মধ্যে থেকেও একটা আলো বেরিয়ে আসছে।

তারপর?

আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি একটা মোটা দড়ি আর ছোট শাবল নিয়ে এসে মূর্তিটাকে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে যেই শাবল দিয়ে চাপ দিয়ে তুলতে গেছি, বললে বিশ্বাস করবেন না বাবু, আমাকে কে যেন মাটি থেকে তুলে নিয়ে এমন ধাক্কা মারল যে আমি দূরে ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়লাম মাটিতে। তারপর কি দেখলাম জানেন, মূর্তিটা একটা বীভৎস আকার ধারণ করে আরও যেন বড় হয়ে গেল আর ল্যাজটাও বিরাট বড় হয়ে গিয়ে, আমাদের দু'জনকেই জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমি মাটি থেকে উঠে পড়েই মায়ের হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে হলঘরের বাইরে এনে দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিলাম।

বিপিন আবার বলতে শুরু করলে, ওই ঘটনার পর মা যেন কেমন বদলে গেলেন। বাবুর সঙ্গে একটাও কথা বলতেন না। মাঝে-মধ্যে আমার সঙ্গেই একটু-আধটু কথা বলতেন।

এরই মধ্যে একদিন মা আমায় ডেকে বললেন, বিপিন, তুমি খোকাবাবুদের কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ, তুমি ওদের একটু দেখো।

কিছুই বুঝলাম না। খোকাবাবুরা পাটনাতে থেকে লেখাপড়া করছে, তারা ভালোই আছে, তাদের আবার কি দেখবো।

এর কয়েকদিন পর, ঠিক সন্ধ্যের সময় এই ঘরে বাবুকে চা দিচ্ছি, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া চলছে। সেই সময় এখানে কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল আর তারই মধ্যে থেকে থেকে আলোগুলো খুব কমে যাচ্ছিল। বাবুকে চা দিয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। এই ঝড়-বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে কে আবার এলো ভেবে দরজাটা খুলে দেখি, অদ্ভুত চেহারার একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন আবার রাস্তার একটা আলোও জ্বলছিল না। বাড়ির আলো খুব টিমটিম করে জ্বলছিল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে লোকটাকে ভালোভাবে

লক্ষ্য করতে পারিনি।

লোকটা হিন্দিতে বাবুর নাম বলে বলল, সে ওনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বললাম, আপনি একটু দাঁড়ান আমি বাবুকে গিয়ে বলছি। কিন্তু বাবুকে সংবাদটা দিয়ে পেছন ফিরেই দেখি লোকটা সোজা চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। বাবু তো রেগে টং। বললেন, আপনি কি রকম লোক মশাই, না বলে একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এলেন? কি চাই বলুন, আমিই প্রশান্ত হালদার।

লোকটা বলল, আমার নাম মগ্নু, ভুটান থেকে আসছি। তারপর ঘরের চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, মূর্তিটা কোথায় রেখেছেন?

কোন মূর্তি?

ভুটান থেকে আপনি যেটা এনেছেন।

আমি কোথায় মূর্তি রেখেছি সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?

বিপিনকে থামিয়ে আমি প্রশ্ন করি, মা তখন কোথায় ছিলেন?

বিপিন বলল ওপরে। তারপর আগের কথার খেই ধরে বলতে লাগল, লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন। মূর্তিটা বাড়িতে রাখলে আপনার এবং পরিবারের সকলের বিপদ হবে। ওটা সাক্ষাৎ শয়তান। এক কাপালিকের ছিল ওটা। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এক জঙ্গলের মধ্যে কাপালিক ওই মূর্তিটাকে দেখতে পায়। বাড়িতে নিয়ে এসে নিজের অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে ওই মূর্তির মধ্যে এক প্রেতাত্মার প্রবেশ ঘটিয়ে ওটাকে জীবন্ত করে তোলে। তারপর নিজের প্রয়োজন মতো মূর্তিটাকে পরিচালনা করে। মনের জোরে মূর্তিটা যেখানে খুশি যাওয়া-আসা করতে পারে। মূর্তিটার নিচের দিকে যে ল্যাজটা আছে ওইটাই বিশেষ করে মানুষকে আকর্ষণ করে কারণ ল্যাজটা মাঝে মাঝে আলোয় ভরে ওঠে আবার নিভে যায়। ল্যাজটার গায়ে যে নানা রংয়ের পাথর আছে সেই থেকেই আলো বেরোয় এবং সেই সময় ল্যাজটাও নড়তে

শুরু করে বিশাল হয়ে যায়। ওই ল্যাজটাই হলো মূর্তিটার শক্তি। আপনিও সময়মতো সেটা দেখতে পাবেন।

বাবু চিৎকার করে বললেন, বিপিন ব্যাটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দে। ঠিক সেই সময় মা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বিপিন কি হয়েছে, এত চেঁচামিচি কেন? আমি কিছু বলার আগেই লোকটা বেশ ধমকের সুরে বলে উঠল, কাপালিকের মন্ত্রপূত মূর্তিকে যে রাখবে সেই মরবে। বাবু এবারে আরও রেগে গিয়ে বললেন, মূর্তি আমার কাছেই আছে কিন্তু তুমি কে যে তোমার কথায় মূর্তিটা ফেরৎ দিয়ে দেবো!

'আমি কে' বলে আবার সেই ভয়ানক অট্টহাসিতে ঘর ভরিয়ে তুলে লোকটি বলল, আমিই সেই কাপালিক আর ওই মূর্তি আমারই সৃষ্টি।

মা এই লোকটার উপস্থিতির কথা জানতেন না বলে একটু হকচকিয়ে গিয়ে ধপ করে সামনের সোফার ওপরে বসে পড়লেন। আমিও ভয় পেয়ে যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেলাম। চোখের সামনে দেখলাম লোকটার জায়গায় লাল কাপড়ে দাঁড়িয়ে এক কাপালিক। তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে আর জানলা-দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ছে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া। সমস্ত ঘরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। মনে হলো কাপালিকের দেহটা যেন শূন্যে ভাসছে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি আর ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোতে আমরাও যেন পাথর হয়ে গেছি। তখনও সে বলছে, আমি কাপালিকের প্রেতাত্মা।

আমাদের সামনেই কাপালিকের চেহারাটা ছোট হয়ে গিয়ে শূন্যে উঠে ঘর থেকে বেরিয়েই যেন মিশে গেল অন্ধকারে।

মায়ের কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাবুও যেন পাথরের মতো হয়ে গিয়ে বসে আছেন সোফার ওপরে। আমারও যেন সব শক্তি লোপ পেয়েছে। হ্যাঁ বাবু তারপর যা বলছিলাম। আমি তো এগিয়ে গেলাম বাবুর কাছে। বাবু ততক্ষণে যেন সামলে উঠেছেন। মায়ের কাছে গিয়ে দেখি মায়ের জ্ঞান নেই। চোখে-মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে বাবু আর আমি মাকে ধরে ওপরে ওনার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বাবু ডাক্তারবাবুকে ফোন করলেন। ডাক্তারবাবু এসে মাকে দেখেটেখে কয়েকটা ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেলেন। ওষুধগুলো খাবার কয়েকদিন পর মা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই ঘটনার পর থেকে বাবু যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন, কথাবার্তাও কম বলতেন আর রোজ সকালে হলঘরের চাবি খুলে ওই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখতেন। বাবু আর মায়ের ওই অবস্থা দেখে আমি পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়ে বড়বাবুকে টেলিগ্রাম পাঠালাম।

বড়বাবু কে?

প্রশান্তর দাদা বললেন, আমি। টেলিগ্রাম যখন পৌঁছায় আমি তখন কাশীতে। বাড়ি ফিরে এখানে আসবো যখন ভাবছি তখন আবার টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে জানলাম প্রশান্ত ও বউমা দু'জনেই মারা গেছে। আমি সেইদিনই চলে আসি। তারপর বসন্ত আর হেমন্তকে পাটনা থেকে নিয়ে এসে মর্গ থেকে বডি বার করে দাহ করাই।

প্রশান্তর দাদা থামতে বিপিন আবার বলতে শুরু করল, প্রথম টেলিগ্রামের পর বড়বাবু এলেন না দেখে বাবুরই আর এক বন্ধু সাকৃচিতে থাকেন তাঁকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালাম। কিন্তু তিনি আমার কথার

কোনো গুরুত্বই দিলেন না। খোকাবাবুদের জানিয়ে কোনো লাভ নেই ভেবে জানাইনি। তবে আশপাশের দু'চারজন পরিচিত লোককে সব জানিয়েছিলাম কিন্তু বাবুর ওই মেজাজের জন্যে ওনার কাছে আসতে কেউ সাহস করেনি।

আমি রোজই বিকেলে খাটাল থেকে দুধ আনতে যাই। সেদিনও দুধ আনতে গেছি, কিন্তু দুধ দিতে দেরি করায় বাড়ি আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গেটটা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে ভেতরে যাবার সময় শুনলাম মায়ের চিৎকার। ছুটে গেলাম হলঘরের দিকে। দেখলাম মায়ের হাতে সেই ছোট শাবল আর বাবুর হাতে মূর্তিটা রয়েছে। কিছু বোঝবার বা বলবার আগেই মায়ের হাতের শাবলটা আছড়ে পড়ল বাবুর হাতের ওপর আর মূর্তিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। বাবু চিৎকার করে ধাক্কা দিয়ে মাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। পড়ে থাকা মূর্তিটাকে হাতে নিয়ে মা আছড়াতে লাগলেন মাটিতে। ঘরের মধ্যে একটা আলোর ঝলকানির সঙ্গে দেখলাম মূর্তির সেই ল্যাজ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা চোখ-ধাঁধানো আলো, ল্যাজটা বড় হচ্ছে আর মূর্তিটাও মাটি থেকে সোজা হয়ে উঠে ক্রমশ বীভৎস হয়ে যাচ্ছে। ল্যাজটা লম্বা হতে হতে ধরে ফেলল মায়ের গলা। মা চিৎকার করে উঠলেন। বাবুও ঝাঁপিয়ে পড়লেন ল্যাজটাকে ধরার জন্যে। আমি মা আর বাবুকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গিয়ে বাড়ির পাশেই ক্লাবের ছেলেদের আর পাড়ার কিছু লোককে ডেকে নিয়ে এলাম। বাড়িতে ঢুকে আমরা সবাই দেখলাম সেই ল্যাজটা বাবু আর মায়ের গলা শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরেছে। মা ও বাবু দু'জনেই ছটফট করছেন। আমরা ল্যাজটাকে ওঁদের গলা থেকে ছাড়াতে যেতেই সেটা ছোট হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা কালো ধোঁয়া বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। মূর্তিটা আমাদের চোখের সামনেই ধোঁয়া হয়ে মিশে গেল অন্ধকারে।

ছবি: রঞ্জন দত্ত

নিজের দিকেই

পঙ্কজ সাহা

শালিখ শালিখ
কে তোর মালিক
উড়ছে যে?

জারুল শিমুল
কে ওড়ালো
হাওয়ায় আজ?

নদীর নূপুর
বাজায় পাথর
সৃষ্টি কার?

তিন প্রশ্নের
একই জবাব,
প্রকৃতি এবং
প্রকৃতি সে।

সেই প্রকৃতির
হাওয়ায় কেন
চক্ষু জ্বালা!

সেই প্রকৃতির
নদীর জলে
বিষ কে মেশায়!

সেই প্রকৃতির
গাছের প্রাণে
হুল কে বেঁধায়!

মানুষ মানুষ
মানুষ ছাড়া
আবার কে!

মানুষ এখন
যুদ্ধরত,
নিজের দিকেই
বাণ ছুঁড়েছে।

মিষ্টি ছড়া

শান্তি সিংহ

মিষ্টি ছড়া কোথায় থাকো তুমি?
এখন বুঝি নোনতা-ঝালের দিন?
শিরীষডালে রেশমি-কোমল ফুল
মিষ্টি গন্ধ ছড়ায় আপন মনে!

বৌ-কথা-কও হিজল গাছে ডাকে
জারুল ফুলে মৌমাছিরা ওড়ে
বকের গায়ে দিনশেষের আলো
আমন ধানে সবুজ শিহরন!

কী আর ভাবো ডাগর-দীঘি-চোখে
ইতিউতি পলক-ভরা মুখ
সাগরফেনা গড়িয়ে ভেঙে যায়
শরৎ দিনে বাসনা উৎসুক!

পরাণকথা গুনগুনিয়ে ওঠে
হাস্নুহানার দোদুল নরম মন
শরৎ আলোয় সেগুন মঞ্জরী
কালো ভ্রমর করে যে গুঞ্জন!

হনুমানের বিয়ে

আশিস সান্যাল

পোড়ামুখো হনুমানের
আজকে হবে বিয়ে,
জুতো-জামায় পরিপাটি
টোপর মাথায় দিয়ে।

গুনগুনিয়ে গাইছে হনু
মনের সুখে গান,
মুখে পুরে বেনারসের
জর্দা-ভরা পান।

বাজছে ঝাঁজর বাসর ঘরে
আজকে সারাদিন,
দুইটি ছাগল বাজায় বসে
সরোদ এবং বীণ।

গানের তালে হঠাৎ এ কী!
হনুর ভাবী বউ,
লেজটি তুলে নাচতে থাকে
পুরুলিয়ার ছউ।

তাই না দেখে ছুটে এল
পশু-পাখির দল,
বাসর ঘরে আজকে ভীষণ
চলছে কোলাহল।

ছবি: সুফি

হাস্যরসিক সুভাষচন্দ্র

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

উনিশশো তেরো সাল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে নতুন ছাত্রেরা ভর্তি হয়েছে কলেজে। ভর্তি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলেরা। একঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রের মধ্যে একটি নাম কিন্তু সবার মুখে মুখে ঘোরাফেরা করে। তার সম্বন্ধে নানা কথা, নানা গুঞ্জন। অথচ ছেলেটি কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়নি, হয়েছে দ্বিতীয়। তবে হ্যাঁ, কলকাতার কোনও নামকরা স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়নি সে, দিয়েছে উড়িষ্যার কটক শহরের একটি স্কুল থেকে।

পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে প্রমথনাথ সরকার। সে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। আর দ্বিতীয় হয়েছে এই ছেলেটি—যার সম্বন্ধে সবাই উৎসাহী। সে কটকের র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র।

কিন্তু ফার্স্ট বয়কে ছেড়ে সেকেন্ড বয়ের প্রতি ক্লাসের ছেলেদের এত আকর্ষণ কেন? কারণ নিশ্চয় ছিল। প্রথমটি হলো ছেলেটি উড়িষ্যা থেকে পরীক্ষা দিয়ে মাত্র দুই নম্বরের ব্যবধানে সেকেন্ড হয়েছে। কলকাতার কোনও স্কুল থেকে পরীক্ষা দিলে হাসতে হাসতে অনেক বেশি নম্বর পেত। সুতরাং, সে অসাধারণ মেধাবী। দ্বিতীয়ত তার পবিত্র চরিত্র। স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। কৈশোরে একবার ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল। সবার ওপর তাকে যেমন রাজপুত্রের মতো সুন্দর দেখতে তেমনি গম্ভীর সে। মনে হয় সব সময় যেন চিন্তামগ্ন। তার ওই ভুবনভোলানো রূপ আর অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বভাব সহপাঠীদের আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে বেশি। ওই বয়সে ওই গাম্ভীর্য সত্যিই ভাবা যায় না। তার এই রাশভারি স্বভাবের জন্য চট করে কেউ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। অনেকে ভাবত বিধাতা বুঝি তাকে হাসি দেননি। তবে হাসলে কিন্তু তাকে দারুণ লাগত। যেন রুক্ষ পাহাড়ের বুকে ছলছল ঝরনার জল। তার সেই হাসি যারা দেখেছে তারা বিস্মিত হয়েছে। রুক্ষ গম্ভীর স্বভাবের অন্তরালে তারা দেখেছে এক অদ্ভুত সরস মন।

হ্যাঁ, এই ছিল সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের একটা দিক। এই হাস্যরসিক সুভাষকে যারা দেখেছে তারা হয়েছে মুগ্ধ। দেখেছে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, দেখেছে ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও। সুভাষ যেমন হাসতেন তেমন হাসাতেন। এমন গম্ভীর মানুষ যে এত প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এর বেশ কিছুদিন পরের কথা। সুভাষের বিলেত যাবার কথাবার্তা চলছে। আই সি এস পড়ার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস অ্যাডভাইসার এক ইংরেজ অধ্যাপক সুভাষকে বলেন, তুমি কি জান অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের সেরা ছাত্ররা আই সি এস পরীক্ষায় বসে? অযথা তোমার বাবা তোমাকে সেখানে পাঠাচ্ছেন কেন?

সুভাষ জবাব দেয়, আমার বাবা দশ হাজার টাকা নষ্ট করতে চান।

সুভাষের এই উক্তি নিয়ে পরে খুব হাসাহাসি হয়। কারণ, সুভাষ আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ হয় এবং অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের ইংরেজ ছাত্রদের পেছনে ফেলে ইংরেজিতে হয় প্রথম।

আই সি এস পাশ করে রসিক সুভাষ এক বন্ধুকে চিঠি লেখে: তুমি শুনে হয়তো দুঃখ পাবে যে আমি আই সি এস পাশ করে ফেলেছি। এখন উপায়!

ছাত্র সুভাষের পর এবার আসা যাক নেতা সুভাষের কাছে। সদাব্যস্ত চিন্তামগ্ন এক গম্ভীর নেতা—যিনি দেশের স্বাধীনতা ছাড়া কিছু ভাবেন না, ভাবতে রাজী নন। তবুও তাঁর অন্তরে রসবোধ ছিল অসাধারণ।

ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল। ১৭(বি) ধারায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সুভাষকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তিন মাস হাজতে থাকার পর তাঁকে ছ'মাসের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দণ্ডাদেশ শুনে হেসে ফেললেন সুভাষ। বললেন, Only six months? Have I robbed a fowl? আমি কি মুর্গিচোর যে অত কম দণ্ড হলো?

চিত্তরঞ্জন আর সুভাষ দু'জনেই তখন জেলে। অর্থ-সংগ্রহ চলেছে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য। চিত্তরঞ্জনের দুই মেয়ে অপর্ণা আর কল্যাণী অর্থ সংগ্রহ করছেন। গয়নাও দান করেছে অনেকে। চিত্তরঞ্জনকে দেখানোর জন্য দুই বোন গা-ভর্তি গয়না পরে জেলে আসেন। সালঙ্কারা দুই বোনকে দেখে সুভাষ হাসতে হাসতে বললেন, কী ব্যাপার? আপনারা দেখছি ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্ক। গায়ে ব্যাঙ্ক চাপিয়ে এসেছেন!

গান্ধী-আরউইন চুক্তির অবদান গোল টেবিল বৈঠক। সুভাষ একদিন বললেন, গোল টেবিল বৈঠকের সবটাই তো ধোঁকা। কারণ, টেবিলটা গোল নয়, বৈঠকটাও সমানে সমানে হয়।

মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বকেও একদিন সুভাষের সরস কথায় হাসতে হয়েছিল। সে কি হাসি!

হঠাৎ গান্ধীজী একদিন শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে হাজির। উদ্দেশ্য সুভাষের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়

নিয়ে আলোচনা। প্রথমেই তিনি বললেন, বিপ্লবীদের সংশ্রব তোমাকে ছাড়তে হবে সুভাষ।

সুভাষ জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

ওরা ভীষণ ডেনজারাস। ওদের আমি পছন্দ করি না।

আমার তো মনে হয় ওঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

না। গান্ধীজী বললেন, ওদের সঙ্গে তোমার মেলামেশা চলবে না।

সুভাষ বললেন, তা সম্ভব নয়।

কেন?

তাহলে তো সকলের আগে আপনাকে ছাড়তে হয়। আপনার সঙ্গেই মেলামেশা বন্ধ করতে হয়।

সুভাষের এই কথা শুনে গান্ধীজীর হাসির দমকে ঘর ফেটে যাবার উপক্রম। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, আমি কি বিপ্লবী?

আর এক ঘটনা। ১৯৪০ সাল। জুন মাসের এক সকালে কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডঃ বি. দে সুভাষের এলগিন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। সুভাষের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেন, সুভাষবাবু, আপনি বাইরে যাবার আগে আমাকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের চাকরিটা দিতে ভুলবেন না যেন।

সুভাষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, বাইরে! আমি বাইরে কোথায় যাচ্ছি?

কেন? সর্দার বলদেব সিং গতকাল আমাকে বলেছেন, আপনি নাকি রাশিয়া যাবার পরিকল্পনা করছেন?

হো-হো করে হেসে উঠলেন সুভাষ। তারপর ডঃ দের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, আপনি কাল রাতে কত পেগ খেয়েছেন? এখনও বোধহয় নেশা কাটেনি।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম সঙ্কট মুহূর্তেও আমরা দেখতে পাই হাস্যরসিক নেতাজী সুভাষকে। গুরুগম্ভীর পরিবেশেও তাঁর হালকা রসালো পরিহাস আমাদের বিস্ময়ে অবাক করে দেয়। খাবার টেবিলে সহকর্মীদের সঙ্গে খেতে বসতেন নেতাজী। মাঝে-মধ্যেই সেখানে বিভিন্ন খাবারের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা হতো।

একদিনের কথা। মিঃ ইয়েলাপ্পাও খেতে বসেছেন নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। দই পরিবেশনের সময় হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, মোষের দুধের দই রোজ খেলে নাকি বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়?

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই নেতাজী বললেন, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা?

ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল খাবার টেবিলে।

যুদ্ধের শেষের দিককার এক ঘটনা। দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত আজাদী বাহিনীর আত্মগোপনকারী একটি সেনাদল আশ্রয় নিয়েছে জনবসতিশূন্য গ্রামের প্রান্তে ঘন গাছের আড়ালে। সঙ্গে আছেন নেতাজী। হঠাৎ গাছের আড়াল ছেড়ে ঘুরতে বেরিয়ে শত্রুবিমানের পাইলটের নজরে পড়লেন আয়ার সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুবিমান থেকে মেশিনগানের গুলি-বৃষ্টি। আয়ার সাহেবও দে দৌড়। ছুটে এসে ঢুকলেন তিনি একটা খড়ের গাদার মধ্যে। দম বন্ধ করে পড়ে আছেন সেখানে। শত্রুবিমান চলে যাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেন আয়ার সাহেব খড়ের গাদা থেকে। সারা গায়ে-মাথায় খড়ের কুচো। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে বরাবরই নজর আয়ার সাহেবের। সব সময় সুবেশে থাকেন তিনি। গা থেকে তিনি যখন খড়ের কুচো ঝাড়ছেন তখনি নেতাজী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ইস, এত সুন্দর পোশাক এভাবে নোংরা হয়ে গেল!

অপ্রতিভ আয়ার আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন না স্যার, রাস্তায় বেরোতে-না-বেরোতেই ব্রিটিশ বিমানের চোখে পড়লাম।

নেতাজী আয়ারের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন। আয়ারও ভ্যাবাচাকা খেয়ে হেসে ওঠেন। হেসে ওঠেন সবাই।

এই হলেন হাস্যরসিক সুভাষচন্দ্র। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সবই তাঁর কাছে সমান। সব অবস্থাতেই তিনি যেমন অবিচল নির্ভীক স্থিতধী তেমনি রসিক। তাই তো তিনি নেতাজী।

আগমনী

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

নীল আকাশে ভাসিয়ে দিয়ে
সাদা মেঘের ভেলা,
বাগান জুড়ে রাশি রাশি
শিউলি ফুলের মেলা—
কে এলোরে ভুবন জুড়ে
ছড়িয়ে আলোর রাশি,
নদীর ধারে পুকুরপাড়ে
শুভ্র কাশের হাসি।
আকাশ-বাতাস জুড়ে কাহার
নূপুর রিনিঝিনি,

ঝিলের জলে পদ্ম-শালুক
বলে চিনি চিনি—
ফি-শরতের সারেঙ্গীতে
তারই আগমনী।
ছুটি-ছুটি চারিপাশে
ছুটির ঘণ্টা শুনি,
ড্যাম্-কুরা-কুর্‌র্ বাদ্যি বাজে
মায়ের আবাহনী॥

ভূত-ভবিষ্যৎ

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূত-কে, মানুষ পাচ্ছে না ভয়!
তাই, ভূতেদের চিন্তা বড়;
ঘটলে এমন, ভাল-তো নয়!
ব্যাপারখানা, কেমন-তর!

ভয় দেখাতে না পারলে, আর
কোনও ভূতের থাকবে না কাজ!
ভূতেরা সব হবে বেকার!
আতঙ্কিত, ভূতের সমাজ।

'ভূত'-এর 'ভবিষ্যৎ'-টা, তবে—
অন্ধকার-ই থাকবে, ভারি!
ভূত দেখে, ভয় পেতেই হবে,
ভূতেরা চায়, আইন-জারি!!

ছবি: সুফি

বিড়াল হজম

অশোক কুমার সেনগুপ্ত

একশো কুড়ি টাকা কেজির সাড়ে সাতশো গ্রাম ইলিশ মাছের অর্ধেক রাতের জন্যে রাখা ছিল। খেয়ে গিয়েছে বিড়ালে। শোনার পর পরেশ দাস যে মাথা ঠোকেনি দেওয়ালে, সেটাই যথেষ্ট। চেঁচাবেই তো। আর বিড়ালের আগে ঘরের সবাইকে আসামী করেও ছাড়বে! কেন দেখেনি, বসে বসে কি খই ভাজছিল? বিড়াল এল শব্দ পেল না, কালা নাকি! নাকি অন্ধ! বকুনি ঝেড়েই যাচ্ছিল।

কিন্তু শোভার স্বামীর কাছে আসামী হতে ঘোরতর আপত্তি। উকিল হয়ে সে মোক্ষম পয়েন্ট বের করে, আজ রবিবার। তুমি তো ঘরে বসে ঘাস কাটছিলে! তুমি কেন দেখনি?

শুনে গুম পরেশ। দুপুরে ঘুম দেওয়া আর ঘাস কাটা কি এক!

দেখতে পায়নি বিড়াল আসা এবং মৎস্য ভক্ষণ, এ দোষ মেয়ে অনুভা নিতে চাইল না। বলল, বাবা, আমি বিড়ালটাকে দেখেছি। মুখ চাটতে চাটতে গোঁফ নাচিয়ে নাচিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

তুইও দেখেই গেলি, দেখেই গেলি! ধরলি না কেন?

বারে, আমি তো তাড়ালাম।

তাড়ালাম! দশ বছরের মেয়েকে মুখ বেঁকিয়ে পরেশ বলল, কেন আদর করতে পারলি না?

মেয়ের চোখের তারা ঠিকরে মার্বেল, বেরিয়ে আসতে চায়! কী বলছ বাবা! আদর করব!

শোভা বলল, তোর বাবার মাথা খারাপ হয়েছে।

হয়নি। তবে হলে খুশি হতাম। হওয়া উচিত ছিল। একশো কুড়ি টাকা কেজি ইলিশ! ঘাড় ঘোরায় মেয়ের দিকে পরেশ দাস, আদর করলে কাছে আসত। কাছে এলে বেঁধে রাখতিস। বেঁধে রাখলে আমি আছাড় মারতাম।

ষাট। ষাট। মা ষষ্ঠীর বাহন, তাকে তুমি মারতে! ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি, তোমার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান হবে না? হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কাতর গলায় শোভা ষষ্ঠীঠাকরুণকে প্রণাম জানায়, হে মা ষষ্ঠী, পাপ নিও না।

তুমি থাম তো।

অনুভা বলল, বাবা আমি বিড়ালটাকে চিনি।

পরেশ অন্য সময় হলে অবাক হতো। বিড়াল কি চেনা যায়! সব বিড়ালই তো একরকম। তুলতুলে চেহারা, সাদা কি সাদার উপর কালো কিছু কেরামতি, কিংবা পুরো কালো। গোঁফ-নাক-চোখ সব এক। এখন অবাক হলো না। বলল, চিনতে পেরেছিস, ব্যস হয়ে গেল। চোর চেনা থাকলে পাকড়াও করতে অসুবিধা হয় না।

অনুভা বলল, ঘোষকাকুর বিড়াল।

হ্যাঁ, ঘোষ ছাড়া কার বিড়ালই বা হবে! বি টু কোয়ার্টারসের এই এলাকায় বিড়ালপ্রীতি তো তাঁরই। ঘোষের সন্তান নেই। মানুষের বাচ্চা পোষ্য না নিয়ে তিনি বিড়াল পুষেছেন। তাতে কার কি-ই বা এসে যায়। পোষ্যের সংখ্যা অনুভার হিসেবে, হিসেবটা যদিও প্রায় ছ'সাত মাস আগের—চব্বিশ। পরেশের এখন মনে পড়ে যায়।

চিত্ত ঘোষ চলে গেল ফুলঝোর। জমি কিনে বাড়ি করল। দুর্গাপুরের লাগোয়া হলেও জায়গাটা প্রায় গ্রামই। ফলে বিড়ালদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও মোটেই ভাল লাগেনি সব পোষ্যের। এগারটি চলে আসে পুরোনো জায়গায়। ঘোষ নিয়ে যায়, আবার চলে আসে, আবার নিয়ে যায়, আবার আসে। শেষ পর্যন্ত বহন-পর্ব ঘোষ পরিত্যাগ করে। কিন্তু এগারটির কী হবে, কে খেতে দেবে তার সন্তানদের! ফলে নিয়মিত তাকে টিফিন ক্যারিয়ারে দুধ, রুটি, মাছ ইত্যাদি ইত্যাদি বয়ে এনে খাইয়ে যেতে হয়। স্নেহ বিষম বস্তু—বলে না!

এদিকে ঘোষের কোয়ার্টারে নতুন যিনি এসেছেন সেই সনৎ চাটুজ্জে ফুটবল না খেললেও বিড়াল-বল খেলাতে ওস্তাদ। নিয়মিত শুট করে তিনি তাদের ভাগিয়েছেন। তারা বাস্তুহারা হয়ে পাড়াময় ছড়িয়ে গিয়েছে। সংখ্যা যে এগারটিই হলপ করে বলা যাবে না। অন্য জায়গার আরও কেউ কেউ এসে ভিড় বাড়াতে পারে। যাই হোক, ঘোষবাবু থাকাকালীন চব্বিশটি কারও বাড়িতেই চুরি করতে ঢুকত না। অঢেল খাবার, যাবে কেন?

এ সব সংবাদ অনুভার দেওয়া। পরেশের বয়ে গিয়েছে বিড়াল বৃত্তান্ত জানতে!

পরেশ বলল, আমি ঘোষবাবুর কাছে যাব। একশো কুড়ি টাকা দামের ইলিশ, ছাড়ব না।

শোভা জিজ্ঞাসা করল, কী বলবে!

আপনার বিড়ালে আমার মাছ

খেয়েছে।

পরেশ ঘোষের কাছে গেল অভিযোগ জানাতে ফুলঝোরে। দেখা পেয়েই শুরু করল।

ঘোষ চুপচাপ শুনল। বড়ই ধীর স্থির মানুষ। তারপর বলল, বসুন। কেমন আছেন? বাড়ির সব ভাল তো? চা খাবেন তো?

রাখুন মশাই বসা, চা খাওয়া। আপনার বিড়াল—পরেশের মনে হলো লোকটা অস্বীকার করতে পারে, বলবে হয়তো আমার বিড়াল নয়। তাই থমকে আগ বাড়িয়ে বলল, আপনি হয়তো বলবেন, আপনার বিড়াল তার প্রমাণ কী।

না। ও কথা আমি বলব না। আমার কি না সে সন্দেহই করছি না। আমি, আপনার এখানে এসে ঝড়ের বেগে বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবছি। আচ্ছা, আপনি তো বললেন, ধরতে পারলে মেরে ফেলতেন! নিন, এই চেয়ারটায় বসুন।

পরেশ চেয়ারে বসে বলল, হ্যাঁ।

তার মানে আপনি খুনের হুমকি দিচ্ছেন। খুনের হুমকি দেওয়াও যে একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা কি আপনি জানেন?

জানি। তবু—তবু আমি খুন করতাম।

শুনুন, পাগলামি করবেন না। ভাল করে বোঝার চেষ্টা করুন। খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন, হরিণ মারার জন্য এক ফিল্ম স্টারকে হাজতবাস করতে হয়েছে। কেন? না, বন্যপ্রাণী জাতীয় সম্পত্তি। তাকে হত্যা অপরাধ!

বিড়াল কি বন্যপ্রাণী!

অবশ্যই। বাঘের মাসি। মাসি-বোনপো কি ভিন্নজাত হয়? তাছাড়া ওদের মধ্যেও বন্যবিড়াল বলে একটা সম্প্রদায় আছে। আমি প্রমাণ করে দেব, আমার বিড়ালটা ওই সম্প্রদায়ের। না, না, ভয় পাবেন না, আসল কথা ওটা নয়, কথা হলো—ঘোষ একটু থামে।

ভয় পাবেন না বললেও পরেশ ভয় পায়। খুন থেকে সরে আসে। বলে, আবার কথা কি! ইলিশ মাছের দামটা আমাকে দিয়ে দিন মশাই।

আহা, আমার কথা শেষ হয়নি। হ্যাঁ, আগে বলুন, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আপনার আছে কি না!

আছে।

বিড়াল জাতীয় সম্পত্তি—এটা তো মানবেন!

মেনে নিচ্ছি। সব প্রাণীই জাতীয় সম্পত্তি। সে হিসেবে আমিও জাতীয় সম্পত্তি।

চিত্ত ঘোষ বলল, কে অস্বীকার করছে! ওই হিসেবে আপনি ওই জাতিভুক্ত।

বিড়ালজাতি আর আমার জাতি একই! পরেশ বিস্ময়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে।

বুঝেছেন তাহলে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, বুঝবেনই তো।

পরেশের চেহারা যদিও হৃষ্টপুষ্ট নয়, কিন্তু বুদ্ধিমান শুনে হৃষ্ট হয় সে। বড়বাবু প্রায়ই অফিসের কাজে প্রশ্ন করলেই বলেন, মাথাতে কি বুদ্ধি নেই! হায়, যদি বড়বাবুর বিড়াল থাকত, তাহলে নিশ্চয় ঘোষবাবুর মতো বুঝতেন।

কী ভাবছেন? শুনুন স্বজাতি রক্ষা করা আপনারও তো কর্তব্য!

পরেশ সানন্দে মেনে নেয়।

দেখুন, কত সহজে আপনি বুঝে গেলেন। ব্রেন থাকলে বোঝা যায়। আপনি শ্রেণী লোক। আমি স্বীকার করছি বিড়াল আপনার মাছ খেয়ে ক্ষতি করেছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই দুষ্কর্ম করেছে খিদের জ্বালায়। এ যে কত বড় ট্র্যাজেডি! দীর্ঘশ্বাস পড়ে ঘোষের।

অনেকক্ষণ কথা হলো। ঘোষই বলল। তার সঙ্গে জানাল, আর একদিন আসুন, আপনাকে বিড়ালের আরও ইতিহাস, আরও উপকারিতা, আরও বিড়াল ভালবাসার কাহিনী, কলকাতার বাবুদের বিড়ালের বিয়ের উৎসব এরকম অনেক অনেক আখ্যান জানাব।

তবে যা জেনে ফিরল পরেশ দাস সেও কম কিছু নয়। বরঞ্চ বাড়াবাড়িই বলা যেতে পারে। মেয়েকে বলল, শোন তোকে তো বিড়াল পুষতে দিইনি। পোষ। বিড়াল পোষ। আমার জানাই ছিল না, বিড়াল এত বিরাট, এমন মহান। আমার আপত্তি নেই।

তবে শোভা ঘোরতর আপত্তি দেখায়।

ময়না

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ও আমার ময়না!
এতটুকু অনাদর
প্রাণে তোর সয় না?
তাই বুঝি মুখ ভার
রাঙা ঠোঁট দুটি আর
মিঠে বুলি কয় না!
না, না, ওরে সোনা-পাখি
আয় তোরে বুকে রাখি
খেতে দিই গোলাপজল
হীরে-দানা, মোতি-ফল
গা-ভরা গড়িয়ে দিই
পান্নার গয়না॥

কি আছে আমার বরাতে

সঞ্জীব কুমার দে

মায়েরা তো বেশ হাসিখুশি হন
বাবারা কেন যে গোমড়া!
জেঠিমা-রা খুব-ই সাদামাটা আর
জেঠুরা হোমরা-চোমরা!
কাকিমা-রা খুব ঝগড়াটে হন
কাকুরা কিন্তু তাহা না,
দাদুরা দারুণ গল্প-বলিয়ে
ঠাকুমা-রা খোঁজে বাহানা।
পিসিদের দিল দরাজ যদিও
হাড়-কেপ্পন পিসেরা!
স্যারেদের তবু দয়া-মায়া থাকে,
নিষ্ঠুর হন মিসেরা।
দিদিরা ভীষণ আবদেরে হয়,
বোনেরা তো কথা-লাগানে!
ভাইয়েরা আবার ভ্যাঁক করে কেঁদে
সকলের ঘুম-জাগানে।
দাদা-রা ভীষণ মারকুটে, রাগী,
টগবগে তেল—কড়া-তে।
পড়লে এ ছড়া, জানি না রে বাবা
কি আছে আমার বরাতে!

ছবি: সুফি

যাই হোক, আবার ঘোষের কাছে যায় পরেশ। চায়ের সঙ্গে গরম সিঙাড়া খেয়ে আসে। আর মাথায় ভরে আনে বিড়ালপ্রীতির আধিক্য। যার ফলে রান্নাঘরে মাছ-দুধ শোভা ঢাকা দিলেও চুপিসাড়ে খুলে দিয়ে আসে। বিড়াল দেখলেই খেতে দেয়।

শোভা তিতিবিরক্ত। ফলে ভাগ্নে বাঁটুল আসতে, ওরে আমার কী হলো রে, তোর মামা—করে সবকিছু শুনিয়ে দেয়। ইলিশের গন্ধ, বিড়াল আসা এবং ঢুকে পড়া।

বাঁটুল বি. এ ফেল হতে পারে, ক্লাব আর ক্রিকেট নিয়ে মাতোয়ারা হতে পারে, কিন্তু মামারক্ষায় সে একটুও গাফিলতি করে না। ধরে নেয় ডাক্তার দরকার। আর চণ্ডী ডাক্তারের মতো ডাক্তার আর ক'জন আছে!

বাঁটুল গিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু আমার মামার বিড়াল হজম হচ্ছে না।

খেতে গেল কেন বিড়াল? জিজ্ঞাসা করেই ডাক্তার টেকো মাথার গোল চোখ আরও গোল করে ভ্রূ উঁচিয়ে বলল, কী বললি! বিড়াল?

হ্যাঁ।

ডাক্তারের সব সময়ই প্যান্ট, শার্ট, টাই, গলায় স্টেথিস্কোপ। ছোটখাটো চেহারা, পুরু গোঁফ, ফোলা গাল। বলল, কিন্তু বিড়াল কি একটা খাদ্য? ছ্যা ছ্যা তোর মামাকে বলিহারি যাই। হ্যাঁরে, ছাগল-মুরগী কি পাওয়া যাচ্ছে না? বিড়াল খেল? তা গোটা? মানে আস্ত?

গোটাটা। লেজ সমেত। বাঁটুল পুরো কেসটা শুনিয়ে দিল।

অ। চণ্ডী ডাক্তার হাই তুলল। মুখে কোনো কথা নেই।

বাঁটুল হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ডাক্তারের মুখ ফোটানোর জন্য বলে, কি হলো!

হয়ে গিয়েছে। পেটের বিড়াল বের করতে কুকুর ঢুকিয়ে দিতে হবে। কুকুর ভেতরে ঘেউ ঘেউ করলেই বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

বাঁটুল চোখ কপালে তুলে বলল, গোটা কুকুর পেটে ঢোকাতে হবে?

হ্যাঁ। চণ্ডী ডাক্তার পরমুহূর্তে আশ্বস্ত করে, তোকে খাওয়াতে হবে না, আমি খাওয়াব কুকুর। তুই শুধু দু'পুরিয়া ওষুধ নিয়ে যা। তারপর মামাকে ধরে আন।

ডাক্তার মামাকে কুকুর খাওয়াচ্ছে বাঁটুল প্রত্যক্ষ করে আঁতকে ওঠে। বলে, ডাক্তারবাবু কুকুর খাওয়ানো যায়?

যায়। তুই জানিস না। জানলে তো আমার মতো ডাক্তার হয়ে যেতিস।

তবে হ্যাঁ, ডাক্তার বটে চণ্ডীদাস, মামাকে কুকুর খাওয়াল, বিড়াল হজম হলো কিংবা বমি হয়ে বেরিয়ে এল আর কি! কুকুর ভেতরে ঘেউ ঘেউ করছে তা দিব্যি টের পেল বাঁটুল, শোভা, পাড়ার লোক সবাই।

চণ্ডী ডাক্তারের কাছে একদিন সিটিং নিয়েই পরেশ বুঝিয়ে দেয়, কুকুরের মতো প্রভুভক্ত প্রাণী আর নেই। ওরা জীবন দেয় প্রভুর জন্যে। গ্রামফোনের চোঙার সামনে কুকুর কেন? না সঙ্গীতের সমঝদার। তার সঙ্গে পুলিশ কুকুর, শিকারী কুকুর, ভেড়া চরানো কুকুর, বুল ডগ, গ্রে হাউন্ড, অ্যালসেশিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে কি কুকুরজাতির শ্রেণী, তাদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। চণ্ডী ডাক্তার পেটে কুকুর ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শোভা বলল, এ কি রে বাঁটুল, কি চিকিচ্ছের ছিরি! বিড়াল হয়ে তো মিউ মিউ করত। এখন যে সব সময় ঘেউ ঘেউ। রাস্তার কুকুরের জন্যে রুটি বেলে বেলে হাতে ব্যথা। রেশনের গম কুকুরে খাচ্ছে। হ্যাঁ রে, কুকুরের রেশন কার্ড দেবে কি না খোঁজ নে।

বাঁটুলেরও রাগ হয়। চিকিচ্ছের কি ছিরি!

তবে চণ্ডি ডাক্তারের রাগ নেই। হেসে বলল, ওরে আমার চিকিচ্ছে এরকম। রোগী মরে যাবে, কিন্তু রোগ থাকবে না। নো তাড়াহুড়ো। তবে তোর মামা মরবে না। কুকুরও বেরুবে।

বাঘ ঢুকিয়ে নিশ্চয়ই!

শুধু বাঘ নয়। সিংহ, হাতি, গণ্ডার, সাপ, ব্যাঙ, গরু, ছাগল সবই ঢোকাব।

মামার পেটে চিড়িয়াখানা বানাবে? সবাইকে কুলুবে তো?

হাঁদারাম। যা মামাকে গিয়ে বল, ডেকেছি। আরও সিটিং লাগবে, আরও ওষুধ লাগবে।

বাঁটুল বলল, আর সময় কত লাগবে?

জানি না। আস্ত একটা বিড়াল, উইথ গোঁফ। হজম কী সোজা! তবু হলো। কুকুরও হবে। হজম না, বেটা লেজ তুলে কুঁই কুঁই ছুট লাগাবে। ভাবিস না।

তা ছুটল। একটা গরুকে দেখে। মামার গোমাতা প্রীতির আধিক্যে। মামার গরুর প্রতি ভক্তিতে। মামা বাঁটুলকেই বলল, বুঝলি, গরুর প্রতি লোমে দেবতা। কত বড় উপকারী জন্তু! কারও সঙ্গে তুলনাই হয় না। আহা, গরুকে বাঁচা বাঁটুল। গরুকে বাঁচা।

গরু থেকে ঘোড়া। ঘোড়ার গল্প আর সুখ্যাতি। রানা প্রতাপের চৈতক থেকে শিবাজীর ঘোড়া। শ্যামবাজারে ঘোড়ার পিঠে নেতাজী।

চিকিৎসা বটে চণ্ডী ডাক্তারের। সব প্রাণীর ঝড় সামলে কিংবা ঝড়ে হাস্তসাস্ত হয়ে মামা আগের মতো। মামা বোঝে পৃথিবীতে বহু প্রাণী। সবাইকে দেখতে হয়। আর সবাইকে দেখলে নিজেকে দেখা হয় না। যদিও নিজেই একটা প্রাণী।

শোভা বলল, তোর ডাক্তারটা কি ভাল রে বাঁটুল! কেমন চিকিচ্ছে করল!

বাঁটুল বলল, ভাগ্যিস চণ্ডী ডাক্তার ছিল। কিন্তু মামী ডাক্তারের একেবারে রোগী হয় না।

আহা, বেচারা। শোভা আফসোস করে, লোকের যে কবে জ্ঞানগম্যি হবে! বুঝলি বাঁটুল, যত নষ্টের গোড়া ওই ইলিশ মাছ।

পরেশ চুপ করে ছিল, ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। ইলিশের কি দোষ! দোষ বিড়ালের। না, না, বিড়াল কি দোষী হয়! বেচারা ক্ষিদের জ্বালায়...তবে ওর জানা উচিত ছিল আমিও একটা প্রাণী।

পরেশ বকবক করে।

ছবি: অরূপ গাঙ্গুলী

অদৃশ্য আততায়ী

রেবন্ত গোস্বামী

ভোরবেলায় একটা হৈচৈ কানে আসতেই ডক্টর কৌস্তুভ সান্যালের ঘুম ভেঙে গেল। ল্যাবরেটরি থেকে আসতে কাল একটু বেশিই রাত্তির হয়েছিল। ঘরের বাইরে আসতে তাঁর পরিচারক তথা পরিচালক অর্জুন খবরটা দিল, এবার আমাদের বাড়ির সামনেই মেরেছে, দাদাবাবু। একসঙ্গে দুটো—একটা বুড়ো আর একটা বাচ্চা।

ডক্টর সান্যাল বুঝলেন, আবার দু'জন নিদ্রিত ফুটপাথবাসী বলি হলো সেই তথাকথিত গ্যাসম্যানের হাতে। এতদিন ডালহৌসি স্কয়ার, গড়িয়াহাট মোড়, শ্যামবাজার মোড় এইসব ব্যস্ত জায়গাগুলোতেই ঘটনাগুলো ঘটছিল। এবার তাঁর রমেশ মিত্র রোডের বাড়ির সামনেই। এই নিয়ে তাহলে প্রায় এক ডজন হতে চলল! গত কয়েক দিন ধরে, বলতে গেলে, কয়েক রাত ধরে এই ডিসেম্বরের শীতের রাতে ফুটপাথে শুয়ে থাকা গরিব লোকদের কে বা কারা একে একে বিষাক্ত গ্যাস শুঁকিয়ে মেরে ফেলছে। পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেনি। খবরের কাগজ তো পুলিশ আর সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। লিখেছে, অনেক কাল আগে এইভাবেই কোনো দুষ্কৃতি কলকাতার নানান জায়গায় ঘুমন্ত ফুটপাথবাসীদের মাথা পাথর দিয়ে পিষে হত্যা করত রাতের অন্ধকারে। কী তার বা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, জানাই গেল না। কাউকে চিহ্নিত করতে সেবারও ব্যর্থ হয়েছিল পুলিশ।

আগের সেই অদৃশ্য ঘাতকের নাম লোকে দিয়েছিল স্টোনম্যান, মানে প্রস্তরমানব।

রাস্তায় নামতেই দেখলেন, পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে এলেন তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র সুগত দাশগুপ্ত। বললেন, নমস্কার স্যর। এবারেও একইভাবে মেরেছে। দু'জনেরই মুখ দেখুন, সেই নীলচে আভা। ময়না তদন্তেও মনে হয় সেই মিশ্র গ্যাসের প্রয়োগ ধরা পড়বে।

বৃদ্ধ লোকটির মৃত্যু অতটা ব্যথিত না করলেও বছর পাঁচেকের শিশুটির মৃত্যু তাঁর বুকে মোচড় মারল। স্টোনম্যানের চাইতেও হৃদয়হীন এই গ্যাসম্যান। স্টোনম্যান কোনো শিশুকে হত্যা করেনি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সকাল সকাল তিনি তাঁর গবেষণাগারের উদ্দেশে রওনা হলেন। তিনি আর ডক্টর নিরুপ কুণ্ডু মিলে যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করার শেষ পর্যায়ে, তার নাম গ্যাস কমপোনেন্ট রেকগনাইজার বা সংক্ষেপে জি-সি-আর। এই কমপিউটারাইজড যন্ত্র প্রায় সহস্র রকম মৌল ও যৌগ গ্যাসের সংস্পর্শে এলেই তার পর্দায় কেবলমাত্র সেই গ্যাসগুলোর ফরমুলাই ডিসপ্লে করবে না, পারিপার্শ্বিক মিশ্রিত গ্যাসে তাদের শতাংশের অনুপাতও ফরমুলাগুলির পাশে দেখাবে। নিম্নতম এক হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ .০০১ শতাংশ পর্যন্ত এই যন্ত্রে ধরা পড়বে। ডক্টর সান্যাল একজন ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞানী। ডক্টর নিরুপ কুণ্ডু রসায়নবিদ। বাতাসে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সিংহভাগ শতাংশ তো আছেই। তাছাড়া রসায়নাগারে ক্লোরিন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি মৌল গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, এমন কি, জলীয় বাষ্প পর্যন্ত প্রায় এক হাজার গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা আজ সফল। ডক্টর কুণ্ডু অন্যভাবে পারিপার্শ্বের গ্যাসের আয়তন মেপে দেখেছেন যে কমপিউটার তাঁর থেকেও অনেক নিখুঁতভাবে পরিমাপ করছে সেই গ্যাসগুলির। এর জন্য মাঝে মাঝেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা, বিশেষত ডক্টর সান্যাল। আগ বাড়িয়ে নিজেই কখনো জলের মধ্যে ক্যালসিয়াম কারবাইড ফেলছেন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে মার্বেল পাথর ফেলছেন, নাইট্রিক অ্যাসিডে...
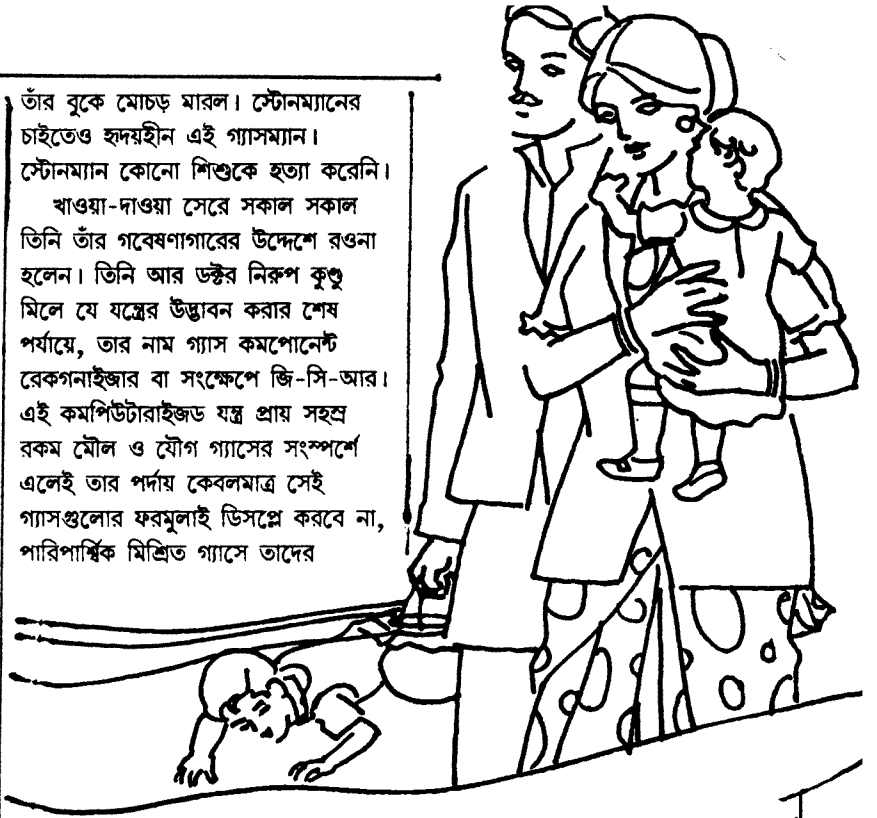
ডক্টর কুণ্ডু তাড়াতাড়ি হাত চেপে ধরেন কখনো। এখনই এমন ভুল করতে যাচ্ছিলেন, যাতে দু'জনেরই গবেষণার ইতি হয়ে যেত। মারাত্মক বিষাক্ত সায়ানোজেন গ্যাসও এর মধ্যে উৎপন্ন হতো। এমনিতেই তো ডক্টর সান্যাল বেশ কিছুদিন ধরে অ্যাজমাটিক ব্রংকাইটিসে ভুগছেন।

আগামী ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনকেই তাঁরা ঠিক করেছেন, যেদিন কলকাতার বিজ্ঞান নগরীতে বিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির সামনে এই যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রদর্শন করবেন।

এই মর্মে কাগজে ও বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমে বিবৃতি তাঁরা দিয়েছেন। অনেক কাজেই এই যন্ত্র ব্যবহার হতে পারে। খনিগর্ভে বা অন্য কোনো গহ্বরে ঢোকার আগে এই যন্ত্র পাঠিয়ে তার বাতাবরণের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাবে। এমন কি, তাঁরা এও আশা করেন, ভবিষ্যতে দূরদূরান্তরের গ্রহে এই যন্ত্র পাঠিয়ে সেখানকার গ্যাসীয় আবহাওয়ামণ্ডল সম্পর্কে আরো সঠিক জ্ঞান মানুষ পাবে।

গতকালের মতো আজও রাত হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর কুণ্ডু হেসে বললেন, আপনাকে নেশায় পেয়ে গেল দেখছি, ডক্টর সান্যাল। সবরকমভাবেই যাচাই করা হয়েছে। যন্ত্রটা যে নিখুঁত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জি-সি-আর সফল। থাক না আজকের মতো। আপনি তো অনেকগুলি মডেল বানিয়ে ফেলেছেন। সব কটি একই রীডিং দিচ্ছে। এবার পাততাড়ি গোটানো যাক।

ডক্টর সান্যাল বললেন, হ্যাঁ, তাই ভালো। তবে একটা পোর্টেবল জি-সি-আর আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। আরো দু'চারটে পারিবারিক মিশ্রগ্যাসের কাছে ধরে দেখব। যেমন চায়ের ধোঁয়া, অর্জুনের বিড়ির ধোঁয়া। পরে আপনি মিলিয়ে দেখবেন যন্ত্রের নাসিকাশক্তি সঠিক কিনা।

ডক্টর কুণ্ডু মনে মনে বললেন, পাগল! প্রকাশ্যে বললেন, আপনার সালবুটামল ইনহেলারই তো যন্ত্রটা বেশি করে শুঁকছে, ডক্টর সান্যাল। সত্যিই, হাঁপানির জন্য ডক্টর কৌস্তুভ সান্যালকে ঘনঘনই এই শ্বাসনালী-প্রসারক গ্যাস নিতে হয়। তবে তিনি ভাবলেন, ডক্টর কুণ্ডুও তো এই গ্যাসমণ্ডলের মধ্যে তেমন সুস্থ নেই। হয়তো তাঁকেও নিতে হবে ভবিষ্যতে। তবে দেখা যাচ্ছে, আরো ভালো হাঁপানির ওষুধ বেরিয়েছে। আহা, আসুক।

ডক্টর নিরুপ কুণ্ডু নিজের গাড়িতে তাঁর দক্ষিণ শহরতলির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। ডক্টর সান্যাল একটা ট্যাক্সি ধরে নিলেন। ব্রিফকেসের আকারের পোর্টেবল জি-সি-আর হাতে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর ভবানীপুরের বাড়ির উদ্দেশে। হাজরা রোডে এসে তিনি ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন। কিছু ওষুধ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভুলেই গিয়েছিলেন কেনার কথা। রাতদিনের খোলা ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিলেন ওষুধ। তারপর একটা গলি দিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে এগোলেন।

শীতের রাতে বড় রাস্তায় কিছু লোকজন আর গাড়ির আনাগোনা থাকলেও এই গলি নির্জন। দু'একটা পান-সিগারেটের দোকান খোলা আছে। একটু দূরেই দেখলেন, তাঁর ভবানীপুরবাসী এক প্রাক্তন ছাত্র শুভব্রত তার স্ত্রী ও দুই ছোট্ট ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। তিনি আর তাকে ডাকলেন না। হয়তো নিমন্ত্রণ বা কোনো উপলক্ষে গিয়েছিল। বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। তিনি দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন।

পরের দিন সকালে সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই খবরটা দেখে ডক্টর কৌস্তুভ সান্যাল এতটাই চমকে উঠলেন যে, তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে খানখান হয়ে ভেঙে গেল। অর্জুন ছুটে এল। কিন্তু তার কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পড়ে চললেন খবরটা। দীর্ঘ শিরোনাম দিয়েছে—পথচারী শিশুও গ্যাসম্যানের বলি! চার বছরের ঋদ্ধিমান বসু তার বাবা-মার সঙ্গে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বাবার হাতে ছিল আত্মীয়বাড়ি থেকে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া মিষ্টান্নের প্যাকেট। মার কোলে ছিল তার বছর দেড়েকের ছোট বোন। কিছুক্ষণের জন্য শিশুটি তার বাবার হাতছাড়া হয়ে পেছনে হাঁটছিল। নির্জন পথের আধো অন্ধকারে হঠাৎ সে রাস্তায় পড়ে গিয়ে গোঙাতে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে মারা যায়। ময়না তদন্তের আগে কিছু বলা সম্ভব না হলেও চিকিৎসকের সন্দেহ কোনো বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। 'খবরাখবর'-এর সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পথের পাশের এক পানের দোকানদারের বিবৃতি অনুযায়ী ঘটনার ঠিক আগেই শিশুটির কাছ দিয়ে একজন লম্বা ব্যক্তিকে দ্রুত চলে যেতে দেখা যায়। অস্পষ্ট আলোয় ভালোভাবে দেখা না গেলেও লোকটির পরনে সাদাটে রঙের স্যুট, হাতে নীল রঙের ব্রিফকেস আর মাথায় লাল উলের বাঁদরটুপি ছিল। নির্জন গলি এবং সম্ভাব্য ক্রেতা মনে করেই দোকানদার তাকে লক্ষ্য করেছিলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে প্রকাশ।

ডক্টর সান্যাল অবাক হয়ে ভাবেন, কয়েক ঘণ্টা আগে যে শিশুটিকে বাবা-মার সঙ্গে হেঁটে যেতে দেখেছেন, সে এখন খবর! কী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে এখনকার সংবাদমাধ্যম! রাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, যখন তিনি অনেকদিন পর ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন।

তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন, পানের দোকানওয়ালা যার বর্ণনা দিয়েছে, তিনি নিজেই সেই ব্যক্তি। জি-সি-আর-এর কেসটা নীল রঙেরই। তাছাড়া স্যুট, বাঁদরটুপি সবই মিলে যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, পুলিশের কাছে গিয়ে কি সব বলে দেবেন? মুহূর্তে এই ভাবনা ভুলে গিয়ে তিনি একটু পরেই বেরিয়ে পড়লেন শুভব্রতর বাড়ির উদ্দেশে। সেখানেই তিনি যা বলার বলবেন। তাছাড়া, তাঁর মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে, সেটাও যাচাই করা দরকার অবিলম্বে।

সেদিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার দিন ছিল না। সারাটা দিন আনমনাভাবে কাটিয়ে রাত্তিরে কর্তব্য ঠিক করে নিলেন। মাঝ রাত্তির পার করে তিনি চুপচাপ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন। অর্জুনকে জাগালেন না। তাঁর বাড়ির লাগোয়া গলিটার মুখে অনেকে শুয়ে আছে। এখানেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল দু'জন অসমবয়সী মানুষকে। ডক্টর সান্যালের হাতে একটি ঘনাকার ছোট যন্ত্র। নীল ঢাকনাটা বাড়িতেই রেখে এসেছেন। তিনি যন্ত্রটা নিয়ে ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে এগোলেন।

আবছা আলোয় আর ধোঁয়াশায় ডক্টর সান্যাল দেখতে পাননি যে, বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুদূর পর পর এক-একজন লোক জেগে বসে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। তাঁকে এভাবে এগোতে দেখে তাদের একজন চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সবাই তাঁর কাছে ছুটে এল। ঘুমন্ত মানুষগুলোও জেগে উঠল। বিছানার পাশে লুকিয়ে রাখা লাঠিগুলো বের করে

একসঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কৌস্তুভ সান্যালের ওপর।

এমন সময় পুলিশের একটা গাড়ি এসে পড়াতে গুরুতরভাবে আহত হলেও ঘটনাস্থলেই মারা পড়লেন না ডক্টর সান্যাল। গাড়ি থেকে পুলিশ অফিসার বেরিয়ে এসে তাঁর মুখের ওপর টর্চ ফেললেন। তারপর বিস্ময়ে বলে উঠলেন, একী স্যার, আপনি!

ডক্টর সান্যাল জড়িতস্বরে বললেন, আমি বেশিক্ষণ বাঁচব না, সুগত। তুমি আমার জবানবন্দি নেওয়ার ব্যবস্থা করো যত তাড়াতাড়ি পারো।

পরদিন রেডিও আর টেলিভিশনের খবরে প্রথমেই ঘোষিত হলো প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর কৌস্তুভ সান্যালের মৃত্যুসংবাদ। যখন নার্সিংহোম ঘিরে ডক্টর সান্যালের অগণিত আত্মীয়স্বজন, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ও গুণমুগ্ধেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে, সেই সময় লালবাজারে কমিশনারের ঘরে বেজে চলেছে একটি টেপরেকর্ড। স্তব্ধ হয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন কমিশনার ও কয়েকজন পুলিশ অফিসার, যার মধ্যে রয়েছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ডক্টর সান্যালের প্রাক্তন ছাত্র সুগত দাশগুপ্তও।

রেকর্ডে মৃত্যুপথযাত্রী বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর বেজে চলেছে—হ্যাঁ সুগত। ফুটপাথের লোকগুলো ঠিকই ধরেছিল। আমিই সেই হত্যাকারী। শুধু আমি নই, আমি তুমি সবাই। মাত্রাবিহীন গাড়ি-নিঃসৃত ধোঁয়া, বিলীয়মান সবুজ আর অট্টালিকার বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ চলাচলহীন বায়ু কলকাতার বাতাসকে মাত্রাতিরিক্তভাবে দূষিত করছে। বিশেষ করে শীতকালে, সারাদিনের জমা এই বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলের চাইতে ভারী হওয়াতে ভূমিস্তরের ওপর জমতে থাকে। মধ্যরাত্রে সেই কার্বন মনোক্সাইড, সীসে, গন্ধক আর নাইট্রোজেন অক্সাইডের মিশ্র বিষাক্ত গ্যাস প্রায় আধ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়, আর তিন-চার ঘণ্টা থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারপাশে। গঙ্গার কাছাকাছি জায়গায় সেই ছড়িয়ে পড়াটা তাড়াতাড়ি হয়। ওরা আমাকে আক্রমণ করার আগেই আমার যন্ত্রের স্ক্রিনে যেসব গ্যাসের সংকেত দেখেছি, তার যে কোনো একটি বেশিক্ষণ ফুসফুসে প্রবেশ করলেই একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। তাই রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় ছোট্ট শিশুটি থেকে নিদ্রিত ফুটপাথবাসীকে আক্রমণ করেছে সেই অদৃশ্য ঘাতক। কিন্তু মায়ের কোলের শিশুটি বেশি উচ্চতায় থাকায় সে বেঁচে গেল। কুকুর-বেড়ালরা ছুটে নিরাপদ জায়গায় যেতে পারে বলে বেঁচে যাচ্ছে। তাদের ইন্দ্রিয় বেশি প্রখর। অবশ্য ওপরের বাতাসও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। দূষিত বাতাস শ্বাসযন্ত্র আক্রমণ করছে প্রথমে। তারপর হৃদয়, স্নায়ু, এমনকি, মস্তিষ্কও। দেহের কোষকেও আক্রমণ করছে স্লো পয়জনের মতো। শারীরিক ও মানসিক দুই দিকেই অসুস্থ করে দিচ্ছে নগরবাসীকে। স্টোনম্যানের মতো এই গ্যাসম্যান কিন্তু আমাদের অপরিচিত নয়। সবার মধ্যেই সে লুকিয়ে আছে। পারবে তাকে শাস্তি দিতে? পার্ক আর ফাঁকা জায়গা দখল করে বাড়ি করা হচ্ছে। পারবে উল্টোদিকে ঘুরতে? বাড়ি ভেঙে পার্ক, পুকুর আর বাগান করতে? জানি, পারবে না। স্টোনম্যানের চাইতে অনেক ক্ষমতাবান এই গ্যাসম্যান। কারণ, সে যে আমাদের মধ্যে ঢুকে বসে আছে! আমাকেও অজান্তে আক্রমণ করেছে বেশ কিছুকাল আগেই। তবে এই সুখ নিয়ে মরছি যে, সে আমাকে পুরোপুরি মারার আগেই আমি মানুষের হাতে মরছি। ফুটপাথবাসীরা গ্যাসম্যানের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করল...

তারপর কিছু জড়ানো কথার পরেই ডক্টর সান্যালের কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল। কমিশনার বোতাম টিপে রেকর্ডার বন্ধ করলেন। তারপর সবাইয়ের মুখের দিকে চাইলেন।

গ্যাসম্যান শনাক্ত হয়েছে। এখন কে তাকে গ্রেফতার করবে? এই প্রশ্নগুলো সাগরের ঢেউ-এর মতো রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ধ্বনিত হতে থাকবে। কিন্তু কে দেবে উত্তর!

ছবি: মদন সরকার

পালকি চলে ধাঁকুড় ধাঁই

জ্যোতিভূষণ চাকী

আইকুঁড়
বাঁইকুড়
ধাই কুঁড় ধাঁই,
নিয়ে চল না পালকি-ভাই।

কে যাবে গো কে যাবে?
বৌ যাবে আর বর যাবে।

পালকি করে হাঁচড়পাঁচড়—
আমার তো ভাই ভাঙা পাঁজর।
পড়ে আছি ছাতিমতলা,
আমার তো আর নেই কো চলা।

খুটখাট খুটখাট খুটখাট,
ফিটফাট ফিটফাট ফিটফাট।
সরিয়ে দিলাম এবার চলো,
বেহারা কই? কে বইবে বলো।

হুপ্ হাফ হুফ হাফ হুপ হাফ্
চার বাঁদর—ধুপধাপ ধুপধাপ ধুপধাপ।
ঘাড় পাতে চার বাঁদর-ভাই।
পালকি চলে ধাঁকুড় ধাঁই।

ছবি: সুফি

দু'কান কাটা দিবস

অগ্নিমিত্র

ডিহি ডঙ্কাগড় রাজ্যে সেদিন দু'কান কাটা দিবস।

রাজ্যের সবাই এই বিশেষ দিনে কান দু'টি কেটে ফেলে। আবার একটু একটু করে কান গজাতে থাকে। পরের বছর এই বিশেষ দিনটি পর্যন্ত কান যতটুকুই গজিয়ে উঠুক, এই দিনে তা আবার কেটে ফেলতে হয়। এই হলো নিয়ম। কান ঠিকমতো কাটার জন্য বিশেষ একদল রাজকর্মচারী সারা বছর ধরে ছুরি-কাঁচি শানায়। তাদের বলে কানঠাস। তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে অস্থায়ী কানকাটা শিবির তৈরি করে বসে যায়। সকাল থেকেই লোক আসছে আর কান কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কান জমা হয় ক্যানেস্তারায়। তারপর সেগুলো ঝকঝকে মোড়কে করে চালান যায় বিদেশে। ডিহি ডঙ্কাগড় রাজ্যের রাজার খাজাঞ্চিখানায় কোটি কোটি টাকা এসে জমা হয়।

এই দু'কান কাটার একটা ইতিহাস আছে।

অনেক বছর আগে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন শ্রীল শ্রীযুক্ত কটকটি কানকো বাহাদুর। প্রতি বছর রাজা কানকো খুব ঘটা করে দেবতা টুডুং টুডুং এবং দেবী ভুজুং ভাজুংকে পুজো দিতেন। এক বছর রাজার একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়ে গেল। পুজোর ভোগে আর সবই দিয়েছেন, শুধু আমড়ার টক দেননি। ব্যস, দেবতা টুডুং টুডুং তো রেগেই আগুন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল, নাক-কান দিয়ে প্রচণ্ড গরম লাভাস্রোত। কানকো রাজাকে তিনি অভিশাপ দিলেন, তোর রাজ্যে এখন থেকে আর অন্য কোনো গাছ হবে না, হবে শুধু আমড়া গাছ। কিন্তু সে-গাছে একটাও আমড়া ফলবে না। এই তোর দু'কান কেটে নিলাম। এখন মরগে যা—

কানকো রাজা তো কেঁদেই আকুল। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর জামার বুকপকেটে হাঁটুজল হয়ে গেল। তা দেখে দেবী ভুজুং ভাজুং-এর মন গলে গেল। হাজার হোক, দেবী তো মায়ের জাতি। তিনি নিজের ফুলিয়া-টাঙ্গাইল মসলিনের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কী আর করবি বাবা? দেবতার অভিশাপ তো ব্যর্থ হয় না? আমি ওর সঙ্গে একটা কারেকশন স্লিপ জুড়ে দিচ্ছি, তাতে তোর সুরাহা হবে। তোর নাতির নাতি তস্য নাতি তস্য তস্য নাতি, ডট ডট...তস্য নাতির নাতির নাতির নাতির নাতি নেপোকেষ্ট যখন ডিহি ডঙ্কাগড়ের রাজা হবে, তারই রাজত্বকালে দেব টুডুং টুডুং-এর আমড়া গাছগুলোতে হঠাৎ এক বছর আমড়ায় আমড়ায় ডাল ঝুলে পড়বে। সেই বছরই আমড়ার টক দিয়ে ভোগ দেবে দেব টুডুং টুডুংকে। সাবধান, ওই এক বছরই মাত্র আমড়া-বর্ষ! তার পরের বছর থেকে আমড়া গাছে গাছে ল্যাংড়া আম ফলতে থাকবে। ভোগ দেওয়ার পরই অভিশাপ কেটে যাওয়ার জন্যেই ল্যাংড়া। তাছাড়া, রাজা-প্রজা সবাইকে আর দু'কান কাটতে হবে না। তখন ল্যাংড়া আর ল্যাংড়া! বারোমাসী ল্যাংড়া! প্রজাদের খেতে দিয়ে নষ্ট না করে নেপোকেষ্ট যেন সেই গাদা গাদা ল্যাংড়া বিদেশে চালান দেয়। ফরেন এক্সচেঞ্জে তোর রাজ্য একেবারে ছয় ছক ছত্রিশলাপ হয়ে যাবে। তখন আর কী? সিংহাসনে বসে কান চুলকোবি আর ল্যাংড়া চুষবি!

কটকটি কানকো আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। তখন আমি কোথায় মা? আমি তো মরে ভূত! সব মজা লুটবে সেই হতচ্ছাড়া নেপো?

দেবী ভুজুং ভাজুং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কী করবি বাবা? যার যেমন কপাল! চোখের জল মুছে নে—

রাজার কান্না তখনো থামেনি। দেবীর আদেশে চোখের জল মুছে নিতেই হলো। আংরাখার হাতা দিয়ে নাকের জল মুছতে মুছতে ফোঁৎ ফোঁৎ করে বললেন, চোখের চেয়ে নাকে বেশি জল আসছে মা। সবই অগত্যা মেনে নিচ্ছি। শুধু একটি প্রার্থনা মঞ্জুর করো। দু'কান কাটা রাজা হয়ে সিংহাসনে বসতে আমার লজ্জা করে না বুঝি? তুমি অনুমতি দাও মা, আমার প্রজাদেরও আমি যেন দু'কান কাটার হুকুম দিতে পারি!

দেবী ভুজুং ভাজুং বললেন, অফকোর্স! রাজার কান থাকবে না আর প্রজার কান থাকবে, তা কি হয়?

সেই থেকে প্রতি বছর দু'কান কাটা দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

দেবী ভুজুং ভাজুং যাঁর কথা বলেছিলেন, সেই নেপোকেষ্ট এখন ডিহি ডঙ্কাগড়ের রাজা। তাঁর মন্ত্রীর নাম ধামাকেষ্ট। রাজা নেপোকেষ্টর উনষাট বছর হয়ে গেল কিন্তু সেই হঠাৎ এক বছর গাছে গাছে আমড়ায় আমড়ায় ডাল ঝুলে পড়ার আমড়া-বর্ষ এখনো এলো না! আমড়া-বর্ষ এলেই আমড়ার টক দিয়ে দেবতা টুডুং টুডুংকে ভোগ দিলেই অভিশাপ থেকে মুক্তি! তারপরে তো ল্যাংড়া? সবাই ভাবে, কপালে কবে আছে কে জানে!

দুই ভাইবোন টাবলু আর টিকলি এক টুনটুনি আর নাককাটা রাজার গল্প পড়তে পড়তে হেসে কুটিপাটি হয়ে কাউকে কিছু না বলে সেই নাককাটা রাজাকে দেখার জন্যে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল। তারা হাঁটছে আর হাঁটছে। কিন্তু কোথায় নাককাটা রাজার রাজ্য? একটা নতুন দেশ তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কোন দেশ তা বুঝতে পারছে না। সব দিকে একই রূপের এক রকমের গাছ। গাছে পাখির কিচিরমিচির নেই, একটা কুকুর-বেড়ালও দেখা যাচ্ছে না। সামনের রাস্তায় দলে দলে লোক এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিকে হন হন করে হেঁটে চলেছে।

টাবলু ফিসফিস করে টিকলিকে বললে, কী ব্যাপার বল তো? রাস্তার দু'পাশ ফাঁকা অথচ সবাই মধ্যিখান দিয়ে হাঁটছে, ওরা কি পাগল-টাগল নাকি?

টাবলু যত ফিসফিস করেই বলুক, ওদের ভেতর কয়েকজন তা শুনতে পেয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিজেদের ভেতর কী যেন বলাবলি করে রাস্তা থেকে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। সামনের আধবুড়ো লোকটি বললে, তোমরা কারা? এ-রাজ্যির বলে তো মনে হচ্ছে না!

টিকলি বললে, ঠিকই ধরেছ। আমাদের দেশ অন্য জায়গায়। কিন্তু তোমরা অমন হন হন করে হেঁটে কোথায় যাচ্ছ? রাস্তার মধ্যিখান দিয়েই বা হাঁটছো কেন?

লোকটি বললে, আজ আমাদের দু'কান কাটা দিবস। দু'কান কাটতে হবে তাই কানঠাসের কাছে যাচ্ছি। আমরা দু'কান কাটা বলে রাস্তার মধ্যিখান দিয়েই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁটি।

টিকলি হেসে গড়িয়ে পড়ল। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁটা? টাবলু বললে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে তো লোকে হাঁচে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে আবার হাঁটে নাকি?

লোকটি বললে, হ্যাঁ, হাঁটে। আমরা হাঁটি। দৌড়তে হলে ঢক ঢক করে দৌড়ই, ঠাস ঠাস করে কাঁদি, সাঁই সাঁই করে খাই, ফটাস ফটাস করে তাকাই—

টিকলি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললে, হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না। পরীক্ষার খাতায় লিখলে একদম গোল্লা। আসলে হবে হন হন করে হাঁটি, বাঁই বাঁই করে দৌড়ই, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদি, হাপুস হুপুস করে খাই আর ফটাস ফটাস করে চটি পায়ে চলি।

যে-ক'জন এগিয়ে এসেছে তাদের চারজন পুরুষ, একজন মেয়ে। টিকলির সেজো পিসির মতোই বয়স হয়তো হবে। সে এগিয়ে এসে বললে, শোনো বাপু, আমাদের এ হলো দু'কান কাটার দেশ, আমাদের নিয়মেই আমরা চলি। তোমাদের দেশের নিয়ম এখানে চালাতে যেও না। এই দ্যাখো, আমার নাম কুড়ানি। আমি সেই কোন ছেলেবেলা থেকে শুধু কুড়িয়েই চলেছি।

টাবলু জিজ্ঞেস করলে, কী কুড়োও?

কেন, আমড়া পাতা। আমাদের দেশে তো আর কোনো গাছ নেই, কেবলই আমড়া গাছ।

কি করো? টিকলি জিজ্ঞেস করলে।

কী আবার করবো, খাই। আমড়া পাতার সুক্তো, লাউঘণ্ট, আলুপোস্ত, মাছের ঝাল, মাছের কালিয়া, দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা—

কি আবোল-তাবোল বকছো! আমড়া পাতার লাউঘণ্ট, আলুপোস্ত, মাছের ঝাল, মাছের কালিয়া, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা—এসব হয়?

ভেবে নিতে হয়। আমরা তো ভেবে নিয়ে রাঁধি, ভেবে নিয়েই খাই। আমড়া পাতা খেয়েই তো আমরা এতকাল ড্যাব ড্যাব করে বেঁচে আছি।

টিকলি একটু রেগে গিয়ে বললে, আবার ড্যাব ড্যাব করে? ড্যাব ড্যাব

ইলিশ কিনছি না

পবিত্র সরকার

দাম কত হে ইলিশ মাছের?
তিনশো টাকা এক কেজি!
সর্ষেফুলের ঢেউ দেখি যে
চোখের সামনে নাচছে জি।

আর খাব না ইলিশ তবে,
তেলাপিয়ার ল্যাজ খাব,
ইলিশ মাছের নাম করো তো,
তোমায় আমি ভ্যাংচাব।

দামটা শুনেই চিত হয়েছি,
চোখ হয়েছে চড়কগাছ,
পাশাপাশি পড়শিরা সব,
তোমরা কেনো ইলিশ মাছ।

মাছ নিয়ে যাও রান্নাঘরে,
ভাজো কিংবা ঝোল চড়াও,
না-হয় লাগাও ঝাল-পাতুরি,
কচুর শাকের ঘণ্ট খাও।

তোমাদের ওই রান্নাঘরের
গন্ধ দিয়ে ভাত মেখে—
আমরা খাব প্রচুর, দাদা,
সেসব দেখতে আসবে কে?

ছবি : সুফি

করে তো তাকায়, কেউ বাঁচে?

প্রথম এগিয়ে এসে যে কথা বলেছিল সেই আধবুড়ো লোকটা বললে, দেখতেই তো পাচ্ছ, আমরা বেঁচে আছি। ওই দ্যাখো, এতক্ষণ কথা বলছি অথচ তোমাদের নামই জানা হয়নি। কী নাম তোমাদের?

টাবলু বললে, আমার নাম টাবলু, ওর নাম টিকলি।

লোকটার পাশে যে মাঝবয়সী লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে একেবারে চোখ বুজে ভাবের আবেগে বললে, আহা, কি সুন্দর ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাং নাম!

টাবলু ফোঁস করে উঠল, ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাং নাম মানে?

সে লোকটা বললে, ওর মানে, অপূর্ব সুন্দর! এই যে আমাদের নাম দ্যাখো। দাদার নাম হাবা, আমার নাম গবা আর কুড়ুনিদির পাশে যারা, ওদের নাম ভ্যাবা আর চ্যাকা। ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাং নয়?

টাবলু গম্ভীর মুখে বললে, হ্যাঁ, ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাংই বটে! তোমাদের যা মগজ দেখছি!

ভ্যাবা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ও মা, মগজ কোথায়? মুণ্ডুটাকে ভারী করে রাখে বলে আমাদের তো ছেলেবেলাতেই মুণ্ডু ছ্যাঁদা করে মগজটা বের করে নেওয়া হয়। আমাদের মুণ্ডু কি হালকা! তোমাদের মুণ্ডুতে মগজ আছে? মুণ্ডুটা ভারী?

টাবলু কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, কি জানি আছে কিনা! ওজন করে তো দেখিনি!

টিকলিও ঘাবড়ে গেছে। মনে জোর আনার জন্যে সে তাড়াতাড়ি টাবলুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন দাদা? মগজ মানে তো ব্রেইন? তোর-আমার নিশ্চয়ই আছে। নইলে পরীক্ষায় অঙ্কে আমরা ফুল মার্কস পাই?

হাবা গম্ভীর মুখে বললে, তোমরা পাবে পাও। আমাদের কিন্তু ঢপ ঢপ করে লজ্জা পায়। চিন্তা করে দ্যাখো, এই মুণ্ডুটার ওপর কত ঝক্কি? চোখ, কান, নাক, মুখ সবগুলোকে টুডুং টুডুং দেব এই মুণ্ডুটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এত বড়ো দেহটার ডগায় ছোট্ট এই মুণ্ডুটার ওপর চারদিক থেকে চ্যাটাং চ্যাটাং করে এতগুলোকে চাপিয়ে দেওয়া কি উচিত? তার ওপর আবার মুণ্ডুর ভেতর দড়াম করে একটা মগজ। ছি!

গবা, ভ্যাবা, চ্যাকা আর কুড়ুনি বললে, ছি ছি ছি!

হাবা বললে, তোমরা শুনলেই তো, মুণ্ডুটাকে হালকা করার জন্যে আমাদের মগজ বের করে দেওয়া হয়। আর এই কান? যাকে কান বলে তা তো কানের মলাট।

কানের মলাট? অবাক হয়ে বললে টিকলি।

কুড়ানি বললে, তা ছাড়া আর কি বাপু? ফুটো দুটো আসলে কান। তার ভেতর দিয়েই তো দিব্যি ঠাস ঠাস করে শুনতে পাচ্ছি। তাহলে আর মলাটে দরকার কি? মলাট থাকলে বরং শীতকালে ঝমঝমে হাওয়া ওতে ঠেকে ঢং ঢং করে ফুটোর ভেতর ঢুকে সর্দি ধরিয়ে দেয়।

কুড়ানির কথার খেই ধরে চ্যাকা বললে, আর নাক? ফুটো দুটো থাকলেই তো গদাম গদাম করে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। সামনে অতখানি নকশার দরকার কি?

ভ্যাবা বললে, ঠিক! সাড়ে আড়াই কথার এক কথা! কিন্তু যাই বলিস চ্যাকা, হাত আর পায়ের কিন্তু খুবই দরকার। সেইজন্যে বুদ্ধি করে টুডুং টুডুং ও-দুটোকে মুণ্ডুর সঙ্গে জুড়ে দেননি।

হঠাৎ সভয়ে চ্যাকা বলে উঠল, অ হাবাদা, সুয্যি যে খটাশ খটাশ করে মাঝগগন পেরিয়ে গেল, কানঠাসের কাছে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে যে নেটফাইন দিতে হবে!

টিকলি বললে, তোমাদের কান তো খাবলা খাবলা করে এখানে একটু, ওখানে একটু উঠেছে। তাও কাটতে হবে?

হাবা বললে, হ্যাঁ হবে। তাই আমাদের নিয়ম। ওরে চল চল, টিপ টিপ করে পদযাত্রায় যোগ দিতে হবে, আর দেরি নয়—

সবাই রওনা হলো। টিকলির একটা হাত ধরে কুড়ানি বললে, তুমিও ঝন ঝন করে আমাদের সঙ্গে এসো না? কান কাটা দেখবে?

টিকলি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাবো না—

কুড়ানি বললে, আহা, তোমার কান তো আর কাটবে না? দেখলে ক্ষেতি কি?

টিকলি কাঁদতে কাঁদতেই চেঁচাতে লাগল, না কাটুক, তবু আমি যাবো না। বলেই এক ঝটকায় কুড়ানির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে জোরে দু'কান চেপে দে ছুট—

পাশের খাটে জানলার কাছে বসে তখনো মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছিল টাবলু। বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ ও-পাশের খাটে ঘুমন্ত টিকলিকে দু'হাতে দু'কান চেপে 'আমি যাবো না' বলে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে টাবলু তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টিকলিকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললে, কী হয়েছে? কী হয়েছে রে টিকু?

টিকলি বলতে লাগল, কটকটি কানকো, টুডুং টুডুং, ভুজুং ভাজুং, হাবা, গবা, ভ্যাবা, চ্যাকা—

কী আবোল-তাবোল বকছিস?

টিকলির ঘোর তখনো কাটেনি। বললে, আমি একটা ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাং স্বপ্ন দেখেছি রে দাদা।

কী স্বপ্ন? টাবলু জিজ্ঞেস করলে।

ঘ্যাস্তা ঘ্যাচাং। মানে, খুব সুন্দর। বলতে বলতে চোখ মেলে তাকাল টিকলি। টাবলুর দিকে তাকিয়ে আবার ভ্যাঁ করে কেঁদে বললে, দাদা, আমার কান দু'টো আছে তো?

কান আবার যাবে কোথায়? যেমন কান তেমনিই আছে। বললে টাবলু।

টিকলি ভ্যাবাচ্যাকার মতো বললে, দু'কান কাটার দেশ! টুডুং টুডুং, ভুজুং ভাজুং, উঃ! ওরে বাবা, আর স্বপ্ন দেখবো না!

ছবিঃ রাজা চন্দ

সেই যে সেই

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাতনি পুপেকে 'সে' নামে এক অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই অদ্ভুত চরিত্রটি এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে দেশ-কাল-পাত্র না মেনে কলকাতায় এসেছিল। আর এ কালের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার একটুও অসুবিধে হয়নি।

[দৃশ্যটি বনেরও নয়। শহরেরও নয়। একটা আধুনিক বহুতল বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে হুহু হাওয়ায় উড়ছে একটা সেকেলে পতাকা। তার লাঠিতে জড়ানো আছে রজনীগন্ধার মালা আর কৃষ্ণচূড়ার ডাল। তার তলায় বসবার জায়গা।

পুপে মেয়েটির বছর সাত-আট বয়েস। ফুল ছড়াচ্ছে আর 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানটা নেচে নেচে গাইছে।

'সে' ঢুকলো।]

পুপেঃ কে তুমি ভাই, চেনা চেনা মুখ। গল্পে যেন দেখেছি তোমাকে!

সে ঃ সে কি পুপেদিদি, আমায় চিনতে পারছো না? আমি যে তোমাদের 'সে'।

পুপেঃ ওমা—'সে'! এতদিন পরে কোথা থেকে এলে বলো তো?

সে ঃ তোমার দাদামশাই —রবিঠাকুর গো, তিনি তো আমার বিশেষ বন্ধুলোক ছিলেন। কত যুগ দেখাসাক্ষাৎ নেই—মনটা উতলা হলো। তাই ভাবলাম যাই, পুপেদিদি তাঁর জন্মদিনের আসর জমাচ্ছে। তা এত উঁচুতে কেন, ভাই। মাটি তো চোখে পড়ছে না।

পুপেঃ আজকাল অমনি হয়েছে। আমি যাদের আসতে বলেছি, তাদের সবাইকে তুমি চেনো। তবে লিফ্‌ট্‌-এ যারা ওঠে, তারা আমার আসরে আসবে না।

সে ঃ কেন কেন?

পুপেঃ সেসব তুমি বুঝে নাও।

সে ঃ হুঁ! হুঁ!

পুপেঃ তা এতদিন কোথায় ছিলে ভাই, 'সে'? আর চেহারাও বা এমন হয়েছে কেন?

সে ঃ তোমার মনে নেই? সেই যে সেবার আমার চেহারা হারিয়ে ফেলেছিলাম, মনে পড়ছে?

পুপেঃ চেহারা হারিয়ে ফেলেছিলে?

সে ঃ আচ্ছা, ভুলে গেলে তুমি, পুপেদিদি? সেদিনও তোমার ঘরে ছিল ভোজ। সেই যে 'সকাল সকাল নাইতে গেলাম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কষে মুখ মাজছিলাম। মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্ করে পড়লাম জলে। তারপরে কী হলো জানিনে। ওপরে এসেছি—কি নিচে—কি কোথায় আছি জানিনে। পষ্ট দেখলাম আমি নেই।'

পুপেঃ নেই?

সে ঃ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। আমি তো সেই থেকে পাতুখুড়োর দেহে ভর করে আছি।

পুপেঃ আহা, থাক্ থাক্। ঐ সবাই এসে পড়ছে—ঐ যে পাঁচিল টপকে আসছে সব। যারা ছোট তারা পাইপ দিয়ে এসে যাবে। লিফ্‌ট্‌ম্যান তো ওদের লিফ্‌টে চড়তে দেবে না কিনা!

সে ঃ ভাল, ভাল। ওসব জিনিসে না চড়াই ভাল।

[খরগোশ (খুকু), শেয়াল (শিবু), ইঁদুর, প্যাঁচা ইত্যাদি হুড়মুড় করে আসর জমিয়ে তুললো।]

পুপেঃ জানো, 'সে'—শিবুর দুঃখে আমার চোখ ফেটে আজও জল আসে। শিবুরামকে মিথ্যে আশা দিয়ে মানুষরা ওর ল্যাজ কেটে দিল। ছিঃ! তারপর ওর মাসি পর্যন্ত ওকে ল্যাজকাটা-শেয়াল বলে ঘরে নিল না। কত হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া করে বেচারী কাঁদলো।

দেব আজ ল্যাজটা ছিঁড়ে।

সে : (গান) 'ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া।'

শিবু: (হাঁপাতে হাঁপাতে) ও কে, ও? 'সে' নাকি? তা এত বছরেও সেই একইরকম থেকে গেলে, ভায়া?

সে : দেহটা তো ধার-করা! তা, তোমার এমন ল্যাজ গজালো কবে? বা, বা, বা, খাসা ল্যাজ, তোফা ল্যাজ!

পুপে: একটু জল খাবে, শিবু? অত হাঁপাচ্ছ কেন? আবার তোমার কেউ ল্যাজ কাটবে বলেছে?

শিবু: (ল্যাজ আছড়ে) কোন ইডিয়ট আর আমার ল্যাজে হাত দেয়? ঐ যে কলকাতার বড়বাজারে আমার বাঁশবন, ওখানে আমি রাজা! আমি এক হাঁকে আমার বাঁশবনের সব পঞ্চায়েতকে ওঠ্-বস করাতে পারি।

সে : ও পুপেদিদি, এ শিবুরাম তো সে শিবুরামের মতো কথা বলছে না।

পুপে: ও ভাই শিবু, তুমি কি কলকাতার কোনো বাঁশবনের শেয়ালরাজা হয়েছ? খুলে বলো, ভাই। রাজাগজাদের বড় ভয় করি।

শিবু: (হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ) আলবৎ! ক্রমশ আমি দেশের রাজা হব! দেখে নিও। দেখবে আমার কী রকম প্রতাপ?

[শিবু পকেট থেকে টেপ রেকর্ডার বার করে, বহু শেয়ালের গলার 'হুক্কা হুয়া' রব শুনিয়ে দেয়।]

পুপে: থামাও, থামাও শিবু। আমাদের আসর নষ্ট হবে।

শিবু: আর আমার শেয়ালরাজ্যে—ঐ যে তোমার 'সে'—ঐ সব পাগ্‌লা-টাইপের লোকের জায়গা নেই। তবে হ্যাঁ, তুমি আমার দুঃখের দিনে অনেক করেছো। তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।

খুরখুরি: (হঠাৎ উঁচু গলায়) উঃ, একটা বড়মানুষের জন্মদিনের উৎসবে এলাম—তো এ কি কেল্লা!

শিবু: কেল্লা মানে? আমার বিষয়ে পথে আসতে কিছু শুনলে? আমার ল্যাজ নিয়ে কোনো কথা?

খুরখুরি: 'তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত...
স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত?'

প্যাঁচা আর ইঁদুর: (পতাকার ওপর বসে) 'ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,—যখন তখন কর যদ্ভুত তদ্ভুত!'

খুরখুরি: যদ্ভুত তদ্ভুত? মানেটা কী হলো?

পুপে: কী জানি, ভাই। তবে আমার মনে হয়, কিদ্ভুত শব্দের সঙ্গে মিল আছে।

সে : আরে হচ্ছেটা কী, পুপেদিদি! তোমার দাদামশাইয়ের শিশু ভোলানাথ মনে আর দুঃখু দিও না। নাচগান হোক।

['আমরা সবাই রাজা' গানটা ধরে দেয় খুরখুরি। আসর জমে ওঠে। গান-নাচের শেষে খাবার বিলি শুরু হয়।]

সকলে: 'কী আনন্দ, কী আনন্দ—' (গান)

শিবু: (হঠাৎ) আজকের আসরে আমি একটা লেকচার দেব।

সকলে: চলবে না, চলবে না।

শিবু: বন্ধুগণ! আমি আজ তোমাদের ল্যাজের ক্রমবিকাশের ওপর একটু জ্ঞান দেব।

খুরখুরি: শেয়াল ভায়ার এখন মাঠ-ময়দানে লেকচার দেওয়ার নেশা হয়েছে। 'বন্ধুগণ' বলে বানিয়ে সাতকাহন—

[কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শিবু খুরখুরির গায়ে মারল তার ল্যাজের এক বাড়ি আর সঙ্গে সঙ্গে 'গাঁ গাঁ' করে বাঘের ডাক শোনা গেল খুব কাছ থেকে।]

সকলে: বাঘ! বাঘ!

শিবু: টিভি-তে হচ্ছে। ছবির বাঘ। ডাক আছে, বাঘ নেই। সুন্দরবন ফাঁকা!

খুরখুরি: (রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে) এত বড় আস্পর্দা! আমি পঞ্চতন্ত্রের সেই শশক! স্পষ্ট কথা বলি বুদ্ধির জোরে—'বুদ্ধির্যস্য, বলং তস্য। নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলং'!

শিবু: কে বললে খরগোশের বুদ্ধি আছে? ওসব পঞ্চতন্ত্রের বানানো গল্পকথা! খরগোশ তো ছার, এমন কি বাঘও আজকাল আমায় ভয় করে।

[খুব কাছ থেকে বাঘের ডাক। শিবু হঠাৎ ভয় পায়। পালাবার চেষ্টা করে। বাঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে।]

পুপে: ভয় পাচ্ছ কেন ভাই শিবু? বাঘ তো তোমার মামা হয় বলেছিলে।

শিবু: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু ল্যাজ নিয়ে আমার সঙ্গে ওর একটা ইয়ে, মানে, মতবিরোধ চলেছে। তাই—!

সে : বা, বা, বা—বাঘের কী ডাক, যেন রবিঠাকুরের কবিতা!

[প্রচণ্ড গর্জন করে বাঘ 'হালুম' শব্দে আসরে লাফিয়ে পড়ে শিবুকে মারে এক থাবার বাড়ি।]

বাঘ: আহম্মক শেয়ালটা নাকি ল্যাজের গর্বে মট্‌মট্ করছে। দেব আজ ল্যাজটা ছিঁড়ে। শয়তান মিথ্যেবাদী।

খুরখুরি: ওর আর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই গো, বাঘদাদা। পালাবে

কিন্তু।

শিবুঃ আমি যাই, কাজ আছে। মামা! ক্ষমা কর!

[কথাটা শুনে নিজের ল্যাজ আছড়ে, বাঘ শেয়ালের বাহারে ল্যাজ ধরে দেয় এক মোক্ষম টান। 'ল্যাজ'টা খুলে আসে। সকলে মিলে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।]

বাঘঃ দুত্তোর ল্যাজ! এটা তো নাইলনের ফল্‌স্‌ ল্যাজ। বাঁশবনের শেয়ালরাজাই বটে! হাঃ! 'সে'! তুমি ওর ল্যাজটা নাও। তোমার রবিদাদাকে দিও।

[শিবু পালাতে গেলে খুরখুরি তাকে চেপে ধরে।]

শিবুঃ ছাড়, ছাড়! কামড়ে দেব কিন্তু।

সকলেঃ দুষ্টুটাকে ধর তো! বেঁধে ফ্যাল্‌!

পুপেঃ নারে! ওকে ছেড়ে দে। অনেক শাস্তি আর শিক্ষা হয়েছে। বাঘ আজও বাঘ—সিঁড়ি বেয়ে দশতলায় উঠে এসেছে অন্যায়ের শাস্তি দিতে। না ভাই, 'সে'?

[শেয়াল হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া করে কেঁদে ওঠে। 'সে' শেয়ালের ফল্‌স্‌ ল্যাজটি ধরে নেয়।]

সে ঃ ভাইসব! আমি ঘুমচোখে জলে পড়ে গিয়ে নিজের দেহ হারিয়ে তারপর পাতুখুড়োর দেহে ঢুকে পড়ে জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি। এই ল্যাজটি কি আমার পরা উচিত হবে? বাঁশবনের ঝুটো শেয়ালরাজার ঝুটো ল্যাজটি? ভেবে দেখো, ভাই। যদ্ভুত তদ্ভুত অদ্ভুত কিম্ভূত—বদভূত! এদের মধ্যে আমি কে? আমারও কি ল্যাজ আছে—না কি, বলো না ভাই?

[একটি ফুটফুটে পাঁচ-ছ'বছরের ছেলে ঢোকে।]

পুপেঃ (আনন্দে আটখানা হয়ে) ওমা! এসে দেখো 'সে'! দাদামশাই কী সুন্দর শিশু ভোলানাথ হয়ে ফিরে এসেছেন।

খোকাঃ আজ তো আমার জন্মদিন। বাঘমামা, আমার হাত ধর! খুরখুরি আর সবাই এসো না! একটা অন্যরকম আধুনিক গান ধরো না সবাই। শিবু-ও গাও! তোমার তো ল্যাজ আবারও গেল।

সকলেঃ নাচগান হোক।

['সে' ধুয়ো তোলে। গান ও নাচ হয়।]

সে ঃ পুপেদিদি শুরু করো!

[গান শুরু হয়। সকলে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচে। এমন কী শিবুরামও আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গে যোগ দেয়।]

গানঃ **'ল্যাজের আমি, ল্যাজের তুমি—**
ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা
ল্যাজ কি কারো কেনা?
ও ভাই, ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা।'

[গোল হয়ে সবাই নাচে। খোকা মাঝখানে।]

যবনিকা

ছবি ঃ সুফি

হাঁক দিল কে

সুখেন্দু মজুমদার

হয়তো এখন ছুটির দুপুর দীঘির জলে
সাঁতার কাটে,
দোল খেয়ে যায় এপাশ-ওপাশ জাপ্টে ধরে
বটের ঝুরি।
আমরা তখন ঘুর ঘুর ঘুর চণ্ডীমেলায়
হারজি মাঠে,
হাঁক দিল কে 'এমনি করে চলবে না আর
সময় চুরি।'
সত্যি কি কেউ হাঁক দিয়েছে, ডাক দিয়েছে,
'ফিরবি নাকি',
এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি কে আমাদের
ডাকতে পারে।
এমন তো নয় রোজ দু'বেলা লেখাপড়ায়
দিচ্ছি ফাঁকি,
সময় কঠিন তাই বলে আর ইচ্ছে করে
কেই বা হারে?
হয়তো বা কেউ মনের মধ্যে আগ বাড়িয়ে
দিচ্ছে নাড়া,
যাই করি না, খুব জরুরি চলতে শেখা
সময় বুঝে।
বলতে পারো হুড়মুড়িয়ে ধরাছোঁয়ার
কিসের তাড়া?
সব'চে ভালো সমঝে চলা মনের মতো
বন্ধু খুঁজে।

চার টুকরো ছড়া

প্রদীপ আচার্য

ট্যাংরাতে ভাই ট্যাংরাতে
মিটিং করে ব্যাঙ রাতে
ব্যাঙখেকো সব চীনার ঠাঁই
ট্যাংরাতে ক্যান জবাব চাই।

দমদমে ভাই দমদমে
বৃষ্টিতে জল কম জমে
গড়িয়াহাটে কোমর জল
বলল পাতিহাঁসের দল।

হাজরাতে ভাই হাজরাতে
জলসা হবে আজ রাতে
বলল মশা গাইব গান
কোন ঘরানা শুনতে চান?

বাঁকড়াতে ভাই বাঁকড়াতে
চিংড়ি মাছ আর কাঁকড়াতে
গলায় গলায় দোস্তি খুব
হোক না তাতে দোষ কি খুব?

‘তেলেস্‌মাতি’ বাড়ি

আবদুল জব্বার

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার প্রফেসার হয়ে এলো নাজিমউদ্দিন। হুগলীর ফুরফুরা শরীফের কাছে বাড়ি তাদের। কলকাতায় তাদের পৈতৃক ব্যবসা আছে বই বিক্রি আর বাইন্ডিংয়ের। কলকাতায় থেকেই পড়াশুনো করেছে নাজিম।

বিয়ের পর চাকরিও মিলে গেল। ফার্স্ট ক্লাশের ওপর তলায় নম্বর মিলেছিল তার। ডক্টরেটও করেছে।

স্ত্রী জাহানারা লাজুক আর ভীতু স্বভাবের মেয়ে। গ্রামে থেকেই বি এ পাশ করেছে। তাকে নিয়ে আসতে হলো বর্ধমানে। ট্রেনে চড়তেও তার ভয়। সে ভয় ক্রমে ক্রমে অবশ্য কেটে গেল।

নাজিম এক মুসলিম পরিবারে সপ্তাহ খানেক কাটানোর পরে শহরের পশ্চিম দিকের একটি বাগানের মধ্যে চমৎকার একখানা চার কামরার দোতলা বাড়ি ভাড়া পেলে। পেছনে শানবাঁধানো বড় পুকুর। বাগানে গাছপালা। কবরখানা। ভাঙা পড়ো হাওয়াখানা। জমিদারশ্রেণীর লোক যাঁরা এ বাড়ির মালিক, সবাই নাকি ‘বাংলাদেশে’ চলে গেছেন। কেয়ারটেকার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কেরানি। ফরসা পাতলা চেহারার আধবুড়ো গোলাম হোসেন খাঁ।

এমন বাড়ি পড়ে থাকে কেন এ প্রশ্ন অবশ্য মনে এসেছিল নাজিমের। গোলাম হোসেন উত্তর দেয়, ‘কে নেবে—কার এমন ধক্ আছে! তাছাড়া নির্জনতা আপনি যেমন ভালবাসেন, সবাই কি তা চায়? তিনদিকেই ফাঁকা মাঠ।

গোটা বাড়িটাই মাত্র পাঁচশো টাকা। সে দুটো-তিনটে টিউশনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে।

কাজের মেয়ে গোলাপী বিবিকে আনতে হয়েছে দেশ থেকে। রাঁধাবাড়ায় তার চমৎকার হাত। তাছাড়া একাই বা জাহানারা থাকবে কি করে?

বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার সময় কাছের দোকানে সাবান, সেন্ট, পাউডার, পাঁউরুটি, মাখন, বিস্কুট কেনার পর দোকানদার কোথায় কোন বাড়িতে সে উঠেছে জেনে নেবার পরে বলেছে, ‘ওটা তো ভূতের বাড়ি! ওখানে কেউ থাকতে পারে না। সবাই পালায়।’

হেসেছে নাজিম। বলেছে, ‘আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। যাদের বুদ্ধি কম, সাহস নেই, আধিভৌতিক কল্পনা আছে, তারা নিজের ছায়াকেও ভূত দ্যাখে।’

কথাটা জাহানারাকে বলেনি। এমনিতেই সে ভীতু। জোঁক দেখলেই লাফ দেয়।

গোলাপী কিন্তু খুব সাহসী মেয়ে। একাই থাকবে সে নিচের ঘরে। প্রথম দু’দিন অবশ্য দোতলায় পাশের ঘরে ছিল। রাত্রে বাঁশবনের দিকে কবরখানায় কি যেন শব্দ হয় দীর্ঘ সুরেলা লয়ে—‘ক্যাঁ ও ও ও ও...’

জাহানারারও কানে পড়েছে।

‘কি শব্দ গো ওটা?’

‘ও কিছু না। ঘুমোও। রাত জাগলে মাথা গরম হয়, তখন টিকটিকির ডাক শুনে মনে হয় স্কুটার ছুটে গেল! কটা বাঁশ লম্বা হয়ে তেঁতুল গাছের ওপর শুয়েছে। বাতাসে দোলা খেলে ডালের গায়ে ঘর্ষণ খায়—তাই ক্যাঁওও করে শব্দ ওঠে। বড় মাছের ঘাইও শোনা যায় পুকুরে। এটা নাকি পীরের পুকুর। কেউ মাছ মারে না। তেঁতুল গাছে অজস্র তেঁতুল হয়, কেউ পাড়ে না—কাঠবিড়ালীতে খায়। পুকুরের পানি স্বচ্ছ হলেও জলজ ঘাসের জন্য যেন কালো দ্যাখায়।’

জাহানারা প্রতি ওক্ত নামাজের পর কোরআন শরীফ পড়ে সুর করে। তার ধারণা, ভূত থাকলে তাতে ভেগে যায়।

গোলাপী আবার এক কাঠি বাড়ায়। বলে, ‘ভূত কলমা-দরুদে ভাগে বটে, মামদো ভূত হলে ভাগে না গো বউমা।’

মামদো ভূত নাকি মুসলমান লোকের ‘রুহ্’ (আত্মা) বদ হয়ে গেলে হয়—যারা গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা পুকুরে ডুবে অনেক কষ্ট পেয়ে মরে।

কথাগুলো যেন জাহানারার মনে গেঁথে যায়। গোলাপী বিবি উত্তর দিকের ঘোষপাড়া থেকে দুধ আনতে যায় আর এ বাড়ির অনেক কথা শুনে আসে। সব কথাই সে বলে জাহানারাকে। রং চড়ায়ও কথার মধ্যে।

এই বাড়ি নাকি অভিশপ্ত। তিন তিনটে লোক মরেছে। পুকুরে ডুবে মরেছে একটা বউ। ঐ পুকুরে সে গা ধোয় আর চুল ঝাড়ে শানের ঘাটে শব্দ করে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমা রাতে তাকে নাকি দ্যাখা যায়।

বিষ খেয়ে মরেছে মেজোকর্তা। সেই বৌটারই স্বামী।

নাজিম সব শোনে। আমল দেয় না। বলে, 'ভূতের গল্প সবই মানুষের বানানো। উদ্দেশ্য, ভয় দ্যাখানো বা মজা করা। দুর্বল লোক বুদ্ধিহীন হলে সে নিজের ভুল কাজে নিজেই কাবু হয়। এসব বিশ্বাসে 'ইমান' (আস্থা) হারায়। মনে মনে ভূতপ্রেতকেই পুজো করে।'

একদিন রাতে কিন্তু নাজিমই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ দোতলার বারান্দা ধরে এগিয়ে যায়। জাহানারা তখন ঘুমোচ্ছে।

গোলাপী বিবিও নিচের ঘরে নাক ডাকাচ্ছে। ঘর-দোর সব বন্ধ। ছাদের ওপরে কি যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এ শব্দটা খিরিশ গাছের ডাল বেয়ে এসে ভাম বা উদ্‌বিড়াল পড়ার হতে পারে; কোনো কোনো এলাকায় এই প্রাণীটাকে 'মাছ-বাঘরোল'ও বলে।

কিন্তু স্পষ্ট যেন মানুষের হাঁটার শব্দ—দুম দুম করে চলে যায়। বাঁ হাতে টর্চ আর ডান হাতে লোহার রড নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বেরোয়। অবশ্য দোর খোলার একটু শব্দ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

নিচে নেমে আসে। ভিজে পায়ের দাগ! বাথরুম থেকে গোলাপীর ঘরের দোর পর্যন্ত।

গোলাপীই তাহলে বাইরে গিয়েছিল? তাই হবে। পুরুষদের মতো খড়ম-পা নয়। পেট-চাপা একটু ছোট ছোট পায়ের ছাপ। এসে শুয়ে পড়ল।

এটা-সেটা দেখে, নানান কিছু সন্দেহ করে মাসখানেক কেটে গেল। মানুষ আশ্চর্য হয়। নাজিমরা এখনো বাস করছে? নাজিম বলে, 'আমি তো ভূত ছাড়াতে জানি!' হাসে সে।

কিন্তু একরাত্রে গোলাপী গোঁ গোঁ করে কাঁদতে লাগল। অস্পষ্ট ভাষায় কেবলই গোঁয়াতে থাকে অনেকক্ষণ। গলা টিপে ধরেছে কেউ?

নিচে নেমে এসে ডাকে নাজিম। দোরে ঘা মারে। কতক্ষণ পরে জেগে যায় গোলাপী। ঘামে ডুবে গেছে তার সর্বশরীর। বলে, 'একটা বিস্তর চুলওলি কালো শাড়িপরা বউ আমার বুকে চেপে বসেছিল—আমাকে জোর করে যেন গেলাসভরা নিমছাল পেষা কষ খাওয়াতে চায়।'

'তুমি খেলে না কেন? তোমার রোগ ভাল হয়ে যেত। মহিলা মামদো ধরেছিল তোমাকে। সে কারো ভাল বই মন্দ করে না।' বলে হাসে নাজিম। জাহানারাকে বলে, 'আসলে গোলাপীর তেল-ঝাল-চর্বি জাতীয় খাদ্য খেয়ে হজম হয়নি, পেটে গ্যাস জন্মেছে—ব্রেনের শিরা বিশ্রাম নেয় ঘুমের সময় কিন্তু উত্তপ্ত হবার ফলে ঐসব মনের বা চিন্তার অথবা ধারণার ছবি তৈরি হয়ে স্বপন দেখেছে।

ক্রমেই সব তত্ত্ব ঠেলে দিয়ে বছর কেটে গেল। আর ভয় নেই। কোনো প্রাকৃতিক কারণের সূত্র খুঁজে না পেয়ে বুদ্ধি হারায়নি নাজিম। তাদের পুত্রসন্তান এসে গেল।

শুরু হলো এবার মামদোর উৎপাত। একুশ দিন যাবার পর বাচ্চার দোলা যেন কোন অদৃশ্য শক্তির টানে দুলতে থাকে। বাচ্চা কাঁদলে কে গালে থাবা মেরে মেরে থামায়! রান্নাঘরের মধ্যে থেকে মনে করেছে বোধহয় গোলাপী। কিন্তু কই না তো, সে তো তখন ঘাটে মাছ রগড়াচ্ছে।

কে বাচ্চাকে তাহলে বোতল ধরে দুধ খাওয়াল? নিচেয় খালি বোতল বসানো আছে!

ক্রমেই আরো ঘন হয়ে এলো সেই আসা-যাওয়া। নাজিম ছাত্রদের পড়ানো, খাতা দ্যাখা, ডিউটিতে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। স্কুটারে যাতায়াত করে।

একদিন বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে তাকে কোলে নিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। কে যেন খুব আলতো হাতে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে তাকেও ঠেলে ঠেলে শুইয়ে দিল। ভয়ে চোখ মেলল না জাহানারা। কি করে দ্যাখা যাক। মাথার চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে। পা টিপে দিচ্ছে। বলল, 'গোলাপী 'বুবু' (দিদি) নাকি!'

'হুঁ।' উত্তর পেলে।

অকাতরে ঘুমিয়ে গেল জাহানারা।

ছুটি পড়তে তারা বাড়িতে এলো। গোলাপীও এলো সঙ্গে। বাড়ি পড়ে রইল তালাচাবি আঁটা। কোনো চোর-ডাকাতও ওখানে যাবে না।

ফিরে এসে দেখল সত্যিই তাই। ঝাঁটপাট দেওয়া চকচকে ঘরকন্না।

তিন-চার ঘণ্টা হলো তারা ফিরেছে—গোলাপী রান্নার যোগাড় না করে ছেলে বয়ে এসে ঘুমিয়ে গেল। যদিও গোলাপী রান্না করেছে তবু গল্প ফাঁদে: 'গরম ভাত-তরকারি রান্নাবান্না করা তো আছে। ডাল, কলিজি আর আলু ভাজা। সেদ্ধ ডিম। কে এসব করে রাখল? আমরা আজ আসব জানলই বা কেমন করে?'

নাজিম এ রহস্যের কিছু সমাধান খুঁজে পায় না।

'তবু অদৃশ্য কেউ অমঙ্গল তো করেনি? দুর্ঘটনা না ঘটালেই হলো। রোজ রান্না করে রাখলে তো আরো ভাল। তাহলে বিবি গোলাপজানকে বিদায় আদায় করে দিই।'

জাহানারার স্বপ্নে একদিন দর্শন দিল একটি বউ।

'কে তুমি ভাই?'

'এ বাড়ির মেজোবউ—রঙ্গিলা বেগম।'

'তুমি প্রেতাত্মা হয়ে গেছ?'

'হাঁ, মেয়ে-মামদো। আমি তোমার বাচ্চাকে ভালবাসি। তোমাকেও ভালবাসি। আমার মেজোকর্তা আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে পুকুরে ডুবিয়ে দেয়। তুমি আমাকে ভয় পেয় না। আমি তোমার কোনোরকম ক্ষতি করব না।'

'তোমার স্বামীও মামদো-ভূত হয়েছে?'

'হাঁ। শ্বশুরও। এই বাড়ির সবাই 'বাংলাদেশে' চলে যেতে তারাও তাদের খোঁজে চলে গেছে, আর আসে না।'

স্বপ্নের ব্যাপারটা জাহানারা নাজিমকে বলতে সে কিছু উত্তর দিতে পারল না। শুধু তাকিয়ে রইল। এরপর জাহানারার আর সহজে ঘুম ভাঙে না। সে ঘুমোলেই অন্য জগতে চলে যায়—কত রকম স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্ন দেখতে সে ভালবাসে।

বড় ডাক্তার দ্যাখানোর পর জাহানারার সুস্থতা ফিরে এলো।

'তেলেস্‌মাতি' বাড়ির অপবাদ দূর হয়ে গেল। এসব কীর্তিকলাপের গল্প প্রতিবেশীরাই বানায়।

ছবি: সুফি

রাস্তায় গিয়ে পটলাদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছে। এমন সময় পি কে'র গাড়িটা এসে থামল। তিনি যেই গাড়ির দরজা খুলে নেমেছেন, ঠিক সেই সময় পটলা ছক্কা মারার মতো ডাং দিয়ে গুলিটাকে সজোরে হাঁকড়েছে। গুলিটা পি কে'র বাঁদিকের রগ ঘেঁষে কানটা একটু ছুঁয়ে ওধারে মিত্তিরদের বাড়ির রকে গিয়ে আছড়ে পড়ল। পটলা এবং তার সঙ্গীসাথী আর তার সঙ্গে প্রীতিও উল্লাসে চিৎকার করেই থমকে গেল। পি কে'কে দেখেই

প্রতিবেশী

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পি কে রে'র পুরো নাম প্রভাত কুমার রায়। কিন্তু সাহেবীয়ানা, বিদ্যা ও অর্থের দাম্ভিকতার আড়ালে প্রভাত কুমার কবেই ঢাকা পড়ে গেছে। আর তাঁর ডাক নাম যে 'পল্টু' সে তো প্রায় ঐতিহাসিক তথ্যের সামিল। বিস্ময় লাগে, ওঁর মতন কেতাদুরস্ত একজন মানুষ টালিগঞ্জের ঘোষপাড়ায় এন এন ঘোষ বাই লেনে অতবড় একটা বাড়ি করে কেন আছেন! ওঁকে নিউ আলিপুর বা সল্টলেকের বাসিন্দা হিসেবেই মানায়। এখানে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্তর পাড়ায় উনি বেমানান।

মানুষটা বাঙালী হয়েও পুরোপুরি সাহেব। ঘরে-বাইরে সর্বদাই সাহেবী পোশাক। মুখে ছোট্ট পাইপ বা হোল্ডারে লাগানো সিগারেট। পাইপ কামড়ে কথা বলেন। ধবধব করছে রঙ। ছ'ফুটের উপর লম্বা সুঠাম চেহারা। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। চোখে দামী ক্রুক লেন্সের চশমা। পাড়ার লোকের সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলেন না, মেশেন না। মেশার সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পি কে রে একটা নাম-করা কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সিনেটের মেম্বার। স্ত্রী অণিমাকে বিয়ের পর বি এ পাশ করিয়েছেন। এক ছেলে প্রণব, এক মেয়ে প্রীতি। দু'জনেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে।

পি কে'র বাড়ির পিছনে হারাধনের খাপরার চালের বাড়িটা ঠিক লেটেস্ট মডেলের ইমপোর্টেড মোটর কারের পাশে ঝরঝরে রিকশার মতো দৃষ্টিকটু। বড় রাস্তার মোড়ে হারাধনের অনেক দিনের পুরনো চায়ের দোকান। হারাধনের তিন ছেলে দুই মেয়ে। ছেলেমেয়েদের ভাল নাম কেউ জানে না। ডাক নাম পটলা, আলু, ঝিঙে। মেয়ে দু'টির নাম কলমি আর থানি। থানকুনি নামটা কেটে-ছেঁটে হয়েছে থানি। ছেলেমেয়েগুলোর গায়ের রঙ কালো হলেও মুখশ্রী খুব সুন্দর। কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে ওরা। পি কে রে-কে বোধহয় একমাত্র হারাধনই প্রভাতবাবু বলে সম্বোধন করে।

অনেক দিন আগের কথা। পি কে'র বাড়ির গেটের সামনে গলিটায় পটলা, আলু এবং পাড়ার আরও কয়েকটা ছেলে ডাংগুলি খেলছে। পি কে'র ছেলে প্রণব দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রত্যেকের বয়স পাঁচ থেকে আটের মধ্যে। প্রণব একটু আগে তাদের লনে বোন প্রীতির সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল। কিন্তু প্রণব প্রীতিকে ব্যাট করতে দেয়নি বলে প্রীতি রেগেমেগে

তারা তাদের উল্লাস সভয়ে গিলে ফেলল। পি কে বাঁ হাতের দু'আঙুল দিয়ে বাঁ কানটা একটু ঝেড়ে পটলাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, অফ্ উইথ ইউ।

পটলারা বুঝতে পারে না। পি কে গম্ভীরভাবে বলেন, যাও। আর কোনোদিন যেন তোমাদের এখানে এইসব আজেবাজে খেলা খেলতে না দেখি। যাও,.বি অফ্ ফ্রম হিয়ার। পটলারা মাথা হেঁট করে চলে যায়। প্রীতি একা দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্বের মতো। পি কে বলেন, পিতু, তুই এই ছোটলোকদের ছেলেগুলোর সঙ্গে খেলছিস! প্রীতি বলে, পটলা তো মোড়ের চায়ের দোকানের হারাধনকাকার ছেলে। পি কে বলেন, ওই একই হলো।

পি কে গম্ভীরভাবে গটগট করে উপরে নিজের ঘরে গিয়ে কোট, টাই খুলতে লাগলেন। ওধারে হারাধনের খাপরার বাড়ির উঠোনে তখন তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। গলগল করে ধোঁয়া ঢুকছে পি কে'র ঘরে। 'রাবিশ' বলে ওদিকের জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দেন পি কে।

সময় গড়িয়ে যায়।

পটলা স্কুল ফাইনালে দু'বার ফেল করল। সেই জন্যেই কিনা জানি না হারাধনও হার্টফেল করল। ভূমিকম্পে

তিনতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার মতো হুড়মুড় করে গোটা সংসারটা গিয়ে পড়ল সতেরো-আঠারো বছরের পটলের ঘাড়ে। সবাই বলল, পটলা, তুই তোর বাবার চায়ের দোকানটা ভাল করে চালা। আমরা তোর পাশে আছি, চিন্তা করিস না। পটলার পরের ভাই আলু পড়াশোনায় আরও খারাপ। সে তো নাইন থেকে টেনেই উঠতে পারছে না। পটলা তাকেও দোকানের কাজে নিয়ে এলো। সৌভাগ্যবশত ছোট ভাই ঝিঙে, পড়াশোনায় বেশ ভাল। প্রত্যেকবার ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। এদিকে কলমি, পটলার পরের বোন কোনোরকমে থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করে। এরপর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সে পাড়ার উর্মিলাদির 'সাজগোজ' নামের দোকানে ফ্রক, ব্লাউজ সেলাইয়ের কাজ শিখতে লাগল।

ওদিকে পি কে রে'র পরিবারের খবর ঠিক বিপরীত। তাঁর ছেলে প্রণব স্টার পেয়ে স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে। ইকনমিক্স নিয়ে এম. এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস পেল। তারপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য চলে গেল অক্সফোর্ডে। মেয়ে প্রীতিও কৃতী। হিস্ট্রিতে এম. এ করেছে। হাই সেকেন্ড ক্লাস। দিল্লির প্রবাসী বাঙালী বিখ্যাত অ্যাডভোকেট মিঃ বিমল সেনের একমাত্র ছেলে ডাক্তার অমল সেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। অমল এম আর সি পি, কার্ডিওলজিস্ট। প্রীতিও ওখানে কলেজে প্রোফেসারির কাজ পেয়েছে। প্রৌঢ় পি কে এবং তাঁর স্ত্রী অনিমা সাফল্যের মাপকাঠিতে যা যা পাওয়ার সব পেয়েছেন। একটা পরিপূর্ণ সফল নিশ্চিন্ত জীবন। তবু এই বিরাট তিনতলা বাড়িতে কি রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পি কে কোনো তলা ভাড়া দেননি। দেবার প্রশ্নই নেই। নিচের তলায় ড্রইং রুম, গেস্ট রুম এবং বিরাট পার্সোনাল লাইব্রেরি। দোতলায় তিনটে বড়ো বড়ো শোবার ঘর, দু'দিকে বারান্দা। একটা ঘরে পি কে আর অনিমা থাকেন। অন্য দুটো ঘর দামী আসবাবে সাজানো। খালিই পড়ে থাকে। দিল্লি থেকে মেয়ে-জামাই, নাতনি এলে থাকে।

পটলা তার বাবার চায়ের দোকান আরও বড়ো করেছে। ছোট ভাই ঝিঙে এম এ পাশ করে স্কুল মাস্টারী করছে। বড় বোন কলমি বিয়ে করেনি, সেলাইয়ের দোকান করেছে। ছোট বোন থানির ভাল বিয়ে হয়েছে। আলুও তাদের চায়ের দোকানের সঙ্গে যুক্ত। পটলা, আলুরও বিয়ে হয়েছে। পটলার ছেলে নৃপেন্দ্রনাথে পড়ে। অনিমার মুখে পটলাদের এসব বৃত্তান্ত শোনেন পি কে। নিজের পুত্র প্রণবের কথা মনে পড়ে তাঁর। মেধাবী ছেলে। বিলেতেই থেকে গেল। ওখানেই একজন বিদেশিনীকে বিয়ে করেছে। তার জন্য পি কে'র কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওখানে থাকবে কেন? হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। কল ফ্রম লন্ডন। প্রণবের ফোন।

প্রণব জানাল, ওরা নেক্সট উইকে দেশে আসছে। এয়ারপোর্টে যাওয়ার দরকার নেই। ওরা তাজ-এ উঠবে। ওদেরই গাড়ি থাকবে। হোটেলে কেন উঠবে জিগ্যেস করায় প্রণব বলল, তার স্ত্রী য়্যালিসও তো যাচ্ছে, তার অসুবিধা হবে পি কে'র বাড়িতে থাকলে। তাছাড়া পি কে'রাও আনকমফরটেবল ফিল করতে পারেন। সব শেষে প্রণব জানাল, নেক্সট সানডে বিকেলে ওরা মা-বাবার সঙ্গে চা খাবে।

জানালা দিয়ে পি কে পটলাদের বাড়ির দিকে তাকান। দেখতে পান রান্নাঘরের বারান্দায় পটলা, কলমি, আলু, ঝিঙে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেতে বসেছে। আজ বোধহয় ছুটির দিন। পটলার বউ পরিবেশন করছে। আলুর বউ বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে দিচ্ছে। পটলার ঠাকুমা, সারা মাথার চুল সাদা, পটলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পটলার মা উঠোনে একটা থালায় বড়ি দিচ্ছে। ওরা সবাই পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছে। পি কে ভাবলেন ওরা বোধহয় কলাই-এর ডাল, আলুপোস্ত, ছোট মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। কী সুখী! তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোটি টাকার মালিক পি কে'র নিজেকে কেমন নিঃস্ব অসহায় মনে হলো। স্ত্রী অনিমা ছেলে-বউয়ের আসার কথা শুনে যত আনন্দিত হলেন, তার চেয়ে বেশি মর্মাহত হলেন হোটেলে উঠবে বলে।

রবিবার। চারটে বাজে। কলিং বেল শুনেই বাড়ির কাজের লোক সহদেব দরজাটা খুলে একজোড়া সাহেব-মেম দেখে ঘাবড়ে যায়। 'বাপি' 'মাম্মি' বলে ডাকতে ডাকতে সাহেব গটগট করে উপরে উঠতে থাকে। পি কে ও অনিমা উৎসুক হয়ে ছিলেন। 'পানু এলি' বলে অনিমা তাড়াতাড়ি ছুটে যান সিঁড়ির কাছে। পি কে'ও এগিয়ে যান। প্রণব ও তার স্ত্রী য়্যালিস এসে পৌঁছায় দোতলায়। প্রণব মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল, পি কে'কে আলিঙ্গন করল। য়্যালিস হাতজোড় করে অশুদ্ধ উচ্চারণে বলল, নমসখার।

পিতু কোথায়? প্রণব বোনের খোঁজ করে। পি কে জানান, এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিয়েছি। দুপুরের ফ্লাইটে আসার কথা। বলতে বলতেই পিতু তার পাঁচ বছরের মেয়ে রিঙ্কুকে নিয়ে এসে পড়ে। য়্যালিস রিঙ্কুকে আদর করে কোলে তুলে নেয়।

হোটেলে ওঠার জন্য পিতু দাদার সঙ্গে রাগারাগি করল। বলল, এখনই জিনিসপত্র নিয়ে আয়। প্রণব হাসে। বলে, আছি তো পাঁচ দিন। দু'দিন চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা। য়্যালিস বলেছে শান্তিনিকেতন দেখবে। তারপর যেতে হবে ঢাকা। ওখানেও বক্তৃতা। তারপর ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন।

এমন বুড়ি ছোঁওয়া করে আসার দরকার কি ছিল? অনিমা অভিমান করেন।

প্রণব বাবা-মাকে বলে, তোমরা এখানকার পাট চুকিয়ে আমার কাছে লন্ডনে চল। খুব ভাল লাগবে।

প্রীতি বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করে, তাহলে এই বাড়িটায় কে থাকবে?

প্রণব নির্বিকারভাবে বলে, সেল ইট। বিক্রি করে দাও।

পি কে ছেলের কথা শুনে হাসেন। অনিমা গম্ভীর হয়ে যান। আলোচনা চলতে থাকে। অনিমা বলেন, দেখ, তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। পি কে'র কিন্তু ভিন্ন মত।

ছেলেকে সমর্থন করে তিনি বলেন, এত বড়ো বাড়িতে কতকগুলো খালি ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকাটা মূর্খামি। তার চেয়ে আমি ভাবছি, এই বাড়িটা বিক্রি করে সল্টলেকে একটা ভাল দেখে ছোট ফ্ল্যাট কিনি। আমার কাছে কয়েকটা প্রপোজালও এসেছে।

সেদিন রাত্রে প্রণব ও য়্যালিস ওখানে ডিনার খেল না। ওদের একটা প্রেস কনফারেন্স আছে। তারপর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পার্টি। তাই সাতটার পরই ওরা চলে গেল।

যেদিন বিকেলে প্রণবরা ঢাকা যাবে সেদিন প্রণব ও য়্যালিস বাবা-মার সঙ্গে লাঞ্চ করবে জানিয়ে মাকে ফোন করল। প্রণব বলল, মা, মাংস করবে না। তোমার হাতের আলুপোস্ত আর অনেক রকম মাছ খাব।

অণিমা মাংস করেননি, করেছিলেন অনেক রকম মাছ। ডিমভর্তি বড় বড় পারশে মাছ ভাজা, মৌরলা মাছের বাটিচচ্চড়ি, তেল কৈ, পাবদা মাছের ঝাল, রুই মাছের কালিয়া, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, ইলিশ মাছের ভাপা, শোল মাছের অম্বল। তাছাড়া মুগের ডাল, আলুপোস্ত, দই, মিষ্টি তো ছিলই। য়্যালিসের কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে পারশে মাছ ভাজা, মৌরলা মাছের বাটিচচ্চড়ি, আলুপোস্ত আর মুগের ডাল।

এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে প্রণবরা পি কে'র নীল মারুতিতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় একটা বল সজোরে এসে গাড়ির হেডলাইটের একটা কাচ চুরমার করে দিল। টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব থেকে কুড়িয়ে আনা শক্ত বল দিয়ে পটলা-আলুর ছেলে এবং পাড়ার আরও কয়েকটি ছেলে ক্রিকেট খেলছিল। পটলার ছেলে নাড়ু ছক্কা মারায় এই বিপত্তি। প্রচণ্ড রেগে পি কে ছুটে এসে নাড়ুর কান ধরে একটা চড় মেরে বললেন, আবার তোমরা এখানে খেলছো? বদমাশ কোথাকার! প্রণব বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করে, ইডিয়েট।

ঠিক এই সময় ওদিক দিয়ে পটলা যাচ্ছিল। সে এগিয়ে এসে সব শুনে নাড়ুকে প্রচণ্ড মারতে লাগল। অন্য ছেলেগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল। সামনের মিত্তিরবাড়ির বিজয় মিত্তির এবং গাড়ির ড্রাইভার এসে মারের হাত থেকে নাড়ুকে রক্ষা করেন। তখন নাড়ুর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। পটলা পি কে'র কাছে জোড়হাত করে বলে, ক্ষমা করবেন। আমি আপনার হেডলাইটের দাম দিয়ে দিচ্ছি।

প্রণব দাঁতে দাঁত চেপে বলে, লোকটার অডাসিটি দেখে গা জ্বালা করছে। পি কে চিৎকার করে বলেন, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! দাম দিতে এসেছো? শোন, ভবিষ্যতে যেন তোমার ছেলেরা এখানে না খেলে। তাহলে আমি ড্রাসটিক স্টেপ নেব।

বিজয় মিত্তির গম্ভীরভাবে বললেন, কেন খেলবে না? এই গলিটা তো কারও পার্সোনাল প্রপার্টি নয়। পটলা বাধা দিয়ে বলে, না, না বিজয়দা, ওরা আর এই গলিতে খেলবে না।

বিজয় মিত্তিরের কথায় পি কে উত্তেজিত হয়ে গেলেন। সেদিনই তিনি ঠিক করলেন, এই বাড়ি বিক্রি করে সল্টলেকে চলে যাবেন।

প্রমোটার তারক দত্ত পি কে'র কথা শুনে হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন, সল্টলেকে আমার সুপারভিশনে একটা লাক্সারি কমপ্লেক্স প্রায় তৈরি। একেবারে পার্কের ধারে। তিনতলার একটা ফ্ল্যাট এখনও খালি আছে। কার্পেট এরিয়া টু থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট। কালই দেখে আসতে পারেন।

কয়েকদিন পরে পি কে ও অণিমা প্রমোটারের সঙ্গে সল্টলেকে ফ্ল্যাট দেখতে এলেন। সত্যিই ভাল ফ্ল্যাট। মার্বেলের ফ্লোর। তিনটে বড় বড় বেডরুম, ড্রইংরুম, ডাইনিং স্পেস, অপূর্ব কিচেন, স্টোর রুম, দুটো গিজার লাগানো বাথরুম। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে ব্যালকনি। ওদিকে একটা অ্যাটাচড বাথরুমসহ ছোট গেস্ট রুম। বাড়ির সামনে বিরাট পার্ক। পি কে'র খুব পছন্দ হয়ে গেল। অণিমা ঠাকুরঘরের কথা বলায় প্রমোটার দত্ত গেস্ট রুমটিকে ঠাকুরঘর করার প্রস্তাব দেন।

টাকা-পয়সার কথা ঠিক হয়ে গেল। দত্ত একটা এগ্রিমেন্টের ড্রাফট এনেছেন। পি কে তাঁর অ্যাটর্নির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক হলো দত্ত পি কে'র সাড়ে সাত কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়িটা ষাট লাখ টাকায় কিনছেন। সল্টলেকের ফ্ল্যাটের দরুন তিনি ঐ ষাট লাখ থেকে তিরিশ লাখ কেটে পি কে'কে বাকি তিরিশ লাখ টাকা দেবেন।

অণিমার বুকটা খালি খালি লাগছে, হাঁফ ধরছে।

অ্যাটর্নি এগ্রিমেন্ট মনোনীত করে দিয়ে গেলেন। দত্ত একটা দশ লাখ টাকার চেক পি কে'কে অ্যাডভান্স দিলেন। ঠিক হলো আগামী মাসে পি কে'রা একটা ভাল দিন দেখে সল্টলেকে উঠে যাবেন।

রাত্রি তখন আড়াইটে। হঠাৎ অণিমা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ছটফট করছেন। দু'বার বাথরুমে গিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন। অণিমার এই অবস্থা দেখে পি কে তাড়াতাড়ি বাড়িতে মেডিসিন ক্যাবিনেটে বমির ওষুধ খুঁজলেন, পেলেন না। যে কাজের লোকটা বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থাকত সেই সহদেব আজ দু'দিন হলো ছুটিতে। বাসন মাজার মেয়েটা আসবে সকাল সাতটায়। রান্না করার বৌটি আসে একটু বেলায়। নিচে এক দারোয়ান ছাড়া কেউ নেই। ড্রাইভার থাকে হরিদেবপুরে। আসে আটটায়। বাড়ির ডাক্তার কিল্টু চক্রবর্তী আবার নতুন বাড়ি করে বাঁশদ্রোণীতে চলে গেছেন। পি কে তাঁকে ফোন করলেন। কিন্তু কেউ ধরছে না। অণিমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। পি কে কি করবেন? নিচে গিয়ে দারোয়ানকে ওঠালেন। তাকে জিগ্যেস করে জানলেন সে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ি চেনে না। পি কে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

অণিমার কাছে দারোয়ানকে থাকতে বলে তিনি উদভ্রান্তের মতো স্লিপিং স্যুট পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফাল্গুনের শেষ। এখনও শেষরাতে শীত শীত করে। পটলা তার চায়ের দোকান খুলতে যাচ্ছিল। পি কে'কে এইসময় ঐভাবে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে, কি হয়েছে জ্যাঠামশাই?

পানুর মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, পি কে বলেন। তুমি ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়িটা জানো?

উনি তো বাঁশদ্রোণীতে নতুন বাড়ি করে চলে গেছেন। ঠিক জানি না।

কি করা যায়?

আমাদের পাড়ায় নিখিলকাকার ছেলে রণজয় বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছে। আপনার বাড়ির কাছেই থাকে। এখন তাকেই ডেকে নিয়ে যাই। এরপর পটলা দোকানের চাকর ফন্তেকে বলে, তুই উনুনটা ধরিয়ে আলুদাকে ডেকে দোকান খোল। আর ঝিঙেদাকে আমার সঙ্গে এঁর বাড়িতে দেখা করতে বল।

অনেকবার কলিং বেল বাজানোর পর ডাঃ রণজয় সরকারের ঘুম ভাঙল। বাইরের আলোটা জ্বলে উঠল। পি কে ডাঃ সরকারের নেমপ্লেটে দেখলেন—FRCS, MRCP এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তারী বিদ্যার ডিগ্রি। ডাঃ সরকার ছোটখাটো মানুষ। বয়স বেশি নয়। এক মাথা কোঁকড়া চুল।

সব শুনে ডাঃ সরকার তখনই ব্যাগ, ই সি জি-র সরঞ্জাম নিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। পি কে'র বাড়ির সামনে ঝিঙে দাঁড়িয়ে। পটলা তাকে বলে, তুই এখনই সাইকেলে করে বাঁশদ্রোণীতে গিয়ে বিল্টু ডাক্তারের নতুন বাড়ি খুঁজে তাঁকে ধরে নিয়ে আয়। বলবি জ্যাঠাইমা খুব অসুস্থ।

ডাঃ সরকার অণিমাকে পরীক্ষা করে, ই সি জি করে দেখে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তিনি এরপর তাঁর ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে অণিমাকে খাইয়ে দিলেন। পালস দেখলেন।

রাত শেষ হয়ে আসছে। মেট্রো রেলের শেডের সামনের তেঁতুল গাছটা থেকে একটা কোকিল কুহু কুহু করে ডেকে চলেছে। এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল। ঝিঙে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ি খুঁজে একেবারে ট্যাক্সি করে নিয়ে এসেছে। ডাঃ বিল্টু চক্রবর্তী যদিও সাধারণ MBBS, কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তার। বয়স হয়েছে। ডাঃ সরকারকে দেখে জিগ্যেস করেন। তারপর অণিমাকে পরীক্ষা করেন। ডাঃ সরকার একটু আগে যে ওষুধটা দিয়েছেন সেটা শুনে বলেন, ঠিকই দিয়েছেন। ওঁর আসলে গ্যাস্ট্রিকের ট্রাবল। প্রেশারটা কন্ট্রোলে আছে। এরপর দু'জনে পরামর্শ করে আর একটা ওষুধের কথা বললেন। ঝিঙে সেটা আনতে ছুটল।

ভোর হয়ে আসছে। একসময় পটলা নিজের দোকানে চলে গিয়েছিল। সে এক কেটলি গরম চা ও এক প্যাকেট ভাল বিস্কুট নিয়ে এসে বলে, কাপগুলো কোথায়?

অণিমা উঠতে যাচ্ছিলেন। পটলা বলে, আপনি উঠবেন না, বলুন কোথায় আছে, আমি নিয়ে আসছি। পি কে মৃদু হেসে পাশের ডাইনিং স্পেস থেকে চারটে কাপ ডিশ এনে সামনের টেবিলটায় রাখলেন।

পটলা সবাইকে চা-বিস্কুট দেয়। ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে অণিমাও খান। খাওয়ার পর তিনি আগের থেকে অনেক সুস্থ বোধ করেন। পি কে পটলাকে চায়ের দাম দিতে গেলে পটলা কিছুতেই তা নেয় না। সে বলে, আপনাদের চা খাইয়ে আজ আমি যে তৃপ্তি পেলাম, টাকা দিয়ে তা নষ্ট করে দেবেন! ডাঃ সরকারকে তাঁর ফি দিতে গেলে তিনিও তা নেন না। পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলেন, উনি ডাঃ চক্রবর্তীর পেশেন্ট। আমি তো জাস্ট আপনার প্রতিবেশী হয়ে কর্তব্য করতে এসেছি। এজন্যে কেন ফি নেব? শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে ই সি জি-র চার্জটা নিতেই হলো। দুই ডাক্তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যান। পটলাও বেরিয়ে যায়। এদিকে খবর শুনে পাশের বাড়ির বিজয় মিত্তির এসে পড়েন।

ঠিক এমন সময় একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে এসে জানায়, মা আজ কাজে আসতে পারবে না। জ্বর হয়েছে। মেয়েটির মা এই বাড়িতে রান্নার কাজ করে। সে খবরটা জানিয়ে চলে যায়। ঝিঙেও বের হয়ে যায়।

মহা সমস্যা হলো তো! পি কে চিন্তিত হন।

বিজয় মিত্তির বলেন, অতো চিন্তার কি আছে? আমার বাড়ি থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পি কে বলেন, না না। আপনি কষ্ট

আজব ভূতের গল্প

রবিদাস সাহা রায়

কেওড়াতলার শ্যাওড়া গাছে
সেদিন গভীর রাতে,
একটা ভূতে চারটে মানুষ
মারলো পিষে দাঁতে।
দশটা ভূত ছুটে এলো
খবর পেয়ে তার,
তারপরেতেই ভূতের খেলা
জমলো চমৎকার।
ভূতে ভূতে লেগে গেল
বিষম মারামারি,
যায় না বোঝা কার সঙ্গে
কার হয়েছে আড়ি।
কেউবা হঠাৎ ছুটে পালায়
দাঁড়ায় আবার ঘুরে,
এমন আজব কাণ্ডটাকে
বলে অদ্ভুতুড়ে।

খুকুর পুতুল

নারায়ণ চন্দ্র দাস

রাগ করেছে মাটির পুতুল
খায়নি কিছু আজ,
কাঠের পুতুল সাজায় খুকু
কনে বৌয়ের সাজ।

কাচের পুতুল কাচের ঘরে
পটের বিবিরানী,
অহংকারে পা পড়ে না
কঠোর হৃদয়খানি!

আলুর পুতুল বাঁধেনি চুল
চাইছে সে লাল ফিতে,
সারাক্ষণ খুকুর কোলে
কুঁকড়ে থাকে শীতে।

চারটি পুতুল চার রকমের
তবুও খুকুর সাথী,
কেউবা খুকুর কনে-বৌ
কেউবা কোলের নাতি।

ছবি: সুফি

করবেন কেন? আমি টালিগঞ্জ ক্লাবে ফোন করে দিচ্ছি। ওরাই লাঞ্চ পাঠিয়ে দেবে।

এই সময় ঝিঙের সঙ্গে পটলার বৌ, মা, বুড়ি ঠাকুমা এসে অণিমার খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অণিমা উঠে বসেন। পটলার ঠাকুমা অণিমার গায়ে-পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে পি কে'কে বলে, তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না পল্টু। আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পটলা বাজারে গিয়ে সব কিছু কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমরা ওঘরে গিয়ে বসো, আমরা তোমাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।

পল্টু! পি কে রে বোধহয় নিজের ডাক নামটা নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। পটলার ঠাকুমার মুখে পল্টু ডাক, 'তুমি' বলা—কি রকম যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি। তাঁকে অনেকদিন কেউ পল্টু বলে, তুমি তুমি বলে ডাকেনি। সুদূর অতীতের একটা ছোট্ট শিশু যেন তাঁর বুকের পাঁজরের তলায় হামা দিচ্ছে—প্রভাত কুমারের বুকটা ব্যথা করছে, ধড়ফড় করছে। ঝাপসা চোখে ছোট ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল, কালো কোঁচকানো মুখে সাধারণ ফ্রেমের চশমা, কুঁজো, আধময়লা থানপরা পটলার ঠাকুমাকে দেবীর মতো মনে হচ্ছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

বাজারটা কোথায় রাখবো? ঝিঙের কথায় সম্বিত ফিরে পেলেন পি কে।

পরের দিন প্রমোটার মিঃ দত্ত আসেন। সামনের সোনাবাঁধানো দাঁত দুটোয় হাসি ছড়িয়ে বলেন, আজই তাহলে রেজিস্ট্রি করার বন্দোবস্ত করি।

পি কে তাঁকে 'বসুন' বলে ভিতরে যান। একটু পরে সেই মনোনীত দলিলের ড্রাফট ও দশ লাখ টাকার চেকটা এনে দত্তর হাতে দিয়ে বলেন, এগুলো নিয়ে যান। এই কাগজটায় একটা রসিদ লিখে রেখেছি চেকটা ফেরত পেয়েছেন এই মর্মে, এটাতে সই করে দিন।

শুনে দত্তর মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়। চারটে আঙুলে দামী আংটি পরা হাতটা একবার নিজের মুখে বুলিয়ে বলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার রেজিস্ট্রি করার খরচের টাকাটা না হয় আমিই দিয়ে দিচ্ছি।

না, না। পি কে বাধা দিয়ে বলেন।

তবে?

আমি এ বাড়ি বিক্রি করবো না।

ভিতর থেকে হাসিমুখে অণিমা বেরিয়ে এসে বলেন, না বাবা। আমাদের এই পুরনো পাড়া ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে মন চাইছে না।

এমন সময় পুরনো কাজের লোক সহদেব ঝিঙের সঙ্গে এলো। অণিমা অবাক হয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেন, তুই তো এক মাসের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলি, চলে এলি?

সহদেব বলল, পটলদার দোকানে ফন্তে কাজ করে। আমারই দেশের লোক। পটলদা কাল দুপুরে ফন্তেকে দেশে পাঠিয়ে জানান, এখুনি চলে এসো, জ্যাঠাইমার খুব অসুখ। সে অণিমা ও পি কে'কে প্রণাম করে ভিতরের ঘরে গেল।

ডাঃ রণজয় সরকার এসে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, জ্যাঠাইমা কেমন আছেন? অণিমার পালস দেখলেন। তারপর ওষুধগুলো নিয়মিত খেতে বলে চলে গেলেন।

পি কে মিঃ দত্তকে জিজ্ঞাসা করেন, চা খাবেন?

অণিমা তাড়াতাড়ি বলেন, হ্যাঁ খাবেন। সহদেব—

পি কে বাধা দিয়ে বলেন, না, না, বাড়িতে চা করতে হবে না। আমরা সবাই পটলের দোকানের চা খাবো। চলুন। পি কে উঠে পড়েন। মিঃ দত্তের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। শেষ চেষ্টা করেন তিনি, সল্টলেকে অমন পার্কের ধারে সুন্দর ফ্ল্যাট ছেড়ে আপনি কেন যে এই এঁদো গলির সেকেলে বাড়িটায় পড়ে থাকতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

পি কে হেসে উত্তর দেন, ও আপনি বুঝবেন না। চলুন, পটলের দোকানে চা খাবো।

হাত তুলে দত্ত বলেন, না। আমি আজেবাজে দোকানে চা খাই না। তারপর বিমর্ষ হয়ে তিনি চলে গেলেন।

পি কে ঝিঙেকে নিয়ে পটলার চায়ের দোকানে যেতে যেতে পরামর্শ করছেন, ভাবছি আমার বাড়ির নিচের তলাটায় গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ফ্রি কোচিং সেন্টার করবো। বি এ অনার্স, এম এ-র স্টুডেন্টরা পড়তে পারবে। ঝিঙে, তুই আমার সঙ্গে থাকবি?

নিশ্চয়ই থাকবো জ্যাঠামশাই। আপনাকে পাশে পেলে আমি জান লড়িয়ে দেব, ঝিঙে বলে।

পি কে হাত নেড়ে বলেন, না না। প্রাণ দিতে হবে না। তাহলে আমি মার্ডার কেসে পড়ে যাবো। বলেই হা হা করে হাসেন।

ঝিঙে পি কে'র দিকে তাকায়। আশ্চর্য হয়ে যায়। পি কে'র পরনে ইস্ত্রি না করা পাজামা, সাদা পাঞ্জাবি—বুকের সব ক'টা বোতাম খোলা, পায়ে স্যান্ডেল। পটলার দোকানে যেতে যেতে ছোট ছেলের মতো পি কে বলেন, পটলাকে নিয়ে আমি আজ খুব মজা করবো। গিয়ে বলবো দু'কাপ চা দাও। দেবে। চা-টা খেয়ে আমি দাম দেব। তারপর ঘাড় নেড়ে বলেন, তখন তো বাছাধন চায়ের দাম না নিয়ে পারবে না। আমি খদ্দের। কী মজাই না হবে! বলে শিশুর মতো হাসতে লাগলেন।

পাশেই কর্পোরেশনের জমাদারদের কোয়ার্টার। ওদের ময়লা জামা পরা একটা বাচ্চা ছেলে হঠাৎ সামনে এসে পড়ে। ওর মা তাড়াতাড়ি এসে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পি কে 'থাক থাক' বলে ডান হাত দিয়ে ওর নোংরা মাথায় আদর করে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে গাল টিপে দিলেন। তারপর ঝিঙের সঙ্গে পটলার দোকানের দিকে খুব তাড়াতাড়ি চলতে থাকেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন—যে ট্রেনে চড়ে ভালবাসা আর আনন্দের জংশন স্টেশনে যাওয়া যায়।

ছবি: প্রণবকুমার হাজরা

কৌতুকী
সুফি
তোমার একটা ছবি তুলবো হাবুল, হাসিমুখ করে দাঁড়াও!
এবার তুমি আমার ছবি তোল।
এটা একটা 'ট্রিক ক্যামেরা' ছবি তুলতে গিয়ে ছেলেটা বোকা বনে যাবে!
কি করে ক্যামেরায় ছবি তুলতে হয় জানিনা।
দাঁড়াও খোকা, আমি তোমার হয়ে ছবিটা তুলে দিচ্ছি
থামুন, থামুন পুলিসভাই…
খুব সহজ, এই সুইচটা টিপলেই সুন্দর ছবি উঠে যাবে!
ফ্যাঁ…এ…এ…র
দেখাচ্ছি মজা পুলিসের সঙ্গে রসিকতা!
আমাকে ঠকাতে গিয়ে কেমন জব্দ!
পরে…
এখানে কিছু দিন লুকিয়ে থাকুন, পুলিস আপনাকে খুঁজছে!
সন্ধান চাই
লালবাজার

কাউন্টিতে খেলা অভিজ্ঞতার জন্যে

সৌরভ গাঙ্গুলি

সেই ১৯৯৬ থেকে একটানা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে চলেছি। এশিয়া কাপের পর মাস চারেক ভারতে আর ক্রিকেট নেই। বিশ্রাম নিতে পারতাম। কিন্তু তা নিইনি।

আমি জানি এই জন্যেই হয়তো অনেকে ভাবছেন আমি অর্থপিশাচ। টাকার পেছনে ছুটছি। তাই শচীন, আজহার, অজয় জাদেজা যখন পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কাটাবেন তখন আমি এ কাউন্টি থেকে ও কাউন্টিতে খেলে বেড়াব। না, ধারণাটা ভুল। পাউন্ড-স্টারলিং রোজগার করতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। অনেকেই বলবেন, কিসের অভিজ্ঞতা? আমি ভারতের হয়ে ইংল্যান্ড সফর করেছি। খেলেছি বিশ্বকাপে। ইংল্যান্ডে আবার কিসের অভিজ্ঞতা? সাধারণ মানুষ ভুল করতেই পারে। আমি কিন্তু সেই নিছক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইনি। ববি সিম্পসনের সঙ্গে থাকাটাই একটা বিরাট অভিজ্ঞতা। ভারতীয় দলের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে ওঁকে পরিপূর্ণভাবে পাইনি। উনি ল্যাঙ্কাশায়ারের কোচ। একসঙ্গে চার মাস ওঠাবসা করব।

ক্রিকেট স্ট্র্যাটেজির খেলা। অনেক সূক্ষ্ম কূটনৈতিক ব্যাপার আছে। আছে টেকনিকের ব্যাপার। বোলার বদল, ফিল্ড প্লেসমেন্টের মধ্য দিয়েও ম্যাচ জেতা যায়। ল্যাঙ্কাশায়ারে আমরা খেলব তিনদিনের ম্যাচের পাশাপাশি একদিনের ম্যাচ। দেশের হয়ে খেলার যে চাপ সেই চাপ তো কাউন্টিতে নেই। প্রতিটি ম্যাচ ময়না তদন্ত করার, কাটাছেঁড়া করার সময় পাব। আলোচনা করা যাবে ববি সিম্পসনের সঙ্গে। আমি মনে করি অধিনায়ক হিসাবে নিজেকে আরও 'ডেভোলাপ' করতে হবে। নিজেকে ঘষে মেজে নিয়ে যেতে হবে বিশেষ একটা উচ্চতায়। তাই তো ল্যাঙ্কাশায়ারে খেলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভারতের অধিনায়ক হিসেবে আমি সফল হতে চাই। অধিনায়কত্ব নিজের কাছে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে আমি সিরিয়াস। আমার টার্গেট আপাতত ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ।

আমি মনে করি দেশের অধিনায়ক হওয়া একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব নিজের দায়িত্ব পালন করার। এজন্য যথেষ্ট সিরিয়াস আমি। তবে বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া যে কোনও ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন। দুটি বিশ্বকাপ আমার কাছ থেকে অল্পের জন্য দূরে সরে গেছে। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গেলেও বিশ্বকাপের আগে বাদ পড়ি। আবার ১৯৯৬-এ ভারতীয় দলে ফিরলাম ঠিক বিশ্বকাপের পর। দুটি বিশ্বকাপ 'মিস' করার পর কোনও বিশ্বকাপে দেশের অধিনায়কত্ব করা নিশ্চয়ই গর্বের। তবে সেটা আরও দু'বছর পরের ব্যাপার। অনেক দেরি আছে। তার আগে অধিনায়ক হিসাবে আমি মাস্টার ডিগ্রি করতে চাই। ববি সিম্পসনের কাছে তারই কিছু পাঠ নিয়ে আসবো কাউন্টিতে খেলার সময়।

অধিনায়ক হিসেবে আমার অভিষেক সিরিজটি তো মনে রাখার মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে হেরে যাই আমরা। কিন্তু একদিনের সিরিজে স্বপ্নের জয় এসে যায়। কোচিনে অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচে ৩০০ রান তাড়া করে জিতলাম। অবশ্য গতবছর শচীন তেন্ডুলকর ও অজয় জাদেজার অবর্তমানে 'স্টপগ্যাপ' অধিনায়ক হিসাবে কাজ চালিয়েছি। তবে ঘোষিত অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব আর টেনশন দুটোই বেশি ছিল। একদিনের সিরিজ খেলার সময় প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক হিসাবে আমি বুঝতে পারিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কিছু ক্রিকেটার সত্যিকারের স্পিরিট নিয়ে খেলছে না। দিল্লি পুলিশের দেওয়া টেপ প্রকাশিত

হওয়ার আগে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমরা সাচ্চা স্পিরিট নিয়েই খেলেছি। এবং সিরিজ জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব আমাদের।

হ্যানসি ক্রোনিয়ে স্বীকারোক্তি করার পর ক্রিকেট দুনিয়ায় তো ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভারতীয় দলের অনেক ক্রিকেটারের নাম উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে অধিনায়ক হিসাবে পুরো ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে আমাকেই। তবে সব থেকে বড় সুবিধা পরবর্তী ছ'মাসে মাত্র একটি টুর্নামেন্ট আছে—এশিয়া কাপ।

আমি অধিনায়কের হাতে অধিক ক্ষমতা চেয়েছিলাম। কারণ অধিনায়কের অনেক কাজ। দলের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অধিনায়কত্ব করা সম্ভব নয়। তাই অধিনায়কের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা চাই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের আমি ব্যাপারটি বুঝিয়েছি। ওঁরা বলেছেন আমরা ক্রিকেটারদের আচরণবিধি তৈরি করছি। সেপ্টেম্বরে বোর্ডের সাধারণ সভার পর তা চালু হবে। এটা হওয়া উচিত। দলে শৃঙ্খলা থাকলে পারফরমেন্স ভাল হবে। একটা জিনিস মাস্ট, ড্রেসিংরুম বা প্র্যাকটিসে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ হলে ভাল হয়।

কড়া হাতে অধিনায়কত্বের হাল ধরতে হবে। আমরা এশীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে পারিনি। একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বকাপে আমরা ছ'নম্বর দল। টেস্ট কিংবা ওয়ান ডে-তে আমরা ঠিক ঠিক হিসাবে ছয় কিংবা সাত নম্বরে। অনেক উন্নতি করতে হবে। যেতে হবে অনেকদূর। তাই দরকার পড়লে কঠোর হতেই হবে।

কোচ কপিলদেব কিন্তু দলের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তা সে দলের রেজাল্ট যাই হোক না কেন। ক্রিকেটারদের কাছে তিনি সত্যিই দাদা। ভাইদের সঙ্গে যেভাবে মেশা উচিত ঠিক সেইভাবেই

মেশেন। তাঁর বিরুদ্ধে দলের কারও কোনও ক্ষোভ নেই। নিজের টার্ম নিশ্চয়ই শেষ করবেন। তবে দলে কোনও বিদেশী কোচ আসবেন কিনা কিংবা ববি সিম্পসনের মতো কোনও বিদেশী অ্যাডভাইজার দরকার কিনা সেটা ঠিক করবে বোর্ড। আমি চাই ফিজিও কোকিনাসের আরও সাহায্য। যাতে ফিটনেস লেভেল আরও বাড়ে। ওটা বাড়লেই ফিল্ডিং-এ উন্নতি হবে। নতুন 'দিশা' পাবে দল।

[১১ এপ্রিল লন্ডনে যাবার আগের দিন রাত্তিরে এই লেখাটি লিখেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি]

অনুলিখনঃ মুক্তা চৌধুরী

অন্য সৌরভ

জয় চৌধুরী

কলকাতা ময়দান থেকে উঠে আসা সৌরভ গাঙ্গুলি এখন ভারতের অধিনায়ক। পরিস্থিতি যা তাতে পুজোর আগেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সৌরভকে এক বছরের জন্য অধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করছে। ব্যাট-বল হাতে মোটামুটি পারফরমেন্স রাখতে পারলে ২০০৩-এর বিশ্বকাপ পর্যন্ত সৌরভ গাঙ্গুলির ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকা অসম্ভব নয়।

অনেকে ভেবেছিলেন অধিনায়ক হলে [illegible] পাল্টে যাবেন। চেহারায় এসে যাবে [illegible] গাম্ভীর্য। ব্যবহারে ঘটবে পরিবর্তন। [illegible]দের পাত্তা দেবেন না। [illegible] সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখবেন।

[illegible] থেকে হিরো হবার পরও সৌরভের কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই সহজ সরল সৌরভ। মুখে লেগে [illegible] হাসি। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেও নিজের [illegible] ইমেজ ধরে রাখতে তৎপর। '[illegible] হ্যায়ের' পর তিনি ঋত্বিক রোশনের [illegible] ফ্যান হয়ে পড়েছেন।

[illegible] হিসাবে সৌরভ কেমন? পরিবারকে [illegible] সময় দিতে পারেন না সৌরভ। [illegible] বছরে টানা তিরিশ দিনও [illegible] তিনি। তবুও পরিবারের প্রতি [illegible] নেই। আমরা সকলেই জানি [illegible] রায় গাঙ্গুলি একজন সফল [illegible] আগে থেকেই তিনি ওড়িশি [illegible] পরিচিত ছিলেন। ডোনা [illegible] ১৮ বছরের তখনই তিনি গুরু কেলুচরণ [illegible] 'ডুয়েট' করেছেন কলকাতার [illegible] ইন্দুস্তানে। তবে সৌরভের [illegible] বিয়ের পর ডোনার [illegible] বেড়েছে।

[illegible] গাঙ্গুলিকে টপকে [illegible] তবুও নিজের আন্তর্জাতিক ম্যাচের ভিডিও রেকর্ডিং দেখার সময় স্নেহাশিস সৌরভের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার। ব্যাটিং হোক, বোলিং হোক, বাবা কিংবা দাদা তাঁকে খেলা সম্পর্কে টিপস দিলে সৌরভ বাধ্য ছাত্রের মতোই শোনেন সবকিছু। হ্যাঁ, ছ'মাস ভারত অধিনায়ক থাকার পরও। বিদেশে থাকলেও খেলার ঘটনাটি সম্পর্কে বাবা-দাদার সঙ্গে চলে টেলিকনফারেন্স। ক্রিকেটার সৌরভ ভারত অধিনায়ক হয়েও বাবা-দাদার কাছে এখনও শিক্ষার্থী। এমনকি তাঁর দাদু বড়িশা স্পোর্টিং-এর প্রাণপুরুষ সচ্চিদানন্দ (কেলো) চ্যাটার্জী বা বড়িশার ক্রিকেট সচিব মামা অরূপ চ্যাটার্জী কিছু বললেও সেই পরামর্শও কানে তোলেন সৌরভ।

ডোনাকেও সঙ্গ দেন সৌরভ। ১৯৯৭ সালের দুর্গাপুজো ছিল সৌরভ-ডোনার দাম্পত্য জীবনের প্রথম পুজো। ওই পুজোয় ডোনা আমন্ত্রণ পান দিল্লির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে নৃত্য পরিবেশনের। ওই সময়ে ছিল চ্যালেঞ্জার ট্রফি। ডোনার পাশে থাকতে মেডিকেল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে চ্যালেঞ্জার ট্রফি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন সৌরভ। চিত্তরঞ্জন পার্ক, লোধি কলোনি, নেহরু এনক্লেভের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে সৌরভ ছিলেন ডোনার সঙ্গী। চিত্তরঞ্জন পার্কের শিবমন্দিরের মণ্ডপে দেন অষ্টমীর অঞ্জলি। আর দশজন সাধারণ বাঙালির মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন পার্ক নবপল্লীর পুজোয় খান খিচুড়ি। এই প্রতিবেদকও চাক্ষুষ করেছেন সেই দৃশ্য (ডুরান্ড কাপ কভার করার জন্য থাকতে হয়েছিল দিল্লিতে)।

যে কোনো সুপার ডুপার হিট সিনেমা সময় বের করে হলে গিয়ে ঠিক দেখে নেবেন সৌরভ। সঙ্গে অবশ্যই থাকেন ডোনা। হেয়ার স্টাইল একটু চেঞ্জ করতে হয়। রাতের শোতে গিয়েও পরতে হয় 'রোদ চশমা'।

ক্রিকেট খেলে গাড়ি পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড আছে সৌরভের। শচীন তেন্ডুলকর পেয়েছেন দুটি গাড়ি। সৌরভ চারটি। কোনো সিরিজে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার হিসাবে গাড়ি থাকলে সৌরভ যেন ঝলসে ওঠেন। ইতিমধ্যেই ক্রিকেট খেলে সৌরভ পেয়েছেন দুটি সিয়েনা, একটি সিয়েলো ও একটি ওপেল অ্যাস্ট্রা। একটি সিয়েনা দিয়েছেন বাবাকে। দ্বিতীয়টি ডোনাকে। বাকি দুটি পরিবারের সম্পত্তি। কলকাতায় থাকলে নিজে চালান।

খেলা ছাড়ার পর সৌরভ গাঙ্গুলি অরুণলাল, সম্বরণ ব্যানার্জী, অশোক মালহোত্রার মতো ক্রিকেট আকাদেমি করবেন কিনা তা ঠিক করে উঠতে পারেননি। কিন্তু সৌরভের উৎসাহে ডোনা কিন্তু ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন নৃত্য আকাদেমি। বেহালার জেমস লঙ সরণীতে একটি মাঝারি সাইজের ফ্ল্যাটে এখন ডোনার ওড়িশি নাচের স্কুল।

মিঠুনের মতোই সমাজসেবী সৌরভ। কার্গিল ফান্ডে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাতে চেক তুলে দিয়ে তিনি পাবলিসিটি নেননি। তার চেয়ে অনেক মহৎ কাজই করেছেন তিনি। গত বিশ্বকাপে টনটনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যে ব্যাটে খেলে তিনি ১৮৩ রানের ইনিংসটি গড়েন তা নিলাম করে দেন। সেই সঙ্গে ওই ম্যাচের গ্লাভস, হেলমেট। নিজস্ব সাজসরঞ্জাম বিক্রি করে তিনি চার লক্ষ টাকা তুলে দেন কার্গিল ফান্ডে। পাশাপাশি মিঠুন চক্রবর্তীর 'আমরা' তহবিলে টাকা তুলতে এগিয়ে দেন সাহায্যের হাত। গত ২ এপ্রিল সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফিল্মস্টারদের ম্যাচে তাঁর জন্যই এসেছিলেন একঝাঁক ক্রিকেটার। অসুস্থ মেডিকেল ছাত্রী সুস্মিতার জন্য টাকা তুলে দিয়েছেন তিনি। সমাজসেবার পাশাপাশি প্রতিবেশীদের আপদ-বিপদেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। পাড়ার মোড়ে আড্ডা দেন। কালীপুজোর সময় বাজান ঢাক।

পুরানো সেই দিনের কথা

রাজু মুখার্জি

প্রথম ইংল্যান্ডে যাই ৭৭ সালে। তার কয়েকমাস আগে ইংল্যান্ড দল পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে একটা ম্যাচ খেলে। সেই ম্যাচ চলাকালীন ইংল্যান্ডের সহ অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নানান কথার মধ্যে মাইক আমায় বলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে। কথাটা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু তখনই আবার নানারকম প্রশ্ন মনে হতে লাগল। মাইককে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গিয়ে উঠব? কে-ই বা খেলার ব্যবস্থা করে দেবেন?

বাংলা ও পূর্বাঞ্চল দলের খেলোয়াড় ছিল তখন দিলীপ দোশি। দিলীপ ইংল্যান্ডে গিয়ে সিনিয়র কাউন্টি দলেও খেলত। সেই কারণেই মাইক আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দিলীপ দোশিকেই পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, বন্ধুর জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় কি? এতটুকু দ্বিধা না করে দিলীপ জানাল, নিশ্চয়ই সম্ভব। রাজু আমার সঙ্গে থাকবে। আর খেলার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। তবে মাইক,প্রয়োজনে তোমাকেও কিন্তু সাহায্য করতে হবে।

ইংল্যান্ডে আমি খেলি নটিংহ্যামশায়ার কাউন্টি দলের দ্বিতীয় একাদশে। খেলাগুলো হতো তিনদিনের। ইংল্যান্ড কাউন্টি দলের প্রাক্তন প্রথম সারির খেলোয়াড়রা এই ম্যাচে খেলতেন। অভিজ্ঞ কাউন্টি খেলোয়াড়রা তরুণদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে কাউন্টি ক্রিকেট এবং টেস্ট টিমের জন্য তাদের তৈরি করতেন। ইংলিশ ক্রিকেটের মেরুদণ্ড ছিল কাউন্টি ক্রিকেটের দ্বিতীয় সারির দলগুলো। পরবর্তীকালে এই স্তর থেকেই উঠে এসেছেন ইয়ান বথাম, ডেভিড গাওয়ার, বিল আথারটনরা।

প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার ক্লাব ক্রিকেট খেলতাম। আমাদের দলে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন খেলোয়াড় সোনি রামাধীন। রামাধীন তখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। তা সত্ত্বেও তাঁর স্পিন বোলিংয়ের যাদুতে ক্লাব খেলোয়াড়রা নাকানি-চোবানি খেত। সেই বয়সেও রামাধীনের বোলিংয়ের নিশানা এত ভাল ছিল যে স্লিপ, গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আমরা অনেক ক্যাচ ধরেছি। তাঁর সময়কার ক্রিকেট অনুরাগীদের নিশ্চয় মনে থাকবে রামাধীন যৌবনে টুপি পরে বল করতেন, আর ফুলহাতা শার্ট পরে খেলতেন। সেই ৭৭ সালেও দেখেছি ওনার খেলোয়াড়ি বেশভূষা এতটুকুও বদলায়নি। সেই ফুলহাতা শার্ট ও মাথায় টুপি।

রামাধীনকে নিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ছে। ৫৭ সালে ইংল্যান্ডের মাঠে রামাধীনের ভেল্কি ইংরেজ খেলোয়াড়দের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। টেস্ট ব্যাটসম্যানরা রামাধীনের অফব্রেক বল মোকাবিলা করতে না পেরে অফস্ট্যাম্পের বল পা দিয়ে আটকে দিতেন। বিশ্ববরেণ্য ব্যাটসম্যান কলিন কাউড্রে ঠিকমতো খেলতে না পেরে এইভাবে পা দিয়ে ওনার বল আটকে দিতেন। একবার রামাধীন খুব রেগে গিয়ে কাউড্রেকে বলেছিলেন, এইভাবে খেললে ক্রিকেটে তোমরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে না। যেভাবে পা দিয়ে বল খেলছ তাতে ফুটবলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রামাধীনের মন্তব্যটা ফলে গিয়েছিল ১০ বছর পরে। ৬৬ সালে ইংল্যান্ড ফুটবলে বিশ্বকাপ জেতে। বৃদ্ধ বয়সেও রামাধীন বলতেন, এদেশে ব্যাট দিয়ে বলের মোকাবিলা করা কখনও সম্ভব নয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ২৫ বছর বাদে রামাধীনের কথা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। ইংরেজরা এখন ক্রিকেট-বিমুখ। ফুটবলই জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

ইংল্যান্ডে থাকার সময় আমি এমনই একটা দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেখানে অন্য কোনো ভারতীয় খেলেছেন বলে জানা নেই। দলটির নাম ডেরিক রবিনস একাদশ। এই ভদ্রলোক একজন শিল্পপতি। আর ক্রিকেট ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। তিনি সারা ইংল্যান্ড ঘুরে ঘুরে একটি একাদশ তৈরি করে ম্যাচ খেলতেন। এই দলে বিদেশ থেকে আসা খেলোয়াড়দের ভিড়ই বেশি ছিল। ৭৭ সালে এই দলে আমার সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের ইমরান খান, অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান ল্যাম্ব ও হেনরি ফদারইনগম। সত্যি বলতে কি প্রথম দিন থেকেই ইমরানকে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে অসাধারণ মনে হয়েছে। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি সুপুরুষ। অ্যালান বর্ডার তখনও আমার মনে তেমন রেখাপাত করেননি। বর্ডার ঠিক শিল্পী খেলোয়াড় ছিলেন না। তাই হয়তো তেমনভাবে আমাকে আকর্ষণ করেননি। তবে ওঁর ধৈর্য ও চেষ্টা দেখে উপলব্ধি করেছিলাম বর্ডার বড় খেলোয়াড় হতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান ল্যাম্ব আর দেশে ফিরলেন না। তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিতাড়িত। ল্যাম্ব ইংল্যান্ডেই থেকে যান এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলে ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন আমার প্রধান বন্ধু ছিলেন অবশ্যই মাইক ব্রিয়ারলি। নানান দিক থেকে সাহায্য করেছেন তিনি আমাকে। ব্রিয়ারলি তখন ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে গাওয়ার, বথাম, উইলিস, নট এবং বয়কটরা সফলতার সঙ্গে খেলে ইংলিশ ক্রিকেট নিয়ে বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন।

ব্রিয়ারলি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। কলেজে শিক্ষকতা করতে করতে তা ছেড়ে দিয়ে পেশাদারি ক্রিকেটে চলে আসেন। একদিন জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, কলেজে শিক্ষকতা না করে কেন পেশাদার ক্রিকেটার হলেন? ব্রিয়ারলি বললেন, বিনা পয়সায় পৃথিবী ভ্রমণ করা এবং অনেক মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ এই ক্রিকেটই আমায় দিয়েছে। শিক্ষক থাকলে তা পারতাম না। তাছাড়া বদ্ধ ক্লাসরুমের থেকে খোলা মাঠ ছোটবেলা থেকেই আমায় খুব টানে।

তাঁর কথা শুনে মনে পড়ে গেল কবিগুরুকে।

● ● ● ●

মজার খেলা ক্রিকেট

সমীর গোস্বামী

ক্রিকেট মাঠে সবই সম্ভব। সেই ঘটনাটি আজ সকলেই ভুলে গেছেন। কাউন্টি ম্যাচে সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল কেন্ট ও সাসেক্স। খেলাটি তখন বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উপস্থিত দর্শকরা নানা মন্তব্য প্রকাশ করে ভবিষ্যৎবাণী করছেন। এমন সময় মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হলো।

কেন্ট দল ব্যাট করছিল। কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির পর দেখা গেল খেলা কিছুতেই আর আরম্ভ হচ্ছে না। ব্যাপার কি? কেন্টের এক অপরাজিত ব্যাটসম্যান সি. জে. এম. ফক্সকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্ট অধিনায়ক কিছুক্ষণ সময় চাইলেন।

না, কোনো হদিসই পাওয়া গেল না ফক্সের। খেলা শুরু হয়ে গেল। কেন্টের সকলে আউটও হয়ে গেলেন এর মধ্যে। সেই সময় হঠাৎ মাঠে হেলতে দুলতে প্রবেশ করতে দেখা গেল ফক্সকে।

ফক্সকে দেখে কেন্টের অতিরিক্ত খেলোয়াড়রা হৈহৈ করে উঠলেন। সকলেই জানতে চান কি হয়েছিল ফক্সের, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন তিনি?

সরল মানুষ ফক্স। নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করলেন। বললেন, লাঞ্চের খাবার মোটেই ভাল ছিল না। তার উপর আমি একটু খেতে ভালবাসি। মনের মতো মধ্যাহ্নভোজ না হলে আমি খেলতেও পারি না। তাই বাইরে খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে। এর জন্য আমি দুঃখিত।

ফক্স এরপর স্কোরারের কাছে গিয়ে দেখলেন ওঁর নামের পাশে 'অনুপস্থিত আউট' লেখা হয়েছে। বেচারা ফক্স চুপচাপ বসে পড়লেন।

এখনকার দিনে এমন ঘটনা ভাবাই যায় না। ইংল্যান্ডে এই মজার ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯১ সালে। এ ব্যাপারে ফক্স আবার পরে স্বীকার করেছিলেন, সেই দিনটিতে ওই সময় আমার কাছে ব্যাটিং করার পরিবর্তে পেটকে শান্ত করার কাজটা অপেক্ষাকৃত জরুরি মনে হয়েছিল। তবে এর জন্য আমি লজ্জিত।

* * *

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। হ্যারল্ড গিমব্লেটের সেই ঘটনার উদাহরণ এখনও দেন অনেক কোচ।

১৯৩৫ সাল। হ্যারল্ড ট্রায়াল দিলেন সমারসেটে। কিন্তু ওঁর পারফরম্যান্স দেখে নির্বাচকরা খুশি হলেন না। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সরাসরি বাতিল করে দিলেন হ্যারল্ডকে।

মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেলেন হ্যারল্ড। এদিকে পরের দিন সকালে হঠাৎ ওঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির এক পত্রবাহক। চিঠি পড়ে হ্যারল্ড অবাক। তবু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে মাঠে হাজির হলেন।

আসলে ম্যাচ শুরুর আগে দেখা গিয়েছিল টিমে এগারোজন খেলোয়াড় হচ্ছে না। তাই হ্যারল্ডকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এবং পুরো দল হয়নি বলে আগে ব্যাটিং নিল সমারসেট।

এর মধ্যে আবার বিপর্যয়। এসেক্সের বিরুদ্ধে এ ম্যাচে সমারসেটের ব্যাটসম্যানরা পুরোপুরি ব্যর্থ। দলের ছ'টা উইকেট গেল মাত্র ১০৭ রানে। তখন হাল ধরলেন হ্যারল্ড।

জেদ নিয়ে পিচে গেলেন হ্যারল্ড। মনে মনে নিজেকে বললেন, অপমানের জবাব দিতে হবে।

চমৎকার ব্যাট করলেন হ্যারল্ড। মোট ৮০ মিনিট খেলে দলের স্কোরকে টেনে নিয়ে গেলেন ১৭৫ রানে। এর মধ্যে হ্যারল্ড করলেন ১২৩। সেঞ্চুরি করলেন ৬৩ মিনিটে। সকলে তো হতবাক। বাতিল খেলোয়াড়ই শেষ পর্যন্ত দলের সম্মান রক্ষা করলেন।

নবনালন্দা থেকে ওলিম্পিকে

তপন দাম

বাংলা থেকে এই প্রথম একজন টেবল টেনিস খেলোয়াড় ওলিম্পিকে খেলতে যাচ্ছে। মেয়েটির নাম পৌলমী ঘটক। এরই মধ্যে দেশে টেবল টেনিস মহলে সাড়া জাগিয়েছে ১৭ বছরের এই মেয়েটি। এখন এক ডাকে সকলেই চেনেন তাকে। টেবল টেনিসের ব্যাট হাতে নেওয়ার পর থেকেই টিভিতে দেখে স্বপ্ন দেখা শুরু ওলিম্পিকে খেলার। এখন সেই রঙিন স্বপ্নটি বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এর আগে শুধু মেয়ে কেন ছেলেদের মধ্যেই বাংলা থেকে কোনো টেবল টেনিস খেলোয়াড় ওলিম্পিক ক্রীড়ায় যাবার সুযোগ পাননি। পৌলমী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে তার নিজের যোগ্যতায়। কেউ তাকে এই সুযোগটি তৈরি করে দেননি। শুধু বাংলা নয়, ভারত থেকে পৌলমী একমাত্র মহিলা টেবল টেনিস খেলোয়াড়, যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে সিডনি ওলিম্পিকে। ওলিম্পিকে পাঁচ ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে পৌলমী অন্যতম। এবারের ওলিম্পিকের জন্যে দেখে শুনে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়া হয়েছে।

বাবা সুভাষ ঘটক ও মা রুমা দেবী ওর ছোটবেলা থেকেই চাইতেন মেয়ে টেবল টেনিস খেলোয়াড় হোক। সেই চিন্তা নিয়েই বাবা ও মা বাড়ির পাশের ক্লাব বৈশাখী সংঘে ভর্তি করে দিলেন। এ সেই ৯১ সালের কথা। ক্লাবের কোচ তপন চন্দ্র পৌলমীর খেলা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ছাত্রীটির মধ্যে ভবিষ্যতে বড় খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাই তিনি খুব যত্ন নিয়ে পৌলমীকে গড়েপিটে নিতে লাগলেন। বৈশাখী সংঘে খেললেও রাজ্য সংস্থার গ্রীষ্মকালীন কোচিং ক্যাম্পেও পৌলমী খেলা শিখেছে। তাই টেবল টেনিসের ভিতটা

পৌলমীর বেশ শক্তই। আর খেলার ধরনটাও ছিল অন্য খেলোয়াড়দের থেকে আলাদা। তাই এত তাড়াতাড়ি পৌলমী উঠে এসেছে শিরোনামে। ওর খেলার মধ্যে যে একটা কিলার ইনস্টিংক্ট আছে তা বুঝতে পেরেই গতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, বাংলারই আর এক খেলোয়াড় মৌমা দাসকে না পাঠিয়ে পৌলমীকেই ওলিম্পিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। টেবল টেনিসে মাত্র তিনজনের দলে পৌলমীই একমাত্র মহিলা। ছেলেদের মধ্যে যাচ্ছেন এস. রামন ও চেতন বাবুর।

নবনালন্দার এই ছাত্রীটির এবারেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। কিন্তু সামনে 'ওলিম্পিক', তাই স্কুলের দিদিমণিরাই পৌলমীকে উৎসাহিত করেছিলেন পরীক্ষা আর ওলিম্পিকের মধ্যে শেষেরটাকে বেছে নিতে।

এরই মধ্যে বিশ্ব টেবল টেনিস ছাড়া এশিয়ান টেবল টেনিস ও সার্কিটের প্রতিযোগিতাগুলিতে খেলেছে পৌলমী। খেলার জন্য সে এই বয়সেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে গেছে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, রাশিয়ায় খেলে এসেছে সে। শিখেছেও অনেক। তাই দিনের পর দিন এই সব আন্তর্জাতিক স্তরের খেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে ওলিম্পিকে পারদর্শিতা দেখাতে চায় বাংলার এই মেয়েটি। ব্রাজিলে গিয়ে কিংবদন্তী ফুটবলার পেলের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ পৌলমী ভুলতে পারছে না। পৌলমীর আরও একটা দুঃখ আছে। দেশের সব খেতাব
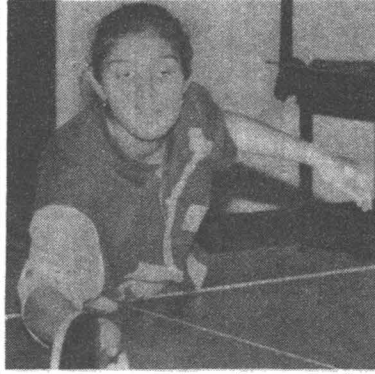
পাওয়া হয়ে গেলেও ক্যাডেট ও সাবজুনিয়রে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। যদিও তার আর বয়স নেই এই বিভাগে খেলার। পৌলমী '৯৮-এ সিনিয়র বিভাগে জাতীয় খেতাব লাভ করা ছাড়াও তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জুনিয়র বিভাগের সিঙ্গলসে। এছাড়া ডবলস ও দলগত খেলার খেতাবও আদায় করে নিয়েছে। এছাড়া রাজ্য চ্যাম্পিয়নের খেতাব তো পেয়েছেই।

স্টেফি গ্রাফের ভক্ত এই খেলোয়াড়টির স্বপ্ন ওলিম্পিকে ভারতীয় দলের পতাকা বহন করা। স্টেফি আদর্শ খেলোয়াড় হলেও লিয়েন্ডার পেজের খেলা দেখতেও ভোলে না পৌলমী। কারণ লিয়েন্ডারের খেলা পৌলমীকে অনুপ্রাণিত করে, সাহস যোগায়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির খেলা পৌলমী পছন্দ করে। পছন্দ করে আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক কপিলদেবকেও। অনেক সংবর্ধনার মধ্যে স্কুলের দেওয়া 'নালন্দা অ্যাওয়ার্ড'টি পৌলমীর কাছে বেশি গর্বের। পড়াশুনা ছাড়া ছবি আঁকা ওর নিয়মিত অভ্যাস। এছাড়া টি.ভি. দেখা, বিভিন্ন দেশের কয়েন জমানো পৌলমীর হবি।

পৌলমী জানাল, রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা ও সর্বভারতীয় সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া তার খেলা সম্ভব ছিল না। রাজ্য সংস্থার তিন কর্তা গোপীনাথ ঘোষ, প্রবীর মিত্র ও রবি চ্যাটার্জির প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। জাপানের ওসাকায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর কোরিয়ার কিমের বিরুদ্ধে খেলাটি সেরা হলেও '৯৮-তে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সিঙ্গলসের ফাইনালে মৌমা দাসের বিরুদ্ধে খেলাটিই তার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই খেলায় মৌমাকে হারিয়ে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় সে।

এবার পৌলমী যাচ্ছে ওলিম্পিকে। বাংলার মানুষ, নবনালন্দা স্কুলের বন্ধুরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

অরুণাভ গুপ্ত

আধুনিক ওলিম্পিকের পরিকল্পনা ছকা হয় ১৮৯২ সালে। পরে প্রতিযোগিতাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৬-তে গ্রীসের এথেন্স শহরে। ৬ থেকে ১৫ এপ্রিল প্রতিযোগিতা চলে। ১৩টি দেশ অংশ নেয়। ৯টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৩১১ জন প্রতিযোগী লড়াই করেন। আমরা অবশ্য সেসব ইতিহাসে যাবো না। আমরা ঐ গ্রীসেরই একজন ডাকসাইটে অ্যাথলিট সম্পর্কে জানবো। যিনি তাঁর ভূমিকার জন্য এখনও গোটা বিশ্বে অমর হয়ে আছেন।

গ্রেগরি ল্যামব্রেকিস 'কেরাসিট্‌স'-এর এক অখ্যাত গ্রামে ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের গণ্ডি টপকিয়ে ল্যামব্রেকিস ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হন এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ সময়ে তিনি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে নিয়মিত 'পাইরাস' দলের হয়ে মাঠে নামা শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে গ্রীসের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে লংজাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ল্যামব্রেকিস। এরপর তাঁকে রোখে কার সাধ্য! পরের বছরই ট্রিপলজাম্পে একেবারে সোনার পদক গলায় ঝোলান। পরের পাঁচটা বছর ওঁকে দেখা গেল গ্রীক চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে স্প্রিনটার-লংজাম্প এবং ট্রিপলজাম্পে আমিই সেরা বলে হাত তুলতে। স্বাভাবিক কারণেই গ্রীসের জাতীয় দলে ঠাঁই পেলেন তিনি। তারপর বলকান ক্রীড়া আসরে টানা বারোবার চ্যাম্পিয়ন হন ল্যামব্রেকিস। তখনই লংজাম্পে ৭.৩৭ মিটার অতিক্রম করে জাতীয় রেকর্ড গড়েন। সেই রেকর্ড ১৯৬০ অব্দি অক্ষত ছিল।

দেশের হয়ে ল্যামব্রেকিস নানান আন্তর্জাতিক আসরে অংশ নেন। ১৯৩৬ সালের জার্মানিতে অনুষ্ঠিত বার্লিন ওলিম্পিক চলাকালীন দুটি বিচিত্র ঘটনার কথা বলেন ল্যামব্রেকিস। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, আমরা জনাকয়েক অ্যাথলিট বুদাপেস্ট-এর কফির দোকানে ঢুকলাম। ঢোকার সময় চোখে পড়ল দরজার বিশাল পাল্লায় ইংরেজদের পতাকা পতপত করে উড়ছে। কারণ জানলাম, ঐ কফি হাউসে একবার ইংল্যান্ডেশ্বরী কফি খেতে

ঢুকেছিলেন। বিশেষ একটি চেয়ারে তিনি অধিষ্ঠান করে সকলকে কৃতার্থ করেছিলেন। ফলে সেই চেয়ারে আর কাউকে বসতে দেওয়া হয় না। আমার জানি কি হলো। সটান সেই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম। অবাক হলেও আমাকে কেউ কিছু বললেন না। আমার দারুণ মজা লাগলো। মনে হলো আমিই সে যে প্রথম নিয়মভাঙার সাহস দেখালো। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে গ্রীসে সেবার একটা কপর্দকও না দিয়ে ওলিম্পিকে প্রতিযোগীদের পাঠিয়েছিল। এমনকি খাবার কেনার অর্থও ছিল না। বলা হয়েছিল ওলিম্পিক ভিলেজে যা খেতে দেবে তাই খেয়ে লড়তে হবে। দাঁতে-দাঁত চেপে পেটে অসহ্য ক্ষিদে নিয়ে আমরা সেবার ওলিম্পিকে লড়েছিলাম।

গ্রীসের ওপর ফ্যাসিস্ট শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রেগরি ল্যামব্রেকিস-এর অ্যাথলেটিকস জীবনের ওপর ফুলস্টপ পড়ে। শুরু হয় তাঁর নয়া জীবন। অন্য ধাঁচে। ১৯৬১-তে তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৬৩-র ২১ এপ্রিল ল্যামব্রেকিস ম্যারাথন থেকে এথেন্স অব্দি শান্তি মিছিল পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্য ক্রীড়াঙ্গনে অশুভ শক্তির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। পুরোভাগে থেকে ৪২ কিলোমিটার পথ তিনি অতিক্রম করেন শাসকদের সমস্ত চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। ফ্যাসিস্ট শাসকরা তাঁর প্রতিবাদ স্তব্ধ করে দিল। ১৯৬৩ সালে 'স্যালোনিকা'তে ল্যামব্রেকিসকে হত্যা করা হলো। লাখো মানুষ তাঁর অন্তিম যাত্রায় সামিল হলেন। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে তাঁকে চোখের জলে বিদায় দিলেন। খেলার আঙিনা যারা কলুষিত করলো তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সব বয়সের মানুষ আওয়াজ তুললেন, "তোমাকে আমরা ভুলছি না। তুমি ওলিম্পিক আদর্শ 'শান্তি এবং মৈত্রীর' জন্য সংগ্রাম করেছো। জীবন দিয়েছো। গ্রীসের সমস্ত অ্যাথলিট তুমি যা করেছ তার জন্য গর্বিত।'

১৯৮৪ সালে 'সিটি অফ ওলিম্পিয়া'তে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ঘোষিত হলো ওলিম্পিকে যেন শান্তি ও বন্ধুত্বের বীজ গভীরে উপ্ত হয়। আজও গোটা বিশ্বের অগুন্তি ক্রীড়াবিদ কৃতজ্ঞ চিত্তে ল্যামব্রেকিসকে স্মরণ করেন। এসো আমরাও সিডনি ওলিম্পিক সামনে রেখে তাঁকে কুর্নিশ করি।

আধুনিক জাগলিং

অভয় মিত্র

জাগলিং একটা মজার খেলা। আমাদের দেশের একটা প্রাচীন খেলা। আগে এই খেলা দেখাত শুধুমাত্র যাযাবরেরাই। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে খেলা দেখিয়ে তারা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। পরে জাগলিং চলে আসে সার্কাসের আসরে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই খেলার জনপ্রিয়তা যেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে এর আধুনিকীকরণ। ফলে জাগলিং এখন শুধুমাত্র শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একে একটি চোখ-ধাঁধানো খেলায় রূপান্তরিত করতে আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলো, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে এই বিষয়গুলি তেমন প্রাধান্য পেত না। কিন্তু বর্তমানে এগুলিই জাগলিংয়ের আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

উজ্জ্বল, ঝলমলে কাপড়ের ওপর জরির কাজ করা পোশাক পরে মঞ্চে উপস্থিত হলে খেলা দেখানোর আগে জাগলারের পোশাকই দর্শকদের মন কেড়ে নেবে। কথায় বলে না 'পহলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী'। এই প্রবাদবাক্যটি 'পারফরমিং আর্ট'-এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। সেইজন্য পোশাকের চটক বা চমক দরকার সবার আগে।

এছাড়া জাগলিং প্রদর্শনকালে আবহসঙ্গীত প্রয়োগ খেলাটিকে বহুলাংশে উজ্জীবিত ও রোমহর্ষক করে তোলে। কোনো বিপজ্জনক খেলায় দর্শকদের মনে যখন একটা কি হয় কি হয় ভাব তখন 'সাসপেন্স মিউজিক' যুক্ত করে খেলাটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলা হয়। ফলে খেলাটি অনায়াসেই দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে।

এরপর আছে আলোর বৈচিত্র্য। এই আলোর বৈচিত্র্য জাগলিংয়ের প্রতিটি খেলাতে আলাদা একটা মাত্রা এনে দেয়। রঙ-বেরঙের আলোর প্রক্ষেপণের সাহায্যে আধুনিক জাগলার জাগলিংকে আরো সুন্দরভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

জাগলিংয়ের উপকরণগুলিতেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানো হচ্ছে। যেমন বলের খেলায় বলগুলিকে নানা রঙে রঞ্জিত করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া লাঠির খেলায়, টুপির খেলায়, ডিশের খেলায়, কার্পেটের খেলায় আধুনিক আঙ্গিকের প্রয়োগ লক্ষ্ণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সর্বোপরি, আধুনিককালে জাগলিংয়ের একটি খেলার সঙ্গে অন্য একটি খেলা যুক্ত করে আরো আকর্ষণীয় ও সুন্দরতর করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। সাইকেল বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে জাগলিং, রোলার ব্যালেন্সের ওপর জাগলিং, ঘড়াঞ্চির ওপর জাগলিং, টান টান দড়ির ওপর জাগলিংয়ের বিভিন্ন কসরৎ প্রদর্শন

খেলাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অনেক সময় দু'তিনজন জাগলার একসঙ্গে মঞ্চে এসে কতকটা নাটকের ঢংয়ে খেলা দেখান। এতে মজা জমে আরও।

মোটকথা, যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে যে কোনো 'পারফরমিং আর্ট'ই তার জৌলুস হারায়। দর্শক চায় নিত্যনতুন কিছু দেখতে। জাগলারকে তাই সব সময় যুগের দাবি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। সেইজন্য আজকের জাগলাররা দেশে-বিদেশে নতুন নতুন খেলা আবিষ্কারে মগ্ন এবং পুরনো খেলাগুলিকেই নতুন আঙ্গিকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টায় রত। জাগলিংয়ের জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ন শুধুমাত্র এই কারণেই।

বর্ষসেরা দুই ছাত্র ক্রিকেটার

বীরু বসু

এ বছর বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছে ১৪ বছরের কিশোর সৌরভ দত্ত এবং ১৯ বছরের কিশোর সুমিত মিশ্র। বাংলার ক্রিকেটে দুই সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ ক্রিকেটার স্বীকৃতি পেল। ওদের পারফরমেন্স দারুণ বলেই এত তাড়াতাড়ি ওরা বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছে।

সেরা সাব জুনিয়র ক্রিকেটার এবং অম্বর রায় সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ রান করার সুবাদেই বারাসাতের সৌরভ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই কৃতিত্ব অর্জন করতে সৌরভকে খুব বেশি সময় খরচ করতে হয়নি। মাত্র তিনটি বছর। তারই মধ্যে সে ব্যাটিং, বোলিং, ফিলডিং—সব কিছুতেই সেরা। ফলে আদর করে সকলেই সৌরভকে এখন জন্টি নামে ডাকতে শুরু করেছেন। ৩২ বলে ১১৪ রান করেছে! তার ওপর ১০৮, ৯০, ৫৮ এবং ৪৭ রানের স্কোরগুলি তো রয়েই গেছে। পরিসংখ্যান বলছে অম্বর রায় সাব জুনিয়র ক্রিকেটে সৌরভ মোট ৪২৪ রান সংগ্রহ করেছে। সঙ্গে ১১টি মূল্যবান উইকেট।

ক্রিকেটার হিসাবে বর্ষসেরা হলেও প্রথম থেকেই ওর ধ্যান-জ্ঞান ছিল ফুটবল। বাড়ির পাশেই শিশুমঙ্গল খেলার মাঠ। ফলে নিয়মিত মাঠে যাবার ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই একটা অভ্যাস ওর মধ্যে ছিল, কিন্তু এলোপাতাড়ি ফুটবল খেলা তার মন ভরাতে পারেনি। ফলে ক্রিকেটকে সে ভালবেসে ফেলে। ক্রিকেটে সৌরভের প্রথম হাতেখড়ি প্রদীপ মাইতির কাছে। তারপর একে একে সঞ্জীবন আচার্য, দেবাশিস শর্মা, দীপক ঘোষ সকলেই সৌরভকে আরও ভাল ক্রিকেট খেলতে সাহায্য করেন। সুযোগ পেয়ে গেল অরুণলালের কোচিং ক্যাম্প বোর্নভিটা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে। প্রথম বছরেই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেল। সঙ্গে পেল অধিনায়কের দায়িত্ব। সেই বছরেই সি এ বি পরিচালিত সাব-জুনিয়র ক্রিকেটে বোর্নভিটা চ্যাম্পিয়ন হলো। ক্রিকেটে সৌরভের হাতে এল প্রথম সাফল্য। বারাসাত থেকে কলকাতার দূরত্ব অনেক। ফলে বাধ্য হয়ে পরের বছর স্ব-ইচ্ছায় ফিরে গেল তার পাইওনিয়ার ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে। আশ্চর্যের ব্যাপার ওর অধিনায়কত্বে পাইওনিয়ার সে বছর সি এ বি-র সাব জুনিয়র টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলো। বর্ষসেরা হবার ফলে সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ১৫তে যে বাংলা দল গড়া হয়েছে তাতে সুযোগ পেয়েছে সৌরভ। চলতি মরসুমে পাইওনিয়ারের হয়ে নিয়মিত ক্রিকেট খেলছে। বাবা সুশান্ত দত্ত ও মা সুমিতা দত্ত ছেলের খেলা নিয়ে আশাবাদী। সঙ্গে রয়েছে পাড়ার দাদা অমল বিশ্বাসের অক্লান্ত পরিশ্রম।
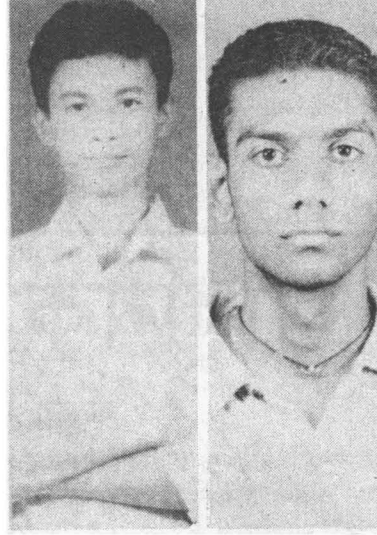
সৌরভ দত্ত সুমিত মিশ্র

সৌরভের পাশাপাশি জুনিয়র ক্রিকেটার সুমিতের (মিশ্র) কৃতিত্বও কিন্তু কম নয়। কলকাতার ছেলে। ২৮/এইচ নলিনী সরকার স্ট্রিটে থাকে। গলিতে খেলে যে বর্ষসেরা ক্রিকেটার হওয়া যায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ সুমিত। স্যুঁটে ব্যানার্জী ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ছাত্র। দেশবন্ধু পার্কে প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ ৺পুলক বিশ্বাসের কাছে ক্রিকেট খেলা শিখলেও বর্তমানে শশাঙ্ক গুপ্ত তার ক্রিকেট খেলার অভিভাবক।' পাড়ার গলিতে ক্রিকেটে অভিষেক হলেও কলকাতার দ্বিতীয় বিভাগ দল মেসার্স ক্লাবে খেলে। প্রথম বছরেই লম্বা-চওড়া রান করে সুমিত সকলের নজর কাড়ে। ৯৮-৯৯ মরসুমে মোট রান করে ৪১২। সর্বোচ্চ ৮৪, আলিপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে। এছাড়া উইকেট পেয়েছে ১০টি। দ্বিতীয় বছর অর্থাৎ ৯৯-২০০০ মরসুমে সি এ বি লিগে সুমিত মোট রান সংগ্রহ করেছে ৭১৯। যার মধ্যে রয়েছে দুটি সেঞ্চুরি। স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউটের বিপক্ষে সুমিতের সর্বোচ্চ রান ছিল ১৩৮। খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ১০৭ রান। এর আগে সাব জুনিয়র ক্রিকেটে সাফল্য না পাওয়ায় এবারের জুনিয়র প্রতিযোগিতাটি সুমিতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। চ্যালেঞ্জ রক্ষায় সুমিত সফল হয়েছে। ৫টি ম্যাচ খেলে ২৩৬ রান করেছে। সেমি ফাইনালে সাই-এর বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান ছিল ৯৩। ফাইনালে সি. সি. সি-র বিপক্ষে ৬২ রান।

শচীন-ভক্ত সুমিত লেখাপড়ায় কিন্তু দারুণ মেধাবী। জয়পুরিয়া কলেজের বি.কম অনার্সের ছাত্র।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
৩.১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।